নব্যভারত।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

২১০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত
ও ২১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

১২৯০ সাল।

প্রথমখণ্ড নব্যভারতের সূচিপত্র।

[প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী]

নব্যভারত।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

প্রথম খণ্ড। | জ্যৈষ্ঠ,—১২৯০ সাল। | ১ম সংখ্যা।

নব্যভারত।

ভারত-ইতিহাস লেখকগণ কলম ধরিয়া লিখুন—১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রাচীন ভারত 'নব্যভারত' নামে অভিহিত হইল। পৃথিবীর যদি বুঝিবার শক্তি থাকে, তবে পৃথিবী বুঝিবে—প্রকৃত পক্ষেই ভারত বর্ত্তমান সময়ে 'নব্যভারত' নামে পৃথিবীর কাহিনীতে আখ্যাত হইয়াছে। একি অহঙ্কারের কথা? যাঁহারা বিদ্রূপপ্রিয়—উপহাস করাই যাঁহাদিগের স্বভাব,—তাঁহারা একথা বলিবেন, তাহা জানি; তাঁহাদিগকে একথা বলিতে দেও। দরিদ্রের কুটীরে যখন নব সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সেই দরিদ্র যখন আহ্লাদ সহকারে সেই সংবাদ দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে যায়,—তখন ধনি-জগৎ যে তাহাকে বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু দরিদ্রের কি আহ্লাদ করিবার কিছুই নাই? নিবিষ্টচিত্তে ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারেন,—দরিদ্রেরও আহ্লাদ করিবার বস্তু আছে—দরিদ্রের জন্যও পৃথিবীতে সুখ রহিয়াছে, দরিদ্রেও সত্য কথা বলিতে অধিকারী। প্রাচীন ভারতের নব জীবনের নূতন সংবাদ প্রচার করিতে কতিপয় দরিদ্র লোক অগ্রসর হইয়াছেন—লোকে ঠাট্টা করিবে, উপহাস করিবে, আশ্চর্য্য কি? সত্য কাহিনী প্রচার করিবার সময় বাধা বিঘ্ন স্মরণ করিয়া যে নিরস্ত থাকে সে মূর্খ। প্রাচীন ভারত 'নব্য ভারত' বেশে জগতের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, আমরা একথা বলিব—কাহারও কথা শুনিব না। ইতিহাস লেখকগণও সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, কলম ধরিয়া এই কথা স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিয়া রাখিবেন।

কি—ভারত নূতন? প্রাচীন ভারত আবার নূতন হইল? বৃদ্ধও কি যুবকে পরিণত হইতে পারে? এ কি শাস্ত্র? পুনর্জ্জন্মে কি তবে বিশ্বাস করিতে হইবে? প্রাচীন ভারত আরও প্রাচীন হইবেন, না পুনঃ নবীনত্বে পরিণত হইলেন? আমরা বলি, এ সকলি সম্ভব। জড়জগৎ হইতে প্রাণি-জগৎ পর্য্যন্ত সকলেরই উত্থান ও পতন আছে। বৃক্ষের পুরাতন পত্র ঝরিয়া পড়ে—আবার নূতন পত্র শাখা প্রশাখাকে শোভিত করে;—

মনুষ্যের নিস্তেজ ও মলিন অঙ্গও এক সময়ে সতেজে কত শোভা ধারণ করে। একবার মনুষ্য নীতি সম্বন্ধে হীন হয়—পতিত হয়—আবার উজ্জ্বল বর্ণে শোভিত হয়—সুনীতিতে ভূষিত হয়। এই মর্ত্তাজগতে এমন লোকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, যে একবার পতিত হইয়া না উঠিয়াছে,—একবার মরিয়া যে না বাঁচিয়াছে। মনুষ্য একবার মরে, আবার বাঁচে;—একবার বৃদ্ধ হয়, আবার নবীন হয়—আবার নব রসে পূর্ণ হয়। মনুষ্য সম্বন্ধে যাহা, দেশ সম্বন্ধেও তাহা, ইহার একটুও ব্যতিক্রম নাই। পৃথিবীর অবিশ্রান্ত গতিতে ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে কোন দেশ ডুবিতেছে, কোন দেশ উঠিতেছে,—কোন দেশের মৃত্যু হইতেছে,—কোন দেশের পুনর্জন্ম লাভ হইতেছে। কালের অনন্ত লীলায় একবার যে দেশ মৃত্যু-মুখে পড়িয়াছিল, সে দেশ সময়ে আবার জীবন লাভ করিতেছে। এই প্রকার জন্ম মৃত্যু যেন পৃথিবীর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ফিরিতেছে। একবার ইটালীর উত্থান, আবার পতন, আবার উত্থান। ইতিহাসে যাহা ইটালী সম্বন্ধে ঘটিয়াছে—ইতিহাসে তাহাই হতভাগ্য ভারত সম্বন্ধে ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতের স্মৃতি নব্যভারতের এক সম্পত্তি বিশেষ বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের আর কি আছে? সকলেই জানেন—কিছুই নাই। সে গার্গী নাই, সে খনা নাই, সে লীলাবতী নাই, সে সাবিত্রী নাই, সে যুধিষ্ঠির নাই, সে ভীম নাই, সে রামচন্দ্র নাই, সে কণিক নাই, সে চার্ব্বাক নাই, সে কালিদাস নাই, সে আর্য্য-ভট্ট নাই, সে বরাহমিহির নাই,—সে কালের আশা ভরসা কিছুই নাই। কিছুই নাই—ভারতের পূর্ব্বকাহিনী স্বপ্ন হইয়া অতীত কালের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে;—সে কালের কোন বস্তুর সহিত এক্ষণকার আর সাদৃশ্য নাই। সহস্র বৎসর স্তব স্তুতি করিলেও আর সে সকল ফিরিবে না। সে ভ্রান্ত, যে আজও সেই সকল মায়াময় স্বপ্ন ভারতবর্ষে—এই হিন্দু-স্থানে বর্ত্তমান শতাব্দীতে দেখিয়া ভুলিতেছে। সে কালের কিছুই নাই। স্মৃতি লইয়া পূজা করিতে চাও, কর, কিন্তু ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দিবেই দিবে যে, সে কালের কিছুই নাই। ভারতের পূর্ব্বের সকলই কালের অনন্ত সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে—কিছুই নাই। ভারতের পূর্ব্ব জীবনী শক্তি যখন একেবারে বিলুপ্ত হইল, যখন একে একে সকল রত্ন ভারত বক্ষকে শূন্য করিয়া পলায়ন করিল, তখন ইতিহাস লেখকগণ শোকার্ত্ত হৃদয়ে চক্ষের জলের দ্বারা ইতিহাসে লিখিলেন—ভারত মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছে। সেই হইতে ভারতগগণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল,—সেই ভীষণ বিভীষিকাময় অন্ধকারে হীন-চেতা পশু সকল দলে দলে বিচরণ করিতে লাগিল;—কেহ কাহাকে দেখে না,—কেহ কাহাকে চেনে না;—এই প্রকারে ভারত কতকাল মৃত্যুতে পড়িয়া রহিল। ভারতের দুর্দ্দশার সে কাহিনী কেবা বলিতে পারে, কেবা শুনিতে জানে? সেই সময়ে মৃত ভারতের ইতিহাস আর কেহ লিখিল না। কত শত বৎসর চলিয়া গেল—দরিদ্র ভারত যে মৃত সেই মৃত। সকলের আশার দীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল—ভারত আবার জীবন পাইবে, এ আশা আর কাহারও হৃদয়ে স্থান পাইল না।

আমরা ভারতের সেই অতীত কাহিনী

সকল স্মরণ করিয়া আজ চক্ষের জলে ভাসিতেছি—সকল ঘটনা লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে না;—সকল কথা ব্যক্ত করিতে হৃদয় অগ্রসর হইতেছে না। এই মরু-ভূমিতে আবার সরসী সৃজিত হইবে,—অন্ধকার গৃহে আবার উজ্জ্বল আলোক শোভা পাইবে—ভারতে আবার সূর্য্য উদিত হইবে, এ চিন্তা তখন কাহারও মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস এই সময়ে কি দেখিল? সবিস্ময়ে জগত দেখিল—ধীরে ধীরে ভারত গগণে আবার নবীন সূর্য্য উদিত হইতেছে। ভারত অন্ধ-কারে আবার দীপ জ্বলিতেছে দেখিয়া সেই সময়ে পৃথিবী কলরব করিয়া উঠিল। ভারত তখন ঐ আলোকের মর্ম্ম কিছুই বুঝে নাই—ভারতের তখন বুঝিবার শক্তি ছিল না। ভারত ভূমির সেই সূর্য্যো-দয়ের কাল ইংরাজ রাজত্বের সময় হইতে গণনা করা যায়। যে কারণেই হউক, ইংরাজ ভারতকে উদ্ধার করিলেন,—ভার-তকে জীবিত করিলেন। তারপর কি হইল?—সূর্য্য ধীরে ধীরে গগণে উঠিতে লাগিল; যে জাতি শত শত বৎসর অন্ধ-কারে বাস করিয়া চক্ষুর জ্যোতি হারা-ইয়াছিল, সেই জাতির আলোক সহ্য হইল না,—তাহারা কলরব করিয়া উঠিল,—অত্যাচার—অবিচার—অধীনতা এই প্রকার কত কর্কশ ধ্বনি আকাশে তুলিতে লাগিল। ইংরাজ রাজত্বকে দুঃখের বলিতে চাও বল, কিন্তু ভাই, নিশ্চয় জানিও, ঐ সূর্য্য কখনও এত শীঘ্র ভারত-গগণে উদিত হইত না, যদি ইংরাজ ভারতে পদার্পণ না করিত। যা'ক সে কথায় আজ প্রয়োজন নাই। সূর্য্য ভারতকে আলোকিত করিবার জন্য আসিয়াছিল—আলোকিত করিল। ভারতের সকলে তখন মুখ চেনাচিনি করিতে লাগিল—'জয় ভারতের জয়' এই শব্দ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল,—পূর্ব্ব স্মৃতি হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল,—কেহ বক্ষে আঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল,—কেহ ক্রন্দন করিতে লাগিল,—কেহ ইংরাজকে তাড়াইবার জন্য অলীক আশার স্বপ্ন দেখিয়া সময় কাটাইতে লাগিল। কিন্তু এ সময়ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না,—সৌভাগ্যবশতঃ শিক্ষার সহিত ভারতের উষ্ণ রক্ত একটু শীতল হইল,—ভারতবাসী স্বাভাবিক কোমলভাবে পূর্ণ হইতে লাগিলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে ভারত জীবন পাইলেন;—কেবল জীবন নহে, শক্তি পাইলেন;—ভাল মন্দ বুঝিবার জ্ঞান জন্মিল,—নীতির আদর বুঝি-লেন। ভারত তখন ইংরাজকে নমস্কার করিতে শিখিলেন,—ভারতের মস্তক নত হইল। এই সময়ে আমরা ভারতকে 'নব্যভারত' বলিয়া অভিহিত করিলাম;—পৃথিবীর সভ্য, অসভ্য অসংখ্য জাতি এই সময়ে ভারতকে একবাক্যে 'নব্যভারত' বলিয়া ব্যাখ্যা করিল।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—সেই প্রাচীন ভারতই যে এই, তাহার প্রমাণ কি?—প্রমাণ চাও?—ভারতের উত্তরদিকে তাকা-ইয়া দেখ—ঐ হিমালয় অদ্যাবধি মস্তক উত্তোলন করিয়া—আপন বক্ষে স্মৃতির চিহ্ন সকল অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া তোমার কথার উত্তর দিবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে;—ঐ আর্য্যাবর্ত্ত রহিয়াছে;—ঐ গঙ্গা যমুনা রহিয়াছে;—ঐ অযোধ্যা রহিয়াছে। আর কি চাও?—ঐ দেখ, ভারতবাসীর হৃদয়ে, সহৃ-দয়তার উজ্জ্বল অক্ষরে প্রাচীন ভারতের চিহ্ন

বিদ্যমান রহিয়াছে ;—দেখ, ধর্ম্ম-প্রধান প্রাচীন ভারতের দয়া ধর্ম্ম কি প্রকারে নব্য-ভারতের হৃদয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে; দেখ, ঐ স্তূপাকারে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল 'নব্যভারতের' ভাষার শোভা সৌন্দর্য্য কি প্রকারে বৃদ্ধি করিতেছে,—ভাষার মূলে কি প্রকার শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। সে ভ্রান্ত, যে প্রাচীন ভারতের অসংখ্য অসংখ্য প্রমাণ পাইয়াও তাহাকে তুচ্ছ করে—এবং প্রাচীন ভারত যে নব ভূষণে ভূষিত হইয়া পৃথিবীর চক্ষুকে আকৃষ্ট করিতেছে, তাহা যে অস্বীকার করে। ভারত-ইতিহাসের গূঢ় অভ্রান্ত সত্য সকলকে যে অস্বীকার করিল, তাহার কি বিড়ম্বনা!!

প্রাচীন ভারতের সহিত নূতন ভারতের কি প্রভেদ, একথার আলোচনায় আমরা অদ্য প্রবৃত্ত হইব না। প্রাচীন ভারত শ্রেষ্ঠ, কি 'নব্য ভারত' শ্রেষ্ঠ, সে বিষয় লইয়াও তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা এই মাত্র বলি, সে সময়ের ভাল সেই সময়েই ভাল লাগিয়াছে—আর এ সময়ের ভাল এ সময়েই ভাল লাগিতেছে। কিন্তু একটী কথা আমরা এস্থলে বলিব, সে সময়ে বাহুবলে যাহা সংসিদ্ধ হইত, এ সময়ে বুদ্ধিবলে ও জ্ঞানবলে তাহা সংসাধিত হইবে, আশা হইতেছে। 'নব্যভারত' এখন বুঝিতে পারিতেছেন—নীতিবলের ন্যায় পৃথিবীতে আর বল নাই; পাপের ন্যায় আর ভয়ানক শত্রু নাই। 'নব্যভারত' আর কি বুঝিতে পারিতেছেন?—বুঝিতেছেন, একতাই মানবের মহাশক্তি,—প্রেম একতার মূল সূত্র, নীতি ও পুণ্য একতার প্রাণ;—বুঝিতেছেন—এক সময়ে পৃথিবী হইতে পাশব শক্তির আদর উঠিয়া যাইবে,—নীতির আদর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে;—শোণিতপাত—অত্যাচার—হিংসার চরমফল যুদ্ধবিগ্রহ এক সময়ে পৃথিবী হইতে পলায়ন করিবে। ইহা বুঝিয়া নব্য-ভারত দিন দিন সেই বলে বলীয়ান হইতেছেন। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, নব্যভারত' ও 'নব্য ইটালী' একই প্রকার। আমরা বলি 'নব্যভারত' ও 'নব্য ইটালী' এক প্রকার নহে। 'নব্য ইটালীতে' নীতির আদর থাকিলেও অস্ত্রের সহিত একেবারে ইহার সম্বন্ধ রহিত হয় নাই—কিন্তু অস্ত্রের সহিত 'নব্যভারতের' কোন সম্পর্ক নাই,—'নব্যভারত' একমাত্র নীতি ও পুণ্যের উপর দণ্ডায়মান হইয়া পৃথিবীর চক্ষুকে আকৃষ্ট করিতেছেন। 'নব্যভারত' শরীরের বলের আদর দিন দিন বিস্মৃত হইয়া জ্ঞানবলে ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতেছেন। 'নব্য ইটালীর' আবার পতন হইতে পারে,—আবার অত্যাচার আসিয়া ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই, 'নব্যভারত' যদি অটলভাবে আপন লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতে পারেন, তবে ইহার সে পতনের আর সম্ভাবনা নাই। ম্যাট্‌সিনি 'নব্য ইটালীর' অধিনেতা ছিলেন—স্বয়ং ঈশ্বর 'নব্য ভারতের' নেতা। পতন ভারত হইতে কতদূরে, একবার কল্পনা কর। নির্ব্বোধ ভারতবাসি! কেন বালকের ন্যায় ম্যাট্‌সিনির অভ্যুত্থান কামনা করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতেছ। সময়ের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া জগদীশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া একবার মাভৈঃ মাভৈঃ রবে 'নব্য ভারতের' সেবা কর দেখি, নীতি পাও কি না, শক্তি পাও কিনা, একতা পাও কি না।

'নব্যভারত' নব বেশে দেশে নব যুদ্ধ ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এই সময়ে যদি

কেহ অগ্রসর হইয়া 'নব্য ভারতের' গুপ্ত অস্ত্র কি, এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমরা তাহাকে নির্ভয়চিত্তে বলিব—নব্যভারতের এক হস্তে পবিত্রতা, অন্য হস্তে উদারতা—মস্তিকে জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তা, হৃদয়ে প্রেম,—আর সমস্ত শরীরে ওতঃপ্রোত ভাবে মানবের রাজা স্বয়ং ঈশ্বর অধিষ্ঠিত। 'নব্য ভারতের' শক্তির পরিমাণ কে করিতে অগ্রসর হইবে? ভারতের পূর্ব্ব স্মৃতি ভারতকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে—ঈশ্বর বিশ্বাসই সকল শক্তির মূল। ভারতবর্ষের যাহারা এই মন্ত্র অস্বীকার করিল—তাহারাই পাপে ডুবিল—অত্যাচারে মরিল—পৃথিবীতে কলঙ্কের পূতিগন্ধযুক্ত নিশান তুলিয়া রাখিয়া অপসৃত হইল। 'নব্যভারতে' যদি এ প্রকার লোক থাকেন, তবে 'নব্যভারত' সতর্কভাবে, যত্ন সহকারে, প্রেমের দ্বারা তাহাদিগকে আবার লক্ষ্য পথে আনিবেন, একজনকেও অন্য পথে যাইতে দিবেন না। 'নব্যভারত' জানেন, শরীরের এক অঙ্গের পতনে অন্য অঙ্গের বল হ্রাস হয়। 'নব্যভারতের' হৃদয়ে ও মনে ঘৃণা থাকিবে না, অহঙ্কার থাকিবে না;—উদারভাবে বিনীত অন্তরে 'নব্যভারত' সকলের সেবা করিবেন। ঠাট্টায় 'নব্যভারত' বিচলিত হইবেন না, নিন্দায় কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন না;—গুপ্ত মন্ত্র সাধনে রত থাকিলে পৃথিবীর সকলকে তুচ্ছ করিতে পারিবেন। 'নব্য ভারত' জানেন, অন্তরে বাহিরে এক থাকাই মহত্ব,—কপটতা সর্ব্বনাশের মূল,—যেখানে অন্তরে কিছু নাই, সেখানে বাহিরে আচ্ছাদন দিয়া ঢাকিয়া জগতের প্রশংসা পাইলেই উন্নতি লাভ করা যায় না। নব্যভারতের আর কি লক্ষ্য আছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে জগতের নিকট অপ্রকাশিত থাকাই ভাল; বৃথা আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন, 'নব্য ভারতের' ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইল কেন? যে দেশে বহু ভাষা প্রচলিত, সে দেশে ইহার এক ভাষা হইল কেন? একথার উত্তর এই—বাঙ্গালা ভাষাই 'নব্যভারতের' ভাষা—আজ না হইলেও কালে হইবে। ভাই, তুমি ইংরাজি ভাষার উন্নতির চেষ্টায় রত হইয়া দিন দিন উন্নত হইতেছ, তোমার নাম সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইতেছে, তুমি কি আত্মাভিমানকে বিসর্জ্জন দিয়া কখনও বাঙ্গালা ভাষার গভীরতা অনুভব করিয়াছ—ইহার উন্নতির পরীক্ষা করিয়াছ—আর ভারতের সমস্ত ভাষার হীনাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ? যদি তোমার পক্ষে এসকল সম্ভব হইয়া থাকে, তবে তুমি ভাই দরিদ্রের এই কথাটীকে স্মরণ করিয়া রাখ,—বাঙ্গালা ভাষাই কালে সমস্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত হইবে। যে হিন্দুস্থানী বাঙ্গালীর সহিত একত্রে ছয় মাস কালযাপন করিয়াছে, সে হিন্দুস্থানী আর বাঙ্গালীর সহিত হিন্দিতে কথা কহিতে ভালবাসে না। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভারতের এমন স্থান নাই, যেখানে বাঙ্গালীর গমন হয় নাই; সুতরাং ভারতের এমন স্থান নাই, যেখানে কোন না কোন লোক একটু বাঙ্গালা না জানে। তারপর বাঙ্গালা যে ভাষা হইতে উৎপন্ন, ভারতের আর প্রায় সমস্ত ভাষাই সেই মূল সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন; না হইলেও মূলের সহিত অনেক

সাদৃশ্য আছে। এই কারণে সহজ জ্ঞানে বুঝা যায়, বাঙ্গালা ভাষা কালে ভারতের ভাষা হইবে। জাতীয় ভাষা ভিন্ন কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না; ভারতের সেই পরিমাণে উন্নতি হইবে, যে পরিমাণে ভাষার উন্নতি হইবে। এক দেশে বিভিন্নধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলে যেমন একতা অসম্ভব, এক দেশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সেইরূপ একতা অসম্ভব। প্রাচীন ভারতে এক সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল বলিয়াই ভারতের হৃদয়ে হৃদয়ে মিল ছিল। এক প্রকার স্বর, এক প্রকার অভাব, এক প্রকার ধর্ম্ম, এক প্রকার ভাষা এ সকলই একতার জন্য চাই। যাঁহারা বলেন, ইংরাজশাসনে সমস্ত ভারত শাসিত, এক শাসনাধীন সকলের অভাবই এক প্রকার, অতএব ভারতের একতার জন্য ধর্ম্ম, ভাষা প্রভৃতির একতা চাই নাই; পৃথিবীর ইতিহাস তাঁহাদের এ কথাকে নিতান্ত অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে। সুতরাং আমরা আর এই কথার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চাহি না। একতার মূল কি, এ সম্বন্ধে ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস, ও ভাষা জগতের ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে উদাহরণ দিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তবে এ কথা আমরা বলি না যে, পৃথিবীর কোন দেশেই এসত্য অপ্রমাণীকৃত হয় নাই। এক ধর্ম্ম এবং এক ভাষা প্রচলিত হওয়া সময় সাপেক্ষ বটে, কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ কার্য্য একদিনে সম্পন্ন হয়? যাঁহারা মানবজাতির অভ্যুদয়ের মূল ইতিহাস নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন—এক ধর্ম্ম, এক ভাষা ভিন্ন কখনও কোন দেশে এক হৃদয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যদি ভারতে ইহা অসম্ভব হয়, তবে ভারতে একতাও অসম্ভব। এক খৃষ্টধর্ম্ম ও ইংরাজি ভাষা পৃথিবীর অসংখ্য জাতিকে কি প্রকারে একতাসূত্রে বাঁধিতেছে, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। যাঁহারা জাতীয় ভাষার উন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতিকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল রাজনীতির অনুসরণ করিয়া পরানুকরণে রত আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা পণ্ডশ্রমে রত দেখিয়া সময়ে সময়ে অশ্রুপাত করিয়া থাকি। আমরা বলি, ভারতে ভাষার একতা এবং ধর্ম্মের একতা সময় সাপেক্ষ হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে; যদি অসম্ভব হইত, তবে ভারতকে আজ আমরা 'নব্যভারত' নামে অভিহিত করিতে প্রয়াস পাইতাম না। কেহ কেহ মনে করেন, ইংরাজি ভাষাই কালে ভারতের ভাষা হইবে; ইহা মনে করিয়া অসংখ্য ভারত সন্তান ইংরাজির সেবায় জীবন ক্ষয় করিতেছেন,—ঐ ভাষার কাল্পনিক অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা জানেন না, জাতীয় ভাষা ভিন্ন কোন ভাষা হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না, হৃদয়স্পর্শী ভাষা না হইলে ছোট বড় সকলের তাহা ভাল লাগে না,—সকলে তাহা গ্রহণ করে না। অসংখ্য নর নারী যে ভাষা গ্রহণ না করিল, সে ভাষাও কি জাতীয় ভাষা—একতার ভাষা হইতে পারে? এই জন্য আমরা বলি ইংরাজি ভাষা, নব্যভারতের শিক্ষার বস্তু হইলেও, হৃদয়স্পর্শী—একতার মধ্যবিন্দু হইবে না। এই জন্য আমরা মনে করিয়া থাকি, যাঁহারা ইংরাজির উন্নতির চর্চ্চায় রত আছেন, তাঁহারা কেবলই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ করিতেছেন। এই কাল্পনিক একতার কাল্পনিক পথ পরি-

ত্যাগ করিয়া ইঁহারা যদি জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধনে রত হইতেন, তবে ভারতের কত অভাব দূর হইত! বাঙ্গালা ভাষা অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে, এই ভাষাই যে কালে ভারতের ভাষা হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়েই বাঙ্গালা ভাষার কোন কোন পুস্তক ভারতের অন্যান্য ভাষায় রূপান্তরিত হইতেছে। কেবল অনুবাদে যখন লোকের তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইবে না, তখন এই ভাষা শিক্ষা করিতে সকলেরই রুচি হইবে। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা কালে কেবল বঙ্গদেশেই ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে না;—ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইবে। যত দিন তাহা না হয়, ততদিন ভারতে একতা অসম্ভব। এই জন্য 'নব্যভারতের' ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইল, কালে এই হৃদয়স্পর্শী ভাষা ভারতের নরনারী সকলের হৃদয়কেই স্পর্শ করিবে,—কালে সকলের মুখেই এই এক ভাষা শ্রুত হইবে। 'নব্যভারতের' এই অভিনব ভাষা ভারতকে সজীব করিবে—এক করিবে, প্রাণে প্রাণে মিলাইবে।

আর একটী কথা বলা হইলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হয়। 'নব্যভারতের' কাল দশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ধরা যায় কি না? আমরা বলি, তাহা যায় না। যখন সুপ্তোত্থিত ভারতবাসী ইংরাজকে অন্তরে অন্তরে ভারতবর্ষ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবার কামনা করিত, মুখে 'ভারতজয়, ভারতজয়' গান করিয়া সুখ পাইত, বিদ্যাশিক্ষাকে চাকুরী বা দাসত্বের কেন্দ্র বলিয়া তাহার অনুসরণ করিত, স্ত্রীশিক্ষাকে ঘৃণা করিত; বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষাকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিত, পরানুকরণে জীবনকে ডুবাইয়া সুখী হইত, ধর্ম্মের নামে উপহাস না করিয়া জলগ্রহণ করিত না, একজন আর একজনকে কাঁদিতে দেখিলে হাস্য সংবরণ করিতে পারিত না, ভারতবাসী দেশহিতৈষী নাম গ্রহণ করিত কেবল যশমানের জন্য, পরোপকার করিত ইংরাজের কৃপা পাইবার জন্য,—এবং ভাই ভাই কাটাকাটী করিয়া মরিত, সে সময়কে 'নব্যভারতের' কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে আর ভারতের সে সময় নাই, এক্ষণ ভারত জাতীয় ভাবের ও জাতীয় ভাষার আদর শিখিতেছেন,—এক হৃদয়ের দুঃখে অন্য হৃদয় কঁাদিতেছে; জাতিভেদকে সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া বুঝিতেছেন, স্বাধীনতার আদর বুঝিতেছেন, জ্ঞানের মর্য্যাদা ও বিদ্যার জন্য বিদ্যার আদর করিতে শিখিতেছেন। আর মুখে 'জয় ভারতের জয়' বলিয়া ইংরাজকে তাড়াইতে ভারতবাসীর ইচ্ছা নাই;—এক্ষণ ভারতবাসী বুঝিতেছেন—আরও অনেককাল ইংরাজের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে। ভারতবাসী এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার আদর বুঝিতেছেন, ধর্ম্মের নামে আর উপহাস করিতে ইচ্ছা নাই,—কাহারও কৃপা পাইবার জন্য বা যশের জন্য পরোপকার করাকে ঘৃণার কার্য্য বলিয়া বুঝিতেছেন। এক্ষণে বিদ্যা শিখিয়া ভারতবাসী দেশের উপকার করিতে ধাবিত হইতেছেন;—বিলাত হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ভারতে আসিয়া জাতীয় ভাব ও ভাষার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। এই সময়ে ভারতের যে কি এক অপরূপ শোভা হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। এই অভিনব সময়কেই আমরা 'নব্যভারতের' সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। স্বায়ত্ত-শাসনের

আন্দোলনে ভারত দেখাইয়াছেন, ভারত রাজনীতি চায়,—ভারত একতার জন্য উৎসুক। ফৌজদারী কার্য্যবিধির বিল সম্বন্ধীয় আন্দোলনে ভারত দেখিয়াছেন, ভারতকে আর পদতলে রাখিতে উদারচেতা ইংরাজগণের ইচ্ছা নাই,—ভারতও নানারূপে দেখাইয়াছেন ভারত আর বিচ্ছিন্ন নাই—একের সুখে অন্যের হৃদয় ফুল্ল হয়, একের দুঃখে অন্যের হৃদয় ব্যথিত হয়। ভাষার আদরের সহিত সংবাদপত্রের আদর বাড়িতেছে, ভারত আলস্য পরিহার করিয়া কার্য্যদক্ষ হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। প্রজা ভূম্যধিকারীর বিলের আন্দোলনে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, ভারতে দুঃখী প্রজাদের জন্য কাঁদিবার অনেক লোক আছে। আরও অসংখ্য কারণে আমরা উদারচেতা মহামতি লর্ড রিপণের শাসন কালকেই 'নব্যভারতের' কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। ইঁহার ন্যায় উদারনৈতিক শাসনকর্ত্তা আর কখনও ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। ইনিই যেন ভারতকে নবভূষণে সাজাইয়া তুলিতেছেন।

'নব্যভারত' সুসময়ে পৃথিবীর নিকট পরিচিত হইলেন,—কতকাল ইহার রাজত্ব থাকিবে, ঈশ্বরই জানেন। 'নব্যভারতের' উন্নতিতে যাঁহারা আনন্দিত হন, তাঁহারা অবশ্য নব্যভারতের উন্নতির জন্য প্রাণপণ করিবেন। ইহার অবনতিতে যাঁহারা আনন্দিত হন, তাঁহারা অবশ্য ইহার অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন। 'নব্যভারত' সুখেও অধীর হইবেন না, দুঃখেও বিষণ্ণ হইবেন না। ধীরচিত্তে বীরের ন্যায় 'নব্যভারত' কর্ত্তব্য সাধনে রত থাকিবেন। সত্য পৃথিবীতে জয় যুক্ত হইবেই হইবে। 'নব্যভারত' যদি সত্য প্রচার করিতে পারেন, তবে কেহই সে সত্যের অপলাপ করিতে পারিবে না। মিথ্যা জগতে কখনও স্থায়ী হইবে না, সুতরাং নব্যভারত যদি মিথ্যা প্রচার করেন, তবে তাহাও কেহ ধরিয়া স্থায়ী করিতে পারিবে না। বন্ধু বান্ধব সকলে 'নব্যভারতকে' আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহাদের ও ঈশ্বরের কৃপা মস্তকে ধারণ করিয়া উদারভাবে 'নব্যভারত' জগতে সত্য প্রচারে রত থাকুক। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, স্বাধীনতা, পবিত্রতা ও উদারতা ইহার মূলমন্ত্র হউক;—একতা—শান্তি এবং সাম্য ইহার চরম লক্ষ্য হউক।

জীবন-গতি নির্ণয়।

(An exposition of the dynamical laws of life.)

প্রথম অধ্যায়।

মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা।

"Some have asserted that human affairs are altogether determined by the voluntary action of man, some that the Providence of God directs us in every step, some that all events are fixed by destiny. It is for us to ascertain how far each of the affirmation is true." J. W. Droper.

আমরা বহির্জগতে যে সকল পদার্থ নিরীক্ষণ করি, তাহারা সকলেই কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট এবং অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন রহিয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য এবং অপরাপর গ্রহ উপগ্রহ সকলই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, এ সকলই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। পৃথিবীস্থ জীব জন্তুর শারীরিক কার্য্যকলাপ, তাহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর দ্বারা পরিশাসিত হইতেছে। বিশাল বিশ্বসংসার একটী বৃহৎ যন্ত্রের ন্যায় বিশ্বনিয়ন্তার অলঙ্ঘ্য নিয়মে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণায়মান হইতে হইতে ক্রমেই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে;—গভীর জলরাশির মধ্য হইতে দ্বীপের উৎপত্তি হইতেছে, আবার পর্ব্বতাকীর্ণ স্থান সকল ক্রমশঃ সাগরগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু বহির্জগতের এই সকল পরিবর্ত্তনই কি কেবল জগৎপিতার অখণ্ডনীয় এবং অপ্রতিহত নিয়মের অধীন রহিয়াছে? অন্তর্জগতের পরিবর্ত্তনসমূহ কি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন নহে? মানবজীবনের কর্য্যকলাপের মধ্যে কি কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী লক্ষিত হয় না? মানবজীবন কি কেবল ঘটনার স্রোতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অদ্য রাজ সিংহাসন লাভ, কল্য বৃক্ষতল আশ্রয় করে?

ফরাশিদেশের ষোড়শ লুইয়ের শিরচ্ছেদন, পতিপ্রাণা, সন্তান বৎসলা, কোমল হৃদয়া রাজমহিষী মেরি আণ্টয়নেটের প্রাণদণ্ড, সমস্ত ইয়ুরোপের ভীতিস্থান বীরচূড়ামণি নেপোলিয়নের কারাবাস ও মৃত্যু কি আকস্মিক দৈব ঘটনা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতে পারে? বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক রোম রাজ্যের বিনাশ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ত্রিভুবনবিজয়ী ভীষ্ম কর্ণের পরাজয়, সিপিও হস্তে কার্থেজের বীর-গৌরব হানিবলের গৌরব বিচূর্ণন, এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে কি কার্য্য কারণ শৃঙ্খল লক্ষিত হয় না? বস্তুতঃ বিজ্ঞানের চক্ষে দৃষ্টি করিলে প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনার মূলে সুস্পষ্টরূপে অনিবার্য্য কারণ সকল লক্ষিত হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ জগতে যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে, এবং

অঙ্কুর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, কার্য্যজগতেও সেই প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং অননুভবনীয় ঘটনা হইতে অতি বৃহৎ ব্যাপার সকল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। কার্য্য কারণ শৃঙ্খল যে কেবল জড়জগতের পদার্থ সমূহের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে তাহা নহে; ঐতিহাসিক ঘটনা সকলও কার্য্য কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কি জড়জগৎ, কি উদ্ভিজ্জ জগৎ, কি কার্য্যজগৎ, সকলের মধ্যেই অলঙ্ঘ্য নিয়ম, ফলাফলের শৃঙ্খলা, নিয়মিত পরিবর্ত্তন, অবিশ্রান্ত উন্নতির স্রোত পরিলক্ষিত হইতেছে। কি দার্শনিক, কি ইতিহাসবেত্তা সকলেই মানবমণ্ডলীর সমগ্র কার্য্যপরম্পরার মূলে কারণশৃঙ্খল নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকানেক চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিয়ম সম্বন্ধে চিরান্ধতা বশতঃ ঈদৃশ ভ্রমজালে নিপতিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা মানব মণ্ডলীর কার্য্যপরম্পরার মূলে কারণ শৃঙ্খল দর্শন করিয়া, অবশেষে মনুষ্য-মনের স্বাধীন কিম্বা স্বতন্ত্র ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মতে মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক অবস্থার দাস; তাহার মনোমধ্যে কোন প্রকার স্বাধীন বা স্বতন্ত্র ইচ্ছার সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব মানবজীবনের গতি নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি না, এইটী নিরূপণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কেন না, মানব মনের ইচ্ছাই জীবনগতি নির্দ্ধারণ করে।

অবস্থাবাদী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যের স্বাধীন বা স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই; যে বহির্জ্জগৎ দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন, সেই বহির্জ্জগতের কোন বস্তু কিম্বা কোন ঘটনা বা কোন অবস্থা, অথবা বহুল বস্তু ঘটনা বা অবস্থার সমষ্টি তাহার অন্তরের মধ্যে যে ভাব উৎপাদন করে, সেই ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি কোন না কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন। এই প্রকার মানব মনের প্রত্যেক ইচ্ছা যখন কোন না কোন ভাব সম্ভূত, এবং সেই ভাব সকল যখন তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বহির্জ্জগতের পদার্থ বা ঘটনা অথবা অবস্থার ফলস্বরূপ, তখন এই অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত অবশ্যই করিতে হইবে যে, মনুষ্যের মধ্যে কোন প্রকার স্বাধীন ইচ্ছার বর্ত্তমানতা সম্ভবপর নহে। ইয়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে স্পাইনোজা মনুষ্যের স্বতন্ত্রেচ্ছা সঞ্চালন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি (স্পাইনোজা) বলিয়াছেন যে, মানব মনে কোন প্রকারেই স্বাধীন কি স্বতন্ত্র ইচ্ছার উদয় হইতে পারে না। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কোন মনুষ্য যে কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তিনী মানসিক অবস্থার ফল, এবং এই শেষোক্ত মানসিক অবস্থা আবার এতৎপূর্ব্ববর্ত্তিনী মানসিক অবস্থার ফল, এই প্রকার ক্রমান্বয়ে দেখিতে গেলে, সহজেই বোধগম্য হইবে যে, মানব মন জন্ম হইতে ক্রমান্বয়ে যে সকল পদার্থ, ঘটনা, বা অবস্থার সংসর্গ প্রাপ্ত হয়, সেই সকল পদার্থ, ঘটনা বা অবস্থা তাহার মনের গতি নিরূপিত করে। আমাদের দেশীয় পুরাতন দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রকার মত পোষণ করিতেন, এবং অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়

ঈদৃশ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই বলিতেন যে, মনুষ্য যে কোন কার্য্য করেন তাহা ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই করেন ; কেননা তাহার নিজের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই।

যে সকল দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই প্রকারে মানব মনের স্বাধীন কিম্বা স্বতন্ত্র ইচ্ছার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, তাহাদিগের মত আমরা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি না। ইহা অবশ্যই, স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহাদিগের মত সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিকরূপে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। আমাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ বহির্জ্জগতের ঘটনা, অবস্থা কিম্বা পদার্থসমূহ নিয়তই যে আমাদিগের মনের ভাব পরিবর্ত্তন করিতেছে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমরা দেখিতেছি যে, বহির্জ্জগতের পদার্থ ও ঘটনা নিচয় মনোমধ্যে নানাবিধ ভাব আনয়ন করিয়া তৎভাবজনিত ইচ্ছা উৎপাদন করিতেছে। সুশীতল প্রভাতসমীরণ শান্তিপূর্ণ ভাবের উদ্রেক করিয়া মানবমনে তম্মূলক গতি প্রদান করিতেছে ; আবার মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ডোত্তাপ সেই ভাবের অবস্থান্তর করিয়া মনের গতি পরিবর্ত্তন করিতেছে। সায়ন্তন নিস্তব্ধতা ও গাম্ভীর্য্য মনুষ্যমনের বর্ত্তমান গতি অবরোধ পূর্ব্বক গত জীবনের সুখ দুঃখ স্মৃতিপথে আনয়ন করে ; আবার চন্দ্রমার সুবিমল জ্যোতি অন্তরাত্মাকে প্রফুল্ল করিয়া মানসিক গতির চঞ্চলতা সম্পাদন করে। পতিপ্রাণা সাধ্বীর হৃদয়প্রফুল্লকর মুখকমল দর্শনে মন এক অভূতপূর্ব্ব পবিত্র প্রীতির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া, সাধু-ইচ্ছা এবং সৎগতি প্রাপ্ত হয় ; আবার বিশ্বাসঘাতিনী ধর্ম্মভ্রষ্টা কুলটা রমণীর দর্শন হৃদয়কে কলুষিত করিয়া মনোমধ্যে অন্যবিধ ভাবের সঞ্চার করে। বন্ধুসম্মিলন মনুষ্যকে প্রফুল্লতা প্রদান করে, এবং অজ্ঞাতসারে চিত্তের উপচিকীর্ষা বৃত্তিগুলিকে চঞ্চল করিয়া তুলে ; পক্ষান্তরে শত্রুসমাগম বিদ্বেষসম্ভূত ঘোর বৈরনির্যাতন-বাসনার উদ্রেক করিয়া, তাহার মনে বিপরীত ভাব উপস্থিত করে। পরলোকগতা স্নেহময়ী জননীর আলেখ্য নিরীক্ষণে হৃদয় গাঢ় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসে পরিপ্লুত হয়, এবং হৃদয়ের তৎসাময়িক তাদৃশ ভাবসম্ভূত ইচ্ছা মনের গতি উৎপাদন করিয়া থাকে ; কিন্তু অপর পক্ষে আণ্টনির বক্ষে-বিরাজিতা ক্লিওপেট্রার চিত্রপট দর্শনে হৃদয় কলঙ্কিত হয় এবং তাৎকালিক অবস্থার অনুযায়িনী ইচ্ছা মনের গতি নিরূপণ করে। এই প্রকারে বহির্জ্জগতের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য যে, সময়ে সময়ে মনের গতি পরিবর্ত্তন করে, তাহা কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন ? আমাদের জীবনের দৈনিক ঘটনা কি সপ্রমাণ করে না যে, এক অবস্থায় নিপতিত হইয়া মানুষ মহর্ষিদিগের বাঞ্ছনীয় দুর্ল্লভ জীবন লাভ করে এবং প্রতিকূল অবস্থা দ্বারা শাসিত হইয়া পশু-জীবন প্রাপ্ত হয় ? সৌভাগ্য এবং ঐশ্বর্য্যমদে প্রমত্ত হইলে মন গর্ব্বিত হয়, দুর্ভাগ্য এবং দরিদ্রতায় মনের গতি নিস্তেজ হইতে থাকে। শুকদেব, প্রহ্লাদ, চৈতন্য, যীশুখৃষ্ট, লুথার প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ কিম্বা শ্রবণ দ্বারা মন পবিত্রগতি প্রাপ্ত হয় ; অন্যদিকে পাপাত্মা রোমীয় সম্রাট্ নিরো কিম্বা বঙ্গীয় নবাব সিরাজ উদ্দৌলার কুক্রিয়া শ্রবণ করিলে হৃদয়ের মধ্যে ঘোরতর ঘৃণার উদ্রেক হয়।

এই প্রকারে বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা যে মানব মনের গতি নিরূপিত হয়, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু এখন এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে যে, মানব মনের গতি কি কেবল বাহ্যিক ঘটনা দ্বারাই নির্ণীত হয়, না মনের এমন কোন আভ্যন্তরিক শক্তি আছে, যদ্দ্বারা বহির্জগতের শক্তি সকল অতিক্রম করিয়া মন আপন স্বাতন্ত্র্য ভাব রক্ষা করিতে পারে? এতৎ সম্বন্ধে ইতিহাসবেত্তা পণ্ডিতবর বকল যাহা বলিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—"এক দিকে মানবমন স্বীয় প্রকৃতিগত নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে এবং বহির্জগতস্থ কোন বল বা শক্তি বা আকর্ষণ দ্বারা অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রাগুক্ত স্বীয় প্রকৃতিতে নিয়মানুসারে স্বাধীন ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; অপরদিকে বহির্জগৎও আপন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নিয়ত কার্য্য করে। কিন্তু এই বহির্জগৎ মানব মনের সংঘর্ষণ লাভ করিয়া মনের আন্তরিক বাসনা এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তেজন পূর্ব্বক মনুষ্যদিগের কার্য্য কলাপে সেই সংঘর্ষণ সম্ভূত নূতন গতি প্রদান করিয়া থাকে; অর্থাৎ মানবগণের কার্য্যকলাপ বহির্জগতের সংঘর্ষণ অভাবে যে গতি প্রাপ্ত হইত, সেই গতি প্রাপ্ত না হইয়া বহির্জগতের সংস্পর্শে এক রূপান্তরিত গতি প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে মানবমণ্ডলী বহির্জগতের গতির রূপান্তর করে এবং বহির্জগৎও প্রত্যেক মনুষ্যের মনের গতির অবস্থান্তর করে; এবং অবশেষে এই পারস্পরিক রূপান্তরিত গতি হইতে সকল ঘটনার উৎপত্তি হয়।" বস্তুত বহির্জগৎ-সমুত্থিত শক্তি বা বল দ্বারা যে মনুষ্য মনের গতি রূপান্তরিত হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্তু মানব মনের কোন্ অবস্থায় বহির্জগৎ তদুপরে কি প্রকার শক্তি সঞ্চালন করিতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে, একদিকে যেমন মানব জীবনের গতি নিরূপিত হইতে পারে, তেমনি অপরদিকে মানবমণ্ডলীর স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি না, তাহারও মীমাংসা হইতে পারে।

ইহা বলা বাহুল্য যে, মানব মন নিশ্চেষ্ট জড়পদার্থের ন্যায় কেবল বাহ্যিক বল প্রয়োগ দ্বারা চালিত হয় না। বহির্জগৎ-সমুত্থিত শক্তি এবং মানব মনের আভ্যন্তরিক শক্তি, এতদুভয়ের সম্মিলনে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই মানব জীবনের গতি। চিন্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, পৃথিবীর সহিত তদুপরিস্থ পদার্থ সমূহের যেরূপ সম্বন্ধ, মানব মনের সহিত, অবস্থা বিশেষে, বহির্জগতের প্রায় সেইরূপ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবী যেরূপ তদুপরিস্থিত পদার্থ সমুদয়কে আকর্ষণ করে, এবং তদুপরিস্থিত পদার্থ সকলও আবার পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, সেই প্রকার বাহ্যর্জগৎ মনের উপর এবং মন বহির্জগতের উপর শক্তি সঞ্চালন করিয়া থাকে। কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণের বল তদুপরিস্থিত সকল পদার্থের আকর্ষণের বল অপেক্ষা প্রবলতর; সুতরাং পৃথিবী তদুপরিস্থিত পদার্থসমূহের নিকট পরিচালিত হয় না, কিন্তু তদুপরিস্থিত পদার্থ সকলই পৃথিবীতে নিপতিত হয়। এই প্রকারে যদি ইহা প্রতিপন্ন করা যায় যে, মানব মনের আভ্যন্তরিক শক্তি বহির্জগতের শক্তি অপেক্ষা এত প্রবল যে, সেই আভ্যন্তরিক শক্তি বহির্জগৎসমুত্থিত শক্তিকে পরাস্ত করিয়া আপন স্বাভাবিক শক্তি সংরক্ষণ করিতে পারে,

তাহা হইলে মনুষ্য যে স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ থাকে না। কেন না, পৃথিবী যেরূপ তদুপরিস্থ পদার্থ সকল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও আপন স্বাভাবিক গতি সংরক্ষণ করিতে পারে, মনুষ্য মনও সেই প্রকার বাহ্যজগৎ-সমুত্থিত শক্তি কর্তৃক বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া আপনার স্বভাব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। পৃথিবী সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতেই তদুপরিস্থ পদার্থ সমূহের আকর্ষণ পরাভব করিয়া আপন শক্তি রক্ষা করিতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্য মনই যে আভ্যন্তরিক শক্তি দ্বারা বাহ্য-জগতের শক্তিকে পরাভব করিতে পারিবে, ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। জনভেদে এবং অবস্থাভেদে মানব মনের আভ্যন্তরিক শক্তির তারতম্য রহিয়াছে। সিদ্ধপুরুষ শুকদেব যৌবন প্রারম্ভেই বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বহির্জগতের শক্তি হইতে আপনার হৃদয় মন নির্ম্মুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসি রাজ্যাধিপতি, যশোলিপ্সু এবং প্রভুত্ব-লোলুপ নেপোলিয়ন মৃত্যুকালেও 'আমাদেরই জয়' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া বিষয়-বিমোহিত মানসিক অবস্থার পরিচয় প্রদান করিলেন। মাসেডনাধিপতি আলেকজাণ্ডার পরাজয় করিবার জন্য পৃথিবীতে আর রাজ্য নাই, ইহা শ্রবণ করিয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু শত্রু-দমনভাব-বিবর্জ্জিত মহর্ষি ঈশার অন্তরাত্মা হইতে মৃত্যুকালে ঈদৃশ মহৎ ভাব সমুত্থিত হইয়া ছিল যে, তৎকালে তিনি সেই ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন,—"পিত! আমার শত্রুদিগকে ক্ষমা কর, কেননা তাহারা জানে না যে, তাহারা কি কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে।" বস্তুতঃ এই বিশ্বজগতে, অবস্থা ভেদে, প্রত্যেক নরনারীর মানসিক শক্তি, হৃদয়ের ভাব এবং জীবনগতি মধ্যে এত পার্থক্য লক্ষিত হয় যে, সর্ব্বতোভাবে এক স্বভাববিশিষ্ট এবং সমহৃদয় দুইটী মনুষ্য পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ দেশ ও কালভেদে মনুষ্য-প্রকৃতির বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অবস্থাভেদে মনুষ্যের প্রকৃতিতে বিভিন্নতা থাকা সত্বেও প্রত্যেক নর নারীর মনের আভ্যন্তরিক শক্তি যে, বহির্জগৎ-সমুত্থিত শক্তিকে পরাজয় পূর্ব্বক মনুষ্যকে অবস্থার দাসত্বশৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তদ্বিষয়ে কোন প্রকারেই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মানব মনের সমুদয় শক্তি প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ বাল্যাবস্থায় মানব জীবন সম্পূর্ণ রূপে বহির্জগতস্থ অবস্থা দ্বারা গঠিত হইতে থাকে। অবস্থাবাদী পণ্ডিতেরা এই জন্যই বলিয়া থাকেন যে, বাল্যকালে মানব জীবনের গতি যেরূপ অবস্থা দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে, যৌবন ও বার্দ্ধক্যাবস্থায়ও সেই অবস্থা অপরাপর নূতন অবস্থার সহিত সম্মিলিত হইয়া আজীবন জীবন-গতি পরিশাসন করে। আমাদের দেশে জন্মপত্রিকা অর্থাৎ কুষ্ঠি প্রস্তুত করিবার যে প্রথা আছে, সেই প্রথাও এই মতমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা জন্মপত্রিকা রচয়িতা লগ্নাচার্য্যগণ, জন্মকালে কোন্ গ্রহ কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা নিরূপণ পূর্ব্বক মনুষ্যের জীবনগতি সম্বন্ধে গ্রহগণের ফলাফল নির্ণয় করিয়া থাকেন। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বর যদি সত্য সত্যই মানবজীবন এইরূপ অবস্থার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া

রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য নিঃসন্দেহে কেবল দুঃখভোগের জন্যই সৃষ্ট এবং তাঁহার মঙ্গলময় নাম অর্থশূন্য ও সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ফলতঃ, অবস্থার দাসত্ব হইতে যদি মানবজীবন কোন ক্রমেই নির্ম্মুক্ত হইতে না পারিত, তাহা হইলে পাপপূর্ণ ইহুদিবংশে পুণ্যজ্যোতিস্বরূপ মহর্ষি ঈশার আবির্ভাব কখনই সম্ভব হইত না, এবং খ্রীষ্ট-বিদ্বেষ্টা সলও সেণ্টপলরূপে জগতে খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন না। প্রত্যেক দেশের ইতিহাস সপ্রমাণ করিতেছে যে,ঘোর অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন এবং পাপ-নিমজ্জিত জাতির মধ্যে সময়ে সময়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্যোতিস্বরূপ পুণ্যাত্মা সাধুপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া দেশীয় প্রচলিত কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য আজীবন যত্ন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের জীবনে অলৌকিক ধর্ম্মবল, সত্যের জ্যোতি, এবং ত্যাগস্বীকারের ভাব সন্দর্শন করিয়া ইঁহাদিগকে কোন কোন জাতি ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ এবং কোন কোন জাতি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এমন কি, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই সাধুদিগের দুর্লভ জীবন লাভের কারণ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, এই সকল মহাত্মা ঈশ্বরের বিশেষ বিধান অথবা ঈশ্বর কর্তৃক বিশেষ কার্য্য সম্পাদনার্থ জগতে প্রেরিত হয়েন। কিন্তু এই সাধুপুরুষদিগের জীবনগতি যে, তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ,ঘটনা কিম্বা অবস্থা-সমুত্থিত শক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিশাসিত হয় না, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, তাঁহাদিগের মন দেশ-কাল-প্রচলিত অবস্থার শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত না হইলে, তাঁহারা কখনই এই প্রকার সাধুজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। এই সকল সাধুপুরুষের জীবনগতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, মানবমনে যে স্বাধীন ইচ্ছার সঞ্চার হইতে পারে, তাহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতীয়মান হয়।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পৃথিবী যেরূপ তদুপরিস্থ সমুদয় বস্তু কর্তৃক আকৃষ্ট হওয়া সত্বেও, তদুপরিস্থ পদার্থ সমূহের নিকট পরিচালিত না হইয়া, আপন প্রবলতর আকর্ষণ দ্বারা উপরিস্থ পদার্থ সকলকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া ভূতলশায়ী করিতেছে; সেই প্রকার মানব মনের আভ্যন্তরিক শক্তি, বহির্জগতের পদার্থ, ঘটনা ও অবস্থা-সমুত্থিত শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর হইলে নিশ্চয়ই মনুষ্য অবস্থার দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারে।

এই স্থানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মনুষ্য মন কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হইলে বহির্জগৎ-সমুত্থিত শক্তিকে পরাস্ত করিয়া আপন স্বাধীন ইচ্ছা সংরক্ষণ করিতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল ইহাই বলা যাইতে পারে যে, মন যখন আপনার সাম্যভাব (equilibrium) সংরক্ষণ করিতে পারে, তখনই স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনে সমর্থ। বহির্জগতে যখন কোন বস্তু দুই বিপরীত দিক হইতে দুইটী সমান বল দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন নিশ্চল হইয়া সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার মানবমন বহির্জগতের পদার্থ ঘটনা বা অবস্থা-সমুত্থিত ভিন্ন ভিন্ন বিপরীত শক্তি কর্তৃক এক সময়ে সমভাবে আকৃষ্ট হইয়া সাম্যভাব অবলম্বন করিতে পারে। সাম্যভাব প্রাপ্ত মন যে অনায়াসে স্বীয় প্রকৃতিগত গতি প্রাপ্ত হয়,

তাহা অতি সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। * কেননা সাম্য অবস্থায় বস্তু কিম্বা প্রাণী সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক শক্তি-সমুত্থিত গতিবিবর্জ্জিত হইয়া, আপন প্রকৃতিগত ভাব প্রাপ্ত হয়। কোন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে আকৃষ্ট হইয়া গতি প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক আকর্ষণ বা বল-সম্ভূত গতি কর্ত্তৃক ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়, এবং সেই ব্যাঘাত দ্বারা প্রত্যেক গতির বেগই ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে; এবং চতুর্দ্দিকস্থ আকর্ষণ বা বল-সম্ভূত গতি এই প্রকারে পরস্পরের প্রতিঘাত দ্বারা ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে আকৃষ্ট বস্তুকে সর্ব্বপ্রকার গতি পরিশূন্য করে। বহির্জ্জগতস্থ পদার্থ, ঘটনা ও অবস্থা-সমুত্থিত যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি মানবমনে ইচ্ছা উৎপাদন পূর্ব্বক জীবনগতি নিরূপণ করে, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রবৃত্তি-উত্তেজক ও কতকগুলি নিবৃত্তি-প্রদায়ক, সুতরাং যখন দুইটী বিরুদ্ধ আকর্ষণ দ্বারা মানবমন আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন সময়ে সময়ে মানবমন সাম্যভাব অবলম্বন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। কিন্তু প্রবৃত্তি-উত্তেজক শক্তিগুলি যখন নিবৃত্তি প্রদায়ক শক্তিগুলিকে পরাস্ত করিয়া মানবমনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখনই কেবল মানুষ অবস্থা দ্বারা পরিশাসিত হইয়া ঘটনার স্রোতে ভাসিতে থাকে। সেই সময়ে মানুষের কোন প্রকার স্বাধীন ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এতদুভয়ের সম্মিলনে যখন মনুষ্যমনকে কামনাশূন্য করিয়া, তাহার জ্ঞানচক্ষুকে ঈশ্বরেরদিকে উন্মীলিত করে, তখনই কেবল মানব স্বীয় প্রকৃতিগত ভাব প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনে সক্ষম। মন, ফললাভ-প্রত্যাশা বিবর্জ্জিত না হইলে আপন প্রকৃতিগত স্বাধীনভাব লাভ করিতে পারে না. বিষয় বিশেষের কামনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কক্ষ্যভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় গত্যন্তর প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই প্রলোভন পরিপূর্ণ সংসারে দুর্ব্বলমতি মানব কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন ও আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে বারম্বার কথিত হইয়াছে যে, মনুষ্য মনের আভ্যন্তরিক শক্তি বহির্জ্জগতস্থ ঘটনা, পদার্থ বা অবস্থা-নিচয়-সমুৎপন্ন শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর হইবে, মানব মনের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। কিন্তু মনের এই আভ্যন্তরিক শক্তি কি প্রকারে কার্য্য করিয়া থাকে এবং কি প্রকারেই বা তাহার তেজস্বিতা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করা উচিত।

মন যে কি পদার্থ—তাহা কেহই জানিতে পারে না। মনের প্রকৃতি মনুষ্যের সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। আমরা কেবল মানসিক কতকগুলি ক্রিয়া জানিতে ও অনুভব করিতে পারি, এবং সেই ক্রিয়াগুলি যে কারণ বা শক্তি হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহাকে মন বলিয়া

* That universal coexistence of antagonist forces which, as we before saw, necessitates the universality of rhythm, and which, as we before saw, necessitates the universality of decomposition of every force into divergent forces, at the same time necessitates the ultimate establishment of a balance. Every motion being motion under resistance is continually suffering deductions; and these unceasing deductions finally result in the cessation of the motion.

Herbert Spencer.

নির্দ্দেশ করি; আর প্রাগুক্ত কার্য্যগুলির মধ্যে যে সমস্ত অগ্রপশ্চাৎ সম্বন্ধ ও কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল লক্ষিত হয়, তাহাদিগকেই মানসিক নিয়ম বলি। এই নিয়ম শব্দটী এস্থানে ব্যাখ্যা করা অত্যাবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। রাজপুরুষেরা রাজ্যশাসনার্থে যে নিয়ম সংস্থাপন করেন, সেই নিয়ম শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রাকৃতিক বা ভৌতিক নিয়ম বলিলে সেই অর্থ বুঝায় না। রাজপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম দ্বারা যাহারা পরিশাসিত হয়, তাহাদিগের প্রকৃতির সহিত নিয়মের কোন যোগ নাই, নিয়ম তাহাদিগের নিকট একটী বাহ্যিক বিষয় মাত্র। কিন্তু 'মানসিক নিয়ম' এই কথাটী বলিলে মনের প্রকৃতিগত গতির যে নির্দ্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ পরিবর্ত্তন, তাহাই বুঝা যায়। আবার সেই প্রকার ভৌতিক নিয়ম বলিলে জড় জগতের স্বভাবসিদ্ধ যে প্রণালী অনুযায়ী পরিবর্ত্তন, তাহাই বুঝা যায়। জড় জগতের নিয়মানুসারে বীজ মৃত্তিকাতে রোপিত হইলে অঙ্কুর হয়, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে নিয়ম শব্দটী কেবল বীজের প্রকৃতিগত নির্দ্দিষ্ট গুণ বা ধর্ম্মকে বুঝায়। ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধের যে যে স্থানে নিয়ম শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং পরে যে যে স্থানে ব্যবহৃত হইবে, তদ্দ্বারা কেবল বিষয় বিশেষের প্রকৃতিগত গতি বুঝা যাইবে। জড় জগতের পদার্থ নিচয় যেরূপ নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি (Definite constitution) প্রাপ্ত হইয়া কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই প্রকার মানব মনও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া উন্নতি লাভ করে। আবার জড় জগতের পদার্থ সকল যেমন তাহাদিগের প্রকৃতির প্রতিকূল ঘটনা বা অবস্থার সংঘর্ষণে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, মানব মনও তদনুরূপ স্বীয় প্রকৃতিগত কার্য্য-প্রণালীর বিপর্য্যয়াবস্থা ঘটিলে প্রকৃতিভ্রষ্ট হইয়া অবনত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মানব মনের আভ্যন্তরিক শক্তি বহির্জ্জগৎ-সমুত্থিত শক্তিকে অতিক্রম করিয়া মনুষ্যকে অবস্থার দাসত্ব হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারে, এই প্রকার যে মত আমরা এই অধ্যায়ে প্রকাশ করিয়াছি, ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মানসিক নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। মানব জীবনের কার্য্যকলাপ যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, তাহাই পরবর্ত্তী অধ্যায়ের আলোচ্য। সুতরাং মানব জীবনের কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, মনের প্রকৃতিগত গতি এবং মনের আভ্যন্তরিক শক্তিও যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।।

ওরে প্রাণ কি তোর বাসনা?

ওরে প্রাণ কি তোর বাসনা?
শ্যামল ব্রহ্মাণ্ড তোর, চন্দ্র তোর সূর্য্য তোর,
মৃদুল সমীর ভরা,
সুখ গন্ধি ফুল ভরা,
শিশির বারিতে ধোয়া, বসন্ত প্রভাত তোর;

কুসুমিত তরু শাখে,
কলকণ্ঠ পাখী ডাকে,
সে পাখী, সে কলকণ্ঠ, সে তরু তোমারি প্রাণ,
তবু তুমি কি বিষাদে, রাতি দিন থাক ম্লান?

তুষার মণ্ডিত শৃঙ্গ, গিরি চূড়া দিনু ধরে,
আকুল তরঙ্গায়িত সাগর দিলাম তোরে,
তবু তোর মিটিলনা আশা,
পোড়া কণ্ঠে কতই পিপাসা?
স্থিগ্ধ প্রকৃতি কোলে, সৌন্দর্য্য ঘুমা'য়ে থাকে
চন্দ্রালোকে নিশীথে যখন,
ঢলু ঢলু চোক দুটি তার,
চুমিতে দিয়াছি কতবার,
তবু তোরে তৃপ্ত করে, রাখিতে না পারিলাম
বুকে; বাসনার হবেনা পূরণ?
অবাধে আকাশ গায়, শূন্যভেদী দিয়াছি উড়িতে
দিয়াছি বাহন ক'রে কত শত ঘনমেঘরাজি,
তারকার মালাহার কণ্ঠে তোরে দিয়াছি পরিতে,
নহে পরিতৃপ্ত তুই, তবুপ্রাণ সে শোভায়সাজি?
এমনি কতই যে গো, প্রকৃতির বাছাবাছাধন,
দিয়াছি তোমায় উপহার;
তবুপ্রাণ হ'লনা বারণ, দুর্ণিবার আকাঙ্ক্ষা ভীষণ
তাই ভাবি কি করিব আর!
বসন্তের সমীরণ, যাহার নিশ্বাসে বয়ে
অনন্ত কি উৎসাহ যায় গো ঢালিয়ে দিয়ে;
সে যে মোর পার্শ্বেতে সদাই,
তবু প্রাণে তিল শান্তি নাই;
হিমাংশু কিরণ ঢালে, তাতে বাকি সুধা আছে,
তুলনা করিগো যবে সে নয়ন জ্যোতি কাছে?
বিহঙ্গের কলকণ্ঠে কি ছাই সঙ্গীত আছে,
সমুদ্র গর্জ্জনে আর কতক্ষণ প্রাণ নাচে?
সস্নেহ সপ্রেম বাণীতার, মরিমরি কি সঙ্গীতময়!
কতই সে শান্তি তথা, মহাসুখে ভাসিয়ে বেড়ায়
প্রকৃতির যাহা কিছু আছে, লোকে যারে বলে
গো সুন্দর,
তাদিয়ে গাঁথিয়ে হার,
দাও দেখি উপহার,
সে মালা মলিন হয়ে যাবে, পড়ে তার চরণ উপর।
সৌন্দর্য্যের সে প্রতিমাখানি, রাতি দিন
রাখিয়াছি পাশে,
তবু তোর কিসের অভাব, ছোট প্রাণ কাহার
উদ্দেশে?
সকলি সুন্দর এরা বটে, মানি তাহা মানি
শতবার,
কিন্তু কি অভাব আছে, লুকিয়ে তাদের কোলে,
তাই প্রাণ কাঁদে অনিবার।
সকলিত সুধাময়, সুখময়, গীতিময়
(কিন্তু হায়)
সে সুখ বিষাদে পোরা,
সে সুধা গরলে ভরা,
ও গীতি ও মিষ্ট গীতি বিলাপের গান গায়!
অশরীরী সুখ কোথা পাব, যার মুখে দুঃখ
রেখা নাই,
এ স্বর্গীয় সুধা কোথা পাব, যাহাতে গরল
মাখা নাই?
বিষাদের সুরে গীত নয়, সে সঙ্গীত বল গো
কোথায়?
তাই মোরপ্রাণ আজ অধীরে কাঁদিয়া খুন হয়;
মোর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়ে, ভ্রমর যে কেঁদে
কেঁদে কয়,
কুসুমে কণ্টক আছে, ফুলে ফুলে মধু নাই হায়!
বিষাদ নিশ্বাস ঘন,
ফেলি কহে সমীরণ,
সুগন্ধি প্রসূনোদ্যানে এজগৎ কেন পূর্ণ নয়?
কোকিল কাঁদিয়ে বলে,
বসন্ত চলিয়ে গেলে,
জলদ আকাশে আসি কেন দেখা দিবে?
সাধের এ তরু কুঞ্জ শূন্য পড়ি রবে?
চাতক কাঁদিয়ে বলে অনন্ত পিয়াস গো,
ওহে জলধর!
দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত তবে জল ঢাল গো
করি ঝর্ ঝর্।
"দিবানিশি কেন নয়, চাঁদনী রজনীময়,"
বলিয়ে চকোর হোথা চাহিছে আকাশ পানে।
বাসনা রয়েছে হায়, তৃপ্তি নাই কোন প্রাণে!

পাশ্চাত্য মায়াবাদ।

(IDEALISM.)

সংস্কৃত দার্শনিক সাহিত্যে মায়াবাদ কাহাকে বলে আমরা ঠিক বলিতে পারি না; আমরা সংস্কৃতাভিজ্ঞ নহি। পাশ্চাত্য Idealism এর সহিত আমাদের দেশীয় প্রাচীন মায়াবাদের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, সংস্কৃতাভিজ্ঞদিগের মুখে ইহা শুনিয়াই আমাদের আলোচ্য বিষয়কে মায়াবাদ আখ্যা প্রদান করিলাম। নামের সাদৃশ্য দেখিয়া কেহ আশা করিবেন না যে, এই মতদ্বয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে।

কোন কোন পাঠক হয়ত বলিবেন, এরূপ শুষ্ক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন কি? জ্ঞান-কৌতুহল চরিতার্থ করিবার পক্ষে ইহা উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু দৈনন্দিন কার্য্যগত জীবনের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? মানব-জীবনের উন্নতির জন্য যে সকল প্রশ্ন-মীমাংসা আবশ্যক, তাহাদের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যদি আমাদের আলোচ্য বিষয় কেবল জ্ঞান-কৌতুহল চরিতার্থ করিবার পক্ষেই উপযোগী হইত, আর কোন প্রয়োজনে না লাগিত, তাহা হইলেও ইহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজনীয় হইত না; যাহা কিছু মানব-হৃদয়ে পবিত্র উচ্চতর সুখদান করে তাহার আলোচনা কখনই নিষ্প্রয়োজনীয় হইতে পারে না, পরন্তু প্রত্যেক মানব-হিতৈষীর পক্ষে তাহা সযত্নে অনুসরণীয়; যিনি সূক্ষ্মতর দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনায় সুখানুভব করিতে শিখিয়াছেন, তিনি মানসিক উন্নতির সোপানে অনেক দূর উঠিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে এই সুখসম্ভোগে সাহায্য করেন তিনি বাস্তবিক তাঁহার উন্নতিপথের সহায়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের আলোচ্য বিষয়টী যে কেবল জ্ঞান-কৌতুহল চরিতার্থ করিবার পক্ষেই উপযোগী তাহা নহে; মানব জীবনের অন্ততঃ একটী অনুসরণীয় বিষয়ের সহিত, একটী উচ্চতর স্বার্থের সহিত ইহার অতি নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের সহিত মায়াবাদের অতি নিকট সম্বন্ধ; আমরা প্রস্তাবের উপসংহারে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, মায়াবাদের সহায়তা ব্যতীত ধর্ম্মবিজ্ঞানের কয়েকটী অতি জটিল অথচ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা একেবারে অসম্ভব।

মূল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে আর দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। আমরা বিশেষ কোন মায়াবাদীর মত ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছি না; মায়াবাদের সপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা নিজের ভাষায়, নিজের প্রণালীতে লিখিব। যাহা লিখিব তাহার অনেক কথা বার্কলী, মিল প্রভৃতি হইতে শিক্ষিত, আবার অনেক কথা কেবল নিজের চিন্তার ফল। এখন মূল

বিষয়ে প্রবেশ করা যাক্, আশা করি পাঠক গাঢ় মনোনিবেশ করিবেন।

জড়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই তিনটী দার্শনিক আলোচনার মূল বিষয়। এই তিনটীর অস্তিত্ব ও প্রকৃতি লইয়াই যত দার্শনিক মতভেদ। এই বিষয়ত্রয় সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত আছে, সমুদায়ের উল্লেখ করা আমাদের বিষয়ের অন্তর্গত নহে; এতদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য মায়াবাদের মত কি তাহাই প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য। মায়াবাদ দুই প্রকার, আস্তিক ও নাস্তিক; আমরা উভয় মতেরই উল্লেখ করিতেছি। উভয়ে একই স্রোতস্বতীর ভিন্ন ভিন্ন শাখামাত্র; একই স্রোতস্বতী কতকদূর পর্য্যন্ত অখণ্ডিত ভাবে প্রবাহিত হইয়া একটী আকাশভেদী অটল শৈলাভিঘাতে বিভক্ত হওতঃ ভিন্ন ভিন্ন গতি অবলম্বন করিয়াছে; একটী পর্ব্বতের সম্মুখ ভাগ দিয়া সূর্য্য কিরণে আলোকিত হইয়া তীরবাসীদগের স্বাস্থ্যও সুখের আধার হইয়া প্রবাহিত হইতেছে; অপরটী পর্ব্বতের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া, সূর্য্যকিরণবঞ্চিত হইয়া, নানা কষ্ট দুঃখের কারণ হইয়া মৃদুমন্দ গতিতে সঞ্চালিত হইতেছে। এখন কল্পনা-মুক্ত হইয়া মূল কথা বলি। মায়াবাদ প্রথমতঃই সমুদয় জ্ঞানের আধার, সমুদয় চিন্তার আধার, সমুদয় সন্দেহ অবিশ্বাসের আধাররূপী মানবাত্মার প্রকৃত ও মূলগত (Substantial) অস্তিত্ব মানিয়া লন, এবং এই অটল শৈলের উপর অন্যান্য মতের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা স্বীকার করিয়া অতঃপর বলেন যাহাকে ভৌতিক পদার্থ বলা হয়, যাহা আমরা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, তাহার অস্তিত্ব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব জ্ঞান-নিরপেক্ষ নহে; তাহার অস্তিত্ব জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহে; তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। দৃষ্ট বস্তু যতক্ষণ দৃষ্টির বিষয়, ততক্ষণই তাহার অস্তিত্ব; দৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইয়া, দৃষ্টির অগোচরে, দৃষ্টি হইতে বিচ্যুত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব। তেমনি, শ্রুত বস্তু যতক্ষণ কোন আত্মার শ্রুতির বিষয়ীভূত থাকে ততক্ষণই তাহার অস্তিত্ব; শ্রুতির অগোচরে, শ্রুতি-বিচ্যুত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব। সমুদয় ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সম্বন্ধেই এইরূপ। যাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপেই তাহার অস্তিত্ব সম্ভব, তাহার ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ, জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অসম্ভব। কিন্তু কেন? ইহার কারণ কি? যুক্তি কি? ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয় মাত্রেরই ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অসম্ভব কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই:—যাঁহা আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয়, আমরা যাহা কিছু দেখি, শুনি, স্পর্শকরি, আস্বাদন করি, আঘ্রাণ করি, অনুভব করি, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ (Sensation) মাত্র—আমাদের আত্মার ভাবান্তর মাত্র—মানসিক অবস্থা মাত্র। যদি তাহাই হয়, যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইন্দ্রিয়-বোধ মাত্রই হয়, আত্মার ভাবান্তর মাত্রই হয়, মানসিক অবস্থা মাত্রই হয়, তবে ইন্দ্রিয়-বিচ্যুত হইয়া জ্ঞান-বিচ্যুত হইয়া, আত্মা-বিচ্যুত হইয়া তাহার অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? যাহা আত্মার ভাবান্তর মাত্র, মানসিক অবস্থা মাত্র, তাহা আত্মা-নিরপেক্ষ হইয়া, মন-নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে, ইহা কেবল অসম্ভব (impossible) নহে, ইহা অচিন্ত্য (inconceivable.) সুতরাং জড় সম্বন্ধে মায়াবাদের মত এই, জড় জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র

পদার্থ নহে, ইহা আত্মার মধ্যে সমুৎপন্ন ভাব পরম্পরা মাত্র (sensations or ideas.) যতক্ষণ ইহা জ্ঞানের বিষয় ততক্ষণই ইহার অস্তিত্ব; জ্ঞাত হওয়া—জ্ঞান-গোচর হওয়াতেই ইহার অস্তিত্ব; ইহার জ্ঞানগোচর হওয়া আর থাকা একই ("its *esse* is *percipi*")।

এই গেল মানবাত্মা ও জড় সম্বন্ধে মায়াবাদের মত; এই পর্য্যন্ত আস্তিক মায়াবাদ ও নাস্তিক মায়াবাদ একত্রে আসিয়াছেন, এখন ইহাদের পৃথক হইবার সময়। যে পর্ব্বতের অভিঘাতে ইহাদিগকে পৃথক হইতে হইল, তাহা ঈশ্বরবাদ শিখরধারী কারণবাদ; কারণবাদ ও ইহার নানাবিধ রূপ সম্বন্ধে এস্থলে অধিক কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে, স্থানান্তরে এই বিষয় কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক হইবে। যে মতের আদর ও সম্মান রক্ষা করিবার জন্য আস্তিক মায়াবাদ নাস্তিক মায়াবাদ হইতে পৃথক হইলেন, এস্থলে কেবল তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। এই যে ভৌতিক জগৎ নামধেয় ভাবপরম্পরা আমাদের মনে সমুৎপন্ন হইতেছে, এই সমুদয় কি আমাদের ইচ্ছা-সম্ভূত? সকলেই বলিবেন, না। তবে ইহাদের আধার কি? কারণ কি? জড়বাদী বলেন ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞেয়-প্রকৃতি অজ্ঞান জড়পদার্থ ইহাদের কারণ; অধিকাংশ দর্শনবিদেরই এই মত। নাস্তিক মায়াবাদীর উত্তর সংক্ষেপে বুঝান কিছু কঠিন; তিনি বলেন, কারণ অর্থ যদি নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী-ঘটনা হয়, তবে এই ভাব পরম্পরা পরস্পরেই পরস্পরের কারণ, যাহা যাহার নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাই তাহার কারণ; আর কারণ অর্থ যদি ইন্দ্রিয়াতীত কোন বস্তু হয়, তবে তাহার অস্তিত্ব নিরূপণ করিবার আমাদের কোন উপায় নাই? এবং এরূপ কারণ কল্পনার কোন প্রয়োজনও নাই। আস্তিক মায়াবাদী বলেন, এই ভাব পরম্পরার একটী ইন্দ্রিয়াতীত কারণ আছে, ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য, আর এই কারণ অজ্ঞেয়-প্রকৃতি অজ্ঞান জড় পদার্থ হইতে পারে না, কেবল জ্ঞানময় আত্মা পদার্থেই কারণত্ব সম্ভবে, সুতরাং এই ভাব পরম্পরার আদি কারণ স্বয়ং পরমাত্মা। তিনিই সর্ব্বদা আমাদের নিকটস্থ থাকিয়া আমাদের মনোমধ্যে এই ভাব পরম্পরা উৎপাদন করিতেছেন। আশা করি পাঠক এখন মায়াবাদের মূল মতগুলি কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিলেন। ইহার মতে পরমাত্মা ও জীবাত্মাই প্রকৃত সত্তা, জড়ের কোন স্বতন্ত্র জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই; পরমাত্মার ইচ্ছা ও শক্তিতে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত নিয়মানুসারে যে সকল ভাব পরম্পরা আমাদের মনোমধ্যে প্রতিনিয়ত সমুৎপন্ন হইতেছে, তাহাদিগকেই আমরা জড় পদার্থ বলি। পাঠক একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—তবে কি আমরা যখন জড় পদার্থ প্রত্যক্ষ না করি, তখন তাহা ধ্বংশ হইয়া যায়? না, তাহা নহে; জড় পদার্থের জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অসম্ভব ইহা সত্য, কিন্তু মানবজ্ঞানই একমাত্র জ্ঞান নহে. আমরা যে সকল বস্তু দর্শন করিয়াছি, করিতেছি ও করিব, সমুদয়ই পরমাত্মার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-দর্শী চির জাগ্রত জ্ঞানের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে। সুতরাং জড় পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বটে, কিন্তু পরমাত্মাতে তাহাদের অস্তিত্ব নিত্য, তাহারা ঈশ্বরের অনন্তমনের চিরস্থায়ী সম্পত্তি; কেবল মানবাত্মার নিকট তাহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাবই অনিত্য।

জড়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে মায়া-

বাদের মত সংক্ষেপে বর্ণিত হইল; এই সকল মতের ভিত্তিরূপে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে তাহার কিছুই বলা হয় নাই. ক্রমশঃ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

বিস্তৃতরূপে মায়াবাদের পক্ষ সমর্থন করিতে যাইবার পূর্ব্বে আমাদিগের পথ পরিষ্কারার্থে আমরা এতদ্বিষয়ে সাধারণের মনে বদ্ধমূল অথচ অতি ভ্রমপূর্ণ একটী আপত্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব। তাহা এই—দর্শনানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মায়াবাদের সপক্ষে প্রদর্শিত যুক্তি আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই ইহাকে একেবারে অসম্ভব অননুভবনীয় বলিয়া উড়াইয়া দেন; তাঁহারা বলেন মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বাহ্যবস্তু না থাকিলে কি মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়-গোচর বস্তুর অনুভূতি কখনও সম্ভব? বহির্দ্দেশে বর্ণ না থাকিলে মনোমধ্যে বর্ণানুভূতি সম্ভব নহে, বহির্দ্দেশে শব্দ না থাকিলে শব্দানুভূতি অসম্ভব ইত্যাদি; সমুদয় ইন্দ্রিয় ব্যাপার সম্বন্ধেই এইরূপ। এরূপ সংস্কার যে নিতান্ত ভ্রমমূলক তাহা সহজেই দেখান যাইতে পারে। স্বপ্নাবস্থায় কি ঘটে একবার ভাবিয়া দেখ। মনে কর, পাঠক, স্বপ্নাবস্থায় দেখিতেছ তুমি নানা বর্ণে অনুরঞ্জিত, একটী কল কল শব্দযুক্ত স্রোতস্বতী-তীরে অবস্থিত, সুগন্ধ পুষ্পোদ্যান-বেষ্টিত, রসনা তৃপ্তিকর নানা সুখাদ্য পরিপূর্ণ, স্পর্শসুখোৎপাদক নানা প্রকার আসন ও শয্যা-পরিশোভিত একটী মনোহর ভবনে উপবিষ্ট রহিয়াছ; এরূপ, অথবা অনেকাংশে এরূপ স্বপ্ন আমরা অনেক সময়েই দেখিয়া থাকি। সময়ে তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, স্বপ্নের বিষয়ীভূত পদার্থ সমূহ বিশ্বাসের ভূমি হইতে দূরীভূত হইল। আচ্ছা, এখন বল দেখি, পাঠক, এই যে স্বপ্ন-দৃষ্ট মনোহর ভবন, যাহা ক্ষণকালের জন্য তোমার বিশ্বাসের রাজ্যে স্থান পাইয়াছিল—ইহা কি? ইহা কি তোমার মন-বহির্ভূত কোন স্বতন্ত্র ভৌতিক পদার্থ? নিতান্ত বুদ্ধিভ্রংশ না হইলে আর কে এই কথা বলিবে? তবে ইহা কি? বিন্দুমাত্র চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে, ইহা তোমার মনোমধ্যে সমুৎপন্ন ভাব পরম্পরা মাত্র, ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থা মাত্র। অতএব দেখ, তুমি যাহাকে প্রকৃত বাহ্যিক ভৌতিক পদার্থ বল, তাহার বর্ত্তমানতা ব্যতিরেকও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই বল, আর ঈশ্বরেচ্ছানুসারেই বল, মনোমধ্যে বর্ণ, শব্দ, ঘ্রাণ, আস্বাদ, কঠিনতা, কোমলতা, বিস্তৃতি প্রভৃতি সমুদায় ভৌতিক বস্তুর অনুভূতি সম্ভব। তবে আর কেমন করিয়া বল, বাহ্য বস্তুর অবর্ত্তমানতায় ইন্দ্রিয়-জ্ঞান সম্ভবপর নহে? ইহা যে অসম্ভব নহে, প্রতিদিন প্রতি রাত্রিতে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। তবে এখন তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা যাহাকে জাগ্রত অবস্থা বলি, সেই অবস্থাতে যে সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি, সেই সমস্তও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অথবা ঈশ্বরেচ্ছাতে সমুৎপন্ন ভাবপরম্পরা মাত্র,—মানসিক অবস্থা মাত্র হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। বাহ্যবস্তু আছে কিনা এই সম্বন্ধে তোমাকে মতামত দিতে অনুরোধ করিতেছি না; থাকাই অধিক যুক্তিসঙ্গত, কি না থাকাই অধিক যুক্তিসঙ্গত এই বিষয়েও কিছু বলিতেছি না, কেবল এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, মন-বহির্ভূত বাহ্য বস্তু না থাকিলেও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন হওয়া,—বর্ণ, শব্দাদি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার অনুভূত হওয়া কিছুই বিচিত্র

নহে, অসম্ভব নহে। ইহা অস্বীকার করিবার তোমার কোন হেতু নাই; পরন্তু যুক্তির নিয়মানুসারে ইহা স্বীকার করিতে তুমি বাধ্য।

মায়াবাদ যে অসম্ভব অননুভবনীয় মত নহে—এই বাহ্য জগৎ নামধেয় ইন্দ্রিয় ব্যাপার সমূহ যে স্বপ্ন-দৃষ্ট ইন্দ্রিয় ব্যাপার সমূহের ন্যায় কেবল মানসিক অবস্থা পরম্পরা হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে,—বাহ্যবস্তুর বর্ত্তমানতা ব্যতিরেকেও যে আমাদের মনোমধ্যে বর্ণ, শব্দ, ঘ্রাণাদি ভৌতিক পদার্থের অনুভূতি সম্ভব ইহা প্রদর্শিত হইল। অতঃপর আমরা যুক্তি দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব, যাহাকে আমরা বাহ্যবস্তু বলি তাহা মানসিক ভাব পরম্পরা ব্যতীত আর কিছুই নহে। চক্ষু কর্ণাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে পরীক্ষা করিয়া দেখাইব, ইহাদের মধ্যে কেহই আমাদিগকে বাহ্যবস্তুর জ্ঞানদানে সমর্থ নহে। (ক্রমশঃ)

অচিন্ত্য শকতি তব কি বুঝিব দয়াময়!

১

বিশাল গম্ভীর সৃষ্টি, যখন যেদিকে চাই,
অনন্ত শোভার রাশি, উথলে দেখিতে পাই।
উপরে অসীম শূন্য,
অগণ্য তারকাপূর্ণ,
অসংখ্য জগৎ তাহে, নিত্য বিচিত্র কৌশলে,
ভ্রমিছে, অনাদি কাল, অচিন্ত্য নিয়ম বলে॥

২

কি বিচিত্র কি গম্ভীর, সৃষ্টির নিয়ম চয়!
ক্ষুদ্র মানবের হৃদি, ভাবিতে আকুল হয়।
অপার জলধি জল,
তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমাচল,
নিবিড় কানন রাজী, বিস্তৃত যোজন শত
সকল(ই) অনাদি যেন, অনন্ত অসীম মত॥

৩

বিশাল সাগর ওই, তরঙ্গ তুলিয়া বুকে,
অনন্ত উদ্দেশে সদা, ছুটিছে মনের সুখে।
ফেনময় উর্ম্মিমালা,
হৃদিমাঝে করে খেলা,
উত্তাল কল্লোল নাদ, উথলিছে বেলাতলে;
মিলেছে জলধিসীমা, দূর মেঘরাজী কোলে॥

৪

অথবা ভীষণ স্থান, বিশাল সাহারা দেশ,
নিত্য বিরাজিত যথা, প্রকৃতির ভীমবেশ।
অপার বালুকা রাশি,
দিগন্ত লয়েছে গ্রাসি,
অসীম বিস্তৃত দৃশ্য, সুধু শ্বেত আভাময়।
কি গম্ভীর, কি ভীষণ, বিমুগ্ধ করে হৃদয়॥

৫

তুলিয়া গর্ব্বিত শির, অনন্ত আকাশ তলে,
ওই গিরি হিমাচল, দাঁড়ায়ে ভারত ভালে।
কটিতটে মেঘ মালা,
শিশুসম করে খেলা,
প্রদীপ্ত তুষার রাশি, শোভা পায় স্তরে স্তরে।
গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি, শোভিছে অবনী পরে॥

সোহাগে তটিনী সতী কৌমুদী মাখিয়ে গায়,
মৃদু মৃদু কল নাদে সাগর উদ্দেশে ধায়।
তারকা দম্পতী চয়,
মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রয়,
রূপেতে বিভোর যেন এ উহার মুখ হেরে,
সুনীল আরসী সম বিমল তটিনী নীরে॥

৭

সায়াহ্ন গগণ মাঝে শোভিত জলদ দল,
বিবিধ বরণে সাজি উজলয়ে নভস্থল।
রবির কিরণ চয়,
মেঘমালে আভাময়,
কতই সুন্দর ছবি আঁকয়ে গগণ তলে,
আবার মুহূর্ত্ত পরে মিলায় মেঘের কোলে॥

৮

সরস বসন্তাগমে ওই উছলিত বন,
বহিছে মৃদুল বায়ু, দুলিছে লতিকাগণ।
পিক কুল কল তানে,
জুড়ায় তাপিত প্রাণে,
ফুটেছে কুসুম কত শ্যামাঙ্গী লতিকাপরে;
হাসিছে কানন ভূমি যেন বা প্রমোদ ভরে॥

৯

অনন্ত সুন্দর বিশ্ব! কিন্তু এ মানব হৃদি
সৃষ্টির সৌন্দর্য্য লয়ে বুঝি বা গঠিল বিধি!
অসীম আকাশ তল,
সুনীল জলধি জল,
প্রভাত কুসুম শোভা অরুণ কিরণ জালে,
একত্র দেখিতে বিধি, নর হৃদি নিরমিলে॥

১০

এতই সুন্দর যদি গড়িলে মানব মন;
এত পাপ তৃষা তবে কেন এত প্রলোভন?
অমৃত, গরল হেন
একত্র মিশ্রিত কেন?
প্রফুল্ল কুসুম মাঝে কেন বিধি কীটবাস।
যেখানে আনন্দধ্বনি সেখানে কি দীর্ঘশ্বাস!

১১

সহাস্য বদন হেরি সুখী ভাবিয়াছি যায়,
মর্ম্মভেদী দুঃখে কিরে তারই বুক ফেটে যায়?
যে জন পরের লাগি
হ'তে চায় সর্ব্বত্যাগী,
সেই কি স্বার্থের দাস? একি বিধি অবিচার!
এত কপটতা পূর্ণ কেন এ পাপ সংসার?

১২

মোহিনী মূরতি হেরে হৃদয় করিয়া দান,
কি পেয়েছি? পাপ তৃষা, এই সুধু প্রতিদান!
এ হেন মূরতি যার,
এমন হৃদয় তার,
কুসুমে গঠিত তনু, পাষাণে গঠিত মন;
কেন এ জগতে বিধি এত পাপ প্রলোভন?

১৩

সুযশ সঙ্গীত শুনি দেবতা ভেবেছি যায়,
এত যশ তৃষা কেন তাহারই হৃদয়ে হায়?
পরের রোদনে যার,
হেরিয়াছি অশ্রুধার,
নয়ন আসারে নিত্য ভিজেছে কপোল তল;
নিজ জননীর দুঃখে সে ফেলেনা অশ্রুজল?

১৪

এই কি নিয়ম তব কহ শুনি দয়াময়,
এত কপটতা কেন অখিল ব্রহ্মাণ্ড ময়?
পাষাণ করিয়ে যদি,
মানবে গড়িতে বিধি,
স্নেহ, দয়া, মোহ শূন্য, জড়জীব একাকার,
হেন কপটতা তবে শুনিতে হ'ত না আর॥

১৫

অথবা গভীর তব সৃষ্টির নিয়ম চয়,
ক্ষুদ্র মানবের চিত ভাবিতে আকুল হয়।
জড় জীব সমস্বরে,
তব গুণ গান করে,
অপার মহিমা তব ব্যক্ত ত্রিভুবনময়,
অচিন্ত্য শকতি তব কি বুঝিব দয়াময়!

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম বিষয়ক মত।

রাজা রামমোহন রায় বিলাত গমনের পূর্ব্বে তাঁহার কোন বন্ধুর * নিকট বলিয়াছিলেন যে "আমার মৃত্যুর পর বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা আমাকে স্বীয় স্বীয় মতাবলম্বী বলিয়া প্রচার করিবে, কিন্তু আমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি।" তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল। বাস্তবিকই তাঁহার মৃত্যুর পরে হিন্দুরা তাঁহাকে বেদান্তানুগামী ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রীষ্টীয়ানেরা খ্রীষ্টীয়ান্, এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরা মুসলমান বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। এমন কি তন্ত্র-মতাবলম্বীরা † তাঁহাকে তান্ত্রিক বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এ প্রকার মতভেদ অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও তাঁহাকে কেহ বেদান্তানুগামী বৈদান্তিক এবং কেহবা ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টীয়ান্ বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এরূপ গুরুতর বিষয়ে আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা ব্যক্ত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। রাজা রামমোহন রায়ের প্রকৃত ধর্ম্মমত অবগত হওয়া কঠিন বিষয় নহে। যে কোন ব্যক্তি সরল ভাবে অনুসন্ধান করিবেন, তিনি তাহা নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক এসম্বন্ধে আমরা কয়েকটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

* শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর পিতা স্বর্গীয় নন্দকিশোর বসু মহাশয়।

† চুঁচুড়ার অন্তর্গত কাঁকশিয়ালীতে মদন কামার নামে একব্যক্তি বাস করিত। সুনিপুন শিল্পকর বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল, সে ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত সাধনে অনুরক্ত ছিল। তাহার গৃহ প্রাচীরে রাজা রামমোহন রায়ের একখানি প্রতিমূর্ত্তি লম্বমান থাকিত। মদন প্রত্যহ প্রাতঃকালে রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে করিয়া রাজার প্রতিমূর্ত্তিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিত। মদনের প্রতিবাসী, প্রস্তাব লেখকের জনৈক বন্ধু তাহাকে এরূপ প্রণামের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল যে, "রাজা রামমোহন রায় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন"।

রাজা রামমোহন রায়ের সিদ্ধপুরুষত্বের বিষয়ে আর একটী গল্প আছে। গল্পটী এই ;—শৈশব কালে তাঁহার মাতামহ কিছুদিন কাশীবাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি তাঁহার মাতার সহিত কিছুদিন কাশীতে মাতামহের নিকট ছিলেন। মাতামহ শ্যাম ভট্টাচার্য্য একজন ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি এক দিবস তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্ত্রপুত সুরা আনিয়া শিশু রামমোহনকে পান করাইয়াছিলেন। উপস্থিত সকলে ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করাতে তিনি বলিলেন "তোমরা রাগ করিও না। আমি এই শিশুকে যাহা পান করাইলাম তাহার গুণে সে একজন সিদ্ধপুরুষ হইবে"। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে তান্ত্রিকদিগের উক্তরূপ সংস্কার বিষয়ে আমরা আর একটী কথা শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পশ্চিমাঞ্চলে একজন তান্ত্রিকের সহিত আলাপ করিলে পর সে তাঁহাকে বলিয়াছিল—"রামমোহন রায় অবধূত থা"।

প্রথমতঃ। তিনি যে বেদান্তানুগামী ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন না, তাহা প্রতিপন্ন করিতে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকারের আবশ্যক হয় না। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি গবর্ণর জেনেরেল লর্ড আমহর্ষ্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই সুস্পষ্ট রূপ ব্যক্ত হইয়াছে যে, তিনি বেদাদি শাস্ত্রকে কখনই আপ্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। উক্ত পত্রের অধিকাংশ আমরা যথাস্থানে প্রকাশ করিয়াছি। পাঠকবর্গ দেখিয়াছেন যে, তিনি তাহাতে বেদের কয়েকটী প্রধান প্রধান মতকে দূষণীয় ও অনিষ্টকর বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। "মায়াবাদ", "পরমাত্মাতে আত্মার বিলয়" ইত্যাদি মতের অযুক্ততা এবং জনসমাজের পক্ষে অনিষ্টকারিতা তিনি সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।* যাঁহারা রামমোহন রায়কে বৈদান্তিক বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেরূপ বিশ্বাসের অবশ্য যুক্তি আছে। যুক্তি এই যে, তিনি পৌত্তলিকদিগের সহিত বিচারে বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি কখন বলেন নাই যে, বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র মিথ্যা। প্রত্যুতঃ পৌত্তলিক মতাবলম্বীদিগের সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বৈদিক প্রমাণের উপরে সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়াছিলেন। যাঁহারা কেবল এই যুক্তিটী অবলম্বন করিয়া রামমোহনরায়কে বৈদান্তিক বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভ্রম হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত রামমোহন রায়ের বিচার প্রণালী তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। তিনি কখনই শাস্ত্র নিরপেক্ষ যুক্তির আশ্রয় লইয়া কোন ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। হিন্দুর নিকটে বেদাদি শাস্ত্র, খ্রীষ্টীয়ানের নিকট বাইবেল, এবং মুসলমানের নিকট কোরাণ অবলম্বন পূর্ব্বক একেশ্বরবাদ প্রচারের চেষ্টা করিতেন। "তোমার শাস্ত্র মিথ্যা" একথা তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে কখন বলিতেন না। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সহকারে তাহার অবলম্বিত শাস্ত্র হইতে সত্য রত্ন সকল উদ্ধার করিয়া দিতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে তিনি হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া ছিলেন যে, কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, সমস্ত শাস্ত্রেই একমাত্র অনাদ্যনন্ত, অপ্রতিম পরমেশ্বরকেই প্রতিপন্ন করিতেছে।" "বেদ বেদান্ত প্রতিপন্ন করে যাঁরে, তাঁরে ভাবহ সাবধানে" হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে যেরূপ, খ্রীষ্টীয়ানদিগের শাস্ত্র সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি কখনই বলেন নাই যে, বাইবেল মিথ্যা শাস্ত্র; অথবা বাইবেল ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট অভ্রান্ত গ্রন্থ নহে। তিনি উক্ত গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মার্সম্যান্ সাহেবের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, খ্রীষ্টীয়ানদিগের তিন ঈশ্বরের মত, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, ও তাঁহার রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, ইত্যাদি মত তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত নহে। তিনি বাইবেল অব-

* রামমোহন রায়ের জীবনচরিত দেখ।

লম্বন করিয়া এরূপ সুন্দর রূপে আপনার মত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, মার্সম্যান সাহেবকে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে হইয়াছিল। এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া যদি রামমোহন রায়কে বেদান্তানুগামী বৈদান্তিক বলা যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা হইলে অবিকল সেইরূপ প্রমাণে বাইবেল বিশ্বাসী ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টীয়ান্ বলাও সুসঙ্গত হইবে। যে প্রকার প্রমাণে হিন্দুরা তাঁহাকে বৈদান্তিক বলেন, ঠিক্ সেইরূপ প্রমাণে অনেক খ্রীষ্টীয়ান্ তাঁহাকে ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টীয়ান্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। অবশ্য তিনি এই উভয় প্রকার মতাবলম্বী হইতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ। কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে, তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এরূপ বিভিন্ন প্রকার মত হইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি এক সময়ে বৈদান্তিক ছিলেন, পরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা মত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তিনি ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ানদিগের মত অবলম্বন করেন। একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই একথার অসারত্ব বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধীয় ও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মবিষয়ক তাঁহার রচিত পুস্তক সকল একই সময়ে ধর্ম্মতলার ইউনিটেরিয়ান্ প্রেস্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পৌত্তলিক হিন্দুদিগের সহিত এবং ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত বিচার তাঁহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয় নাই।

রামমোহন রায়কে ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিস্ কার্পেণ্টার তাঁহার প্রণীত রামমোহন রায়ের জীবন চরিত্র পুস্তকে অনেক প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি এজন্য রামমোহন রায়ের সহিত পরিচিত কয়েক জন ইংরাজের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।* মিস্ কার্পেণ্টারের আহূত সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য আমরা নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিয়াছি; কিন্তু তথাচ আমরা রামমোহন রায়কে ইউনিটেরিয়ান্ মতাবলম্বী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। সাক্ষীগণ সকলেই প্রায় বলিতেছেন যে, তাঁহারা রামমোহন রায়কে বলিতে শুনিয়াছিলেন যে, তিনি খ্রীষ্টকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিতেছেন যে, রামমোহন রায় বিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলিয়া ছিলেন "I have denied his divinity but not his commission." কিন্তু কেবল এই কথা বলিলেই কোন ব্যক্তি ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টীয়ান হইতে পারে না। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক আছেন যাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত ঐরূপ কথা বলিতে পারেন। খ্রীষ্টকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলিলেই কেহ খ্রীষ্টীয়ান্ হয় না। "আমি বাইবেলকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করি" রামমোহন কি কখনও এপ্রকার কোন কথা বলিয়াছিলেন? তাঁহার প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ সকলে কেহ এপ্রকার কোন বাক্য প্রদর্শন করিতে পারেন না। মিস্ কার্পেণ্টারের

* রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর মিস্ কার্পেণ্টারের পিতা ডাক্তার কার্পেণ্টার রাজার পরিচিত কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কয়েক খানি পত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মিস্ কার্পেণ্টার সেই পত্র কয়েকখানি আপনার পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন।

আহূত সাক্ষীগণের মধ্যে কেহই সেরূপ কোন কথা বলেন নাই। এস্থলে আর একটী আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই যে, রামমোহন রায় বিলাতে ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষ হইয়া কিছুই নূতন কথা বলেন নাই। ভারতবর্ষে থাকিতে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেই সে সকল কথা ব্যক্ত রহিয়াছে। কিন্তু আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, সেই সকল পুস্তকের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহাকে ইউনেটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

মিস্ কার্পেণ্টারের সাক্ষীদিগের মধ্যে একজন বলিয়াছেন যে, রাজা রামমোহন রায় খ্রীষ্টের অলৌকিক কার্য্য সকলে এবং মৃত্যুর পর তাঁহার পুনরুত্থানে বিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, রাজা রামমোহন রায় উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করুন আর নাই করুন, শ্রোতা যে তাঁহার বাক্যের উক্ত প্রকার অর্থ বুঝিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মানব প্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, লোকে অনেক সময় আপনার মানসিক ভাব ও ইচ্ছানুরূপ অপর ব্যক্তির বাক্যের তাৎপার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধেও সেই প্রকার হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, বাইবেল শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্টের জীবন ও তাঁহার কার্য্যাদি সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত, তাহাই তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। লোকে বুঝিতে না পারিয়া সেই গুলিকে তাঁহার নিজের বিশ্বাস বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন। ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কোন কোন স্থান পাঠ করিলে বোধ হয় যেন তিনি খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া, মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুত্থান প্রভৃতি বাইবেল বর্ণিত বিষয়ে বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, তাঁহার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র ছিল, তিনি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিতেই প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কেবল বাইবেল কেন? তাঁহার প্রণীত হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ক বিচার গ্রন্থ সকলের কোন কোন স্থান পাঠ করিলে বোধ হয় যেন তিনি জন্মান্তর জীবাত্মার ও পরমাত্মার একত্ব, নির্ব্বাণ মুক্তি, প্রভৃতি মতে আস্থা প্রদর্শন করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

সূর্য্য।

"নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥"

জগৎ সবিতা ভগবান বিভাবসু ভারত বিজয়ী বেদপরায়ণ আর্য্য ব্রাহ্মণের উপাস্য দেবতা। বেদের মহামন্ত্র সাবিত্রী গায়ত্রী সেই দেবের স্তোত্র; এবং ব্রাহ্মণেরা প্রাতে,

মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে এই তিন বার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ স্বরে এই মহামন্ত্র পাঠ না করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে প্রত্যবায় ভাগী হয়েন। সে মহামন্ত্র এই:—

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো-দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।"

সর্ব্বব্যাপী ও সকল ভূতের প্রসব কর্ত্তা, সর্ব্বদা দীপ্তিমান্ ও ক্রীড়াযুক্ত সেই দেবের ভর্গ অর্থাৎ তেজ আমরা চিন্তা করিতেছি। তাঁহার সেই তেজ আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তিকে ধর্ম্ম কামার্থ মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গে প্রেরণ করুক। সবিতার ভর্গতেজ জীবনকালে চিন্তা তদীয় উপাসকমণ্ডলীর উপাসনা, এবং অন্তিমকালে মোক্ষপদরূপে সৌরলোক প্রাপ্তি তাঁহাদের ঐকান্তিক কামনা। তাঁহাদের এই আকিঞ্চন ঋগ্বেদ সংহিতার অনেক স্থলে পরিস্ফুট রূপে প্রকটিত রহিয়াছে। ঐ বেদের এক স্থলে স্বর্গীয় সুধা সোমরসকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে,—"সোম! যে অক্ষয় লোকে চিরালোক বিরাজিত, এবং যে স্থলে সূর্য্যমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত, আমাকে তথায় লইয়া চল।" সূর্য্যলোক যে জীবাত্মার মুক্তিমণ্ডপ বা শেষ আবাস স্থল, তাহা আজ কাল অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিতেছেন। লুই ফিগুয়ার তাহার 'Day After Death' নামক গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন যে জীবাত্মা দেহপিঞ্জর হইতে বিমুক্ত হইয়া অনন্ত আকাশের নানা স্থানে নানারূপ মূর্ত্তি ধারণান্তর অবশেষে সূর্য্যলোকে প্রবেশ পূর্ব্বক মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। *

কেবল ভারতীয় আর্য্য ব্রাহ্মণ কেন, আদিম কালীন আরও অন্যান্য জাতিরাও সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের †, আফ্রিকার এবং আমেরিকার আদিম বাসীদের মধ্যে সূর্য্যের উপাসনা ব্যতীত অন্য উপাসনাই নাই। ফলতঃ বিচার করিয়া দেখিতে গেলে পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে যত প্রকার উপাসনা পদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে, সূর্য্যের উপাসনা তাহার অধিকাংশের অপেক্ষায় ন্যায় সঙ্গত। সূর্য্য বিশ্বপতির অপরিসীম শক্তি ও অপার মহিমার সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি। সূর্য্যের কিরণকণা প্রসাদে সৌরজগতের যাবতীয় জীব প্রাণ ধারণ করিতেছে। দিনেক মাত্রও সূর্য্যোদয় না হইলে জগতের অসংখ্য জীব প্রাণত্যাগ করে, এবং উপর্য্যুপরি ৪।৫ দিন মাত্র সূর্য্যোদয় না হইলে জগৎ একেবারে প্রাণিশূন্য হইয়া যায়। সূর্য্য জীবের কেবলমাত্র জীবনের কর্ত্তা নহেন; তিনি সর্ব্বপ্রকারে জীবের সুখ সচ্ছন্দতা বিধানের বিধাতা। তাঁহার অপরিসীম শক্তিপাশে সংবদ্ধ থাকিয়া গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি পদার্থপুঞ্জ তাঁহার আজ্ঞাকারী উপাসকের ন্যায় অনবরত তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে; এবং এই শক্তির কণামাত্র

---

* "The Sun, the centre of the planetary aggregation, the constant source of light and heat, which sends forth the motion, sensation, and life upon the earth, is, in our belief, the final sojourn of purified, perfected souls, which have attained their most exquisite subtlety.........Placed in the centre of this vast world, understanding the secrets of nature, and all the mysteries of the universe, they are in the possession of perfect happiness, of absolute wisdom, and of illimitable knowledge."

Louis Figuier.

† প্রতি সাঁওতাল পল্লীতে বোঙা বুঙীর মন্দির আছে। সাঁওতালেরা নিত্য তথায় উপাসনা করে। বোঙা শব্দ সাঁওতালী, ইহার অর্থ সূর্য্য।

পৃথিবীর চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থকে শক্তি সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্র সূর্য্যের যে অপার মহিমা ও অপরিসীম শক্তির বিষয় ঘোষণা করিতেছেন, বৈদিক কাল সম্ভূত সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণদিগের তাহা অবিদিত ছিল না। সৌরতেজেই যে জীবের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি হয়, এবং বস্তুমাত্রের গতিই যে ঐ তেজ সম্ভূত, বেদের অনেক স্থলে তাহার নির্দ্দেশ আছে। সৌরতেজ উদ্ভিদ পদার্থ মধ্যে সঞ্চিত থাকিয়া উহাদিগকে দাহ্যগুণ বিশিষ্ট করে; ঐ তেজের প্রভাবেই পৃথিবীর জলরাশি হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘ সমুৎপন্ন করে, এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় ও নদী সকল বৃদ্ধি পায়, সুতরাং বসুন্ধরা সফলা হয়। এসকল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াও তাঁহারা সম্যক প্রকারে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। *

এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, ভারতীয় আর্য্যেরা, জড় সূর্য্যের উপাসক ছিলেন না। তাঁহারা মহাতেজা, জগতের শক্তিসমুচ্চয় ও সর্ব্বমঙ্গলময় সেই দেবের চিন্তাতেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের হৃদয়ে জিগীষা বৃত্তি প্রণোদিত হওয়ায়, তাঁহারা শক্তিসম্পন্ন হইতে প্রয়াসী হইলেন। ভগবান বিভাবসু জগতের শক্তিসমুচ্চয়, সুতরাং সেই পুরাকালে তাঁহারা সেই জলন্ত তেজের আরাধনাতেই নিযুক্ত হয়েন। জীবনান্তে তাঁহাদের অক্ষয় আত্মা সেই জগতের হিতসাধক জ্যোতির্ম্ময় পদার্থে বিলীন হইয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে, এই বিশ্বাস সতত হৃদয়ে জাগরুক থাকায় মৃত্যুভয় তাঁহাদের হৃদয়ে একেবারেই সমুদিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা বীরোচিত অসীম সাহস সম্পত্তি লাভ করিলেন। অনন্তর এই মহাশক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এবং তেজঃপুঞ্জ জ্যোতির্ম্ময় অভীষ্টদেবে জীবন উৎসর্গ করিয়া, তাঁহারা সোৎসাহে ভারত বিজয় ব্যাপারে ব্রতী হয়েন, এবং ভুজবলে ভারতে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। কিন্তু কালক্রমে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হওয়ায় এই মহাশক্তির উপাসনায় তাঁহারা যেমন বিরত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান দুর্দশার সূত্রপাত আরম্ভ হইল। আধুনিক ইয়ুরোপীয়েরা সূর্য্যোপাসক না হইয়াও শক্তির ঘোরতর উপাসক; সুতরাং এতদূর উন্নত। শক্তির অনুগ্রহ ব্যতীত সাংসারিক, সামাজিক,

* The grand phenomenon of the accumulation of solar heat in plants, a phenomenon which science has since elucidated, was early perceived by the ancients. It is frequently pointed out in the *Veddas* in expressive terms. When they lighted the wood on the hearth they knew that they only 'forced' it to give out the fire which it had received from the sun. When their attention was directed to animals, the close bond, wich exists between heat and life struck them in all its force............Life exists and perpetuates itself on the earth on three conditions only, that fire should penetrate the body under its three forms, of which one resides in the sun's rays, one in the ignited aliments, and the third in respiration, which is air renewed by motion. Now these two latter proceed, each after its own fashion, from the sun, (*Surya*); his celestial force is the universal motor, and the father of life: that which he first engendered, is the fire here below (*Agni*) born of his rays, and his second eternal co-operator is air put in motion, which is also called wind, or spirit (*Vayu*). M. Burnouf.

কিংবা রাজনৈতিক কোনও বিষয়েরই উৎকর্ষ লাভের প্রত্যাশা নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শক্তির উপাসনায় অভ্যুন্নত হইয়াছিলেন; শক্তির উপাসনা পরিহারের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের এ ঘোর অবনতি হইয়াছে, এবং পুনর্ব্বার শক্তির আরাধনা ব্যতীত আমাদের পুনরভ্যুত্থানের আর আশা নাই। কিন্তু অভীষ্টদেব যখন একবার রুষ্ট হইয়াছেন, তিনি কি পুনর্ব্বার সুপ্রসন্ন হইবেন?

যাঁহার প্রসাদে জীবন লাভ করিয়া আমরা সর্ব্বপ্রকারে সংসারে সুখসচ্ছন্দতা সম্ভোগ করিতেছি, এবং যিনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপাস্যদেবতা তাঁহার আকার, প্রকার, স্বরূপ, প্রকৃতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় সম্যক প্রকারে অবগত হইতে হয়ত অনেকেরই আন্তরিক বাসনা জন্মিতে পারে। আমরা পাঠকগণের সেই বাসনা কিয়ৎ পরিমাণে পরিতৃপ্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্র সূর্য্যের অদ্ভুত রহস্য যতদূর উদ্ভেদ করিয়াছে, আমরা পাঠকবর্গের সমীপে তাহাই বিবৃত করিব।

অরুণোদয়ে ও গোধূলি সমাগমে আমরা পূর্ব্ব ও পশ্চিমগগণে যে জবাকুসুম সঙ্কাশ ভাস্কর দেখিতে পাই, এবং মধ্যাহ্ন কালে যিনি আমাদের মস্তকোপরি আকাশের অত্যুচ্চ প্রদেশ হইতে বিমল শুভ্র প্রখর করজাল বিস্তার করিতে থাকেন, তিনি বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যের রাজ্যান্তরের প্রতিনিধি। তাঁহার শাসনাধিকারকেই সৌর জগৎ কহে, তিনি এই জগতের মধ্যদেশে অবস্থান পূর্ব্বক স্বরাজ্য শাসন করিতেছেন। অনাদি অনন্ত ও নিখিল জগৎপতির ইচ্ছায় তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার আদি ও অন্ত উভয় থাকাই সম্ভবপর। কিন্তু এ আদি ও অন্তকাল সংখ্যা দ্বারা নির্ণীত হইবার নহে। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, অনন্তকালের অতিদূরবর্ত্তী কোনও সময়ে সূর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং অনন্ত কালের অতি দূরবর্ত্তী কোনও সময়েই আবার তাঁহার অন্ত হইবে।

সূর্য্য সৌর জগতের কেন্দ্রস্থিত নক্ষত্র এবং উহার অধীশ্বর। নবগ্রহ, * উপগ্রহ মণ্ডলী, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি তাঁহার সন্ততি এ জগতের অধিবাসী। এজগৎ কতদূর বিস্তৃত তাহাও অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই; তবে সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া, এবং ২,৭৪৬, ২৭১,০০০ মাইল ব্যাসার্দ্ধ লইয়া একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিলে, সেই বৃত্তের পরিধি যাহা হইবে, সৌর জগতের আয়তন তাহার অপেক্ষা ন্যূন নয় এইমাত্র বলা যাইতে পারে। গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতির সহিত সূর্য্যের কোনই সৌসাদৃশ্য নাই। আকার প্রকারে, গঠনে ও গুণে তিনি এ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহার আয়তন এত বৃহৎ যে এ জগতের সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ উল্কা পিণ্ড প্রভৃতির আয়তন একত্র করিলেও উহার সমান হয় না। আমাদের পৃথিবী এজগতের একটীমাত্র গ্রহ; সুতরাং সূর্য্য যে আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা অতি বৃহৎ তাহা

* আমাদের শাস্ত্রকারেরাও নব গ্রহের অস্তিত্ব মানিতেন। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নয়টী তাঁহাদের নবগ্রহ। বর্ত্তমান জ্যোতির্ব্বিদেরা যে নব গ্রহের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা এই,——— Vulcan, Mercury (বুধ), Venus (শুক্র), Earth (পৃথিবী), Mars (মঙ্গল), Jupiter (বৃহস্পতি), Saturn (শনি), Uranus, এবং Neptune.

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে সোম বা চন্দ্র গ্রহ নহে, উপগ্রহ মাত্র, এবং রবি বা সূর্য্য গ্রহদিগের রাজা।

সহজেই অনুমেয়। জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সূর্য্যের আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা ১,২০০,০০০ গুণ বৃহৎ; এবং সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ৩০০,০০০ গুণ ভারী; অর্থাৎ ১,২০০,০০০ টী পৃথিবী একত্রিত হইলে সূর্য্যের আয়তনের সমান হয়; এবং ৩০০,০০০টী পৃথিবী একত্র করিয়া ওজন করিলে সূর্য্যের সমান ভারী হইতে পারে। সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে তিন বৎসর কাল অতীত হয়, কিন্তু এ প্রকারে সমস্ত সূর্য্যমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে হইলে (৩০০) তিন শত বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। পৃথিবীর অধিবাসীদের ন্যায় সূর্য্যের অধিবাসীরা * অল্পায়ু হইলে তাঁহাদের পক্ষে একবার মাত্রও সমগ্র সূর্য্যমণ্ডল পরিভ্রমণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। আবার ভূপৃষ্ঠে যে দ্রব্য ওজনে যত ভারী, সূর্য্য পৃষ্ঠে সেই দ্রব্য তাহার অপেক্ষা ৩০ গুণ ভারী। এই সকল কারণ বশতঃ স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত প্রকৃতি পুঞ্জ পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহস্থিত পদার্থপুঞ্জ অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন প্রাকৃতিক। সৌরজগতে সূর্য্যই একমাত্র আলোকময় ও তেজঃপুঞ্জ পদার্থ। সূর্য্যের আলোক ও তেজ লাভ করিয়াই অন্যান্য গ্রহমণ্ডলী আলোকিত ও তেজস্বান হইতেছে, এ আলোক ও তেজ না পাইলে, উহারা চিরান্ধকারাবৃত ও তেজঃসম্পর্ক শূন্য হইয়া সজীব পদার্থের আবাস ভূমি হইতে পারিত না।

পাঠক! শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে যাহা হইতে সৌরজগতের যাবতীয় পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার মহিমায় জগতে জীবগণ জীবন পাইয়াছে, এবং যে সর্ব্বশক্তি সমুচ্চয় ও সকল প্রকার গতির আধার হইতে সর্ব্বভূত গতিলাভ করিতেছে, সেই আলোকময় ও তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ। আমাদের পৃথিবী যে যে উপকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে, উহাও সম্ভবতঃ সেই সেই উপাদানে * নির্ম্মিত, কিন্তু তেজের আতিশয্য বশতঃ উহার উপাদান সমষ্টি বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর আকারের ন্যায় সূর্য্যেরও আকার গোল, সুতরাং উহাকে গোলক বলা হইয়া থাকে। পৃথিবীর উপাদান সকল ও যেমন স্তরে স্তরে সজ্জিত, সূর্য্যের উপাদান ও ঠিক তদ্রূপ। নৈশগগণে ভাসমান যে ধূমবৎ পদার্থ সমূহ আমরা দেখিতে পাই, সূর্য্যও এক সময়ে ঐ প্রকার আকারে অনন্ত আকাশের নানাস্থানে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সুদূরবর্ত্তী ঐ সকল পদার্থ পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইয়া সম্মিলিত হওয়ায় আমাদের সূর্য্যের উদ্ভব হয়। অনন্ত আকাশে এ প্রকারে যে কত সূর্য্য এবং কত ধূমবৎ পদার্থ আছে তাহা কে বলিবে! নীল নৈশগগণে পরিদৃশ্যমান মুক্তাফলরাজী নক্ষত্রাবলীও এক একটী প্রকাণ্ড সূর্য্য। দুই খণ্ড কাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্নি সমুৎপন্ন হয় সকলেই জানেন, আকাশে ভাসমান ঐ সকল ধূমবৎ পদার্থের সম্মিলনে এক একটী সূর্য্যের

* সূর্য্য মণ্ডলে কোনও শরীরী জীব বাস করে কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে পৃথিবীর অধিবাসীদের ন্যায় যে কোনও জীব সূর্য্যমণ্ডলে থাকিতে পারে না, তাহাতে আর কোনও সংশয় নাই।

* সূর্য্য কি কি উপকরণে নির্ম্মিত তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তবে সূর্য্যে যে, নিম্নলিখিত পদার্থ আছে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে;—

Sodium, Iron, Magnesium, Barium Copper, Zinc, Calcium, Chromium, Nickel, Hydrogen. Titanium, Aluminium, Cobalt, Manganese.

উদ্ভবকালে যে কি পরিমাণে তেজের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই অনুভব করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়েও ঐ প্রকার পদার্থ সকল সূর্য্যমণ্ডলে নিপতিত হইয়া ঐ অনন্ত অনলের ইন্ধনের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

সূর্য্যের যে আলোকময় অংশ আমরা দেখিতে পাই; উহা বাস্তবিক উহার উপরিভাগ নহে; হাইড্রজন (অম্লনক) নামক বায়বীয় আবরণ উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কঠিন ভাবাপন্ন পৃথিবীর উপরিভাগ যেমন বায়বীয় আবরণে পরিবৃত; সূর্য্যের আলোকময় ঐ অংশও সেইরূপ অম্লনক বায়বীয় আবরণে পরিবেষ্টিত। পৃথীবীর অভ্যন্তর দিয়া যেমন সময়ে সময়ে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভূ-গহ্বর হইতে নানা প্রকার পদার্থ উত্থিত হইয়া থাকে, সূর্য্যের মধ্যভাগ হইতেও সময়ে সময়ে সেই প্রকার পদার্থ উহার আলোকময় আবরণ ভেদ করিয়া উঠিতে থাকে। ইহাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে সৌরোৎপাত বলা যায়। শশাঙ্কের কলঙ্কের ন্যায় সূর্য্য মণ্ডলে যে সকল কাল কাল রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল সূর্য্য মণ্ডলের গহ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এ সকল গহ্বরের আয়তন এত বৃহৎ যে, আমাদের পৃথিবীর ন্যায় দুই তিনটী পৃথিবী উহার অভ্যন্তরে অনায়াসে প্রবিষ্ট হইতে পারে।

আমরা সূর্য্যকে আলোকময় ও তেজঃপুঞ্জ বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু পাঠকবর্গের নিকট ঐ আলোক ও তেজের আতিশয্যের বিষয় কিছুই বলি নাই। আমাদিগের পাঠক মণ্ডলীর মধ্যে যাঁহারা বৈদ্যুতিক আলোক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে সূর্য্যালোকের আতিশয্য অনুমান করিতে সমর্থ হইবেন। মাগনেসিয়াম ধাতুনির্ম্মিত সূক্ষ্ম তার জ্বালাইলে যে অত্যুজ্জ্বল আলোকের উদ্ভব হয়, সম্ভবতঃ বিজ্ঞানাধ্যায়ী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা নয়নগোচর করিয়াছেন। ৫০০টী বাতী এক সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত করিলে এ আলোকের সমান আলোক হয়, এবং ১৮০,০০০টী বাতী বা ৩৬০ গাছি ম্যাগনেসিয়াম সূত্র এক সঙ্গে জ্বালাইলে যে পরিমাণ আলোকের উৎপত্তি হইবে, দিবাকরও প্রতিক্ষণে তত পরিমাণ আলোক প্রদান করিতেছেন। পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানবলে সূর্য্যের তেজের আতিশয্যও নির্ণয় করিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে তেজঃসম্পাতে জল অল্প অল্প গরম হইতে হইতে অবশেষে ফুটিয়া উঠে। জল যত দূর গরম হইতে পারে ফুটন্ত অবস্থা তাহার শেষ সীমা। এক কড়া জল কয়লার আগুণে ফুটাইতে অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিট কাল লাগে, কিন্তু ৯৭॥ ঘন ক্রোশ আয়তন বিশিষ্ট কোনও পাত্র বরফ জলে পূর্ণ হইলে সেই সমস্ত জল কয়লার আগুণে গরম করিয়া ফুটাইতে কত সময়ের আবশ্যক, তাহা সম্ভবতঃ অল্পায়াসেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু সূর্য্যের তেজ এত প্রখর যে, এই বৃহৎ জলরাশি মুহূর্ত্তকের মধ্যেই সূর্য্যের সমস্ত তেজ পাইলেই ফুটিয়া উঠে।

এই প্রচণ্ড অনলানল কি প্রশান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক অনন্ত আকাশে ভাসমান রহিয়াছে? না, কখনই না। যে অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিশিখা সৌর জগতের সজীবতা ও জীবন্ত ভাব সংরক্ষা করিতেছে, সে কি নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে? কোনও নগরে অগ্নি লাগিলে

তথায় যে কি প্রকার হুলস্থূল পড়িয়া যায়, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অগ্নির হিস হিস শব্দের সঙ্গে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের শাঁ শাঁ নিঃস্বন সংমিলিত হইয়া কেমন এক প্রকার ভয়াবহ শব্দ সমুৎপন্ন করিয়া সেই নগরবাসীদিগকে একেবারে আকুলিত করিয়া তুলে। সূর্য্যমণ্ডল অতি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড; সুতরাং তথায় ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত সর্ব্বক্ষণই স্বকীয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। পৃথিবীতে যত কেন প্রবল ঝড় হউক না, উহাতে বায়ুর বেগ কখনই প্রতি ঘণ্টায় ৫০ ক্রোশের অধিক হয় না, কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলে নিরন্তর যে ঝড় বহিতেছে, তাহাতে বায়ুর বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ ক্রোশেরও অধিক। এই প্রবল বাত্যাভিতাড়নে সূর্য্যের অবয়ব স্খলিত জলন্ত অগ্নিশিখারাশি আবার প্রতিক্ষণে অনন্ত আকাশের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

এই প্রভূত পরাক্রমশালী জগৎলোচন সহস্ররশ্মি যে প্রকারে এই অসীম তেজোরাশি লাভ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি সময়ে সময়ে তদীয় শরীরে নিপতিত হওয়ায় উহার সঞ্চিত তেজের বৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু সৌর জগতের সর্ব্বত্র ঐ তেজ বিকীর্ণ হওয়ায় সৌর তেজের ক্রমেই যে হ্রাসতা ঘটিতেছে তাহাতে আর সংশয় নাই। কোনও ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট মূলধন লইয়া কারবার আরম্ভ করিলে, কারবারের ব্যয় যদি তাঁহার আয়ের অপেক্ষা ন্যূন হয়, তবে কিয়ৎকালের মধ্যেই তাঁহার মূলধনও উড়িয়া যায়। আমাদিগের সূর্য্য উদ্ভবকাল সম্ভূত যে তেজোরাশি লইয়া রাজত্ব করিতে বসিয়াছেন, প্রতি বৎসরেই তাহার কিয়দংশ ব্যয়িত হইতেছে; বর্ত্তমান সময়ে উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি পতনজাত যে তেজ তিনি সময়ে সময়ে লাভ করেন, তাহা তাঁহার ব্যয়ের অপেক্ষা অনেক কম; সুতরাং উল্লিখিত মহাজনের মূল ধনের ন্যায় সূর্য্যের সঞ্চিত তেজের ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে; কিন্তু এত অল্প পরিমাণে এ তেজের হ্রাস হইতেছে যে, আমরা তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না। যত অল্প পরিমাণেই সৌর জগতের হ্রাস হউক না কেন, সময়ে যে এই জলন্ত ও তেজঃপুঞ্জ সূর্য্য নিষ্প্রভ ও তেজঃসম্পর্কশূন্য হইবে তাহাতে তিলার্দ্ধও সন্দেহ নাই। জগৎ লোচন নয়ন মুদিত করিলে সেই সঙ্গে সঙ্গে জগতের নয়নও মুদিত হইবে। কিন্তু সকলের মূল কারণ সেই অনাদি অনন্ত বিশ্বপতি স্বকীয় সৃষ্টি প্রক্রিয়া সংরক্ষার নিমিত্ত অন্য কোনও উপায় উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়াছেন কি না, তাহা তিনিই জানেন! তাঁহার ইচ্ছায় জড় পরমাণু সমষ্টির সম্মিলনে আলোকময় ও তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার অমোঘ নিয়ম প্রভাবেই সৌর তেজের হ্রাস হইতেছে এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ সংরক্ষিত বা বিলুপ্ত হইতে পারে।

সন্তোষ ক্ষেত্র।

যাঁহারা ভারতের ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, ভারতের পূর্ব্বতন কাহিনী যাঁহাদের হৃদয়ের প্রতিস্তরে নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণের কীর্ত্তি-

কলাপে অবশ্য বিস্ময় প্রকাশ করিবেন এবং অবশ্য সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষগণকে বিনম্রভাবে পবিত্র প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিতে অগ্রসর হইবেন। আর্য্যগণের কীর্ত্তি কেবল যুদ্ধ বিগ্রহেই শেষ হয় নাই। তিরৌরী বা হলদিঘাট, দেওয়ীর বা নওশেরা, রামনগর বা চিলিয়ানওয়ালার পুণ্যপুঞ্জময় ক্ষেত্র কেবল তাঁহাদের অবিনশ্বর কীর্ত্তির রেখাপাতে ইতিহাসের বরণীয় হয় নাই। বীরত্ব-বৈভবের সহিত জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সত্যনিষ্ঠায় এবং দানশীলতা প্রভৃতি গুণে তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর নিকট পূজা পাইয়া আসিতেছেন। প্রতাপসিংহ প্রভৃতির ন্যায় ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, বুদ্ধ প্রভৃতির ধর্ম্মনিষ্ঠার মোহিনী শক্তি বিকাশ পাইয়াছে এবং শিলাদিত্য প্রভৃতির দানশীলতার অপূর্ব্ব প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। আজ ভারতের এই অপূর্ব্ব দানশীলতার কয়েকটী কথা এস্থলে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে,—যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্য আপনার বিজয়-পতাকায় পরিশোভিত করিতেছিলেন, যখন মহাবীর পুলকেশ আপনার অসাধারণ ভুজবলের মহিমায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, চীনদেশের চিরপ্রসিদ্ধ দরিদ্র পরিব্রাজক যখন নালন্দার সঙ্ঘরামে জ্ঞানবৃদ্ধ শীলভদ্রের পাদতলে বসিয়া হিন্দু আর্য্য ঋষিগণের অপূর্ব্ব জ্ঞান গরিমার সৌন্দর্য্য-রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন, তখন মহারাজ শিলাদিত্য গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে একটী মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড এই মহোৎসবের ক্ষেত্র ছিল। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি "সন্তোষ ক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসব প্রাচীন ভারতবর্ষের একটী প্রধান ঘটনা। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গ ফীট পরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেসমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজন-গৃহ সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোভা পাইত। এই সকল ভোজন-গৃহের এক একটীতে একবারে প্রায় সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্ব্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণ শ্রমণ, নিরাশ্রয় দুঃখী, পিতৃ মাতৃহীন, আত্মীয় বন্ধুশূন্য নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দান গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত এইস্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভীরাজ ধ্রুবপতু এবং আসাম-রাজ কুমার এই করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই দুই করদ রাজার ও মহারাজা শিলাদিত্যের সৈন্য সন্তোষ-ক্ষেত্রের চারিদিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতুর সৈন্যের পশ্চিমে বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত। এইরূপ শৃঙ্খলা বিশেষ পারিপাট্যশালী ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণ সময়ে অথবা তৎ-

পূর্ব্বে সন্তোষ-ক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দুষ্ট লোকে আত্মসাৎ করিতে পারে, এই আশ-ঙ্কায় ইহার চারি দিক সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত। এই ক্ষেত্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলের অব্যবহিত পশ্চিমে ছিল। শিলাদিত্য আপনার সৈন্যগণের সহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন। ধ্রুবপতু ক্ষেত্রের অব্যবহিত পশ্চিমে এবং ক্ষেত্রে ও অভ্যাগত দলের মধ্যভাগে সৈন্য স্থাপন করিতেন। আর কুমার যমুনার দক্ষিণ তটে আপনাদের সৈনিক দল রাখিতেন।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপোষক হইলেও হিন্দু ধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়-কেই আদর সহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেব মূর্ত্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু ও তৃতীয় দিনে শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভা বিকাশ করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দান-কার্য্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন ব্যাপিয়া হিন্দু দেবতা পূজকেরা, এবং দশ দিন ব্যাপিয়া উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয় বন্ধু শূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে ৭৫ দিন পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণি-মুক্তা-খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই মহা-মূল্য আভরণ রাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীরধারণ করিয়া মহারাজ শিলাদিত্য যোড়হাতে গম্ভীর স্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তি রক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষ-ক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্য সঞ্চয়ের মানসে ভবি-ষ্যতেও আমি এইরূপ দান করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।" এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্ত হস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য রক্ষা ও বিদ্রোহ দমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

পবিত্র প্রয়াগে পবিত্র-স্বভাব চীন দেশীয় শ্রমণ হিউয়েন্থসাঙ্গ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোৎ-সবের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভারতের প্রাচীন নৃপ-তিগণ আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ এবং অন্তিমে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা ধর্ম্ম সঞ্চয় মানসে প্রতি পঞ্চম বর্ষে এই উৎ-সবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু ইহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংস্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। ইঁহাদিগকে সকল সময়ে এই উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের

মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়; এবং যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। এই উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান করা হইত, উভয়েই সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এজন্য ইঁহারা সর্ব্বদা দানবীর রাজার কুশল কামনা করিতেন এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সে রাজ্যের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এদিকে সাধারণেও এই অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এই রূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেন। ইহার পর যে সকল সাহসী দস্যু রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া শেষে রাজসিংহাসন গ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা সন্তোষ-ক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থাভাব প্রযুক্ত আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসবে আর্য্য-কীর্ত্তির মহিমা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি ভারতবর্ষ যবনের পর ইংরেজের পদানত না হইত, যদি বৈদেশিক সভ্যতা-স্রোত ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে গড়াইয়া না পড়িত, ভারতের সন্তানগণ যদি আপনাদের জাতীয়ভাব হইতে বিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে বোধহয়, আজও ভারতবর্ষ এই প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির মহদাড়ম্বরে পরিপূর্ণ থাকিত এবং আজ এই অপূর্ব্ব দানশীলতার অপার মহিমায় ভারতের দুঃখ দারিদ্র্য অন্তর্হিত হইয়া যাইত। ভারতের দুরদৃষ্ট বশতঃ এ অপূর্ব্ব দৃশ্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ কয়জন ভারতবাসী ইহার জন্য নীরবে নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন? কয়জনের হৃদয় এ অতীত স্মৃতির তীব্র দংশনে কাতর হইয়া পড়ে? কে ইহার উত্তর দিবে? প্রতিধ্বনি বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিতেছে, কে উত্তর দিবে?

স্বাধীনতা।

উপক্রমণিকা।

এক দিন বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম, ইতিহাসে এমন ঘটনা কেন হইল যে, যে রোমানগণ একদিন স্বাধীনতা ও তেজস্বিতা গুণে জগতে অগ্রগণ্য ছিল, যাহাদের ভুজবলে এক সময় সমুদায় জাতি কম্পিত হইয়াছিল, যাহারা সতী লুক্রিশিয়ার মান হানির জন্য স্বীয় রাজাদিগকে জন্মের মত বিদায় করিল, যাহারা তৎপরে বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের সুখ সম্ভোগ করিল, এরূপ কেন হইল যে, সেই রোমানগণ আবার অবশেষে সম্রাটদিগের যথেচ্ছাচারের শৃঙ্খল ও বিদেশীয় শত্রুদিগের প্রতাপের শৃঙ্খল কণ্ঠে বহন করিতে প্রস্তুত হইল? এটী একটী ইতিহাসের গভীর সমস্যা। ইহাকে সমস্যা বলি, তাহার কারণ এই,—স্বাধীনতার প্রকৃতি এই যে, ইহা দশদিন উপভোগ করিলে, ইহার প্রতি

মমতা জন্মে। এরূপ মমতা জন্মে যে, তৎপরে লোকে বরং প্রাণ দিতে পারে কিন্তু স্বাধীনতা দিতে পারে না। স্বাধীন ভাবে অঙ্গ চালনাতে সুখ। শিশু আপনার মনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পদ কয়খানি চালনা করিয়া খেলিতেছে, তাহার হাতখানি ধর অমনি সে কাঁদিবে, কারণ সুখের ব্যাঘাত হইল। স্বাধীনভাবে হৃদয় মনের শক্তি সকলকে চালনা করাতেও সুখ এবং তাহার পথে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও ক্লেশ। যে অঙ্কুর বীজ হইতে বাহির হইয়া অনাবৃত আকাশে একবার মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে বীজগর্ভে পুনঃ-সঙ্কুচিত করা যেরূপ দুষ্কর, সেইরূপ স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুর জীবনপ্রদ শক্তির মধ্যে যে হৃদয় মনের বিকাশ হইয়াছে, সে হৃদয় মনকে পুনরায় পরাধীনতার সংকীর্ণ সীমামধ্যে বদ্ধ করাও কঠিন। স্বাধীনতা কিছুকাল উপভোগ করিলে তাহা আত্মার স্বাভাবিক ভাব ও সংস্কারে পরিণত হয়; তৎপরে স্বাধীনতাতে হস্ত দিলে সমগ্র প্রকৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। তবে রোমানগণ পরাধীনতার শৃঙ্খল গলে পরিধান করিল কেন? এ সমস্যার উত্তর কোথায়?

অনেকে ইহার অনেক প্রকার উত্তর দিয়াছেন। কেহ বলেন রোমানদিগের রাজ্য যখন দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইতে লাগিল, যখন পারস্যের ও মিসরের রত্নরাজি রোমীয় রাজকোষে সংগৃহীত হইতে লাগিল, যখন রোমান সেনাপতিগণ স্তূপাকার স্বর্ণ রোপ্য বহন করিয়া আনিতে লাগিলেন, যখন রোমীয় ধনিগণ পূর্ব্বদেশীয় রাজাদিগের জাঁক জমকের অনুকরণ করিতে লাগিলেন, যখন নানাজাতির অর্ণবপোত সকল বাণিজ্য সামগ্রী রোমে বহন করিতে লাগিল, তখন বিলাসপরায়ণতা ও সুখপ্রিয়তা রোমকদিগের মনে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। রোমানগণ দৈহিক শ্রমকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা করিল, এবং ইন্দ্রিয়-সেবা ও আমোদ কৌতুককে পরম লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের পৌরুষের হ্রাস হইল, তাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য ক্ষীণ হইয়া গেল, এবং তাহাদের স্বাধীনতা প্রবৃত্তি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল, সুতরাং তাহারা পরাধীনতার শৃঙ্খল গলদেশে ধারণ করিতে প্রস্তুত হইল।

কেহ কেহ বলেন, সুখ সমৃদ্ধির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোমানগণ দুর্নীতি-পরায়ণ হইয়া উঠিল। তাহাদের প্রাচীন কালের মিতাচার, সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়পরতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, সতীত্ব, স্বদেশ-প্রিয়তা, নির্লোভতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল একে একে অস্তমিত হইতে লাগিল। তাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যত্ব ভ্রষ্ট হইল; শরীর মনের শক্তি সকলকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল; সুতরাং তাহাদের পক্ষে পরাধীনতার শৃঙ্খল গলদেশে ধারণ করা সহজ হইল।

কেহ কেহ বলেন, রোমীয় রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমান সেনাপতিগণ এক এক দেশের ভারপ্রাপ্ত হইয়া সেই সেই দেশের অধিনায়ক রূপে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তত্তৎ প্রদেশে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড সেনাদল রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে রোমনগরে প্রাচীন কাল হইতে সেনাদল রাখিবার নিয়ম নাই; যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে প্রত্যেক নগরবাসীকে আবশ্যকমত সৈনিকের বেশ পরিধান করিতে হইত, আবার সন্ধি স্থাপন হইলে প্রত্যেকে স্বীয় স্বীয় কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত

হইত। কালে শান্তিপ্রিয় নগরবাসিগণ দুর্ব্বল হইল, এবং প্রবাসবাসী সেনাপতিগণ প্রবল হইলেন। তাঁহারা বিদেশীয় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, ধনরত্ন অশ্ব গজ প্রভৃতি জয় চিহ্ন সকল বহন করিয়া ও বহু সংখ্যক বন্দীকৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসদিগের দ্বারা অন্বিত হইয়া যখন সসৈন্যে রোমনগরে প্রবেশ করিতেন, যখন তাঁহাদের বিজয় নিনাদে দিগ্‌দেশ প্রতিধ্বনিত হইত, তখন রোমবাসিদিগের চিত্ত তাঁহাদিগের প্রতাপে চমৎকৃত ও পরাভূত হইয়া পড়িত। এইরূপে জুলিয়াস সীজার যখন গাল্‌দেশ হইতে সসৈন্যে রোমের দ্বারে উপনীত হইলেন, তখন রোমানগণ তাঁহার সৈন্যবল দেখিয়া ভয়ে ভীত হইল। সুতরাং শ্রমশক্তির উপরে সামরিক শক্তির প্রবলতাকেই রোমের পতনের কারণ বলা যাইতে পারে।

কেহ বা বলেন যে,রোমানগণ যতদিন সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ ছিল, যত দিন রোম নগরবাসিদিগকে চতুঃপার্শ্বস্থ শত্রু কুলের সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইত, যতদিন এই ক্ষুদ্র সমাজটীকে অকালে নিধন প্রাপ্ত করিবার জন্য চারিদিকের লোকের চেষ্টা ছিল, তত দিন জাতীয় গৌরব জাতীয় একতা ও জাতীয় অধিকার রক্ষার ইচ্ছা রোমানদিগের মনে নিতান্ত প্রবল ছিল। সেই জাগ্রত ইচ্ছা ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের ধর্ম্ম বিশ্বাসের ন্যায় একটী প্রবল বন্ধন-রজ্জু হইয়া তাহাদিগকে শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও মনুষ্যত্বে পূর্ণ করিয়াছিল। ক্রমে রোমের রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত জাতিদিগকে যে পরিমাণে রোমানের অধিকার দেওয়া হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে রোমানদিগের মনে "রোম" ও "রোমান" এই দুইটী শব্দের উন্মাদকারিণী শক্তির হ্রাস হইতে লাগিল। রোমানদিগের জাতীয় বন্ধন রজ্জু শিথিল ভাব ধারণ করিতে লাগিল, সেই সঙ্গে তাহাদের শৌর্য্য বীর্য্যেরও হ্রাস হইল। সুতরাং রোমানদিগের কণ্ঠ পরাধীনতার শৃঙ্খলের জন্য প্রস্তুত হইল।

এ সকল উত্তরের মধ্যে যে কোন যুক্তি নাই তাহা নহে। পূর্ব্বোক্ত কারণ গুলি যে রোমানদিগের পরাধীনতার পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এইমাত্র বলিলে সকল বলা হইল না। রোমানদিগের দুর্গতি ও অবনতির গুরুতর ও প্রকৃত কারণগুলি এখনও নির্দ্দেশ করা হইল না। সে কারণ গুলি ভাবী দুর্দ্দশার বীজরূপে সমাজ বক্ষেই নিহিত ছিল। ইহা একটী ইতিহাসের অভ্রান্ত প্রমাণিত সত্য যে, সমাজের গঠনের মধ্যে, রক্ত মাংসের মধ্যে যদি দুর্ব্বলতার বীজ নিহিত না থাকে, তাহা হইলে কোন প্রকার আকস্মিক, বা বাহ্যিক কারণে তাহাকে দুর্ব্বল করিতে পারে না। আমি দেখিতেছি রোম যখন শ্রীবৃদ্ধিশালী, রোম যখন পরম প্রতাপবান্, রোম যখন ভুবনবিজয়ী, রোম যখন স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের আদর্শ স্বরূপা,তখনও ঐ সকল দুর্গতির বীজ রোমীয় সমাজ বক্ষে বিদ্যমান ছিল।

সে বীজ কি? প্রথম বীজ এই যে, রোমে জাতিভেদ প্রথা ছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি বর্ণভেদ ছিল না বটে, কিন্তু প্রেট্রীসয় ও প্লিবীয় ছিল। ইহারা কে? কিরূপে ইহাদের উৎপত্তি হইল? রাজ্য মধ্যে ইহাদের ক্ষমতা ও অধিকারের সীমা নির্দ্দেশ কিরূপে হইত? এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সময়ে সময়ে বিবাদ ঘটনা হইয়া কিরূপ আন্দোলন ও পরিবর্ত্তন সকল সংঘটিত হইত?

তাহা এখন সবিশেষ উল্লেখ করিবার সময় নাই। রোম রাজ্যের ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অতি প্রাচীনতম কাল হইতে রোমীয় সমাজে এই দুই শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দৃষ্ট হয়। প্রথম প্রথম এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন অনিষ্ট ফল উৎপাদন করে নাই; কারণ তখন রোমানগণকে চতুর্দ্দিকে প্রবল শত্রুকুলে বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হইত, আততায়ীর উপদ্রব নিবারণ চিন্তাতে রোমানদিগের গৃহবৈরের সময় থাকিত না,—পেট্রীসিয় এবং প্লীবিয় উভয়েই স্বদেশপ্রিয়তা সূত্রে বদ্ধ হইয়া বিপক্ষদলের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত। প্লীবিয়গণই যোদ্ধা, তাহারাই টেক্‌স দাতা সুতরাং তাহাদিগকে ছাড়িয়া কার্য্য করা প্রেট্রীসিয়দিগের পক্ষে সম্ভব ছিল না; এই জন্য বিপদ কালে প্লীবিয়দিগের আদর বাড়িত; তাহারাও সেই সুযোগে কোন কোন অধিকার লাভ করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু রোমের প্রতাপ ও সুখ সৌভাগ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় ধনিদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহারা দরিদ্র প্লীবিয়দিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিত, এ অত্যাচার কোন অংশে তাহা হইতে ন্যূন নহে। ধনিদিগের এই অত্যাচার কালক্রমে এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে ইহা অসহ্য আকার ধারণ করিয়াছিল। অধিক কি, এই ধনিদিগের অত্যাচারে ইটালীয় লোকদিগকে অস্থির হইতে হইয়াছিল। গীবন তাঁহার ইতিবৃত্তে ইটালীয় ইতিহাস লেখকদিগের গ্রন্থাবলী হইতে যে সকল বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে দৃষ্ট হয় যে, এই ধনিরা এক একজন এক একটী স্বাধীন রাজার মত হইয়া পড়িয়াছিল, এক একজনের বহুসংখ্যক সৈন্য ও দাস থাকিত, ইহারা নিজ দলের রক্ষার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিত, সর্ব্বদাই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ দাঙ্গা হাঙ্গাম রক্তপাতে প্রবৃত্ত হইত, যাত্রা, মহোৎসব বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে জাঁক জমকের পরিসীমা রাখিত না; নদী হইতে জাহাজ সকল মারিয়া লইত এবং স্থলে ডাকাতি করিত; ইহাদের উপদ্রবে সামান্য ও দরিদ্র লোকেরা সুখে নিদ্রা যাইতে পারিত না; বল প্রয়োগ দ্বারা দরিদ্রদিগকে স্বীয় দাসত্বে নিয়োগ করিত; দরিদ্র প্লীবিয়গণের কুল কন্যাদিগেরও মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলা দুষ্কর হইত। এমন কি, ইহাদের দৌরাত্ম্যে পোপদিগকেও সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত।

পেট্রীসিয় এবং প্লীবিয়দিগের এই জাতিবৈরের ন্যায় দুর্গতির আর একটী বীজ কালক্রমে রোমীয় সমাজে নিহিত হইয়াছিল। রোমানগণ যখন বিদেশ অধিকার করিতে যাইতেন, তখন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বহুসংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া আনিতেন। রণক্ষেত্রে পরাজিত ও বন্দীকৃত ব্যক্তিদিগকে দাসত্বে পরিণত করা প্রাচীন কালের সাধারণ রীতি ছিল। এই বন্দীকৃত দাসদিগকে রোমে আনিয়া বিক্রয় করা হইত এবং ধনবান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ইহাদিগকে ক্রয় করিয়া লইতেন। এক এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয়ে এমন দুই তিন শত বা তদধিক দাস থাকিত। এমন কি, দাসের সংখ্যা অনুসারে সমাজ মধ্যে ধনিদিগের সম্ভ্রমের তারতম্য হইত। ধনিগণ এই সকল ক্রীত দাসকে সর্ব্বপ্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্যে

নিযুক্ত করিতেন ; ইহাদিগের দ্বারা অশ্ব গো প্রভৃতির কার্য্য করাইতেন ; কোন প্রকার আনন্দ উৎসব উপস্থিত হইলে ইহাদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধাইয়া দিয়া বন্ধুদিগকে কৌতুক দেখাইতেন ; কখন কখনও সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশুদিগের মুখে ইহাদিগকে ফেলিয়া দিয়া রঙ্গ দেখিতেন। ইহাদের আর্ত্তনাদে যখন নাটমন্দির কম্পিত হইত এবং ইহাদের রক্তে যখন উক্ত মন্দিরের প্রাঙ্গণভূমি সিক্ত হইত, তখন সমবেত দর্শকগণ পরম কৌতুক উপভোগ করিয়া আনন্দসূচক করতালি ধ্বনি করিত। ইহাদিগকে হত্যা করিলে কাহাকেও দণ্ডভাগী হইতে হইত না। ইহাদিগকে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেওয়া হইত, আবার কখন কখনও গুরুতর অপরাধ উপেক্ষা করা হইত। গীবন বলিয়াছেন, গরম জল আনিতে আদেশ করাতে কোন দাস একটু অধিক উষ্ণজল আনিয়াছে, সেজন্য তাহাকে ৩০০ শত বেত্রাঘাতের আদেশ হইল, আবার সেই ব্যক্তি অপর একজন দাসকে হত্যা করিয়াছে শুনিয়া উপেক্ষা করা হইল। এমন কি, এরূপ দৃষ্টান্তের কথাও শ্রুত হওয়া যায় যে, একজন রোমীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির গৃহে সম্রাট আগষ্টস্ ভোজে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একজন ক্রীতদাস কোন অপরাধ করাতে গৃহস্বামী ভোজের নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন এবং ঐ হতভাগ্য দাসকে এরূপ প্রহার করিলেন যে, সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল ; গৃহস্বামী তাহার মৃতদেহ ফেলিয়া দিতে আদেশ করিয়া আবার আসিয়া প্রসন্ন মনে ভোজে বসিলেন। যেন কোন বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। এরূপ শুনা যায় যে, এই ঘটনা আগষ্টসের প্রাণকে এত বিদ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি ইহার পর আর আহার করিতে পারিলেন না। সে যাহা হউক, এই দাসদিগের সংখ্যা রোমের রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে লাগিল। এমন কি অবশেষে ইটালীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদিগের দ্বারা উপনিবেশ সংস্থাপন করা আবশ্যক হইয়া উঠিল।"

পাঠক দেখিতেছেন, রোমীয় সমাজ মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক বিদ্যমান। (১ম) প্রেট্রিসিয়, (২য়) প্লীবিয়, (৩য়) ক্রীতদাস। ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন। এক দল অত্যাচারকারী অপর দুইজন অত্যাচরিত। অত্যাচারের অর্থ স্বাধীনতা হরণ করা, ও মানবাত্মার মহত্ত্ব ও অধিকার বিস্মৃত হওয়া। অত্যাচারে যে বাস করে তাহার অধোগতি যে করে তাহারও অধোগতি। বহুদিন অত্যাচারে বাস করিতে করিতে লোকের স্বাধীনতা প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। যে অত্যাচার করে তাহারও স্বাধীনতা প্রবৃত্তি ম্লান হইয়া যায়। যে মানবের অধিকারকে নিত্য হরণ করে, মানবের অধিকার সকল যে পবিত্র ও দুর্লঙ্ঘ্য, এ সংস্কার আর তাহার চিত্তে থাকে না। এই কারণে যে অপরকে দাসত্বে পরিণত করিয়া সুখ পায়, সে অপরের দাস হইয়াও সুখে থাকিতে পারে। আবার অপর দিকে যে ব্যক্তি অত্যাচারে বাস করিয়া বর্দ্ধিত হয়, সে নিজে প্রভু হইলে অপরের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে।" ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত জন সমাজের প্রতিদিনের কার্য্যে এবং ইতিহাসের অনেক ঘটনাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এত কথা বলিবার অভিপ্রায় এই ; আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোন জাতির মনের

মধ্যে যতদিন স্বাধীনতা প্রবৃত্তি জীবিত থাকে, ততদিন কেহ তাহাকে সহজে পরাধীন করিতে পারে না। সুতরাং কোন জাতিকে যদি কিছু কাল স্বাধীনতার সুখ ভোগ করিয়া আবার পরাধীন হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, কোন বিশেষ কারণে উক্ত জাতির স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। রোমের জাতিভেদ এবং দাসত্ব প্রথাকেই উক্ত কারণ বলিয়া অনুমান করি। এতদ্দ্বারা সমাজের অঙ্গভূত তিন শ্রেণীরই স্বাধীনতা প্রবৃত্তি দিন দিন ম্লান হইয়া যাইতে লাগিল। প্রাচীন রোমানগণ যে সকল স্বত্ব ও অধিকারকে অমূল্য জ্ঞানে কত সংগ্রাম করিয়াছিলেন; সেই সকল অধিকারের প্রতি লোকের উপেক্ষা জন্মিতে লাগিল। স্বাধীনতার সুখভোগ করা অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সুখে রত হওয়া লোকের অধিক বাঞ্ছনীয় হইতে লাগিল। সুতরাং এরূপ অবস্থায় পরাধীন হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িল।

উপরে যে কারণ নির্ণীত হইল তাহাতে ইহাই উক্ত হইল যে, জাতীয় মন হইতে স্বাধীনতা প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত না হইলে সে জাতির কণ্ঠে পরাধীনতা শৃঙ্খল দেওয়া সহজ নয়। কিন্তু স্বাধীনতা প্রবৃত্তি কাহাকে বলে? মানুষ যখন মানুষকে দাসত্বে পরিণত করে, মানুষ যখন মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে, তখন তাহার আচরণে কি প্রকাশ পায়? সে আচরণের অর্থ এই, ও ব্যক্তি আমার সমান জগতের ধনধান্য ও সুখ সমৃদ্ধি ভোগে অধিকারী নয়; আমার সুখের জন্য, উহার সুখ বিসর্জ্জন করিতে হইবে; আমি উহার অপেক্ষা বলবান বা ধনী, বা সদ্বংশজাত, অতএব ও আমার সমশ্রেণী গণ্য জীব নয়; আমি যদি মানুষ হই ওব্যক্তি মানুষ অপেক্ষা হীন; যে ক্লেশ আমি পেলে অন্যায় হয়, সে ক্লেশ ও পেলে অন্যায় হয় না। সংক্ষেপে, ও আমার ভাই নয়, সৃষ্টিকর্ত্তার চক্ষে আমার সমান নয়। অতএব সকল প্রকার পরাধীনতার মূলে দুইটী মহা সত্যের বিলোপ। প্রথম সত্য,মানুষ মানুষের ভাই—দ্বিতীয় সত্য,মানবের আত্মা একটী মহৎ বস্তু, ইহাকে ঈশ্বর যে সকল শক্তি সামর্থ্য দিয়াছেন তাহা হরণ করা বা তাহার পথ রোধ করা অপরের পক্ষে অকর্ত্তব্য। যে সমাজ মধ্যে জন্মগত, ধনগত, বাহুবলগত, ধর্ম্মগত, বা শাসনগত প্রাধান্য ঘটিত সমাজিক বা রাজনৈতিক অধিকারের তারতম্য থাকে, যে স্থানে এই কারণে জাতিভেদ থাকে, সেখানে উক্ত উভয় সত্য ক্রমে লোকের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়; এবং সমাজ বক্ষে পরাধীনতার বীজ নিহিত হয়। যে বলে—"আমি প্রবল,তুমি দুর্ব্বল অতএব তুমি আমার দাস"—সে যখন একজন তৃতীয় প্রবলতর ব্যক্তির হস্তে পড়ে তখন বলে "ও প্রবল আমি দুর্ব্বল, অতএব আমি উহার দাস।" উভয় স্থলে তাহার একই যুক্তি, একই ভাব। সুতরাং সাম্যনীতির বিস্মৃতি এবং মানব আত্মার অধোগতিই সকল প্রকার পরধীনতার মূল। এই দুইটী স্থূল সত্য স্মরণ রাখিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা স্বাধীনতা সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসায় সমর্থ হইব। সে সকল প্রশ্ন এইঃ—স্বাধীনতা কাহাকে বলে? লোকের স্বাধীনতা প্রবৃত্তি কিরূপে বর্দ্ধিত হয়? স্বাধীনতার বিঘ্ন কি কি? জন সমাজের সহিত ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক নরনারীর সম্বন্ধ কিরূপ? জন সমাজ ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীনতাতে কতদূর হস্তার্পণ করিতে পারেন? ক্রমশঃ এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

'নব্যভারতের' প্রথম অভিনয়—সুরেন্দ্র নাথের কারাবাস! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই, এই অন্তরস্পর্শী ঘটনাটী আমাদের চক্ষের সম্মুখে ঘটিল। ইলবার্ট সাহেবের কার্য্যবিধি আইনের সংশোধন প্রস্তাব উদারচেতা লর্ড রিপণের উদারতার উৎকৃষ্ট ফল,—তাহারই পরিণাম সুরেন্দ্রের কারাবাস। আকাশে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে অল্পে অল্পে যে মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল, সহসা সেই মেঘ হইতে বজ্রপাত হইল! ইংরাজ মহলে আনন্দের সীমা নাই—ইংলিসম্যান সম্পাদক চুপি চুপি হাসিতেছেন! আর, ভারতবাসী?—সহসা বজ্রপাতে চকিত হইয়া উঠিয়াছেন,—নিদ্রিত ভারতবাসী শয্যা পরিহার করিয়াছেন। রাস্তায় যাও লোকে লোকারণ্য, বাজারে যাও লোকে লোকারণ্য, স্কুলে যাও লোকে লোকারণ্য,সভা গৃহে যাও লোকে লোকারণ্য, একি দৃশ্য? উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হতভাগ্য, পরপদ-দলিত ভারতবর্ষে আজ একি চিত্র দেখিতেছি? সকলের মুখে এক কথা—সকলের মনে এক চিন্তা—সকলের হৃদয়ে এক বেদনা—সুরেন্দ্র কারাবাসে! যাহা ভারতে আর কখনও হয় নাই—তাহা আজ হইয়াছে। আমাদের জন্ম সার্থক হইল—চক্ষু তৃপ্ত হইল—ভারতের প্রথম অভিনয় আমরা দেখিলাম। এই অভিনয় দেখিয়া ভীত হইলাম, না সুখী হইলাম? এই দৃশ্য দেখিয়া যে ভীত হইয়াছে,—সে আজও জাতীয় উন্নতির সূক্ষ্ম ইতিহাসে অভিজ্ঞ হয় নাই।

অনেকে টেলার সাহেব প্রভৃতির নজির দেখাইয়া বলিতেছেন, হাইকোর্টের ক্ষমা করা উচিত ছিল। কেহ বলিতেছেন, এপ্রকার সরাসরি বিচারের ক্ষমতা হাইকোর্টের নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, এক অভিযোগের মকদ্দমায় অন্য প্রকার অভিযোগের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে! কেহ বলিতেছেন ৩। ৪ দিনের মধ্যে মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া জজেরা ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন। এই প্রকার কত জনে কত কথা বলিতেছেন। আমরা এ সকল কথা সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহার মীমাংসা করিব না। সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ পাঠকগণ সে বিচার করিবেন; আমরা বলি, সুরেন্দ্রের কারাবাস নব্যভারতের একটী উজ্জ্বল ঘটনা। যদি সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস না হইত,—যদি সুরেন্দ্রনাথ অভিযোগে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াই মলিন মুখে ফিরিতেন,—তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ের তেজ হ্রাস হইত, উৎসাহ কমিয়া যাইত,—সুরেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে মৃত জীবন লাভ করিতেন। আর আমদের ন্যায় সম্পাদকদিগের হৃদয় কম্পিত হইতে থাকিত—ভয়ে ভয়ে এ পথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতাম;—মৃত-জীবন যাপন কবিতে পল্লীগ্রামে গমন করিতাম। তাহা হইলে ভারতের ভয়ানক অনিষ্ট হইত,—আর কাহারও পানে কেহ তাকাইত না। সেই জন্য আমরা বলি, ন্যায় হউক অন্যায় হউক, সুবিচার হউক অবিচার হউক, সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস ভারতের জীবনীশক্তি আনয়ন করিয়াছে,—আজ ভারতের

হৃদয়ে হৃদয়ে, কণ্ঠে কণ্ঠে, হস্তে হস্তে মিলনের কারণ হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাবু পঞ্চাশৎ বৎসর বেঙ্গলি পত্রে উৎসাহের প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া যাহা না করিতে পারিতেন—পঞ্চাশৎ বৎসর বক্তৃতার দ্বারা যাহা করিতে না পারিতেন, হঠাৎ এই ঘটনায় তাহা সংসিদ্ধ হইয়াছে; এজন্য সুরেন্দ্র নাথের জীবনকে গৌরবান্বিত মনে করা উচিত। এই জন্য আমরা এই ঘটনাটীকে ভারত ইতিহাসের একটী শুভ ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। আশা করি সুরেন্দ্রনাথের পরমাত্মীয় স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই একথা বলিবেন। এই ঘটনাটীতে সুরেন্দ্র-নাথ অমর হইলেন,—আমাদের জীবন সার্থক হইল,—ভারতের শিরায় শিরায় নূতন তরঙ্গ প্রবাহিত হইল—ভারত শক্তির প্রথম পরীক্ষা হইল।

জজদিগের কথা আর আমরা কি বলিব? তাঁহারা তাঁহাদেরই মহা অনিষ্ট সাধন করিলেন। ভারতকে পাশব শক্তির দ্বারা যাঁহারা ভয় দেখাইয়া পদানত রাখিতে চান, তাঁহারা আপনাদের অনিষ্টই আপনারা সাধন করেন। কোন সভ্য দেশ পাশব শক্তির দ্বারা বশীভূত থাকিতে পারে না। বশীভূত রাখিবার প্রধান মন্ত্র ভালবাসা,—সদ্ভাব,—আত্মীয়তা। এই মন্ত্রের শিষ্যদিগের অগ্রণী ব্রাইট সাহেবই ইংলণ্ডের পরম বন্ধু। জজদিগকে আমাদের শত্রু মনে করি আর না করি—তাঁহাদিগকে তাঁহাদের শত্রু মনে করি। তাঁহারা যদি ক্ষমা প্রদর্শন করিতেন, কিম্বা এখনও যদি ষ্টেটস্‌ম্যানের পরামর্শে দণ্ড প্রতিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের উপকার করিলেন, নিজেদের মহত্বই অপ্রতিহত রাখিলেন মনে করিব,—আমাদের উপকার করিলেন, একথা মনে করিব না। তাঁহারা যখন আপনাদের অনিষ্ট আপনারা করিয়াছেন, তখন তাঁহারা যে অন্যায় করিয়াছেন, একথা মূর্খরাও বলিবে। আইনতঃ অন্যায় করিয়াছেন কি না, তাহার বিচার অগৌণে হইবে। যদি অন্যায় করিয়া থাকেন, তবে তাহাদের ন্যায় স্বদেশের অনিষ্টকারিদিগের নরকেও স্থান হইবে না। বিচারকগণ কোন্ আইন অনুসারে বিচার করিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া বড় ভাল করেন নাই। কিম্বা ষ্টেট্‌স্‌-ম্যান সম্পাদক যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়া 'তাঁহাদিগের অনধিকারের চর্চ্চা' সাধারণের নিকট প্রতিপন্ন করিতেছেন, তাহার উত্তর প্রদান না করিয়াও ভাল কার্য্য করিতেছেন না। লোকেরা তাঁহাদিগের ব্যবহারে অশ্রদ্ধা করিবে, আশ্চর্য্য কি? আমাদের মধ্যে যদি কেহ এ প্রকার করিত, তবে বালকবৃন্দ তাহাকে হাতে তালি দিয়া উড়াইয়া দিত। হাইকোর্টের এই বিচারে যে লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিজ্ঞ জজেরা বলিয়াছেন, 'তাহাদের মান সম্ভ্রম বজায় রাখা ও সাধারণকে ভীত করাই এই দণ্ডবিধানের প্রধান উদ্দেশ্য।' এই দণ্ড বিধানে হাইকোর্টের ক্ষমতা ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিল কি না রহিল, ইতিহাস সে কথার বিচার করিবে; আমরা হাইকোর্টের এই প্রকার বিচারকে ইলবার্ট বিলের পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। এই ঘটনায় ভারতের যে পরম উপকার সাধিত হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। এই ঘটনায় আমরা ভীত, কুণ্ঠিত, বা দুঃখিত হই নাই। জাতীয় জীবন গঠনের এই প্রকৃত সময়ে

কোন্ ব্যক্তি ভীত বা দুঃখিত হইবেন? যদি মঙ্গল চাও, এই ঘটনা সম্মুখে রাখিয়া, ভারতবাসি, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে যত্নশীল হও, জাতীয় জীবন গঠনের জন্য বদ্ধপরিকর হও।

সুরেন্দ্রনাথের নাম এইবার ভারতবাসীর হৃদয়ে গ্রথিত হইল,—সুরেন্দ্রনাথের জন্য এইবার দেশহিতৈষি-দলে আসন নির্দ্দিষ্ট হইল। সুরেন্দ্রনাথের জন্য আজ ঘরে ঘরে লোক অশ্রুপাত করিতেছে, এ সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। আমরাও সুরেন্দ্রনাথের উপলক্ষে জাতীয় জীবনী শক্তির পরিমাণ করিতে পারিয়া আহ্লাদে আজ ভাসিতেছি। ভাসিতেছি বটে—কিন্তু মনে কিছু ক্ষোভ রহিল। প্রথমতঃ সুরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের নিকট ক্ষমা চাহিয়াও ক্ষমা পাইলেন না। ক্ষমা প্রার্থনা করায় সুরেন্দ্রনাথের মহত্ব ছিল কি না; তাহা আমরা বলিতে চাহি না, কিন্তু যদি জজেরা ক্ষমা করিতেন তবে তাহাদের মহত্বের সীমা থাকিত না। ক্ষমার ন্যায় পৃথিবীতে আর মানবের উৎকৃষ্ট ভূষণ নাই। ভূতপূর্ব্ব জজ বার্ণেস পিকক্ ফেল্ডইক সাহেবকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু গার্থ সুরেন্দ্রনাথকে ক্ষমা করিলেন না,—ক্ষমা করিয়া সুরেন্দ্রকে ও তৎসঙ্গে ভারতকে নিস্তেজ করিলেন না! দেশের প্রধানতম বিচারালয়ের এই ব্যবহারে আমরা দুঃখিত হইয়াছি। ভারতবাসী কখনও এই মর্ম্মভেদী কথা ভুলিতে পারিবে না। আর আমাদের ক্ষোভ কি? ক্ষোভ এই,—বিচারের দিন আমাদিগকে সুরেন্দ্রনাথের মলিনমুখ দেখিতে হইল! আর সুরেন্দ্রনাথ যখন কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন, তখন বরফ জল ভিন্ন তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। এ চিত্র আমাদের হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ আজ দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন দেখিয়া সুখী হইয়াছেন বটে, কিন্তু বিচারের দিন সে ভাব ছিল না। ম্যাট্‌সিনি ও কস্থুথের জীবনী আমাদের হৃদয়পটে অঙ্কিত,—তাঁহাদের কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবার সময়ের প্রফুল্ল মুখ আমাদের হৃদয়ে ভাসিতেছে। এ জগতে ধন্যবীর তাঁহারা! বরার্ট এমেটের নাম করিব কি? আমাদের এই দুঃখ রহিল, বরার্ট এমেটের মুখে মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তির সময়ে যে প্রফুল্লতা দেখিয়াছিলাম, সুরেন্দ্রনাথের মুখে কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা পাইবার সময়েও সে প্রফুল্লতা দেখিলাম না! ঐ সকল মহাত্মাদিগকে মৃত্যুভয় দেখাইয়াও অন্য দোষিদিগের নাম কেহ জানিতে পারে নাই—সুরেন্দ্রনাথ এফিডেভিটে অন্য সহযোগীর ব্যবসার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিলেন! তাঁহার হৃদয়ে সেই সময়ে কি ভাব ছিল, অন্তরদর্শী ভগবানই জানেন; এই ব্যবহারে আমরা তাহার হৃদয়ের প্রশস্ততা দেখিতে পাই নাই। এ দুঃখের কথা আজ বলি কেন? বাঙ্গালী চরিত্র হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে! দিল্লি-দরবার ও প্রতিবাদকারী সম্পাদকগণের নিমন্ত্রণ রক্ষা,—হেষ্টি সাহেবের প্রতি লোকের বিরক্তি ও তাহার পরিণাম,—হাইকোর্টের এটর্ণিগণের প্রতিজ্ঞা ও তাহার শেষ ফল—এ দরিদ্রদিগের হৃদয়ে ঘোরতর কালিমা লেপন করিয়া রাখিয়াছে। সে কালিমার রেখা প্রক্ষালিত না হইতে হইতে আবার কালিমার রেখা পড়িল! বঙ্গদেশে কেহ হিতৈষী নাম গ্রহণ না করে সেও ভাল, কিন্তু তবুও আমরা

এই প্রকার মতিশূন্য, চঞ্চল হিতৈষি দেখিতে চাই না।

আর একটী ক্ষোভ রহিল,—অধিকার আছে কি নাই তাহা না জানিয়াই ভারতবাসী সুরেন্দ্রনাথকে ক্ষমা করিতে রাজদ্বারে আবেদন করিলেন! সুরেন্দ্রনাথ দুই মাস জেলে থাকিলেই একেবারে জীবন হারাইবেন, আমরা মনে করি না; আর যদি জেলেই তাঁহার মৃত্যু হয়, সে মৃত্যুকেও আমরা মৃত্যু মনে করিতে পারি না,—যে একজনের মৃত্যু শত জনের জীবন সঞ্চারের কারণ। একজনের মৃত্যুতে যখন শত লোকের জীবনী শক্তি সঞ্চার হয়, তখন সে মৃত্যুকে ভয় করা কাপুরুষের কার্য্য! এইজন্য আমরা সুরেন্দ্র বাবুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আবশ্যকতা স্বীকার করি না। এই প্রকার সরাসরি বিচার করিতে হাইকোর্টের অধিকার আছে কি না, এই বিষয়টী মীমাংসার জন্য তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। এই সময়ে আমাদিগের সমবেত চেষ্টায় যাহাতে হাইকোর্টের অধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা হয়, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। সুরেন্দ্রবাবুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় কোন উপকার নাই—আজ উপকার পাইলেও কাল আবার চিৎকার করিতে হইবে। ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা ভুলিয়া ভারতবাসী এই অধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যত্নশীল হউন।

সুরেন্দ্রবাবুর জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে সভা হইতেছে। এই সময়ে যাঁহারা কলিকাতায় বাস করিতেছেন, তাঁহারা ভারতবাসীর হৃদয়ের শক্তির কতকটা পরিচয় পাইতেছেন। অনেক সাহেব মনে করিয়া থাকেন, ইলবার্ট বিলসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়া জাতীয় বিদ্বেষভাবকে বদ্ধমূল করিয়াছিল বলিয়াই ভারতবাসী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা এই প্রকার মনে করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সময়ের ভাব একটুও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের পূর্ব্বের সময় আর এক্ষণ নাই,—শিক্ষায় ভারত পূর্ব্ব বেশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন বেশ ধারণ করিয়াছেন। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত যুবকবৃন্দের হৃদয় অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, 'জাতীয় উন্নতির' ঘোরতর চিন্তার রেখা যুবকবৃন্দের মস্তিষ্ককে বিলোড়িত করিতেছে :—"ভারত কি এক হইবে না"—ভারতের প্রাণে প্রাণে কি মিল হইবে না? এই এক চিন্তা সকলের মনে জাজ্জ্বল্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে। পূর্ব্বের সময় থাকিলে আজ এক সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাসে ভারতের লোক এত চিন্তান্বিত হইত না। কে না জানেন, পূর্ব্বে এক জনের দুঃখে অন্য হৃদয় প্রফুল্ল হইত? ভারতের সে সময় আর নাই। তাই ভারতে এত আন্দোলন—এত উৎসাহ,—এত যত্ন!

সুরেন্দ্রবাবুর আন্দোলনে ষ্টেটসম্যান সম্পাদক ভারতের যে উপকার করিতেছেন, তাহা ব্যক্ত না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। তুলনা করিলে আর সকল আন্দোলন একদিকে, ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের লেখনী এক দিকে। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদকের লেখনী ধারণ এতদিনে সার্থক হইল! পতিত দেশের জন্য, পতিত ব্যক্তির জন্য যার হৃদয় ক্রন্দন করে, অসহায়ের স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য যে যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হয়, তাহার হৃদয়ের মহত্ত্বের পরিমাণ কে করিতে পারে? সুরেন্দ্রবাবুর কারাবাসের আজ্ঞা পাইবার দিন হইতে ষ্টেট্‌সম্যান সম্পাদক প্রাণপণে সুরেন্দ্রবাবুর হইয়া কথা বলিতেছেন। ধন্য সৎসাহস—ধন্য মহত্ত্ব—ধন্য সহৃদয়তা! ইহাকেই বলে ইংরাজের উদারতা। আইন সম্বন্ধীয় কথা লইয়া ষ্টেটস্‌ম্যান যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যদি অন্যায় না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ভারতবাসীর ষ্টেটস্‌ম্যানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আমরা আজ হৃদয়ের সহিত ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদক মহাশয়কে ভক্তি ও শ্রদ্ধার উপহার দিতেছি। আশা করি, তিনি ইংলিসম্যানের অনিষ্ট চেষ্টায় ভীত না হইয়া, সত্য পথ অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

১২৯০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গবাসীর একটী স্মরণের দিন। এই দিনে আমরা বিডনষ্ট্রীটের নূতন রঙ্গভূমির গৃহে ও তৎনিকটবর্ত্তী অনাবৃত স্থানে যেচিত্র দেখিয়াছি, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। ভারত সভার যত্নে এই দিন টাউনহলে সুরেন্দ্রবাবুর মকদ্দমা সম্বন্ধে একটী বৃহৎ সভা হইবার কথা ছিল, কিন্তু কোন অপরিহার্য্য কারণে এই সভা টাউনহল গৃহে না হইয়া বিডনষ্ট্রীটে হয়। সভায় প্রায় বিশপঁচিশ সহস্র লোক উপস্থিত ছিল। বাঙ্গালীর দুঃখে বাঙ্গালীর হৃদয় ব্যথিত হয়, বাঙ্গালীর কষ্টে বাঙ্গালীর হৃদয়ে আঘাত লাগে, ইহার দৃষ্টান্ত আমরা এবার প্রত্যক্ষ করিলাম। সরাসরি মতে এই প্রকার মকদ্দমার বিচার করিতে হাইকোর্টের অধিকার আছে কি নাই, এই সম্বন্ধে আন্দোলন করার অভিপ্রায়ে এই সভার অধিবেশন হয়। কোন সভা উপলক্ষে ইতিপূর্ব্বে কখনও আমারা এতলোকের সমাবেশ দেখি নাই। এই সভার উদ্দেশ্য সাধনার্থ ৮ই জ্যৈষ্ঠ বাবু লালমোহন ঘোষ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। সভার কার্য্যকারিতা দেখিয়া আমারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু সভার সহিত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের দলবলের কোন প্রকার যোগ নাই বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কৃষ্ণদাসবাবু এবার খুব "পেট্রিয়টের" ন্যায় কার্য্য করিলেন! তাঁহার কোন বন্ধু বলিয়াছেন—"বাঙ্গালিদিগের সহিত এই সকল আন্দোলনে যোগ দিলে সাহেবদিগের নিকট তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তি থাকে না।" একথা যদি সত্য হয় তবে কোন্ বাঙ্গালী তাঁহার এই প্রকার ব্যবহারে ব্যথিত না হইবেন? বঙ্গদেশের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া যে সাহেবের মুখ চাহিয়া চলিতে পারে, তাঁহাকে কৃষ্ণদাস না বলিয়া শ্বেতদাস বলিয়া ডাকিলে যুক্তিসঙ্গত হয়।

সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসে উদারচেতা, সহৃদয় রিপনের হৃদয় যে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। লোকে যে যাহাই বলুক না কেন, রিপন নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া বুঝিতেছেন, ইলবার্ট বিলই এই ঘটনার মূল প্রবর্ত্তক। ইলবার্ট বিলের আন্দোলন না হইলে ইংলিস্‌ম্যান সম্পাদক কখনই সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লিখিয়া হাইকোর্টের বিচারপতিদিগকে প্রলুব্ধ করিতে সক্ষম হইত না—আর হাইকোর্টের জজেরা ত্রস্তব্যস্ত হইয়া কখনই এই প্রকার অদূরদর্শীর ন্যায় কার্য্য করিত না। অনেকে

নরিস্ সাহেবকে গালাগালী করিতেছেন; তাঁহারা যদি জানিতেন যে, এই ঘটনাটী বাঙ্গালি-বিদ্বেষী সাহেবদিগের উত্তেজিত হৃদয়ের একটী সামান্য কার্য্য মাত্র, তাহা হইলে তাঁহারা কেবল নরিস্‌কে কখনই গালাগালী করিতেন না। এই সমস্ত ব্যাপারের গূঢ় তত্ত্ব রিপন বাহাদুরের নিকট কিছুই অপকাশিত নাই। তিনি সাহেবদিগের চক্ষের শূলসম হইয়াছেন; ইহাও বুঝিতে আর তাঁহার বাকী নাই;—তিনি অম্লান চিত্তে সকল প্রকার তিরস্কার ও গালাগালী মস্তক পাতিয়া লইতেছেন। তাঁহার হৃদয়ে এই সময়ে কি প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইতেছে, তাহা অন্তরদর্শী ঈশ্বরই জানে; কিন্তু যাঁহাদের মঙ্গলের জন্য তিনি দিবানিশি চিন্তা করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতি এই প্রকার অন্যায় ব্যবহারে তাঁহার হৃদয় যে ব্যথিত হইয়াছে, এবিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসিদিগের উপর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য ভার ন্যস্ত হইয়াছে। গ্লাডোষ্টোন সাহেবের কথায় যদিও আমরা আশ্বাস পাইয়াছি,—রিপনকে কর্ম্মচ্যুত করা হইবে না, কিন্তু কেবল তাহাতে রিপনের মান সম্ভ্রম থাকে না। ইংরাজ সম্প্রদায় নানা প্রকারে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে—রিপন অনুপযুক্ত শাসনকর্ত্তা। এই সময়ে ভারতবাসী যদি রিপন সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন, তবে আমরা মনে করিব, ভারত আজও রিপনের মহত্ব বুঝিতে পারে নাই। ভারত যে রিপনের শাসনে সন্তুষ্ট, একথা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। রিপন সম্বন্ধে যখন "কমন্স হাউসে" প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন আর ভারতবর্ষের উদাসীন থাকিলে চলিবে না। মান্দ্রাজের ন্যায় গ্রামে ২ নগরে ২ সভা করিয়া রিপনের রাজত্বকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে প্রার্থনা করা উচিত। ইংলণ্ডকে বুঝাইতে হইবে যে, বিশ সহস্র ইংরাজ রিপনের বিরোধী হইলেও বিশ কোটী ভারত সন্তান রিপনের পক্ষপাতী। ভারত যদি ইহা না করেন, তবে বুঝিব ভারত অকৃতজ্ঞ, রিপনও অবশেষে ম্লানমুখে স্বীকার করিবেন— অকৃতজ্ঞ ভারত এক্ষণও উন্নত-শাসনের উপযুক্ত হয় নাই; বুঝিবেন,—ভারতের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, সকলই ভস্মে ঘৃত-নিক্ষেপ হইয়াছে।

ফৌজদারিকার্য্যবিধি-আইন সংশোধনের বিল লইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে কত আন্দোলন হইয়া গেল। ভারতবর্ষে ইংলিস্‌ম্যান সম্পাদক, ব্রান্সন, কেস্উইক বংশ, নীল-কর, চা-করদিগের পালা শেষ হইতে না হইতে বিলাতে ষ্টিফেন, সিটনকার, লুইস জ্যাকসন প্রভৃতি আসরে নামিয়া কত বিদ্যাই প্রকাশ করিলেন! আর্থার হবহাউস, ফিয়ার ও মার্কবি সাহেব ইহাদিগের লেখনীকে পরাস্ত করিতে না করিতে লর্ড লিটন, ক্রানব্রুক, সালেস্‌বরী প্রভৃতি মহোদয়গণ বিলের বিরুদ্ধে লর্ড-সভায় মত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক, কিম্বারলি, লর্ড চানসলার প্রভৃতি যখন বিলের প্রতিবাদকারিদিগকে পরাস্ত করিলেন, তখন ভারতের ইংরাজ মহিলারা ক্ষেপিয়া উঠিলেন। টাইমস্ পত্রের কলিকাতাস্থ সংবাদদাতার মিথ্যা সংবাদ যখন ধরা পড়িল, তখন ইংলিসম্যান সম্পাদক

হইলেন—চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। ভারতে একদিকে শিবপ্রসাদের প্রতিমূর্ত্তি ভস্মীভূত হইতে লাগিল, অন্য দিকে ইংরাজ মহল মাতিয়া উঠিল। মেমেরা আবেদন করিল, হাইকোর্টের সাহেব জজেরা সঙ্গে সঙ্গে বিলের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিলেন, আর ইংলিসম্যান সম্পাদক সংজ্ঞাহীনের ন্যায় যাহা তাহা বলিয়া ভারতবাসিদিগকে ও তৎসঙ্গে রিপনকে গালাগালী দিতে লাগিল। পবিত্র ভারতে ফিরিঙ্গী-সাহেব দ্বারা পবিত্র রিপনের প্রতিমূর্ত্তিও ভস্মীভূত হইল! এই সকল আন্দোলনের পরিণাম কি হইল? সুরেন্দ্রনাথ কারাবাসে গেলেন! আর রিপনের মুখ মলিন হইল!! আর পরিণামে কি হইবে? —ভবিষ্যৎ উত্তর করিবে।

———

আমরা মনে করিয়াছিলাম, বঙ্গদেশেই সর্ব্বাগ্রে স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলিত হইবে; কিন্তু এতদিনে আমাদিগের সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। মান্দ্রাজে সে দিন স্বায়ত্ত-শাসনের বার্ষিক উৎসব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল; দিল্লি, মুলতানে স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল, আসামে প্রচলিত হইল, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত হইবার আয়োজন হইল, কিন্তু বঙ্গদেশ যেমন ছিলেন তেমনি রহিলেন! বঙ্গের শাসনকর্ত্তা যে নিদ্রায় সেই নিদ্রায় রহিলেন? টমসনের ব্যবহারে আমরা দিন দিন মর্ম্মাহত হইতেছি।

পাঠকগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, বহু অর্থ ব্যয়ে কলিকাতায় সেণ্ট্রাল বোর্ড সংস্থাপনের যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, ভারত-ষ্টেট সেক্রেটারী তাহা নামঞ্জুর করিয়াছেন।

ছোটলাট টমসন সাহেব ধর্ম্মের আচ্ছাদনে আবৃত হইয়া যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন আমরা তাঁহার নিকট কত আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি অল্পকালের মধ্যে সকল আশার মূল উৎপাটন করিয়াছেন। যে কয়েকটী কার্য্যের দ্বারা তাঁহাকে আমরা চিনিতে পারিয়াছি, দুঃখের সহিত নিম্নে তাহার উল্লেখ করিলাম।

১। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলিত হইল, কিন্তু তিনি আজও বাঙ্গালায় উহা প্রচলন করিতে প্রস্তুত হইলেন না।

২। দেশে সাম্য স্থাপনের উদ্দেশে যে ইলবার্ট বিল প্রণীত হইয়াছে, তিনি সেই বিলের বিরুদ্ধে মত দিয়াছেন।

৩। পাটনার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক যে হত্যাকাণ্ড হয়, তাহাতে সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি পুলিসের পক্ষ অবলম্বন করিয়া হত্যা কাণ্ডের সুবিচার হইতে দেন নাই।

৪। দার্জ্জিলিং এবং কার্শিয়াঙ্গের সাহেবদিগের সুবিধার জন্য কুলি আইন প্রণয়ন করেন। (আহ্লাদের বিষয় উপরিতন কর্ম্মচারিগণ এ আইন নামঞ্জুর করিয়াছেন।)

৫। বারম্বার অন্যায় রূপে বিহারীলাল গুপ্তের অধিকার উপেক্ষা করিয়া প্রধান মাজিষ্ট্রেটি পদে সাহেব নিযুক্ত করিয়াছেন।

৬। আবকারী বিভাগের আয় বৃদ্ধির জন্য সাধারণের সুপেয় খেজুর রসে টেক্স ধার্য্য করেন।

৭। ইডেন সাহেব সেরেস্তার অধঃস্তন কর্ম্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধির সম্বন্ধে যে অনুরোধ করেন, টমসন তহবিলে টাকা নাই বলিয়া সে অনুরোধে উপেক্ষা করেন, এদিকে অহিফেন বিভাগের সব ডেপুটীদের বেতন বৃদ্ধির জন্য এক লক্ষ ৪০ সহস্র টাকা খরচ করিলেন!

৮। বিগত বৎসর মহা অনিষ্টকারী আবকারী বিভাগের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, এ আহ্লাদ তাঁহার হৃদয়ে আর ধরে নাই!!

ব্যোম-তত্ত্ব।

এ দেশের পুরাতন দর্শনশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন পদার্থচিন্তক ঋষিরা এক সময়ে ছায়া, অন্ধকার, প্রতিবিম্ব ও ব্যোমতত্ত্ব লইয়া মহা আন্দোলন করিয়াছিলেন। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের আচার্য্যেরা প্রথমে ছায়া বা অন্ধকারকে অবস্তু বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; পশ্চাৎ মীমাংসক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা উহাকে অতি মহদ্বস্তু বলিয়া মান্য করিয়াছিলেন। নৈয়ায়িকদিগের বুদ্ধিতে তদ্দ্বয়ের বস্তুতা প্রতিভাত হয় নাই, কিন্তু মীমাংসকদিগের বুদ্ধিতে উহা দশম বস্তুরূপে স্ফুরিত হইয়াছিল। "রূপবত্ত্বাৎ ক্রিয়াবত্ত্বাৎ দ্রব্যন্তু দশমং তমঃ।" তাঁহারা বলেন যে, ছায়া ও অন্ধকারে এক প্রকার রূপ আছে। রূপ আছে বলিয়াই উহা চক্ষুর্গ্রাহ্য। ছায়াতে এক প্রকার ক্রিয়াশক্তি আছে। ক্রিয়াশক্তি আছে বলিয়াই ছায়ার আকুঞ্চন ও প্রসারণ প্রভৃতি সংসিদ্ধ হয়। যাহার ক্রিয়াশক্তি আছে সে কেন অবস্তু বা মিথ্যাপদার্থ হইবে? তমঃ বা অন্ধকারে যখন ক্রিয়াশক্তি আছে তখন সে অবশ্যই দ্রব্য—পদার্থ—তোমাদের বিনির্ণীত নব দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত—দশম দ্রব্য। তমঃ যদি দ্রব্য হয় তবে ছায়াও দ্রব্য, ছায়া যদি বস্তু হয় তবে প্রতিবিম্বও বস্তু তিনটীর কোনটীই অবস্তু নিঃস্বরূপ, বা মিথ্যা-পদার্থ নহে; সকল গুলিই বস্তুসৎ।

ছায়া ও প্রতিবিম্ব প্রায় এক জাতীয় পদার্থ। বিম্বের তারতম্য অনুসারেই প্রতিবিম্বের তরতম ঘটনা হইয়া থাকে। সেই তরতম ভাবাপন্ন প্রতিবিম্বের মধ্যে কতক গুলির নাম ছায়া এবং কতকগুলির নাম প্রতিবিম্ব।

প্রতিবিম্ব ও ছায়া যে নিঃস্বরূপ বা মিথ্যা পদার্থ নহে, এবং উহা যে ক্রিয়ার যোগ্য, তাহা বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জনৈক আর্য্যের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। পরন্তু তিনি তাহা অনুভবারূঢ় করাইতে পারেন নাই বা চেষ্টা করেন নাই। ছায়া বা প্রতিবিম্ব যে, কার্য্যে লাগে, ফটোগ্রাফ্ সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা কে বিশ্বাস করিয়াছিল? কেবল পৌরাণিক গল্প-কথায় শুনা যায় যে, ছায়ার বিধৃত হওয়ার শক্তি আছে এবং দার্শনিকদিগের কল্পনায় দেখা যায় যে, প্রতিবিম্বের আধেয় হওয়ার যোগ্যতা আছে। সুরসা সাপিনী ছায়া ধরিত। নেত্রের কৃষ্ণসারে বস্তুর প্রতিবিম্ব আবদ্ধ হয়। ফটোগ্রাফের সৃষ্টি হওয়ায় এ সকল পুরাতন কথাকে আর অলীক বলিতে পারা যায় না। এবং ছায়া ও প্রতিবিম্বকে অবস্তু, নিঃস্বরূপ বা মিথ্যা বলা যায় না। উহারা সম্পূর্ণ মিথ্যা পদার্থ হইলে কখনই ফটোগ্রাফের সৃষ্টি হইত না। ফটোগ্রাফ আবিষ্কারের পূর্ব্বে যেমন ছায়ার বস্তুত্বে বিশ্বাস ছিল না—তেমনি ইলিক্‌ট্রিসিটী অর্থাৎ

বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কারের পূর্ব্বেও উহার অস্তিত্ব কেহ জানিত না। যত দিন না যাহার স্থূলকার্য্য প্রত্যক্ষ হয়, তত দিন কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিতে চাহে না, ইহা মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। পূর্ব্বে যেমন লোকের ছায়ার বস্তুত্ব পক্ষে সংশয় ছিল, তেমনি ব্যোম বা আকাশের বস্তুত্ব পক্ষেও সংশয় ছিল;—ছিল নহে, সে সংশয় অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ব্যোম বা আকাশ কোন বস্তু নহে। "আবরণাভাবোহি আকাশঃ।" আবরণ না থাকাই আকাশ। সুতরাং আকাশ একটা সংজ্ঞা মাত্র; আকাশ একটা অভাবের ন্যায় বা খ-পুষ্পের ন্যায় নিরাত্মক, তুচ্ছ বা মিথ্যাপদার্থ। সেই জন্যই উহাকে শূন্য বলে। পরন্তু যোগিপুরুষেরা বলেন যে, আকাশ বা ব্যোম মিথ্যা বা নিরাত্মক নহে, উহা এক অদ্ভুত মহান্ পদার্থ। উহাতে এক অসীম অনন্ত শক্তি সন্নিরুদ্ধ আছে।

আকাশ যে নিরাত্মক মিথ্যা পদার্থ নহে, একথা এখন কে বিশ্বাস করিতে পারে? বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায়, ছায়ার ক্রিয়াশক্তির ন্যায় যত দিন না আমরা আকাশের কোন স্থূলধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিব বা অনুভব করিতে পারিব, তত দিন আমরা ব্যোমকে নিরাত্মক বা মিথ্যা পদার্থ বলিতে ক্ষান্ত থাকিব না। কিন্তু আমাদের অন্ততঃ একবারও মনে করা উচিত যে, আমরা ফটোগ্রাফ্ আবিষ্কারের পূর্ব্বে ছায়াকে যেরূপ ভাবিতাম, বৈদ্যুতিক শক্তি জানিবার পূর্ব্বে তাহাকে যেরূপ মনে করিতাম, সম্প্রতি ব্যোম বা আকাশকে আমরা ঠিক্ সেইরূপ মনে করিতেছি কি না। বিপুল চিন্তাশীল প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের বাক্য আমরা বুঝিতে পারিতেছি কি না। পূর্ব্বকালের চিন্তাশীল ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন যে, আকাশই সর্ব্বাদিম, জগতের মূলকারণ, সৃষ্টিশক্তির বীজ স্বরূপ। আকাশ হইতেই বায়ু প্রভৃতি ভূত নিচয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সৃষ্টবস্তু আকাশেই জন্মে, আকাশেই স্থিতি করে, আকাশেই লীন হয়। আকাশ এক মহান্ শক্তির রাশিস্বরূপ।

আমাদের পুরাতন কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বলেন, "শব্দ গুণমাকাশম্।" আকাশ বায়ুর ও শব্দের সমবায়ী কারণ। বায়ুও আকাশ হইতে জন্মিয়াছিল, শব্দও আকাশে জন্মিয়াছিল, অতএব শব্দ গুণটী আকাশের অসাধারণ ধর্ম্ম, বায়ু প্রভৃতি পরভবিক ভূতেও শব্দগুণ আছে বটে, কিন্তু তাহা উহারা আকাশের নিকটেই লাভ করিয়াছে। অতএব আকাশকে অনুভবারূঢ় করিতে হইলে বায়ু ও শব্দের প্রকৃতি অর্থাৎ আদ্যাবস্থাই আকাশ, এইরূপ ধ্যান করিতে হইবে। বৃক্ষের প্রকৃতি বা আদ্যাবস্থা যেমন বীজ; সেইরূপ শব্দের বা বায়ুর আদ্যাবস্থা বা বীজ আকাশ। বীজ না থাকিলে যেমন প্ররোহ হয় না, সেইরূপ আকাশ না থাকিলেও শব্দ হয় না। এই ত গেল কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের মত। এ বিষয়ে শ্বেত-দ্বৈপায়নেরা কি বলেন, তাহাও বলিতেছি।

আধুনিক শ্বেত-দ্বৈপায়নেরা বলেন যে, (কেবল শ্বেত-দ্বৈপায়নেরা নহে,—যাঁহারা যাঁহারা আকাশের বস্তুত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা সকলেই) আকাশ কোন বস্তু নহে; উহা কেবল সংজ্ঞামাত্র। সুতরাং উহার কোন গুণ বা ক্ষমতা নাই। তোমরা যে শব্দ গুণের কথা বলিলে তাহা বায়ুর গুণ। বায়ু হইতেই শব্দ উৎপন্ন হয়। বায়ুই কঠিন বস্তুদ্বয়ের দ্বারা অভিহত হইয়া শব্দ উৎপাদন করে। শব্দ যে বায়ু হইতেই জন্মে, আকাশ

হইতে জন্মে না,তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। যথা—উপায়ক্রমে কোন স্থান হইতে বায়ুকে নিষ্কাশিত কর। করিয়া সেই বায়ুশূন্য স্থানে দুই কঠিন বস্তু লইয়া পরস্পর দ্বারা পরস্পরে অভিঘাত কর। দেখিতে পাইবে যে, তথায় আর কোন শব্দই উৎপন্ন হইতেছে না। এতদ্রূপ বিশেষ-পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, শব্দ বায়ুর গুণ; আকাশের গুণ নহে। শব্দ আকাশের গুণ হইলে অবশ্যই তথায় শব্দ হইত। তথায় যখন শব্দ হয় না, তখন আর শব্দকে আকাশের গুণ বলিয়া বিবেচনা করিতে পার না।

শ্বেত-দ্বৈপায়নদিগের এ যুক্তি বড় মন্দ মনোরম নহে। কিন্তু কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের যুক্তির নিকট ইহা অকিঞ্চিৎকর। যথা—আকাশ বা ব্যোম ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি আকাশকে ছাড়িয়া শব্দ উৎপাদন করিতে পারিতে, বায়ু নিঃসৃত করণের ন্যায় যদি উহাকে বুজাইয়া ফেলিয়া শব্দ জন্মাইতে পারিতে, তাহা হইলে তুমি শব্দকে আকাশের গুণ না বলিয়া বায়ুর গুণ বলিতে পারিতে। পরন্তু যখন তাহা পার না, তখন তুমি কিসে জানিলে যে শব্দ আকাশের গুণ নহে? আকাশকে ছাড়িয়া শব্দ করা দূরে থাকুক, শব্দজনক বস্তুদ্বয়ের অভিঘাত সিদ্ধিও করিতে পারিবে না। যদি তুমি সত্য সত্যই "বায়ু শূন্যস্থলে শব্দ হয় না" এরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাক, তবে তোমার তদ্বিষয়ে বুঝিবার ত্রুটী আছে। সে স্থলে তোমার ইহাই বুঝা উচিত যে, সবাত স্থলে যেমন শব্দ হয়,নির্ব্বাত স্থলেও ঠিক্ সেইরূপ শব্দ হইয়াছে; পরন্তু শব্দবহনকারী বায়ুর অভাবে তাহা তোমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হওয়ায় শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ হয় নাই। কেননা, আঘাত দ্বারা আকাশে যে শব্দ জন্মে তাহা বায়ুর দ্বারা বাহিত হইয়াই শ্রবণেন্দ্রিয়ে নীত হয়। সেই নির্ব্বাত স্থলের শব্দ বায়ুর অভাবে তোমার শ্রবণেন্দ্রিয়ে উপনীত হয় নাই; সুতরাং তুমি তাহা শুনিতে পাও নাই।

অপিচ, বস্তুদ্বয় ও অভিঘাত শব্দের কিরূপ কারণ, তাহাও দেখা আবশ্যক। যুক্তির দ্বারা নির্ণয় হয় যে, বস্তুদ্বয় ও অভিঘাত তাহার নিমিত্ত কারণ মাত্র; সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ নহে। কেননা, সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণের স্বভাব এই যে, উহারা নষ্ট হইলে তৎসমবেত কার্য্যও নষ্ট হয়। ঘটের সমবায়ী কারণ মৃত্তিকা, আর তাহার অসমবায়ী কারণ কপাল কপালিকার সংযোগ। ঐ দুই কারণের অভাব হইলেই তজ্জাত ঘটের অভাব হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু বস্তুদ্বয় ও তদভিঘাত চলিয়া গেলেও তদুৎপন্ন শব্দ চলিয়া যায় না। সুতরাং তাহারা শব্দের নিমিত্ত কারণ; এবং আকাশই তাহার সমবায়ী কারণ। শব্দ যে আকাশ-সমবেত হইয়াই জন্ম লাভ করে, তৎপক্ষে সংশয় না করাই উচিত।

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের তৃতীয় যুক্তি এই যে, নিঃস্বরূপ পদার্থের প্রতিবিম্ব হয় না। যে নিজে বিম্ব নহে—যে নিজে অবস্তু—নিরাত্মক বা মিথ্যা, তাহার আবার প্রতিবিম্ব কি? সাবয়ব হউক আর নিরবয়ব হউক, সৎপদার্থ বা বস্তুসৎ হইলেই তাহার প্রতিবিম্ব থাকে। যে যেমন, তাহার তেমনিই প্রতিবিম্ব। আকাশের যখন প্রতিবিম্ব আছে, তখন সে অবশ্যই সদ্বস্তু। গভীর জল-জলাশয়ে আকাশের সহিত চন্দ্রবিম্বের প্রতিবিম্ব অনুভব করা যাইতে পারে। চন্দ্রপ্রতিবিম্ব যে জলোপরি ভাসমান না দেখাইয়া অন্তস্তলে নিমগ্নের ন্যায় দেখায়, তাহার কারণ

আর কিছু না, আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে বলিয়াই ওরূপ দেখায়। * উপরে যে আকাশ বা দূরত্ব আছে, তাহারই প্রতিবিম্ব অগ্রে পড়ে, পশ্চাৎ তদ্বক্ষে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব সংলগ্ন দেখায়। এ সকল তত্ত্ব আলোচনা করিয়া কোন্ মূঢ় না আকাশকে বস্তু বলিবে?

চতুর্থ যুক্তি এই যে, আকাশ নিরাত্মক বা অবস্তু হইলে তদুৎপন্ন বায়ুও নিরাত্মক হইত। কেননা, যে যাহা হইতে জন্মে সে তাহার ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, ইহাই নিয়ম।

পঞ্চম যুক্তি এই যে, যে জন্মে সে বস্তু। অবস্তু পদার্থের আবার জন্ম মরণ কি? আকাশ যে উৎপন্ন পদার্থ তাহা বেদে উক্ত আছে। "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" সেই পরমাত্মা রূপী পরব্রহ্ম হইতে আকাশ জন্মিয়াছে। আকাশ হইতে বায়ু জন্ম লাভ করিয়াছে। বায়ু হইতে অগ্নি বা উষ্মতার জন্ম হয়। তদ্দ্বয় হইতে জলের সৃষ্টি হয়। জলের পরিণামে মৃত্তিকার (মলা) জন্ম হয়। কেবল বেদ নহে, বেদের ন্যায় খ্রীষ্টিয়ান্দিগের পরম মান্য বাই-বল গ্রন্থেও ইহা উৎপন্ন বস্তু বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অতএব আকাশ যখন উৎপন্ন দ্রব্য, তখন উহা বস্তু বা সাত্মক পদার্থ। বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি যেমন পূর্ব্বে লোকের অজ্ঞাত ছিল, তেমনি এই আকাশ বা ব্যোম নামক মহান্ শক্তিটী এক্ষণে লৌকিক জ্ঞানের অগোচর আছে।

পূর্ব্বকালের যোগিগণ এই আকাশের আরও কয়েকটী গুণের কথা বলিয়াছেন। যথা "সর্ব্বতোগতিরব্যূহো-বিষ্টম্ভশ্চেতি চ ত্রয়ঃ। আকাশধর্ম্মা ব্যাখ্যাতা পূর্ব্বধর্ম্মবিলক্ষণাঃ।"

সর্ব্বতোগতি—ইহার অর্থ অতি মহান্। আকাশের গতি (অর্থাৎ প্রাপ্তি) নাই এরূপ কাল দেশ পাত্র কিছুই নাই। আকাশের শক্তি, সকলশক্তির মূলে, সকলদ্রব্যের গাত্রে সংলগ্ন আছে। এমন কোন বস্তু নাই, যাহা আকাশসূত্রে অনুস্যূত নহে। আত্মায় আত্মায় যে সংযোগ আছে, তাহাও আকাশশক্তির প্রভাব। যদি বল, আত্মায় আত্মায় সম্বন্ধ আছে, ইহা তোমায় কে বলিল? তাহাতে আমরা বলিব, একথা আমাদিগকে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বলিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেন, আকাশ সর্ব্বব্যাপক পূর্ণ পদার্থ; আত্মাও সর্ব্বব্যাপক পূর্ণ পদার্থ। আকাশও সর্ব্ব মূর্ত্ত্যসংযোগী; আত্মাও সর্ব্বমূর্ত্ত্যসংযোগী। সেই জন্যই মনুষ্যেরা সময়ে সময়ে দূরস্থ পুত্রের বিপদে ব্যাকুল হইয়া থাকে এবং সেই জন্যই অনেক সময়ে লোকে সত্যস্বপ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। *

* অনেক সময়ে অনেক ব্যক্তিই এই বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন সন্দেহ নাই। পৃথিবীর পরপ্রান্তে বন্ধু বান্ধব বিপন্ন হইলে পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত তদীয় বান্ধব যেন তাহা অস্ফুটভাবে জানিতে পারে বলিয়াই তাহাদের অন্তরাত্মা অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া উঠে। পশ্চাৎ সংবাদ দ্বারা তাহারা জানিতে পারে যে, তাহাদের চিন্তা মিথ্যা নহে, সত্য। অনেক সময়ে আমরা দূরস্থ বন্ধুর মৃত্যু স্বপ্ন দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছি এবং পরে তাহা সত্য হইয়াছে। কোন দূরস্থ বন্ধুকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিতে পারিলে সেই স্মর্ত্তব্য ব্যক্তির আত্মা তাহা অতি অস্পষ্টভাবে জানিতে পারে, পরন্তু তাহা বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারে না বলিয়াই সে ব্যাকুল হয়, অথবা তাহার আত্মায় অন্য কোনরূপ আঘাত লাগে। আহারের সময় দাঁত উঠিতে থাকিলে লোকে বলে তোমায় কে মনে করিতেছে। এই লৌকিক কথাকে একবারে মিথ্যা বলা যায় না। অনেক সময়েই আমরা ইহার সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছি। "টনক নড়া" নামক একটী প্রবাকথা

অব্যূহ—ইহার অর্থ নিরবয়ব। আকাশের কোন অবয়ব নাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ যোগ্য মূর্ত্তি নাই, সেই জন্যই আকাশ অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, ও অভেদ্য। আকাশ পরম মহৎ অথচ পরম লঘু।

বিষ্টম্ভ—ইহার অর্থ অতি গূঢ়। অচ্ছেদ্যতা, অভেদ্যতা, অদাহ্যতা ও অবয়বশূন্যতা, সমস্তই সেই গূঢ়তম বিষ্টম্ভ-শক্তির ফল। এবং উহার অবিকারিত্ব ও স্থিরভাবও বিষ্টম্ভ-শক্তির ফল।

আকাশ যাবদীয় ভূত ভৌতিকের আধার। এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা আকাশের আধেয় নহে। আকাশের সহিত প্রত্যেক জীবের সম্বন্ধ আছে। আত্মার সহিত আত্মার যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে, আত্মা বা জীব যদি তাহা জয় করিতে পারে, তাহা হইলে সে আকাশের কৃপায় আকাশকে যথেচ্ছ বিহার-যোগ্য করিয়া লইতে পারে। এ কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানি না, কিন্তু যোগীরা বলেন যে, "কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুত্বসমাপত্তেশ্চাকাশগমনম্।" আকাশের সহিত কায়ার অর্থাৎ মানবদেহের যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে, সংযম দ্বারা অর্থাৎ যোগবলে সেই সম্বন্ধকে আত্মাধীন করিতে পারিলে মনুষ্য আকাশতুল্য লঘু হইতে পারে এবং আকাশের উপর যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারে।

যোগিদিগের মতে আকাশের ক্ষমতা অসীম। এমন কি ব্রহ্ম ও আকাশ প্রায় তুল্য। তাঁহাদের মতে "ব্রহ্মব্যোম্নোরভেদোঽস্তি চৈতন্যং ব্রহ্মণোঽধিকম্।" ব্রহ্মের সহিত ব্যোমের প্রভেদ থাকিত না, ব্যোমে যদি চৈতন্য থাকিত। ব্রহ্মের চৈতন্যই অধিক; আর সমস্তই সমান। লোকে বলে, পরম যোগী মহাদেব সর্ব্বদা বম্ বম্ করিতেন। আমরা বলি, তিনি বম্ বম্ করিতেন না, ব্যোম ব্যোম করিতেন। ব্যোমতত্ত্ব যে কি, তাহা কেবল তিনিই বুঝিয়াছিলেন, আর কেহ বুঝে নাই। তিনি ব্যোমতত্ত্বের অদ্ভুতভাবে মগ্ন হইয়া, ব্যোমের প্রেমে উল্লসিত হইয়া, সর্ব্বদাই ব্যোম ব্যোম ধ্বনি করিতেন। শিবভক্ত মানবেরা আজি পর্য্যন্তও সেই ব্যোম ব্যোম ধ্বনির অনুকরণ করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা না বুঝিয়া ব্যোম ব্যোমকে বম্ বম্ করিয়া তুলিয়াছেন।

আমাদের দেশে আর ব্যোমতত্ত্বে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার সম্ভাবনা নাই। ইয়ুরোপে যদি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রেত-তত্ত্বের অনুশীলন হয়, তবেই তদ্দেশীয়দিগের দ্বারা এই ব্যোমতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই।

আছে, তাহাও মিথ্যা নহে। টনক নড়া আর কিছু না, অন্তর্যামীর ন্যায় আনুমানিক প্রকারে জানিতে পারা। পৃথিবীর এক প্রান্তে এক জন মরিল, অপর ব্যক্তি তাহা জানিতে পারিল। ইহা কাহার শক্তিতে সম্পন্ন হয়, তাহা অনুভব করা সুকঠিন। কিন্তু যোগীরা বলেন, আকাশ ও আত্মার সর্ব্বতোগতি আছে বলিয়াই উক্তরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। আত্মায় আত্মায় সংযোগ আছে, আকাশের সহিত আত্মার সংযোগ আছে, সেই জন্যই একের শক্তি অন্যে সংক্রামিত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও কত শত অলৌকিক ঘটনা আছে, শত সহস্র বৎসর চেষ্টা করিলেও যাহার কারণ অনুভূত হয় না, সে সমস্তই আকাশ ও আত্মার পরস্পর ব্যাপিত্ব প্রভাবেই সম্পন্ন হয়, ইহা যোগিপুরুষেরা অনুমান করিয়া থাকেন।

ক্ষেপা ভোলার চিন্তাতরঙ্গ।

মানবের স্বাধীনতা ও তাহার প্রাকৃতিক মূল।

পৃথিবীর ভাই বোন্! তোমরা এক-ধাতুর লোক, আমি অন্য প্রকৃতির মনুষ্য। আমি সাধ করিয়া একথা বলিতেছি না. কিন্তু মনের দুঃখাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়াই বলিতেছি। তোমাদের সঙ্গে আমার বনে না। তোমাদের সঙ্গে আমার প্রাণের, রুচির এবং কার্য্যের মিল নাই।

তোমরা যাহা করিতে লজ্জা এবং ঘৃণা বোধ কর, আমি তাহা সর্ব্বদা করি। আমি সারা দিন পথে পথে ফিরি, হাসি, নাচি, গাই আবার কাঁদি। চক্ষুর জলধারা শুকাইতে না শুকাইতে পুনরায় হি—হি—করিয়া অট্ট অট্ট হাসিতে থাকি। ক্ষণকাল পরেই হু—হু—করিয়া কান্দিয়া উঠি। সময় নাই—দিন নাই, রাত্রি নাই—যখন ইচ্ছা হয় শুই, যখন ইচ্ছা হয় ছুটি, যখন ইচ্ছা হয় বসি। যখন তোমরা বিষণ্ণ. তোমাদের চারি দিকে আপদ বিপদের মেঘ ও ঝটিকার অন্ধকার ঘেরিয়া থাকে, যখন তোমরা ভাবনা চিন্তায় আকুল হইয়া অস্পষ্ট স্বরে রোদন বা চীৎকার কর, তখন হয়ত আমি আমার চিত্ত-নদীর ভাব-বানোচ্ছ্সিত বক্ষে,আনন্দলহরীর বিভঙ্গে সুখরবির বাল কিরণলীলা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আবিলার্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে সুন্দর আমোদ উপভোগ করি। আবার যখন তোমারা আমোদে উন্মত্ত, তখন হয়ত আমি বিষণ্ণ মুখে, মলিন মনে এক পার্শ্বে বসিয়া ভাবি। কি ভাবি?—মাথা, মুণ্ড, ছাই। কিন্তু যখন মনে ভাবনার আবেগ হয়, তখন তাহা থামাইতে পারি না। তোমরা নীরোগী. সুস্থচিত্ত। তোমাদের ধৈর্য্য আছে, তোমাদের সাধনার বল আছে, তোমরা ভাবের স্রোতে ভাস না; কিন্তু ভাবকে আপনার অভিপ্সিত পথে চালাও। তোমাদের মনে বা প্রাণে কোন আবেগ উপস্থিত হইলে থামাইতে জান, থামাইতে পার। আমি ক্ষেপা পাগল, আমি কিছুই করিতে পারি না। এ উন্মত্ত প্রাণ বিহঙ্গ এক বার ছুটিলে আর ফেরেনা, আর ধরা দেয় না! যখন ক্লান্তি বোধ হয়, পাখা দুটীই অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন হয় তো কিছু কাল হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে, ক্ষণ কাল পরে আবার ধাবিত হয়। এ জীবন রাজ্যে সেই অনিবার্য্য গতির প্রতিরোধকারী বা নিবারক নাই; থাকিলে তোমরা আমায় পাগল বলিবে কেন?

আমি রোগের পাগল নই, কিন্তু ভাবের পাগল। ভাবে আমার সুখ, ভাবনায় আমার আনন্দ। আমি ভাবিতে পাইলে বাঁচি, না ভাবিলে মরি। তোমাদের সুখ দুঃখের কারণ সংসারের ক্ষতিলাভ। আমার সুখ দুঃখের উৎপাদক ভাব এবং ভাবের অভাব। এই জন্য তোমাদের আনন্দ ও নিরানন্দের সঙ্গে আমার আনন্দ নিরানন্দের সম্বন্ধ নাই। দেখ—এই সুন্দর বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রি।

পশ্চাতে বিস্তীর্ণ মাঠ, সম্মুখে উচ্ছ্বসিতবক্ষ নির্ম্মল-সলিলা ভাগীরথী মৃদু কলরবে ধাবিতা। মন্দ মলয় বায়ুর শীতল প্রবাহে শরীর মন জুড়াইতেছে। জাহ্নবীর বক্ষে বিক্ষিপ্ত সুবর্ণ কুসুম রাশিবৎ জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত লহরীমালা ক্রীড়া করিতেছে। চারিদিক নীরব,নিস্তব্ধ। এরূপ সুস্নিগ্ধ সময়ে এইরূপ স্থানে বসিলে তোমাদের মনে কত আনন্দ হইত, কত সুখ হইত, কিন্তু আমার দগ্ধ চক্ষু ইহার কোন শোভার দিকেই আকৃষ্ট হইতেছে না। আমি এখন কি করিতেছি?—ভাবিতেছি। এই নির্জ্জন প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য এবং মাধুর্য্যপূর্ণ সুন্দর ক্রোড়ে বসিলে তোমাদের মনে কেমন শান্তি এবং আহ্লাদ-মিশ্রিত সুখদ ভাবের উদয় হইত, কিন্তু আমার প্রাণে চিন্তার শত ঢেউ উঠিয়া—শতমুখে ছুটিতেছে। আমি সুধুই ভাবিতেছি। ভাবিতেছি—তোমাদের বিষয়,আর আমার বিষয়। আজ সাধারণ মনুষ্যের বিষয়ই আমার ভাবনার বিষয়।

আমি কখনও মানবচরিত্রের উপরিভাগ দেখিয়াই পরিতুষ্ট হইতেছি, আবার কখনও বা তাহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতেছি। মানুষেরা সাধারণ কথায় সচরাচর বলিয়া থাকে—"দেবচরিত্র আর রাজচরিত্র বুঝা ভার।" কিন্তু আমি বলি, মানব মাত্রেরই চরিত্রের গভীর মর্ম্ম ভেদ করা দুরবগাহ বুদ্ধি বৃত্তির কার্য্য। ষড়ঋতু-সমন্বিত ধরণীর বক্ষ এবং প্রাবৃটের গগণচ্ছবির অপেক্ষাও মনুষ্য স্বভাবের বৈচিত্র্য সমধিক। এই স্থানে কিছুকাল বেদব্যাসকে বিশ্রাম দিয়া, আমি তোমাদিগকে আর একটী মনের কথা বলিয়া লইতে ইচ্ছা করিয়াছি। সে কথাটী এই—আমি পাগল। ভাবেরই হই, আর রোগেরই হই, মোদ্দা কথা,—আমি ক্ষেপা পাগল। এ পৃথিবীতে পাগলের সমান দুঃখী জীব দ্বিতীয় নাই। মানুষ আর সকলের জন্য আপনার হৃদয় ভাণ্ডারে নানা ভাব ও স্বাভাবিক সুপ্রবৃত্তিরূপ রত্ন রাজির মধ্যে একটী সহানুভূতির রত্নও ফেলিয়া রাখে, কেবল পাগলের জন্য নয়। পাগলের দুঃখে দুঃখিত হয় পাগলের তপ্ত অশ্রুতে অশ্রু ঢালে,পাগলের চীৎকারে যোগ দেয়, পাগলের সঙ্গে মিলিয়া হাসে, নাচে, কান্দে, গায় অথবা উন্মত্তের দগ্ধ প্রাণের দুইটী কথা কাণ পাতিয়া শোনে এমন একটী লোকও এ জগতে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। পাগলের আছে কে? পাগলের আছে—ক্ষেপাইবার লোক,—হাতে তালি দিবার লোক। পাগলের বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, ভাই নাই, বোন নাই, মা নাই, বাপ নাই,—পাগলের আছে তাড়াইবার লোক, পাগলের আছে অবহেলা করিবার লোক। পাগলের কথার নাম প্রলাপ। সে প্রলাপের মূল্য নাই। পাগলের চিন্তার নাম অযথা চিন্তা, তাহাকে সকলে ঘৃণা করে। উদার পাঠক! তুমি কি এই ক্ষেপাভোলার চিন্তায় যোগ দিতে প্রস্তুত হইবে? আমি জানি এ জগতে "বৃদ্ধের সাত খুন মাপ হয়," কিন্তু অজাত-শ্মশ্রুর প্রতিই মানুষের অজাত ক্রোধ। কেন?—তাহার কারণ বলিতে পারি না। সৌভাগ্যবশতঃ—আমি পাগল হইলেও জাতশ্মশ্রু এবং পরিণত বয়স্ক। আমার এই বিস্তীর্ণ জীবন ক্ষেত্রে, পাপেচ্ছা এবং বিবেকের মহাযুদ্ধ,পুণ্যের পবিত্র প্রভাব, পাপ পিশাচের ভীষণাধিপত্য, প্রেমের দুর্জ্জয় তরঙ্গোচ্ছ্বাস, বিরহের বিশ্বগ্রাসী দাবদাহ, শোক ও দুঃখ দারিদ্র্যের মহাঝটিকা এবং পার্থিব সম্পদ ও বিলাসের ক্ষণস্থায়ী রৌদ্রালোক,

বারম্বার এই সকলেরই অভিনয় সংঘটিত হইয়াছে। তাহাতে আবার নূতন কথা শুনিতে এবং নূতন চিন্তা জানিতে হইলে পাগলের সঙ্গে না মিশিলে সুখ হয় না। আর একটী কথা, ভস্মের নিম্নেও মুক্তাফল লুক্কায়িত থাকিতে পারে। পাগলের প্রলাপেও সেইরূপ সত্য নিহিত থাকিতে পারে। এই জন্যই পাঠক! আমি তোমাকে আমার এই উন্মত্ত চিন্তার তরঙ্গে একবার সাঁতার দিতে অনুরোধ করিতেছি। তবে একথা সত্য যে, যাহারা সমুদ্র গর্ভে রত্ন অনুসন্ধান করে, তাহারা প্রতি ডুবেই মাণিক পায় না। এক ডুবে না পাইলেই অধীর হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেয় না, কিন্তু ধৈর্য্য ধরিয়া আবার ডুব দেয়, —আবরে ডুব দেয়। শেষ কথা, আমি পাগল, আমাকে ক্ষমা করিবে। কি বলিতে কি বলি. অনেক সময় কিছুই আমার ঠিক থাকে না। কখনও ধান ভানিতে শিবের গীত গাই, কখনও বা শিব গড়িতে বানর গড়ি।

এ পৃথিবীতে মানুষকে প্রবীণ এবং গম্ভীর করিতে বয়স যেমন একটী মহৌষধ, বিবাহও তেমনই আর একটী। বিবাহকে ঔষধ না বলিয়া স্পর্শমণি বলিলেই ভাল হয়। কারণ ইহার সংস্পর্শে অনেক সময়ে মাটী এবং ভস্ম পর্য্যন্ত তপ্ত কাঞ্চনে পরিণত হয়। কার্ত্তিক দাদা, দেবত্রাসনাশী, অবিনাশী পরাক্রমাধার সুরবীর হইয়াও সর্ব্বত্র অগ্রাহ্য, কিন্তু গণেশ দাদা অলসের প্রতিমূর্ত্তি হইলেও শুঁড় ঝুলাইয়া পেট ফুলাইয়া সকল দেবতার অগ্রে পূজা পান। কার্ত্তিকের কি নাই এবং গণেশের কি আছে? গণেশের কলাবউ আছে, কার্ত্তিকের তাহা নাই, কলাবউ ডাল পালা মেলিয়া গণেশের গৃহের শোভাবর্দ্ধন করেন। কার্ত্তিকের গৃহ শূন্য, তিনি গৃহলক্ষ্মীর অভাবে লক্ষ্মীছাড়া। ভাই সকল! আমি পাগল হইলেও কার্ত্তিক নই। আবার গণেশ বলিয়াও কলাবউ এর নাকমলা খাইতে খাইতে আমার নাসিকা এখনও শুঁড়ে পরিণত হয় নাই। তাহার প্রমাণের জন্য আমার নাক মাপিয়া দেখিতে পার। দেখিবে তোমাদের নাকের চেয়ে আমার নাক এক ইঞ্চির বড় অধিক লম্বা হয় নাই। তবে কিনা বিবাহ করিলে অন্ততঃ অল্প করিয়া দুই চারিটা নাকমলা কাণমলা খাইতে হয়। ইহা দাম্পত্য প্রণয়ের দস্তুর এবং লক্ষণ। উহা ব্যতীত উক্ত প্রণয়ের গৌরব থাকে না। এই প্রণয় গৌরব রক্ষা করিতে গিয়াই এ গরিবের নাসিকাটী কিঞ্চিদধিক এক ইঞ্চি মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি যে গণেশ, আমার যে কলাবউ আছে, এই নাসিকা বৃদ্ধিই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এখন হইতে তোমরা একটী সঙ্কেত শিখিলে, যদি কাহারও বিবাহের বিষয়ে তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে তাহার নাক কাণ মাপিলেই জানিতে পাইবে, সে জাল করিয়াছে কি না।

আমার শ্রীমতী কলাবউএর নাম সুকেশী। তিনি যে আমায় ভাল বাসেন তাহার প্রধান এবং প্রথম পরিচয় এই যে, আমার বাড়ীতে নূতন খ্যাংড়া আসিলেই সর্ব্বাগ্রে ম্লান কল্পে তাহার অর্দ্ধেক শলাকা আমার ললাটে না ভাঙ্গিয়া ভুলক্রমেও তিনি তদ্দারা উঠান বা ঘর ঝাট দেন না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীবিষ্ণু! আমি কি বলিতেছিলাম না? বলিতেছিলাম—মানবচরিত্র অতি অদ্ভুত এবং বৈচিত্র্যময়। সমুদ্র গর্ভের অনেক বৃত্তান্ত মনুষ্য জ্ঞানের নিকট প্রকাশিত হই-

য়াছে, আকাশেরও অনেক তত্ত্ব মানুষ জানিতে পারিয়াছে, কিন্তু অতি পুরাকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত মানব হৃদয়ের যাহা কিছু আবিষ্কার করিতে মনুষ্য সক্ষম হইয়াছে, তুলনা অনুসারে বিচার করিতে গেলে, তাহা অতি সামান্য। নদী এবং সিন্ধু বক্ষে যত তরঙ্গ উঠে, যত তরঙ্গ বিলীন হয়, তাহা গনিলেও গণা যাইতে পারে, কিন্তু মনুষ্য-হৃদয়ের তরঙ্গ কেহ গণিতে পারে না। এই অনন্ত বিস্তৃত বিশাল অর্ণবে, কি সুদিনে, কি দুর্দ্দিনে, প্রতিনিয়তকাল ব্যাপিয়া, নিমিষে অগণ্য তরঙ্গ উঠিতেছে, অগণ্য তরঙ্গ ছুটিতেছে; অসংখ্য উর্ম্মিমালা প্রতি মুহূর্ত্তে মিলাইয়া যাইতেছে। যে সকল তরঙ্গ মিলাইয়া যায় তাহারাও সামান্য নদী বা সিন্ধু তরঙ্গের ন্যায় চিরদিনের তরে নির্ব্বাপিত হয় না, কিন্তু বিস্মৃতির আঁধারে নাচিতে থাকে;—যাই ঘটনা প্রদীপধারিণীর ন্যায় তাহার উপরে স্মৃতির আলোক বিস্তার করিয়া দেয়, অমনি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

অনেকে মনে করিতে পারে, পর্ব্বত পাদ-মূলবেষ্টিনী তরঙ্গিনী-বক্ষের অবস্থা অতি অদ্ভুত। কারণ শৈলবাহিনী স্রোতস্বিনী তটে দণ্ডায়মান হইলে অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন-ময় দৃশ্যাবলী প্রতিনিয়ত দর্শকের চক্ষুর বিস্ময় সম্পাদন করিতে থাকে। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যে স্থানে, যে নদীগর্ভে জলের লেশমাত্র ছিল না, যেখান হইতে কেবল উত্তপ্ত বালুকারাশি উড়িয়া উড়িয়া পথিক জনের দুঃসহ কষ্ট বৃদ্ধি করিতেছিল, পর মুহূর্ত্তেই দেখ—সেই স্থানে, সেই তটিনী-গর্ভে প্রবল বান উপস্থিত। যে গিরিনদী মৃত ও শুষ্কাবস্থায় পড়িয়াছিল, জল-তরঙ্গের পরিবর্ত্তে পরিদর্শনকারীর মনে বিষম উদাস ও কঠোর বৈরাগ্যের তরঙ্গ ঢালিয়া দিতেছিল, সে যে কেবল সঞ্জীবিত হইল, তাহাতে যে কেবল স্রোত বহিয়া, জল আসিয়া তাহার দৃশ্যের রমণীয় পরিবর্ত্তন সংঘটন করিল, তাহা নহে, কিন্তু তাহার প্রতাপ, তাহার দর্প ও শক্তি, তাহার আবর্ত্ত, তাহার তরঙ্গ বিস্ফারিত উচ্ছ্বাস, দুর্জ্জয় এবং দুর্ব্বার হইল। তাহার বক্ষ যে কেবল স্ফীত হইল, তাহা নহে, কিন্তু তাহার উদ্বেলিত তরঙ্গ ও স্রোত-বেগোদ্দীপ্ত বারিরাশি দুই তীর ভাসাইয়া দূরবর্ত্তী প্রান্তর এবং গ্রাম পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া ফেলিল। কিন্তু যে প্রবীনচিত্ত, সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি একবার মাত্র বিশেষ রূপে মানব হৃদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট গিরিনদীর এই অদ্ভুত কাণ্ড কলাপ কিছুই নয়। এই জন্যই বলি, মনুষ্য হৃদয়—মানবচরিত্র বৈচিত্র্য এবং বিশেষত্বময়।

একথা যথার্থ যে, বস্তু মাত্রেরই বিশেষত্ব প্রকৃতিপ্রসূত অবশ্যম্ভাবী সুমহৎ ফল। বস্তু-দ্বয়ের মধ্যে প্রকৃতিগতই হউক কিম্বা আকৃতি-গতই হউক, অথবা কার্য্য বা প্রয়োজনগতই হউক, কিছু না কিছু প্রভেদ অর্থাৎ বিশেষত্ব না থাকিলে, একের সত্তা সত্ত্বে অপরের সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজনীয় অথবা অর্থশূন্য হইত। এই বিশেষত্বেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য এবং স্রষ্টার সুমহৎ জ্ঞান ও মহিমার প্রকৃষ্ট বিকাশ। এই জন্যই দেখিতে পাই—অণুতে অণুতে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, শিশিরবিন্দুটীতে শিশিরবিন্দুটীতে, সমুদ্রে সমুদ্রে, তৃণে তৃণে, তরুতে তরুতে, শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, জীবে জীবে, বিশ্বের সর্ব্বত্র সাম্যে বৈষম্য, সাধারণ্যে বিশেষত্ব গূঢ়নিহিত। এই সাম্যে বৈষম্য এবং সাধারণ্যে বিশেষত্বের নিগূঢ় মিশ্রণেই জগতের এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য, এত আনন্দজনক ভাব। সুধুই লাল, সুধুই

নীল বা সুধুই হরিত বর্ণে শোভার সৃষ্টি হয় না। লালের পাশে নীলের রেখাটী এবং হলুদের পাশে সবুজের রেখাটী টান, অমনি সৌন্দর্য্য বা শোভা বিকশিত হইয়া হাসিতে থাকিবে। গোলাপস্তুপের উপরে একটী গোলাপ ফুটিলে সে কাহার চক্ষু আকর্ষণ করিতে পারিত? কিন্তু যখন শ্যামল পল্লব স্তবকের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র যুইএর কলিকা, ফুটি ফুটি বলিতে বলিতেই যেন ধীরে ধীরে, সলজ্জভাবে ফুটিতে থাকে, তখন তাহাতে কাহার চক্ষুর আনন্দ বিধান করে না? এক-দ্রব্যে বিপণী সাজাইলে তাহার সৌন্দর্য্য ফুটিয়াও যেন ফোটেনা, কিন্তু তোমার প্রকৃতিগত শোভাগ্রাহিনী শক্তি সহকারে যেই তুমি যথারীতিতে যথাস্থানে বিভিন্ন বস্তু-সকল সজ্জিত করিলে, অমনি দেখ—সেই নির্ব্বাপিত শোভা সৌন্দর্য্য যেন কোন অলক্ষিত জ্যোতির আভাসে জাগিয়া উঠিল। এই সৌন্দর্য্যময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে স্থানে পদনিক্ষেপ করিবে সেই স্থানেই দেখিবে, এই মহা নিয়তিরচক্র সর্ব্বত্র ঘুরিতেছে। বারি-বিন্দু হইতে জল-রাশি, অণু হইতে গিরিবর, তৃণ গাছটী হইতে আমেরিকার "প্রেরি" নামক মহা কাননবক্ষ এবং ক্ষুদ্র প্রান্তর হইতে সুবিশাল গগণবক্ষ পর্য্যন্ত যেখানে, যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে সেখানেই দেখিবে এই একই নিয়ম বিশ্ব সৌন্দর্য্যের প্রাণের প্রাণ। দেখিবে—সর্ব্বত্রই সাম্যে বৈষম্য, সাধারণ্যে বিশেষত্ব বিরাজ করিয়া শোভা সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে তৎপর রহিয়াছে।

ঐ দেখ—বৈশাখী পূর্ণিমার বিস্তীর্ণ সুনীল আকাশের নিম্নে, নিস্তব্ধ নিশার রজতরঞ্জিত ক্রোড়ে, প্রফুল্ল পুষ্প কানন বক্ষে, অযুত সহস্র মালতি, যুই, বেল এবং গোলাপ কুসুম বিকশিত,—দূর হইতে দেখ, দেখিবে উহা যেন সাম্যময়; দেখিবে—যেন একটী ফুলময় সাগরে নাতিমন্দ বায়ু তাড়নে কোটি তরঙ্গ উঠিয়া নাচিয়া মিলাইতেছে। উদ্যানের মধ্যে যাও, প্রতিপুষ্পের নিকটে যাও, আবার দেখিবে সেই সাম্যের মধ্যে বৈষম্যের অদ্ভুত ক্রীড়া। ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র কলিকা বা উদ্‌গমনোন্মুখ মুকুলটী হইতে বড় বড় ফুলগুলি পর্য্যন্ত যাহার কাছে যাইবে সেই যেন বলিবে "আমায় দেখ"। তুমিও দেখিবে, এত ফুলের মধ্যেও বস্তুতঃই তাহাতে কিছু দেখিবার আছে, কিছু বিশেষত্ব আছে। এই জন্যই একটী ফুল দেখিয়া যে আনন্দ পাই; দশটী এবং দশ সহস্রটী দেখিয়া তদপেক্ষা ক্রমান্বয়ে অধিকতর এবং অধিকতম আনন্দ প্রাপ্ত হই। এই প্রকার বৈষম্য বা বিশেষত্ব হইতেই যেমন পুষ্পোদ্যানের সৌন্দর্য্য শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়া নানারূপ নূতন ২ ভাবে নূতন নূতন দৃশ্যে দর্শকের মনে অপার আনন্দ বিস্তার করিতেছে। বিশ্ব পদার্থ সমূহগত বিশেষত্বও এইরূপ জগন্নি-হিত অনির্ব্বচনীয়, পরমাদ্ভুত, অসীম শোভা সৌন্দর্য্যের বিকাশক। যখন দেখিতেছি, সাম্যে বৈষম্য অথবা সাধারণ্যে বিশেষ ভাবের অভাবে, জগৎ সৌন্দর্য্যবিহীন, দুঃখ-ময়, মরুতুল্য দর্শনদুঃসহ হইয়া উঠে, তখন এইরূপ বৈষম্য বা বিশেষত্বের অপযশঃ ঘোষণা করিতে কে প্রস্তুত হইবে? কিন্তু মানব চরিত্রে যখন এই বিষমতা বা বিশেষ ভাবের অদ্ভুত ক্রীড়া দেখিতে পাই, তখন অন্ততঃ কিছু ক্ষণের জন্য কর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় অবাক্ ও হতবুদ্ধি না হইয়া আপনার স্থানে দৃঢ় রূপে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হই না।

মানব প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যের বিশেষ বিস্ময়-জনকতা এই যে,একই সিদ্ধি লাভ জন্য মনুষ্যের প্রতি ব্যক্তির সাধনা পৃথক্ রীতির। মনে কর এজগতে স্থূলতঃ এবং সাধারণতঃ প্রায় সকল মানুষই একটী পদার্থের জন্য ব্যাকুল। সে পদার্থটী কি? এ প্রশ্নের অবিসম্বাদিত উত্তর—"সুখ"। অধিকাংশ বা সমস্ত মানবের সমস্ত কার্য্যের তাৎপর্য্যার্থ—এই সুখ। এই সুখরূপ সিদ্ধির জন্য মনুষ্য মাত্রের সাধনার বিষয় চিন্তা কর, দেখিবে—তদ্‌গত পার্থক্য অদ্ভুত।

ঐ দেখ—রামু হাসিতে হাসিতে আমোদের তরঙ্গে সন্তরণ মধ্যে সুখরত্ন অনুসন্ধান করিতেছে। সে জানে আমোদে সুখ, হাসিতে সুখ। আবার শ্যামুর প্রাণ আজ আবেগ ভারে ভারাক্রান্ত। সে রামুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চক্ষুর জলে গণ্ড ও বক্ষ ভাসাইয়া কান্দিতেছে। আজ তাহার সুখ কান্নাতে, হাসিতে নয়। অনাথিনী হরিদাসীকে কেহ কখনও হাসিতে দেখে নাই। কিন্তু যখনই তাহার সহিত দেখা হয়, দেখিতে পাই সে কান্দিতেছে। জিজ্ঞাসা কর—"ও গো হরিদাসি! তুমি দিন নাই, রাত নাই, সকল সময়েই কান্দ কেন?" হরিদাসীর কণ্ঠ হইতে গদ্ গদ স্বরে এই উত্তর শুনিবে, "আমার প্রাণ যাহা চায় তাহা ঐ চক্ষুজলের সাগরে বহুদিন হইতে ডুবিয়া গিয়াছে। তুমি কি সেই অভীপ্সিত ধন আমায় তুলিয়া-দিতে পার?" তুমি দুঃখিনী হরিদাসীর একথার উত্তরে কি বলিবে? বলিতে বাধ্য হইবে—"আমি দুর্ব্বল মানব শিশু, ভগ্নি—দুঃখিনী, অনাথিনী হরিদাসি। তুমি কি জান না যে, আমার এ ক্ষুদ্র হাত দুই খানি ঐ স্থানেই বান্ধা পড়িয়াছে। উহার ওপারে তোমারও হাত নাই, আমারও নাই।" তখন হরিদাসী বলিবে—"তবে আমি কান্দি? কান্নাতেই আমার প্রাণের সুখ এবং শান্তি। তবে আমি কান্দি।"

শ্রীবিষ্ণু! অনেক সময় গিয়েছে, আজ আর না,আর একদিন বলিব। ক্ষেপাভোলা।

ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ।

ধর্ম্ম সমাজের জীবনী ও নীতি সমাজের রক্ষাবন্ধনী স্বরূপ। জনসমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য এক দিকে ধর্ম্মবল, অপরদিকে নৈতিক জ্ঞানের সমান আবশ্যকতা। অথচ সামাজিকদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই এই ধর্ম্ম ও নীতির প্রকৃত তথ্য অবগত নহে।

ধর্ম্ম মানব জাতির এক সার্ব্বভৌম অবলম্বন। প্রকৃতির অভ্যন্তরে নিহিত বিশ্বাসই ধর্ম্মের প্রাণ। সেই বিশ্বাস প্রতি মানবাত্মার স্বাভাবিক লক্ষণ, উহা উপার্জ্জিত নহে। জীবশরীরের পাকস্থালীর পক্ষে ক্ষুধা যেরূপ, মানবাত্মার পক্ষে বিশ্বাস তদ্রূপ। মনুষ্যের সেই বিশ্বাস, শিক্ষা, সহবাস, অবস্থা ও আত্ম-কর্ম্মানুযায়ী হইয়া গঠিত হয়। এই জন্যই ধর্ম্মজগতে বিশ্বাসের এরূপ অভাবনীয় বৈচিত্র্য। শত শত জ্ঞানী লোক যাঁহাকে

মুক্তি ও সম্পত্তির প্রতিভূ মনে করিয়া অবিসম্বাদিত চিত্তে তাঁহার পদে লুণ্ঠিত হন, শত শত বিচক্ষণ পুরুষ হয়তো, তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্য দূর থাকুক, তাঁহার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করেন না!

কোন গ্রন্থ বিশেষের লিখিত উপদেশ বা অনুষ্ঠান পরম্পরা অথবা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অবলম্বিত ও প্রচারিত মত সমূহই ধর্ম্ম, এ কথা বলিলে ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব লোপ পায়, ধর্ম্ম সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হয়। কতকগুলি মনুষ্যের হৃদয় মনের গঠনের সাম্য, অবস্থা, শিক্ষা, চিন্তা, ও কার্য্য প্রণালীর অপেক্ষাকৃত সমতা বশতঃই সেই সকল লোকের বিশ্বাস অনেকাংশে একরূপ হইয়া গঠিত হয়; সুতরাং তাহাদিগের মতেরও অনেকটা একতা হইয়া পড়ে। এইরূপে এক মতাবলম্বী মনুষ্যসমিতিকে এক সম্প্রদায় বলে। অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন কোন কোন মনুষ্য যখন কোন অভিনব সম্প্রদায় গঠন বা সম্প্রদায় মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা অপর সাধারণের হিতার্থে আপনাদিগের বিশ্বাস ও তদনুযায়ী উপদেশ ও অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করেন, এইরূপে ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের উৎপত্তি হয়। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই অপৌরুষেয় আপ্তবাক্য নহে। এই কল্পিতকথার কোন যুক্তি নাই, আর ইহার প্রমাণও থাকিতে পারে না। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উক্তি অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ বলিয়াই কোন মত গ্রহণীয় ও কোন অনুষ্ঠান পালনীয় মনেকরা অজ্ঞ ও অসারের কার্য্য। আপনার অন্তরের বিশ্বাস যাহাতে প্রবৃত্ত করে, তাহাই প্রকৃতধর্ম্ম।

হিতাহিত বিচার জ্ঞানের লক্ষ্য। কি সত্য কি মিথ্যা, কি ধ্রুব কি অধ্রুব, কি মঙ্গলপ্রদ, আর কিইবা অমঙ্গলের হেতু, এইরূপ বিচারের জন্য অনুসন্ধিৎসা এবং এতদ্রূপ বিচারক্ষমতাকে জ্ঞান বলে, মানবের এই জ্ঞানই জনসমাজে সমস্ত নীতিসূত্রের প্রবর্ত্তক। শরীরের পক্ষে যেমন চরণ ও চক্ষু, আত্মার পক্ষে তেমনই বিশ্বাস ও জ্ঞান দুইটী উপাদান। চলচ্ছক্তি রহিত হইলে যেমন প্রখর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিও পাদমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না, সেইরূপ দৃষ্টিশক্তিবিহীন অন্ধও স্বকীয় পদবলে চলিতে অক্ষম, চেষ্টা করিলেও বিপথগামী হইয়া বিভ্রাটগ্রস্ত হয়। অতএব বিশ্বাস ও জ্ঞানে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাই বিহিত। যাহার আত্মা বিশ্বাসবলে বঞ্চিত, প্রখর জ্ঞানের আধার হইলেও সে ব্যক্তি জীবনপথে পঙ্গু ও অসহায়। তদীয় জ্ঞান গরিমা চিন্তাতে, জল্পনাতে এবং কার্য্যকালে কাপুরুষতায় পরিসমাপ্ত হয়। এই জন্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক পুরুষপুঙ্গব গম্ভীরস্বরে স্বীয় শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন—"যদি সর্ষপ কণিকাপ্রমাণ বিশ্বাসও তোমাদিগের থাকে, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতকে বলিও "সরিয়া যাও, পর্ব্বত আপনি সরিয়া যাইবে।" যিনি এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাক্য সপ্রমাণ হইয়াছে। দ্বাদশজন মাত্র সহায় লইয়া বিশ্বাসের বলে সেই সামান্য সূত্রধরপুত্র যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, আজ সমগ্র ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাংশে তাহার প্রভাব বিস্তারিত হইয়া পরিয়াছে! পক্ষান্তরে আবার জ্ঞানবিহীন বিশ্বাস নানা বিড়ম্বনার আকর স্বরূপ। যাহার অন্তর জ্বলন্ত বিশ্বাসপূর্ণ, অথবা যাহার জ্ঞান শক্তি যথোচিত পরিস্ফুট নহে, তাহার বিশ্বাস কুসংস্কারের অন্ধতায় পরিণত হয়। ধর্ম্মতত্ত্ববিহীন

দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তি যেরূপ নীচ ও নিষ্ঠুর কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সেই ব্যক্তি ততোধিক অস্বাভাবিক কার্য্য সাধনকরিতে পারে, সন্দেহ নাই। সে একদিকে অতিদুর্ব্বল ও অপরদিকে গুরুতর অত্যাচারী হইয়া সমাজের কণ্টক স্বরূপ হইতে পারে। জ্ঞানীর পক্ষে যেমন সংশয় ও স্বার্থই দুর্ব্বলতা ও স্বেচ্ছাচারের কারণ, তাহারও পক্ষে কুসংস্কারজনিত অমূলক বিভীষিকা ও অজ্ঞানতাজনিত অহঙ্কার ও অনুদারতা,সেইরূপ ভীরুতা ও অত্যাচারের হেতু হইয়া পড়ে।

এই বিশ্বাস-মূলক, ধর্ম্মমূলক নীতির অনুশাসনভিন্ন যেমন প্রতিব্যক্তির জীবনের সৌন্দর্য্য থাকে না, সমাজের পক্ষেও তদ্রূপ। সমাজবন্ধন, সমাজের স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য ধর্ম্ম এবং নীতির যুগপৎ সমান আবশ্যকতা। পৃথিবীর ইতিহাসে একথার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। জীবশরীর সজীব ও সচেতন রাখিবার জন্য যেমন অম্লযান বায়ুর প্রয়োজন, সমাজকে বলবান করিতে হইলেও সেইরূপ ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রয়োজন। কস্মিন কালেও কোন চার্ব্বাকশিষ্য কোন সমাজশক্তির সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ধর্ম্ম বলের অভাবে জগতে কোন জাতিই কখনও সৌভাগ্যের মুখ দেখিতে পায় নাই। প্রাচীন ভারতে যে কিছু উন্নতি হইয়াছিল, তাহা ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছিল। পুরাতন ভারতের শিল্প,সাহিত্য ও রাজনীতি যেন ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মের পরিচর্য্যার উপকরণ স্বরূপ। ধর্ম্মবলে একবার রোমনগরী সভ্য জগতের শাসন ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কথিত আছে, রোম রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী যুদ্ধ দেবতা মার্সদেবের মন্দিরের দ্বার সমস্ত রোম রাজত্বকালমধ্যে তিন বার মাত্র অবরুদ্ধ হইয়াছিল। অবশ্য প্রতিপাল্য প্রথা এইরূপ ছিল,—যখনই রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে কোন প্রতিবেশী রাজ্যের সংগ্রাম উপস্থিত হইত, তখনই যুদ্ধ দেবতার মন্দিরের দ্বার দিবা রাত্রি উদ্ঘাটিত থাকিত। পুরাতন কালে সেই রণকণ্ডূয়ন সময়ে অতিবিস্তীর্ণ রোম রাজ্যে এবম্বিধ সংগ্রামের আর শেষ ছিল না। রোমের বীর পুরুষেরা রণমদে মত্ত হইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, এদিকে রোম রাজ্যের নগরে নগরে, ঘরে ঘরে দেব পূজার মহা ধুম উপস্থিত হইত। সভ্য জগতের শির্ষ স্থানে অবস্থিত থাকিয়া আমেরিকাও এখন ধর্ম্মচর্চ্চা ও পারলৌকিক গবেষণায় নিমগ্ন। ঈশ্বর, পরলোক ও মনুষ্যত্ব, এই তিনে বিশ্বাসের নাম ধর্ম্মবল। এই তিনে বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে, এইরূপ বিশ্বাস সাধন করিতে না পারিলে, মনুষ্যের আশা, উৎসাহ, অধ্যবসায়, সৎসাহস, আত্মনিগ্রহ, ভক্তি, বিনয় ও ভ্রাতৃভাব স্থির ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত হয় না। এ সকল গুণের অভাবে জাতীয় অভ্যুদয় বা সামাজিক মঙ্গল সম্ভবে কি? যাহাদের ভ্রাতৃভাব নাই, তাহাদের কি একতাসম্ভব? যাহাদের সৎসাহস নাই, তাহাদের আবার বীরত্ব কি? আর যাহার আশা অনন্ত নহে,তাহার অধ্যবসায় কি সকল অবস্থায় স্থির থাকিতে পারে? বাস্তব ধর্ম্মবলই বীরত্ব, ধর্ম্ম বলের নামই মনুষ্যত্ব। সতী যখন হাস্য মুখে জলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন করিয়া, সেই আলোকে স্বর্গপথের অন্ধকার বিদূরিত করিতেন, তখন ধর্ম্মবিশ্বাসই সেই মহাযজ্ঞে অবলার কোমল হৃদয়ে অলৌকিক দৈববল প্রদান করিত। স্বদেশহিতৈষী বীরপুরুষ পারলৌকিক অনন্ত সুখের আশা-

সেই পুত্র কলত্রের মায়া পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহের প্রতিমূর্ত্তিরূপে শত্রুর অস্ত্রকে উপেক্ষা করেন। দক্ষিণ মহাসমুদ্রের ভীষণ বক্ষে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জে যে সকল নরমাংসাশী মনুষ্য আজিও মনুষ্যজীবন লইয়া ভয়ানক রাক্ষসী বৃত্তির অভিনয় করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচারের জন্য আর কে যত্ন করিয়াছে? যাঁহাদিগের হৃদয় ঐশীশক্তি প্রভাবে পরিপূর্ণ যাহাদিগের অন্তর ধর্ম্মভাব ও স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাবে অলঙ্কৃত, তাঁহারাই সভ্যসমাজ স্বচ্ছলতা ও গৃহ সুখলালসা পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল রাক্ষসদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

ধর্ম্মের শাসন ভিন্ন চরিত্র গঠন করে কে? বিশ্বাস ভিন্ন চরিত্রে বল দেয় কে? যাহারা ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া, সামাজিক উন্নতি ও রাজনৈতিক স্বচ্ছলতা ঘটাইতে চাহে, তাহারা কি ভ্রান্ত! মনুষ্য স্বভাবই ধর্ম্ম। ঈশ্বর, পরকাল ও ভ্রাতৃভাব-সাধন সেই স্বভাবের লক্ষণ। স্বভাবকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা স্বার্থকে ভিত্তি করিয়া সামাজিক উন্নতি করিতে প্রয়াসী, তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। যত কেন বক্তৃতা কর না, যত কেন প্রবন্ধ লেখ না,—তুমি বাগ্মী হইতে পার, তুমি সাহিত্য সমাজে সুচতুর লেখক বলিয়া স্থূলদর্শীদিগের নিকট অগণ্য ধন্যবাদ লাভ করিতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে যতক্ষণ ধর্ম্মালোচনায় উদাসীন দেখিব, ধর্ম্মানুষ্ঠানে উদাসীন দেখিব, তোমার মধ্যে ভক্তি, বিনয় ও ভ্রাতৃভাব না দেখিব, ততদিন তোমাকে হয় ভ্রান্ত, না হয় বণিক্‌-বৃত্তিধারী মুখ-সর্ব্বস্ব আচার্য্য মনে করিব। যদি কাহারও অর্থসম্পত্তি, উচ্চপদ অথবা খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভকরিতে ইচ্ছা থাকে, তাহার পক্ষে এরূপ বাঙ্ময়ী দেশ-হিতৈষিতা শোভনীয় বটে, কিন্তু সমাজের প্রকৃত উপকার কেবল কথায় হয় না। স্বয়ং পৃষ্ঠপাদ থাকিয়া, অপরের স্কন্ধে রাখিয়া অস্ত্রচালনার চেষ্টা করিতে যে লজ্জিত হয় না, তাহার পক্ষে নির্ব্বাক্‌ থাকাই ভাল। সমাজের হিতসাধন করিতে হইলে স্বয়ং চরিত্রের বল সাধন করিতে হয়, অপরের চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে হয়। এইরূপ করিয়া সকলে মিলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, নচেৎ নহে। এইরূপে সমাজের চরিত্রবল-সাধন ধর্ম্মবিশ্বাস সাপেক্ষ। যুক্তিতর্ক দ্বারা মানুষকে সৎকার্য্য ও সৎ সাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত করা যায় না। এককথায় যাঁহারা সংশয় করেন, তাঁহারা বিখ্যাত ফরাশী বিপ্লবের ইতিবৃত্ত পাঠ করিবেন। ইদানীন্তন কালে এমন ভয়ানক সমাজ বিপ্লব—এরূপ ভীষণতম অগ্নিকাণ্ড আর সংঘটিত হয় নাই। যদি তৎকালে ফরাশী জাতির চরিত্রে বল থাকিত, তাহা হইলে বিপ্লবকারীগণ যে সকল মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহারা ফ্রান্স ভূমিকে স্বর্গভূমি করিয়া, জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিত। "স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের" নাম করিয়া তখন তাহারা কি ভয়ানক লোমহর্ষণ কাণ্ড পরম্পরাই না সম্পাদন করিয়াছিল!! কিন্তু এত করিয়াও কিছুতেই কিছু হইল না; ফরাশী জাতি আবার যথেচ্ছাচার শাসনদণ্ড শিরোধার্য্য করিল। যখন মানবশক্তির আগ্নেয়গিরিরূপী নেপোলিয়ান বোনাপার্টি কার্য্যক্ষেত্রে অভিনয় আরম্ভ করিলেন, তখন চরিত্রহীন বিপ্লব-

কারীগণ, চরিত্রহীন ফরাশী জাতিকে লইয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইল এবং পরিণামে সঙ্কটে পড়িয়া বিষাক্ত বৃশ্চিকদলবৎ পরস্পরের অঙ্গ দংশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিল; এবং এইরূপে আপনাদিগের ধর্ম্মহীনতা ও পাষণ্ডতার প্রায়শ্চিত্ত করিল। এইরূপ হইবার কারণ আর কিছুই নহে। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত পৌরোহিত্য ও কুসংস্কারের অবতাররূপ-ধর্ম্মের অনুচিত পুরাতন শাসনে ফরাশী জাতি অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্মহীন, বিশ্বাসবিহীন হইয়া একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অষ্টদশ শতাব্দীর নিদারুণ বিপ্লব ও তদানুষঙ্গিক সেই স্বেচ্ছাচার, সেই দীর্ঘকালের অন্ধ-ভক্তি-প্রধান ধর্ম্মের অনুচিত শাসনের প্রতিফল স্বরূপ। অথচ প্রকৃত ধর্ম্মবল, প্রকৃত চরিত্রবল না থাকাতেই ফরাশীজাতি এরূপ গুরুতর আন্দোলন করিয়া, এরূপ অর্থ, সামর্থ্য ও সুখ্যাতির শ্রাদ্ধ করিয়া, পরিণামে এরূপ বিভ্রাট ভোগ করিয়াছিল।

এদিকে জ্ঞানহীন বিশ্বাস মহা অনর্থের মূল। অন্ধ বিশ্বাসের উপর সংস্থাপিত ধর্ম্মও সমাজকে ধ্বংশ করিবার হেতু হইয়া উঠে। জ্ঞানালোচনার অভাবে ধর্ম্ম কুসংস্কার ও কুকর্ম্মের আকর হইয়া পড়ে। তাদৃশ ধর্ম্ম যে সমাজের পালনীয়, সে সমাজের অচিরে দুর্গতি হয়। ইউরোপের যে সকল দেশে পুরাতন ধর্ম্ম পুস্তক ও ধর্ম্মগুরু পোপের একাধিপত্য দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল, সেই সকল দেশে যথেচ্ছাচার, অত্যাচার ও বহুবিধ দুর্নীতি প্রবেশ করিয়া পরিণামে তাহাদিগকে বিষম বিভ্রাটগ্রস্ত করিয়াছে, কাহাকেও বা একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। জ্ঞানালোচনাবিহীন ভ্রান্তধর্ম্মসংস্কারের অনুরোধে সপ্তদশ সংখ্যক অশ্বারোহীর ভয়ে একদিন বঙ্গের সিংহাসন বিজাতীয় লোকের করতলস্থ হইয়াছিল! প্রাতঃস্মরণীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্যের অনুচরদিগের যে বর্ত্তমান সময়ে শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে, জ্ঞানালোচনার অভাবই তাহার কারণ। এক দিন মহম্মদের শিষ্যেরা যে জলন্ত অনলের মত এক হস্তে অসি, অপর হস্তে কোরাণ লইয়া ব্রহ্মপুত্র হইতে আটল্যাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত ছাইয়া পড়িয়াছিল, জ্ঞানালোচনার অভাবেই ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সেই সমস্ত পরাক্রম নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। জ্ঞান চর্চ্চার অভাবে বিশ্বাস কুসংস্কার, অনুদারতা ও কল্পনা-প্রিয়তায় পরিণত হয়। কুসংস্কার মনুষ্যকে অন্ধ করে, অনুদারতা মনুষ্যকে নিষ্ঠুর করে, এবং কল্পনা-প্রিয়তায় মনুষ্যের চরিত্রকে শিথিল করে। অজ্ঞতা, অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচারই যে প্রত্যেক সমাজের পতনের কারণ, তাহার আর সন্দেহ কি?

বর্ত্তমান সময়ে এই বঙ্গ সমাজ যেরূপ হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে, বঙ্গ সমাজ যেরূপ অজ্ঞতা, অনুদারতা, স্বেচ্ছাচার, স্বার্থপরতা ও কাপুরুষতার প্রেতভূমি হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে এ সমাজকে উদ্ধার করিতে হইলে,—এই সমাজের পঙ্কোদ্ধার করিতে হইলে, ধর্ম্ম ও নীতির উৎকর্ষ সাধন একান্ত আবশ্যক। এ দেশে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়া জ্ঞান চর্চ্চার কথঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম শিক্ষার কোনরূপ সুব্যবস্থা হয় নাই। বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা স্বেচ্ছাচার, কপটতা এবং ইতর সুখ লালসাতে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। যতকাল এ দেশের ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে, এবং শিক্ষা মন্দিরে জ্ঞান ধর্ম্ম এক যোগে সাধিত না হইবে, ততকাল সৌভাগ্য-সূর্য্যের মুখাবলোকন করিবার আশা বঙ্গবাসীর পক্ষে সত্য সত্যই সুদূর পরাহত থাকিবে।

জীবন-গতি নির্ণয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মানবের কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন

"The life of individual man is of a mixed nature. In part he submits to the free-will impulses of himself and others, in part he is under the inexorable dominion of law. &c." J. W. Draper.

চিন্তাশীল পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যমাত্রেরই যখন স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চলন করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে, তখন মনুষ্য জীবনের কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতি বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বোধ হইতে পারে যে, মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা তাহার নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তদ্‌বহির্ভূত বিষয় কর্ত্তৃক পরিশাসিত কি পরিচালিত হইতে পারে না। মনুষ্যের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন বলিয়া স্বীকার করিলে, সেই প্রকৃতিসম্ভূত কার্য্যকলাপও যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। অতএব মনুষ্য প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিশাসিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয় কিনা, তাহাই অগ্রে অবধারণ করা উচিত বোধ হইতেছে। নিয়ম শব্দের অর্থ কি, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে একবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিয়ম কোন ক্রিয়া উৎপাদক বা গতি পরিচালক শক্তি নহে।* ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, বস্তু বা প্রাণীর যে প্রকৃতিগত গতির প্রণালীবদ্ধ ভাবান্তর, তাহাকেই নিয়ম বলা যায়। নিয়ম, বস্তু বা প্রাণীর প্রকৃতিগত গতির ভাবান্তর উৎপাদন করে না, কিন্তু এই ভাবান্তর যে প্রণালী-অনুসারে উৎপন্ন হয়, সেই প্রণালীই নিয়ম। জগৎবিখ্যাত ফরাশী দার্শনিক অগস্ত কমৎ কারণ শব্দ পরিত্যাগ করিয়া তৎস্থানে নিয়ম শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বস্তু বা প্রাণীর আদি কারণ মনুষ্য, বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর। এক বস্তু যে প্রণালীতে রূপান্তরিত হইলে তদ্দারা অপর বস্তুর উৎপত্তি হয়, সেই প্রণালীকে নিয়ম বলা যায়। সূর্য্যের তাপ প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র জল বাস্পরূপে পরিণত হয়; বাস্প শীতল বায়ু-স্পর্শে ঘনীভূত হইলে মেঘের আকার ধারণ করে; মেঘ আবার সমধিক শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া বৃষ্টি রূপে বর্ষিত হয়। এই স্থলে সূর্য্যোত্তাপ এবং সমুদ্র জল এই উভয়ের সম্মিলন হইলে, তাহাদিগের সম্মিলিত প্রকৃতির ভাবান্তর প্রাপ্তি নিবন্ধন মেঘের উৎপত্তি হয়। এই অবস্থান্তর-প্রাপ্তি-রূপ কার্য্যটীকে নিয়ম নামে অভিহিত করা যায়। পরন্তু মেঘের উৎপত্তি

* "A Law of nature is not an Agent nor an Agency by which substances are coerced, but an abstract expression of the series of positions which substances assume under given conditions. It is not a creator of the phenomena, it is their *formula*. It does not precede and coerce them, it is evolved by them." Lewis' Problem of life and mind.

সর্ব্বকালে এবং সকল অবস্থাতে বাষ্প হইতেই হইতেছে, সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি যে, মেঘোৎপত্তি সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম রহিয়াছে। পক্ষান্তরে যদি কখন সমুদ্র বাষ্প হইতে, কখন বৃক্ষ হইতে, বা কখন পুষ্প হইতে মেঘ উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে মেঘোৎপত্তি সম্বন্ধে যে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম রহিয়াছে, তাহা বলা যাইত না। সেইরূপ মনুষ্যমনের ইচ্ছা যদি কোন নির্দ্দিষ্ট মানসিক ভাবসম্ভূত না হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্যের কার্য্যকলাপ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন নহে। কিন্তু মানসিক শক্তিগুলি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যের মন প্রথমতঃ কোন না কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে, পরে সেই জ্ঞান তাহার মনেতে একটী ভাব বা আবেগ আনয়ন করে, এবং সেই ভাব বা আবেগদ্বারা পরিচালিত হইয়া মনুষ্য তদ্‌ভাবানুযায়ী কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং জ্ঞান, ভাব বা আবেগ উৎপাদন করে, এবং ভাব বা আবেগ আবার ইচ্ছা উৎপাদনকরে। কোন বালকের সম্মুখে একটী পুতুল উপস্থিত করিলে বালক প্রথমতঃ তাহা দর্শন করিয়া উহার বিদ্যমানতা জ্ঞাত হয় এবং এই বিদ্যমানতা সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাহার মনোমধ্যে ঐ পুতুলটীর প্রতি ভালবাসার ভাব আনয়ন করে, কিম্বা পুতুল বিকটাকৃতি হইলে ভয়ের ভাব আনয়ন করে। তৎপরে বালকের মনে ভালবাসার ভাব আনীত হইলে, বালক সেই পুতুল ধরিবার জন্য উদ্যোগ করে, অথবা ভয়ের ভাব আনীত হইলে, বালক তৎক্ষণাৎ পুতুলের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। এই প্রকারে মনে যদ্রূপ জ্ঞান জন্মে, তদনুরূপ ভাবের উৎপত্তি হয়, এবং সেই ভাবানুরূপ ইচ্ছার সঞ্চার হয়। সুতরাং মানব মনের কোন ইচ্ছাই বিনা কারণে উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু যখন মানব মনের ইচ্ছাই জীবনের গতি নিরূপণ করে, (অর্থাৎ মানুষ যে কোন কার্য্য করে তাহা কোন ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত হইয়া করে) এবং সেই ইচ্ছা আবার যখন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে মানবমনে সঞ্চারিত হয়, তখন মানুষের কার্য্যকলাপ যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সমুদ্র জল হইতে যেমন বাষ্পের উৎপত্তি হয়, এবং বাষ্প হইতে যেমন মেঘের উৎপত্তি হয়, সেই প্রকার জ্ঞান ভাব উৎপাদন করে এবং ভাব হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। সুতরাং জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা ইহাদিগের মধ্যেও কার্য্যকারণশৃঙ্খল বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্ঞানের বিভিন্নতানুসারে ভাব বা আবেগের বিভিন্নতা হয় এবং ভাব বা আবেগের বিভিন্নতানুসারে ইচ্ছার বিভিন্নতা হইয়া থাকে। মনুষ্য মন মৃত্তিকাস্বরূপ, জ্ঞান বীজস্বরূপ। মৃত্তিকাতে বীজ রোপন করিলে যেমন বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ বিষয় বিশেষের জ্ঞান মনোমধ্যে প্রবেশ করিলে ভাব বা আবেগের উৎপত্তি হয় এবং বৃক্ষ হইতে যেমন ফলের উৎপত্তি হয়, তেমন ভাব হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়।

কিন্তু সকল প্রকারের মৃত্তিকা বা সকল স্থানের মৃত্তিকা একরূপ নহে। কোন মৃত্তিকাতে বীজ সতেজে অঙ্কুরিত হয়, কোন মৃত্তিকাতে বীজ একেবারেই অঙ্কুরিত হয় না, কোন মৃত্তিকাতে বীজ নিস্তেজ বৃক্ষ উৎপাদন করে। সেই প্রকার মানসিক শক্তির তারতম্যানুসারে বিষয় বিশেষের জ্ঞানসম্ভূত

ভাব বা আবেগের তারতম্য ঘটিয়া থাকে, এবং ভাব বা আবেগের প্রকৃতিগত গতি অনুসারে ইচ্ছার সঞ্চার হয়। এবং সেই ইচ্ছাই মানুষকে কোন না কোন কার্য্যে পরিচালন করিয়া জীবনের গতি অবধারিত করে।

কিন্তু বহির্জ্জগতের পদার্থ, ঘটনা বা অবস্থার সংঘর্ষণসম্ভূত জ্ঞান, আবেগ ও ইচ্ছা প্রভৃতির মধ্যে যেরূপ নিয়মিত কার্য্য কারণ শৃঙ্খল দৃষ্ট হয়, সেই প্রকার মনের আভ্যন্তরিক শক্তিসমুত্থিত বিশ্বাস এবং ভাব সম্ভূত কার্য্যকলাপ ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন।

বহির্জ্জগতস্থ পদার্থ, ঘটনা কি অবস্থার সংস্পর্শ ব্যতীত মনের আভ্যন্তরিক শক্তিনিচয় সঞ্চালিত বা প্রস্ফুটিত হয় না। বহির্জ্জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা মনের অন্যান্য নিশ্চেষ্ট শক্তিকে উত্তেজনপূর্ব্বক মনোমধ্যে কতকগুলি অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বিষয়সম্বন্ধে বিশ্বাস, চিন্তা এবং ভাব আনয়ন করে। অর্থাৎ বহির্জ্জগতের যে সকল বস্তু, ঘটনা বা অবস্থা ইন্দ্রিয়গোচর, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলে মন প্রকৃতিগত নিয়মানুসারে তাহার মূল কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু আমাদিগের কোন বিষয়ের মূল কারণ অথবা শেষ কারণ জানিবার শক্তি নাই। পদার্থ, ঘটনা বা অবস্থার মূল কারণ কিম্বা শেষ কারণ মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। সূর্য্যোত্তাপসংস্পর্শে কেন সমুদ্রজল বাষ্পরূপে পরিণত হইল, তাহা আমরা জানিতে পারি না। কিন্তু মানব মন এই সকল অজ্ঞেয় বিষয় জানিতে না পারিলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করে না।

আমরা কোন বিষয়ের মূলকারণ জানিতে পারিনা; অথচ তাহার কোন মূল কারণ আছে বলিয়া বিশ্বাস করি। মনের আভ্যন্তরিক শক্তি-সমুত্থিত এই প্রকার অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্বসম্বন্ধীয় বিশ্বাস বা জ্ঞান মনোমধ্যে কতকগুলি অপরিস্ফুট ভাব উৎপাদন করে। *

দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ ২ এই প্রকার বিশ্বাস বা জ্ঞানকে আত্মপ্রত্যয় (intuition) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে ভিন্ন২ দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতের মিল নাই।

জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মানদার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট্ আত্মপ্রত্যয়কে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান (Transcendental knowledge or innate ideas) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু মানবের মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত কোন জ্ঞান আছে কিনা তাহা নির্ণয় করা এপুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। ঈদৃশ প্রশ্নসমূহ কেবল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য। আমরা কেবল এই মাত্র সপ্রমাণ করিতে চেষ্টাকরিব যে, মানব মন যেরূপ বহির্জ্জগতের পদার্থ, ঘটনা বা অবস্থাসম্ভূতজ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হইয়া এক প্রকার গতি লাভকরে, সেইরূপ মনের আভ্যন্তরিক শক্তিসমুত্থিত বিশ্বাস ও আবেগদ্বারা পরিচালিত হইয়া গত্যন্তর প্রাপ্ত হইতে পারে। মানব মনের এই আভ্যন্তরিক শক্তিই তত্ত্বজ্ঞানের মূল কারণ।

* "Beside that *definite* consciousness of which logic formulates the laws, there is also an indefinite consciousness which cannot be formulated. Besides complete thought and beside the thought, which though incomplete, admit of completion, there are thoughts which it is imposible to complete and yet which are still real in the sense that they are normal affections of intellect." Herbert Spencer.

মানব মন শুদ্ধ যে কেবল দৃষ্ট এবং অনুভবনীয় (perceptible) বিষয়ই উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা নহে, কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং অননুভবনীয় বিষয় সম্বন্ধেও মন এক প্রকার অপরিস্ফুট ভাব ধারণা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ *। এই অননুভবনীয় বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞান অনুভবনীয় বিষয় সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ন্যায় মানব মনে আবেগ ও ইচ্ছা উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট জ্ঞান মনুষ্যমনে স্বতন্ত্র২ প্রকৃতি-বিশিষ্ট আবেগ উৎপাদন করে, এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আবেগ আবার বিভিন্ন প্রকারের ইচ্ছা উৎপাদন করিয়া মানবজীবনে ভিন্ন ২ প্রকার গতি প্রদানকরে। এতৎ পূর্ব্বঅধ্যায়ে মনুষ্যমনে যে আভ্যন্তরিক শক্তির বর্ত্তমানতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই আভ্যন্তরিক শক্তি আর কিছুই নহে—শুদ্ধ মানব মনের অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং অননুভবনীয় বিষয় ধারণা করিবার শক্তি মাত্র। দৃষ্ট এবং অনুভবনীয় বিষয় উপলব্ধি করিবার শক্তি এবং অদৃষ্ট ও অননুভবনীয় বিষয় ধারণা করিবার শক্তি, ইহারাউভয়ে মনুষ্যমনে সম্মিলিত হইয়া কি প্রকার কার্য্য করে এবং কিরূপেই বা পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাই অগ্রে সমালোচনা করা কর্ত্তব্য।

বাল্যকালে মানবজীবন কেবল বহির্জগতস্থ পদার্থ, ঘটনা বা অবস্থাসমুত্থিত শক্তিদ্বারা পরিশাসিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ মনুষ্য জন্মকালে যে সকল অবস্থা, ঘটনা বা পদার্থ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, সেই সকল অবস্থা, ঘটনা বা পদার্থসমুত্থিত শক্তি দ্বারা তাহার মনের প্রথমগতি নিরূপিত হয়। এইরূপে বাল্যাবস্থায় মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস। তাহার মনোমধ্যে এসময়ে কোন স্বাধীন ইচ্ছার সঞ্চার হইতে পারে না। একটী শিশুর মন এক মুহূর্ত্তে একটী সুন্দর পুতুল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহা পাইবার জন্য প্রলুব্ধ হয়, অপর মুহূর্ত্তে ক্ষুধাবোধদ্বারা পরিচালিত হইয়া আহার করিবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করে। কিন্তু এদিকে ক্রমশঃ যেমন তাহার মানসিক শক্তি গুলি পরিপক্কতা লাভ করে, তেমন অপর দিকে বহির্জগতস্থ পদার্থ, ঘটনা ও অবস্থাসমুত্থিত শক্তি গুলির পরাক্রম ক্রমে ২ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর মন একটী সুন্দর পুতুলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহা পাইবার জন্য প্রলুব্ধ হয়; কিন্তু ষোড়শবর্ষীয় বালক পুতুলের প্রলোভনকে অনায়াসে পরাস্ত করিতে পারে। আবার ষোড়শবর্ষীয় বালকের মন বেশভূষার প্রলোভনদ্বারা যদ্রূপ পরিচালিত হয়, চত্বারিংশ বর্ষীয় বৃদ্ধের মন তদ্রূপ হয় না। এই প্রকারে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে২ মনুষ্য বহির্জগতস্থ এক প্রকার পদার্থ, অবস্থা বা ঘটনাসমুত্থিত শক্তিকে পরাস্ত করিয়া অন্যবিধ পদার্থ, অবস্থা বা ঘটনাদ্বারা পরিশাসিত হইতে থাকে। সুতরাং তাহার কার্য্যকলাপ, তাহার তাৎকালিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। প্রত্যেক নরনারী যেরূপ পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং বাল্যকালে

* "Throughout all future time, as now, the human mind may occupy itself not only with ascertained phenomena and their relations, but also with unascertained something which phenomena and their relation imply. Hence if knowledge cannot monopolize consciousness—if it must always continue possible for the mind to dwell upon that which transcends knowledge, then their can never cease to be a place for something of the nature of religion." Herbert Spencer.

যে প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহার জীবন-গতি যে তদনুরূপ প্রকৃতি লাভ করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বহির্জগতের ভিন্ন২ পদার্থ, ঘটনা ও অবস্থার সংঘর্ষণে মন যতই অধিক পরিমাণে গত্যন্তর প্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই তাহার আভ্যন্তরিক শক্তির তেজ পরিবর্দ্ধিত হয়।

ব্যায়ামদ্বারা যদ্রূপ শারীরিক শক্তির পরিপক্কতা জন্মে, সেই প্রকার মানসিক শক্তি-নিচয়, বিবিধ বিষয়ের চিন্তা ও অধ্যয়নদ্বারা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়। কোন জড়পদার্থের উপর এক একটী নূতন বলপ্রয়োগ করিলে যেমন তাহার গত্যন্তর হইতে থাকে, সেই প্রকার এক একটী বিষয়সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা চিন্তাদ্বারা মানবমনেও একটী নূতনগতি প্রদত্ত হয়। বৃহৎ মনুষ্যসমাজমধ্যে নিম্ন-শ্রেণীস্থ শ্রমোপজীবিদিগকে অধিক চিন্তা করিতে হয় না, এই জন্য যে সকল রাজ-পুরুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিকাদি নানা বিষয়ে সতত চিন্তা করিতে হয়, তাহাদিগের মন উক্ত শ্রমোপজীবিগণের মন অপেক্ষা অধিকতর গত্যন্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রাজমন্ত্রী গ্লাড্‌ষ্টোনের মন অসংখ্য বিষয়ের চিন্তাদ্বারা সর্ব্বদা বিলোড়িত হইয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গত্যন্তর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু একটী কৃষকের মন কেবল জীবিকানির্ব্বাহের উপায় চিন্তনে নিবিষ্ট থাকাতে একমাত্র নির্দ্দিষ্টগতি অবলম্বন করে।

কিন্তু এতৎ পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বহির্জগতস্থ পদার্থ, ঘটনা কিম্বা অবস্থাসম্ভূত যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি মানব মনে ইচ্ছা উৎপাদন করে, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রবৃত্তি-উত্তেজক এবং কতকগুলি নিবৃত্তি-প্রদায়ক। সুতরাং কোন বস্তু যেরূপ দুইটী বিপরীত আকর্ষণদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মানব মন প্রবৃত্তি-উত্তেজক ও নিবৃত্তি-প্রদায়ক এই দুইটী বিরুদ্ধশক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইলে সাম্যভাবা-পন্ন হয়। সাম্যভাবাপন্ন মন তখন কেবল আভ্যন্তরিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া তত্বজ্ঞান-কক্ষে পরিভ্রমণ করে। অজ্ঞেয় এবং অননুভবনীয় বিষয় সম্বন্ধে মনুষ্যমনে যে অপরিস্ফুট জ্ঞানের বিদ্যমানতা, তাহাকেই মনের আভ্যন্তরিক শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং এই আভ্যন্তরিক শক্তি আবার তত্বজ্ঞানের মূলকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই অপরিস্ফুট ভাব সাম্যাবস্থাপন্ন মনুষ্য মনে যে গতি প্রদান করে, সেই গতিই জীবনের স্বাভাবিক গতি এবং এই অপরি-স্ফুট ভাব সাম্যাবস্থাপন্ন মানবমনকে যে পথে পরিচালিত করে, সেই পথই মানব মনের স্বাভাবিক কক্ষ। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিষয় বিশেষের কামনাদ্বারা যখন মানব মন পরিচালিত হয়, তখন কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় কোন এক দিকেই ধাবিত হইতে থাকে। অতএব এক্ষণে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, বহির্জগতস্থ বিষয়ের কামনাবিশিষ্ট মন, বহি-র্জগতস্থ নিবৃত্তিপ্রদায়ক শক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, সাম্যভাব প্রাপ্তান্তর আভ্যন্তরিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইলে স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়। সুতরাং মনুষ্য মন যখন বিষয় বিশেষের কামনা পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় আভ্যন্তরিক শক্তিদ্বারা পরিচা-লিত হয়, তখন আপন স্বাধীন ইচ্ছা সংরক্ষণ পূর্ব্বক স্বাভাবিক গতি প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বিষয় বিশেষের কামনাদ্বারা পরিচালিত হইলে তাহার স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালন করিবার কোন শক্তি থাকে না; এবং তখন মনুষ্য

সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস। এইস্থলে মানবজীবনে দুই প্রকার গতির বিদ্যমানতা প্রতীয়মান হইতেছে,—মানবমন কোন বিষয় বাসনাদ্বারা পরিচালিত হইলে এক প্রকার গতি প্রাপ্ত হয় এবং বিষয় বাসনা বিবর্জ্জিত মন তত্বজ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হইলে অন্যবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু মনুষ্য বিষয় বাসনাদ্বারা পরিচালিত হইলে তাহার কার্য্যকলাপ যদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, তত্বজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইলেও যে তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন রহিয়াছে, তাহা সহজেই প্রতীত হইবে। অর্থাৎ মনুষ্যকে অবস্থার দাস বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহার কার্য্যকলাপ যদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অথচ মনে স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনক্ষমতার বিদ্যমানতা স্বীকার করিলেও তদীয় কার্য্যকলাপ তদ্রূপ নিয়মাধীন বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

কিন্তু মনুষ্য মন যখন আভ্যন্তরিক শক্তিসমুত্থিত তত্বজ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হয়, কেবল তখনই যে স্বকীয় স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনে সমর্থ হয়, এ বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগের প্রাচীন যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনাজিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ সুখ দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥
জ্ঞানবিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম লোষ্ট্রাশ্ম কাঞ্চনঃ॥

অর্থাৎ, যিনি আত্মাদ্বারা আত্মাকে জয় করিয়াছেন, তাঁহার আত্মাই আত্মার বন্ধু, কারণ অজিতাত্মার শত্রুভাবে আত্মাই শত্রুবৎ থাকেন। জিতাত্মা এবং রাগাদিরহিত সাধকের পরমাত্মা এবং শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ মানাপমান সম্বন্ধে সমভাবে বর্ত্তমান থাকে। জ্ঞান এবং বিজ্ঞানদ্বারা যাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত, তিনিই নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয়; এবং উক্তরূপে সমাহিত যোগীর নিকট মৃত্তিকা প্রস্তর ও স্বর্ণ সকলই সমান। বস্তুতঃ, মনুষ্য যখন মনের আভ্যন্তরিক শক্তিদ্বারা বহির্জগতের সংঘর্ষণসম্ভূত মানসিক শক্তিকে পরাজয় করিতে পারে, তখনই কেবল মনুষ্যকে জিতাত্মা বলা যায়। কেন না, তখন তিনি আত্মাদ্বারা আত্মাকে পরাজয় করেন। জিতাত্মা মানবই স্বাভাবিক মনুষ্য এবং জিতাত্মার প্রকৃতিই মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রকৃতি।

ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী সম্বন্ধে চিরান্ধতা নিবন্ধন অনেকানেক চিন্তাশীল পণ্ডিত মনুষ্যের জীবনগতি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নানাভ্রমজালে নিপতিত হইয়াছেন। কেহ কেহ মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালন ক্ষমতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন; কেহ কেহ আবার মানবের এই স্বাধীনেচ্ছা সঞ্চালন ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনুষ্যদিগের কার্য্য কলাপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইতে পারে না। কিন্তু জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে সম্বন্ধ, মনুষ্যের স্বাভাবিক অবস্থায়, সেই সম্বন্ধটী জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যস্থিত পারস্পরিক আকর্ষণ। যেমন পৃথিবী সূর্য্যকে এবং সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মা জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। মানব মনে অজ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে অপরিস্ফুট জ্ঞান রহিয়াছে, সেই জ্ঞান, ক্রমে পরিবর্দ্ধিত

হইয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হয়; এবং সেই তত্ত্বজ্ঞানসমুত্থিত ভাব বা আবেগই জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যস্থিত পারস্পরিক আকর্ষণ। জীবাত্মা যে পরিমাণে তত্ত্বজ্ঞানপরিশূন্য হয়, সেই পরিমাণে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যস্থিত আকর্ষণ নিস্তেজ হইয়া যায়, এবং সম্পূর্ণ রূপে তত্ত্বজ্ঞান বিবর্জ্জিত জীবাত্মা প্রাগুক্ত আধ্যাত্মিক আকর্ষণ পরিশূন্য হইয়া কেবল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় বাসনাদ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। এই শেষোক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত মনুষ্য সম্পূর্ণ রূপে অবস্থার দাস। কিন্তু অবস্থার দাসত্বাবদ্ধ জীবাত্মা কোন্ অবস্থায় কি প্রকার কার্য্য করিবে, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ সহজেই ভবিষ্যৎ বক্তার ন্যায় গণনা করিয়া নিরূপণ করিতে পারেন। ইংলণ্ডীয় দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, কোন মনুষ্যের মানসিক প্রবৃত্তি এবং তাহার স্বভাব ও প্রকৃতি কিরূপ তাহা জানিতে পারিলে, সে কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে তাহা অভ্রান্ত রূপে নির্ণয় করা যাইতে পারে।* অধিকন্তু যদি বিশেষ রূপে সেই মনুষ্য আমাদিগের নিকট পরিচিত হয় এবং কি প্রকার প্রলোভন তাহার প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে পারে, তাহা জ্ঞাত থাকি, তাহা হইলে, তাহার আচার ব্যবহার জড়রাজ্যের কার্য্যকলাপের ন্যায় নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা যায়।

বস্তুতঃ যে সকল মনুষ্য একেবারে তত্ত্বজ্ঞান বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল বিষয় কামনা দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাদিগের জীবনগতি নির্ণয় করা তত কঠিন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। যদি তাহাদিগের হৃদয়স্থিত সর্ব্বপ্রবল আসক্তি সকল নিরূপণ করা যায় এবং কোন কোন বিষয় দ্বারা তাহাদিগের মন প্রলুব্ধ হইয়া বিমোহিত হইয়াছে, তাহা সম্যক রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তবে তাহারা কিরূপে কার্য্য করিবে, কি প্রকার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিবে, তাহা অনায়াসেই নির্ণীত হইবে। আবার যে সকল তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ মুক্তাত্মা বিষয়বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া স্বর্গীয় জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবনগতি নির্ণয় করা এতদপেক্ষাও সহজ বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহারা কেবল পরমাত্মার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু যাহাদিগের বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই; এবং তত্ত্বজ্ঞানের আভাসমাত্র অন্তরাত্মাকে সংস্পর্শ করিয়াছে, এই প্রকার বিমিশ্রণ-প্রাপ্ত জীবাত্মার জীবনগতি নির্ণয় করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। ইহাদিগের জীবন প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। ইহারা সর্ব্বদাই সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ইহাদিগের কার্য্যকলাপ মধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্কার করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ দার্শনিকগণ নানাবিধ মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু জড়জগতের পদার্থ সকলের গতিসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এই প্রকার বিমিশ্রণপ্রাপ্ত জীবনের

* "Correctly conceived the doctrine of so-called philosophical necessity is simply this: that given the motives that are present to an individual mind, and given likewise the character and disposition of the individual, the manner in which he will act may be unerringly inferred; that if we know the person thoroughly and knew all the inducements that are acting upon him we could foretell his conduct with as much certainty as we predict any physical event." John Stuart Mill.

গতিও নির্ণয় করা যাইতে পারে। কোন জড় পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে বিবিধ প্রকার বল দ্বারা আকৃষ্ট হইলে, সর্ব্বাপেক্ষা অত্যল্প প্রতিবাতশূন্য পথ উক্ত পদার্থের গতি-পথ হয়। সেই প্রকার বিমিশ্রণপ্রাপ্ত জীবনের গতিপথও জীবন বিশেষের দুর্দ্দম স্পৃহা ও অশাসিত প্রবৃত্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। * কিন্তু বিমিশ্রণযুক্ত জীবনে যেসকল বিবিধ প্রকারের প্রবৃত্তিউত্তেজক ও নিবৃত্তিপ্রদায়ক শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, অগ্রে বৃহৎ মনুষ্য সমাজের সহিত জন বিশেষের জীবনের কি প্রকার সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা উচিত। অতএব এতৎপরবর্ত্তী অধ্যায়ে মনুষ্য সমাজের কার্য্য-কলাপ যে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, তৎ-পর্য্যা-লোচন কালে বিমিশ্রণপ্রাপ্ত জীবনের গতি-মুখ সম্বন্ধেও সমালোচনা করা যাইবে।

এই অধ্যায়ে উপসংহারে এ বিষয় উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে যে, বৃহৎ মনুষ্য সমাজের সহিত প্রত্যেক মানব-জীবনের যে নিগূঢ় বন্ধন রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি না হইলে মানব-জীবন-গতি নির্ণীত হইতে পারে না।

হিন্দু আর্য্যগণের বেদাধ্যয়ন।

আর্য্যজগতে ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন ও আদিম গ্রন্থ আর নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আর্য্যভাষার সহিত তাঁহাদের ভাষার সংস্রব দেখিয়া ঋগ্‌বেদকে তাঁহাদের আপন প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়াও সময়ে সময়ে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। যে ঋগ্‌বেদ তিন চারি হাজার বৎসর হইতে কোটী কোটী লোকের ধর্ম্মের ও নৈতিক জীবনের মূলস্বরূপ হইয়াছে, প্রাচীন সময়ে সে বেদ কখনও মুদ্রিত বা প্রচলিত হয় নাই। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এত প্রাচীন সাহিত্য কিরূপে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল? বর্ত্তমান সময়ে বেদের পাণ্ডুলিপি দেখা যায় বটে, কিন্তু খ্রীষ্ট শাকের সহস্রবৎসরের পূর্ব্বের ভারতীয় সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি প্রায় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রারম্ভের বা বৈদিক সাহিত্যের শেষ সময়ের পূর্ব্বে যে, ভারতে লিপি প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কিরূপে ব্রাহ্মণ, সূত্র ও প্রাচীন স্তোত্রাদি বিদ্যমান ছিল? এই জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তির জন্য বলা উচিত যে, সমগ্র বেদ কেবল ভারতের আর্য্যগণের অপূর্ব্ব স্মৃতি শক্তির বলে রক্ষা পাইয়া আসিতেছিল। এই সমুদয় স্মরণ রাখিবার জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল। এখন শিক্ষার্থিগণ পাঠশালায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সময় অতিবাহিত করেন, ভারতের উচ্চ তিন বর্ণের বংশসম্ভূত সন্তানেরা সে সময়ের মধ্যে কোন গুরুর মুখ হইতে বেদ অভ্যাস করিতেন। ইহা তাঁহাদের পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল। এই পবিত্র কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য দেখাইলে তাঁহাদিগকে সমাজে

* "As in individual animals, inclusive of men, motion follows lines of least resistance, it is to be inferred that among aggregates of men the like will hold good." Herbert Spencer

স্থগিত হইতে হইত। লিপি-প্রণালীর সৃষ্টির পূর্ব্বে সাহিত্য সঞ্জীবিত রাখিবার আর কোন উপায় না থাকায়, যাহাতে বেদের কোন রূপ ব্যাঘাত না ঘটিতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা অতি সাবধান ছিলেন।

প্রাচীন সময়ে বেদ কিরূপে মুখে মুখে শিক্ষা দেওয়া হইত, শিক্ষক কি নিয়মে ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেন, ছাত্রেরাই বা কি নিয়মে সেই পাঠ আয়ত্ত করিত, এস্থলে সংক্ষেপে তদ্বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। খ্রীষ্টের অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের শিক্ষাগৃহে কিরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা ইহাতে জানা যাইবে।

ঋগ্‌বেদের প্রাতিশাখ্যে উক্ত বেদের উচ্চারণ বিধি উল্লিখিত হইয়াছে। যাস্ক ও পাণিনির আবির্ভাব সময়ের মধ্যে, খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বোধ হয় প্রাচীন প্রাতিশাখ্য লিখিত হইয়া থাকিবে। উক্ত প্রাতিশাখ্যের পঞ্চ দশ অধ্যায়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষককে নির্দ্দিষ্ট সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী হইতে হইত। ব্রহ্মচারীর করণীয় সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন না করিলে কোন শিক্ষকই অধ্যাপকের পদে অধিষ্টিত হইতে পারিতেন না। শিক্ষক যেমন কতিপয় নির্দ্ধারিত বিষয় সম্পাদন করিতেন, তেমনি ছাত্রকেও কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিতে হইত। এই নির্দ্দিষ্ট ব্রতপালনোন্মুখ শিক্ষার্থী ব্যতীত শিক্ষক আর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। আচার্য্য উপযুক্ত স্থানে বাস করিবেন, যদি তাঁহার একটী বা দুইটী শিষ্য থাকে, তাহা হইলে তাহারা তাঁহার দক্ষিণে উপবেশন করিবে। শিষ্য সংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগকে স্থানের সচ্ছলতা বিবেচনায় বসিতে হইবে। প্রত্যেক নূতন পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ছাত্রদিগকে গুরুদেবের পদবন্দনার পর "পাঠ আরম্ভ করুন" এই কথা বলিতে হইবে। তৎপর শিক্ষক "ওঁ, হাঁ," বলিয়া দুইটী কথা উচ্চারণ করিবেন। এই কথা সংযুক্ত-বর্ণ-বিশিষ্ট হইলে তাঁহাকে কেবল একটী মাত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। অধ্যাপক দুই একটী কথা উচ্চারণ করিলে পর প্রথম ছাত্র প্রথম কথাটী আবৃত্তি করিবেন। কিন্তু উহার অর্থ বোধ না হইলে তিনি পুনরায় "মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করিবেন। তৎপর অধ্যাপক উহার ব্যাখ্যা করিয়া "ওঁ হাঁ মহাশয়" বলিবেন।

একটী প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপে অধ্যাপনা চলিতে থাকিবে। এ প্রশ্ন সচরাচর তিনটী পদ লইয়া গঠিত হয়, কিন্তু যদি ৪০ কি ৪২ শব্দের কবিতা হয়, তাহা হইলে তাহার দুইটী কবিতা লইয়া একটী প্রশ্ন হইয়া থাকে। প্রশ্নটী শেষ হইলে পর শিষ্যদিগকে উহা আর একবার অভ্যাস করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া কণ্ঠস্থ রাখিতে হইবে। যতক্ষণ সমস্ত পাঠ শেষ না হইবে, ততক্ষণ অধ্যাপক একে একে সকল ছাত্রকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে লইয়া গিয়া এক একটী প্রশ্ন করিবেন। ৬০টী প্রশ্ন লইয়া এক একটী পাঠ হইবে। সর্ব্বশেষের কবিতার্দ্ধ শেষ হইলে অধ্যাপক বলিবেন, "মহাশয়" এবং শিষ্য, "ওঁ হাঁ মহাশয়" বলিয়া পাঠের শেষ কবিতাটী উচ্চারণ করিবেন। পরে ছাত্রবর্গ অধ্যাপকের চরণ বন্দনা করিয়া বিদায় লইবেন।

পাঠ সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই সকল নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাতিশাখ্যে

এসম্বন্ধে আরও অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এমন কি ছোট কথা পরিত্যক্ত হইবার আশঙ্কায় অধ্যাপককে দীর্ঘ উচ্চারণ বিশিষ্ট বা একস্বরযুক্ত শব্দকে দুইবার উচ্চারণ করিতে হইবে। কতকগুলি ছোট কথার পর "ইতি" শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং আর কতকগুলি কথার পর "ইতি" শব্দ প্রযুক্ত হইলে ঐ কথা পুনরায় উচ্চারণ করিতে হইবে যথা "চ ইতি চ"।

প্রায় অর্দ্ধবৎসর ব্যাপিয়া এইরূপ অধ্যাপনা কার্য্য চলিত। সচরাচর বর্ষাকালেই পাঠ আরম্ভ করিবার রীতি ছিল। অনেক পর্ব্বদিনে পাঠ বন্ধ থাকিত। এসম্বন্ধে গৃহ্য ও ধর্ম্মসূত্রে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নিয়ম আছে।

খ্রীষ্টের পাঁচ শত বৎসর পুর্ব্বে প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে এইরূপ শিক্ষা প্রণালী ছিল, এই প্রণালীতে প্রাচীন আর্য্যগণ বেদাধ্যয়ন করিতেন। স্মৃতিশক্তির প্রভাবে সমস্ত বেদ তাঁহাদের জিহ্বাগ্রে থাকিত। তাঁহারা সিন্ধু সরস্বতীর মনোহর পুলিনে যোগাসনে সমাসীন হইয়া ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে এই পরম পবিত্র বেদগান করিতেন। উপস্থিত সময়েও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে বেদের অধ্যাপনা হইয়া থাকে। বারাণসীতে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে ও তৈলঙ্গে বেদের বিশেষ আলোচনা হয়। অদ্যাপি তৈলঙ্গে এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা বেদাধ্যয়নে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ইঁহারা দান প্রাপ্তির আশায় নানাস্থান ভ্রমণ করেন। সম্পন্ন লোকেরা ইঁহাদের মুখে বেদ শুনিয়া আপনাদের সামর্থ্য অনুসারে ইঁহাদিগকে অর্থ দিয়া থাকেন। এক জন সুপণ্ডিত বর্ত্তমান সময়ের বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ঋগ্‌বেদ পাঠক যদি বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী হন, তাহা হইলে তাঁহার দশগ্রন্থ পাঠ করিতে অন্যুন আট বৎসর লাগে। দশগ্রন্থে এই সকল বিষয় আছেঃ—১। সংহিতা বা স্তোত্র। ২। ব্রাহ্মণ। যজ্ঞাদি সম্বন্ধে গদ্য গ্রন্থ। ৩। আরণ্যক বা অরণ্য গ্রন্থ। ৪। গৃহ্যসূত্র। সাংসারিক আচার ব্যবহারের নিয়ম। ৫০। ষড়ঙ্গ, শিক্ষা-জ্যোতিষ, কল্প, ব্যাকরণ, নিঘণ্টু ও নিরুক্ত এবং ছন্দ।

এই আট বৎসরের মধ্যে অনধ্যায় বা পর্ব্বদিন বাদে শিষ্যকে সকল দিনেই পড়িতে হয়। এক চান্দ্র বৎসরে ৩৬০ দিন; সুতরাং আট বৎসরে ২৮৮০ দিন হয়। তন্মধ্যে পর্ব্বদিন ৩৮৪ বাদ দিলে আট বৎসরে ২৪৯৬ দিন পাঠাভ্যাসের জন্য থাকে। এখন এই দশ গ্রন্থে স্থূল স্থূল হিসাবে ২৯৫০০টী শ্লোক থাকিলে ঋগ্‌বেদপাঠককে প্রতিদিন ১২টী করিয়া শ্লোক পড়িতে হয়। প্রতি শ্লোকে ২২ পদটী আছে।"

এইরূপে পাঠ সমাপ্ত করিয়া বৈদিক শিষ্যগণ এক এক খানি জীবিত বেদ স্বরূপ হইয়া উঠেন। বেদের অন্তর্গত যে কোন অংশ জিজ্ঞাসা করা যায়, স্বরগ্রাম ঠিক রাখিয়া তৎক্ষণাৎ ইঁহারা সেই অংশ আবৃত্তি করেন। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যেমন সমস্ত ঋগ্‌বেদ জানিতেন, তেমনি ইঁহারাও সমস্ত ঋগ্‌বেদ আয়ত্ত করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানকালে মুদ্রিত বেদ এবং তাহার হস্ত লিপির অভাব না থাকিলেও ইঁহারা ইঁহাদের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় গুরুর মুখে শুনিয়া সমস্ত বেদ অভ্যাস করেন। এইরূপে বেদশিক্ষা ইঁহারা পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যদিও এখন দিন দিন ইঁহাদের সংখ্যার হ্রাস হইতেছে, তথাপি

ইঁহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই। তিন চারি হাজার বৎসর হইতে যে স্তোত্রাবলি মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, ভারতের সন্তানগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও, ভারতীয় আকাশতলে বসিয়া সেই পবিত্র স্তোত্রমালা আবৃত্তি করিতেছেন। যদি লিপি-প্রণালী উদ্ভাবিত না হইত, যদি বৈজ্ঞানিকের গবেষণা মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি না করিত, যদি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধিকারে না থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ তরুণবয়স্ক ব্রাহ্মণ-কুমার তাঁহার সহস্র সহস্র সমপাঠীর সহিত সমবেত হইয়া, যে গান সরস্বতী প্রভৃতি প্রসন্ন-সলিলা নদীর তটদেশে বসিয়া একদিন প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ গাইয়াছিলেন, আজিও সেই পবিত্র বেদ গান করিতেন।

সূর্য্য ও 'সময়'*।

বিগত সংখ্যার নব্যভারতে সূর্য্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া "সময়"পত্রিকার সম্পাদক আমাদিগকে কটাক্ষ করিয়া ২২ জ্যৈষ্ঠ তারিখের কাগজে লিখিয়াছেন—"বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ না করিয়া সূর্য্য সম্বন্ধে লোখা (?) নব্যভারতের উচিত হয় নাই। ভ্রান্তি পূর্ণ মত সমুদায় প্রচার করা অপেক্ষা নিস্তব্ধ (?) থাকা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ"। আমরা ভ্রান্তিপূর্ণ মত প্রচার দ্বারা কুসংস্কার পূর্ণ' ভারতবাসীদিগকে প্রতারিত করিতেছি দেখিয়া উক্ত পত্রিকা সম্পাদক তাঁহাদের"সম্বাদ পত্রে ক্রমশঃ সূর্য্য বিষয়ে বিজ্ঞানবিৎদিগের মত প্রকাশ করিতে চেষ্টা"করিবেন। আমাদের 'ভ্রান্তি পূর্ণ" প্রবন্ধ দেখিয়া যে সম্পাদকের বিজ্ঞানবিষয়ে লিখিতে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, ইহাও আমাদের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয়। তিনি বিজ্ঞান রবির সমুজ্জ্বল প্রভায় কুসংস্কাররূপ অন্ধতমঃ বিদূরিত করিয়া ভারতবাসীদিগকে যে বৈজ্ঞানিক আলোকে আলোকিত করিবেন, আমরা কিয়ৎ পরিমাণে তাহার যোগাড় করিয়া দিলাম, এজন্য আমাদের নিঃসন্দেহে ভরসা হইতেছে, পাঠকবর্গ আমাদের অজ্ঞানকৃত দোষ সকল মার্জ্জনা করিবেন।

সময়ের সমালোচনে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহার প্রতিবাদ করা আবশ্যক। কারণ সূর্য্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা আমাদের নিজের মত কিছুই বলি নাই, বর্ত্তমান

* আমরা ভরসা করি আমাদিগের সহযোগী তাঁহার পত্রিকায় আমাদের এই প্রতিবাদ মুদ্রিত করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

সুযোগ্য সহযোগী আমাদিগের 'অনুদারতার' আর যে সকল পরিচয় দিয়াছেন, আমরা সে সকলের উত্তর দেওয়ার আবশ্যকতা দেখি না; কারণ বিজ্ঞ পাঠকগণ তাঁহার অযৌক্তিকতা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। সত্য কথা লিখিলে অনুদারতা হয়, একথা আমরা এই প্রথম সহযোগীর মুখে শুনিলাম। 'ক্ষমা প্রার্থনা করায় সুরেন্দ্রনাথের মহত্ত্ব ছিল কিনা, তাহা আমরা বলিতে চাহি না' ইহা লিখিলেই সুরেন্দ্র বাবুর নীচত্ব প্রতিপন্ন হইলে, সহযোগীর এ সিদ্ধান্ত অতি আশ্চর্য্য। যাহা হউক আমরা সহযোগীর সহিত এই সকল সামান্য বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিয়া পাঠকদিগের সময় নষ্ট করিতে চাহি না। প্রকাশক।

বিজ্ঞান শাস্ত্র সূর্য্যের অদ্ভূত রহস্য যতদূর উদ্ভেদ করিয়াছে, আমরা কেবল তাহারই স্থূল স্থূল বিবরণ পাঠকদিগের নিকট প্রকটিত করিয়াছিলাম। যাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণেও বর্ত্তমান প্রকৃতিবিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতেছেন যে, "কুসংস্কার পূর্ণ ভারতে" আমরা "সূর্য্য-সম্বন্ধে ভ্রান্তিপূর্ণ মত সকল" প্রচারিত করি নাই, কিন্তু আমাদের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সমালোচক মহাশয়ই এ বিষয়ে ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়া, অর্থশূন্য বাগাড়ম্বর মাত্র করিয়া বিজ্ঞানানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের বিভ্রম জন্মাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা যে নিজেরা এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে পারিবেন, সে আশা অতি বিরল, পরন্তু সমালোচকের বাক্‌চাতুর্য্যে বিমোহিত হইয়া আমাদের উপর সন্দিহান হইতে পারেন বিবেচনায়, আমরা এবারও সূর্য্যসম্বন্ধে আধুনিক দার্শনিকদিগের মত, তাঁহাদের নিজের কথাতেই প্রকটিত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম।

"সময়" সম্পাদক আমাদের প্রবন্ধে প্রকটিত বিষয়ের যে তিন স্থলে দোষারোপ করিয়াছেন, আমরা কেবল তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তিনি সর্ব্ব প্রথমে বলেন যে, "লুইফিগুয়ার যাহা কল্পনার তুলিকা দ্বারা চিত্রিত করিয়াছেন, নব্যভারত তাহা বিজ্ঞানের কথা বলিয়া কুসংস্কারপূর্ণ ভারতে প্রচার করিতেছে দেখিয়া আমারা (?) হতবুদ্ধি হইয়াছি।" আমরা বলি আমরাও সম্পাদকের শব্দার্থ গ্রহণে এতদূর প্রবীণতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। আমরা বলিয়াছিলাম, সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণেরা অন্তিম কালে সৌরলোক প্রাপ্তি কামনা করিতেন। কেন করিতেন? ইহার কারণ এই যে, সূর্য্যলোক যে জীবাত্মার মুক্তিমণ্ডপ বা শেষ আবাস স্থল, তাঁহাদের এরূপ সংস্কার বা বিশ্বাস ছিল। যে সময়ে তাঁহাদের এ বিষয়ে বিশ্বাস বা সংস্কার জন্মে, তখন সমগ্র পৃথিবী অশিক্ষিত ও অসভ্য ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয়েরা সুসভ্য ও সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের হৃদয় হইতে কুসংস্কার সকল তিরোহিত হইতেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও লুইফিগুয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও স্বীকার বা বিশ্বাস করেন যে, সূর্য্যালোকই জীবাত্মার মুক্তিমণ্ডপ বা শেষ আবাস স্থল। এ বিষয়টী তাঁহারা বিজ্ঞানের অখণ্ড্য প্রমাণ ও পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আমরা এ কথা বলি নাই; সুতরাং আমরা উহা 'বিজ্ঞানের কথা বলিয়া প্রচার করিতেছি' সম্পাদক কিরূপে এ সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি কি বলিতে চাহেন যে, বিজ্ঞানের প্রমাণ বা পরীক্ষা দ্বারা যে বিষয় স্থিরীকৃত না হয়, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা বিশ্বাস বা স্বীকার করেন না। ঈশ্বর আছেন কিনা, পরকাল আছে কিনা, মরিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় কিনা, বিজ্ঞান শাস্ত্র কি এ সকল প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারে? এবং বিজ্ঞান দ্বারা এ সকল বিষয় মীমাংসিত হয় নাই বলিয়া কি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা পরকাল বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না? এ সকল বিষয় বিজ্ঞানের সীমার অতীত, সুতরাং বিজ্ঞান তাহাতে নিরুত্তর, কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা, বিজ্ঞান নিরুত্তর বলিয়া যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা পরকাল স্বীকার করেন না, এমত নহে। আবার বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা যাহা বিশ্বাস বা স্বীকার করেন, তাহাই কিছু বিজ্ঞানের কথা নহে; আর যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও আমরা দায়ী নহি।

কারণ লুইফিগুয়ার তাঁহার গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলিতেছেন—'You will find in this book, not only an attempt at the solution of the problem of the future life by *science*, but also the statement of a complete theory of nature, of a true philosophy of the Universe.—বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা বিশ্বাস করিতেন যে, সূর্য্যলোক বা সবিতৃমণ্ডল জীবাত্মার মুক্তিমণ্ডপ। লুইফিগুয়ারেরও এ বিষয়ে বিশ্বাস ছিল, কারণ তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে,—The sun &c. &c. is, in *our belief*, the final sojourn of purified, perfected souls.—পাঠক দেখিবেন ফিগুয়ার (belief—বিশ্বাস) এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং উপরোক্ত মতটী যে সমালোচক 'কল্পনার তুলিকাদ্বারা চিত্রিত হইয়াছিল' মনে করিতেছেন, অন্ততঃ লুইফিগুয়ারের নিকট তাহা সেরূপ বোধ ছিল না। এ বিশ্বাস যে তাঁহার অকৃত্রিম তাহ'ও তাঁহার লিখন দৃষ্টে জানা যায়, কারণ, তিনি পুনরপি বলিয়াছেন 'I write with absolute sincerity. লুইফিগুয়ারের এ মত যুক্তি ও বিজ্ঞান সঙ্গত, কি যুক্তি ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ, তাহা আমরা বিচার করি নাই, এবং তাহা বিচার করাও আমাদের অভিপ্রেত ছিল না।

'সময়' সম্পাদকের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, "সূর্য্যের ভার পরিমাণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব? কি উপায় দ্বারা সে কার্য্য সাধিত হইতে পারে?" সুতরাং তাঁহার বিবেচনায় আমরা যে লিখিয়াছিলাম—'সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ৩০০,০০০ গুণ ভারী, অর্থাৎ ৩০০, ০০০টী পৃথিবী একত্র করিয়া ওজন করিলে সূর্য্যের সমান ভারী হয়,' তাহা ভ্রান্তিমূলক। সময় সম্পাদকের সমস্ত বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, তাঁহার বিবেচনায় Mass এবং Weight এই দুইটী কথার অর্থগত বিভিন্নতা আমাদের বোধগম্য হয় নাই, এবং আমরা না বুঝিয়া Mass শব্দের প্রতিবাক্যে 'ভার,' এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছি। তাঁহার ইচ্ছা আমরা ভার এই শব্দের পরিবর্ত্তে Mass (পরমাণু সমষ্টি ?) এই শব্দটী প্রয়োগ করি। সমালোচক গম্ভীর ভাবে আমাদের বোধশক্তির উপরে দোষারোপ করিয়া এই মত প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া আমরা ক্ষুণ্ণ হইলাম না; এবং ক্ষুণ্ণ হইবার আমাদের কোনও কারণও নাই। বিশ্ব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে যে বিষয়ে তাঁহার ন্যায় একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান লোকও পদে পদে ভুল করিয়াছেন, এবং যে বিষয় অনেক কষ্টে এবং অনেক গোলযোগের পর তিনি মনে করেন যে, তিনি কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্বাধীন করিয়াছেন, সে বিষয়, যত কেন সহজই হউক না, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ বুঝেন, তাহা কি তিনি সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন? এ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই হয়ত আমাদের সমালোচক আমাদের ভুল দেখাইতে এতদূর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞান কেবল বিজ্ঞানবিৎদিগেরই আলোচ্য, এবং এতদুরূহ বিষয়ে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই, যাঁহারা এরূপ কুসংস্কার পূর্ণ নহেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা 'Mass, শব্দটীর প্রতিবাক্যে কি কারণে 'ভার' শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছিলাম। ইংরাজী "Mass" শব্দের প্রচলিত প্রতিবাক্য বাঙ্গালা ভাষায় থাকিলেও হয়ত এস্থলে উহা প্রয়োগ করিতে আমরা সাহসী হইতাম না। কারণ 'সূর্য্য' নামক প্রবন্ধটী যাঁহাদের জন্য অভিপ্রেত

হইয়াছে, তাঁহারা যে Mass শব্দের গূঢ়ার্থ সহজে বুঝিতে পারেন, আমাদের সে বিশ্বাস নাই। একটী দ্রব্য অপেক্ষা অন্য আর একটী দ্রব্যের Mass অধিক, ইহা সাধারণতঃ লোককে বুঝাইতে হইলে ওজন করিয়া দেখাইয়া দিতে হয়, নতুবা তাঁহাদের বোধগম্য হয় না। একটী দ্রব্য ওজন করিলে অপর একটী অপেক্ষা যদি ভারী হয়, তবে সচরাচর লোকে অনায়াসে মনে করিতে পারেন যে, যে দ্রব্যটী ভারী তাহা অধিক সারবান অর্থাৎ তাহাতে Mass (সামগ্রী বা স্থিরাংশ) অধিক আছে। ফলতঃ 'ভার বা ভারী, এই শব্দ প্রয়োগ ব্যতীত বিজ্ঞানানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে Mass শব্দটীর মর্ম্ম পরিজ্ঞাত করা কিছুতেই সম্ভব নহে। এজন্য ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরাও সর্ব্বসাধারণের বোধস্থূলভার্থে পুস্তক প্রণয়ন কালে এ প্রকার স্থল সমূহে Mass শব্দটীর পরিবর্ত্তে *Weight* (ভার) এই শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। নিউজারসি কলেজের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অধ্যাপক সি, এ, ইয়ঙ্গ, এল. এল ডি, সূর্য্য বিষয়ক যে গ্রন্থ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন, 'The sun has been *weighed* against the earth and found to contain a quan tity of matter nearly 330,000 times as great.' আবার এফ, এ, পাউচেট এম, ডি, তাঁহার ইউনিভার্স নামক গ্রন্থের ১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—'Astronomers have not rested content with knowing the volume of the sun; they have attempted to estimate its *weight* and have succeeded. By comparing its *weight* with that of the earth, they have made it out that it would require a large number of the latter to counterbalance it. If we supposed the existence of a prodigious balance which allowed us to place the sun in one scale, we should have to put 350,000 terrestrial globes into the other in order to weigh it properly. ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ লকিয়ার বলেন 'The *weight* of the sun is 300, 000 times greater than that of our earth.

বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বোক্ত কারণে ইংরাজী মাস (Mass) শব্দের প্রতিবাক্যে আমরা ভার শব্দ ব্যবহার করিয়াছি; কিন্তু এরূপ করায় আমাদের বিবেচনায় বিশেষ দোষও দৃষ্ট হয় না। ইংরাজী ভাষায় *Mass* এবং *Weight* এই দুইটী স্বতন্ত্র শব্দ থাকা সত্বেও পণ্ডিতেরা সর্ব্বসাধারণের বোধ-স্থূলভার্থ পুস্তক প্রণয়ন কালে যে, *Mass* শব্দের পরিবর্ত্তে *Weight* (ভার) শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ কয়েকটী দ্বারা বিশেষরূপে সপ্রমাণ করা গেল। বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত প্রস্তাবে Mass এর প্রতিবাক্য অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। *Mass* শব্দ দ্বারা যে ভাবটী সূচিত হয় তাহা ভার শব্দ দ্বারা বিলক্ষণ বুঝা যায় এবং এপর্য্যন্ত সকলে বুঝিয়াও আসিতেছেন। এপাত্রে ⁄৪সের দুগ্ধ ধরে বা এপাত্রে যত দুগ্ধ ধরে তাহা ⁄৪সের ভারী। এই লৌহ নির্ম্মিত দণ্ডটী আধমন ভারী বা এই লৌহনির্ম্মিত দণ্ড খানিতে আধমণ পরিমাণ লৌহ আছে। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, সম্পাদক মহাশয় আমাদের ভুল ধরিতে গিয়া স্বয়ং একটী ভয়ানক ভুল করিয়া আমাদের ঘাড়ে তাহা চাপাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইংরাজীতে যাহাকে *Mass* বলে আমরা তাহাকে ভার বলিয়াছি, সুতরাং আমাদের ভুল হইয়াছে এবং তাঁহার বিবেচনায় 'ভার না বলিয়া আমরা যদি 'পরমাণু সমষ্টি' বলিতাম তাহা হইলে সকল

গোল ঢুকিয়া যাইত। পাঠক দেখুন, আমাদের সমালোচক মনে করেন ইংরাজি *Mass* কথাটির বাঙ্গালা প্রতিবাক্য পরমাণু সমষ্টি। আমরা বলি যে *Mass* শব্দটীর প্রতিবাক্য কখনই পরমাণু সমষ্টি হইতে পারে না। কারণ কি, তাহা যাঁহারা Roscoe কৃত Elementary Chemistry মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন; সুতরাং আমাদের সমালোচক মহাশয় যে, এ বিষয় জানেন না, ইহা আমরা কোন্ সাহসে মনে করিব। তবে আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে হয়ত অনেকে এ বিষয়ে সম্যক প্রকারে পরিজ্ঞাত নহেন, এজন্য আমরা তাঁহাদেরই সুবিধার্থে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক মনে করিলাম। রসায়নবিৎপণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ভিন্ন জাতীয় পরমাণু সকলের আয়তন বা আকৃতি (size or volume) এক সমান হইলেও উহারা ওজনে সমান ভারী হয় না। অম্লজনকের (Oxygen) একটী পরমাণু অজ্ঞনকের (Hydrogen) একটী পরমাণু অপেক্ষা ১৬গুণ ভারী, এবং যবক্ষারজনকের (Nitrogen) একটী পরমাণু অজ্ঞনকের একটী পরমাণু অপেক্ষা ১৪গুণ ভারী। কি কারণে এক জাতীয় পদার্থের একটী পরমাণু অন্য জাতীয় পদার্থের একটী পরমাণু অপেক্ষা ওজনে ভারী হয়, তাহার নিগূঢ় কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, তবে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের পরমাণুর ভার ভিন্ন ভিন্ন হয় বলিয়া যে, পদার্থের পরমাণুর ভার যত অধিক সেই পদার্থে Mass তত অধিক আছে, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ Mass পদার্থের (Weight) এর সানুপাতিক। এজন্য আমাদের বিবেচনায় *Mass* ও *Weight* এই দুইটীর প্রতিবাক্য ভার হইতে পারে। সে যাহা হউক, অম্লজনকের একটী পরমাণু যখন অজ্ঞনকের একটী পরমাণু অপেক্ষা ১৬ গুণ ভারী, তখন অম্লজনকের একটী পরমাণুর *Mass* ও অজ্ঞনকের একটী পরমাণুর *Mass* অপেক্ষা ১৬ গুণ অধিক। সুতরাং একটী পরমাণুরও যখন *Mass* আছে স্বীকার করিতে হইতেছে, তখন *Mass* এর প্রতিবাক্যে আমাদের সমালোচক মহাশয় কিরূপে পরমাণু সমষ্টি শব্দটী প্রয়োগ করিলেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি *Mass* শব্দটীর প্রতিবাক্য বাঙ্গালায় স্থিরীকৃত হয় নাই। কেহ *Mass* এর প্রতিবাক্য সামগ্রী, কেহ বা পিণ্ড এইরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু উহার একটীও আমাদের মনঃপূত হয় না। আমাদের বিবেচনায় *Mass* (মাস)ই বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হওয়া উচিত। সার বা স্থিরাংশ কিয়ৎপরিমাণে ইহার প্রতিশব্দ হইতে পারে।

পাঠক! আমরা বলিয়াছিলাম 'সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা ৩০০,০০০ গুণ ভারী, এবং এ বিষয় এই মাত্র লকিয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎগণের গ্রন্থোদ্ধৃত অংশ সকল দ্বারা সম্যক প্রকারে সপ্রমাণ করিলাম। তাঁহারা সকলেই *weight* এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং *weight* শব্দের অর্থ যে 'ভার' তাহা সকলেই জানেন। আমাদের সমালোচক আবার বলেন, 'সূর্য্যের ভার পরিমাণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কি উপায় দ্বারা সে কার্য্য সাধিত হইতে পারে?" এ বিষয়ের প্রত্যুত্তর দিতে হইলে স্বতন্ত্র এক খানি গ্রন্থ লিখিতে হয়। আমাদের পাঠক বর্গ যদি অনুগ্রহ করিয়া 'Guillemin's Heavens', "F. A. Pouchett's Universe"

প্রভৃতি গ্রন্থ সকল অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন, তাহা হইলে এ বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

গুলিমান তাহার Heavens নামক গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন, We have been able to weigh the earth, and we have found that it weighs 6, 069, 000, 000, 000, 000, 000, 000 tons exclusive of the weight of the air. আর এক স্থলে উক্ত আছে :—The Sun's weight approaching to 2, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 tons. বলা বাহুল্য যে গুলিমানকৃত হেভেনস্ নামক গ্রন্থ খানি প্রকটর এবং লকিয়ার কর্তৃক অনুবাদিত, এবং ইহার নবম সংস্করণ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা বলিয়াছিলাম, আধুনিক বিজ্ঞানবিৎদের মতে সূর্য্য 'এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ"। আমাদের সমালোচক মহাশয় গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন যে, "সূর্য্য কিছুতেই বায়বীয় পদার্থ হইতে পারে না।' সূর্য্য কি প্রকার পদার্থ তাহা না বলিয়া তিনি কেবল মাত্র বলিতেছেন "Spectrun (*Sic*) analysis দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণ হইয়াছে যে, সূর্য্যের অভ্যন্তর জলন্ত তরল কিম্বা কঠিন পদার্থ এবং তাহার চারিদিক ব্যাপিয়া সোডিয়ম প্রভৃতি ধাতু বাষ্পাকারে অবস্থান করিতেছে।" এ অতি নূতন আবিষ্কার, এবং আমাদের সমালোচক যে অভিনিবেশ সহকারে গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন, ইহা হয়ত তাহারই ফল। সম্ভবতঃ টিণ্ডাল সূর্য্যের প্রকৃতি (constitution) সম্বন্ধে তাঁহার Heat and Mode of Motion নামক গ্রন্থে কিরককের(Kirchhcff*) যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন সমালোচক বুঝি তাহাই অবলম্বন করিয়া, ও তাহার উপরে রং চড়াইয়া এরূপ লিখিয়াছেন। ধন্য তাঁহার সাহস, ধন্য তাঁহার শিক্ষা, ধন্য তাঁহার অভিনিবেশ, ধন্য তাঁহার অনুশীলন! পাঠকের স্মরণ আছে যে, সমালোচক বলিয়াছেন 'স্পষ্টরূপ প্রমাণ হইয়াছে" ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের সমালোচকের প্রধান অবলম্বন(Authority) টিণ্ডাল কি বলেন তাহাও শুনুন। 'The sun, according to Kirchhoff, consists of a central orb, molten or solid, of exceeding brightness.' আবার '*If this be admitted*, the sunspots and faculae *seem to be caused* by the disturbances of the fiery molten ocean, by the plunging into it of streams of asteroids.' এস্থলে স্পষ্ট প্রমাণ শব্দের অসদ্ভাব দৃষ্ট হইতেছে। আবার স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে যে,'The sun is, according to M. Kirchhoff, the German philosopher, a globe, a sphere, *probably liquid* which burns throughout its whole mass, and in all its parts. This incandescent globe is surrounded by a very heavy atmosphere, formed of the vapours which proceed from the incandescent globe. কিন্তু কিরককের পরবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদেরা তাঁহার এই মতকে প্রমাদ শূন্য মনে করেননা। তাঁহাদের বিবেচনায় সূর্য্য সর্ব্বতোভাবে বায়বীয় পদার্থ। 'Astronomers now a days are almost unanimous in regarding the sun as a great body, incandescent in all its parts, as a globe in a state of fusion, surrounded by a burning atmosphere, or, as M. Faye states

* এস্থলে বলা আবশ্যক যে Kirchhoff এবং Bunsen Spectrum Analysis দ্বারা সূর্য্য কি কি উপকরণে নির্ম্মিত, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে নির্দ্দেশ করেন।

it, a simple agglomeration of incandescent gases'. C. A. Young. P. H. D. L. L. D. Professor of Astronomy in the College of New Jersey, ১৮৮২ সালে সূর্য্য সম্বন্ধে যে গ্রন্থ* প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার এক স্থলে উল্লেখ আছে, While it is, perhaps, not possible to demonstrate at present the falsity of the theory maintained by Kirchhoff and Zollner, by proving that the solar nucleus is neither solid nor liquid, and showing that the solar heat is not confined to the surface, but permeates the whole mass with continually increasing intensity near the centre of the globe, it is yet evident enough that it meets the exigencies of the case only by calling *in unknown and imaginary substances and operations.* On the other hand, the gaseous theory, ***which is now generally adopted,*** involves no new kinds of matter or unknown forces, but conceives of solar phenomena as entirely the same in kind as those we are familiar with in our laboratories, though immensely different in degree and intensity.

জ্যোতির্ব্বিদ্ ইয়ঙ্গ সাহেব সূর্য্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে ;—

1. The central portion of the Sun (which contains more than nine-tenths of the whole mass of the sun) is probably for the most part gaseous.

2. The photosphere is a shell of luminous clouds.

3. The chromosphere is composed mainly of uncondensable gases (conspicuously hydrogen).

4 The corona yet has received no explanation, which commands Universal assent.

ফরাশী দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত Father Secchi বলেন :—We must conclude from these facts that the sun cannot be composed of a solid mass, nor, enormous as may be the pressure existent in this mass, it cannot possibly, so to speak, be in a liquid state. Whence we are necessarily led to the supposition that it is gaseous, notwithstanding its extreme condensation. (See Father Secchi on *The Sun*, p. 289.)

M. Delaunay of the French Institute বলেন "I am inclined to agree with M. Faye, that the sun is a gaseous mass with a very elevated temperature, which prevents the elementary substances that enter its composition from *consolidating*.

Rambosson তাঁহার Astronomy নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—"For my own part, after comparing the various solutions that have been proposed, I must pronounce for the *gaseous* nature of the Sun.

Popular Scientific Recreations নামক গ্রন্থের ৪৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—The sun is *not solid* so far as we can tell. It is a mass of "white hot" vapour, and is enabled to shine by reason of its own light. So we may conclude the sun to be entirely gaseous, but thanks to the recent researches of ***Spectrum analysis*** (already explained), by which the light of the sun has been examined by means of the spectroscope, and split up into its component colours. Mr. Lockyer and other Scientists have discovered that a number of elements (metals) exists in the sun in a fused, or rather vapourous state, in consequense of the intense heat.

আর না, আর পাঠকবর্গকে ক্লিষ্ট করিব না। তাঁহারা সম্ভবতঃ এখন নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছেন যে, সূর্য্যকে যে আমরা এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ (gaseous) বলিয়াছিলাম, তাহা আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের মতানুসারে অযৌক্তিক হয় নাই। আজ কাল অধিকাংশ জ্যোতির্ব্বেত্তারাই এই

* ইয়ঙ্গসাহেবের এ গ্রন্থ খানি International Scientific Series এর Vol XX

মতের পোষকতা করিতেছেন বলিয়া আমরা তাহাই পাঠকবর্গের গোচর করিয়াছিলাম, কিন্তু এ মতও যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, তাহা আমরা কিছুতেই আমাদের সমালোচকের ন্যায় ভরসা করিয়া বলিতে পারি না। বিজ্ঞানের অধিকতর উন্নতি হইলে এ মতও খণ্ডন হইয়া সূর্য্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে নূতন মতের প্রচার হইতে পারে। সত্য বটে, কিরকফ ও জলনার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করিতেন হয়ত তাঁহারা বিশ্বাস বা স্বীকারও করিতেন যে, সূর্য্যের অভ্যন্তরে জ্বলন্ত কঠিন বা তরল ভাবাপন্ন পদার্থ আছে; এবং তাঁহাদের পূর্ব্বে হার্সেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করিতেন, হয়ত বিশ্বাস বা স্বীকারও করিতেন যে, সূর্য্যের অভ্যন্তর প্রদেশ সুশীতল হওয়ায় তথায় জীবাদি বাস করিতেছে। ডাঃ ইলিয়ট নামক একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ও এই মতাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু কথিত আছে মিস বয়েল নামক যুবতীকে হত্যা করায় নর-হত্যা অপরাধে বিচারাগারে আনীত হইলে, তাঁহার কাউনসেল এবং প্রিয়বন্ধু ডাঃ সাইমন তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থে বক্তৃতা কালীন বলেন যে, এ ব্যক্তি উন্মাদ রোগগ্রস্ত, সুতরাং নর-হত্যা অপরাধে অপরাধী হইতে পারেন না, কারণ তিনি যদি প্রকৃতিস্থ হইতেন, তাহা হইলে কখনই সূর্য্যের অভ্যন্তরে প্রাণী বাস করিতে পারে এ প্রকার উদ্ভ্রান্ত মত প্রচার করিতে পারিতেন না। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশ সকল দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, আমাদের সমালোচক যে বলেন 'Spectrum analysis দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, সূর্য্যের অভ্যন্তর জ্বলন্ত তরল বা কঠিন পদার্থ' তাহা সম্পূর্ণ অলীক। কিরকফ স্বয়ংও কখন সাহস করিয়া বলেন নাই যে তিনি Spectrum Analysis দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সূর্য্যের অভ্যন্তর জ্বলন্ত তরল বা কঠিন। পক্ষান্তরে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা একবাক্যে বলেন যে, Spectrum Analysis দ্বারা যতদূর বুঝা গিয়াছে তাহাতে সূর্য্যকে সম্ভবতঃ এক প্রকার বায়বীয় (gaseous) পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আবার আরাগো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ Polariscopic analysis দ্বারা যত দূর বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিবেচনায় সূর্য্য এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ।

আমরা অস্বীকার করি না যে, কিরকফ মনে করিতেন, "হয়ত সূর্য্যের অভ্যন্তর জ্বলন্ত তরল কিংবা কঠিন," সম্ভবতঃ তিনি ইহা স্বীকারও করিতেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা যে, এমত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন তাহার বিশেষ প্রমাণ দেওয়া গেল। আবার আমরা ইতিপূর্ব্বে বিশদরূপে বুঝাইয়াছি যে, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা যাহা বিশ্বাস বা স্বীকার করেন, তাহাই কিছু "বিজ্ঞানের কথা হয় না।" কিন্তু আমাদের সমালোচক বুঝি মনে করেন যে, তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করেন বা স্বীকার করেন, তাহাই বিজ্ঞানের কথা। এরূপ না হইলে জীবাত্মার সূর্য্যলোকে মোক্ষপদ-প্রাপ্তি-রূপ লুইফিগুয়ারের বিশ্বাসের কথা, যাহা আমরা লিখিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়াই উহাকে 'বিজ্ঞানের কথা' বলিয়া আমরা প্রচার করিতেছি, তিনি এরূপ ভাবিবেন কেন?

সহৃদয় পাঠক! বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্রে আমাদের সমালোচকের যে কি পর্য্যন্ত অধিকার, তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইলেন। এক্ষণে দেখুন তাঁহার বাঙ্গালা শব্দার্থ-

জ্ঞান কি প্রকার অদ্ভুত। তিনি লিখিয়াছেন, "তবে সূর্য্যের ভার কি উপায়দ্বারা নিরাকরণ করা যাইবে?" সমালোচক সম্ভবতঃ "নিশ্চয়" অর্থে "নিরাকরণ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন. কিন্তু ইহা অভিধান ছাড়া তাঁহার মনগড়া অর্থ। ফলতঃ "নিরাকরণ" শব্দের অর্থ "দূরীকরণ" বা নিবারণ" ভিন্ন আর কিছুই হয় না। এ কথাটী বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবের সংশ্লিষ্ট না হইলেও আমরা সমালোচকের শব্দার্থে ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিবার জন্যই উল্লেখ করিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

উপসংহার কালে এই মাত্র বক্তব্য, লিখন অপেক্ষা সমালোচন অতীব গুরুতর; ইহাতে বিস্তর গবেষণা, বিস্তর অনুশীলন আবশ্যক। সংবাদ পত্রের সম্পাদককে সামাজিক. রাজনৈতিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েরই সমালোচন করিতে হয়। সুতরাং তাঁহার অতি সাবধানে লেখনী পরিচালন করা কর্ত্তব্য। অন্যথা পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমাদের দেশে যিনি মনে করেন তিনিই সংবাদ পত্রের সম্পাদক হন, এবং যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই লিখিতে থাকেন। আমাদের অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণও অনেক সময়ে সংবাদ পত্রের সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন।

জাতীয় একতা।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি প্রভৃতি ইউরোপের সকল দেশই জাতীয় গৌরবে উন্মত্ত. সকল দেশই বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত এক একটী জাতির আবাস ভূমি। আসিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আফগান. পারসীক, চৈনিক প্রভৃতি এক একটী জাতিকে এক একটী দেশের অধিবাসী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা ভারতীয় জাতি বলিয়া একটী সর্ব্বদেশব্যাপী জাতির গৌরব করিতে পারি না। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে ভাষা বিভিন্ন, আচার ব্যবহার বিভিন্ন, পরিচ্ছদ বিভিন্ন; ইহার এক একটী প্রদেশকে এক একটী স্বতন্ত্র দেশ বলিলেও অন্যায় হয় না। আবার এই সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম্মগত কত বিভিন্নতা। এরূপ স্থলে আমরা কিরূপে সমস্ত ভারতবাসীকে এক জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইব? আজি যদি ভারতের পঞ্চবিংশতি কোটি লোক একজাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতে পারিত, সকলের হৃদয় যদি একভাবে পরিচালিত হইত, এক স্বরে বাজিত, এক অভাবের জন্য ক্রন্দন করিত, তাহা হইলে কি দুই চারি জন দেশীয় ইংরাজ কুলাঙ্গার ভারতবাসীকে গালি দিতে পারিত? না—ভারতের উন্নতি স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে সাহস করিত? আশার মধ্যে এই, আজি শত শত বৎসর পরে ভারতের সমস্ত হৃদয়, অন্যান্য নানা প্রভেদ সত্বেও, এক মহা আন্দোলনে আন্দোলিত হইয়াছে, এক সাধারণ দুঃখে হিমালয় হইতে কুমারিকা

পর্য্যন্ত, পেশোয়ার হইতে আসাম পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাই আমরা সাহস করিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, এক জাতীয় লোকের মধ্যে কি কি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে ভারতে তাহার কি কি আছে, সেই বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইব। এক রাজনৈতিক সীমার মধ্যে অথবা এক শাসনের অধীনে বাস, এক ভাষা, এক পরিচ্ছদ, চরিত্রগত কতকগুলি সাধারণ লক্ষণের অস্তিত্ব, এক আচার ব্যবহার, ও সাধারণতঃ এক ধর্ম্ম, এই কয়েকটী লক্ষণ একজাতীয় লোকদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে এক দেশে বাস না হইলেও অন্যান্য জাতীয় লক্ষণের বর্ত্তমানতা প্রযুক্ত জাতিগত ঐক্যের ব্যতিক্রম হয় না। এইজন্য কি কানেডা, কি কেপকলনি, কি অষ্ট্রেলিয়া, কি নিউজিলণ্ড, যেখানে যাও, ইংরাজদের একই প্রকার জাতীয় ভাব দেখিতে পাইবে। এই জন্য পৃথিবীর অপর প্রান্তস্থিত কোনও ইংরেজের উপর কেহ অত্যাচার করিলে, সমস্ত ইংরেজ সমাজ হুঙ্কার করিয়া উঠে। ইউনাইটেডষ্টেটবাসী ইংরেজগণ ইংলণ্ডের শাসন অতিক্রম করিয়া, ইংলণ্ডের সহিত সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া, নূতন শাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন বলিয়া, আজি আর তাঁহারা ইংলণ্ডীয় ইংরেজদের স্বজাতীয় বলিয়া পরিগণিত নহেন। ক্রমে২ তাঁহাদের আচার ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতিও একটু বিভিন্নভাব ধারণ করিতেছে। তথাপি সে দেশের একজন অধিবাসীর সহিত ইংরাজের যেরূপ সহানুভূতি কোনও বাঙ্গালীর সহিত সেরূপ হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। য়িহুদীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা স্বদেশ হইতে দূরীভূত হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িলেও তাহাদের মধ্যে কেমন আশ্চর্য্য জাতীয় বন্ধন বিদ্যমান রহিয়াছে! সর্ব্বস্থানেই তাহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম মত সাধারণতঃ একই প্রকার।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, এক দেশের মধ্যে বাস না হইলেও অন্যান্য জাতীয় লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে জাতীয় একতার ব্যাঘাত হয় না। উপরি লিখিত উদাহরণ গুলির সম্যক্ আলোচনা করিলে আর একটী বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে ইংরেজ ও য়িহুদী জাতির কথা বলা হইল, তাহারা প্রত্যেকে একটী বিশেষ জাতি বা বংশ হইতে সমুদ্ভূত। ইংরেজ যে দেশে বাস করুক, তাহার জন্ম ইংরেজ শোণিতে, সমস্ত য়িহুদীর জন্ম য়িহুদী বংশে। এক বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণ ভিন্নদেশবাসী হইলেও, এই মূল বংশগত সম্বন্ধ সকল স্থলেই যে অনেক পরিমাণে জাতীয় বন্ধনের সহায়তা করে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু মানবজাতির ইতিবৃত্ত ধীর ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, কোথাও কোথাও ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে আমরা যাহাদিগকে ইংরেজ জাতীয় বলি, তাহারা সকলেই এক স্যাক্সন বংশ হইতে উৎপন্ন নহে। বর্ত্তমান ইংরেজ জাতি নানা বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। এখনও অনেক য়িহুদী, ফরাসী, জর্ম্মণ, ইটালীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় লোক ইংরেজের সহিত একজাতি ভুক্ত হইয়া যাইতেছে। ইউনাইটেড্ষ্টেটে যে নূতন জাতির সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে নাই এমন জাতিই

নাই। ইংরেজ, ওলন্দাজ, আইরিস্, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতির সংমিশ্রণে এই জাতি গঠিত হইতেছে। ইংরেজের ভাগ অধিক বলিয়া ইংরেজী ভাষা, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির প্রভাব সকলের উপর বিস্তৃত হইতেছে বটে, কিন্তু মূলতঃ তাহারা বিভিন্ন জাতীয় লোক। অথচ এই সকল বিভিন্ন জাতীয় লোক যে, কালে সম্মিলিত হইয়া একটী বৃহৎ জাতিতে পরিণত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এই সংমিশ্রণের কার্য্য বহুদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে ও এখনও চলিতেছে। বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা, এক রাজনৈতিক অবস্থায় ও এক শাসন প্রথার অধীনে অবস্থিত হইলে, কালে যে এক জাতিতে পরিণত হইতে পারে, প্রাচীন রোমকগণও তাহার একটী বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এক শাসন প্রথার অধীনে যাহারা থাকে তাহাদের অভাব, উন্নতির আশা প্রভৃতি অনেক পরিমাণে এক হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত সহানুভূতি হয়।

জাতীয় একতার পক্ষে ভাষা যে একটী প্রধান উপকরণ, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। যাহাদের মাতৃভাষা এক, তাহাদের মধ্যে অতি সহজেই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। বিদেশে ভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্নভাষী লোকের মধ্যে বাস করিতে করিতে যদি হঠাৎ একদিন স্বদেশীয় ভাষা কর্ণগোচর হয়, তাহা হইলে মনে যে কি আনন্দের উদয় হয়, তাহা যিনি এরূপ অবস্থায় কখনও পতিত হইয়াছেন, তিনিই সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন। সামাজিক বা রাজনৈতিক মহা আন্দোলনের সময় এই ভাষার তার আবশ্যকতা বিশেষ বুঝিতে পারা যায়। সংবাদ পত্রে ও প্রকাশ্য বক্তৃতায় দেশের মঙ্গল ও অভাবসম্বন্ধে যে সকল গুরুতর বিষয় আলোচিত হয়, তাহাতে যে সর্ব্ব সাধারণের সহানুভূতি থাকা আবশ্যক এবং তাহার জন্য একটী সাধারণ ভাষা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তর্কদ্বারা তাহা বুঝাইবার কোনও আবশ্যকতা নাই। এক জনের মনের দুঃখ আর একজন যদি বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি কিরূপে সম্ভব হইবে? অনুবাদ অনেক স্থলেই ভাবের বিনাশক। আমার হৃদয়ের ভাষায় আমার অভাব যদি তোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তাহা যেমন তোমার মনে প্রবেশ করিবে, হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিবে, অনুবাদের সাহায্যে সে কার্য্য করিতে হইলে কখনই সেরূপ হইবে না। অনুবাদে বাক্যের শক্তি অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। বক্তৃতাকালে বক্তার ভাব প্রকাশের ধরণ, স্বরের তেজ প্রভৃতিতে শ্রোতার হৃদয় যেরূপ আন্দোলিত হয়, বক্তৃতার অনুবাদ পাঠ করিয়া তাহা কখনই হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন যাহাদের মাতৃভাষা এক তাহারা পরস্পরকে যত আপনার লোক মনে করিবে, অন্যের সম্বন্ধে তত সম্ভব বলিয়া বোধ হয়না।

ভাষার ন্যায় পরিচ্ছদও একটী আপনার লোক চিনিবার উপায়। ইহা যদিও জাতীয় একতা সম্পাদনের একটী প্রধান সাধন নহে, তথাপি প্রায় সকল জাতির কোনও না কোন রূপ জাতীয় পরিচ্ছদ আছে, যাহা দেখিলে অনায়াসেই তাহারা কোন্ জাতীয় লোক তাহা বুঝা যাইতে পারে।

চরিত্রের লক্ষণ ও আচার ব্যবহারের সাদৃশ্য জাতীয় একতার ফলমাত্র। যখন বিভিন্ন জাতি মিলিয়া একটী প্রকাণ্ড জাতিতে

পরিণত হইতে থাকে, এক প্রদেশের লোক অপর প্রদেশের লোকের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে থাকে, সামাজিক সম্মিলনে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে থাকে, তখন পরস্পর সংঘর্ষণ ও সংমিশ্রণে, জাতীয় চরিত্র ও আচার ব্যবহার আপনা আপনি অনেক পরিমাণে একরূপ হইয়া পড়ে। আবার অন্য দিকে, যে সকল লোকের পরস্পরের আচার ব্যবহারের সাদৃশ্য আছে তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতির ভাব পরিবর্দ্ধিত হইয়া জাতীয় ভাবকে দৃঢ়তর করে।

ধর্ম্মের একতা জাতীয় বন্ধনের একটী প্রধান সাধন; এমন কি কাহারও কাহারও মতে ইহা সর্ব্বপ্রধান সাধন। ধর্ম্ম মনুষ্য মনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব। সংশয় বাদী বিজ্ঞানবিদ্‌গণ যাহাই বলুন না কেন, মনুষ্য আজিও ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই, এবং কখনও পারিবে না। ইহা চিরকালই মনুষ্যমনে রাজত্ব করিবে। ইহার বন্ধন যেমন দৃঢ়, এমন আর কিছুরই নহে। ইহা বিভিন্ন দেশীয় লোকদিগকে আপনার করিয়া দিতে পারে। আবার ধর্ম্মসম্বন্ধে মতভেদ হইলে আপনার লোকও পর হইয়া যায়; পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামী স্ত্রীতে অসদ্ভাব ও শত্রুতা জন্মে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় একতার প্রভাবেই য়িহুদীদিগের জাতীয় ভাব আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, ইহার প্রভাবেই সমস্ত মুসলমানের হৃদয় আজিও একস্থরে বাজিতেছে; ইহার অনুরোধেই ইংলণ্ড গ্রীসের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী তুরুষ্কের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, ইহার প্রভাবেই শিখেরা এককালে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ধূর্ত্ত রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণও ইহার ক্ষমতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কোন পদানত জাতির মধ্যে ধর্ম্মের একতা স্থাপিত হইতে দেখিলে ইহাদের ভয়ের পরিসীমা থাকে না। এক দেশীয় বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিচ্ছেদ উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিতে পারিলে, সহজে তাহাদিগকে পদানত রাখা যায়, ইহাই যাঁহাদের রাজনীতির মূল মন্ত্র, তাঁহারা যে সমস্ত দেশমধ্যে এক ধর্ম্ম ও এক ভাষা বিস্তারের বিরোধী হইবেন, ও 'যেন তেন প্রকারেণ' বিভিন্ন প্রদেশীয় লোকদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাবের উদয় করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাঁহারা মানবপ্রকৃতির অভ্যন্তরে অতি অল্পমাত্রও প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা একটুমাত্রও চিন্তার সহিত ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন, ধর্ম্মের একতা জাতীয় একতা সংস্থাপনের সর্ব্বপ্রধান সাধন না হইলেও যে একটী প্রধান সাধন, তাহা তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে দেখা গেল যে, যাহারা এক জাতীয় লোক বলিয়া গণ্য, তাহারা প্রায় এক রাজনৈতিক শাসনের অধীনে বাস করে, এবং সেই জন্য তাহাদের সকলের সাধারণ অভাব এক ও এক উন্নতির আশায় সকলের হৃদয় পরিচালিত; তাহাদের ভাষা ও পরিচ্ছদ একরূপ; তাহাদের আচার ব্যবহার ও চরিত্রগত অনেক সাদৃশ্য আছে; এবং তাহাদের ধর্ম্মমত সাধারণতঃ এক। কোন কোন স্থলে তাহারা এক বংশোদ্ভব বটে; কিন্তু সকলের সম্বন্ধে একথা খাটে না। এক বংশোদ্ভব না হইলেও যদি অন্যান্য বিষয়ে সাদৃশ্য থাকে ও বিভিন্ন বংশীয় লোক-

দের মধ্যে বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক সম্বন্ধ ও সম্মিলনের উপায় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে প্রাচীন রোমক ও বর্ত্তমান ইংরেজ এবং ইউনাইটেডষ্টেট্‌স্‌বাসীদের ন্যায় কালে তাহারা যে এক জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া একটী বৃহৎ জাতিতে পরিণত হইতে পারে, তাহা মানবজাতির ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে এক প্রকার নিঃসংশয় বলিয়া বোধ হয়।

বাহুল্য ভয়ে অদ্য এই প্রস্তাবের কেবল প্রথম অংশটী বিবৃত করিয়া ক্ষান্ত হইতে হইল। ভারতবাসীদের সম্বন্ধে এই সকল কথা কতদূর খাটে ও ভারতবাসীর জাতীয় বন্ধনের পথে কি কি অন্তরায় আছে, তাহা আগামীবারে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

স্বাধীনতা।

প্রথম অধ্যায়।

উপক্রমনিকাতে বলা হইয়াছে, যে সকল স্থলে মানুষকে মানুষের উপর অত্যাচার করিতে দেখা যায়, সে সকল স্থলেই দুইটী মহাসত্যের অপলাপ দৃষ্ট হয় (১ম) মানুষ মানুষের ভাই (২য়) জগতের ধন ধান্যে, সুখ সৌভাগ্যে, কিম্বা রাজনৈতিক বা সামাজিক কার্য্যে সকলের সমান অধিকার। অদ্যাবধি জগতের যত স্থানে দাসত্ব প্রথা কিম্বা জন্মগত, ধনগত, শাসনগত, কি ধর্ম্মগত কোন না কোন প্রকার জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, সকল স্থানেই উক্ত উভয় মহাসত্যের বিলোপ দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রোমীয় ধনিগণ বহুসংখ্যক ক্রীতদাস রাখিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কোন কোন গৃহে দুই তিন শতেরও অধিক দাস থাকিত; পরে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, স্থলবিশেষে সহস্রাধিক দাস থাকিত। এরূপ শুনাযায়, রোমীয় সম্ভ্রান্ত মহিলারা বহুসংখ্যক ক্রীতদাসীদ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতেন, এবং অতি সামান্য সামান্য অপরাধে (যথা অলঙ্কার খানি যথা স্থানে সন্নিবেশিত না করা) তাহাদিগকে অসহ্য যন্ত্রণা দিতেন এবং কখনও কখনও বাঁধিয়া, প্রহার করিয়া, অনাহারে রাখিয়া, ইতর জন্তুদিগের দ্বারা খাওয়াইয়া, ও ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া অতি নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিতেন। তাঁহাদিগের এইরূপ নৃশংস আচরণে তাঁহাদের ভর্ত্তাগণ অসন্তোষ প্রকাশ করিলে, তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেন, "তবে কি একটা ক্রীতদাসকে মানুষের মত ব্যবহার করিতে হইবে?" বহুদূরের কথা নয়, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা দেশে দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। শুক্লবর্ণ খ্রীষ্ট শিষ্যগণ পোতারোহণে আফ্রিকার উপকূলে আগমন করিতেন, এবং শোণিত লোলুপ পশুযূথের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ নিরপরাধ কাফ্রিকদিগের গ্রামে পড়িয়া তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া পুরুষ, রমণী, বালক, বালিকাদিগকে ধৃত করিতেন, এতদ্ভিন্ন বিক্রয়ার্থে আনীত শত সহস্র ব্যক্তিকে ক্রয় করিতেন। ক্রয় করিয়া দলে দলে তাহাদিগকে শৃঙ্খলবদ্ধ করাহইত, এবং আমেরিকা দেশে উত্তীর্ণ করিয়া বাজারে বিক্রয়—

করা হইত। ইহাদিগের প্রতি যে ভয়ানক নির্দ্দয়তাচরণ করা হইত, তাহা বর্ণন করিতে লেখনী লজ্জিত হয়, এবং মনুষ্যের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে স্মরণ করিয়া মনুষ্যনামের প্রতি ঘৃণা জন্মে। জননীর ক্রোড়হইতে একমাত্র শিশু দুই বৎসরের বালককে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া বিক্রয় করা হইল, হতভাগিনী মাতা ধরাতে লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; পতির নিকট হইতে পত্নীকে ছিঁড়িয়া পতিকে এক জনের নিকট এবং পত্নীকে অপর জনের নিকট বিক্রয় করা হইল। এরূপ ঘটনা বিরল ছিলনা। বলিতে লজ্জা হয়, গৃহপালিত গাভী-কুলের ন্যায় বন্ধুবান্ধবের দাসদিগের দ্বারা ক্রীত দাসীদিগের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করা হইত। আমরাও মানুষ, ইহারাও মানুষ, এরূপ জ্ঞান থাকিলে কখনই এরূপ আচরণ হইতে পারিত না। আমেরিকার এই জঘন্য দাসত্ব প্রথার উন্মূলনের জন্য যে সকল সহৃদয় পুরুষ ও রমণী কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বার বার স্মরণ করাইয়া বলিতে হইয়াছে—"ওগো ইহারাও মানুষ, ইহারাও ঈশ্বরের সন্তান; ইহাদিগকে পশুর প্রায় ব্যবহার করিলে মহাপরাধ হয়।"

এইরূপে চিন্তাসহকারে আলোচনা করিলেই দৃষ্ট হইবে, সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল দেশের অত্যাচারকারী ও প্রজা-পীড়কদিগের মনে এই ভাবটী লুক্কায়িত থাকে যে, "ও ব্যক্তি আমার ন্যায় জগতের ধন ধান্যে, সুখ সৌভাগ্যে কিম্বা রাজ-নৈতিক ও সামাজিক মর্য্যাদাতে সমাধিকারী নয়; সুতরাং এ সকল হইতে উহাকে বঞ্চিত করা আমার পক্ষে ও সমাজের পক্ষে অন্যায় নয়।" আমাদের শাস্ত্রে কহে, "যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ" যজ্ঞে বলি দাইবার জন্যই পশু সকল সৃষ্ট হইয়াছে। জগতের প্রজা-পীড়ক ভূপতিদিগের শাস্ত্রেও চিরদিন কহিয়াছে, "রাজাদিগের জন্য প্রজারা সৃষ্ট।" মহাকবি মিল্‌টন বলিয়াছেন, "পুরুষ ঈশ্বরের জন্য এবং রমণী পুরুষের জন্য সৃষ্ট হইয়াছেন।" যে মিল্‌টন রাজকীয় অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি ধর্ম্মসমাজ মধ্যে ধর্ম্মাচার্য্যদিগের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব দেখিয়া সেই প্রভুত্বের অবসান করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন, যিনি তাহাদিগের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা বর্ষণ না করিয়া চারি ছত্র কবিতা লিখিতে পারিতেন না, যিনি মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য অকাট্য যুক্তি সকল প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, যিনি প্রথম চার্লসের হত্যার পর স্বাধীনতা পক্ষীয় বন্ধুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তুর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যাঁহার উক্তি সকল অদ্যাপি জলন্ত স্বাধীনতার ভাবের আদর্শ ও আকরস্বরূপ হইয়া আছে, সেই মিলটনও এই শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে কি প্রমাণ পাই? ইহাতে ইহাই অনুভব করি, সামাজিক প্রভুত্ব-প্রিয়তা মানব-মনে এমনি প্রবল যে, তাহা অতিশয় উন্নতমনা ব্যক্তিদিগের পক্ষেও দুরতিক্রমনীয়। বিশেষ চিরাগত সামাজিক প্রথা যদি এই প্রভুত্বের অনুকূল হয়, তাহা হইলে তাঁহাদেরও চিত্ত অজ্ঞাতসারে এই মহাভ্রমজালে জড়িত হইয়া পড়ে।

সে যাহা হউক, যে কারণে পরাধীনতা ও অত্যাচারের উৎপত্তি হয়, তাহা অবগত হইলে, স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারিব, এই জন্যই

সকল প্রকার অত্যাচারের এত আলোচনা করা যাইতেছে। রোমীয় প্রভু ও মার্কিন প্রভু বলিয়াছিলেন; "দাসগণ মানুষ নয়, জগতের ধনধান্যে, সুখশান্তিতে আমাদিগের ন্যায় উহাদের অধিকার নাই।" ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছিলেন, "শূদ্রগণ শাস্ত্র পাঠ করিবে না, শাস্ত্র প্রণয়ন করিবে না, রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবে না, অর্থাৎ যে সকল কার্য্যের দ্বারা মানবাত্মার উন্নতি হয়, জগতের কল্যাণ হয়, হৃদয় মনের গূঢ়শক্তি সকল বিকশিত হয়, চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, সে সকল কার্য্যে শূদ্রের অধিকার নাই এবং সে সকল কার্য্য হইতে শূদ্রদিগকে বঞ্চিত রাখা সমাজের পক্ষে অন্যায় নহে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণ কঠোর শাস্ত্রীয় শাসনের দ্বারা শূদ্রদিগের ভাবী উন্নতির পথে অর্গল পাত করিলেন। ইহার কি শোচনীয় ফলই ফলিল! মানসিক শক্তি সামর্থ্যের বিকাশোপযোগী ক্ষেত্র ও অবসরের অভাবে সহস্র সহস্র নিকৃষ্ট জাতীয় নরনারীর আত্মা হীনপ্রভ হইয়া রহিল; সামাজিক ঘৃণার তলে বাস করিয়া তাহাদের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের আকাঙ্ক্ষা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া গেল; আত্মাদর ম্লান হইয়া সকল প্রকার দুষ্কৃতি তাহাদের পক্ষে সহজ হইয়া পড়িল; "তোরা পশু" "তোরা পশু" এই কথা শুনিতে শুনিতে তাহারাও নিজ চক্ষে পশুবৎ হইয়া গেল; ভারতসমাজ তাহাদের পাপভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। অপর দিকে তাহাদিগের মধ্যে কত মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তির মনীষা, কত ধর্ম্ম-পরায়ণ লোকের ধর্ম্মভাব, কত সদাশয় নরনারীর সদাশয়তা সমাজের অবজ্ঞার তলে পড়িয়া প্রস্ফুটিত হইতে পারিল না, সে সকলের দ্বারা তাহাদের নিজের কল্যাণ ও জন সমাজের কল্যাণ সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতে পারিল না।

এতক্ষণের পর স্বাধীনতা কাহাকে বলে, তাহার আভাস আমরা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইতেছি! জগতের ধন ধান্যে, সুখ শান্তিতে, যে মানব মাত্রের সমাধিকার এবং ঈশ্বর প্রদত্ত শরীর মনের শক্তি সকলকে নিজের ও জগতের কল্যাণার্থ নিয়োগ করিবার যে সমাধিকার, সেই অধিকার দ্বয়কে অবাধে উপভোগ করিতে পারার নাম স্বাধীনতা। উক্ত উভয় প্রকার অধিকারকে একসূত্রে বদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত লক্ষণের আকারে অর্পণ করা যাইতে পারে—জগদীশ্বর মানবের দেহমনে যে সকল শক্তি দিয়াছেন, অবাধে সেই সকলকে তাঁহার অভীষ্টপথে নিয়োগ করিয়া সুখী ও উন্নত হইতে পারার নাম স্বাধীনতা। যে সমাজমধ্যে মানবের এই অমূল্য অধিকার প্রস্ফুট নয়, সেখানে কোন না কোন আকারে সামাজিক অত্যাচার সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে, কারণ উক্ত উভয় প্রকার অধিকার সকলের প্রাপ্য এবং আমরা তাঁহাতে বাধা দিব না, এই সংস্কারের উপরেই সকল প্রকার সামাজিক স্বাধীনতার ভিত্তি।

স্বাধীনতার যে লক্ষণ রচনা করা গেল তাহার ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ আবশ্যক বোধ হইতেছে। মার্কিন কাফ্রিদিগের দাসত্ব এবং ভারতীয় শূদ্রদিগের দাসত্বের দৃষ্টান্ত সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করা যাউক। উক্ত উভয় প্রকার দাসত্বের কি অনিষ্ট ফল ফলিয়াছিল, তাহা এক্ষণে যেরূপ অনুভব করা যাইতেছে, পূর্ব্বে কখনই সেরূপ উজ্জ্বল রূপে প্রতীতি করিতে পারা যায় নাই। আমেরিকার দাসত্ব প্রথা এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে, ভারতের জাতিভেদের প্রকোপ

ও অল্পে অল্পে শিথিল হইতেছে। তাহার ফল প্রত্যক্ষ কর।—আমেরিকার স্বাধীনতা-প্রাপ্ত কাফ্রিদিগের দ্বারা দিন দিন কত মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে! তাঁহাদের অনেকে ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়া যে কেবল দেশের ধনাঢ্যতা বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বিবী এমাওা স্মিথের ন্যায় অনেক পুরুষ ও রমণী সাহিত্যালোচনায়, বিজ্ঞান-চর্চ্চায়, ধর্ম্ম প্রচারে, ও জনহিতৈষণায় জীবন উৎসর্গ করিয়া আমেরিকার ও জগতের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-বিষয়ে কত সাহায্য করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, এতদ্বারা কি ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না? তিনি যে উদ্দেশ্যে মানবকে দেহ মনের শক্তিসকল দিয়াছেন, তাহা কি সুসম্পন্ন হইতেছে না? ভারতীয় জাতিভেদ প্রথা শিথিল হওয়াতেও এই সুন্দর ফল দৃষ্ট হইতেছে। যে সকল জাতি হিন্দুরাজত্বকালে নীচ ও ঘৃণিত বলিয়া পদতলে দলিত ছিল, ইংরাজ শাসনের সুবাতাসে মস্তক তুলিবার অধিকার পাওয়াতে, তাঁহাদের মধ্যে কত প্রতিভাশালী লোক দেখা দিতেছেন! কেবল যে তাঁহাদের অনেকে ধনশালী হইয়া দেশের ধন ধান্য বৃদ্ধি করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু বঙ্গসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাঁহাদের কত লোক প্রতিভা, মহত্ব ও মনুষ্যত্বের গুণে আমাদের অগ্রণী ও সমাজের শিরোমণি হইয়াছেন। রাজনীতি-সম্বন্ধে বঙ্গবাসিগণ প্রধানতঃ কাহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতেছেন? বিজ্ঞান সম্বন্ধে কাহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা দিতেছেন? ইঁহারা কে? ঘোর জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কি দশা ছিল? ইঁহাদের জ্ঞানপ্রভা ও চরিত্রের দ্বারা ভারতের যে কল্যাণ হইতেছে, তদ্দ্বারা কি ঈশ্বরের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে না? তবে ইঁহাদের সমজাতীয় লোকের এই সকল মনুষ্যত্ব ও মহত্ব এত কাল যে বলপূর্ব্বক চাপিয়া রাখা হইয়াছিল, ইহা কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য হয় নাই? পরে দেখ, ইংরাজেরা এদেশে কি করিতেছেন। তাঁহাদের অনেকে এ দেশীয়দিগকে বলিতেছেন, তোমরা বড় বড় পদগুলি পাইবে না, তোমরা আমাদের আজ্ঞাবহ থাক, আমাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য কর, আমাদের আপীষে কলম পেস; কিন্তু যে সকল কার্য্যে দায়িত্ব আছে, চিন্তার প্রয়োজন আছে, বহুজনের উপর শাসন ভার আছে, তাহা পাইবে না। ইহাতে কি তাঁহারা এদেশীয়দিগের ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি সকলের পথ রোধ করিতেছেন না? আজ মেজার বেয়ারিং রাজস্ব মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করাতে ইংলণ্ড হইতে লোক বাছিবার জন্য অন্ধকার দেখিতে হইতেছে কেন? সার, টি মাধব রাওকে কি উক্ত পদ দিলে চলিত না? যদি বল তিনি এত বড় কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। কে বলিল? ভাল, দিয়া কেন দেখ না? সে ব্যক্তির দ্বারা না হয়, দ্বার খুলিয়া রাখ, পরে উপযুক্ততর ব্যক্তি সকল আসিবে। একটা দেশ শুদ্ধ লোককে এরূপে চাপিয়া রাখিও না; তাহাদের দ্বারা তাহাদের নিজের দেশের যতটুকু কল্যাণ হইতে পারে, তাহার পথ রোধ করিও না। শম্ভুনাথ পণ্ডিতকে বিচারপতি করিবার সময় ভাবিয়াছিলে যে, সে কার্য্য এদেশীয়ের দ্বারা চলিবে কিনা, তৎপরে কি দ্বারকানাথ মিত্রের ন্যায় সুদক্ষ-লোক পাও নাই? দ্বার উন্মুক্ত রাখ, ঈশ্বর-

প্রদত্ত শক্তি সকল তাঁহার অভীষ্ট কার্য্যে খাটুক। সকল স্থলেই এই নিয়ম, যেখানে দেখিবে অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল শিথিল হইতেছে, সেই খানেই দেখিবে যে, মানবের ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তি সকলের দ্বারা তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে, এবং সর্ব্ববিধ লোকের সুখ বৃদ্ধি হইতেছে।

ঈশ্বর আমাদিগকে দেহ মনের যে সকল শক্তি দিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা সুখী হই, এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করি, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য; সুতরাং যে সমাজ মধ্যে নর নারী অবাধে সেই সকল শক্তিকে নিয়োগ করিতে পারে না, যে সমাজে এ-রূপ ব্যবস্থা যে, এক জনের বা একদলের সুখ বা উন্নতির পথ অবরোধ করিয়া অপর দলের সুখ বা উন্নতির পথ উন্মুক্ত করা হয়, যে সমাজে অগ্রে এক জনের সুখের রেখা পাত করিয়া পরে অবশিষ্ট স্থানে অপরের সুখের রেখা পাত করিতে হয়, সে সমাজ ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরুদ্ধ. তাহার মূলে অধর্ম্ম, তাহার ভিত্তিতে পাপ। সেই পাপ-বীজ হইতে পাপ ফলই প্রসূত হয়। চিকিৎসাতত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, মানব দেহের মধ্যে যতক্ষণ রতি প্রমাণ বিষাক্ত পদার্থ থাকে, ততক্ষণ শারীরিক ধাতু সকল সুস্থির হইতে পারে না, হয় ফুলিবে, না হয় বেদনা হইবে, না হয় পচিবে, না হয় ক্ষত প্রকাশ পাইবে, না হয় জ্বর প্রকাশ পাইবে। সে বিষাক্ত বস্তু শরীরের অভ্যন্তর হইতে বিদূরিত না হইলে শারীরিক ধাতু সকলের বিকারের বিরাম নাই। কোন না কোন প্রকারে শারীরিক যাতনা ভুগিতেই হইবে। সেই রূপ যে সমাজ গঠনের মধ্যে এই অন্যায় ও অধর্ম্ম থাকে, কাহার সাধ্য সে সমাজকে সামাজিক বিকার হইতে রক্ষা করে? দুই দিন না হয় দশ দিন, দুই বৎসর না হয় দুই শত বৎসর পরে, সে পাপ যত দিন সমাজ বক্ষ হইতে বিদূরিত না হইবে, সে কণ্টক যতদিন সমাজের চরণ হইতে উৎপাটিত না হইবে, তত দিন সমাজের শান্তি নাই, ততদিন সে সমাজ মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার অনল জ্বলিতে থাকিবে, ততদিন দলে দলে কাটাকাটি, রাজায় প্রজায় বিবাদ, বারবার সামাজিক বন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন করিবার চেষ্টা চলিতে থাকিবে। কাহার সাধ্য সেই অধর্ম্ম ও অন্যায়ের বীজ সমাজ-বক্ষে নিহিত থাকিতে সে সমাজকে সুখ শান্তিতে রক্ষা করে? কি মানবাত্মা, কি জনসমাজ, সত্য ভিন্ন, ন্যায় ভিন্ন, ধর্ম্ম ভিন্ন কাহারই প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই। যদি কাহারও ইতিহাসের কোন প্রমাণিত সত্য বিশ্বাস করিবার ইচ্ছা থাকে, এই সত্যটী ভাল করিয়া হৃদয়পটে মুদ্রিত করিয়া রাখুন।

মানুষ একা যাহা করিতে পারে না, দশ জনের সাহায্যে তাহা করিবে এই জন্যই জন-সমাজ। একা সম্পূর্ণ রূপে আত্মরক্ষা করিতে পারে না, একা ভয় বিপদ হইতে ত্রাণ পাইতে পারে না, একা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী সকল সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে না, একা আপনাকে সুখী করিতে পারে না, একা নিজের উন্নতির সকল উপায় অবলম্বন করিতে পারে না, এই জন্যই জন সমাজ। অতি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলেই অনুভব করিতে পারা যাইবে যে, ঈশ্বর মানবের দেহ মনে যে সকল শক্তি দিয়াছেন, তদ্দ্বারা মানবের সুখ ও উন্নতিলাভ বিষয়ে সাহায্য করা জনসমাজের প্রধান কর্ত্তব্য।

যে সমাজ যে পরিমাণে এবিষয়ে অনুকূল, সে সমাজ সেই পরিমাণে নিজের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। সুতরাং জন সমাজ যে, কেবল ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক নর নারীর স্বাধীনতার পথরোধ করিবেন না, কেবল যে অবাধে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় দেহ মনের শক্তি সকলকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দিবেন, তাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেকের সুখী হইবার ও উন্নতি লাভ করিবার পক্ষে যে কিছুর প্রয়োজন তাহা যোগাইয়া সকলকে সাহায্য করিবেন। জন-সমাজের লক্ষ্য যদি এত মহৎ হয়, তবে ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীনতাতে হস্তার্পণ করা যে তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ঈশ্বর যাহাকে যে কিছু শক্তি দিয়াছেন,সে সমুদায়ের নিয়োগ করিয়া সে আপনার সুখ ও উন্নতি লাভ করুক, আমি তাহার পক্ষে অন্তরায় হইব না। এই মূলনিয়ম অবলম্বন করিয়া জনসমাজ সকল স্থানে কার্য্য করিবেন।

তবে কেন দস্যু, তস্কর, পরদ্রোহী ব্যক্তিদিগকে স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়? জনসমাজের এ অধিকার আছে। তুমি যথেষ্ট আপনার শক্তি সকলকে নিয়োগ করিয়া নিজের সুখ ও উন্নতি লাভের চেষ্টা কর, কিন্তু তোমার অপরের সুখ ও উন্নতির পথ অবরোধ করিবার অধিকার নাই। অন্যে তোমার পক্ষে অন্তরায় হইবেনা, তুমিও অন্যের পক্ষে অন্তরায় হইও না। যদি তুমি কাহারও পক্ষে অন্তরায় হও, তবে তাহাকে রক্ষা করা সমাজের কর্ত্তব্য, সে জন্য সমাজ তোমাকে শাস্তি দিতে বাধ্য; কিন্তু যতক্ষণ একের দ্বারা অপর কাহারও সুখ বা উন্নতির পথ অবরুদ্ধ না হইতেছে, ততক্ষণ জন-সমাজ কাহারও কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিবেন না। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই মূল নিয়মাবলীকে বিশদ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। মনে কর, আমার পৈতৃক আবাস ভূমিটী অতি সংকীর্ণ, এক্ষণে আমি দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছি; আমার পদ বৃদ্ধি সহকারে, আত্মীয় ও কুপোষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, বাড়ীটী না বাড়াইলে আমি সুখী হইতে পারিতেছি না। আমার প্রতিবেশী একটী বিধবা, এ সংসারে তাহার আপন কেহ নাই, বলে সে আমার সমকক্ষ নয়; সুতরাং আমি বলপূর্ব্বক তাহার পাঁচ কাঠা ভূমি হরণ করিয়া আমার অশ্বশালা গো শালা প্রভৃতি প্রস্তুত করিলাম, জনসমাজ এরূপ কার্য্য হইতে দিবেন না। সেই অবলার বল হইয়া আমাকে শাস্তি দিয়া তাহার বস্তু তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। কিন্তু মনে কর আমি ন্যায্য মূল্য দিয়া পাঁচজন প্রতিবেশীর পাঁচবিঘা ভূমি খরিদ করিয়া আপনার আবাস বাটী প্রশস্ত করিলাম, জন সমাজ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না। এরূপ স্থল আছে, যেখানে আমার দ্বারা অপরের সুখের ব্যাঘাত হইতে পারে, অথচ জন সমাজ আমার কার্য্যে হস্তার্পণ করিবেন না। প্রথমতঃ মনে কর হিন্দুগণ বাদ্যোদ্যম করিয়া আপনাদের দেবমূর্ত্তি সকল, লইয়া গেলে সহরের মুসলমানদিগের ক্লেশ হয়; অথবা একটী প্রকৃত ঘটনা স্মরণ করা যাউক, "মুক্তি ফৌজ" নামক খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ বোম্বাই নগরের রাজপথ দিয়া গান করিতে গেলে তত্রত্য হিন্দু ও মুসলমানগণ বিরক্ত হয়। এস্থলে সমাজের কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্যের পথ অতি পরিষ্কার। সমাজ যদি ভীরু ও কাপুরষ না হন, তাহা হইলে অত্যাচার কারীদের প্রতি ভ্রুকুটী করিয়া বলিবেন

ইহারা রাজপথ দিয়া যাইবে তাহাতে তোমাদের কি! ইচ্ছা হয় তোমারাও দশ শত বার যাও, তাহার পথে কেহ প্রতিবন্ধক হইতেছে না। তোমাদের বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে যেমন তোমাদের অধিকার, ইহাদের বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করাও তেমন অধিকার। ইহা না হইয়া সমাজ যদি হিন্দুদিগকে বলেন,মুসলমানেরা বিরক্ত হয় অতএব তোমরা দেব দেবীর মূর্ত্তি বাহির করিতে পারিবে না, মুসলমানদিগকে যদি বলেন,হিন্দুগণ অসন্তুষ্ট হয় অতএব তোমরা গোঁয়ারা বাহির করিতে পারিবে না, মুক্তিফৌজকে যদি বলেন, লোক অসন্তুষ্ট হয় অতএব তোমরা গান করিতে পারিবে না, তাহা হইলে লোকের স্বাধীনতা হরণ করা হয় এবং কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। আর একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর, আমি এবং আর দশ জন লোক আমরা সকলে একটী কর্ম্মের জন্য প্রার্থী হইয়াছি। ইহা নিশ্চিত, আমার আবেদন যদি গ্রাহ্য হয় তবে আর ৯জন ব্যক্তি নিরাশ হইবে, আমি সুখী হইলে আর ৯ জনের সুখের ব্যাঘাত হইবে। এস্থলে ত একজনের সুখের দ্বারা অপরের সুখের ব্যাঘাত হইতেছে, এস্থলে জনসমাজের কর্ত্তব্য কি? এস্থলেও জনসমাজ দেখিবেন, আমি কাহারও পথ আবরণ করিতেছি কিনা। আমি যদি কাহারও আবেদন কর্ম্মদাতার হস্তে যাইতে না দিতাম, যদি মনে কর ডাকঘর হইতে তাহা হরণ করিতাম, কিম্বা যদি তাঁহার গুণাবলী কর্ম্মদাতার জ্ঞাত হইবার পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিতাম, কিম্বা যদি কর্ম্মদাতার নিকট তাঁহার কুৎসা রটনা করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইতাম, তাহা হইলে তাঁহার পথ আবরণ করা হইত। কিন্তু এস্থলে তাহা নহে; আমার পথ যেরূপ উন্মুক্ত, তাঁহারও পথ তেমনি উন্মুক্ত। যদি তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য না হইয়া থাকে তাহা আমার দোষে নয়, কিন্তু তাঁহারই দোষে। হয় তাঁহার উক্ত কর্ম্মের মত যোগ্যতা নাই না হয় তিনি নিজের গুণাবলী প্রকৃত রূপে কর্ত্তৃপক্ষের বিদিত করিতে পারেন নাই, না হয় অসময়ে আবেদন করিয়াছেন। যে কার্য্যে আমার অপরাধ নাই সে জন্য আমি দণ্ডনীয় হইতে পারি না, সুতরাং সমাজ আমার স্বাধীনতাতে হস্তার্পণ করিতে পারেন না।

উপরে যে যে বিষয় বিচারিত হইল, তদ্দারা এই কয়েকটী মূল সত্যে উপনীত হওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ ঈশ্বর যাহাকে যে কিছু শরীর মনের শক্তি দিয়াছেন সে ব্যক্তি তদ্দারা নিজের সুখ ও উন্নতির পথ আবিষ্কার করিবে, সমাজ সে পক্ষে অন্তরায় হইবেন না, কিম্বা অপরকে অন্তরায় হইতে দিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, যে স্থলে এক ব্যক্তি নিজের সুখ ও উন্নতির পথ আবিষ্কার করিতে গিয়া অপরের পথ অবরোধ করে, সে স্থলে সমাজ দুর্ব্বলের রক্ষার্থ তাহার স্বাধীনতাতে হস্তার্পণ করিতে অধিকারী। তৃতীয়তঃ এতদ্ভিন্ন আর সকল স্থলে সমাজের অন্তর্ভূত প্রত্যেক ব্যক্তির ও দলের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কেবল তাহা নহে, সমাজ যে কেবল রক্ষক তাহা নহে, সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক নর নারীর সকল প্রকার উন্নতির বন্ধুও সহায় হওয়া উচিত। অর্থাৎ সমাজ যে কেবল আমার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইতে দিবেন না, তাহা নহে, কিন্তু আমি যাহাতে সর্ব্বতোভাবে উন্নতি লাভ করিতে পারি, তাহার উপায় ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। ক্রমশঃ।

ওয়ার্ডসোয়ার্থ, কীট, ও শেলীর প্রেতাত্মার আবাহন।

আজিও প্রকৃতি রয়েছে তোমার,
সেই মধুময় পুরাণ শোভা,
আজিও শরীরে ফুটিছে তোমার
শত ২ সুখ-চাঁদের আভা।
আজিও তোমার মাথার উপর
দিগন্ত ছাইয়ে অনন্ত অম্বর,
নিশীথে, দিবসে, ফুটায় হরষে
রবি শশী আর উজল তারা।
অকূল সাগরে, ঊর্ম্মিখেলা করে,
ভাসে শত পোত কাতারে কাতারে,
আজিও আসিয়ে, মিশিছে ভাসিয়ে,
শত নদ নদী পাগল পারা।
আজিও আকাশে মেঘ ভেসে যায়,
অজস্র ধারায় বরষি বারি;
আজিও নিদাঘে ঝটিকার বায়,
প্রবল চঞ্চল দুরন্ত ভারি।
আজিও তোমার শ্যামল কানন,
বিহগ কূজনে কূজিত গো!
আজিও রয়েছে মানব ভবন,
হরষ বিষাদে জড়িত গো!
সকলি রয়েছে প্রকৃতি তোমার,
তিলেক ওরূপ পড়িনি খসি;
তেমনি দেখিছি উজল তোমার,
রয়েছে মুখের বিমল হাসি।
কিন্তু গো তোমার রূপের পূজক,
গুণের পূজক যাহারা ছিল,
কোথা গো প্রকৃতি কোথা গো তাহারা
কোন স্রোতকারে ভাসায়ে নিল!
কোথা শেলী, কীট, ওয়ার্ডসোয়ার্থ,
বড় ভাল যারা বাসিত তোরে;
রেখেছ কি পূরে, বুকের ভিতরে?
দেখাও ও বুক দেখাও চিড়ে।
আছে সে "ওয়াই" আছে "টিণ্টরণ্" *
আছে সে "কুকুর" তান †
এসব দেখিয়ে; এসব শুনিয়ে,
কাঁদে নাকো আর কাহারও প্রাণ।
এখন(ও) নিশীথ-বিহগের গান ‡
তরু কুঞ্জ মাঝে পড়ে গো ঝরি,
কিন্তু কোথা কীট্, কে শুনি সে তান,
চায় উড়ে যেতে আকাশ ধরি?
সুদূর বিমানে এখনো চাতক§
উৎসাহ সঙ্গীত ছড়ায়ে দেয়,
কত শত মেঘ এখন তখন¶
ভাসিয়ে আকাশে চলিয়ে যায়।
কিন্তু কোথা শেলী? তাই তো গো বলি,
প্রকৃতি লো তোর সকলি আছে,
পূজক তোমার, সেবক তোমার,
প্রেমিক তোমার, চলিয়ে গেছে!
আয় শোভাময়ি! আয় আয় তবে,
দুজনা মিলিয়ে খুলিয়ে প্রাণ,
অমর তাঁদের প্রেতের উদ্দেশে,
গেয়ে গেয়ে ফিরি বিষাদ গান!
কোথা গো তোমরা, কবিকুলচূড়া
এ প্রাণে আসিয়ে উদয় হও,
প্রকৃতিরে আজি দেখিব ভেবেছি,
কবিতা সাধনা করিব ভেবেছি,
এ প্রাণ সঙ্গীতে মাখায়ে দেও!

* ও † "ওয়াই এবভ্ টিণ্টরণ" ও "কুকু" ওয়ার্ডসোয়ার্থের কবিতা।

‡ 'নাইটিংগেল' কীটের একটী কবিতা।

§ ¶ "স্কাইলার্ক" ও 'ক্লাউড্' শেলীর কবিতা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সত্য কথা লিখিলে বা বলিলে অনেক বন্ধুর হৃদয়ে যে আঘাত লাগে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম, কিন্তু সত্য-সেবায় রত থাকিলে উদারতার হ্রাস হয়, ইহা আমরা এবার কোন কোন সহযোগীর মুখে শুনিলাম। আমাদের বিশ্বাস, সত্য-সেবাতেই উদারতা, সত্যের অপলাপের চেষ্টাতেই অনুদারতা। আমরা সত্যের অনুরোধে যদি কাহারও হৃদয়ে ব্যথা দিয়া থাকি, বিনীত অন্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু সত্যকে গোপন করিয়া কাহাকেও সন্তুষ্ট রাখিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। এজন্য সমস্ত দেশ আমাদের বিরোধী হইতে পারে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু সে জন্য আমরা কুণ্ঠিত বা ভীত নহি। সমস্ত পৃথিবীও যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তবুও সত্যের রাজ্য আমরা প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাই। অন্য দিকে মিথ্যাকে সর্ব্ব প্রযত্নে পৃথিবী হইতে তিরোহিত করিতে চাই। সর্ব্বপ্রযত্নে সত্যকে স্থায়ী এবং মিথ্যাকে তিরোহিত করিবার জন্যই 'নব্য-ভারতের' সৃষ্টি হইয়াছে।

সত্যের অনুরোধে আমাদের সকল প্রকার ভ্রম সংশোধন করিতে আমরা প্রস্তুত। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি—অনিচ্ছার সহিত অবশেষে লর্ড রিপণ কুলিআইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্ববারে আমরা লিখিয়াছিলাম,—কুলি-বিল নামঞ্জুর হইয়াছে; পূর্ব্বে ইহাই শুনা গিয়াছিল বটে; কিন্তু পরে জানা গিয়াছে, বিল পাশ হইয়াছে, টমসন সাহেবের আর একটী গৌরবের চিহ্ন ইতিহাসে স্থায়ী হইয়াছে !!

যন্ত্র সম্বন্ধীয় আইন প্রচার করিয়া লর্ড লিটন ভারতের স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন, অনেক সাহেবের পক্ষে এ প্রলোভনের হাত অতিক্রম করা বড় সহজ কথা নয়। কুক্ষণে রিপণ বাহাদুর ভারত-হিতৈষী (?) সাহেবদিগের যশের ব্যাঘাত ঘটাইলেন, নচেৎ এতদিনে হয়ত বাঙ্গালায় তুমুল আন্দোলন উঠিয়া যাইত। আমরা ষ্টেট্‌সম্যানের নিকট শুনিলাম, কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কতকগুলি কুচক্রী বাঙ্গালি-বিদ্বেষী সাহেব দেশীয় সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য এক গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া টমসনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল। বাঙ্গালার হিতৈষী ধার্ম্মিকপ্রবর (?) ছোট লাট সাহেব সরাসরী অনুমতি না দিয়া রিপণের পরামর্শ প্রার্থনা করেন। কিন্তু লর্ড রিপণ প্রস্তাবে অসম্মত হন। টমসনের নাম তবে আর কি উপায়ে দেশে স্থায়ী হইবে? বাঙ্গলার এমন উপকারী বন্ধু আর নাই !!

এসমেড্ বারলেট সাহেব প্রাণপণে রিপণ বাহাদুরকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় আছেন। এই মহাত্মা ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে সত্বরই পার্লিয়ামেণ্টে আন্দোলন উপস্থিত করিবেন। কিন্তু আমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই—মন্ত্রীবর গ্লাডোষ্টোন, প্রভৃতি অনেক সদাশয় ব্যক্তি রিপণের পক্ষে আছেন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গালার ছোট লাট টমসন সাহেব বিলের বিরুদ্ধে থাকিলেও, ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গলার তিন জন শাসনকর্ত্তাকে বিলের পক্ষে দেখা যাইতেছে,—ইহাঁদিগের নাম ইডেন, টেম্পল, এবং ক্যাম্বেল। ষ্টেটস্‌ম্যান বলেন, বাঙ্গলার হাইকোর্ট বিলের বিরুদ্ধ হইলেও,

বম্বে ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের হাইকোর্ট সম্পূর্ণ বিরোধী নহে। ইঁহারা বিলে একটু সংশোধন করিতে ইচ্ছা করেন। উক্ত পত্রিকা বলেন, বম্বে, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, আসাম এবং বর্ম্মার গবর্ণমেণ্ট সকলকে বিলের পক্ষে ধরা যায়; মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের কথা ঠিক বলা যায় না। নিম্নশ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীগণ অধিকাংশই বিলের বিরুদ্ধে বটে, কিন্তু তাহাতে কি রিপণ নৈরাশ বা ভীত হইবেন? এত আন্দোলনের পর যদি বিল পাশ না হয়, তাহা হইলে রিপণের মুখ দেখাইবার আর স্থান থাকিবে না।

মেজর ব্যারিং রিপণের দক্ষিণ হস্ত—সেই ব্যারিং ভারত পরিত্যাগ করিবেন, এ সংবাদে ভারত চকিত হইয়া উঠিয়াছেন। স্বায়ত্ত শাসন বিল, ইলবার্ট বিল, প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের বিল প্রভৃতি অমীমাংসিত থাকিতে ব্যারিং চলিলেন, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। বিংকোটী ভারতসন্তান মিলিয়া কি এই মহাত্মার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ও মহারাণীর নিকট আবেদন করা যায় না?

আজ কাল পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যত বিষয় উত্থাপিত হইতেছে, অতীত কালে কখনও এত বিষয়ের প্রশ্ন উক্ত সভায় উপস্থিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, পার্লিয়ামেণ্ট সভায় ভারতবন্ধু ফসেটের আসন বুঝি শূন্যই থাকিবে। সৌভাগ্যের বিষয়, ওডনেল আমাদের সে আশঙ্কা দূর করিয়াছেন। ওডনেল সাহেব আজকাল বিশেষ যত্ন সহকারে ভারত সংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনা করিতেছেন। ওডনেল দীর্ঘজীবী হইয়া ভারতের পরম উপকার সাধন করুণ, আমরা স্থান এবং সময়ের দূরত্ব বিস্মৃত হইয়া হৃদয়ের নিভৃত স্থানে তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

এত দিন পরে এই হৃদয়-বিদারক কথা শুনিলাম—"ভারতসভা যে ভাবে সংগঠিত, ইহাকে প্রজার প্রতিনিধি সভা বলা যাইতে পারে না"। প্রজা ভূম্যধিকারী আইনের পাণ্ডুলিপি আজও গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে, জমিদার পক্ষের লোকেরা সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে আইন বিধিবদ্ধ না হয়, এই সময়ে এই নিদারুণ কথায় কোন্ প্রজাহিতৈষী দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারেন? যে সময় হইতে এই আইন সংশোধনের প্রস্তাব উঠিয়াছে, সেই সময় হইতে ভারতসভা প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন,—কত স্থানে সভা করিয়াছেন—কত লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন! কিন্তু হঠাৎ "সঞ্জীবনীর" নিকট, এই অসময়ে, এই নিদারুণ কথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম,—চক্ষু হইতে জল পড়িল! ভারত সভার পানে চাহিয়া আমরা অসংখ্য দরিদ্র প্রজার কষ্টদুঃখ ভুলিয়াছিলাম—মনে করিয়াছিলাম—ভারত সভা থাকিতে প্রজাদের আর ভয় নাই। কিন্তু হায়, এত দিনে বুঝিলাম দরিদ্র প্রজাদের 'মা বাপ' বাঙ্গলায় নাই। এই দুঃখেই প্রজাহিতৈষী 'সাধারণী' বলিতেছেন—"প্রজার দোহাই দিয়া অনেক সভা সংসারে অবতীর্ণ হন বটে, কিন্তু একটু শক্তি সামর্থ হইলেই আর প্রজাহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিতে চান না;—তখন তাঁহারা বিশ্ব-বান্ধব হইতে চান।" সঞ্জীবনী প্রজাদের একটী সভা সংস্থাপনের জন্য যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে,—কিন্তু এই বিপদের সময় প্রজার পক্ষ হইয়া কে কথা বলিবে? প্রজাদের কোন লোক কৌন্সিলে

নাই,—প্রজাদের কোন কৃষ্ণদাস পাল নাই—প্রজাদের কোন 'হিন্দু পেট্রিয়ট নাই।' এক আশাস্থল ছিল—ভারতসভা, সময় বুঝিয়া তিনিও অন্য আন্দোলনে মাতিয়াছেন! এই সময়কার উপায় যদি "সঞ্জীবনী" বলিয়া দিতে পারেন, আমরা বাধিত হইব। আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল—প্রজাহিতৈষী রিপণ ও তাঁহার কৌন্সিল। সেই কৌন্সিল হইতেও ব্যারিং চলিয়া যাইতেছেন। কিছু দিন বাদে এই রিপণও যদি চলিয়া যান, তবেই সকল আশার মূল উচ্ছেদ হয়। আশাশূন্য হইয়া আমরা প্রজাদিগকে লইয়া কাঁদিতে থাকি।

এঙ্গলোইণ্ডিয়ানেরা যে প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, তবে বুঝি স্বায়ত্ত-শাসন আর প্রচলিত হয় না! প্রকাশ্যে এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া ইহারা ভিতরে ২ মিউনিসিপালিটীর দোষ অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিল;—অবশেষে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর দোষ দেখাইয়া প্রায় ২০০ স্বাক্ষরসম্বলিত একখানি আবেদন ছোট লাট বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর নির্ব্বাচিত কমিসনারদিগের দ্বারা যখন কার্য্য চলিতেছে না, তখন স্বায়ত্ত-শাসন এদেশে চলিতে পারেনা, ইহাই প্রতিপন্ন করা বোধ করি ইহাদের অন্তরের ইচ্ছা। চারি মাস পূর্ব্বে হইতে ইংলিসম্যান ড্রেন, বস্তী ও পচাপুকুরের কথা তুলিয়া সকলকে মাতাইতে ছিলেন! ছোট লাট সাহেব আবেদন খানি মিউনিসিপাল কমিসনারদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, কমিসনার মহাশয়গণ বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্য করিবেন। তাঁহাদের পারদর্শিতার উপরে দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রচলিত হওয়া অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে, এটী যেন স্মরণ থাকে।

সাধারণী যাহাই বলুন, ভবিষ্যতে আবার লীটনের ন্যায় শাসনকর্ত্তা আসিতে পারে বলিয়া, রিপণের গুণ ঘোষণা করিতে আমরা বিরত থাকিব না। ভাল বস্তুকে ভাল বলিতে যদি ভারত কাতর হয়, তবে দুঃখের সীমা থাকিবে না। আমরা পূর্ব্ব বারেও বলিয়াছি, এবারেও বলিতেছি,—রিপণের জন্য গ্রামে ২ সভা হউক। এত আন্দোলনের পর ইলবার্ট বিল যদি পাশ না হয়, তবে রিপণের দুঃখের সীমা থাকিবে না—ভারতবর্ষ চক্রান্তকারী ইংরাজদিগের দর্পে কম্পিত হইবেন! তাহা হইলে আর কি কেহ কখনও সাহেবদিগের মতের বিরুদ্ধে কোন আইন বিধিবদ্ধ করিতে পারিবে? কখনই না। আন্দোলনে বিলাতের ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংশোধিত বিল স্থগিত হইল;—ইহাতে আমরা কি শিক্ষা পাইলাম? যাহা শিক্ষা পাইলাম—তাহাতে প্রাণ সিহরিয়া উঠিল—ইলবার্টের বিলের পরিণাম ভাবিতে চক্ষে জল আসিল! যদি এত আন্দোলনের পর বিল পাশ না হয়—নিশ্চয় রিপণ ভারতকে কাঁদাইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন। এই আশঙ্কা থাকিতেও কি ভারত রিপণ ও ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবেন?—ভারতের পক্ষে সকলই সম্ভব।

সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে সেকেন্দরাবাদ কলেজের প্রিনসিপাল দেশহিতৈষী ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় অপমানের সহিত নিজাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পদচ্যুত ও নিষ্কাশিত হইয়াছেন। এই অবিচার উৎপন্ন সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। চান্দা রেলওয়ে সংক্রান্ত গোলযোগে কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়া নিজাম রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিবেন না?

জীবন-গতি নির্ণয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সামাজিক কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন।

"Step by step the notion of evolution by law is transforming the whole field of our knowledge and opinion. It is not one order of conception which comes under its influence: but it is the whole sphere of our ideas, and with them the whole system of our action and conduct. Not the physical world alone is now the domain of inductive science, but the moral, the intellectual, and the spiritual are being added to its empire. *** It was the last task of the astronomer to show eternal change even in the grand order of our solar system. It is the *crown* of philosophy to see immutable law even in the complex action of human life."* (Canon Kingsley's Lecture on the limit of Exact Science as applied to History)

জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তের ইতিহাস বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, জাতীয় জীবন্ (national life) জন বিশেষের জীবনের ন্যায়, পর্য্যায়ক্রমে বাল্যাবস্থা, যৌবনাবস্থা, প্রৌঢ়াবস্থা এবং বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এবং এক একটী মনুষ্যের জীবনের ন্যায় জাতীয় জীবনও অবশেষে বিলয় প্রাপ্ত হয়। কি ভারতবর্ষ, কি গ্রীস, কি রোম, সমুদায় প্রাচীন রাজ্যের ইতিহাসই এই বিষয় স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিতেছে।

অতি ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট একটী সামান্য এবং অপরিচিত জনপদ হইতে ভাবী বহুবিস্তীর্ণ চিরপ্রসিদ্ধ প্রবল পরাক্রান্ত রোম রাজ্য সমুৎপন্ন হইয়াছিল। রোমের ইতিহাস পাঠ করিলে বোধ হয়, রোম যেন একটী সদ্য-প্রসূত বালকের ন্যায় ভূমিষ্ট হইয়া কালসহকারে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইল, এবং তৎপরে সেই যৌবন মদে প্রমত্ত হইয়া তৎকালজ্ঞাত সমুদায় দেশ-প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য লোলুপ হইয়া উঠিল। কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে যৌবনাবসানে প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত মাত্রই যৌবনসুলভ প্রখর তেজস্বিতা ও প্রমত্ততা বিবর্জ্জিত হইল এবং তখন প্রৌঢ়োচিত প্রশান্ত ভাব ধারণ পূর্ব্বক সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং রাজনীতি বিষয়ে সমধিক পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া, যুদ্ধ কিম্বা রাজ্যলাভ-তৃষ্ণা অধিক পরিমাণে পরিত্যাগ করিল। আবার সেই প্রৌঢ়াবস্থা অতিবাহিত হইলে রোম বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত ক্রমে নিস্তেজ হইতে লাগিল। সেই শেষাবস্থায় রোমান জাতির আর ভাবী উন্নতির আশা রহিল না। সুতরাং বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক রোম পরাস্ত হইয়া একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হইল। কিন্তু দীর্ঘ কালাতিপাত নিবন্ধন ফল-প্রসবাসমর্থ প্রাচীন

* This passage is quoted by Canon Kingsley in his lecture from an anonymous writer.

বৃক্ষের ন্যায়, রোম সমূলে উৎপাটিত হইলে পর, আবার তাহারই মূলদেশ হইতে স্থানে স্থানে নব নব জাতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। প্রাচীন গ্রীস রাজ্যের সমগ্র ইতিহাস বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, গ্রীকদিগের জাতীয় জীবনও যে এই প্রকার চারিটী অবস্থাতে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে।

আমাদের দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এবং কলি এই চারিটী যুগ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে নানাবিধ ভ্রমাত্মক সংস্কার প্রচলিত আছে। কিন্তু বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে যে, সত্যযুগ জাতীয় জীবনের বাল্যাবস্থা, ত্রেতাযুগ যৌবনাবস্থা, দ্বাপরযুগ প্রৌঢ়াবস্থা এবং কলিযুগ বৃদ্ধাবস্থা। আর্য্য মহর্ষিগণ এক একটী যুগের যেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং এক এক যুগে যেরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং রাজনীতি প্রচলিত ছিল, তদ্দৃষ্টে স্পষ্টতঃ বোধ হইতেছে যে, জাতীয় জীবনের এক একটী অবস্থাই এক এক যুগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবার চারিযুগে এক কল্প পূর্ণ হয়, এবং কল্পান্তে মহাপ্রলয় হইয়া পৃথিবী বিলয় প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার যে কথিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাও নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, জাতীয় জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে দীর্ঘকালব্যাপী সময়, তাহাকেই কল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে সমাজ বিজ্ঞানের যেরূপ সমালোচনা হইতেছে, সেই প্রকার আর্য্য দার্শনিকগণের মধ্যে যে কতক পরিমাণে সমাজ বিজ্ঞানের (Sociology) চর্চ্চা প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যুত সমাজ বিজ্ঞানের মূলসূত্রনিচয় অবলম্বন করিয়াই আর্য্যদার্শনিকগণ যুগ নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সেই যুগার্থ সম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের নানাপ্রকার কল্পিত এবং ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়াছে। আর্য্যপণ্ডিতগণের কোন একটী বিষয় শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে, তাহারা এক একটী ভাবকে, কি অবস্থাকে, কিম্বা বিষয়কে একটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন অথবা নাম দ্বারা অভিহিত করিয়া সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। আর্য্যদিগের ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলে দেখা যায়, কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন কিম্বা নাম দ্বারা কতকগুলি বর্ণকে কিম্বা ধাতুকে অভিহিত করিয়া পরে তদ্দ্বারা সূত্র রচনা করিয়াছেন। সুতরাং সামাজিক এক একটী অবস্থাকে এক একটী "যুগ" এই নাম দ্বারা অভিহিত করিয়া, তাঁহারা এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাল-প্রচলিত সামাজিক ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না।

বস্তুতঃ আমরা প্রত্যেক প্রাচীন জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে জাতীয় জীবনের মধ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি যুগের লক্ষণ সকল দেখিতে পাইয়া থাকি। ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন জাতির আদিম অবস্থা হইতে শেষাবস্থা পর্য্যন্তের ইতিহাস বিশেষ রূপে তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রত্যেক জাতীয় জীবনই এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট এবং অখণ্ডনীয় নিয়ম দ্বারা চিরকাল পরিশাসিত হইতেছে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতি

হাসের মধ্যে যে ঐক্যতা রহিয়াছে, তাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক দেশীয় লোকের জাতীয় জীবনের সহিত অপর দেশীয় লোকের জাতীয় জীবনের যে সকল বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, সেই সমস্ত বিভিন্নতার মূল কারণ কেবল স্থান বিশেষের মৃত্তিকা, জল, বায়ু, উত্তাপ ইত্যাদির বিভিন্নতা মাত্র। মনুষ্য প্রকৃতি সকল দেশে এবং সর্ব্বকালেই এক প্রকার নিয়মাধীন বটে, সুতরাং কেবল বাহ্যিক ব্যবস্থার বিভিন্নতা নিবন্ধন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে কিছু বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে অপর কোন প্রকারের বিভিন্নতার বিদ্যমানতা সম্ভব হইতে পারে না। বস্তুতঃ প্রত্যেক মনুষ্য-প্রকৃতি এক প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন বলিয়া স্বীকার করিলে, মনুষ্য সমাজের কার্য্যকলাপ যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন, তাহা সহজেই স্থিরীকৃত হইবেক। কিন্তু মনুষ্য সমাজ কি প্রকারে গঠিত হইয়াছে এবং সামাজিক উন্নতি এবং অবনতি কি প্রকার নিয়মাধীন, তাহা অগ্রে অবধারণ না করিলে সামাজিক কার্য্যকলাপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন কিনা, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রতীতি হইতে পারে না। অতএব সমাজগঠন সম্বন্ধীয় মূল সূত্রগুলি সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। এই অধ্যায়ে আমরা সাধারণতঃ কেবল সামাজিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলের উল্লেখ করিয়া তৎপর সামাজিক গতি সম্বন্ধীয় দুই একটী সাধারণ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন দ্বারা সামাজিক পরিবর্দ্ধন (social growth by process of evolution) সামাজিক বিশ্লেষণ (theory of social segregation) এবং সামাজিক গতির সাম্যভাব (equilibrium of social movement) এই তিনটী বিষয় ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইবে।

প্রত্যেক নর নারী এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজের এক একটী পরমাণু স্বরূপ। পরমাণু সকল স্বকীয় গতি (molecular motion) বিবর্জ্জিত হইয়া যোগাকর্ষণ দ্বারা একত্রিত হইলে যেমন এক একটী বস্তুর আকার ধারণ করে, সেই প্রকার প্রত্যেক মনুষ্য স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনগতি বিবর্জ্জিত হইয়া, পরস্পরের সহিত সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে সমাজ গঠিত হয়। এক একটী পরমাণু যেরূপ স্বকীয় গতি বিবর্জ্জিত না হইলে অপরাপর পরমাণুর সহিত সম্মিলিত হইতে পারে না, প্রত্যেক নর নারীও সেই প্রকার স্বকীয় স্বাধীনগতি বিবর্জ্জিত না হইলে সামাজিক শৃঙ্খলে গ্রথিত হইতে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম * মনুষ্যগণের সামাজিক সম্মিলন সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আবার পরমাণু সকল যেরূপ স্বকীয় গতি বিবর্জ্জিত হইয়া পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হওয়া মাত্রই সংযোগ উৎপন্ন বস্তুর গতি প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার পৃথিবীর নরনারীগণ আপন আপন

* "The change from a diffused, imperceptible state, to a concentrated perceptible state, is an integration of matter and concomitant dissipation of motion; and the change from a concentrated, perceptible state, to a diffused, imperceptible state, is an absorption of motion and concomitant disintegration of matter" *Herbert Spencer.*

স্বতন্ত্র গতি বিবর্জ্জিত হইয়া সমাজ সূত্রে আবদ্ধ হইলেই সামাজিক গতি দ্বারা পরিশাসিত হইতে থাকে। একটী বস্তু অপর একটী বস্তুর সহিত সম্মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্বকীয় প্রকৃতিগত গতি অনুসারে কার্য্য করিতে থাকে। কিন্তু অপর পদার্থের সহিত একত্রিত হইবামাত্রই স্বকীয় ধর্ম্ম ও গতি বিবর্জ্জিত হইয়া সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থের গতি ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। হাইড্রজন এবং অকৃসিজন গ্যাসের সম্মিলনদ্বারা জল উৎপাদন হয়। কিন্তু জলের মধ্যে হাইড্রজন কিম্বা অকৃসিজনের গুণ ও ধর্ম্ম পৃথকরূপে আর অবস্থিতি করে না। অকৃসিজন এবং হাইড্রজন উভয় মিলিত হইয়া নূতন গতি ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যগণও সাংসারিক নানাবিধ সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আপন আপন স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া এক প্রকার জীবন গতি লাভ করে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক শৃঙ্খলে সম্বদ্ধ হইবা মাত্রই তাহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়; এবং তদ্রূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন নিবন্ধন জীবন গতি রূপান্তরিত হইয়া যায়। যুবক অপরিণীত অবস্থায় কেবল নিজের সুখসচ্ছন্দতা সম্বন্ধীয় চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে; কিন্তু উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া মাত্রই, তাহার নিজের সুখ শান্তির চিন্তার সহিত তাহার সহধর্ম্মিনীর সুখ শান্তির চিন্তা আসিয়া সম্মিলিত হইল, সুতরাং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিনী জীবনগতির রূপান্তর যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। প্রত্যেক নরনারীর সামাজিক সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ট হইতে থাকে, তাহার জীবনগতিও সেই পরিমাণে মিশ্রভাব ও জটিলতা প্রাপ্ত হয়। এবং অবশেষে সামাজিক গতিই তাহার জীবনের একমাত্র গতি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মানবগণের সম্মিলন দ্বারা সমাজ গঠিত হয়, কিন্তু সমাজ গঠিত হইলে পর প্রত্যেক নরনারীর জীবন প্রচলিত সামাজিক গতিকেই আশ্রয় করে। নদীর জল সমুদ্রে নিপতিত হইলে সমুদ্র জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যেরূপ একাকার হইয়া যায়, সেই প্রকার প্রত্যেক নরনারী মনুষ্যসমুদ্ররূপ এই বৃহৎ মনুষ্যসমাজে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই স্বাধীন জীবন, গতি বিবর্জ্জিত হইয়া মানসিক কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে সমাজ-যন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। একটী জড় পদার্থ অপর একটী জড় পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া একাকার হইলে উভয়ের পূর্ব্বাকৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। উভয়ে মিলিত হইয়া এক নূতন আকার ধারণ করে। কিন্তু মানবমণ্ডলির সম্মিলন-সমাজ গঠিত হইলে, তাহাদের প্রত্যেকের বাহ্যিক আকৃতি রূপান্তরিত না হইলেও, তাহাদের পরস্পরের মানসিক গতি মধ্যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, এবং সেই সংযোগ-উৎপন্ন গতি প্রত্যেকের জীবন শাসন করিতে থাকে।

এক একটী পরমাণু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কি ভাবে অবস্থিতি করে এবং কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহা নির্ণয় করা যেরূপ আমাদিগের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত, সেই প্রকার সামাজিক-ভাবাস্পৃষ্ট মানব প্রকৃতি কল্পনাতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এক একটী জড় পদার্থকে আমরা পরমাণুর সমষ্টি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু জড় পদার্থ হইতে এক একটী পরমাণু তুলিয়া লইতে পারি না। মনুষ্য-সমাজ হইতেও এক একটী নর নারীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার জীবনগতি নির্ণয় করা

যায় না। প্রত্যেক নর নারী মনুষ্য সমাজের মধ্যে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সামাজিক ভাব-পরিপূর্ণ হৃদয় লইয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়; সুতরাং সর্ব্ব প্রকারে সামাজিক ভাব-বিবর্জ্জিত এবং স্বতন্ত্র গতি-প্রাপ্ত নর নারী মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। পরমাণু কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, জড় পদার্থের এতাদৃশ ক্ষুদ্রতম অংশ যাহা কখন আর বিভাগ করা যাইতে পারে না। কিন্তু সেই প্রকার ক্ষুদ্রতম অংশ যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং কল্পনাতীত, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। পক্ষান্তরে এক একটী মনুষ্য এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজের এক একটী পরমাণুস্বরূপ, এই প্রকার যে কথিত হইয়াছে,তদ্দারা এইমাত্র বুঝা যায় যে, জড় পদার্থের অভ্যন্তরস্থ পরমাণুগুলি যদ্রূপ সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক নর নারী, মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে, এই মনুষ্যসমাজ মধ্যে ঠিক তদনুরূপ সংযোগাবদ্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। মনুষ্য মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে পর যদি অপর কোন মনুষ্যের সহিত তাহার সংসর্গ না হয়, তত্রাচ তাহার স্বীয় জননীর সম্বন্ধে তাহার মনোমধ্যে যে সকল ভাবের উদয় হইতে থাকে, সেই সকল ভাব নিবন্ধন তাহার জীবন-গতি প্রচলিত সামাজিক গতির সহিত ক্রমে সম্মিলিত হইয়া যায়। সৌরজগতে যেরূপ গ্রহ, উপগ্রহ পরস্পর আকর্ষণসূত্রে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ঠিক সেইরূপ এক একটী মানব প্রকৃতি অপরাপর মানব প্রকৃতির সহিত মানসিক আকর্ষণ দ্বারা সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং মনুষ্যের প্রকৃতিগত-গতি সম্পূর্ণরূপে বিনাশ না করিয়া তাহাকে সমাজ বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অত্যন্ত অসভ্য জাতির মধ্যে নানাবিধ সামাজিক বন্ধন পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক বন্ধন কখন যোগাকর্ষণের (attraction of cohesion) এবং কখন বা মধ্যাকর্ষণের (attraction of gravitation) ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। যোগাকর্ষণ শক্তির ন্যূনাতিশয্য প্রযুক্ত বস্তু কমল কিম্বা কঠিন হইয়া থাকে। বহির্জগতে আমরা যত প্রকার জড় পদার্থ দর্শন করি, তন্মধ্যে কতকগুলি অতিশয় কঠিন,—যথা ধাতু, প্রস্তর ইত্যাদি, এবং কতকগুলি নিতান্ত কমল কিম্বা একেবারে তরল—যথা কর্দ্দম, জল, বায়ু ইত্যাদি। কিন্তু প্রস্তর মধ্যে যোগাকর্ষণের আতিশয্য প্রযুক্ত তাহা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে, পক্ষান্তরে কর্দ্দম কিম্বা জল ইত্যাদির মধ্যে যোগাকর্ষণ শক্তির ন্যূনতা প্রযুক্ত তাহা এতাদৃশ কমলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। অসভ্য জাতির মধ্যে সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তাভাবে তাহাদিগের সমাজ কমল পদার্থের ন্যায় সহজেই বিনষ্ট হইতে পারে, কিন্তু সভ্যজাতির মধ্যে সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তাপ্রযুক্ত তাহাদের সমাজস্থ প্রত্যেক নর নারীর জীবন-গতি পরস্পরের সহিত একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়ে এবং সেই প্রকার সমাজ সহজে অন্য সমাজ-সংঘর্ষণে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

আকর্ষণ (attraction) শক্তি (force) গতি (motion) প্রভৃতির কার্য্য যে, কেবল জড় পদার্থের মধ্যেইপ্রত্যক্ষ হয়, তাহা নহে ; সামাজিক কার্য্য কলাপের মধ্যেও আমরা নানাবিধ শক্তির কার্য্য এবং গতির রূপান্তর নিয়তই নিরীক্ষণ করিতেছি। এই বিশ্বজগতে যে কোন পরিবর্ত্তন আমরা দর্শন করি, তাহার মূল কারণ যে কোন না কোন প্রকারের শক্তি তাহা কোন ব্যক্তিই অস্বী-

কার করিতে পারেন না * কোন বিষয়, ঘটনা, কি অবস্থার কার্য্য-কারণ শৃঙ্খল পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে অবশেষে কোন প্রকারের শক্তিই তাহার মূল কারণ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। শক্তি ভিন্ন কোন পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। কিন্তু শক্তির মূল কারণ কি তাহা নির্দ্ধারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য। বস্তুতঃ শক্তির মূল কারণ আমাদিগের নিকট অজ্ঞেয় এবং অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তাই সকল শক্তির মূল কারণ এবং মূল শক্তি। কি সজীব, কি নির্জীব, সকল পদার্থই সেই একমাত্র মূল শক্তি হইতে শক্তি-প্রাপ্ত হইতেছে। শক্তিকে অনির্দ্দিষ্ট কারণ-সম্ভূত নির্দ্দিষ্ট ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; (the conditioned effect of the unconditioned cause) কিন্তু শক্তির মূল কারণ আমাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত হইলেও শক্তির কার্য্যকলাপমধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও ফলাফলের শৃঙ্খলা সততই লক্ষিত হইতেছে। শক্তি ভিন্ন কোন গতি উৎপন্ন হয় না, এবং গতিও শক্তির রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগতের সকল বিষয়ের মধ্যে নানাবিধ বিরুদ্ধ শক্তি (Antagonistic force) অবস্থিতি করিয়া বিবিধ প্রকারে গতি উৎপাদন করিতেছে। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, গত্যুৎপাদন সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম-সকল কেবল জড় জগতের কার্য্যকলাপেই প্রযোজ্য। কিন্তু মানব জাতির সমগ্র ইতিহাস সুস্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে যে, জাতীয় উন্নতি এবং অবনতি সম্পূর্ণ রূপ গতি সম্বন্ধীয় নিয়মাধীন রহিয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তিদ্বারা কোন বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে আকৃষ্ট হইলে অত্যল্প ব্যাঘাত বিশিষ্ট পথে (Line of least resistance) সেই বস্তু গমন করিতে থাকে, অর্থাৎ অত্যল্প ব্যাঘাতবিশিষ্ট পথই সেই বস্তুর গতিমার্গ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। সামাজিক কার্য্যকলাপের উন্নতি ও অবনতি সম্বন্ধে এই নিয়ম সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। সমাজের মধ্যে যদি নানাবিধ বিরুদ্ধ অবস্থা-সম্ভূত বিবিধ প্রকারের শক্তি এক স্থানে এক সময়ে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতীয় জীবন অত্যল্প ব্যাঘাত বিশিষ্ট স্থানেই কেবল পরিবর্দ্ধিত হইতে সমর্থ হয়। ইহার উদাহরণার্থ আমরা একটী সাধারণ সামাজিক্ ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। প্রত্যেক জাতীয় সমাজেই আত্মরক্ষার ইচ্ছা কিম্বা বংশ বৃদ্ধির ইচ্ছা যারপর নাই প্রবল। সুতরাং আত্ম-রক্ষা এবং বংশ বৃদ্ধির ইচ্ছারূপ শক্তি দ্বারা

* "We come down then finally to *Force*, as the ultimate of ultimates. Though Space, Time, Matter, and Motion, are apparently all necessary data of intelligence, yet a psychological analysis shows us that these are either built up of, or abstracted from, experiences of *Force*. Space and Time, as we know them, are disclosed along with these different manifestations of Force as the conditions under which they are presented. Matter and Motion are concretes built up from the contents of various mental relations; while Space and Time are abstracts of the forms of these various relations. Deeper down than these however, are the primordial experiences of Force, which, as occurring in consciousness in different combinations supply at once the materials whence the forms of relations are generalized and the related objects built up." Herbert Spencer.

জাতীয় জীবন আকৃষ্ট হইতেছে এবং তদ্দারা পরিচালিত হওয়াতে সমাজস্থ সকল নর-নারীর শক্তি সমষ্টি সৎসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে। পক্ষান্তরে আত্মরক্ষা ও বংশ বৃদ্ধির ব্যাঘাত উৎপাদক শক্তিস্বরূপ দুর্ভিক্ষ, দূষিত বায়ু, যুদ্ধ, এবং সংক্রামক রোগ প্রভৃতি বিরুদ্ধ দিক্ হইতে জাতীয় জীবনকে আকর্ষণ করিতেছে। এই স্থানে দুইটী বিরুদ্ধ শক্তিদ্বারা জাতীয় জীবন আকৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং অত্যল্প ব্যাঘাত বিশিষ্ট পথ ভিন্ন জাতীয় জীবনের অপর কোন গমন পথ নাই। অর্থাৎ দেশের যে যে স্থানে দূষিত বায়ু, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ এবং সংক্রামক রোগের শক্তি অত্যল্প রূপে অনুভূত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত স্থানে আত্মরক্ষা ও বংশ বৃদ্ধির ইচ্ছাসম্ভূত শক্তি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। *

বস্তুতঃ আমরা জড় জগতের পরিবর্ত্তনের মধ্যে গতি সম্বন্ধীয় যত প্রকার নিয়ম দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ই সামাজিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে ও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শক্তি,আকর্ষণ এবং গতির নির্দ্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ কার্য্য কি বহির্জগত, কি অন্তর্জগত সর্ব্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বাদ্য যন্ত্রের তালের মধ্যে যদ্রূপ পরিমাতব্য সময়ান্তরে পরিবর্ত্তন উপলব্ধি হয়,তদনুরূপ কোন কোন প্রকারের সামাজিক পরিবর্ত্তন পরিমেয় সময়ান্তরে বারম্বার ঘটিয়া থাকে। গতি সম্বন্ধীয় ঈদৃশ পরিমেয় সময়ান্তর ঘটনীয় কার্য্যকে (Rhythm of motion) অর্থাৎ গতির তাল বলা যাইতে পারে। সামাজিক ঘটনার মধ্যেও গতির রিথ্ম কিম্বা তাল সততই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। কোন কোন অসভ্য জাতি এক স্থানে দুই তিন বৎসর বাস করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন এক স্থানে বাস করিতে থাকে। আবার ঠিক দুই তিন বৎসর পরে সেই নূতন আবাস ভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য স্থানে চলিয়া যায়। তথা হইতে পুনরায় নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে চতুর্থ এক স্থানে চলিয়া যায়, এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে এক একটী স্থান পরিবর্ত্তনের মধ্যে গতির রিথ্ম কিম্বা তাল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত অসভ্য জাতীয় লোকেরা প্রথমতঃ যে স্থানে বাস করে, সেই স্থানোৎপন্ন আহারীয় দ্রব্যের অপ্রচুরতা তাহাদিগকে (লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নিবন্ধন) সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া থাকে। এই প্রকারে এক একটী নূতন স্থানের আহারীয় দ্রব্যের অপ্রচুরতা নিবন্ধন তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে সেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং নূতন আবাস ভূমি গ্রহণও পরিত্যাগের মধ্যে পরিমেয় সময়ান্তরিক কার্য্য ও প্রতিকার্য্য লক্ষিত হয়। কিন্তু দেশীয় আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ইত্যাদির মধ্যে গতির রিথ্ম কিম্বা তাল বিশেষ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য সমাজের আদিমাবস্থায় বিনিময় কার্য্য (Exchange) সাম্বৎসরিক কিম্বা যাম্মাসিক মেলা উপলক্ষে সম্পন্ন হইত। কিন্তু লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে

* Thus when we contemplate a society as an organism, and observe the direction of its growth, we find this direction to be that in which the average of opposing forces is the least. Its units have energies to be expended in self-maintenance and reproduction. These energies are met by various environing energies that are antagonistic to them—those of geological origin, those of climate, of whild animals, of other human races with whom they are at enmity or in competiton. And the tracts the society spreads ever, are those in which there is the smallest total antagonism'' Herbert Spencer.

সামাজিক বন্ধন যত পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, বিনিময় কার্য্য সম্পাদনার্থ সপ্তাহে সপ্তাহে তত হাট বাজার বসিতে লাগিল। তৎপরে উন্নত সামাজিক অবস্থায় বিনিময় কার্য্যের সুবিধার্থ দৈনিক বাজারের আবশ্যক হইয়া উঠিল এতদ্দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, লোকের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা, একটী শক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া, যে পরিমাণে গত্যুৎপাদন করিবে, প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব মোচন ইচ্ছার কার্য্য ঠিক সেই পরিমাণে, শক্তি সঞ্চালন পূর্ব্বক, মনুষ্য সমাজের গতির মধ্যে রিথ্‌ম্ কিম্বা তাল সংস্থাপন করিবে।

সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য।

"মহাদেবঃ সতীদেহং স্কন্ধে নিধায় নৃত্যতি।"

(এমন) সুন্দর নাগর কেহে ?
প্রেমে ঢল ঢল, প্রেমেই বিহ্বল
পরাণ পাগল স্নেহে !
স্কন্ধ বিলম্বিনী, প্রিয় প্রণয়িনী,
(যেন) প্রেমের প্রবাহ দেহে !
(এমন) উদার প্রেমিক কেহে ?

প্রেমের ধেয়ান, প্রেমের গেয়ান
প্রেমিক তাপস বর,
তাধিয়া তাধিয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া
(বড়) সুন্দর নাচিছে হর !
পিশাচ ভূত, প্রেত অযুত
বাজায় ডমরু গাল,
বিকট রঙ্গে, প্রমথ সঙ্গে
নাচিছে তাল বেতাল !
বিশ্ব প্রেমিক, পিনাক ধৃক্
পঞ্চমে ধরিছে তান,
উথলে রুদ্র, স্বর সমুদ্র
প্রমথে গাহিছে গান !
বিরাট দক্ষে, ধরণী কম্পে
ক্ষুব্ধ চরণ ভরে,
নাহিক শব্দ, সমীর স্তব্ধ,
বাসুকী কাঁপিছে ডরে !
(এমন) প্রেমের পাগল কেহে ?

প্রেমে ঢল ঢল, রক্ত উজ্জ্বল
ঊর্দ্ধ নয়ন দ্বয়,
বিশ্বদাহ, বহ্নি প্রবাহ
ললাট ভাসায়ে বয় !
বিরহ কঙ্কাল, গলে অস্থিমাল
ঢুলিতেছে দলমল !
মহা কালকূট, কলঙ্ক গরল
করেছে কণ্ঠের তল !
পর উপহাস, পরা দিক্‌বাস,
লজ্জায় কেহ না চায়,
মাথার উপর, গর্জ্জে বিষধর,
ভ্রুক্ষেপ নাহিক তায় !
রূপ-রুদ্রাক্ষে, রুদ্র কটাক্ষে
লুপ্ত কলুষ মোহ,
জ্ঞান চৈতন্য, প্রেমেরি জন্য
নেত্রে গলিত লোহ !
প্রেম প্রশান্তি, বিনোদ কান্তি
অকলঙ্ক শশধর,
শোভিছে কপালে, স্নিগ্ধ করজালে
জগত উজ্জ্বলতর !

স্বার্থ স্মুরতি, ভস্ম বিভূতি
রঞ্জিত সুন্দর কায়,
(শিরে) প্রেমের গঙ্গা, চল তরঙ্গা
ত্রিলোক উদ্ধারি ধায় !
এ নব বেশ, ভোলা মহেশ
প্রেমের রজত রবি,
প্রণয় মগ, হৃদয় ভগ্ন,
আদরে বন্দিছে কবি ।

৩

(এমন) প্রেমের পাগল কেহে ?
নাহি দিন রাত, নাহি শীত বাত
সুস্থান কুস্থান জ্ঞান,
নাচিয়া গাইয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া
পাগল করিল প্রাণ !
আপনি মাতিল, পরে মাতাইল
কি যাদু করিল হর,
আকাশ পাতাল, সকলি মাতাল,
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর !
বাজে রুদ্রতাল, মত্ত মহাকাল
মুগ্ধ জগত নাচে,
ছাড়িয়া যে যাহার, ছুটিল সংসার
পাগল ভোলার পাছে !
সমীর ধায় হুহু, বজ্র গর্জ্জে মুহু
বিজলী চলিল হেসে,
তারকা কোটি কোটি, করিছে ছুটা ছুটি
আকাশে উন্মত্ত বেশে !
গ্রহ উপগ্রহ, ভ্রমিছে অহরহ
চৌদিকে সর্ব্বদা তার,
বসন্ত ঋতু ছয়, মুগ্ধ হৃদয়
মাস পক্ষ তিথি বার !
ছুটিছে নদীকুল, করিয়ে কুলকুল
গাহিয়া প্রেমের গান,
নীরধি প্রেমাকুল, নিরখি সে অকূল
আহ্লাদে ডাকিছে বান !
শ্যামল তরুদল, লইয়ে ফুল ফল
অঞ্জলি করিয়ে আছে,
লতিকা পুষ্পবতী, উদার প্রেমে সতী
ভুলেছে ভোলার নাচে !
কোকিলা করে গান, পাপিয়া ধরে তান
শ্যামাসুন্দর ভাষে,
খঞ্জন শিখিবধূ, নাচে মৃদু মৃদু
তাঁহারি প্রেমবিলাসে !
স্বর্গে দেবগণ, পাতালে নাগগণ—
মর্ত্ত্যে মানব চয়,
তুলিয়ে উর্দ্ধে হাত, গাহিছে একসাথ
"জয় প্রেমেরি জয় !"
বাজিছে রুদ্রতাল, নাচিছে প্রেতপাল
চিত্ত প্রেমেতে লয়,
গলিত শব গন্ধে, পিশাচ মহানন্দে
"গাহিছে প্রেমেরি জয় !"
প্রেমেরি সুধাস্বাদে, প্রেমেরি প্রসাদে
হয়ে হর মৃত্যুঞ্জয়,
তুলিয়ে উর্দ্ধে হাত, গাহিছে বিশ্বনাথ
"জয় প্রেমেরি জয় !"
নিঃস্বার্থ প্রেম তার, কাম ছারখার,
হৃদয় বৈরাগ্যময়,
(সেই) নিষ্কাম প্রেমছবি, নিরখি গায় কবি
"জয় প্রেমেরি জয় !"

রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম বিষয়ক মত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা এস্থলে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার পুস্তকে একস্থলে ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "যে শাস্ত্রপ্রমাণে ব্রহ্মকে মান, সেই শাস্ত্রপ্রমাণে দেবতাদিগকে কেন না মান?" রামমোহন রায় ইহার উত্তরে বলিতেছেন যে,—"ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা ভূত জাতয়ঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনানুসারে তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব মানিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে জন্ম ও মৃত্যুর অধীন বলিয়া স্বীকার করেন। এস্থলে কে বলিবেন যে, রামমোহন রায় বাস্তবিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার সত্তায় বিশ্বাস করিতেন? তাঁহার বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব ও তাহাদিগের নশ্বরত্ব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বাইবেল শাস্ত্র সম্বন্ধেও অবিকল সেই রূপ। উক্ত শাস্ত্রবিষয়ক বিচার গ্রন্থ সকলের যে যে স্থল পাঠ করিলে বোধ হয় যে, তিনি খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া ও মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুত্থানে বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাসের কথা নহে। ঐ সকল স্থলের প্রকৃত তাৎপর্য্য কেবল এই মাত্র যে, অলৌকিক ক্রিয়া প্রভৃতি উক্ত শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া তিনি স্বীকার করেন। তিনি ঈশ্বরের মত, খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি খ্রিষ্টীয়ানদিগের কয়েকটী মত যে বাস্তবিক তাঁহাদিগের শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, ইহা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া ও মৃত্যুর পরে তাঁহার পুনরুত্থান, এই দুইটী বিষয় সম্বন্ধে তিনি উক্তরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং উহা খ্রীষ্টিয় শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু অদূরদর্শী লোকে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ইহা তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস বলিয়া মনে করিয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় দেখিলেন যে, লোকেরা যেরূপ কুসংস্কারান্ধ, তাহাতে তাহারা শাস্ত্র নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ যুক্তির বল অনুভব করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাহাদিগের অবলম্বিত শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কোন কথাই তাহাদিগের গ্রাহ্য হইবে না। সুতরাং তিনি যে যে সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সহিত ধর্ম্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের অবলম্বিত শাস্ত্র হইতেই স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহাতে লোকে কোন প্রকার সৃষ্ট-জীব বা অপর কোন পদার্থের উপাসনা না করিয়া এক মাত্র নিরাকার অনন্ত স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনায় অনুরক্ত হয়, ইহারই জন্য তিনি যাবজ্জীবন প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতেই হিন্দু-

দিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, সকল প্রকার সাকার দেবদেবী মনুষ্যের কল্পনা মাত্র, তাহাদিগের উপাসনা দ্বারা মুক্তি লাভের আশা নাই; বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মই আমাদিগের উপাস্য; এবং তদ্দ্বারাই জীব মুক্তিলাভে সক্ষম হয়। তিনি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র হইতেই খ্রীষ্টিয়ানদিগকে বুঝাইয়া দিতেন যে, যিশুখ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার নহেন, তিন ঈশ্বরের মত খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রসঙ্গত নহে। একমাত্র পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারাই জীবের প্রকৃত কল্যাণ লাভ হয়। তিনি এই প্রকারে প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অবলম্বিত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে তাহাদিগের নিকট স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিতেন বলিয়া, তাহাদিগের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, তিনি তাহাদিগের অবলম্বিত শাস্ত্রকে ঈশ্বর-প্রেরিত আপ্ত বাক্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু একদেশদর্শী লোকেরই এপ্রকার ভ্রমাত্মক সংস্কার জন্মিয়াছে। হিন্দু কি খ্রীষ্টীয়ান শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁহার সকল প্রকার পুস্তক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রতীতি করিতে পারিয়াছেন যে, রামমোহন রায় সর্ব্বশাস্ত্রের সারগ্রাহী একেশ্বরবাদী ছিলেন।

কেবল তাঁহার বিভিন্ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক কেন? তাঁহার কার্য্য ও আচরণের বিষয় স্মরণ করিলেও সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায় পূজিত শাস্ত্রকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মসমাজে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক বেদ বেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন. আবার উক্ত সমাজের অসাম্প্রদায়িক ভাব রক্ষা করিবার জন্য খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ফিরীঙ্গী বালকদিগকে লইয়া আসিয়া তাহাদিগের মুখে দাউদের গীত শুনিতেন। যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার প্রচারিত সত্যের প্রতি যার পর নাই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াও তিনি আপনাকে চির জীবন হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। পৈতৃক বিষয়ে আপনার সত্ব রক্ষার জন্য তিনি আদালতে আপনাকে হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়াও তিনি হিন্দু আচার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি তাঁহার ইয়ুরোপীয় বন্ধুদিগকে স্পষ্ট রূপে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পরে খ্রীষ্ট ধর্ম্মানুযায়ী তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া না হয়। পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন যে, তাঁহার ইংলণ্ডীয় বন্ধুগণ অতি সাবধানে সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, মৃত্যুর পর তাঁহার মৃত শরীরে ব্রাহ্মণের চিহ্ন স্বরূপ যজ্ঞোপবীত দৃষ্ট হইয়াছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তি বাইবেলকে ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে এ প্রকার ব্যবহার কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন উন্নতমনা সত্যপ্রিয় দৃঢ়চিত্ত লোকের পক্ষে এ প্রকার অসঙ্গত ব্যবহার কখনই সম্ভবপর নহে।

রাজা রামমোহন রায় যে সর্ব্বশাস্ত্র সারগ্রাহী একেশ্বরবাদী ছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন করা কঠিন বিষয় নহে। আমরা ক্রমে ক্রমে পাঠকবর্গের নিকট কয়েকটী প্রমাণ উপস্থিত করিতেছি।

প্রথমতঃ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টডীড্ পত্র একটী অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অবগত হইয়াছেন যে, রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজে কোন প্রকার

সাম্প্রদায়িকতাকে স্থান দান করেন নাই। যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ আছে, যে সকল মত দেশ কালে বদ্ধ, এপ্রকার কিছুই উক্ত ট্রাষ্টডীড্‌পত্রে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। যে প্রকার উপাসনা ও উপদেশে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের আপত্তি করিবার কিছুই থাকে না, ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি তাহাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছেন। উক্ত পত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজ গৃহে পরমেশ্বরকে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক নামে পূজা করা হইবে না, এবং উপাসনান্তে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রণালী অবলম্বিত হইবে না। যে ব্যক্তি কোন একখানি বিশেষ শাস্ত্রকে ঈশ্বর প্রেরিত আপ্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, অথবা যিনি ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বরপ্রেরিত একমাত্র গুরু ও নেতা বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার পক্ষে এ প্রকার অসাম্প্রদায়িক সমাজ সংস্থাপন কি কখন সম্ভব হইতে পারে?

দ্বিতীয়তঃ। প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা রামমোহন রায় পারস্য ভাষায় "তোহফ তুল মোহদীন" নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, উক্ত পুস্তকে তিনি পরমেশ্বরের নিকট অলৌকিক ভাবে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অলীকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি উহাতে বলিয়াছেন "ভ্রান্ত স্বভাব ধর্ম্ম-প্রয়োজকেরা দেশ বিশেষে, কাল বিশেষে শাস্ত্র বিশেস কল্পনা করিয়াছেন, আপনাদের স্বার্থ সাধন ও আপন ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন জন্য দেবদেবাদি ঘটিত উপাখ্যানাদি রচনা করিয়াছেন, যে সমস্ত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব লোকসাধারণের বোধগম্য হয় না, তাহা ঐশীশক্তি-সম্পন্ন অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং কার্য্যকারণ প্রণালীর স্বরূপ তত্ত্ব নির্দ্ধারণ ও প্রতিপাদন না করিয়া অশেষ বিধ কুসংস্কার পাশে লোক সাধারণকে বদ্ধ করিয়াছেন।"* উক্ত পুস্তকে তিনি অলৌকিক ভাবে পরমেশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির যাথার্থ্য একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন।

* ১৭৭৬ শকে ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তের বক্তৃতা।

পাশ্চাত্য মায়াবাদ।

(IDEALISM)

২। ইন্দ্রিয়-বিষয়।

প্রথম সংখ্যক প্রস্তাবে মায়াবাদের মূলমত গুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়া আমরা প্রস্তাবের উপসংহারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, মায়াবাদ অসম্ভব অননুভবনীয় মত নহে, তবে ইহা প্রমাণ-সাপেক্ষ। ইহার প্রমাণালোচনা না করিয়াই যে লোকে ইহাকে অসম্ভব অননুভবনীয় বলিয়া অগ্রাহ্য করে, ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। স্বপ্নানুভূত ইন্দ্রিয় ব্যাপার সমূহ মানসিক অবস্থা পরম্পরা মাত্র, ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম

জাগ্রতাবস্থায় আমরা যে সকল ইন্দ্রিয়-ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি, যাহাদিগকে আমরা বাহ্যবস্তু বলি, ইহারাও ঈশ্বরেচ্ছা বা প্রাকৃতিক নিয়ম-সমুৎপন্ন মানসিক ভাব পরম্পরা মাত্র হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। অতঃপর অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যুক্তি দ্বারা এই মতের সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব, চক্ষু কর্ণাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে পরীক্ষা করিয়া দেখাইব যে, ইহাদের মধ্যে কেহই আমাদিগকে বাহ্যবস্তুর জ্ঞানদানে সমর্থ নহে। এখন এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। পুনরায় পাঠকের গাঢ় মনোনিবেশ প্রার্থনা করিতেছি।

জড়পদার্থ কাহাকে বলি? চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের নামই জড়পদার্থ; যাহা কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, আঘ্রাণকরা যায়, আস্বাদন করা যায় এবং স্পর্শ করা যায়, তাহারই নাম জড়পদার্থ। ইহাই জড়পদার্থের লৌকিক সংজ্ঞা; এবং আমরাও জড়পদার্থের এই অর্থই গ্রহণ করি। কিন্তু জড়ের আবার একটী দার্শনিক সংজ্ঞা আছে; প্রকৃতবাদী (Realistic) দার্শনিকদিগের মতে জড়ের অর্থ "আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ (Sensation) সমূহের কারণরূপী ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞান পদার্থ" এই দর্শনবিৎদিগের অনেকেই লৌকিক বিশ্বাসের পরিপোষক বলিয়া প্রশংসিত, কিন্তু লৌকিক সংজ্ঞার সহিত ইঁহাদের সংজ্ঞার যে কত দূর প্রভেদ তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন; এই দর্শনবিৎ-কল্পিত "ইন্দ্রিয়াতীত জড়পদার্থের" বিষয় আমরা সম্প্রতি কিছু বলিব না, যথা স্থানে ইহার আলোচনা হইবে। এই পদার্থের সহিত লৌকিক বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নাই; লোকে ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ-সমূহকেই জড়পদার্থ বলিয়া থাকে, এবং বিশ্বাস করে এই পদার্থ সমূহ যেমন জ্ঞানের বিষয় রূপে, তেমনি আবার জ্ঞান-নিরপেক্ষরূপে, বাহ্যবস্তু রূপে স্থিতি করিতেছে। এই বিশ্বাস যে ভ্রমমূলক, ইন্দ্রিয়গোচর ব্যাপার সমূহ যে ইন্দ্রিয় বোধ (Sensations) মাত্র, মানসিক অবস্থা পরম্পরা মাত্র, ইহাই আমাদিগকে এখন দেখাইতে হইবে।

দর্শনানভিজ্ঞ পাঠককে বলা আবশ্যক, এই মত একমাত্র মায়াবাদের সহিতই যে সংশ্লিষ্ট তাহা নহে। ইহা কেবল মায়াবাদের মত নহে; আধুনিক প্রকৃতবাদী দর্শনবিৎগণেরও এই মত। বর্ণ, শব্দ, ঘ্রাণাদি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহ যে আমাদের মানসিক ভাব পরম্পরা মাত্র, ইহা কেবল বার্কলি, মিল, ফেরিয়ার ও ফ্রেজার প্রভৃতি মায়াবাদীদিগের মত নহে, ইহা লক, ক্যাণ্ট, রীড, ষ্টুয়ার্ট, ব্রাউন, হ্যামিলটন, ও স্পেনসার প্রভৃতি আধুনিক প্রকৃতবাদীদিগেরও মত। এই বিষয়ে লৌকিক মতই এখনো অজ্ঞানাচ্ছন্ন রহিয়াছে, দার্শনিক মত অনেক দিন পূর্ব্বে পরিষ্কার হইয়াছে। আমাদের প্রস্তাব সাধারণ পাঠকের জন্য, তজ্জন্যই এই বিষয় বিশেষরূপে প্রদর্শন করা আবশ্যক। যাহা হউক এই বিষয়ে বিশেষ রূপে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, আমাদের পথ পরিষ্কারার্থ আমরা মায়াবাদের একজন দারুণ শত্রু এবং লৌকিক প্রকৃতবাদের একজন অত্যুৎকৃষ্ট পরিপোষকরূপে প্রসিদ্ধ দর্শনবিৎ রীডের কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি; প্রকৃতবাদী পাঠক দেখিবেন, তাঁহার নিজের ব্যারিষ্টারই তাঁহার বিপক্ষে বলিতেছে। রীড্ ঘ্রাণ সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

"It is evidently ridiculous to ascribe

to it figure, colour, extension, or any other quality of bodies. He (the person smelling,) cannot give it a place, any more than he can give a place to melancholy or joy: nor can he conceive it to have any existence but when it is smelled So that it appears to be a simple and original affection or feeling of the mind, altogether inexplicable and unaccountable. It is indeed impossible that it can be any body: it is a sensation; and a sensation can only be in a sentient thing." (১)

ইহার অর্থ:—"ইহাতে আকার, বর্ণ, বিস্তৃতি অথবা জড়ের অন্য কোন গুণ আরোপ করা স্পষ্টতঃই হাস্যজনক। সে (আঘ্রাণকারী ব্যক্তি) দুঃখ সুখের স্থান নির্দ্দেশ করিতে যেমন অসমর্থ, ইহারও স্থান নির্দ্দেশ করিতে তেমনি অসমর্থ এবং আঘ্রাণ করিবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ইহা থাকিতে পারে, ইহা অনুভব করিতেও অসমর্থ (অর্থাৎ ইহা অনুভবনীয়)। সুতরাং প্রতীত হইতেছে, ইহা সম্পূর্ণরূপ অবর্ণনীয় ও অজ্ঞেয় কারণ, একটী অমিশ্র এবং মৌলিক মানসিক অবস্থা বা ভাব। ইহা কোন জড়পদার্থ হওয়া বাস্তবিকই অসম্ভব, ইহা একটী ইন্দ্রিয় বোধ; এবং ইন্দ্রিয় বোধ কেবল বোধশক্তি-সম্পন্ন পদার্থেই (অর্থাৎ কেবল মনেই থাকিতে পারে।"

উক্ত দর্শনবিৎই বর্ণ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—
"When a coloured body is presented, there is a certain apparition to the eye, or to the mind, which we have called *the appearance of color.* Mr. Locke calls it *an idea;* and indeed it may be called so with the greatest propriety. This idea can have no existence but when it is perceived. It is a kind of thought, and can only be the act of a percipient or thinking being," (২)

অর্থ:—"যখন কোন রঞ্জিত পদার্থ সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন চক্ষু অথবা মনের সমক্ষে একটী দৃশ্য প্রতিভাত হয়, ইহাকে আমরা বর্ণের আবির্ভাব নাম দিয়াছি। লকসাহেব ইহাকে 'ভাব' বলেন; এবং বাস্তবিক ইহাকে প্রকৃতার্থে তাহাই বলা যাইতে পারে। এই ভাব যখন প্রত্যক্ষীভূত হয়, সেই সময় ব্যতীত সময়ান্তরে ইহার অস্তিত্ব অসম্ভব। ইহা চিন্তাবিশেষ মাত্র, সুতরাং জ্ঞানসম্পন্ন বা চিন্তাসম্পন্ন জীবের কার্য্য ব্যতীত ইহা আর কিছুই হইতে পারে না।" (বলা বাহুল্য যে রীড এই দৃষ্ট বর্ণের কারণরূপী একটী অদৃষ্ট বর্ণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; এই "অদৃষ্ট বর্ণ" (!) বিষয়ে পরে আলোচনা হইবে।]

এখন সাক্ষাৎভাবে ইন্দ্রিয়ব্যাপার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক? আমরা পর্য্যায়ক্রমে নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক্‌কে জিজ্ঞাসা করিব, তাহাদের বিষয় সমূহ কিরূপ পদার্থ?—জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র পদার্থ, অথবা জ্ঞানাধীন মানসিক অবস্থা মাত্র? এই পরীক্ষাকার্য্য বড় কঠিন, পাঠককে বিশেষরূপে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইতে হইবে, আর সতর্ক হইতে হইবে যেন কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ান্তরলব্ধ জ্ঞান মিশ্রিত করিয়া না ফেলেন।

প্রথমতঃ—নাসিকা; ইহার বিষয় ঘ্রাণ। পুষ্পের সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে ও তথাকার স্নায়ুবিশেষে কম্পন উৎপাদন করে, এই কম্পন মস্তিষ্কে চালিত হইলেই মন ঘ্রাণানুভব করে। ঘ্রাণ কি? ইহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য পদার্থ হইতে ইহাকে স্বতন্ত্র করা যা'ক, তাহা হইলে ইহার প্রকৃতি নিরূপণ সহজ হইবে। প্রথমতঃ পুষ্পের পরমাণুসমূহ;

(১) An Inquiry into the human mind" &. Chap II. Sec. II.
(২) Ibid, Chap VI. Sec IV.

এই সমুদায় ঘ্রাণ নহে, ইহাদের সহিত ঘ্রাণের কোন সাদৃশ্য নাই, ইহারা যে ঘ্রাণের আনুষঙ্গিক পদার্থ, ইহাও আমরা ঘ্রাণানুভবের পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম না ; তৎপর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক গঠন,—ইহা স্পষ্টতঃই ঘ্রাণ নহে ; অতঃপর স্নায়ু ও মস্তিষ্কে উৎপন্ন কম্পন, ইহাও ঘ্রাণ নহে, মৃত শরীরের ইন্দ্রিয়েও এই রূপ কম্পন উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা বলিয়া মৃত ব্যক্তি কিছু ঘ্রাণানুভব করে না ; তার পর রহিল কেবল একটী মানসিক অবস্থা, মানসিক অনুভূতি, মানসিক-ভাব ; ইহাই তবে ঘ্রাণ। কিন্তু মানসিক ভাব কেবল ভাবক্ষম মনেই থাকিতে পারে, অজ্ঞান, অভাবুক, অচেতন পদার্থে থাকা অসম্ভব ; সুতরাং পুষ্পে ঘ্রাণ আছে ইহা বলা অসঙ্গত, পুষ্পে ঘ্রাণ থাকা অসম্ভব। পাঠক বলিতে পার "পুষ্পে ঘ্রাণ নাই বটে, কিন্তু পুষ্পে ঘ্রাণের কারণ রহিয়াছে, ঘ্রাণোৎপাদনের শক্তি রহিয়াছে ; " কিন্তু "কারণ" "শক্তি" এই সমুদায়ের তো এখন আলোচনা হইতেছে না. এই আলোচনা পরে হইবে। যুক্তি এস্থলে কি বলে তাহার কথা হইতেছে না, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ বিষয় যাহা, তাহারই কথা হইতেছে। এখন সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা দেখা গেল, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় যে ঘ্রাণ, তাহা ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ, জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে, ইহা একটী মানসিক অবস্থা মাত্র। একটী প্রাকৃতিক তত্ত্বের উল্লেখ করিলে এই বিষয়টী আরো পরিষ্কার হইতে পারে ; তাহা এই— যে সকল পদার্থ আমাদিগের নিকট দুর্গন্ধ, অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়, কোন কোন জন্তু তাহাই আগ্রহের সহিত আহার করে ; যদি ইহা তাহাদের নিকটও দুর্গন্ধময় বলিয়া বোধ হইত,তাহা হইলে তাহারা তাহা আহার করিত না ; তাহাদের নিকট ইহা সুগন্ধময় বোধ হয় বলিয়াই তাহারা ইহা আহার করে। ঘ্রাণ যদি কোন স্বতন্ত্র স্থায়ী পদার্থ হইত, তাহা হইলে একটী বিশেষ বস্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর নিকট ভিন্ন ভিন্ন গন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হইত না; এরূপ হওয়াতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঘ্রাণ মানসিক গঠনানুসারে পরিবর্ত্তনশীল একটী অস্থায়ী মানসিক অবস্থা মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ—জিহ্বা ; ইহার বিষয় স্বাদ। ভক্ষ্যবস্তুর সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহ মুখস্থিত লালা রসে গলিত হইয়া স্নায়ু বিশেষে কম্পন উৎপাদন করে, সেই কম্পন মস্তিষ্কে চালিত হইলেই মন স্বাদানুভব করে। ঘ্রাণের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক কথা স্বাদের সম্বন্ধে খাটে। পাঠক পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক রসনাকে পরীক্ষা করিবেন। করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, রসনার বিষয় যে স্বাদ, তাহা মানসোৎপন্ন অস্থায়ী ভাব মাত্র, সুতরাং কোন বাহ্য বস্তুতে ইহার অবস্থান অসম্ভব।

তৃতীয়তঃ—কর্ণ ; ইহার বিষয় শব্দ। ভৌতিক শক্তির আঘাতে বায়ুমধ্যে এক প্রকার তরঙ্গ উত্থিত হওতঃ কর্ণের অভ্যন্তরস্থ পটহে আহত হইলে স্নায়ু বিশেষে কম্পন সমুৎপন্ন হয়, এবং সেই কম্পন মস্তিষ্কে চালিত হইলে শব্দানুভব হয়। এখানেও পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাপ্রণালী প্রয়োগ করিলে পূর্ব্বোক্ত মীমাংসাই উপস্থিত হইতে হয়। বায়ুর তরঙ্গ শব্দ নহে, পটহে আঘাত শব্দ নহে, স্নায়ু ও মস্তিষ্কে সমুৎপন্ন কম্পন ও শব্দ নহে, এই সমুদায় মৃত শরীর সম্বন্ধেও সম্ভব,অথচ তাহা শব্দানুভবে অক্ষম ; সুতরাং এই সমুদায় আনুষঙ্গিক ঘটনার সংযোগে

আত্মার মধ্যে যে ভাব (sensation) উৎপন্ন হয়, তাহাই শব্দ, শব্দ মানসিক অবস্থা মাত্র। কোন কোন পাঠক হয়ত বলিবেন, আমরা তো দূরস্থিত শব্দ অনুভব করিতে পারি, দূরস্থিত শব্দ আবার মানসিক অবস্থা হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে প্রথম কথা এই যে, আমরা দূরস্থিত শব্দ অনুভব করি না, শব্দের দূরস্থিত কারণ জ্ঞাত হই মাত্র। কেল্লার তোপের শব্দ শুনি, ইহার অর্থ এই যে, আমাদের অনুভূত শব্দের কারণ যে কামান তাহাকে জ্ঞাত হই; দ্বিতীয় কথা এই যে, শব্দের দূরস্থিত কারণ ও আমরা সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞাত হই না, ইহা সাক্ষাৎলব্ধ জ্ঞান নহে, উপার্জ্জিত জ্ঞান, পরীক্ষা-লব্ধ জ্ঞান; কেবল শব্দানুভব এই জ্ঞানের আকর নহে; কেবল শব্দ ইহার আপন কারণের বিষয় কিছুই বলিতে পারে না। এই বিষয় বিস্তৃত রূপে প্রমাণ করিবার স্থানাভাব; পাঠক রীডের "ইনকোয়ারির" চতুর্থাধ্যায় দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পড়িলে এই বিষয় কতকটা জানিতে পারিবেন।

চতুর্থতঃ—চক্ষু; ইহার বিষয় বর্ণ। সমুদায় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই ইন্দ্রিয় পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; পাঠক যদি কেবল আমাদের কথা শুনিয়া যান, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা না করেন, আমাদের উক্তির সত্যাসত্যতার বিষয় ভাবিয়া না দেখেন, তবে তাঁহাকে বুঝান আমাদের অসাধ্য। এই বিষয়ে অনেক বলিবার আছে, কিন্তু আমরা ২। ৪ টি স্থূল স্থূল কথা মাত্র বলিব। সূর্য্য প্রভৃতি দীপ্তিমান পদার্থের পরমাণু সমূহ সর্ব্বদা আন্দোলিত অবস্থায় থাকে এবং ইহারা আকাশব্যাপী ইথার নামক এক প্রকার সূক্ষ্ম অদৃশ্য পদার্থে আন্দোলন উৎপাদন করে, এই আন্দোলনের নামই আলোক। এই আন্দোলন আমাদের চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ স্নায়ু বিশেষে আহত হইলেই আমরা বর্ণানুভব করি। বর্ণই দর্শনেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ বিষয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের ন্যায় ইহাও একটী মানসিক অবস্থা মাত্র; পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার পরীক্ষা করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন; প্রথমতঃ আকাশব্যাপী ইথার, ইহা বর্ণহীন অদৃশ্য পদার্থ, ইহা স্পষ্টতঃই বর্ণ নহে; তৎপর ইথারের আন্দোলন,—ইহাও বর্ণ নহে, অদৃশ্য পদার্থের আন্দোলন আর বর্ণ, এই উভয়ে বিন্দু মাত্রও সাদৃশ্য নাই; তৎপর এই আন্দোলনোৎপন্ন স্নায়বিক কম্পন, ইহাই বা কিরূপে বর্ণ হইবে? তারপর রহিল কেবল একটী মানসিক অনুভব, একটী মানসিক অবস্থা, ইহাই তবে বর্ণ। পাঠক এই সাক্ষাৎ পরীক্ষাটী ভাল করিয়া বুঝুন, তাহা হইলে এই বিষয় সম্বন্ধীয় সমুদায় আপত্তি-খণ্ডন সহজ হইবে। একটী আপত্তি এই—পাঠক বলিতে পার, আমরা তো আমাদের শরীর হইতে পৃথক এবং অল্প বা অধিক দূরস্থিত পদার্থে বর্ণ দেখিতে পাই, তবে ইহাকে মানসিক অবস্থা বলিব কিরূপে। ইহার উত্তর এই, দূরস্থিত পদার্থকে বাস্তবিক তুমি দেখিতে পাও না, তদুপরি পতিত আলোক-রাশি তোমার চক্ষুতে প্রতিফলিত হইয়া তোমার চক্ষুতে একটি চিত্র অঙ্কিত করে, তুমি তাহাই দেখিতে পাও; আলোক-প্রাপ্ত মূল পদার্থ যে দূরে অবস্থিত, এই বিশ্বাস নানা উপায়ে ক্রমে উপার্জ্জিত হয় এবং তৎপর সাক্ষাৎ জ্ঞানের ন্যায় প্রতিভাত হয়। চক্ষু দ্বারা দূরত্বানুভব যে আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এই বিষয়ে বার্কলির

সময় হইতে প্রায় দার্শনিক মাত্রেই নিঃসন্দিগ্ধ রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক বস্তুই চক্ষুর সমসরলরেখাভিমুখে দেখিতে পাই; প্রত্যেক আলোক-রশ্মি সরল ভাবে আমাদের চক্ষুতে পতিত হয়। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, যে রেখা আমার চক্ষুর সম্মুখে সরল ভাবে বিস্তৃত, তাহার বিস্তৃতি দর্শন আমার পক্ষে অসম্ভব, তাহার এক প্রান্ত মাত্র আমার দৃষ্টির বিষয়; সুতরাং যে প্রান্ত আমার চক্ষু-সংশ্লিষ্ট, কেবল তাহা দেখাই আমার পক্ষে সম্ভব।

(ক্রমশঃ।)

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম।

অনেকের সংস্কার এই যে, বিজ্ঞানের উন্নতিতে ধর্ম্মের অপচয় হয়। তাঁহারা বলেন, বিজ্ঞানের আলোচনার যতই বৃদ্ধি হইতেছে, বিজ্ঞান-বলে সভ্যতার যতই উন্নতি হইতেছে, জনসমাজ হইতে ধর্ম্ম ততই দূরে যাইতেছে। কেহ বা এতদূর বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই যে, চরমে সভ্যজগৎ নাস্তিকতা অবলম্বন করিবে!

এই কি সত্য কথা? পরিণামে জগৎ নাস্তিক হইবে, এই কি যথার্থ সিদ্ধান্ত? আমরা বলি—কখনই নহে। কোন বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে দুই উপায় অবলম্বন করিতে হয়, প্রথম যুক্তি, দ্বিতীয় উদাহরণ। এই দুই উপায়েই আমরা দেখিতেছি, প্রতিপক্ষের কথা বলবৎ থাকে না।

প্রথমতঃ যুক্তির পথেই চলি। মূলে যদি দুই পদার্থে বিরোধ থাকে, তবে সেই দুই পদার্থের মিলন হইতে পারে না। জল শীতল, অগ্নি উত্তপ্ত; জলের প্রকৃতি শৈত্য, অগ্নির প্রকৃতি উষ্ণতা; উভয়ের মূলেই বিরোধ। অতএব জল ও অগ্নির একত্র সমাবেশ হইতে পারে না; হয় অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, না হয় উত্তাপে [illegible] বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। কথাটী যদিও সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-সম্মত হইল না, তথাপি আমাদিগের বক্তব্য বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহার করাতে ক্ষতি নাই।

ধর্ম্মে এবং বিজ্ঞানে কি এইরূপ প্রকৃতিগত বিরোধ আছে? নাই। ধর্ম্মের মূল কি? না, বিশ্বাস (Faith); বিজ্ঞানের মূল কি? না, "কি এবং কেন?" (Why and how) এই অনুসন্ধিৎসা; ইহার অপর নাম কার্য্যাকারণ জ্ঞান (Reason)। এই বিশ্বাস ও "কার্য্যকারণ জ্ঞানে" কি বিরোধ আছে? নাই। একটী উদাহরণ দিতেছি।

সকলেই আপনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে; এ বিশ্বাস স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে যে সকল বিষয়ের বা ঘটনার সম্বন্ধ, তাহা বিস্মৃত হইয়া কেহ আত্ম-সত্তায় বিশ্বাস করিতে পারে কি? যাঁহারা মনোবিজ্ঞান ভালরূপে অনুশীলন করিয়াছেন, যাঁহারা এ বিষয়ে বেশ চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন,—"এই যে আমি দেখিতেছি, এই যে আমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিতেছি, এই যে আমার মনে চিন্তা ও হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি জন্মিতেছে" এই

সকল জ্ঞান (consciousness) যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে কার্য্য না করিত, তাহা হইলে কেহই আপনার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারিত না। অতএব বিশ্বাসের কার্য্যের জন্যই বিলক্ষণ কার্য্যকারণ জ্ঞানের প্রয়োজন।

যদি বল, কার্য্যকারণ জ্ঞানই আমাদিগের একমাত্র নেতা; তবে আর "বিশ্বাস" বলিয়া আর একটা পদার্থের নাম কর কেন? তবে "অজ্ঞতা (Ignorance) না বলিয়া বিশ্বাস (Faith) বল কেন? যদি বিশ্বাস নামে একটা কিছু থাকিল, তবেত দেখিতেছি, তাহার সঙ্গে কার্য্যকারণ জ্ঞানের বিরোধ নাই; বরং উভয়ে অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। বরং যেখানে কার্য্যকারণ জ্ঞানের অভাব সেখানেই বিশ্বাসেরও বিকৃতি। দৃষ্টান্ত উন্মাদ। পাগল অনেক অপ্রকৃত কথায় বিশ্বাস করে, আবার অনেক প্রকৃত কথায় বিশ্বাস করে না। আমরা এমন চিন্তাশক্তি বিহীন লোকের কথাও শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি ষোড়শোপচারে আহার করিবার পরক্ষণেই "হায়, আজ আমার অন্ন মিলিল না, আমি ক্ষুধায় মরিলাম!" বলিয়া হাহাকার করিয়াছে!! বিশ্বাস কার্য্যকারণ জ্ঞানের অভাব (negative) নহে, উহা প্রকৃত ভাব পদার্থ (positive)। পরে বুঝান যাইতেছে

যদি বল, বিশ্বাস কার্য্য কারণ জ্ঞানের ফল; তবে ত নিজ মুখেই বিশ্বাসের অস্তিত্ব অকাট্য রূপে স্বীকার করিলে। বিশ্বাস কি? বিশ্বাস ত আর মনের কোন সিদ্ধান্ত নয়। উহা মানবাত্মার গতি (Tendency) মাত্র। আত্মার সে গতি যদি কার্য্যকারণ জ্ঞানের ফলও হইত, তাহা হইলেও সেই জ্ঞানের উৎকর্ষ অর্থাৎ বিজ্ঞানের উন্নতিতে সেই বিশ্বাস বর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত অর্থাৎ ধর্ম্মের উন্নতি হইত। তবে ত আর বিজ্ঞান ধর্ম্মকে সংহার করিতে পারিল না, ধর্ম্মের পথ পরিস্কার করিল মাত্র। বাস্তব কথাও তাই, বিজ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিই করিয়া দেয়। তবে বিশ্বাস কার্য্যকারণ জ্ঞানের ফল নহে, উহার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রূপে সম্বন্ধ।

যাঁহারা মানব জীবনের সমস্ত কার্য্যকে জ্ঞান (Reason) বা অজ্ঞতার (Ignorance) ফল মনে করেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষের অপলাপ করেন। কি শরীরে, কি আত্মাতে সর্ব্বত্রই কতকগুলি স্বাভাবিক লক্ষণ আছে, ঐ গুলিকে ইংরেজীতে (Instinct) কহে, বাঙ্গলাতে স্বতঃসংস্কার বলা যাইতে পারে। আভ্যন্তরিক স্বতঃসংস্কারকে সহজ জ্ঞান (Intuition) বলে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু মাতৃস্তন্য পান করে, ইহা স্বতঃসংস্কার বা Instinct এর কার্য্য। কারণ নির্ণয় করিতে পারি না, অথচ সুন্দর পদার্থ আমাদিগের বড় প্রিয় বোধ হয়। ইহা (Intuition) বা সহজ জ্ঞানের কার্য্য। মানবাত্মার মধ্যে জীবনাশা, প্রীতি ও বিশ্বাস আমাদিগের ঐরূপ সহজ জ্ঞান। সমাজ বন্ধনের মূল যেমন প্রীতি, ধর্ম্মের মূল সেইরূপ বিশ্বাস। কার্য্য-কারণ জ্ঞানলাভে অর্থাৎ সুশিক্ষাতে যেমন প্রীতি বর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত হইয়া সমাজের উন্নতির সহায়তা করে, সেই রূপ বিশ্বাসও বর্দ্ধিত ও মার্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মোন্নতির সাহায্য করে। বারম্বার ইহাই মনে করিতে হইবে যে, বিশ্বাস কোন সিদ্ধান্ত নহে, কোন গ্রন্থ লিখিত কথা নহে। উহা আত্মায় নিহিত স্বাভাবিক বৃত্তি; চিন্তা ধারণা স্মৃতি প্রভৃতি মানসিক শক্তির মত আত্মার স্বাভাবিক এক

লক্ষণ। * উহার সঙ্গে জ্ঞানের বিরোধ নাই। আত্মার এই বৃত্তির এক লক্ষণ নির্ভরশীলতা। এই বৃত্তিই আপনা হইতে মহত্তর শক্তির অস্তিত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞানের প্রবর্ত্তক। এই বৃত্তির বশেই মানবাত্মা উচ্চতর শক্তির উপরে নির্ভর না করিতে পারিলে যেন সুস্থ হইতে পারে না। এই বৃত্তির প্রথম ও শেষ মীমাংসা জগতের আদি কারণ (First cause)। এই বিশ্বাস বৃত্তির অনুশাসনেই জ্ঞান ও শিক্ষার বৈলক্ষণ্য অনুসারে ধর্ম্ম মত ও ধর্ম্ম ভাবের নানা মূর্ত্তি আমরা মানব-সমাজে দেখিতে পাই। জ্ঞান বৃদ্ধিতে ধর্ম্ম ভাবের রূপান্তর হয় বটে, কিন্তু ধর্ম্মকে এড়াইবার সাধ্য নাই। ধর্ম্মও জ্ঞানকে সংহার করিতে পারে না, জ্ঞানও ধর্ম্মকে সংহার করিতে পারে না। কেন না, জ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়ের বীজ যুগপৎ মানবাত্মায় নিহিত, পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। তবে আর বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে বিরোধ কৈ?

যুক্তি ছাড়িয়া দৃষ্টান্তের দিকে গেলে আমরা কি দেখিতে পাই? পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাই, ধর্ম্ম চিরকাল জগতে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। চিরকাল জগতে ধর্ম্ম ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সংশয়-বাদও ছিল। বেদ বেদাঙ্গ ছিল, চার্ব্বাকও ছিল; মার্স মিনর্ব্বা ছিল, তার সঙ্গে ইপিকিউরসও ছিল; চৈতন্য নিত্যানন্দ ছিলেন, জগাই মাধাইও ছিল। আজিও ইয়ুরোপে নিউম্যানের মত ধর্ম্ম বিশ্বাসী আছেন, আবার গোল্‌ডষ্টূকরের মত প্রতিবাদী আছেন। কেহ মনে করিও না, পৃথিবী হইতে আজ কাল ধর্ম্ম চলিয়া যাইতেছে। চিরকালই মানুষ ভূতকালকে অতিরঞ্জিত দেখিয়া বর্ত্তমানকে হীন মনে করিয়াছে। আমাদিগের পিতামহগণ বলিতেন, "সে কালে ধর্ম্ম-জ্ঞান ছিল, এ কালে লোকের তাহা নাই।" আমরাও কখন কখন কার্য্য কর্ম্মে বা লোকের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলি,—"আজ কাল আর লোকের ধর্ম্ম জ্ঞান নাই!" কিন্তু এ দেশের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বের ধর্ম্ম ভাবের সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মভাবের তুলনা কর দেখি। অসার ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ের কথা বলিতেছি না। যথার্থ ধর্ম্মভাব—যাহাতে ত্যাগ-স্বীকারের আবশ্যকতা, অথচ যাহাতে মানুষের চরিত্র ও সমাজের নীতি উন্নত হয়, তাহার সঙ্গে তুলনা কর দেখি। রাজর্ষি রামমোহনের সমকালবর্ত্তী বঙ্গীয় যুবকগণ ও বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গীয় যুবকগণের মধ্যে কি ধর্ম্মোন্নতির কিছুই তারতম্য দেখিতে পাও না? ইতিহাস বলে, সময়ে সময়ে ইহার উহার উত্থান পতন আছে বটে, কিন্তু গড়ে জগতে যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি, তেমনই ধর্ম্মের উন্নতি।

তবে বিজ্ঞানের সঙ্গে কাহার বিরোধ? বিরোধ উপধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম কাহাকে বলি? কতকগুলি মত বা অনুষ্ঠান কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গ্রন্থ প্রচার করে, কতকগুলি লোক তাহাই অখণ্ড্য ও পালনীয় মনে করিয়া তাহার অনুসরণ করে, আপনাদিগের ধর্ম্ম-ভাব ও স্বাধীন চিন্তাকে কার্য্য করিতে না দিয়া পরের আদেশ অর্থাৎ সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়। ইহারই নাম উপধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। এইরূপ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম যাহাদিগের নেতা, ও এইরূপ ধর্ম্ম যাহাদিগের ব্যবসায়, অর্থাৎ অন্নসংস্থান ও মর্য্যাদা রক্ষার উপায়, তাহারাই বিজ্ঞা-

নের বিরোধী ; তাহারাই পৃথিবীর জ্ঞানোন্নতি ও স্বাধীন চিন্তাকে অভিসম্পাৎ করে। কেন না জ্ঞান বিজ্ঞান তাহাদিগের ধর্ম্মকে সংহার করে, তাহাদিগের ঘর ভাঙ্গিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত যথা,—খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তক বলিতেছে যে, ঈশ্বর ছয় দিনে সমস্ত সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সে সৃষ্টিও অদ্যাবধি পাঁচ সহস্র বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। বিজ্ঞান এই ধর্ম্ম মতকে চূর্ণ করিয়া ফেলে। বিজ্ঞান পৃথিবীর স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া, অন্তরীক্ষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রচার করিতেছে যে, লক্ষ লক্ষ বৎসরে পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা হইয়াছে। বিজ্ঞানের কথায় খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্রান্ত গ্রন্থ ভ্রান্ত হইয়া পড়িল, সুতরাং এই উপধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ। কিন্তু এক অপরাজিত শক্তিতে, ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা ত বিজ্ঞান অস্বীকার করিল না। অলৌকিক কার্য্য (Miracles) যে সকল পৌরাণিক ধর্ম্মের ভিত্তি, বিজ্ঞান তাহাদিগের পরম শত্রু ; কেন না জড় জগতের পদার্থ সকলের গুণাগুণ নিরূপণ ও প্রচার করিয়া অনেক অলৌকিক কার্য্যকেই বিজ্ঞান লোকের আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞান ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা অস্বীকার করে না, বরং সৃষ্টির গূঢ় রহস্য সকল ভেদ করিয়া ঐশী মহিমার অনন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়।

বহুকাল অত্যাচার করিয়া, অর্থাৎ অধর্ম্মপথে চলিয়া যাহারা আপনাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্মজ্ঞান বিনষ্টবৎ করিয়াছে, তাহারাই ধর্ম্মের শাসনকে ভয় করিয়া, এবং ধর্ম্মের মধুরতার স্বাদ না পাইয়া, ধর্ম্মকে অস্বীকার করিতে চায়। আর যাহারা বহুকাল অযত্ন করিয়াছেন, এক দেশে চলিয়াছেন, কেবল চিন্তার পথে, কেবলই কার্য্যকারণ জ্ঞানের উপদেশে চলিয়াছেন, তাঁহারাও বিশ্বাস ও ভক্তিবৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছেন, বিকাশ পাইতে দিতেছেন না ; তাঁহারাও সৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্ত দেখিয়া ধন্য হইতে পারিতেছেন না বটে, কিন্তু ঐশী শক্তি অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। যাহার চক্ষু ভাল করিয়া ফুটে নাই, সে যেমন জগতের দিকে চাহিলে বলিয়া উঠিবে, "অহো, কি দেখিতেছি ; কিছুই যে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না!" স্পেন্সারের মত দুই একজন আধুনিক দার্শনিকও সেইরূপ বলিতেছেন, "এসৃষ্টি আপনা হইতেই হয় নাই বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিনা ; প্রকৃতির এ রহস্য ("Mystery)" ভেদ করিতে পারিতেছি না!" তাই আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকে বলে, "বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।"

বাস্তব, ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাদ নাই ; বিজ্ঞানই ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করে। কিরূপে? ভাবিয়া দেখ, বিজ্ঞান জড়ের জড়ত্ব নাশ করে। মনে কর প্রকাণ্ড ঝড় ও শীলাবৃষ্টি হইয়া কোন প্রদেশ ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হইল, বৃক্ষ লতা উৎপাটিত ও গৃহাদি ভূমিসাৎ হইল। তুমি দেখিলে, কি একটা কাণ্ড হইয়া গেল ; অজ্ঞান অশিক্ষিত মনে করিল যে, দেব-দৈত্যের আস্ফালনে এ বিষম বিভ্রাট ঘটিল। কিন্তু বিজ্ঞান কি বলিবে? বিজ্ঞান বলিবে এই ঝটিকা কোন একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, ভূতের কার্য্য নহে। জড়ের কার্য্য বলিয়া

যাহা ভাবিতেছ, তাহা এক নিগূঢ় ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য। উত্তাপে পৃথিবীর জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিয়াছিল, শীতল বায়ুস্পর্শে সেই বাষ্প জলবিন্দু ও শীলা হইয়া ভূতলে পড়িল। উত্তাপেই বায়ু উষ্ণ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিল, প্রবল বায়ুস্রোত উৎক্ষিপ্ত বায়ুরাশির স্থল পূর্ণ করিল; ঝড় বহিল। বিজ্ঞান বলিতেছে এই সকল কথা, এই সকল তত্ত্ব বিজ্ঞান আবিষ্কার করিল। কিন্তু এই উত্তাপ কি? বিজ্ঞান কি বলিতে পারে, ইহা জড় পদার্থ বা জড়ের গুণ? বিজ্ঞানের কার্য্য শেষ হইল। এখন বিশ্বাস বলিতেছে,—উত্তাপ আর কিছুই নহে, উহা জড় জগতের পরিচালনার জন্য ভগবানের ইচ্ছায় রচিত এক অদ্ভুত যন্ত্র। অতএব দেখ, বিজ্ঞান যেমন ভূতের ভয় ও কুসংস্কার দূর করিল; তেমনই আবার জড়ের জড়ত্ব নাশ করিয়া অন্ধ শক্তির স্থলে ইচ্ছা শক্তির প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিল। কেবল কারণ পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে করিতে বিজ্ঞান দেখিতে পায় যে, জড় কখনও স্বয়ং পরিচালিত হয় না; বিশ্ব-সংসার এক সার্ব্বভৌম শক্তিতে (Universal force) পরিচালিত হয়। এই সার্ব্বভৌম শক্তি অন্ধ হইতে পারে না, অন্ধ হইলে চলে না। কেননা এক শক্তির ফলে শক্ত্যন্তর উদ্ভূত হইতে পারে, কিন্তু সকল শক্তির আদিতে ইচ্ছাশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি (Intelligent force) না থাকিলে চলে না। এইরূপ শক্তির অভাবে জগৎ কার্য্যের পরিচালনা মানুষ কল্পনাও করিতে পারে না।

বিজ্ঞানকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া যাঁহারা ধর্ম্মকে বিদায় করিতে চাহেন, তাঁহারা জড়-; কেননা দ্বৈতবাদী (Deist) ও অদ্বৈতবাদীদের (Pantheist) সঙ্গে আমাদিগের মতদ্বৈধ থাকিলেও তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। "দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও প্রকৃত ধর্ম্ম" নামে আর একটী প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা আছে। সুতরাং আজ কেবল জড়বাদীদিগের সঙ্গেই তর্কের মীমাংসা হউক। কেননা জড়বাদ ও বিজ্ঞান একই কথা। জড়বাদীরা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়াই আত্মমত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন।

জড়বাদীদিগের কয়েকটী আপত্তি আছে; তাহার সকলই বিচারের উপযুক্ত নহে। কিন্তু দুইটী আপত্তি বেশ গুরুতর, সেই দুইটীকে তাঁহারা অখণ্ড্য মনে করেন। কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। জড়বাদীদিগের প্রথম আপত্তি এই যে, "যদি ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই জগৎ এক দিন ছিল না; ঈশ্বরের সৃজন শক্তি কি তখন ছিল না, কি নিদ্রিত ও মৃতবৎ ছিল?" এই আপত্তি কেন অখণ্ড্য হয়, আমরা বুঝিতে পারি না। ইচ্ছাময় জগৎ-প্রসবিতা ঈশ্বর এক কালে ইচ্ছা করিয়াছিলেন না যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এইরূপ হউক; তাহাতে ক্ষতি কি? সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর কোন এক সময়ে তাহার ইচ্ছাশক্তিকে জগৎসৃজনরূপ কার্য্যে বিনিয়োগ না করিয়া "আপনাতে আপনি" ছিলেন, ইহা কি অসম্ভব? ইচ্ছা-শক্তি-বিশিষ্ট হইয়া এইরূপে থাকা তোমার আমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া কি ঈশ্বরের সম্বন্ধেও তাই? তুমি আমিও ত কিয়ৎকালের জন্য বা কিয়ৎ পরিমাণে "আপনাতে আপনি" থাকিতে পারি। পূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাময় ঈশ্বরের ইচ্ছা, প্রবৃত্তির দাস ও ঘটনার পুতুল

তোমার আমার ইচ্ছার অনুরূপ হউক না কেন, ইহাই কি যুক্তি?

বাস্তব জগৎ এক কালে ছিল না, বলিলেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা সৃজন শক্তির অপলাপ হয় না। তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, "কখন সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কি আমরা ধারণা করিতে পারি? ধারণা করিতে পারি না এজন্য কাল অনন্ত; কালজ্ঞানের আদি বা অন্ত আমাদিগের ধারণার বহির্ভূত অনন্তকাল ধারণা করিতে পারিনা বলিয়াই কি সহজ জ্ঞানলব্ধ স্রষ্টা বা আদিকারণ অস্বীকার করিব? এ কোন্ যুক্তি?

জড়বাদীদিগের দ্বিতীয় প্রধান আপত্তি এই যে, "জড় ভিন্ন জড় উৎপন্ন হইতে পারে না, অতএব এই সৃষ্টির স্বতন্ত্র স্রষ্টা কল্পনা মিথ্যা; জগৎ চিরকালই আছে।" এই মতের নাম ধ্রুববাদ বা Positivism। জড় ভিন্ন জড়ের উৎপত্তি হয় না, কিরূপে জানিলে? ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন কেবল জড় কার্য্য করিতে পারে না, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ক্ষেত্র পতিত আছে. গৃহে বীজ আছে; কর্ষণ ও বপন না করিলে কদাপি শস্য উৎপন্ন হইবে না। আমি ইচ্ছা করি, আর আমার হস্তপদ পরিচালিত হয়; সুখাদ্য ভক্ষণের অভিলাষ করি, আর রসনা-মূলে লালার সঞ্চার হয়। ইচ্ছা ত জড় নয়, আকর্ষণ ও গুরুত্ব প্রভৃতির মত জড়ের গুণও নয়। জড় ভিন্ন অপর কোন পদার্থ যদি জড়ের উপরে কার্য্য করিতে পারিল, তবে সেই পদার্থ, অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তি, জড় উৎপাদন করিতে পারিবে না কেন? আমাদিগের ইচ্ছা শক্তি যদি জড়কে পরিচালিত করিতে পারে, তবে সর্ব্বশক্তিমতী ঐশীশক্তি জড় উৎপাদন করিতে পারিবে না, এযুক্তি ন্যায়সঙ্গত (Logical) নহে। তবে যিনি মানবীয় ইচ্ছাশক্তিও অস্বীকার করেন, তিনি প্রত্যক্ষের অপলাপ করেন। কেহ কেহ বা আপনার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সন্দেহ করিয়া দার্শনিক তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। তাদৃশ লোকের সঙ্গে বিতণ্ডা করা অনর্থক।

জড়বাদীদিগকে জিজ্ঞাস্য এই,—জড় হইতে এক্ষণ আমরা জড় প্রসূত হইতে দেখিতেছি সত্য, কিন্তু উৎপাদন করিতেছে কে? সৃষ্টিকার্য্যে দুইটী বিষয় অপরিহার্য্য। প্রথম শক্তি, দ্বিতীয় বুদ্ধি, বুদ্ধি না থাকিলে সৃষ্টির কল্পনা (Design) ও সৃষ্টির লক্ষ্য (Destiny) স্থির করে কে? ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ্ রাজ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবনে অবস্থা ও প্রয়োজনের যে বৈচিত্র্য ঘটে, তাহার কল্পনা বা নিয়তি-স্থির কি মৃত্তিকা, জল, বায়ু বা দেহস্থিত রক্ত মাংস করিতে পারে? প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও রক্ত মাংস অচেতন জড়; অথচ সেই কাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও রক্ত মাংসের মধ্যে সৃজন ও পালন শক্তির যে প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখিতেছি, তাহাকে ঐশী শক্তির কার্য্য না বলিয়া কি বলিব?

আরও একটী কথা আছে। যদি জড় ভিন্ন জড় উৎপন্ন হইতে না পারে, তবে সৃষ্টি কথাই বলা যায় না। বলিতে হয় যে, জগতে পদার্থের রূপান্তর হইতেছে মাত্র। যদি জগৎ কেবল রূপান্তরিতই হইতেছে বিশ্বাস করি, তবে জগৎ সীমাবিশিষ্ট; কেননা জড় যত বড়ই হউক না, উহার সীমা আছে। অতএব দেখ, যদি সর্ব্বশক্তিময়ী ঐশী শক্তির অনন্ত সৃষ্টিকার্য্যে অবি-

শ্বাস কর, তবে বলিতে হয় যে ব্রহ্মাণ্ড সীমাবিশিষ্ট। বস্তুতই কি তাই? জড়-বাদের কি বিড়ম্বনা! দৃশ্যমান জড় পদার্থের পরমাণু সকল ব্যবস্থাপিত হইয়া অভিনব পদার্থ গঠিত হয়, দেখিতেছি সত্য; কিন্তু সেই ব্যবস্থা করে কে? আর কে বলিল যে, নিত্য নূতন পরমাণুর সৃষ্টি হইতেছে না? জড় জগতের আদি, অন্ত ও অভ্যন্তর পূর্ণরূপে পরিমাণ ও পরীক্ষা করিয়া কে দেখিয়াছে, বা দেখিতে পারে? তবে এরূপ কথা বলা মানুষের পক্ষে ধৃষ্টতা বই আর কি হইতে পারে?

এতক্ষণ জড়বাদীদিগের আপত্তি খণ্ডনে যত্ন করিলাম; এইক্ষণ একটী প্রশ্ন করিতেছি। বোধ হয় দার্শনিক জগতে এরূপ প্রশ্ন নূতন। প্রশ্ন এই,—সকল বিষয়ই প্রমাণ সাপেক্ষ। পদার্থবিদেরা পরমাণুর যেরূপ সূত্র নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে পরমাণু কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে; সুতরাং উহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। অতএব অনুমান-সিদ্ধ পরমাণুকে জগতের মূল না বলিয়া, বিশ্বাসলব্ধ ভগবানের ইচ্ছা শক্তিকেই মূল ঠিক করা অধিকতর যুক্তি সিদ্ধ নয় কি? এই প্রশ্ন শুনিয়া কেহ বা হাসিতেও পারেন; কিন্তু আমাদিগের ভরসা আছে, অনেকে হাসিবেন না।

জাতীয়-উৎসব।

পূর্ব্ব বঙ্গে নৌ-সঞ্চালন একটী স্থানিক জাতীয় উৎসব। জাতীয় উৎসব বলিলাম বটে, কিন্তু বাস্তবিক জাতীয় উৎসব ভারতবর্ষে নাই। ভারত-হৃদয়ে অদ্যাপি জাতীয় একতা, জাতীয় আদর ও জাতীয় ভাবের উন্মেষ হয় নাই। কিন্তু কাল মাহাত্ম্যে কিম্বা অপরাপর জাতির সংশ্রবে আসিয়া, তাহাদের ভাব ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করত, এক্ষণ তাহারা অন্ততঃ, জাতীয় বলিতে প্রকৃত পক্ষে কি বুঝায়, তাহা জানিতে পারিয়াছে। সীতাহরণের ন্যায় অবমাননা-সূচক, লক্ষণশক্তিশেলের ন্যায় হৃদয়-বিদারক, অভিমন্যু বধের ন্যায় অবিচার-পরিপোষক কিম্বা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মত অত্যাচার-দ্যোতক ঘটনাবলোকন করিয়া, ইসলামবংশ-প্রমুখ কাফেরবিমর্দ্দন মহাম্মদ হানিফের পন্থাবলম্বন করিতে না পারিলেও, এখন তাহারা একীভূতভাবে লজ্জায় ম্রিয়মাণ, দুঃখে মুহ্যমান ও ক্ষোভে খিদ্যমান হইতে শিক্ষা করিয়াছে। এই সময়ে জাতীয়ভাব উত্তেজিত করিবার জন্য, জাতীয় একতা বদ্ধমূল করিবার জন্য জাতীয় উৎসবের একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু বঙ্গে, কেবল বঙ্গে কেন, ভারতে জাতীয় ভাবোদ্দীপক, জাতীয় একতা বিবর্দ্ধক উৎসব কোথায়? যে উৎসবে ধামনিক শোণিত সবলে সঞ্চলিত, নয়ন বিস্ফারিত, মন উদ্বোধিত ও অন্তর্নিগূঢ় ভাবরাজি উদ্বেলিত হয়, সে উৎসব কৈ? যে উৎসবে আমরা পুরুষ; যে উৎসবে আমরা এক জাতি ও এক প্রাণ, এই ভাবের উদ্রেক করে, সে উৎসব কই?

ইত্যগ্রে সমগ্র ভারত একছত্র রাজত্বাধীন

হয় নাই। ভারতে একীভূত জাতীয়ভাব যে কখনও স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। এক হুঙ্কারে সমগ্র ভারত শিহরিয়া উঠিল, প্রাচ্যোপসাগরান্ত প্রদেশ হইতে পাশ্চত্য সাগরান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত কাঁদিল, এক আনন্দধ্বনি কুমারিকা হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল, ভারত ইতিহাসে এমন ঘটনা কৈ?

ভারত জাতি-বিচ্ছিন্নতা, ধর্ম্ম-বিচ্ছিন্নতা ও সমাজ-বিচ্ছিন্নতায় চিরকালই ছিন্ন ভিন্ন। আজও ভারতে বাঙ্গালীর অবমাননায় বেহারী অবমানিত, গুর্জ্জরবাসীর উন্নতিতে মহারাষ্ট্রীয় উন্নত, শিখের ক্ষতিতে রজপুত ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিতে শিখিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। হিন্দুস্থানে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ মাত্র থাকা কালেও যাহা হয় নাই, আজ কি সেই দেশে,—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ানাদি বিবিধ জাতি ও ধর্ম্মের আবাসভূমিতে, তাহা হইবে? হঠাৎ ভাবিতে অসম্ভব বোধ হয় বটে, কিন্তু তবু যেন আশা হয় ইহা হইবে। ভারতবর্ষ এখন এক শাসন-পরতন্ত্র। ভারতের সিংহ, শার্দ্দুল ও মেষ শাবক এক শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়াছে। অনিচ্ছা সত্বেও একের দুঃখে অপরকে দুঃখভাগী ও সুখে সুখভাগী হইতে হইয়াছে। ভারতবাসীর একতাবন্ধনের এই এক ভূমি। কিন্তু কেবল একছত্র শাসন প্রভাবেই একপ্রাণতা হইবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। ধর্ম্মই একপ্রাণতার বীজ মন্ত্র। ধর্ম্মগত একতা না হইলে এক প্রাণতা সম্ভবে কোথা? তবে কি খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান [illegible], অথবা হিন্দু ও মুসলমান খ্রীষ্টীয়ান হইবে; কিম্বা খ্রীষ্টান ও হিন্দু মুসলমান হইয়া যাইবে? ইহাই কি আশার বিষয়? এরূপ হওয়াত সম্ভব মনে হয় না; উহাকে প্রকৃতিসিদ্ধ বলিয়াও বোধ করি না। তবে ধর্ম্মগত একতা কিরূপে হইবে?

জগতের সকল ধর্ম্মই মূলে এক। স্থান, কাল, ও পাত্র ভেদে প্রকার ভেদ ও বিধি-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকার ভেদ ও বিধি-বৈচিত্র্য উদ্ঘাটিত করিয়া সকল ধর্ম্মকে এক দেখিবার দিন আসিয়াছে। দিন আসিয়াছে—যখন খ্রীষ্টীয়ানগণ, হিন্দু ও মুসলমানদিগকে "ইন্‌ফিডেল্‌স" ও অনন্ত নরকের যাত্রী মনে করিবে না; যখন মুসলমানগণ হিন্দু ও খ্রীষ্টীয়ানদিগকে "কাফের ও গুণাগার" ভাবিবে না, যখন হিন্দুগণ খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমানদিগকে ধর্ম্মদ্রোহী ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিবে না। ঈশ্বর এক। হিন্দু, খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান সকলই তাঁহা হইতে এবং তাঁহারই ইচ্ছাতে স্থান, কাল, পাত্র ও প্রয়োজন ভেদ। তাঁহারই ইচ্ছাতে ধর্ম্ম, সমাজ, রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহার ভেদ। এই ভেদ সত্বেও অভেদত্ব দর্শনের দিন উপস্থিত,—এককে অনন্ত ও অনন্তকে এক দেখিবার দিন সমাগত; তাই আশা হয় ভারতে এবং যথা সময়ে জগতে একতা ও একপ্রাণতা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কিন্তু আমরা কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। ভারতে প্রাণপ্রদ, পৌরুষজনক, বীরত্বব্যঞ্জক উৎসব কৈ?

মথুরায় কংশ-বধের যে অভিনয় হয়, তাহা এখানকার "আশালতার" (Band of Hope) সুরারাক্ষস বধ বিশেষ,—শুষ্ক, নীরস ও ব্যঙ্গোদ্দীপক। এখানকার হিন্দুমেলা প্রদর্শনী বিশেষ। ইহাতে হৃদয় নৃত্য করে না, ধমনীর বৃত্তি বিবর্দ্ধিত হয় না, আন্তরিক ভাব বিপ্লবকে অন্তরাত্মা প্রধুমিত হয় না।

বাঙ্গালার প্রধান উৎসব দুর্গোৎসব।

এই উৎসবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি? পূজার অংশ পুরোহিতের হাতে; সাধারণের অংশ কি? পূর্ব্বে ছিল কবির লড়াই, ছড়া, ও পাঁচালীর ছড়াছড়ি, এখন তীর্থ-মহিমা-নাটক ও পাঁচজুতা প্রহসন!! কাশ্মিরী অপ্সরার দোদুল্যমান বাহুবল্লীর লীলাখেলা পর্য্যবেক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া সিংহবাহিনীর দিকে কাহারও দৃষ্টি যায় কি? উচ্ছলন্ময়ী, ফেণমূর্দ্ধা, আরক্তদৃশা সুরেশ্বরীকে জহ্নুমুনিবৎ গণ্ডুষে পান করিতে সক্ষম হইয়া কে আর কদলীময়ী গঙ্গার আদর করে? আধুনিক দুর্গোৎসবে ইত্যাকার শিক্ষা ভিন্ন আমরা আর কি শিক্ষা পাইয়া থাকি?

মহিষমর্দ্দিনী, ত্রিশূলধারিণী নিশুম্ভ-ঘাতিনীর রণময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া কোন নারীর, নারী দূরে থাকুক, কোন পুরুষের মনেও অসুর দলনের ভাব উদ্দীপ্ত হয় কি? দনুজ দলনার্থে দ্বিভূজা উমা দশভূজা হইয়া করাল করবাল, প্রচণ্ড পরশু, সুতীক্ষ্ণ ত্রিশূল ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া, ভার্য্যার অঞ্চলবিলাসী বাঙ্গালীর স্বীয় কাপুরুষতার বিষয় মনে পড়ে কি? কৈ তাহার ত নামগন্ধও দেখি না। ফল্গুৎসব, বারইয়ারিপূজা ও চড়ক পার্ব্বনাদি উৎসবের বিবরণ লিখিয়া আর লেখনীকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না।

আমরা যেরূপ জাতীয় উৎসবের অভাবে আক্ষেপ করিলাম, তাহার একটী মাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিব। সেটী মহরমের আনুষঙ্গিক গোঁয়ারার মিছিল। এই মহা নগরীতে যতবার এই মিছিল আমাদের নয়নগোচর হইয়াছে, ততবারই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছি, আমাদের এরূপ উৎসব কোথায়? যখন আবাল বৃদ্ধ মুসলমান সমাজকে "হাসেন্ হসেন্" বলিতে বলিতে বক্ষে করাঘাত করতঃ কর্ব্বলাভিমুখে প্রধাবিত হইতে দর্শন করি, তাহাদের বীরপ্রাণ আজিও যেন সেই হাসেন হসেনের জন্য উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছে, যখন ইহা ভাবি, তখন কোন্ পাপে গৃহোন্মুখ, আত্মপ্রাণ-সর্ব্বস্ব, হীনবীর্য্য বাঙ্গালী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তদ্বিষয়ে চিন্তা হয়, দুঃখ হয় এবং আপনার প্রতি ধিক্কার হয়। তখন মনে হয়; ক্ষণকালের জন্য একবার মুসলমান হই, তাহাদের বীরপ্রাণ-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হই, এবং তাহাদের হইয়া পুরুষপ্রাণতা ও একপ্রাণতা শিক্ষা করি। হায়! মুসলমান রাজত্বকালে এদেশীয়েরা ধুতি চাদর ছাড়িয়া ইজার চাপকান পরিল, মাতৃভাষা ছাড়িয়া আরবী ও পারশী ধরিল, আর্য্যকুলাঙ্গনাকে গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ করিতে শিখিল, বাহিরের সকলই গ্রহণ করিল, কিন্তু মুসলমানের প্রধান ও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম যে জাতীয় একপ্রাণতা, তাহার পাশ ঘেঁসিয়াও কেহ গেল না। আর আজ ইংরেজের শাসন; ইংরেজের বাহিরের সাজ, অসার আচার ব্যবহার, বাহ্যিক আড়ম্বর কি না এদেশে পরিগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের জাতীয় প্রেম, জাতীয় গৌরব, জাতীয় সম্মাননার ভাব কি ভারতবাসীকে স্পর্শও করিয়াছে?

পূর্ব্ব বঙ্গের যে উৎসব উপলক্ষে আজ অন্তরের কয়েকটী দুঃখের কথা কহিলাম, তাহা কি পূর্ব্বোক্তরূপ উৎসব? দূরাদপি দূরের কথা। কিন্তু এই উৎসব কতক পরিমাণে সাহস ও বলবীর্য্যের উত্তেজক বটে। পরন্ত এই উৎসব প্রচলিত থাকায় বর্ষাকালে প্রবমান পূর্ব্ব বঙ্গের অপোগণ্ড বালক ও নৌকায় চলিতে এবং প্রয়োজনানুসারে জলে ঝাঁপ দিতে ভীত হয় না। কলিকাতার পঞ্চবিং-

শতি বর্ষীয় ত্রঢ়িষ্ট ও বলিষ্ঠ যুবাও যেমন পুষ্করিণীর সিঁড়ি হইতে পদস্খলিত হইলে ডুবিয়া মরেন, পূর্ব্ব বঙ্গের পঞ্চমবর্ষীয় বালকের জন্যও সে আশঙ্কা অতি অল্প। বাস্তবিক কলিকাতায় অধিকাংশ লোক কালীঘাটের কাটা গঙ্গাকে দেখিয়া যত ভয় করেন, পূর্ব্ব বাঙ্গালার লোক ভীষণ মেঘনাদ ও উত্তাল তরঙ্গায়িত পদ্মাকেও তত ভয় করে না। এই নির্ভীতির প্রধান শিক্ষাস্থল উক্ত নৌ-সঞ্চালনোৎসব। এই উৎসবের আর একটী সুন্দর অঙ্গ আছে। সেই অঙ্গের বিষয় লইয়াই "সারিমালার" অবতারণা হইয়াছে। নৌ-সঞ্চালনে গায়ন জন্য সামাজিক, অনাস্তিক ও কালসম্বন্ধীয় বিষয় লইয়া সুন্দর সুন্দর সারি সকল রচিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ জুগুপ্সিত বিষয় ধরিয়া অশ্লিল ভাষায় সারি প্রস্তুত করিয়া থাকেন বলিয়াই ইহার প্রতি অনেকে দোষারোপ করিয়া থাকেন; কিন্তু "সারিমালায়" সেরূপ গীত কেহ দেখিতে পাইবেন না।

বর্ষাতে নৌ-সঞ্চালন ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থলে নির্দ্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন হয়, সুতরাং এই উৎসব প্রায় মাস কালব্যাপী; কিন্তু শ্রাবণী সংক্রান্তির পর ১লা ভাদ্রই প্রধান উৎসবের দিন। এই দিনে আপঞ্চাশৎ শত হস্ত পরিমিত দীর্ঘ অথচ প্রায়ই তিন হস্তের অনধিক পরিমিত প্রশস্ত ছিপ্ নৌকা সকল নানা রঙ্গে অনুরঞ্জিত হয়। এক এক নৌকায় ষষ্টি, সপ্ততি বা ততোধিক সংখ্যক লোক তত সংখ্যক বৈটা হস্তে করিয়া আরোহণ করে। এইরূপে সজ্জিত শতাধিক নৌকা এক এক স্থলেতে একত্রিত হয়। তদ্ভিন্ন দর্শক সংখ্যাও বহুতর হইয়া থাকে। দর্শকেরা অবস্থা, পদ ও সম্মানানুসারে পাতাম, পানসী ও বজ্রাদি চাঁদোয়া, পর্দা ও পতাকা দ্বারা সজ্জিত করিয়া উৎসব স্থানে উপস্থিত হয়েন। যখন শতাধিক দৌড় নৌকায় শত শত লোক সমস্বরে সারিতে তান ধরিয়া বৈটা দ্বারা সজোরে নৌকার দুই পার্শ্বে প্রচণ্ড প্রতিঘাত করে, যখন এক নৌকারোহীদল ভ্রুকুটী-কুটিল মুখে অবজ্ঞা-উদ্দীপক বাক্যে অপর নৌকাকে আবাহন করে, যখন এক এক দিক লক্ষ্য করিয়া দশ বিশ খান নৌকা তীর বেগে সঞ্চালন করে, যখন জয়ীপক্ষ আস্ফালন পূর্ব্বক বাহু উত্তোলন করত জীত পক্ষকে বৈটার পাতা প্রদর্শন করে, তখন নিতান্ত ভীরু ও কাপুরুষের মনেও কিঞ্চিৎ বীরভাবের আবির্ভাব হয়। মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় নৌকার সঞ্চালন ধ্বনি সহ সারি-লহরি কর্ণগোচর হইলে চিরশয্যাগতও একবার খট্বাপরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে, মৃত ব্যক্তিও নিমীলিতনেত্র উন্মীলন করে। পূর্ব্ব বঙ্গের এই উৎসব যে আমাদের লক্ষ্যানুরূপ উৎসব তাহা নহে, তবে কথঞ্চিৎ পরিমাণে লক্ষ্যের দিকে, এই মাত্র।

অগ্নিময় জ্বলন্ত পুরুষ।

মনুষ্য আর পশুতে এই স্থলে প্রভেদ,—মানুষ ধীর বুদ্ধি এবং স্বাধীন প্রকৃতি। মানুষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে পারে এবং বিবেচনা করিয়া স্বাধীনভাবে প্রতিপদ বিক্ষেপ করে। মনুষ্য আপনার উপরে আপনি দৃঢ়রূপে অবস্থিত, স্রোতের শৈবালবৎ উদ্দাম প্রবৃত্তি বা এক মাত্র জাতিগত চির নির্দ্দিষ্ট সংস্কার-বায়ুর ঘাত-প্রতিঘাতে সংসার-সাগরে নিয়ত ভাসিয়া বেড়ায় না। মানব জীবন সংগ্রামময় ; ভবসংসার মানবের যুদ্ধ ক্ষেত্র। বিপদ সম্পদের সমীকরণ, পশুত্ব দেবত্বের সামঞ্জস্য বিধান এই জীবন-আহবের লক্ষ্য। এই মহাসংগ্রামে মানব মহাবীর। মনুষ্যের এই উন্নত ভাবের নাম মানব চরিত্র ; মানব চারিত্রই মানবের জীবন। মনুষ্য হইতে যখন এই চরিত্র কোন দুর্ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায়, মানুষ তখন বাঁচিয়াও মরিয়া থাকে।

এই মৃতবৎ চরিত্রহীন মনুষ্য স্থূল বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া, স্থূল দৃষ্টিতে অনেক সময় গোষ্পদে সাগর কল্পনা পূর্ব্বক বিশ্ব সংসার প্লাবনের আশঙ্কায় ভীত ও চকিত হইয়া উঠে। আবার কখনও বা প্রকৃত বিশ্ববিধ্বংশ-কারী উচ্ছ্বসিত মহাসমুদ্রকে গণ্ডুষস্থিত জল বিন্দুমাত্র মনে করিয়া, নির্ভয়ে প্রফুল্ল মনে বিচরণ করিতে থাকে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞান মানুষেরা দিবসে শিবা-রব শুনিলে কতই ভীত হয় ; মনে করে—এবার বুঝিবা পৃথিবী ধ্বংশ পাইবে,—দেশ একবারে উচ্ছন্নে যাইবে। যখন তাহাদের মনে এই আশঙ্কা প্রবেশ করে, তখন তাহারা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। চতুর্দ্দিকে স্বস্ত্যয়ন ও দেবার্চ্চনার ঘটা পড়িয়া যায়। তাহাদের সমশ্রেণীস্থ লোকেরা দেখিয়া ভাবে, এই লোকগুলি বড়ই দেশহিতৈষী, দেশের মঙ্গলের জন্য, পৃথিবীর হিতের জন্য ইহাদের প্রাণ বড়ই ব্যাকুল। অবসর পাইলেই কেহবা বৃথা হুজুক উঠাইয়া, পঞ্চমে স্বর তুলিয়া, শূন্য-গর্ভ কুম্ভের ন্যায় যশ ও স্বার্থের বায়ু-প্রতিঘাতে, বিশাল শব্দে দিগন্ত কাঁপাইতে থাকে। অসার লোকেরা আবার তাহার প্রতিশব্দের পৃষ্ঠে "বাহাবা" শব্দ যোগ করিয়া গগণবক্ষ কোলাহলময় করিয়া ফেলে। কিন্তু "শূন্যেতে মারিলে ঢিল রহে কতক্ষণ ?" অসত্য পরাজিত হয়, বিপদের অগ্নিকুণ্ডে পড়িবামাত্র গিল্টির কাজ ঘুচিয়া গিয়া অল্প মূল্যের পিত্তল বাহির হইয়া পড়ে। তথাপি হুজুকীর হুজুক কমে না। অপর দিকে এই সকল হুজুকপ্রিয় অসার মুগপাত্র মানুষদিগেরই বিষম অমনোযোগে, দুর্ব্ব্যবহারে দেশের নর নারী সকল ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে গভীর পাপ এবং দুর্নীতি পঙ্কে জড়িত ও মলিন হইয়া পড়ে। অধর্ম্ম ও নাস্তিকতার পূতিগন্ধময় বায়ুচ্ছ্বাসে গৃহবাস দুঃসহ হইয়া উঠে। আত্মবিচ্ছেদ ও গৃহবিচ্ছেদের অগ্নিশিখাগুলি ধিকি ধিকি করিয়া ক্রমে প্রবল দাবদাহে পরিণত হইতে থাকে। দেশব্যাপী অসারতা

এবং অপদার্থতা দেখিয়া প্রবলতর পরজাতি তাহাদের উপরে একাধিপত্য স্থাপন পূর্ব্বক মানব হৃদয়ের স্বার্থদূষিত পশু ভাবের পূর্ণ বিকাশ প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হয়। কূট-চক্রী শাসকগণ আপনাদের জটিল মস্তিষ্কের গূঢ় চিন্তাপ্রসূত মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক, অলক্ষিতে দেশের হস্তপদ বন্ধন করিয়া দেশবাসীকে চির দাসত্বের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করিবার জন্য, সর্ব্বদাই অবসর এবং সুযোগ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করে। স্থূলদর্শী লোক সকল এই নিগূঢ় ব্যাপারের অর্থ ভেদ করিতে পারে না এবং তজ্জন্য একবারও ভাবে না। যে জাতির দেহ পর-মাণু সকল ঈদৃশ হীন প্রকৃতির মনুষ্যমণ্ডলী দ্বারা সংরচিত, সেই জাতিই এ পৃথিবীতে মৃত আখ্যার একমাত্র অধিকারী।

শ্মশান ক্ষেত্রে প্রবেশ মাত্র যে প্রকার, বীভৎস ও বিভীষিকা পূর্ণ দৃশ্য সকল চতু-র্দ্দিক হইতে দৃষ্টিক্ষেত্র একেবারে ঘনরূপে আবৃত করিয়া ফেলে, সর্ব্ব স্থান হইতে পূতিগন্ধময় বায়ুচ্ছ্বাস আসিয়া নাসিকা-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়,—হৃষিত শব মাংস-ভোজী ইতর জন্তু এবং পক্ষী সকলের পর-স্পর দ্বন্দ্ব ও আমোদ-জনিত বিকট চীৎ-কার রবে কর্ণকুহর ফাটিয়া যাইতে থাকে, প্রাণে ঔদাস, শোক, দুঃখ, ভয়, ঘৃণা বা ন্যক্কারজনক ভাব এবং বিমর্ষতা একত্র সমুদিত হইয়া মহা বিপর্য্যয় উৎপাদন করে; কোন মৃত জাতির অভ্যন্তরে সহসা প্রবেশ করিলেও যেন তদ্রূপ অবস্থা পরাম্পরা আসি-য়াই চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘেরিয়া ধরে। সে-খানে প্রবেশ মাত্রই দেখিবে, সবল দুর্ব্বলের স্কন্ধে পড়িয়া, দুঃখ, দারিদ্র্য, ও চিরাত্যাচার প্রপীড়িত, জীর্ণ শীর্ণ, শুষ্ক শরীর হইতে রুধিরশূন্য নীরস মাংসপেশী সকল বজ্র-দন্তে ভীষণ বলে আকর্ষণ করিতেছে। সাধু অসাধুর অত্যাচারে সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত। মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, প্রবঞ্চক, দস্যু ও তস্কর সকল স্বাধীন ভাবে, সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাবিহার পূর্ব্বক দিবা নিশি অবাদে আপনাদের দুষ্প্-বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে সর্ব্বদা হাস্যরঙ্গে উন্মত্ত। আদর এবং সম্মান চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও তেজবত্তা পরিত্যাগ করিয়া, অসদুপায় উপার্জ্জিত ধনরাশি অথবা অত্যাচারীর ভয়-প্রকট কুটিল ভ্রূভঙ্গির দিকেই প্রধাবিত। সেখানে প্রবেশ করিলেই হয় ত শুনিবে দুরাচারী ইন্দ্রিয়-পরায়ণ বা বহুবিবাহ-দোষে দূষিত চরিত্র, পাষাণ হৃদয়, স্বেচ্ছাচারী পুরুষগণের বিষমাত্যাচারে পরম আদর ও সম্মানের বস্তু গৃহলক্ষ্মী, সমা-জের অন্তঃশোভাবর্দ্ধনকারিণী, মানবহৃদয় সংগঠনে অদ্বিতীয় শক্তিশালিনী, দেশ ও সমা-জের জননী বা প্রথম শিক্ষার পবিত্র প্রস্রবণ রূপিণী, দেবীস্বরূপা নারীকুল অনাদরে, অজ্ঞানান্ধকারে অন্তঃপুর-কারাগারে বন্দিনী থাকিয়া, সাধারণ মহোৎসবের দিনেও মনো-দুঃখে অবিরলধারায় অশ্রু বর্ষণ পূর্ব্বক রোদন করিতেছেন। বালবিধবার অন্ত-র্দ্দাহ-জনিত আর্ত্তনাদে আকাশ সর্ব্বদা ফাটিয়া যাইতেছে। সেখানে প্রবেশ করি-লেই স্বার্থের প্ররোচনাকৃত, হৃদয় এবং বিবেকবিরুদ্ধ, দূষিত, অসৎ পাপানুষ্ঠানের বিকট দুর্গন্ধে নাসারন্ধ্র বিদীর্ণ হইতে থা-কিবে। সেখানে দেখিবে দান, ধ্যান, জপ, তপ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য সকল বাহ্যাড়ম্বর পরিপূর্ণ এবং কেবল বৃথাভিমান সংগ্রহের হীন উপায়স্বরূপ। দেশহিতৈষণা প্রভৃতি মানব হৃদয়ের সুমহৎ ভাব সকল সেখানে

কেবল ছলনা পূর্ব্বক সুযশ ও ক্ষণিক-প্রভুতাক্রয়ের সামান্য পণ রূপে পরিগণিত। পরানুকরণ এবং পরপদলেহনই সেখানকার জন সাধারণের আভিজাত্য চিহ্ন। পরজাতীয় প্রভু সকলের কৃপা কটাক্ষই সেস্থানে জাতীয় স্বর্ণমুকুটের উজ্জ্বল ভূষণ।

আমরা যখন জগতের বিস্তীর্ণ ইতিহাস সম্মুখে রাখিয়া পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে, পত্রের পর পত্রে, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায়, এইরূপ নানা মৃত জাতির দুঃখপূর্ণ মলিন ছবি মুহূর্ত্তে ২, ঘনকৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় উদিত হইয়া আমাদের অন্তর্দৃষ্টির আকাশ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন করিতে থাকে। এখানে দেখি মিসর, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, নীলাকাশ বক্ষে জ্বলিতেছিল, জ্বলিতে জ্বলিতে, হাসিতে হাসিতে, দেখিতে দেখিতে নিবিয়া গেল। ওখানে গ্রীসের আকাশে শত সূর্য্য, রোমের গগণে অবুত রবি দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বল আলোক-প্রভায় ভাসাইতেছিল, অলক্ষিতে সেই জ্বলন্ত মিহির মণ্ডল সকলও ঘন নীল, অতল গভীর সাগর গর্ভে খসিয়া পড়িল, আকাশ অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গেল। ফিনিসিয়া, জুডিয়া, কালডিয়া প্রভৃতি বহু সংখ্যক দেশ ও নক্ষত্র-মালার ন্যায় পৃথিবীর নীলাম্বরে এক দিন জ্যোতি বিস্তার করিয়া হাসিতেছিল, আজ সে হাসি, সে দীপ্তি অদৃশ্য। দুঃখিনী ভারতও এক দিন আপনার অঙ্গপ্রভায় কোটি রবি-প্রভা গ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছিল, আজ সেই দুর্জ্জয় প্রভারাশি ঘন গভীর তিমির গর্ভে বিলীন।

ইতিহাসের এইরূপ চিত্র দেখিয়া, রাজ্যলক্ষ্মীর এইরূপ অসাধারণ চপলতার কথা ভাবিয়া সকলেরই প্রাণে গভীর দুঃখ এবং ভীতি সঞ্চারিত হয়। অনেক সময়ে বিষম নিরাশার অন্ধকারে হৃদয় আকাশ ঢাকিয়া যায়। যাহারা একদিন জগতের শীর্ষ স্থানে দাঁড়াইয়া কটাক্ষে পৃথিবীকে হাসাইতে কাঁদাইতে ছিল; যাহারা এক সময়ে সমস্ত ধরাকে শিষ্যের ন্যায় উপদেশ এবং শিশুর ন্যায় হাতে ধরিয়া শিক্ষা দান করিতেছিল; যাহাদের বীরত্ব, ধীরত্ব, সৌজন্য, সম্মান, গৌরব, পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ঐশর্য্যশালিতার পরিমাণ করিতে গিয়া হৃদয় বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইত; যাহাদিগকে উৎসাহ, অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, দয়া, দাক্ষিণ্য এবং নির্ম্মল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-জ্ঞানে দেবতা বলিয়া ভ্রম জন্মিত; আজ তাহারাই ধরণীর মলিন ধূলি-শয্যায় শয়ন করিয়া অবসন্ন শরীরে, ভগ্ন হৃদয়ে, বিষণ্ণমুখে পরপদ সেবায় জীবনের দিন গুলি গভীর দুঃখের সহিত যাপন করিতেছে। এই চিত্ত-বিপ্লবকারী ব্যাপার পরম্পরা ভাবিয়া কাহার না হৃদয় গভীর অতলস্পর্শ অবসাদ সাগরে একবারে নিমগ্ন হইয়া যায়? আমরা আজ দেখিব, এই নিরাশার অন্ধকারময় জগতেও আশার জ্যোতি আছে কি না,—এই অকূল সমুদ্রেও এমন কিছু আছে কি না, যাহা আমাদিগকে এক দিন না এক দিন, এই দুঃখসিন্ধুর পর পারে লইয়া যাইবার কিঞ্চিৎ ভরসাও দিতে পারে?

আজ পুরাকালের সভ্যতার জ্যোতিকে লজ্জা দিয়া, মলিন করিয়া, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবীন সভ্যতার স্বর্ণময় প্রভারাশি পৃথিবীর বিশাল আকাশে বিস্তৃত। আজ বিজ্ঞান ও জ্ঞানবলে মনুষ্য-সন্তান প্রাচীন কালের মানবমণ্ডলী হইতে অনেক ঊর্দ্ধে সদর্পে দণ্ডায়মান। নবীনবিজ্ঞান আপনার

গম্ভীরনিনাদী শিঙ্গা বাজাইয়া জ্ঞানিমণ্ডলীর দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিতেছে, "উন্নতি-উন্নতি। এ জগতে সকলই উন্নতিশীল, সকলই উন্নতির দিকে ধাবিত। বিশ্বসংসার-রূপ সুবিশাল বাষ্পীয় রথচক্র সমূহ, উন্নতি-রূপ দৃঢ়তম, অক্ষয়, অনন্ত লৌহময় পথে অবিশ্রান্ত, অপ্রতিহত এবং ক্রম-বর্দ্ধন-শীল গতিতে, নক্ষত্র বেগে নিরন্তর প্রধাবিত। আজ অবনতির বিষাদ সঙ্গীত পরিত্যাগ কর, উহা স্বপ্নদৃশ্য বা মোহমন্ত্র মাত্র।" নিত্য-পরিদর্শনও মানব সাধারণকে,—পাণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, সকলকে, দিনের পরে দিন যতই গত হইতেছে, ততই যেন ঘটনার পর ঘটনা দেখাইয়া ধীরে ধীরে অব্যক্ত স্বরে বুঝাইয়া দিতেছে,—"উন্নতি-উন্নতি। উন্নতির পরেও উন্নতি। অবনতি মায়ার কুহক,—কুসংস্কারের প্রলাপ।" মানিলাম—এসকলই আশার কথা। আজ শাপভ্রষ্ট দেবরাণীর ন্যায়, স্বর্গকানন-চ্যুত পারিজাতের ন্যায়, ভারত-ভূমি পৃথিবীর ধুলিরাশিতে বিলুণ্ঠিত। আজ রাহুগ্রস্ত চন্দ্রকলার ন্যায়, তুষার-নিপীড়িত প্রফুল্ল নলিনীসদৃশ, ভারত-মাতা মলিনা ও হীনদশা গ্রস্ত। যাহা এক দিন গন্ধর্ব্বের চৈত্ররথের সহিত, ত্রিদিবের নন্দনের সহিত তুলিত হইত, যাহা এক সময়ে অলকা ও অমরার সৌভাগ্য-রাশি ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে পুণ্য ভূমি বৈকুণ্ঠ-নামের উপযুক্ততা পাইয়াছিল, স্বর্ণভূমি যাহার জগৎবিখ্যাত নাম, বীর প্রসবিনী যাহার আদরের আখ্যা, ধর্ম্ম ক্ষেত্র যাহার বিশেষ অভিধা,—আজ সেই গৌরবান্বিত ভারত পৃথিবীর ভীষণ বিভীষিকাপূর্ণ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত। আজ তাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত মৃত শব দেহে পরিপূর্ণ। যে গগণে এক দিন এক সঙ্গে সৌভাগ্যের কোটিরবি জ্বলিত, আজ সেই আকাশ বিষাদের কালীমাখা মেঘে সমাচ্ছন্ন, অবসাদ ও নিরাশার গভীর আঁধারে ঢাকা। এই অন্ধকারে, এই বিশালবিস্তৃত, সুদূর-প্রসারিত শব্দ ও বায়ুগতিহীন শ্মশানবক্ষে দাঁড়াইয়া, আজ কি ঐ নবীনবিজ্ঞানের গম্ভীর স্বরে স্বর মিলাইয়া বলিব, "ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সকলেই উন্নতির দিকে ধাবিত, উন্নতির পরেও উন্নতি, তাহার পরেও উন্নতি, বিশ্বনিহিত উন্নতির মহা স্রোত অনন্তপ্রবাহে অনন্তের দিকে প্রধাবিত? অথবা বৈজ্ঞানিকের হাস্ত ধরিয়া, ভারতের এই দুঃখপূর্ণ মলিন দৃশ্য দেখাইয়া, ভারতের দুঃখকাহিনী বিরলে শুনাইয়া, বলিব—ভাই! নীরব হও, তোমার জ্ঞান বিজ্ঞান সকলই ভুল, সকলই ভ্রমাত্মক? না—এ সকল স্থূলদর্শীর উপর ভাসা কথা; বিজ্ঞানের বাক্য পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞের ন্যায় সহজ মীমাংসায় উপস্থিত হইবার কথা নয়।

আমরা যখন দেখি, একটী ফুল অঙ্কুরিত মুকুলাবস্থা হইতে ধীরে ধীরে, লজ্জাবতী বঙ্গ-কুলবধূর ন্যায়, আবরণ ঘোমটাটী সরাইয়া ভয় ও সঙ্কোচবিহ্বল-চিত্তে "দেখি কি না দেখি" বলিতে বলিতেই যেন সাহস পাইয়া চক্ষু খুলিল—মধুর মধুর, ঈষৎ ঈষৎ হাসিতে হাসিতে যেন অট্ট অট্ট খল খল হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু সেই হাসি বহুক্ষণ থাকিল না, দামিনী রেখার ন্যায় চমকিয়াই মেঘে মিলাইল, আবার অন্ধকারের গর্ভে চির-দিনের জন্য লুক্কায়িত হইল;—প্রভাতের তপ্ত-কাঞ্চন-রাগ-রঞ্জিত স্নিগ্ধক্রোড়ে যে ফুল ফুটিয়া দিগন্ত সৌন্দর্য্য রসে ভাসাইতেছিল, দ্বিপ্রহরের অলন্ত চুল্লিকা সদৃশ অঙ্ক স্পর্শে

সেই সুন্দর ফুল হতশ্রী ও মলিন হইয়া পড়িল; পরদিন প্রভাতের পূর্ব্বেই তাহার সমস্ত দলগুলি, ঝরিয়া পড়িয়া, মৃত্তিকায় মিলাইতে লাগিল, তখন আমরা বলি ফুলের ধ্বংশ এবং অবনতি হইল। বৈজ্ঞানিক বলেন—"এই ধ্বংশ অবনতির নয়, উন্নতির জন্যই পরিবর্ত্তন মাত্র। যে ফুলটী ঝরিয়া পড়িল, তাহার বৃন্তটী নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, দেখিবে—ফুল একটী ক্ষুদ্র ফলের কুঁড়ি রাখিয়া যেন আপনার কর্ত্তব্য পরিসমাপন পূর্ব্বক সানন্দে অন্তর্হিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ফলও বড় হয়; ফল আবার কালক্রমে একটী বীজ এবং বীজ একটী সুন্দর প্রিয়দর্শন অঙ্কুর পৃথিবীকে উপহার দিয়া স্ব স্ব লীলা সম্বরণ করে। অঙ্কুর দেখিতে দেখিতে বৃক্ষে পরিণত হয়,—বৃক্ষে আবার কত ফুল, কত ফল, কত বীজ,—সেই বীজে আবার কত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। ইহাকেই বলে বস্তুর অনন্ত উন্নতি।"

দ্বিতীয় কথা—যে পুষ্পদল গুলি ঝরিয়া পড়িয়া মাটীতে মিশিল, তাহার পরিণামের বিষয়ে কি মীমাংসা করিব? বৈজ্ঞানিক বলেন "তাহারও শেষ মীমাংসা—উন্নতি। ফুলদলের ভূতময় দেহ ভূতে,—ভূত আবার শত ফুল, শতফল, শততরু, শত জীবদেহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া সেই অনন্ত উন্নতির স্রোতেই ভাসিয়া চলিয়াছে। এই পুষ্পের পরিবর্ত্তন বা উন্নতিক্রম বিশ্বের সর্ব্বত্রই বিস্তৃত। তৃণ হইতে বৃক্ষ, ধূলিকণা হইতে পর্ব্বত ও গ্রহ নক্ষত্র, জলবিন্দু হইতে জলরাশি এবং ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলই এই নিয়মে উন্নতির দিকে ধাবমান। এই উন্নতির নিয়ম দ্বিবিধ;—গঠনানুসারী, আর ধ্বংশানুসারী। পুষ্প হইতে ফল, ফল হইতে বীজ, বীজ হইতে অঙ্কুরাদিক্রমে উন্নতির নাম গঠনানুসারী, আর ফুলদল হইতে ভূতেবিশ্লেষনাদি ক্রমে যে উন্নতির ক্রম তাহাই ধ্বংশানুসারী। সর্ব্বত্রই এই দ্বিবিধ নিয়মে পরিবর্ত্তন কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। মানবসমাজও এই নিয়মদ্বয়ের প্রয়োগাধীন।"

পতিত মানবসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দুইটী ব্যাপারের ছবি আমাদের চক্ষুতে বিশদ্ রূপে ভাসিতে থাকে। প্রথমতঃ—কোন মানবসমাজ উন্নতির উচ্চতম অবস্থায় যে শক্তি সকল উপার্জ্জন করে, তাহা অবিনাশী। এই অবিনাশী শক্তিরূপ ভিত্তির উপরেই পরবর্ত্তী উন্নততর সমাজ পরম্পরারূপ দীপ্তিময় মনোহর প্রাসাদাবলী সংগঠিত হইতে থাকে। সমাজের পরে সমাজের, জাতির পরে জাতির উত্থান পতন প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়মানুসারে সম্পাদিত হয়, কিন্তু কিছুতেই ঐ মূলশক্তির ক্ষয় বা হ্রাস হয় না। উহা ক্রমেই বর্দ্ধিতায়তন হইয়া বিদ্যুদ্বেগে অনন্ত উন্নতিমার্গে ধাবিত হইতে থাকে। বর্ত্তমান সভ্যসমাজ সকলের মূলে অবতরণ করিয়া অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই দৃষ্ট হইবে যে, উহা কেবল প্রাচীন মিসর, ভারত, আরব, গ্রীস ও রোম প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্য সমাজ-শক্তিরূপ সুন্দর পুষ্পেরই সুফল মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ—যে মানবসমাজ একবার উন্নতির উচ্চ আকাশ হইতে পতিতবৎ প্রতীয়মান হয়, তাহার প্রাণ যায়, দেহ থাকে। যে শক্তি তাহার জীবনের মূল শক্তি ছিল, তাহা পরবর্ত্তী উন্নততর সমাজের শক্তি-সাগরে মিশিয়া যায়,—সূর্য্যালোক নক্ষত্রের জ্যোতি গ্রাস করে,—মৃত সমাজের জীবনহীন মৃত-

শব ধরার বক্ষ অবরোধ করিয়া পড়িয়া থাকে। এই মৃত দেহের তুলনাস্থল সেই ধরা-নিপতিত শুষ্ক পুষ্পদলরাশি। ইহার উন্নতি ধ্বংশানুসারী,—ইহার উন্নতি ভাঙ্গিয়া গড়ানে, ইহার উন্নতি পুরাতনের বিশ্লেষণ দ্বারা নুতনতরের সংরচনায় নিহিত।

ধ্বংশের অর্থ রূপান্তর প্রাপ্তি। জড়-জগতের সর্ব্বত্রই রূপান্তর প্রাপ্তির সময়ে তাপোদ্গম পরিদৃষ্ট হয়। কঠিন বস্তু তরল হইবার সময়ে, তরল বস্তু বাষ্পীভূত হইবার কালে, এবং এতদুভয়ের বিপরীত পর্য্যায়েও উত্তাপের প্রকাশানুভব হয়। দূষিত বস্তুর বাষ্পে-পরিণতি, সর্ব্বদা উত্তাপ নিঃসারক। রাসায়নিক মিশ্রণ সময়ে অনেক স্থলে ধক্ ধক্ করিয়া অগ্নি জ্বলিতে থাকে। গতিময় জড় জগতের গতি উষ্ণতাত্মক। নিদাঘ কালীন শুষ্ক কানন, সংঘর্ষণ বশতঃ ভীষণ দাবাগ্নি প্রকঠন করিয়া, ভস্ম ও বাষ্পে পরিণত হয়। বায়ুমণ্ডলের পরিবর্ত্তনে মেঘ ও ঝটিকার উৎপত্তি হয়। ঝটিকার সময়ে, মেঘান্ধকারে বিদ্যুৎ ও বজ্রাগ্নি প্রকাশ পায়। জনসমাজ যখন ধ্বংশানুক্রমে রূপান্তরিত হইতে থাকে, তখন সেখানেও অগ্নির অদ্ভুত ক্রিয়া সকল পরিদৃষ্ট হয়। যখন মৃত জাতির ভগ্ন হৃদয়ের উপরে অভিনবতর প্রবল জাতি আসিয়া প্রভুত্বের দৃঢ়তম দুর্গ সংগঠন পূর্ব্বক তদুপরি বিজয় নিশান উড্ডীয়মান করে, ক্ষুধার্ত্ত জলোকার ন্যায় শতমুখে জাতীয় শরীরের রুধির শোষণ করিতে থাকে,—যখন ধন, মান, গৌরবরূপ সমস্ত রুধির শোষিত হওয়াতে জাতির দেহ দুর্ব্বল, হতশ্রী ও বিবর্ণ হইয়া পড়ে, তখন সেখান হইতে উপধর্ম্ম, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার, পাপ ও মহা অত্যাচারের গরলময়, দূষিত উষ্ণ বায়ুরাশি উত্থিত হইয়া সর্ব্বদাই আকাশ পূতিগন্ধে পূর্ণ করিতে থাকে, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, এবং ক্রমে ক্রমে সেই জাতির জীবনের মহা রঙ্গভূমি ভীষণ বিভীষিকাপূর্ণ মহাশ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হয়। একদিন যায়, দুইদিন যায়, যুগের পরে যুগ চলিয়া যায়, অন্ধকারের পর অন্ধকারের তরঙ্গ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিতে থাকে। যখন দিঙ্মণ্ডল নীরব, নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ হয়, যখন গভীর নিদ্রার জাল সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়ে, যখন দেশের লোক পুরাতন রীতি নীতির দোষ গুণ বিচার-শূন্য হইয়া, অপরিবর্ত্তনীয় ও অভ্রান্ত বোধে সেই বিকৃত আচার ব্যবহারকে কণ্ঠভূষণ করিয়া, তজ্জনিত পাপভারে অধঃপাত হইতে অধঃপাতে পতিত হইতে থাকে, তখন কোথা হইতে কে জানে, সেই শব্দ শূন্য, সেই দিক্‌বিদিগ্‌ভেদ শূন্য, গভিরতম তিমিরাচ্ছন্ন, নিরাশার শুষ্ক ঝটিকাপূর্ণ জাতীয় মহাপ্রান্তরে, দুই চারিটী জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিতে থাকে। সাধারণ লোকেরা তত বুঝিতে পারে না, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী প্রবীণ-চিত্ত লোক সকল সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া আশার সহিত ধীরে ধীরে বলেন, জাতীয় মহাবিপ্লবের দিন আগতপ্রায়। তখন কালের গোপনীয়-গর্ভে, গূঢ় সৃষ্টিচক্র ঘুরিতে থাকে, কেহই তাহা দেখিতে পায় না। এক দিন সেই স্ফুলিঙ্গ রাশির মধ্যে, সকলের অলক্ষিতে, সহসা এক জ্বলন্ত অগ্নিস্তম্ভ উৎসারিত হইয়া অল্প সময় মধ্যেই মহাবেগে দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তাহার উজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত

জগতের আকাশ প্রতিভাত হইতে থাকে। জনসাধারণ অবাক্ এবং স্তম্ভিত হইয়া দেখে,—ধরাপৃষ্ঠে আচম্বিতে এক মহা অগ্নি-কাণ্ড উপস্থিত। দেখিতে দেখিতে সেই মহাগ্নিতে পুরাতন রীতিনীতির সমস্ত মলিনতা দগ্ধীভূত হইয়া যায়, এবং তাহা হইতে বিশুদ্ধ স্বর্ণকণা সকল সঞ্চিত হইয়া অভিনব বিশাল সমাজ মন্দিরের ভিত্তিভূমি সংরচিত হইতে থাকে। যাহারা চিরান্ধকারে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের বিকৃত চক্ষুতে সেই আলোকছটা অসহ্য হওয়ায়, তাহারা চীৎকার পূর্ব্বক উহার প্রতিবাদ ও অপযশ ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তদ্বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। কিছুদিন ঘাত প্রতিঘাত চলিতে থাকে; অবশেষে সত্য, তাহার অবশ্যম্ভাবী জয়পদগ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দের মোহিনী পতাকা উড্ডীয়মান করে। এই জাতীয় বিপ্লবের নিদানভূত অগ্নিস্তম্ভকেই আমরা মহারুদ্র বা অগ্নিময় জ্বলন্ত পুরুষ অভিধা প্রদানে প্রস্তুত। ঈশা, মুষা, মহম্মদ, কন্‌ফোসী, বুদ্ধ, নানক এবং চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ এইরূপ এক একটী জাতীয় বিপ্লব-সাধক জ্বলন্ত অগ্নিস্তম্ভ। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও এই শ্রেণীর পুরুষ। আমেরিকা বিপ্লবের কর্ণধার ওয়াসিংটন, ইটালির ম্যাট্‌সিনি, ফ্রান্সের গাম্বেতা এবং হঙ্গারীর তেজস্বী সন্তান কস্থুথ, ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী মহারুদ্র। ধ্বংশ ইঁহাদের কার্য্য,—ধ্বংশ হইতে উন্নতি ইঁহাদের লক্ষ্য। ইঁহারা প্রত্যেকেই অগ্নিময় জ্বলন্ত পুরুষ। ইঁহাদের দেহ জ্বলন্ত অগ্নিতে গঠিত, হৃদয় অগ্নিস্রোতে প্লাবিত, দৃষ্টি অগ্নিবর্ষী, বাক্য জ্বলন্ত অগ্নিরাশি উদ্গারী। অগ্নিময় জ্বলন্ত পুরুষের লক্ষণ এই —তাঁহারা নিজে জ্বলন্ত অগ্নিস্তম্ভ, জ্বলজ্জ্বল অগ্নি স্রোত লইয়া জগতে আগমন করেন, জ্বলন্ত অগ্নিসিন্ধু প্রবাহমান রাখিয়া ধরা হইতে অন্তর্হিত হন। তাঁহারা যে স্থান দিয়া যান, অগ্নি তাঁহাদের অনুগমন করে, তাঁহারা যাহা স্পর্শ করেন, অগ্নি তাহাতে প্রবিষ্ট হয়। তাঁহাদের প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে অগ্নি উৎসারিত হয়, সেই অগ্নি স্পর্শে মৃতব্যক্তিও জীবন পায়। তাঁহাদের অগ্নিময় কটাক্ষপাতে চিরোরোগীও বীরের ন্যায় দম্ভ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠে। তাঁহাদের জ্বলন্ত জীবন এবং বাক্য, কুসুমদামরচিত মধুর ভাণ্ডার নারীহৃদয়েও অগ্নিস্রোত ঢালিয়া দেয়। জগতের ইতিহাসে অভ্রান্তরূপে, স্বর্ণাক্ষরে এই সকল সত্য অঙ্কিত রহিয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য।

বেদ রক্ষার্থ দেবগণের অবতরণ।

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ বলিতেছেন, যাহা কিছু শক্তিসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন, অথবা তেজস্বী, সে সমস্তই ভগবানের অংশ সম্ভূত।*

* যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেববা।
তত্তদেব ত্বং বিদ্ধি মম তেজোহংশ সম্ভবং॥

আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ এই বাক্যের অনুসরণ করিয়াই তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণকে ভগবানের অবতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবাচার্য্যও সাধুদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের এই চির প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিয়া শঙ্করকে শিবের অবতার বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। মহাদেব একদা কৈলাস ভবনে বিহার করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ;—"হে দেব, আপনার অবিদিত নাই, ভগবান বিষ্ণু আমাদিগের হিত সাধনের জন্য বুদ্ধরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধুনাতন শিষ্যেরা তদীয় ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া আপনারাই বঞ্চিত হইতেছেন। তাহাদিগের দূষিত মতে পৃথিবী ব্যাপ্ত হইল, সর্ব্বত্র অনাচার, বেদের অনাদর হইতেছে। কেহ কেহ বা বলিয়া থাকেন, বেদ ভণ্ড ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার উপায় মাত্র। সন্ধ্যা বন্দনাদি সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে। কেহ আর সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করে না, সকলে পাষণ্ড হইয়াছে। যজ্ঞের নাম লইলে লোকে কাণে হাত দেয়। আমরা আর বলী পাই না। ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া লোকে লিঙ্গচক্রাদি চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিতেছে। জঘন্য কাপালিকেরা সদ্যকৃত্ত দ্বিজমুণ্ডে উগ্রভৈরবের পূজা করে, তাহাদের দুরাচারের আর সীমা নাই। ঈদৃশ আরও অসংখ্য কুপথ আশ্রয় করিয়া জনগণ বিড়ম্বিত হইতেছে। হে ভগবন্, আপনি স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সকল দূষিত মত খণ্ডন না করিলে আর সংসারের রক্ষা হয় না।" মহাদেব তথাস্তু বলিয়া দেবগণের মনোরথপূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—"অধর্ম্মের নাশ এবং সদ্ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আমি স্বয়ং শঙ্কর নামে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিব। বিষ্ণুর ভুজ-চতুষ্টয়ের ন্যায় আমার চারিজন শিষ্য হইবে। আমি ব্যাসকৃত বেদান্তসূত্রের প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশ করিব। আমি জ্ঞান বিস্তার করিয়া লোকের মোহের নিদানভূত অজ্ঞানতা জনিত দ্বৈতভাব দূর করিব। কিন্তু হে দেবগণ, তোমরাও সকলে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা হইলেই তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" দেবগণকে এইরূপ আশ্বস্ত করিয়া স্বীয় পুত্র স্কন্দের প্রতি দৃষ্টিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—"হে সৌম্য, যে উপায়ে জগতের উদ্ধার সাধিত হইবে, তোমাকে বিশেষরূপে বলিতেছি। কর্ম্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান বেদের এই তিন কাণ্ড, জগতের রক্ষার জন্য এই কাণ্ডত্রয়েরই উদ্ধার প্রয়োজন। উপাসনা (যোগ) কাণ্ডের উদ্ধারার্থ বিষ্ণু এবং শেষ, পূর্ব্বেই আমার অনুমতিক্রমে, সঙ্কর্ষণ ও পতঞ্জলি নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং জ্ঞানকাণ্ডের উদ্ধার আমি স্বয়ং শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধন করিব, এইমাত্র দেবগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইলাম। অধুনা তোমাকে যাইয়া সুব্রহ্মণ্য (ভট্টপাদ) নামে সংসারে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক বেদ-বিরোধী বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজয় করিয়া জৈমুনি-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। তোমার সাহায্যার্থ ব্রহ্মাও মণ্ডন নামে অবতীর্ণ হইবেন এবং ইন্দ্র সুধন্বা নামে রাজা হইবেন।" দেবসেনানী স্কন্দ মহাদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। বলীর অভাবে আতুর হইয়া দেবগণকে

অনেক স্থলেই এইরূপ ব্রহ্মা অথবা শিবের নিকটে যাইতে দেখা যায়। কিন্তু মাধবাচার্য্য শঙ্করকে কেবল শিবের অবতার বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছেন না, কোথাও বা বিষ্ণুর অবতার, কোথাও বা হিরণ্যগর্ভের অবতার বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, কোথাও বা শঙ্করকে ব্রহ্মা এবং শিব হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন *। কিন্তু শিবেরও অন্যতর নাম শঙ্কর। নামের সাদৃশ্যেও তিনি অজ্ঞলোকদিগের নিকট শিবের অংশ বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। এবং যেমন পুষ্পের সংশ্রবে অনেক হেয় কীটও দেবতার মস্তকে স্থান লাভ করে, সেইরূপ শঙ্করের অবতারত্বে তাৎকালিক আরও অনেকেই দেবাবতার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

দেবরাজ সুধন্বা নামে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজধানী পৃথিবীতে অমরাবতীতুল্য শোভা ধারণ করিল। তাঁহার বিদ্যার প্রতি আদর দেখিয়া রাজসভায় অসংখ্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের সমাগম হইল। অথবা যেন তিনি কৌশলক্রমে সমস্ত বেদ-নিন্দুকদিগকে একত্র করিয়া স্কন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে দেবসেনানী সুব্রহ্মণ্য নামে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহার অন্যতর নাম ভট্টপাদ। তিনি জৈমিনীকৃত সূত্রার্থ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া পরিশেষে রাজা সুধন্বার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। ভট্টপাদ সভাস্থলে আসীন হইলে পর, নিকটস্থ বৃক্ষ শাখায় কোকিলের ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বলিতে লাগিলেন :—"হে রাজ-কোকিল, যদি হেয় কাক-তুল্য বেদনিন্দুকদিগের সঙ্গে তোমাকে দূষিত না করে, তবেই তুমি বাস্তব প্রশংসার পাত্র।" বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা এই কথা শুনিবামাত্র পাদাহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। উভয়পক্ষের বিচার আরম্ভ হইল। ভট্টপাদ স্বীয় তীক্ষ্ণ যুক্তিকুঠারে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত সকল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধদিগের ক্রোধাগ্নি দ্বিগুণিত হইল। শব্দে রসাতল ভেদ করিতে লাগিল। অবশেষে তর্কে পরাজিত হইয়া বৌদ্ধেরা লজ্জায় অধোবদন হইল। এইরূপ তাহাদিগের দর্প চূর্ণ হইলে পর, ভট্টপাদ বেদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া রাজাকে শুনাইতে লাগিলেন এবং তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। পরিশেষে রাজা তাহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "তর্কে জয়পরাজয় দ্বারা মতের সত্যতার প্রমাণ হয় না, তাহাতে কেবল বিদ্যারই পরিচয় হয়, অতএব যিনি গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া আহত না হইবেন, তাহারই মত সত্য।" এই কথা শুনিবামাত্র সকলে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভট্টপাদ বেদ স্মরণ করিতে করিতে নিকটস্থ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, যদি বেদ সত্য হয়, তবে আমার কোনরূপ আঘাত লাগিবে না; বলিতে বলিতে তিনি শৃঙ্গ হইতে নিপতিত হইলেন। দ্বিজবরের পতনে তুলাপিণ্ডবৎ শব্দ হইল, কিন্তু তাহার কোন আঘাত লাগিল না। এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া দিকদিগন্ত হইতে লোক

* স্মরেণকিল মোহিতো বিধিবিধুচ জাতুৎপথো-
ত্তথাহমপি মোহিনী-কুচকচাদি বীক্ষাপরঃ।
অগমহহমোহিনীমিতি বিমৃশ্য সোহভ্যাগমীৎ
ব্রতীশ-বপুষা শিবঃ স্মরকৃতার্ত্তি-বার্ত্তোজ্ঝিতঃ ॥

সকল আসিয়া মিলিল। এতদ্দর্শনে রাজার বেদে শ্রদ্ধা জন্মিল, এবং নিজকে বেদনিন্দুক-দিগের সঙ্গদোষে দূষিত বলিয়া আত্মগ্লানি হইল। কিন্তু বৌদ্ধেরা প্রতিবাদ করিতে লাগিল যে, এতদ্দ্বারা মতের সত্যতার পরীক্ষা হয় না, যেহেতু মন্ত্র ও ঔষধাদির দ্বারাও এইরূপ শরীর রক্ষা হইতে পারে। রাজা প্রত্যক্ষ প্রমাণেও তাহাদের অনাদর দেখিয়া ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন, "আপনা-দিগকে একটী প্রশ্ন করিতেছি, যাঁহারা উত্তরদানে অক্ষম হইবেন, শিলাঘাতে তাঁহা-দের মস্তক চূর্ণ করিব।" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজা একটী কলসী মধ্যে একটী সর্প পূরিয়া রাজসভায় আনয়ন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলুন দেখি ইহার মধ্যে কি আছে?" তাহারা বহু অনুনয় দ্বারা রাজাকে প্রসন্ন করিয়া, পরদিন প্রাতে বলিবেন, এই অঙ্গী-কার করিয়া সকলে চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্ম-ণেরা আকণ্ঠ জলে অবতরণ করিয়া সূর্য্য-দেবের স্তব করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইয়া তাহাদের যাহা বক্তব্য বলিয়া দিলেন। বৌদ্ধেরাও কলসী-মধ্যে কি আছে স্থির করিলেন। পরদিন প্রাতে সকলে সভা-স্থলে আসীন হইলে পর, বৌদ্ধেরা উত্তর করিল যে, কলসীমধ্যে সর্প লুক্কায়িত আছে, এবং ব্রাহ্মণেরা বলিল যে, তন্মধ্যে স্বয়ং বিষ্ণু শেষ-ফণায় শয়ান আছেন। ব্রাহ্মণদিগের উত্তর শুনিয়া রাজার মুখ ম্লান হইয়া পড়িল। কিন্তু এমন সময়ে আকাশবাণী হইল "হে মহারাজ, ব্রাহ্মণেরা সত্যই বলিয়াছে, তাহাতে সংশয় করিও না।" আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া রাজা কলসীমধ্যে বিষ্ণুর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্র তাহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইল। সেই অবধি সুধন্বা বৌদ্ধ ও জৈনদিগের ভয়ঙ্কর শত্রু হইলেন। তিনি সেতু হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ বেদ-নিন্দুকদিগের বধের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ভট্টপাদের প্ররোচনায় সুধন্বা বৌদ্ধ ও জৈন-দিগের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিলেন। তাহাদের বিনাশ হইলে পর, ভট্টপাদ বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডের উদ্ধার দ্বারা স্কন্দের অবতরণের প্রয়োজন সাধিত হইল। ক্রমশঃ।

ক্ষেপাভোলার চিন্তাতরঙ্গ।

মানবের স্বাধীনতা ও তাহার প্রাকৃতিক মূল।

(দ্বিতীয় সংখ্যার ৫৯ পৃষ্ঠার পর)

তুমি বলিতে পার—"ক্রন্দনে আবার সুখ কি? ক্রন্দন তো দুঃখেরই চির সহ-চর?" আমি বলি, আতপ তাপিতের পক্ষে যেমন ছায়া, পিপাসার্ত্তের পক্ষে যেমন জল, শোকার্ত্ত এবং দুঃখার্ত্তের পক্ষে তেমনই রোদন। জলবর্ষণে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত গগণ পরিষ্কৃত এবং আলোকিত হয়। অশ্রু-বর্ষণে হৃদয়ভার ক্ষয় হয়, মলিনতা ও

অবসাদ দূরে যায়, শান্তি এবং তৎসহকৃত অননুমেয় আনন্দাবির্ভাবে প্রাণে একরূপ বিমল সুখের সঞ্চার হয়। তাই মানুষের কান্না পায়, মানুষ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কাঁদে। অনেক সময়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিলে যেরূপ যাতনা এবং কষ্টানুভূতি হয়, অশ্রু প্রবাহের সন্নিরোধে তদপেক্ষাও ক্লেশানুভব হইয়া থাকে। অতএব কান্নাতে সুখ আছে। ক্রন্দনে সুখ না থাকিলে, কান্নাতে সুখের গন্ধ না পাইলে, সুখদাস মানব, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কেন, বল প্রকাশ করিলেও কাঁদিত না। তাই বলিতেছিলাম,—ঐ আমোদপ্রিয় রামুর পাশে শামু দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, প্রাণগত সুখের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে। হতভাগিনী, দুঃখিনী হরিদাসী প্রতিনিয়ত অশ্রুজলে গণ্ড ও বক্ষ ভাসায়, সেই আন্তরিক চির পিপাসারই শান্তিবিধান জন্য।

আবার একজনের সুখ উন্মত্ততাতে, অপরের সুখের রত্নভাণ্ডার গম্ভীর চিন্তার অতল সিন্ধুর তলে লুক্কায়িত। প্রেমিক নিমাই, যে কহিনুরের উদ্দেশে ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ, উত্তাল, তরঙ্গাকুল প্রেমমহাসিন্ধুর গভীর গর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন, দ্বিসহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মহাযোগী বুদ্ধদেব কি ঠিক তাহারই জন্য নির্ব্বাণ সমাধিরূপ অবাত-নিষ্কম্প, অতল মহাহ্রদের নিম্নে ডুবিয়াছিলেন না? আলেকজাণ্ডার এবং নেপোলিয়ন, হানিবল এবং ওয়াসিংটনের উন্মত্ত প্রাণ যে যশোলক্ষ সুখের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল; নিউটন এবং আর্য্যভট্টের গভীর চিন্তানিরত-চিত্তও তজ্জাতীয় সুখলালসায়ই ক্ষিপ্ত ছিল। কেবল সাধনা সম্পূর্ণ পৃথক্। এইরূপে যত আলোচনা করিবে ততই দেখিতে পাইবে,—সুখধামে প্রবেশ জন্য মনুষ্য সকল সর্ব্বদা বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিতেছে। যাহারা এইজন্য অবিকল এক পথের পথিক, এমন দুইটী প্রাণও এ জগতে দুর্লভ। অতএব এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটী অবলম্বন করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে,—মানব সাধারণের সিদ্ধি এক হইলেও ব্যক্তিগত সাধনা বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার দিকে মনোযোগ রাখিয়া যদি মানবজাতির সাধারণ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তবে দেখিতে পাইবে,—যেন মনুষ্যত্ব রূপ একগাছি সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরূপফুল সকল গ্রথিত হইয়া, মানবজাতি নামে একটী অপূর্ব্ব মালা সংরচিত হইয়াছে। যেন মানবত্বরূপ একখানি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় থালাতে ব্যক্তিরূপ বিবিধ বর্ণের ফুল সকল সজ্জিত রহিয়াছে। সেই পুষ্পপূর্ণ থালার নাম মানব জাতি। যেন নরত্বরূপ সুবিশাল গগণবক্ষে ব্যক্তিরূপ বিবিধ দৃশ্যের নক্ষত্র সকল উদিত হইয়াছে। সেই নক্ষত্রভূষিত সুন্দর গগণের নাম মনুষ্য জাতি। যেন একটী সুন্দর জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত সিন্ধু বক্ষে সুবর্ণ রঞ্জিত, হীরা-কুচি খচিত, বিক্ষিপ্ত পুষ্প রাশির ন্যায় নানা ভাবের, নানা দৃশ্যের লহরী সমূহ ক্রীড়া করিতেছে। সেই এক একটী বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের নাম এক এক জন ব্যক্তি, আর ঐ সাগর বক্ষের নাম মনুষ্যত্ব, সমুদয় একত্রে মানবজাতি। অর্থাৎ সমগ্র মনুষ্যজাতির উপর দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের চক্ষুতে সাম্য এবং বৈষম্য এই উভয় বিধ ছবিই যুগপৎ নিপতিত হয়। মানবের মানবত্ব যখন ভাবি, তখন দেখি, সর্ব্বত্র সাম্য; আবার মানবের ব্যক্তিত্ব যখন চিন্তা করি তখন দেখি,—সর্ব্বত্র বৈষম্য। এই সাম্য এবং বৈষম্য, উভয়ই মানব জাতির

ভিত্তি এবং প্রাণ। ইহা হইতেই মনুষ্য-সমাজের শ্রী, গৌরব এবং উন্নতি। পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি, স্বাতন্ত্র্যে, বিশেষত্বে বা বৈষম্যে বিশ্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ, বিশ্ব-স্রষ্টার মাহাত্ম্য, গৌরব এবং জ্ঞানের অদ্ভুত পরিচয়। সুতরাং মানব জাতির যাহা কিছু গাম্ভীর্য্য, যাহা কিছু দেবত্ব, যাহা কিছু শোভা সৌন্দর্য্য, যাহা কিছু হৃদয় বিলোড়ন-কারী বিস্ময়পূর্ণ ভাব,—তাহা এই ব্যক্তিগত পার্থক্য, বৈষম্য বা বিশেষত্ব হইতেই সমুদ্ভূত। মহাচিন্তাশীল, ফরাশী দার্শনিক মহামনা কোম্‌ত, যে বিশ্বব্যাপী মানবত্বের মহাদৃশ্য দেখিয়া, বিস্ময়াভিভূত চিত্তে ভাবিয়াছিলেন ইহাই মানবের পূজ্য, ইহাই মনুষ্যের ধেয়, ইহাই জ্ঞেয়; সেই দৃশ্য কোথা হইতে আসিল? অর্থাৎ যখন মানব সাধারণের একত্রীভূত সমগ্র শক্তির বিষয় আমরা চিন্তা করি, তখন দেখিতে পাই,—সেই শক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা। যখন মানব জাতির সমগ্র উন্নতির বিষয় ভাবি, তখন দেখি, মানব শক্তিই মহাশক্তি। মানব আকাশের বক্ষ, সমুদ্রের গর্ভ তন্ন তন্ন করিয়া নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে; বনের পশুকে ধরিয়া মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় বশ করিয়া রাখিয়াছে। যে জল, আগুন, ও আকাশের বিদ্যুতের অসীম বলের ও পরাক্রমের কথা ভাবিলে ভীতি সঞ্চার হয়;—যে সমুদ্র তরঙ্গের শক্তি ভাবিয়া অবাক্ হই, যে দাবানলের পরাক্রম চিন্তা করিয়া কাঁপিতে থাকি, যে বজ্রের মূর্ত্তি স্মরণ পথে পতিত হইলেই জীবন মৃতের মত নীরব ও নিস্তব্ধ হই,—সেই জল, আগুন ও বিদ্যুৎকে মনুষ্য আপনার বেতনভোগী দাসের ন্যায় খাটাইয়া লইতেছে। এমন কি, মানব এই বিশাল বিশ্বের রচয়িতার প্রতি ইচ্ছাতরঙ্গের তত্ত্বাবধারণে পর্য্যন্ত আপনার হস্ত বিস্তার করিতে সমুদ্যত। এই সমগ্র মানব শক্তির সঙ্গে যখন ব্যক্তিগত শক্তির তুলনা করি, তখন তাহাকে অতি ক্ষুদ্রাম্নক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইতে থাকে। কিন্তু সেই মহাশক্তি এই ক্ষুদ্র শক্তি সমূহেরই সমষ্টি মাত্র। তাহার যত কিছু মাহাত্ম্য, যত কিছু ক্ষমতা, যত কিছু সৌন্দর্য্য, ইহা হইতেই সমুদ্ভূত। এই ব্যক্তিগত শক্তির সৌন্দর্য্য, পার্থক্যে। অতএব কোমতের চক্ষু সমগ্র মানবশক্তির যে মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, তাহার মূল—ব্যক্তিগত পার্থক্যে, বৈষম্য বা বিশেষত্বে। এইরূপে যাহার চক্ষুতে যখন মানবের যে সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইয়াছে, তৎসমুদয়েরই মূল ভিত্তি এই বিশেষত্বে। মানবের এই অদ্ভুত ব্যক্তিগত পার্থক্যের কথা যখনই স্মরণ পথে উদিত হয়, তখনই দিব্য চক্ষুতে দেখিতে পাই—"এজগতে আমি আসিয়াছি একা, যাইব একাকী,—আমার জন্য আমিই। কারণ আমার সিদ্ধি সকলের সঙ্গে এক হইলেও, সাধনা পৃথক্। আমার সাধনা আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, ও রুচির অনুমোদিত। এজগতে দেখিতে পাই, হরি গোপালকে নিন্দা করে এই বলিয়া,—"গোপাল আমার মত দশজনের সঙ্গে মিশে না, আমার মত সভা প্রভৃতিতে যোগ দিয়া, সাধারণের সঙ্গে একত্র হইয়া জগতের হিতে হস্তার্পণ করে না, ধর্ম্ম সাধনের সময় সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া দশায় পতিত হয় না, দশজন, দশহৃদয় একত্র হইলে যে স্বাভাবিক ভাবের উচ্ছাস হয়, সেই উন্মত্ত তরঙ্গে গাঢালিয়া—মুহূর্ত্তের জন্যেও ভব যাতনা হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করে না।

অতএব গোপাল, মূর্খ, পাগল, অকর্ম্মণ্য এবং ধর্ম্মহীন পাষণ্ড।"

আবার গোপাল হরিকে বলে—"তুমি আমার মত নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা কর না, নির্জ্জন সাধনার গর্ভে ডুবিয়া মহামূল্য রত্নের অনুসন্ধান কর না, আপনার বিবেকানুসারে ধীরভাবে নীরবে বীরের ন্যায় কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পার না। হৃদয়ের নিভৃত স্থানে প্রেমময়ের উজ্জ্বল অমৃতময় আবির্ভাবে অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া, ধর্ম্মের মহোচ্চ ভাব, ঈশ্বরের জীবন্ত সত্তার মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা কর না। অতএব তুমি অপদার্থ, আড়ম্বরপ্রিয়, কপটাচারী।"

এই বিসদৃশ ভাবের কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিবে, গোপাল এবং হরি উভয়েই মানবপ্রকৃতির গভীর মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হয় নাই; মানবের ব্যক্তিগত পার্থক্য, বৈষম্য বা বিশেষত্বের গৌরব অবধারণ করিতে পারে নাই। তাহারা উভয়েই জানে না,—এক সিদ্ধির জন্য মনুষ্যের সাধনার ভিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। এই পার্থক্য স্থান বিশেষে, বিষয় বিশেষে ন্যূনাধিক হইতে পারে, কিন্তু এক কখনই হইবে না। পক্ষান্তরে, অত্যন্ত বিভিন্নতাতেও ভয়ের বিষয় নাই। বরং এইরূপ বৈষম্যেই মানবের মহত্ব, মানবজাতির এত উন্নতি ও গৌরব। মনুষ্যের মূর্খতা অনেক সময়ে আপনার পদাঙ্কানুসারে সমস্ত মানবকে পরিচালন করিতে প্রলুব্ধ করে। পক্ষান্তরে অনেক মানুষ দীপমক্ষিকার ন্যায় আপনা হইতেই এইরূপ সঙ্কীর্ণতার আগুনে ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গ ঢালিয়া দেয়। এই শেষোক্ত ঘটনার মূল প্রবর্ত্তক, অপরিণামদর্শী যশোলিপ্সা বা বিনায়াসে উচ্চ সিদ্ধিলাভের প্রলোভন। খ্রীষ্ট বা সক্রেটিস সত্যের জন্য প্রাণত্যাগ করিলেন, সমস্ত পৃথিবী তাঁহাদিগকে পূজা করিতে লাগিল। আমার এইরূপ পূজা পাইতে ইচ্ছা, আমিও বলপূর্ব্বক, অনাবশ্যকমতে সেইরূপ প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি, কিন্তু অগাধ জ্ঞানসিন্ধু বিশ্ববিধাতার নিয়মচক্র এমনই সুন্দর ও ন্যায়রক্ষক যে, তাহাতে পূজার পরিবর্ত্তে আমি জগতের ঘৃণা ভিন্ন আর কিছুই পাইব না। তথাপি কুটিল বুদ্ধি নির্ব্বোধেরা সর্ব্বদাই এইরূপ পথ অবলম্বন করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে আমি ঠিক সক্রেটিস বা খ্রীষ্ট হইব, এইজন্য তাঁহাদের প্রতি পদচিহ্নে পাদক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সিদ্ধান্তও সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ। বস্তুতঃ বিধাতারই ইচ্ছা,—আমি "আমি" হইব; তুমি "তুমি" হইবে। সক্রেটিস্ অনন্তকাল সক্রেটিস্ থাকিবেন, খ্রীষ্ট অনন্তকাল খ্রীষ্ট থাকিবেন্। ঈশ্বরের এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের গূঢ় অর্থ যেখানে যে পরিমাণে অপরিজ্ঞাত, সেই স্থানে সেই পরিমাণে মানবশক্তির অপব্যবহার।

এখন প্রিয়দর্শন বুদ্ধিমান পাঠক! তুমি একবার—ঐতিহাসিক তত্ত্বসাগরে ডুব দেও। দেখিবে,—"প্রাচীন মিসর ও ভারতের উজ্জ্বল গৌরবরবি আজ কেন অস্তমিত?—বুঝিবে, গ্রীসে আর সে ভুবন প্রকাশক জ্যোতিরাশি নাই কেন? বুঝিবে —প্রাচীন রোমের সেই ধরাশাসনী প্রভুশক্তি কোথায়? বুঝিতে—মুসলমানের সেই গভীর বজ্রনির্ঘোষকারী কণ্ঠ আজ নীরব কেন? আরও বুঝিবে ফ্রান্সের সেই নর রুধির-ধারা প্রবাহিনী রাক্ষসী ঘটনার মূল কি? আর আজ সমস্ত ধরা কেনই বা

এক শাসনী শক্তির শেষ দিন আগতপ্রায় দেখিয়া নীরব এবং গম্ভীর!" ভারত সন্তান! আজ এই গভীর চিন্তার মূলে প্রবেশ করিয়া বুঝিয়া লও, ভারত-উদ্ধারের, পতিত জাতির পুনরুত্থানের মূলমন্ত্র কি?

যত দিন জগতে এক ব্যক্তি সহস্র ব্যক্তির এইরূপ স্বাভাবিক পার্থক্যের পথে আপনাকে প্রবল বাধারূপে উপস্থিত করিবে, যত দিন একব্যক্তি কোটি কোটি ব্যক্তিকে আপনার পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে বাধ্য করিবে, অথবা যতদিন কোটি কোটি ব্যক্তি অন্ধের ন্যায় এক ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইবে, তত দিন আত্মকলহ ও গৃহ বিবাদরূপ নির্ধূম অগ্নিশিখাই বল, আর দেশব্যাপী সমরানলই বল, কিছুরই নিবৃত্তি হইবে না। ততদিন প্রকৃত বিশ্বব্যাপী শান্তির আভাস সংসারে কখনই প্রতিফলিত হইবে না। তুমি যদি আমাকে সম্পূর্ণরূপে অথবা অংশত "তুমি" করিতে চাও, অথবা আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক "তুমি" হইতে চাই, ঐ আকাশের চন্দ্র সূর্য্য খসিয়া পড়িবে, গঙ্গার প্রবল স্রোত নিরুদ্ধ হইবে, তথাপি এই চেষ্টা সফল হইবে না। হইবে কি? হইবে—তোমাতে আমাতে সংঘর্ষণ। আজ হউক, কাল হউক সেই সংঘর্ষণে প্রবল আগুন জ্বলিবে। ক্রমশঃ

যোগ।

যোগ আর্য্য-হৃদয়-সমুদ্রের অমূল্য রত্ন। এতদিন এই রত্ন অরণ্যে বা গ্রন্থবিশেষে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর ধর্ম্মবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতবর্গ ও ধর্ম্ম-পিপাসুগণ, সেই রত্নকে গৃহীর দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে উপস্থিত হইয়া, ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিতেছেন। আর্য্যগণ যোগের নাম শ্রবণ করিলেই আনন্দিত ও উল্লসিত হইয়া যোগের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করেন। একদিকে দেখিতে গেলে বলিতে হইবে যে, আর্য্য-যোগের প্রতি আর্য্যসন্তানদিগের এত আদর ও যত্ন শুভ ও মঙ্গলপ্রদ; যদি এই যত্ন ও আদরের ভাব স্থায়ী হয়, তবে ভারতীয় হৃদয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। অপরদিকে দেখিতে হইলে আমরা নৈরাশ হইয়া পড়ি। কারণ আমাদের যোগ শাস্ত্র নানা শাখায় বিভক্ত। কতকগুলি বিষয় নিতান্ত হিতকর ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপানস্বরূপ, আর কতকগুলি প্রকৃত নীতি ও ধর্ম্মবিরোধী। শঙ্করাচার্য্য যখন মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী সরসবাণীর সহিত বিতণ্ডাতে প্রবৃত্ত হন, তখন সরসবাণী সাংসারিক বিলাসতত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন করেন। শঙ্কর কুমারসন্ন্যাসী, বিলাস বাসনার বিন্দুমাত্রও অবগত নহেন, সুতরাং সরসবাণীর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন,—"মাতঃ, আমাকে কিছুদিনের অবকাশ দিন। আমি বিলাসকলাপ শিক্ষা করিয়া আসি।" এই বলিয়া শঙ্কর সশিষ্যে মণ্ডনের বাসভবন হইতে বহির্গত হইয়া অন্যত্র ভ্রমণ করিতে যান। পথিমধ্যে কোন এক রাজার মৃতশব পরিদর্শন

করিয়া যোগবলে সেই মৃতশবের মধ্যে শঙ্কর প্রবেশ করেন এবং রাজকীয় বিলাস বাসনায় বহুদিন যাপন করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখন দেখা যাউক, যোগীবর শঙ্করাচার্য্যের এ কার্য্যটী নীতির অনুমোদিত কি না। আর্য্যগণ পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ সম্মান করিয়া থাকেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যোগীবর শঙ্করাচার্য্য পরস্ত্রী সহবাস দোষে দূষিত কি না? শঙ্করাচার্য্য নিজেই সন্ন্যাসধর্ম্মকে পবিত্র ও পরিত্রাণের প্রধান সোপান বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এখন দেখিতেছি, সেই শঙ্করাচার্য্য আবার যোগীদিগের বিরোধী হইয়া দুর্নীতির অনুসরণ করিতেছেন। রাজপত্নী মৃত-স্বামীকে জীবিত বোধ করিয়া তাঁহাকে স্বামীবৎ আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বয়ং কোন দুর্নীতির পক্ষ আশ্রয় করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর কপটতা আচরণ করিয়া, ইন্দ্রের ন্যায় রাজমহিষীর সতীত্ব অপহরণ করিয়া, নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন। এখন আমরা এই শ্রেণীর যোগকেই নীতি-বিরোধী বলিয়া স্বীকার করি। আবার বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত যোগকেই আর্য্যযোগ বলিয়া প্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প। সুতরাং আর্য্যানুকারী যোগানুরক্তেরা যে হঠাৎ ভ্রমে নিপতিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কোনটী আর্য্য কোনটী অনার্য্য যোগ, তাহা নির্দ্ধারণ করা উচিত বলিয়াই এই প্রস্তাবের অবতারণা হইল।

এখন আমার প্রথম আলোচ্য বিষয় এই যে, যোগ স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক। আমরা দেখিতে পাই যে, লোক স্বাভাবিক উপায় দ্বারা সভাব পদার্থে উপনীত হয়, অস্বাভাবিক উপায় দ্বারা অভাব পদার্থে উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন লোক অসৎচিন্তা করিয়া সৎপথে উপস্থিত হইতে পারে না,—তাহার অসৎচিন্তা তাহাকে অসৎপথে লইয়া যাইবেই যাইবে, এবং ঈশ্বর ও সত্য হইতে ভ্রষ্ট করিবে। এখানে দেখা যায় অসৎচিন্তা অভাব পদার্থ, সুতরাং সে অসৎ বিষয়ে উপস্থিত হইবে না কোথায় যাইবে? যোগ আধ্যাত্মিক। যোগ সম্বন্ধে যে যে উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, সে সে উপায় আধ্যাত্মিক হওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং অনাধ্যাত্মিক ও অস্বাভাবিক উপায় আর্য্য-যোগীর অনুসরণীয় নয়। ঈশ্বর নিরাকার। ইহা কি চিন্তার বিষয়, না মীমাংসার বিষয়? আমরা বলি, ঈশ্বর নিরাকার, এইটী জ্ঞানের মীমাংসা মাত্র। তুমি, ঈশ্বর নিরাকার, এই বিষয় চিন্তা করিতে পার কি না। ঈশ্বর নিরাকার, যদি অনবরত এই বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তোমার মনের আশ্রয় স্থান কোথায়? মন কোন বস্তু বা বিষয় ভিন্ন ভ্রমণ করিতে অক্ষম। মনকে কোন বস্তু বা বিষয় ছাড়িয়া দাও, সে অনন্তকাল সেই বস্তু বা বিষয়ে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইবে। শূন্য বা নিরাকার অবস্তু। সুতরাং শূন্যত্ব ও নিরাকারত্ব মনেরও বিষয় নহে। যাহা মনের বিষয় নহে, অথচ অবস্তু, তাহা লইয়া যোগী কি করিবেন?

যোগের মুখ্য উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রাপ্তি। ঈশ্বর সভাব। যোগ সম্বন্ধে যে যে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, প্রত্যেক উপায়ই স্বাভাবিক হওয়া কর্ত্তব্য। কি জড় রাজ্য, কি আধ্যাত্মিক রাজ্য, কি মনোরাজ্য, ইহার প্রত্যেকটীই এক একটী যোগাকর্ষণে

নিয়মিত হইতেছে। আবার সেই যোগাকর্ষণ স্বাভাবিক ও সহজ। আলোক ও চক্ষের যোগে দর্শনকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। মানব-হৃদয় মানব-হৃদয়কে দর্শন করিয়া বিশুদ্ধ প্রীতির পথে অগ্রসর হয়। আত্মার স্বাভাবিক গতি পরমাত্মার দিকে। চক্ষের দর্শন যেমন স্বাভাবিক, মানবাত্মার সহিত মানবাত্মার যোগ যেমন স্বাভাবিক, আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগও তেমনি স্বাভাবিক।

প্রায় প্রত্যেক বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে অপসারিণী ও আকর্ষণী শক্তির বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই আকর্ষণী শক্তির নামই যোগশক্তি। যেমন আলোক বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া চক্ষের নিকট উপস্থিত করে, আমার হৃদয় অপর হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়ের হৃদাবস্থ করিয়া তোলে, তেমনিই আত্মা পরমাত্মা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া চরমগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার প্রত্যেকটীর মধ্যেই যৌগিক বা আকর্ষণী শক্তি আছে। এই যৌগিক শক্তি বা আকর্ষণী শক্তি স্বাভাবিক ও সহজ। যাহারা জড়বিজ্ঞানবিৎ, তাহারা জড়শক্তিনির্ণয়ে পটু। যাহারা মনস্তত্ত্ববিৎ তাহারা মানবীয় গতি নির্ণয়ে সুদক্ষ। আর যাহারা আত্মতত্ত্ববিৎ, তাহারা যোগদর্শনে অভিজ্ঞ। ইহার প্রত্যেক শ্রেণীর দার্শনিকেরাই স্বকীয় দর্শনকে স্বাভাবিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তবে যে কেন আমরা যোগদর্শনকে স্বাভাবিক বলিব না, তাহার কোন যুক্তি দেখি না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যৌগিক বিশ্বাস কি? যোগ বলিতে গেলে এইরূপ প্রত্যয় হইবে যে, ব্যক্তিদ্বয় বা বস্তুদ্বয়ের মিলন। এই সম্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বলেন যে, "সংযোগো যোগ ইত্যুক্ত জীবাত্মপরমাত্মনঃ" জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগের নামই যোগ। যদি উভয় ব্যক্তির মিলনকেই যোগ বলা যায়, তাহা হইলে যোগ শব্দের বাস্তবিকতা থাকে। আর যাহাকে আমরা আর্য্য-যোগ বলি, তাহারও মুখ্য উদ্দেশ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক্ বস্তুত্ব রূপে বিশ্বাস না করিলে যোগী হওয়া যায় না। যোগের প্রথম মন্ত্র এই যে, আমি আছি এবং ঈশ্বর আছেন। এই আমি শরীর নহে, কিন্তু আত্মা; আর এই ঈশ্বর অজ্ঞেয়-কারণ বা অন্ধ শক্তি নহেন, কিন্তু এক অনন্ত পুরুষ ও মহান আত্মা। এখন কথা এই যে, অজ্ঞাত-কারণবাদীরা যোগী হইতে পারেন কি না। যোগ একনিষ্ঠ। প্রথমতঃ আমরা কোন একটী বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করি, অথবা সেই বস্তুর সেই সেই প্রকৃতিতে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস বা গবেষণার দ্বারা সেই বস্তু বা ব্যক্তির একত্বে ও ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস না করিলে বিষয় বা ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার মীমাংসা হইতে পারে না। অমীমাংসিত বিষয়ের অস্তিত্ব আর আকাশ কুসুমের অস্তিত্ব একই বস্তু। আকাশ কুসুম, এই কথা অনেকের মুখে শ্রবণ করা যায়; কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করি আকাশ কুসুম পদার্থটী কি, তাহার বর্ণ বা আকৃতি কি, এই পুষ্প কোথায় পাওয়া যায়? ইহার উত্তরে সকলেই বলিবেন, তাহা আমরা জানি না। এইরূপ অজ্ঞাত-কারণবাদী যোগীদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে, অজ্ঞাত কারণটা কি? "তাহার উত্তরে তাঁহারা বলিবেন, তাহা আমরা জানি না।" তবে বল ত অজ্ঞাত কারণবাদি, "জানি

না," এই শব্দের পশ্চাত অনুসরণ করিয়া কোথায় উপস্থিত হইবে? কোন্ পদার্থের সহিত তোমার আত্মার যোগ হইবে? "জানি না" যেমন কোন পদার্থ নহে, অজ্ঞাত কারণবাদীদিগের যোগও তদ্রূপ যোগ নহে।

আমি যদি স্বীকার করি যে, অজ্ঞাত কারণের সহিত আত্মার নাশ হইতে পারে না, কিন্তু তাহা বলিয়াই একমাত্র অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা স্বীকার করিব কেন? মানবাত্মা বা দেবপ্রতিমার সহিত কি আত্মার যোগ হইতে পারে না? আত্মা বা দেবপ্রতিমা লক্ষ্য করিয়া কি যোগী যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না?

আমাদের মন যখন সাকার পদার্থে আবদ্ধ থাকে, তখন আমরা মনকে ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে বৃহৎ হিমালয়ে আরোহণ করাইতে পারি। ক্ষুদ্র জলকণা হইতে বৃহৎ সমুদ্রে সন্তরণ করাইতে পারি, কিন্তু যখন আমাদের মন চেতন পদার্থের প্রতি ধাবিত হয়, তখন আমরা মনকে সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ পদার্থে বদ্ধ রাখিতে পারি না। আত্মা কি? আত্মার বিষয় যখন আমরা চিন্তা করি. তখন আত্মাকে আমরা একটী ক্ষুদ্র পদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারি না,—তখন আত্মাকে চেতন পদার্থ, জ্ঞান ও শক্তির আধার বলিয়া মনে করি। মানবীয় চেতন শক্তি যদিও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, মানবীয় শক্তি যদিও অপেক্ষাকৃত লঘু, মানবীয় জ্ঞান যদিও অপেক্ষাকৃত অসার, তথাপি চিন্তার সময়, সেই শক্তি, সেই জ্ঞান—ও সেই সত্তাকে আমরা সঙ্কীর্ণ প্রাচীর দ্বারায় আবেষ্টন করিয়া তাহার মধ্যেই বিচরণ করিতে পারি না। মানবাত্মার অস্তিত্ব বা জ্ঞান চিন্তা করিতে গেলে আমার মন একেবারে অনন্ত অস্তিত্বে ও অনন্ত জ্ঞানে যাইয়া উপস্থিত হয়। নিরাকার অস্তিত্ব ও নিরাকার জ্ঞানকে খণ্ড বা অংশ করিয়া চিন্তা করা যাইতে পারে না। এই সম্বন্ধে এই মাত্র মীমাংসা হইতে পারে যে, অনন্ত সত্তার অল্পতাই মানবীয় সত্তা। অনন্ত জ্ঞানের অল্পতাই মানবীয় জ্ঞান। এই সত্তাও জ্ঞানের অল্পতা ধ্যানগম্য নহে, কিন্তু জ্ঞানগম্য। সুতরাং যোগপরায়ণ মানবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। (ক্রমশঃ)

বিবধ প্রসঙ্গ ও সমালোচন।

রেণ্টবিল, জমিদার ও প্রজা।—যাঁহারা স্বচক্ষে পল্লিগ্রাম পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন—বর্ত্তমান সময়ে প্রজাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। বেহারের জমিদারগণ বা কলিকাতার বিলাসসুখে পরিশোষিত ও পরিপালিত ব্যক্তিগণ যাহাই বলুন, বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে প্রজাদিগের দুরবস্থা দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। উদরে তেমন অন্ন নাই, শরীরে বস্ত্র নাই,—অর্দ্ধাহারে,—অনাবৃত অবস্থায় শীত কালের শীত, গ্রীষ্মকালের গ্রীষ্ম, বর্ষাকালের জল ইহাদের শরীরের উপর দিয়া চলিয়া যায়—সমস্ত দিন কৃষক মাঠে পড়িয়া থাকে।—কিসের

জন্য? আর যাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, আমরা বলিব—সমাজ রক্ষার জন্য,—জমিদারের উদরপূর্ত্তির জন্য। সেই সমাজ, সেই জমিদার আজ পর্য্যন্ত তাহাদের দুঃখ বুঝিল না—তাঁহাদের কষ্ট দেখিল না; ইহা কি অল্প পরিতাপের বিষয়? দেশে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে—লোকের মন উন্নত হইয়াছে, ভাল কথা, কিন্তু দেশের শক্তি যাহারা, তাহাদিগের কি হইয়াছে? উন্নতির কথা দূরে থাকুক,—তাঁহাদের উদরের কি বিধি ব্যবস্থা,—কি উপায় হইয়াছে? যে দেশের উপরকার-শ্রেণী উন্নত হইয়া নিম্নশ্রেণীর অবনতদিগকে তুলিতে চেষ্টা করিল না, সে দেশের উন্নতিতে ধিক,—যে দেশের লোকেরা জ্ঞান লাভ করিয়া অশিক্ষিতদিগকে তাহা বিতরণ করিল না, সে দেশের জ্ঞানোপার্জ্জনে ধিক। হতভাগ্য বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে এইবার পরীক্ষা হইতেছে—উন্নত অবস্থার,—শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের। যতদূর পরীক্ষা হইয়াছে—তাহাতে বুঝিলাম, বঙ্গদেশের সকলি বৃথা হইয়াছে। ঐ যে শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত জমিদারশ্রেণী (?) মিলিয়া আজ দরিদ্র, মূর্খ প্রজাদিগের পরিণাম আরো অন্ধকারে ডুবাইতে চেষ্টা করিতেছেন,—মশক বধের জন্য, কামান প্রস্তুত করিতেছেন, তোমরা উহাদিগকে যে সম্মানের চক্ষে দেখিতে চাও, দেখ, আমরা উঁহাদিগের শিক্ষাকে, উন্নত অবস্থাকে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারি না। সে কালের জমিদারেরা প্রজাপীড়ন করিত তাহা আমরা সহ্য করিতে পারিতাম, কারণ সে কালের জমিদারেরা অশিক্ষিত ছিল। আজ সকলে না হইলেও, অনেক জমিদারই কিছু কিছু শিক্ষা পাইতেছেন। আজ শিক্ষার অভিমানে বক্ষস্ফীত করিয়া যে কার্য্যে ইহাঁরা ব্যস্ত ইহাকে কে প্রশংসা করিবে? স্বার্থের কথা বলিতে চাও?—যাহার মস্তকে তৈলের নাম গন্ধ নাই, তাহার মস্তকে তৈল না দিয়া তৈলসিক্ত মস্তকেই তৈল দিবার কথা বলিতে চাও? বল। যাঁহার ঘরে লক্ষ টাকা, তাহার স্বার্থের জন্য ঐ হতভাগ্যদিগের ভিঠামাটী উচ্ছন্ন করিয়া আরো টাকা সংগ্রহের কথা বলিতে চাও? বল। যে অসংখ্য মানব সন্তান পশুপক্ষীর ন্যায় আজ এখানে, কাল ওখানে আবাস অন্বেষণ করিয়া মাথা রাখিতেছে, তাহাদের স্বার্থ ভুলিয়া ঐ শোভিত অট্টালিকার অধিপতির স্বার্থের কথা বলিতে চাও? তাই বল। আমরা ঐ বিলের প্রতিবাদ শুনি,—আর অশ্রুপাত করি,—আর ঐ হতভাগ্যদিগের পরিণাম ভাবিতে ভাবিতে কালের মহা সমুদ্রের দিকে, নৈরাশ মনে, অগ্রসর হই।

দেশের শিক্ষিত জমিদার যখন দেশের অশিক্ষিত প্রজার মঙ্গলের কথা ভাবিতে পারিল না, শুনিতে পারিল না, কল্পনা করিতে পারিল না,—উন্নত পিতা মূর্খ সন্তানের মঙ্গল কামনা করিতে অক্ষম হইল,—উন্নত স্বদেশী ভ্রাতা মূর্খ ভ্রাতার হিত চিন্তা করিতে যখন অক্ষম হইল;—তখন অধিক শিক্ষিত বিদেশী রাজার উপর আর কত আশা করা যাইবে। যাঁহারা এক অন্নে প্রতিপালিত, এক প্রকার বায়ুতে পরিবর্দ্ধিত, তাঁহারাই যখন দরিদ্রদের দুঃখ বুঝিল না, তখন ঐ দূরদেশবাসী ইংরাজ ভারতের কাঙ্গালদিগের মর্ম্মবেদনা আর কি বুঝিবে? এই জন্যই ঐ বিলে খাসমহলের প্রজাদের কথার উল্লেখ নাই। ভাই সমদুঃখী "সাধারণী," তুমি দুঃখ করিতেছ কেন? প্রজার হইয়া

লিখিতেই বা চেষ্টা করিতেছ কেন? স্বদেশী শিক্ষিত জমিদারগণও স্বার্থ ছাড়িবেন না.—বিদেশী শিক্ষিত ইংরাজগণও স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই উভয় শ্রেণীই যখন এক প্রকার স্বার্থান্বেষী, তখন নিশ্চয় উভয় শ্রেণীর মধ্যে ঘনিষ্টতাও মিলন হইবে। হইবে কেন?—মিলন হইয়াছে। বড়-লাটের বড়সভায় জমিদারপ্রতিনিধিকে দেখিয়াও যাহারা ছোট জমিদার ও বড় জমিদারের মিলনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না. তাহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ।

এই বিলের পরিণাম কি হইবে, জানি না, কিন্তু যাহাই হউক, এদেশের প্রজার দুর্দ্দশা শীঘ্র ঘুচিবে. সে আশা নাই। কাঁদিতে হয়, কাঁদ, লিখিতে হয়, লিখ; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, অসহায় দরিদ্রদিগের মঙ্গলের আশা নাই। আমাদের দেশে যে ক্ষমতা পায়, সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে—জমিদার করে, রাজা করে। শিক্ষা পাইয়াও দেশের জমিদারশ্রেণী যখন প্রজাদের মঙ্গলের দিকে চাহিতে পারিতেছেন না, তখন আইনাধিকার পাইলেই যে প্রজারা তাহা রক্ষা করিতে পারিবে, কখনও আশা করা যায় না; কারণ ঐ স্বার্থপর জমিদারশ্রেণী যৎসামান্য ক্ষমতা পাইলেই উহাদের রক্তমাংস শোষণ করিতে পারিবে। অধিকার পাইয়াও যে তাহা রক্ষা করিতে না পারে, তাহার পক্ষে উহা পাওয়া না পাওয়া সমান। ঐ স্বার্থপর জমিদারশ্রেণী থাকিতে কখনও প্রজারা স্বার্থাধিকার রক্ষা করিতে পারিবে, আশা করা যায় না;—কারণ চিরকাল অধার্ম্মিক বুদ্ধিজীবী, মূর্খকে চালায়—শিক্ষিত,অশিক্ষিতের উপর আধিপত্য বিস্তার করে;—কেবল স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। তবে যদি ধর্ম্মজ্ঞান থাকিত-ঐ শিক্ষায় ধর্ম্ম জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে আর এ প্রকার অবস্থা হইত না। শিক্ষা হইতেছে. কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান চলিয়া যাইতেছে,—উন্নতি হইতেছে কিন্তু স্বার্থচিন্তা সকল উদারতার স্থান অধিকার করিতেছে; এদেশের কৃষকের দিন কবে ফিরিবে. ভবিষ্যৎ বলিতে পারে।

আর একদিক দেখ—ঐ বিল পাশ হইলেও সকল প্রজার মঙ্গল হইবে না—খাসমহলের প্রজাদের যে কষ্ট—সেই কষ্টই থাকিবে। আমরা যতদূর জানি, খাসমহলের প্রজাদের উপর যেপ্রকার অত্যাচার হয়. অতি অল্প জমিদারের অধীনস্থ প্রজাদের উপর সে প্রকার হইয়া থাকে। শিক্ষিত গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের মঙ্গলের জন্য বিল করিলেন. কিন্তু আপন স্বার্থ ভুলিতে পারিলেন না—আপন অধীনস্থ প্রজাদের মঙ্গলের দিকে চাহিলেন না। জমিদারগণ যে এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া নীরবে থাকিবেন, কখনই আশা করা যায় নাই। গবর্ণমেণ্ট বলেন, প্রজাদের মঙ্গলের জন্য আইন করিতেছেন—কার্য্যের সময় খাস-মহলের প্রজাদের বাদ দিতেছেন। জমিদার দলের নেতা বড়লাটের সভায় বলেন, তিনি প্রজা ও জমিদার উভয়ের মঙ্গলের দিক চাহিয়াই কথা বলিবেন. কার্য্যের সময়; প্রজাদের যেখানে একটু স্থবিধা মনে করেন, তাহারই বিরুদ্ধে বলেন। এই দুই দলের ব্যবহার একই প্রণালীর, একই ধাতুর। এই জন্য আমরা বলি, কেবল শিক্ষায় রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয় না; কারণ যেখানে স্থধু শিক্ষা, সেখানে স্বার্থের ভয়ানক আধিপত্য—সেখানে কেবল সংসার-জ্ঞান। আর যেখানে শিক্ষায় ধর্ম্ম, সেখানেই স্বার্থনাশ—সংসারের অতীত চিন্তা। পরলোকের চিন্তাভিন্ন মনুষ্যকে স্বার্থশূন্য করিতে পারে না। জমিদারশ্রেণীই শিক্ষিত

হউন, আর গবর্ণমেণ্টই শিক্ষিত হউন, যতদিন ধর্ম্মজ্ঞানে ইহারা পরিচালিত না হইবেন, ততদিন ঐ রাজনীতি কেবল স্বার্থনীতিতে পর্য্যবসিত হইবে—ঐ পরার্থ কেবল নিজার্থে শেষ হইবে। যতদিন দেশের অণুতে অণুতে ধর্ম্মের বায়ু প্রবাহিত না হইবে, ততদিন ঐ কোটি কোটি দুঃখী প্রজাদের আর মঙ্গলের আশা আমরা দেখি না। ইতিহাস এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছে, ইতিহাস এই কথার সাক্ষ্য দিবে।

রেণ্টবিলের আন্দোলন।—পৃথিবীর ইতিহাস একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়াছে—চিরদিন কাহারও একভাবে যায় না—দুঃখ চিরদিন মানবকে মলিন রাখিতে পারে না। ভারতের কৃষকশ্রেণীর দিন কি ফিরিবে না?—কবে ফিরিবে, জানি না,—কিন্তু ইতিহাস বলে—নিশ্চয় ফিরিবে, প্রজার দাসত্ব চিরকাল সমভাবে থাকিবে না। কিন্তু আজ হইতে যদি তাহার আয়োজন আরম্ভ না হয়, তবে কতকালে ফিরিবে, তাহা কল্পনাও করা যায় না? দুঃখী প্রজাদের উন্নতির জন্য শিক্ষিতশ্রেণী দায়ী—জমিদারশ্রেণী দায়ী; কিন্তু ভারতের শিক্ষিত শ্রেণী, জমিদার শ্রেণী, প্রজাদের উন্নতির কল্পনা করিতেও ভীত হন—বিভীষিকা দেখেন। ষ্টেটস্‌ম্যান বলিতেছেন, সম্ভবতঃ রিপন বাহাদুর চারি বৎসরের অধিক কাল ভারতে থাকিবেন না; বিলাতে তাঁহার উত্তরাধিকারী পর্য্যন্ত ধার্য্য হইতেছে,—এই কথা শুনিয়া জমিদারশ্রেণী ভয়ানক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন—সহরে সহরে সভা করিতেছেন; তাঁহাদের বিশ্বাস, কোন প্রকারে যদি আর এক বৎসর বিলখানিকে অবিবেচিত অবস্থায় রাখিতে পারেন, তবেই আশা পূর্ণ হয়। লর্ড রিপন চলিয়া যাইতে যাইতেই লিবারেল রাজত্ব প্রায় শেষ হইয়া আসিবে; রিপনের উত্তরাধিকারী ভারতে আসিয়াই হঠাৎ কোন কার্য্যে হাত দিবেন, সে আশা অল্প। পরে দেখিতে দেখিতেই তাঁহার রাজত্বকাল শেষ হইয়া যাইবে। খাসমহল সম্বন্ধে নির্ব্বাক থাকিলেও, ঐ বিলে প্রজাদের অনেক প্রকার মঙ্গলের কথা আছে। রিপন ও তাঁহার সদস্যবর্গের অনেকেই প্রজাদের পক্ষে আছেন। কিন্তু রিপন চলিয়া গেলে—আর কে বিলের পক্ষে থাকিবে? শিক্ষিতশ্রেণী, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ বিষয়ে এক প্রকার উদাসীন, তাহাদের নিজেদের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত;—দুঃখীদের জন্য কে ভাবিতে বসিবে? বিবি নাইটিন্‌গেল বিলাতে বসিয়া ভারতের মূর্খ প্রজাদের বুলি ফুটাইবার জন্য বক্তৃতা করিতেছেন, তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, আর আমরা ভারতে বসিয়া আহ্লাদে, আমোদে স্বীয় স্বীয় স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি। যাহাদের জন্য বিল হইতেছে, তাহারা কিছুই জানে না—কিছুই বুঝে না;—পূর্ব্বে যেমন ছিল, আজও তেমনি রহিয়াছে। যিনি যাহাই বলুন, কৃষকদিগের আর মা বাপ নাই। যদি থাকিত, তবে এই সময়েই আন্দোলন উঠিত। যে সময় চলিয়া যাইতেছে, এ সময় আর ফিরিবে না—লর্ড রিপন চলিয়া গেলে বিল পাশ হওয়া দুরূহ হইবে। আমরা ভারতসভাকে বার বার অনুরোধ করি, তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া দুঃখী প্রজাদের সহায় হউন।

খোলাভাটী।—প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালার

খোলাভাটীতে যত অনিষ্ট হইতেছে, এত আর কিছুতেই হয় নাই। ইহাতে বাঙ্গলার পল্লির সুখ শান্তি একবারে বিনষ্ট করিতেছে। প্রলোভনের বস্তু সম্মুখে থাকিলে পৃথিবীর অধিকাংশ মানবেরই যে পতনের সম্ভাবনা, এ কথা আর বুঝাইয়া বলিতে হয় না। নয় দশ বৎসরের শিশু হইতে অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ, নিজের আয়ত্তে, স্বেচ্ছায় আজ অক্লেশে ঐ হলাহল পান করিয়া মজিতেছে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবার ও সমাজকে মজাইতেছে। দশ বৎসরের শিশু পয়সা লইয়া বাজারে যাইতেছিল, পথে ঐ প্রলভনের হস্তে সমস্ত সমর্পণ করিয়া মত্ত হইয়া গৃহে ফিরিল,—জননী হাহাকার করিতে লাগিলেন। এ প্রকার হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের আজ কাল আর অপ্রতুল নাই। আজ নিরন্ন কৃষকশ্রেণী পর্য্যন্ত সমস্ত পরিবারকে অনাহারে রাখিয়া দিবসের উপার্জ্জন ঐ প্রলোভনের সহিত বিনিময় করিতেছে। এই সকল দেখিয়া আমাদের সুযোগ্য ছোটলাট বলেন, যখন প্রজারা সুরা পান করে, তখন তাহাদের অবস্থা ভাল!! একদিকে বড়লোকের মুখে এপ্রকার কথা ফুটিতেছে, অন্যদিকে দিন২ গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে—দরিদ্রতার হাহাকার—দুর্নীতির কষাঘাত—পশুচরিত্রের ভীষণ অভিনয় গ্রামকে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। গ্রামের অবস্থা দেখিলে বোধ হয় না যে, কোথায়ও ধর্ম্মের আধিপত্য আছে। ঐ ভাটপাড়ার কথাই বল,—আর ঐ বারাণসীর কথাই বল, ধর্ম্মের দৃঢ় বন্ধনী হৃদয় হইতে ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আজ ঐ বন্ধনী লৌকিক ব্যবহারে পরিণত হইয়াছে—কেবল বাহিরের আচ্ছাদন হইয়াছে। ইহা নিশ্চয় কথা—সুরেন্দ্র নাথ কারাগারে নিক্ষিপ্ত না হইলে, শালগ্রামশিলা লইয়া কখনও এত আন্দোলন হইত না। ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল গ্রামের শোচনীয় অবস্থা। খোলাভাটীর জন্য গবর্ণমেণ্টকে গালাগালি না দিয়াছে, শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এমন লোক অতি অল্প; কিন্তু সেই শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্যে কয়জন লোক খোলাভাটীর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়াছে—অধিবাসীদিগকে সতর্ক করিয়াছে? মুক্তিফৌজ ধর্ম্মতলার মদের দোকান তুলিয়া দিতে পারে, কারণ তাহারা ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত, কিন্তু আমাদের দেশের কয়জন লোক কয়টী মদের দোকান তুলিয়া দিয়াছে? গবর্ণমেণ্ট যদি স্বার্থের পথ পরিত্যাগ না করেন, তবে কি আর আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আমরা চেষ্টা করিব না? প্রলোভন জগতে চিরকাল থাকিবে—মানবের যদি শক্তি থাকে, চিরকাল সেই প্রলোভনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। সেই শক্তি সঞ্চারে চেষ্টা নাই—কেবল আছে অন্যকে তিরস্কার করা। সে প্রকার সমবেত শক্তি যদি দেশে থাকিত, কোন পল্লিতে খোলাভাটী স্থাপিত হইতে পারিত না; গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক কোন স্থানে খোলাভাটী স্থাপন করিবার আদেশ দিতে পারিতেন না—দিতেন না। আর যে স্থানে খোলভাটী স্থাপিত ছিল, তাহাও তুলিয়া দেওয়া সহজ হইত। দুঃখের বিষয়, এ দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। দেশের সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ সভাগুলিও যদি একত্রিত হইয়া ক্রমে ক্রমে খোলাভাটীর অনিষ্টকারিতা প্রচার করিতেন, তাহা হইলেও কতক মঙ্গলের আশা ছিল। কিন্তু অনেকেই এ বিষয়ে উদাসীন; অনেকেই বলেন গবর্ণমেণ্ট

উপায় না করিলে আর আশা ভরসা নাই। যতদিন বাঙ্গলার এই অবস্থা থাকিবে; কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন?

হাইকোর্টের অধিকার।—প্রিবিকৌন্সিলে সুরেন্দ্র বাবুর আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হইলাম। সুরেন্দ্র বাবু মুক্তিলাভ করিয়াছেন, ভারতের আজ আহ্লাদের সীমা নাই, কিন্তু এই শুভ সময়ে আমরা কাঁদিতে বসিলাম। বাস্তবিকই আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি,দেখিতেছি—ঐ মুক্তিতে আমাদের আহ্লাদের কিছুই নাই; আহ্লাদের যদি কিছু থাকে,তবে তাহা হাইকোর্টের জজদিগের আছে; তাঁহাদিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রহিল—অধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা হইল না,—এখানে হইল না,—বিলাতে হইল না। দুই মাস বন্ধুহারা হইয়াছিলাম, আজ বন্ধুকে কার্য্যক্ষেত্রে পাইয়াছি বটে, কিন্তু ঐ অধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের আর সুখের আশা নাই, কারণ যখন তখন আবার আমাদের এই বিপদ ঘটিবার পথ উন্মুক্ত রহিল। আর কেহ কিছু করুক বা না করুক, সম্পাদকদিগের আর নীরব থাকা উচিত নহে। সমস্বরে একবার ক্রন্দনের রোল তুলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সকলে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, অবশ্য সুফল ফলিবে।

জাতীয় ধন ভাণ্ডার।—উপযুক্ত সময়ে ভারত-সভা জাতীয় ধন ভাণ্ডার সংস্থাপনের সূত্রপাত করিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই অধঃপতিত দেশকে তুলিতে হইলে এপ্রকার অনেক আয়োজন করিতে হইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটী কথা বলিবার আছে, আশা করি ভারতসভা কথা কয়েকটীকে ভাল ভাবে গ্রহণ করিবেন। জাতীয়-ধন-ভাণ্ডারকে দেশের অভাবোপযোগী করিতে হইলে, কয়েকজন বিশ্বাসী ট্রষ্টি নিযুক্ত করা উচিত,—বম্বে, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও বাঙ্গলা, ভারতের প্রধান প্রধান সকল নগর হইতে, সকল প্রকার সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই সভ্য গ্রহণ করা উচিত; কেবল বাঙ্গলাকে সমস্ত ভারত বিশ্বাস নাও করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই ভাণ্ডারের অর্থ কি প্রকার আন্দোলন-কার্য্যে ব্যয়িত হইবে, তাহাও প্রকাশ করা উচিত। যদিও ইহা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য, কিন্তু তবু ইহা করিতেই হইবে; নচেৎ ভবিষ্যতে অনেকে অনেক কথা বলিবে। সাধারণের অর্থ ব্যয়ের ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত—কাহারও যেন কোন কথা বলিবার না থাকে। এদেশের লোক সাধারণ হিতকর কার্য্যে আজও মুক্ত হস্তে টাকা প্রদান করিতে শিক্ষা করে নাই, এই সময়ে একটু বিশেষ সতর্ক না হইলে ভবিষ্যতের অনিষ্ট অনিবার্য্য। আর একটী কথা এই—নিঃস্বার্থ ভাবে মানুষ দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে,ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সভা অগ্রসর হউন;—স্বার্থের মহাসমুদ্রে যে দেশ ডুবিয়া রহিয়াছে, সেই দেশে নিঃস্বার্থ ভাবের উদাহরণ না দেখাইতে পারিলে, দেশের কিছুই হইবে না।

স্থানাভাব প্রযুক্ত এবার পুস্তকাদির সমালোচনা প্রকাশিত হইল না, আগামী বারে হইবে।

স্বাধীনতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
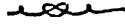
প্রথম অধ্যায়ে স্বাধীনতার যে লক্ষণ রচনা করা গিয়াছে, তাহাতে স্বাধীনতার সামাজিক ভাবই প্রকাশ করা হইয়াছে; কিন্তু যে ভাব বা যে তেজ অন্তরে থাকাতে মানবের স্বাধীনতা প্রবৃত্তি নানা প্রকারে প্রকাশ পায়, সেই আন্তরিক ভাবকে এখনও প্রকাশ করা হয় নাই। তাহা নির্ণয় করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

জগদীশ্বর দেহ মনে যে সকল শক্তি দিয়াছেন, তাহাদের চালনার পথ অবরুদ্ধ না হইলেই যে মানব স্বাধীনতার সুখ উপভোগ করে তাহা নহে। স্বেচ্ছাচারিতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। এখনও মধ্য-আসিয়াতে ও আরবের মরু প্রান্তে কত জাতি বসতি করিতেছে, যাহারা, কি সভ্যতার নিয়ম, কি দয়ার নিয়ম, কি ভদ্রতার নিয়ম, ইহার কোন নিয়মাধীন নহে। তাহারা যেন আজিও সেই আদিম বর্ব্বর অবস্থায় বাস করিতেছে। তাহাদের কোন প্রকার স্থির আবাস নাই, নিয়মানুগত স্থস্থির সমাজ নাই, কোন প্রকার সামাজিক বা রাজনৈতিক শাসন-প্রণালী নাই; ইহারা ইহাদের মরুভূমির বায়ুতাড়িত বালুকা পটলের ন্যায়, নিরন্তর যাবাবর অবস্থাতে পশুপালন ও লুণ্ঠন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে নড়িয়া বেড়াইতেছে। ঐ সকল ভূভাগের উপর দিয়া কত সমর-তরঙ্গ, কত পরিবর্ত্তন-স্রোত, কত ধর্ম্মপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেই সকল তরঙ্গের আঘাতে পূর্ব্ব পশ্চিমের দেশ সকল আন্দোলিত হইয়াছে, কত জাতি, কত রাজবংশ অভ্যুত্থিত ও পতিত হইয়াছে, কত নূতন নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু সে সকল তরঙ্গ যেন এই সকল জাতিকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। তাহারা চিরদিন স্বাধীন, অথচ চিরদিন বর্ব্বর। অরণ্যচর বিহঙ্গমের ন্যায় ইহাদের মারব স্বাধীনতার কেশ মাত্র হরণ করিলে ইহারা কখনও সহ্য করে না। ইহারা কখনও কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করে না, কাহারও রাজ্যে ছচাল বাঁধিয়া বাস করে না, কাহাকেও কর দিতে স্বীকৃত হয় না, কাহারও বন্ধন বা পীড়নের ভয় রাখে না। সততই জনসমাগম হইতে দূরে দূরে নিরুপদ্রব স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। ইহাদের দেহ মনে যে কিছু শক্তি আছে, তাহার পথ তো কেহ অবরোধ করিতেছে না, তবে কি ইহাদের অবস্থা স্বাধীনতার আদর্শ?

মনে মনে আপনাকে এই প্রশ্ন করিলেই প্রকৃত স্বাধীনতা ও বাহিরের সামাজিক স্বাধীনতার প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। সমাজিক স্বাধীনতা তখনই অক্ষুণ্ণ থাকে,

যখন জনসমাজ মানবের সেই দেহ মনের শক্তি সকলের পথ অবরোধ না করিয়া বরং তাহাদের বিকাশের অনুকূল হয়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জগদীশ্বর যে আমাদিগকে শরীর মনের শক্তি দিয়াছেন, তাহা এই জন্য যে, তাহাতে তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, সুতরাং মানব যখন নিজ শক্তি সকলকে তাঁহার অভীষ্ট কার্য্যে নিয়োগ না করিয়া পশুপ্রায় ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থতায় তাহার নিয়োগ করে, তখন সে স্বাধীনতা স্বৈরাচারিতাতে পরিণত হয়। প্রকৃত স্বাধীনতাকে স্বর্গীয় পবিত্র অগ্নি বলিয়া বর্ণন করা যাইতে পারে, তাহা মানবকে মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রদান করে, তাহা জনসমাজকে উন্নত ও পরিশুদ্ধ করে, রাজনীতিকে উন্নত ও ধর্ম্মানুগত করে, এবং মানব জীবনের সকল বিভাগকে নবভাবে এবং নব তেজে অনুপ্রাণিত করে। অতএব স্বাধীনতার সেই ভাব কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করিব।

ঈশ্বর আমাদিগকে দেহ মনের শক্তি দিয়াছেন এবং জনসমাজও তাহার পথে অন্তরায় নয়, কিন্তু সেই সকল শক্তিকে ঈশ্বরের অভীষ্ট কার্য্যে নিয়োগ করায় কে? জগতে আমরা দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস যে, এই ব্রহ্মাণ্ড অন্ধশক্তির দ্বারা পরিচালিত, উদ্দেশ্যবিহীন কার্য্য নহে। পরন্তু ইহার প্রত্যেক ব্যাপার, প্রত্যেক ঘটনা গূঢ় ধর্ম্ম-নিয়মের দ্বারা শাসিত। যেন ইহার প্রকৃতি ও গঠনের মধ্যেই এমন কিছু আছে যদ্দারা নিরন্তর সত্য, ন্যায়, প্রেম ও পবিত্রতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার প্রত্যেক পরমাণু যেন সত্য ও ন্যায়ের অধীন থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের এই অনির্ব্বচনীয় গূঢ় শক্তির গতি সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার দিকে। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্হিত এই অব্যক্ত শক্তিকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন করিয়া তদুপরি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং এই শক্তির অনুগত হওয়াকে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য জানিয়া আপনাদের প্রবৃত্তি সকলকে তদনুসারে শাসন করিতেছেন। ইঁহাদের দৃষ্টি নিরন্তর সত্যের উপরে—ন্যায়ের উপরে পতিত। সত্যের প্রতি ও ধর্ম্মের প্রতি যে গাঢ় অনুরাগ তাহার গুণেই ইঁহারা সংসারের ভয়াবহ স্থান সকলকে অতিক্রম করিয়া থাকেন, এবং অতি গুরুতর প্রলোভন সকল উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ধর্ম্মপথে থাকিবার বাসনা ইঁহাদের মনে এত প্রবল যে, ইঁহারা ধন, মান, পদগৌরব প্রভৃতি দ্বারা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হইতে দেন না। এ সমুদায়কে নিকৃষ্ট বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি আছে, সুতরাং ইঁহারা সংসারের ধনী, মানী, বা পদস্থ লোকদিগের ভয়ে ভীত নহেন। ইঁহারা দীন দরিদ্র হইয়াও রাজাদিগের অপেক্ষা প্রবল। সমুদায় রাজশক্তি সম্মিলিত হইলেও ইঁহাদের প্রাণকে বিকম্পিত করিতে পারে না—কিম্বা ইঁহাদের হৃদয়স্থিত অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিতে পারে না।

অপর শ্রেণীর ভাব ইহার বিপরীত। এই ব্রহ্মাণ্ড যে গূঢ় ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা শাসিত, কোন মঙ্গল উদ্দেশ্যের দিকে যে ইহার গতি এবং সত্য ও ন্যায়ই যে সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত ইঁহাদের সে বিশ্বাস নাই। ইঁহারা মনে করেন, এ জগতে অসত্য এবং অন্যায়েরও জয় হইতে পারে, অসাধুতার দ্বারা সুখী হওয়া যাইতে পারে, এবং নীচতার দ্বারা উন্নতি লাভ করা

যাইতে পারে। সুতরাং ইহাঁরা আপনাদিগকে ধর্ম্ম-নিয়মের অধীন করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন ; প্রবৃত্তির বাতাসে পাল দিয়া ইহাঁরা ভবসাগরে পাড়ী দিয়াছেন। যখন যে প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তখনই তাহার চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি ইহাঁদের আসক্তি এবংইন্দ্রিয়সুখই ইহাঁদের অনেকের পক্ষে পরম সুখ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

প্রথম শ্রেণীর লোক স্বাধীন। তাঁহারা অন্তরে স্বাধীন—ধর্ম্ম-নিয়মের অধীন হইয়াই স্বাধীন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একজন মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন "সত্যকে প্রীতি কর, সত্যই তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।" এই অমূল্য উপদেশের অতি গভীর অর্থ। যে মুহূর্ত্তে মানুষ সত্যকে হৃদয়ের অকপট প্রীতি দিতে আরম্ভ করে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার আত্মার স্বাধীনতার আরম্ভ হয়। সত্যের উপর, ন্যায়ের উপর ও ধর্ম্মের উপর যাহার অন্তরের প্রেম স্থাপিত হইয়াছে, তাহার আত্মা সকলপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। মানুষ যখন সত্যের উপর, নিজ কর্ত্তব্যের উপর দণ্ডায়মান হয়, তখন সে স্বার্থ চিন্তার এবং সুখাসক্তির উপরে উঠিয়া যায়। এ সকলে আর তাহার চিত্তকে আবদ্ধ করিতে পারে না। সেইরূপ লোকভয়ও আর তাহার চিত্তকে ত্রস্ত করিতে পারে না। কারণ তাঁহার যে সাহস, তাহা কোন প্রকার পার্থিব বলের সাহস নহে, কিন্তু অপার্থিব সত্যের সাহস। এই বিশ্বাসাগ্নি ও প্রেমাগ্নি একবার যাঁহার হৃদয়ে লাগিয়াছে, তিনি সাংসারিক অবস্থাতে অতি দরিদ্র হইলেও অকুতোভয়। এরূপ কথিত আছে, মহাত্মা লুথরের আত্মীয় স্বজনগণ যখন তাঁহাকে নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সমবেত সম্রাট ও পোপের প্রতিনিধিগণের সমক্ষে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন "এই সহরের সমুদায় ছাতে যত টালি ইট আছে, আমার শত্রু সংখ্যা যদি তাহার অধিকও হয় তথাপি উক্ত সভায় গিয়া সত্যপক্ষ সমর্থন করিব।" একজন সামান্য দরিদ্র ধর্ম্ম-যাজকের এত সাহস কোথা হইতে আসিল? ইহার কারণ এই, তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি যে পক্ষে, সত্য সেই পক্ষে এবং ঈশ্বর সেই পক্ষে।

এই রূপে সত্যের উপর এবং ধর্ম্ম-নিয়মের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যাঁহারা আপনাদের প্রবৃত্তি সকলকে শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই ধীর, তাঁহারাই স্বাধীন। সেই কর্ত্তৃত্ব শক্তি এবং প্রভুত্বশক্তি হইতেই স্বাধীনতার ভাবের জন্ম। এরূপ ব্যক্তি যদি হীনাবস্থ লোকও হন, তথাপি তাঁহার চরণে আমাদের মস্তক শ্রদ্ধাভরে স্বতঃই অবনত হইয়া থাকে। তিনি যখন জন-সমাজ মধ্যে অগ্রসর হন, তখন আমরা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়া মস্তক অবনত করি। আমি যাহা অপেক্ষা আপনাকে হীন মনে করি, সেই আমার প্রভু এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তিই নরকুলে রাজা। কেহ যেন এরূপ ভ্রমে পতিত না হন যে, এরূপ বীর-প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষণজন্মা, কিম্বা ধনী বা সম্ভ্রান্তদিগের মধ্যেই মিলে। বরং আমরা ধন ও পদসম্ভ্রমকে অনেক অংশে এই মহত্ত্ব লাভের প্রতিকূল মনে করি। এই সুস্নিগ্ধ ও পুষ্কল তরু দারিদ্র্য ও হীনাবস্থার ছায়ার মধ্যে অনেক সময় সুন্দররূপে

বাড়িয়া থাকে। জন-সমাজে মধ্যবিত্ত ও হীনাবস্থ এরূপ শত সহস্র লোক আছেন, যাঁহারা সহস্র প্রকার প্রলোভনের দিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া অকুণ্ঠিতভাবে ও সাহসের সহিত স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদা নিযুক্ত। তাঁহাদের আয় অল্প কিন্তু সাধু ইচ্ছা অতি মহৎ; তাঁহাদের সংসারের অসচ্ছলতা অধিক কিন্তু অন্যায়-প্রাপ্ত অর্থের প্রতি ঘৃণা অত্যন্ত প্রবল। তাঁহারা দুর্ব্বল কিন্তু প্রবল অত্যাচারকারীর দ্বারস্থ হইবার বাসনা বিন্দুমাত্র নাই; তাঁহারা সহায় সম্বল-বিহীন কিন্তু সত্যানুষ্ঠানে সাহস অতি বিপুল; তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব নাই কিন্তু নিজ কর্ত্তব্যের প্রতি আস্থা অতি দৃঢ়। মানবদেহের মধ্যে মেরুদণ্ড যেরূপ, জন-সমাজ মধ্যে এই সকল লোক সেইরূপ। ইঁহারাই জন-সমাজকে দণ্ডায়মান রাখেন। সৌভাগ্যক্রমে যে সমাজ মধ্যে এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অধিক, সে সমাজ, সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিবেই করিবে। ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই এক্ষণে সকল বিষয়ে নেতা। সাহিত্য সমাজে তাঁহারাই চিন্তা ও ভাবের পথ প্রদর্শক, শিল্প-বাণিজ্যে তাঁহারাই অগ্রসর ও কৃতী, রাজনীতি সংশোধনে তাঁহারাই উৎসাহী ও দক্ষ। বিদ্যা, বুদ্ধি, দক্ষতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণে তাঁহারাই অগ্রগণ্য। কিন্তু ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই উন্নতির ও প্রভাবের মূল কোথায়? তাঁহাদের মধ্যে সত্যানুরাগী, স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী পুরুষের সংখ্যা অধিক, এই জন্যই তাঁহাদের এত শক্তি।

যতই চিন্তা করা যাইবে ততই দেখিতে পাইব যে, আধ্যাত্মিক মুক্তভাব হইতেই প্রকৃত স্বাধীনতার জন্ম। মানবাত্মা যত দিন বদ্ধ ও জড়-ভাবাপন্ন, ততদিন বাহিরের অবস্থা সহস্র অনুকূল হইলেও কেহ মানবকে স্বাধীন রাখিতে পারে না। আমরা মানবাত্মাকে যতদিন একটী মহৎ বস্তু বলিয়া মনে না করি, ততদিন ইহার অধিকার সকলকেও মহৎ বলিয়া মনে হয় না এবং স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারি না। জন-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবং মানবের ইতিহাসের বিষয় আলোচনা করিলেই আমরা একটী বিষয় দেখিয়া বিস্মিত হই। সেটী এই—দেখিতে পাই, যে জাতি বহুদিন দাসত্ব শৃঙ্খল গলে ধারণ করিতেছে, তাহাদের চরিত্র অতি হীন হয়, সামাজিক রীতি নীতি অতি কুৎসিত হইয়া যায়, বিবিধপ্রকার পাপাচরণ তাহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। আবার যে জাতি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও নীচ সুখাসক্ত হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে অচিরকাল মধ্যে দাসত্বের শৃঙ্খল গলে ধারণ করিতে হয়। এই উভয়ের একই কারণ। পরাধীনতাতে মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞানকে অগ্রে লুপ্ত করে, তৎপরে সেই জাতি বিবিধ প্রকার দুর্নীতি-জালে জড়িত হইয়া পড়ে। আবার অপরদিকে পাপাচার মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞানকে ম্লান করে, সুতরাং সে জাতির দাসত্ব নিগড় ধারণ করিবার উপযুক্ত হয়।

সকল প্রকার আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মূলে মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান। কিন্তু মানবাত্মা যে মহৎ, এ জ্ঞান আমাদিগের কখন হয়? সেই মহত্ত্বের পরিচয় আমরা অগ্রে নিজ অন্তরে পাই, পরে অপরের মধ্যে দেখি। নিজ অন্তরে আত্মার মহত্ত্ব তখনি বুঝিতে পারি, যখন নিজের কর্তৃত্ব-শক্তির পরিচয়

পাই; অর্থাৎ যখন নিজের প্রবৃত্তিগণকে শাসনাধীন করিয়া তদুপরি সত্যের ও ন্যায়ের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যখন অনুভব করি যে আমি মুক্তজীব। সুতরাং ধর্ম্মনিয়মের মহিমা যে জানে না, সে আত্মার মহিমা জানে না; যে আত্মার মহিমা জানে না, সে স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত নয়।

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, যে পরিমাণে মানবাত্মার মহত্ত্বের জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে, যে পরিমাণে মানব-বিবেকের সমাদর বর্দ্ধিত হইয়াছে, যে পরিমাণে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সেই পরিমাণে সামাজিক, রাজনৈতিক সকল প্রকার স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইউরোপের বর্ত্তমান স্বাধীনতার ভাব ইহার প্রমাণ স্থল। লুথার যে দিন মানব-বিবেকের মহিমা ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই দিন প্রথম চার্লসের মৃত্যু, দ্বিতীয় জেমসের পদচ্যুতি, ও ফরাসি বিদ্রোহাগ্নির সূচনা হইয়াছিল। অর্থাৎ লুথার ধর্ম্মসম্বন্ধে মানব বিবেকের যে মহত্ত্ব ঘোষণা করিলেন, সেই ভাব ইউরোপের চিন্তার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকল বিভাগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। ক্রমে অত্যাচারী রাজাদিগের সিংহাসন কম্পিত হইতে লাগিল, সকল প্রকার সামাজিক দাসত্বের মূলে কুঠার পড়িতে লাগিল, নরনারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করা হইল। সেই সংগ্রাম অদ্যাপি চলিতেছে— লুথার যে ভাবস্রোতকে প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে নিজ কার্য্য সাধন করে নাই। এক্ষণ যে চতুর্দ্দিকে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার মধ্যেও মানব বিবেকের মহত্ত্বের ভাব দেখিতে পাইব।

ক্রমশঃ

পাশ্চাত্য মায়াবাদ বা অভূতবাদ।

৩। ইন্দ্রিয় বিষয়।

আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যক প্রস্তাব কোথায় শেষ হইয়াছিল, তাহা পাঠকের স্মরণ আছে কি? আমাদের দৃষ্টির বিষয় বস্তুতঃ আমাদের চক্ষু-সংশ্লিষ্ট, দূরস্থ বস্তু দর্শন আমাদের পক্ষে অসম্ভব, ইহা এখন প্রায় সর্ব্বসম্মত; এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তৎপর প্রস্তাবের শেষভাগে আমরা এই বিষয়ে একটি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম; পাঠক সেই যুক্তিটী স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাব পড়িবেন। এই প্রস্তাব পূর্ব্ব প্রস্তাবেরই শেষাংশ মাত্র।

আমাদের দৃষ্টির বিষয় যে আমাদের ইন্দ্রিয়-সংশ্লিষ্ট, দূরস্থিত পদার্থ দর্শন যে আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এই সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রকৃতবাদী দার্শনিক সার উইলিয়ম হ্যামিল্টন বলিতেছেন,—"দূরস্থ বস্তু অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত অসম্পর্কিত বস্তু দর্শনের বিষয় বলা—ভাব, বাক্য অথবা উভয়তঃ ভাব ও বাক্যের গোলযোগ মাত্র। কোন বাহ্যবস্তু যতটুকু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কিত থাকে, ততটুকু মাত্রই দৃষ্ট (perceived) হয়,

এবং ইহা যত টুকু ইন্দ্রিয়েতে বর্ত্তমান, তত টুকুই ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কিত। যথা আমরা চক্ষু দ্বারা সূর্য্য বা চন্দ্রকে দেখি এই বাক্যটী অসত্য অথবা লুপ্তাংশবিশিষ্ট (elliptical.) আমরা দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎ সংশ্লিষ্ট কতকগুলি আলোকের অবস্থান্তর মাত্র দেখি ; সুতরাং ডাঃ রীড্ যে বলিয়াছেন, যখন দশ জন লোক সূর্য্য বা চন্দ্রকে দেখে তখন তাহারা সকলে ঠিক একই বস্তু দেখে, এই কথা বিজ্ঞানতঃ সত্য হওয়া দূরে থাকুক্, বাস্তবিক কথা এই যে, এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখে, কারণ, প্রত্যেকেই তাহার ইন্দ্রিয়-সংশ্লিষ্ট এক একটী ভিন্ন ভিন্ন আলোকরাশি দেখে। বস্তুতঃ ক্রমান্বয়ে এক এক চক্ষু দ্বারা দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দক্ষিণ ও বাম চক্ষু দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখিতে পাই। দৃষ্টি (perception) দ্বারা নয়—যুক্তিবিশেষ দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয়-বিষয় সমূহের সহিত সাক্ষাৎ জ্ঞানের অন্তরালস্থিত সত্বা সমূহের সম্বন্ধ জ্ঞাত হই।"* নিতান্ত বদ্ধমূল লৌকিক বিশ্বাস সমূহও বিজ্ঞানের চক্ষে কতদূর ভ্রান্তিপূর্ণ হইতে পারে, এই উদ্ধৃত অংশটি পড়িয়া পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক আমাদের আলোচ্য মূল বিষয়ে আসা যাক্। বর্ণ মানসিক অবস্থা কি পদার্থের গুণ, এই সম্বন্ধে যদি পাঠকের এখনও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে এই বিষয় আরো ২।১টী কথা বলি। পাঠক অবশ্যই জানেন যে, অন্ধকারস্থিত পদার্থ কেবল যে বর্ণশূন্য তাহা নহে, ইহা অদৃশ্য, এবং কেবলমাত্র স্পর্শগোচর। পুনশ্চ, ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তদ্দ্বারা পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, এই অদৃশ্য স্পর্শগোচর পদার্থ কখনই আমাদের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় না ; আমাদের দৃষ্টির বিষয় যাহা তাহা আমাদের চক্ষুসংলগ্ন চিত্র ; এই চিত্র সেই বস্তু-পতিত আলোক কর্ত্তৃক অঙ্কিত বটে, কিন্তু এই চিত্র সেই পদার্থ নহে, এমন কি ইহা সেই পদার্থের প্রতিরূপও নহে ; একটি বস্তুকে আর একটি বস্তুর প্রতিরূপ বলিয়া চিনিতে হইলে উভয়কেই দেখা আবশ্যক, কিন্তু এস্থলে তাহা হয় নাই ; যে বস্তু হইতে পতিত আলোক আমার চক্ষুতে চিত্র অঙ্কিত করিল, তাহা তো কখনই আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই,—এবং হওয়াও অসম্ভব, কেননা দৃষ্টির বিষয় মাত্রই চক্ষু-সংশ্লিষ্ট হওয়া চাই ; সুতরাং সেই বস্তুর সঙ্গে আমার দৃষ্ট চিত্রের সাদৃশ্য আছে, কিরূপে বুঝিব ? সেই স্পর্শগোচর পদার্থও এই দৃষ্ট পদার্থে কেবল কার্য্য কারণ ও চিহ্ন চিহ্নিতের (Sign and the thing Signified) সম্বন্ধ মাত্র, সাদৃশ্যগত সম্বন্ধ কিছুই নাই। সুতরাং পাঠক, তুমি যে বাহ্য বস্তুতে বর্ণ আরোপ করিতে যাইতেছ, তাহা যখন একেবারে দৃষ্টির অগোচর তখন তাহাতে বর্ণের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব ? চির-অদৃষ্ট এবং চির-অদৃশ্য পদার্থে দৃষ্ট এবং দৃশ্য বর্ণগুণ আরোপ করা অপেক্ষা অধিক অসঙ্গত আর কি হইতে পারে ? পাঠক বলিতে পার ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর এমন ভিন্ন ভিন্ন গুণ অবশ্যই আছে, যাহা থাকাতে আলোক-সংস্পর্শে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বোধ উৎপাদন করে। হাঁ, থাকিতে পারে, কিন্তু এই গুণ অদৃশ্য,—অদৃশ্য গুণের আলোচনা হইতেছে না, দৃশ্য বর্ণের আলোচনা হইতেছে ; এবং আলোচনাতে প্রমাণিত হইল যে, কেবল মাত্র স্পর্শগোচর অদৃশ্য পদার্থে দৃষ্ট ও দৃশ্য

* Lectures on Metaphysics, Lec. XXVII. P. 153.

গুণ যে বর্ণ তাহা থাকা অসম্ভব। অতঃপর, অদৃশ্য ইথারের অদৃশ্য আন্দোলন যে দৃশ্য বর্ণ হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে; স্নায়বিক কম্পন যে বর্ণ নহে তাহাও নিঃসন্দেহ। তৎপর থাকে কেবল একটি মানসিক অনুভব—অস্থায়ী মানসিক অবস্থা—ইহারই নাম বর্ণ।

আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; একটি প্রাকৃতিক তত্বের উল্লেখ মাত্র করি,—একই বস্তু নানা অবস্থায় নানা বর্ণে দেখায়, সাক্ষাৎদর্শন ও অনুবীক্ষণ দ্বারা দর্শন, দূরত্ব ও নৈকট্য, আলোকের আধিক্য ও অল্পতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও ক্ষীণদৃষ্টি, সুস্থ চক্ষু ও পাণ্ডু-পীড়িত চক্ষু(jaundiced)এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে বর্ণনানুভবে যে গুরুতর পার্থক্য হয় তাহাতে ইহাই প্রমাণ করে যে, বর্ণ কোন স্থায়ী বাহ্যিক বস্তু বা বস্তু-গুণ নহে, ইন্দ্রিয়ের অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তনশীল মানসিক বিকার, মানসিক ভাব মাত্র।*

পঞ্চমতঃ স্পর্শেন্দ্রিয়। ইহার বিষয় উষ্ণতা ও শীতলতা, মসৃণতা ও কর্কশতা। এই সমুদায় বিষয়ানুভবের সহিত বল প্রয়োগ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে আর দুইটী বিষয় অনুভূত হয়—কঠিনতা ও কোমলতা। এখন দেখা যাক্, এই বিষয় গুলি বাহ্য বিষয়, কি আমাদের মানসিক অবস্থা মাত্র। অনেক সময় বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে আমরা যে স্পর্শানুভব করি তাহাকে কি শীতল কি উষ্ণ কিছুই বলা যায় না, তাহাকে কেবল স্পর্শ মাত্র বলা যাইতে পারে। আচ্ছা, পাঠক এরূপ একটি স্পর্শ অনুভব করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি তাহা কি? স্পর্শানুভব করিলেই আপাততঃ তিনটী বিষয় মনে পড়ে (১) আমাদের শরীর, (২) বর্ণ, বিস্তৃতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয় ঘটিত একটি বস্তু, (৩) এই দুয়ের সংযোগে উৎপন্ন একটি মানসিক্ অবস্থা (Sensation) এই তিনটী বিষয়ের মধ্যে তৃতীয়টীই যে সাক্ষাৎ স্পর্শের বিষয়, তাহা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। এই ভাব সম্পূর্ণরূপেই মানসিক অবস্থা মাত্র, মন-নিরপেক্ষ হইয়া থাকা ইহার পক্ষে অসম্ভব। এই ভাবানুভবের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কারণরূপী যে একটী বাহ্য বস্তুর জ্ঞান অনুভূত হয়, পাঠক কিঞ্চিৎ ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন, তাহা স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, তাহা আত্মপ্রত্যয় অথবা অন্ত ইন্দ্রিয়-ঘটিত অভিজ্ঞতার ফল। এই বিষয় পরে আলোচিত হইবে। কেবল স্পর্শ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল শৈত্য ও উষ্ণত্ব সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বলা যাইতে পারে। অগ্নির নৈকট্য বশতঃ আমি যে উষ্ণতা অনুভব করি, তাহা অগ্নিতে না আমাতে? অগ্নি প্রভৃতি বস্তুর সূক্ষ্ম পরমাণু সমূহের অতি ত্বরিত আন্দোলন ইথার যোগে আমাদের শরীরে পরিচালিত হওতঃ স্নায়বিক কম্পন উৎপন্ন হইলেই আমরা উত্তাপানুভব করি। পাঠক ভাবিয়া দেখুন আমাদের অনুভূত উত্তাপ কি। পরমাণু বা ইথারের আন্দোলন উত্তাপ নহে; বিজ্ঞান ইহাকে উত্তাপ বলিতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা আমাদের অনুভূত উত্তাপের কারণ বা পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা মাত্র; আমাদের অনুভূত উত্তাপের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। অতঃপর স্নায়-

---

* For arguments of this nature with regard to all sensible things see Locke's Essay "Bk II. chap 8, and Berkeley's first dialogue between Hylas and Philonus.

বিক কম্পন,—ইহাও উত্তাপ নহে, ইহা উত্তাপের আনুষঙ্গিক অবস্থা মাত্র; তৎপর থাকে কেবল একটী মানসিক ভাব মানসিক অবস্থা, ইহাকেই আমরা উত্তাপ বলি। বলা বাহুল্য যে, এই মানসিক অবস্থা মন-বিচ্যুত হইয়া থাকা—কোন জড়বস্তুতে থাকা একেবারেই অসম্ভব। এই বিষয়ে আরো দুই একটী কথা বলিতেছি। পাঠক কোন উপায়ে তোমার এক হস্ত উষ্ণ ও আর এক হস্ত শীতল কর, তৎপর একটী পাত্রস্থিত জলকে ক্রমান্বয়ে এক এক হস্ত দ্বারা স্পর্শ কর, দেখিবে এক হস্তে ইহা শীতল ও আর এক হস্তে উষ্ণ বোধ হইবে। এখন ঐ জল উষ্ণ কি শীতল, কি বলিব? একই বস্তু এককালে কিরূপে উষ্ণ ও শীতল দুইই হইবে? যদি বল অনুভূত বিষয়দ্বয়ের মধ্যে একটী বস্তু-গুণ আর একটী মানসিক ভাব, তবে বল দেখি কোন্‌টী মানসিক ভাব আর কোন্‌টী বস্তুগুণ? একটীকে মানসিক ভাব বলিলে আর একটীকে তাহা না বলিবার যুক্তিযুক্ত কারণ খুজিয়া পাইবে না। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যায়, শরীরের অবস্থানুসারে একই বস্তু এককালে শীতল এবং উষ্ণ উভয় গুণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়, এই সমুদায় দৃষ্টান্ত আমাদের মীমাংসার বিশেষ পরিপোষক। শৈত্য ও উষ্ণতার বিষয় যাহা বলা হইল এবং কঠিনতা ও কোমলতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইতেছে, এই উভয়ের সাহায্যে মসৃণতা ও কর্কশতার বিষয় বুঝা যাইতে পারে। আমার সম্মুখস্থ টেবিল কঠিন ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই ইহাকে অঙ্গবিশেষ দ্বারা স্পর্শ করিয়া ইহাতে বল প্রয়োগ করিলে ইহা আমার অঙ্গের গতিরোধ করে। (ইহা ব্যতীত টেবিল সম্বন্ধীয় যে সকল আনুষঙ্গিক ইন্দ্রিয়বিষয় যথা বর্ণ, বিস্তৃতি স্পর্শবোধ ইত্যাদি, পাঠক এই সমুদায় এখন ছাড়িয়া দাও, কেন না এই সমুদায় স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় নহে।) এই গতিরোধ ব্যাপারে দুইটী বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়, (১) আমার মাংসপেশী সম্বন্ধীয় একটী অনুভব যাহাকে muscular sensation বলা হয়, (২) এই ইন্দ্রিয়বোধোৎপাদক একটী বাহ্যিক শক্তি। প্রথমোক্ত বিষয়টীই ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইহা স্পষ্টতঃই ইন্দ্রিয়-বিচ্যুত, মনবিচ্যুত হইয়া থাকিতে অক্ষম। দ্বিতীয়টী কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, (যদি হয়, পাঠক বল কোন্ ইন্দ্রিয়ের?) ইহা আত্ম-প্রত্যয়, যুক্তি বা কল্পনার বিষয়, অতএব ইহাকে ইন্দ্রিয়াতীত সুতরাং আধ্যাত্মিক বস্তু বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। অতএব কঠিনতা কোমলতা আর কিছুই নহে, আমাদের মাংসপৈশিক বোধ (muscular sensation) এর অল্পতা আধিক্য এবং বাহ্যিক শক্তির প্রবলতা ও ক্ষীণতা মাত্র। অতএব দেখা গেল আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় আমাদিগকে কোন বাহ্যিক ভৌতিক বস্তুর জ্ঞান দিতে অক্ষম।

আমাদের ইন্দ্রিয় পরীক্ষা শেষ হইল। আমরা এক একটী করিয়া সমুদায় ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে দেখাইলাম যে, ইহাদের বিষয় সমূহ আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষ মন-বহির্ভূত বাহ্যিক বস্তু নহে, আমাদের মানসোৎপন্ন অবস্থাপরম্পরা মাত্র। কোন বিশেষ ইন্দ্রিয় বিষয়ের আলোচনা কালে অন্য বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বিষয়ের এমন ভাবে উল্লেখ করিতে হইয়াছে, যাহাতে পাঠকের হঠাৎ বোধ হইয়া থাকিতে পারে যে, আমরা সেই

সমুদায়কে আত্মা-বর্হির্ভূত বাহ্য বস্তু বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লইয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক আমরা ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে কখনই এই অর্থে গ্রহণ করি নাই; কিঞ্চিৎ পরেই আবার দেখাইয়াছি সেই সেই ইন্দ্রিয়-বিষয় ও মানসিক অবস্থা বই আর কিছুই নহে। অতএব আমাদের প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা হইল, ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের নামই যদি জড়-পদার্থ হয়, তবে জড়-পদার্থ মানসিক অবস্থা পরম্পরা মাত্র, ইহা প্রমাণিত হইল। অতঃপর এই প্রশ্নের আনুষঙ্গিক কতকগুলি প্রশ্ন এবং প্রকৃতবাদী দার্শনিকগণের কল্পিত ইন্দ্রিয়াতীত কোন অচেতন পদার্থ আছে কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিব।

বীর এবং বীরত্ব।

মানুষ, মানুষ কেন?—অল্পদর্শী এ কথা শুনিয়া হাসিতে পারে। তবে হাসিবে না কে?—যিনি অতল সাগরে ডুবিতে গিয়া, শেষ না পাইয়া, ফিরিয়া আসিয়াছেন; যিনি বিশাল গগণবক্ষ তন্ন তন্ন করিতে গিয়া, আদি অন্ত না দেখিয়া, নিবৃত্ত হইয়াছেন। হাসিবেন না তাঁহারা। আর হাসিবেন না,—যিনি মানব হৃদয় ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন, যিনি মানব প্রকৃতির গূঢ় মর্ম্ম অবধারণ করিতে অন্ততঃ চিন্তা করিয়াছেন। যিনি মনুষ্য-চরিত্র-সাগরে ডুবিয়া, তল স্পর্শ করিতে না পাইয়া, অবাক এবং স্তম্ভিত হইয়াছেন, এ প্রশ্নের উত্তর তিনিই ধীর ভাবে দিবেন।

মানুষ, মানুষ কেন?—মানব হৃদয়ে তেজ আছে, মানুষ অগ্নির সন্তান। মানুষের অস্থি সকল অগ্নি দ্বারা নির্ম্মিত, মনুষ্যের ধমনীতে অগ্নি স্রোত প্রবাহিত, প্রতি মানুষই "অগ্নিময় জলন্ত পুরুষ।" এই জন্যই মানুষ, মানুষ। তোমরা সকলে একত্র হইলে, ঐ বর্ষার বান-উচ্ছ্বসিত গঙ্গার দুর্ব্বার স্রোত রোধ করিতে পার, ঐ সমুন্নত হিমাদ্রিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পার, ঐ আকাশের তারা, চন্দ্র, সূর্য্য, একটী একটী করিয়া তুলিয়া, হয়ত, প্রশান্ত মহাসমুদ্রের জলে ডুবাইতে পার, পারনা কেবল একটী কাজ। ঐ ক্ষুদ্র মানব হৃদয় খানিকে,—যদি উহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব থাকে,—পৃথিবীর সমগ্র বল প্রয়োগ করিলেও, উহার নিজের স্থান হইতে, একচুলও নড়াইতে পারিবে না। প্রকৃত মানুষ এক দিন যাহা অন্যায় বলিয়া স্থির করিয়াছে, অকর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়াছে, যত দিন তাহার মনে সেই সংস্কার থাকিবে, তত দিন, পৃথিবীর সমগ্র শক্তি কেন, যদি এই বিশাল বিশ্বনিহিত সমগ্র শক্তি প্রযুক্ত কর, এমন কি যদি অসঙ্গত না হইত, তবে ইহাও বলিতে সাহস করিতাম,—যদি ঈশ্বর স্বয়ং আসিয়াও ভয় প্রদর্শন করিয়া বলিতে পারিতেন,—তোমাকে ইহা করিতে হইবে,—এক গাছি লঘু তৃণের অপেক্ষাও সামান্য বোধে সেই ভয়-প্রকট ভ্রুকুটিকে সে অবহেলা করিয়া, অটল চিত্তে, পূর্ব্বস্থানেই দাঁড়াইয়া থাকিবে। আমরা মানব-হৃদয়ের এই সমুন্নত ভাব-

কেই, বীরত্ব উপাধি দিতে প্রস্তুত। আর বীর কে? একথার কি উত্তর এখনও বাকী রহিয়াছে? বীর তিনিই, যিনি এই বীরত্বের প্রকাশক।—যাঁহার হৃদয় নিহিত সত্যানুরাগ ও ন্যায় প্রিয়তা-রূপ মহা দাবাগ্নিতে বিশ্বের সমস্ত শক্তি তৃণপুঞ্জের ন্যায় পুড়িয়া গেলেও আপনি, আপনার স্থানে, অচ্যুত থাকেন, বীর তিনিই। বীর সেই দেবপুরুষ—বীর সেই মহাত্মা, এখন দেখি—পৃথিবীর মানুষেরা কাহাকে বীরত্ব, কাহাকে বীর বলে।

বীরের প্রতি সমাদর প্রদর্শন, বীরত্বের পূজা, মনুষ্য প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী ফল। সাধারণ মানব-হৃদয় তন্ন তন্ন করিয়া, দেখিলেই ইহার প্রমাণ অবধারিত হইতে পারে। পৃথিবীতে এমন দেশ নাই, এমন স্থান নাই, যেখানকার অধিবাসী মানুষেরা, সাধারণ ভাবে, মনুষ্য হৃদয়ের স্বাভাবিক তেজবত্তার পক্ষপাতী নয়। দুঃখের বিষয় এই,—শিক্ষা ও জ্ঞানের অপ্রাচুর্য্য হেতু, মনুষ্যসকল যেমন ঈশ্বরদত্ত অপরাপর মহৎ গুণ সমূহের বিষম অপব্যবহার করিয়া, জগতে হিতের পরিবর্ত্তে কেবল অনিষ্টই আনয়ন করিয়াছে, সেই মানুষের হাতে পড়িয়া, বীরত্বের অবস্থাও তাহাই ঘটিয়াছে। ঈশ্বর অগ্নি দিয়া, মানুষকে বলিয়াছিলেন, ইহা পরম উপকারী, দুষ্ট মনুষ্য তাহা গৃহে সংযোগ করিয়া পৃথিবী পোড়াইয়া ফেলিল! পরমেশ্বর অস্ত্র দিয়া বলিলেন, ইহা জগৎকে রক্ষা করিবে, পাষণ্ড মানব, তদ্দ্বারা সংসারে বিনাশের বিভীষিকা আনায়ন করিল! নতুবা নররুধির-পিপাসু জঙ্গিস, তৈমুর, এবং নাদিরশাও বীরের পবিত্র নাম পাইল কেন? দুরাশার চিরক্রীত দাস, দস্যুতা-ব্যবসায়ী সেকেন্দর এবং নেপোলিয়ন বীর চূড়ামণি বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের বক্ষ আজও কলঙ্কিত করিতেছে কেন? ক্রমওয়েলই বল, আর শিবজির নামই কর, পূজনীয় দেবদুর্লভ স্বাধীনতার মাননীয় নামে, যাহারা রাক্ষসের কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারে, মানুষ বলে বলুক, ইলিয়দ এবং রামায়ণ, মহাভারত হইতে বর্ত্তমান শতাব্দীর মহা কাব্যাবলী পর্য্যন্ত, সমস্ত পুরাণ, ইতিহাস, এইরূপ বীরগণের গুণ বর্ণনা এবং স্তুতিগান করে করুক্, আমরা ইহাদিগকে বীর বলিয়া, সেই পবিত্র অমর-বাঞ্ছিত আখ্যায় কলঙ্কের কালিমা ঢালিতে পারিব না। ওয়াশিংটনই বল, ম্যাট্‌সিনীই বল, আর গ্যারিবল্‌ডীর নামই কর, যাঁহাদের হৃদয় এবং বিবেক, হস্তস্থিত অসিকে, পবিত্র মানবাত্মার আবাস গৃহ রূপ নরদেহ রুধিরে অভিষিক্ত করিতে সঙ্কোচিত হয় নাই, স্বর্গের দেবদেবীগণ, বীর বলিয়া, তাঁহাদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু মহান ঈশ্বরের নাম স্মরণ থাকা পর্য্যন্ত, এ ক্ষুদ্র প্রাণ, দেবজগতের সে কার্য্যকেও, প্রশংসনীয় বলিতে সক্ষম হইবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—"দুষ্টের দমন করিয়া, আপনার দেশকে এবং মানব সাধারণকে, উদ্ধার করা কি বীরত্বের কার্য্য নয়? মানব সাধারণ কে?—ইটালীর বা ফ্রান্সের অধিবাসী কয়েকটী? না উত্তর আমেরিকার না দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী গণ?—না তাহাদেরও মধ্যে আবার কতকগুলি বাদে কতকগুলি লোক মাত্র? মানব-সাধারণ কে? মানব সাধারণ,—সমস্ত জগৎবাসী,—পরম পিতার সমস্ত পুত্র কন্যা। আফ্রিকার জঙ্গলবাসী নিগ্রো হইতে সভ্য জগতের শিরচূড়ামণি পণ্ডিতমণ্ডলী পর্য্যন্ত

সকলেই মানব সাধারণ শব্দের অভিধেয়। "সকলের পিতা মাতা এক, সকলেই সকলের ভাই ভগ্নী" এই মূলমন্ত্র মানব সাধারণ বা মনুষ্য জাতির প্রাণ। একটী পরমাণুর প্রতি অপর পরমাণুর আকর্ষণ শক্তি কোথা হইতে আসিল? বিজ্ঞান আজও এ কথার সুস্পষ্ট উত্তর দিতে অসমর্থ, কিন্তু এক মানব অপর মানবের প্রতি যে জন্য আকৃষ্ট হয়, তাহার মূল আমরা জানি। সেই মূলকেই মানব জাতির প্রাণ বলিলাম। এই প্রাণরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ, জ্ঞানীর চক্ষে, বিশ্বাসী ধার্ম্মিকের চক্ষে, অচ্ছেদ্য, অলঙ্ঘ্য। এই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক কি সামান্য নদিটী, সামান্য পর্ব্বতটী, সামান্য সাগর বা উপসাগরটীর ব্যবধানে, সামান্য মত-পার্থক্যে, সামান্য অপরাধে, উল্লঙ্ঘিত হইতে পারে? এমনও কি কোন কারণ ঘটিতে পারে যে, মানুষের অবিকৃত হৃদয় এবং বিবেক, এই পূজনীয় পবিত্র সম্বন্ধকে, রক্তাক্ত অসির অগ্রে উড়াইতে বলিবে? কেন? বুদ্ধ, কন্‌ফোসী এবং ঈশার পবিত্র প্রাণ কি মানব সাধারণের উদ্ধারের জন্য, জগতের পরিত্রাণের জন্য, কান্দিয়াছিল না? তবে পৃথিবীকে আজ স্বর্গে পরিণত করিল কে? আজ সাম্যের মহাসঙ্গীত জগতে ছড়াইল কে? অসিতে অসিতে সংঘর্ষণ জনিত জ্বলজ্জ্বল অগ্নিরাশি,—না, পাণিপথ, ওয়াটার্লু প্রভৃতি সমরক্ষেত্রের শত সহস্রমুখী নররুধিরধারা—ভ্রাতৃ রক্তের পাপময়ী নদী—না, শোকাতুরা ভগ্নীগণের হৃদয়স্পর্শী বিলাপ ধ্বনি? যাঁহারা সকল সুখ ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া, মান অভিমানের সহিত জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া, হিংসা, ক্রোধাদিকে সাধনার মহাগ্নিতে দগ্ধীভূত করিয়া, পবিত্রতাময় পরিত্রাণ এবং সাম্যের মহাসঙ্গীতে সমস্ত আকাশ ধ্বনিত করিলেন, তাঁহারাই কি প্রকৃত বীর নন্? যিনি, গলিত কুষ্ঠ রোগীকে, প্রাণের আবেগে কোলে করিয়া,—আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন, যিনি দস্যুর দারুণ নিষ্পীড়নেও প্রেমের মহামন্ত্র না ভুলিয়া, বলিতে পারিলেন—"মেরেছে, মেরেছে কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেব না?" তিনিই কি বীরচূড়ামণি নন্? অনেকে বলে, "মিরাবোঁ অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ফরাসী ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, সাম্যের প্রথম সঙ্গীত গাইয়াছিলেন।" আমি বলি,—পঞ্চদশ শতাব্দীতে—যিনি ভারতের এক পার্শ্বে, বঙ্গের বক্ষে দাঁড়াইয়া, "মেরেছে, মেরেছে কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দেব না।" এই মহাবাক্য বা সঙ্গীতাংশ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনিই সাম্য সঙ্গীতের মহাগায়ক। ইহারও পনর শতবৎসর পূর্ব্বে আর একজন ধা আর একটী দেবতা বলিয়াছিলেন "বাঁ গালে চড় মারিলে, ডান গাল ফিরাইয়া দাও,"। "যদি কোন ভ্রাতাকে অসন্তুষ্ট করিয়া থাক, তবে তাহাকে অগ্রে সন্তুষ্ট করিয়া আইস, নতুবা ভগবান তোমার উপহার গ্রহণ করিবেন না।" ইনি ঈশা—ইনিও সাম্যসঙ্গীতের পরম মহাগায়ক। তাঁহার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যিনি বলিলেন—"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" তিনিই সাম্যসংগীতের চূড়ান্ত এবং আদি মহাগায়ক। মিরাবোঁর সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ ফল ফরাসী বিপ্লবের নররক্তময়ী রাক্ষসিক ঘটনা, আর বুদ্ধ, চৈতন্য, ঈশার মহামহিমান্বিত গভীর সঙ্গীতের প্রতিপদ হইতে যেন মানবসমাজের অনন্ত উন্নতি, অনন্ত শান্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই আদিম কালের অন্ধকারে

দাঁড়াইয়া, ভারতের নগর, গ্রাম, বন, নদ, নদী, গিরিশৃঙ্গ সকল প্রতিধ্বনিত করিয়া, আদি মহাগায়ক বুদ্ধ যে সঙ্গীত গাইলেন, আজও পৃথিবীর তৃতীয়াংশের অধিক সংখ্যক লোক, সভ্যতার আলোকে দাঁড়াইয়া, সেই সঙ্গীতের 'ধুয়া' গাইতেছে। মধ্যযুগে ভারতে যে অভাবনীয় উন্নতি ফুটিয়াছিল, তাহা সেই সঙ্গীতেরই একটী উচ্ছ্বাস মাত্র। ধর্ম্ম জগতের শান্তিপূর্ণ নিভৃত স্থানে থাকিয়া, মহাপ্রভু চৈতন্য সরবে, নীরবে, মানব প্রেমের যে অমৃতধারাবর্ষী মহাসঙ্গীত গাইয়াছিলেন, আজ দারুমজ্জাগত অগ্নি প্রবাহের ন্যায়, গোপনে, সমস্ত নর নারীর হৃদয়ে হৃদয়ে, সেই গীতি-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সেই মহাগীতই যেন,—সেই প্রেমের উন্মত্ত প্রবাহই যেন, বঙ্গীয় অপরিচিত কবির প্রাণে ঢালিয়া দিয়াছে;—

"একটী তরঙ্গ, উঠিবে অভঙ্গ,
সুদূর পশ্চিমে, আমেরিকা দেশে।
আফ্রিকা স্বরূপ, ধুই একি রূপ,
মিলিবে আসিয়া, আসিয়া শেষে।"

আর সেই ঈশার সঙ্গীত,—জগৎ যত দিন থাকিবে, ততদিন কেহ ভুলিতে পারিবে না! আজ সমগ্র সভ্য জগতের মহোন্নতি স্রোত, সপ্তমে সুর তুলিয়া সেই সঙ্গীত গাইতেছে! ঊনবিংশ শতাব্দীর সমুন্নত জ্ঞান, বিজ্ঞান সেই মহাগীতের গম্ভীর পদাবলী মাত্র। পৃথিবীব্যাপ্ত অগণ্য বাণিজ্য-পোত, বাষ্পীয় তরণী, বাষ্পীয় শকট এবং তাড়িত সম্বন্ধীয় অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া—সেই মহাধ্বনিরই প্রতিধ্বনি! আজ ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হইতে চলিল, মহাগায়ক ঈশার এই পার্থিব কণ্ঠ ধূলায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সে হৃদয়-কণ্ঠের সঙ্গীত আজও শেষ হয় নাই, অনন্তকালেও হইবে না! আবার যখন বুদ্ধ, চৈতন্য, ঈশা এই তিন পরম মহাগায়কের সম্মিলিত মহাসঙ্গীত মানস শ্রবণে শুনিতে থাকি, তখন বিস্ময়ে জগৎ নিস্তব্ধ হয়, গাম্ভীর্য্যে আকাশ পূর্ণ হইয়া যায়, দিক সকল স্তম্ভিত হয়, প্রাণের মধ্যে অনাহত শব্দে যে মহা ঘোর ধ্বনি হইতে থাকে, তাহার স্মরণেও হৃদয়ের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ছার মিবারের কণ্ঠ, এই মহাসঙ্গীত সিন্ধুর একটী সামান্য বুদ্‌বুদ্ মাত্র। এই সঙ্গীতের একটী সামান্য উচ্ছ্বাসে, শত আলেকজাণ্ডার, শত নেপোলিয়ন উড়িয়া যাইতে পারে, শত ওয়াসিংটন, শত ম্যাট্‌সিনী, শত গারিবল্‌ডী ভাসিয়া যাইতে পারে, পূর্ব্বের সূর্য্য উত্তরে উঠিতে পারে, যত অদ্ভুত, যত মহান ব্যাপার কল্পনা করিতে পার, সকলই ঘটিতে পারে। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিবে, মানবের হৃদয় যতদিন থাকিবে ততদিনই সাক্ষ্য দিবে। বীর এই মহাসঙ্গীতের মহাগায়কগণ;—আর বীরত্ব ইঁহাদেরই জ্বলন্ত জীবন।

অসি।

এই অস্ত্রটী সর্ব্বদেশ সাধারণ এবং ইহার প্রচার ও ব্যবহার অদ্যাপি সমভাবে বর্ত্ত-মান আছে। প্রাচীন জনশ্রুতি ও ধনু-র্ব্বেদের লিপি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, পূর্ব্বকালে যেরূপ তীক্ষ্ণধার অসি উৎপন্ন হইত—এখন আর সেরূপ শক্তি সম্পন্ন তীক্ষ্ণ অসি কোন শিল্পীই প্রস্তুত করিতে পারে না। শুনা গিয়াছে এবং ধনুর্ব্বেদেও লিখিত আছে যে, অসির আঘাতে প্রস্তর স্তম্ভও কর্ত্তিত হয়। পাথরে আঘাত করিলেও ধার থাকে, ভাঙ্গিয়া যায় না, এরূপ অসি আর এখন নাই। কেন নাই? তাহা জানি না। এক্ষণকার অসি যেরূপ হয় হউক, পরন্তু পূর্ব্বকালে কত প্রকার অসি ছিল, কিরূপ লোহায় কোন্ প্রদেশে প্রস্তুত হইত, কিরূপ পায়ণ অর্থাৎ পান্ দিয়া তাহার ধার বাঁধা হইত এবং কিরূপ কৌশলেই বা তাহা ব্যবহৃত হইত; অদ্য আমরা এই সকল বৃত্তান্ত বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া পাঠক-গণের অক্ষি সমক্ষে অর্পণ করিব। যদিও এইরূপ প্রস্তাবে কিছু শিক্ষিতব্য থাকে না—তথাপি ইহার দ্বারা কুতূহল বৃদ্ধি ও পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মহিমা অনুভূত হইতে পারে; তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

এই অস্ত্র অতি পুরাতন। অতি পূর্ব্ব-কালে ইহার আটটী মাত্র নাম ছিল। যথা—অসি, বিশসন, খড়্গ, তীক্ষ্ণবর্ম্মা, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মমাল। অনন্তর ইহার আরও কয়েকটী নাম বৃদ্ধি হইয়াছিল। যথা—নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, রিষ্টী, কৌক্ষেয়ক, মণ্ডলাগ্র, করপাল, করবাল, তরবার, ও তরবারি। ছোট বড় ও গঠনের তারতম্য অনুসারে ইহার আরও দুই চারিটী নাম আছে। সে সকল ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অসি সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা লিখিত আছে। তাহা হইতে প্রথমে আমরা লৌহ পরীক্ষাটী বিবৃত করিব। অগ্রে লৌহ পরীক্ষা, পশ্চাৎ দোষ গুণের পরীক্ষা করাই উচিত।

অসির উপযুক্ত লৌহ প্রথমতঃ দ্বিবিধ। নিরঙ্গ ও সাঙ্গ। প্রথমোক্ত নিরঙ্গ লৌহ আবার অনেক বিধ। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত লৌহকে কাঞ্চী প্রভৃতি নাম দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। সেই সকল লৌহই অসি নির্ম্মাণের উপযুক্ত এবং বিবিধ ব্যাধির বিনাশক। যথা—

লৌহানাং লক্ষণং বক্ষ্যে যথোক্তং মুনিপুঙ্গবৈঃ।
নিরঙ্গ সাঙ্গ ভেদেন তে লৌহা বিবিধা মতাঃ॥
নিরঙ্গাঃ কাঞ্চি গাণ্ড্যাদি ভেদাৎ বহুবিধা মতাঃ
অসি কর্ম্মসু তে নাস্তা নানা ব্যাধি বিনাশনাঃ॥"

[বীর চিন্তামণি।

খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র প্রায়শঃই সাঙ্গ লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত হয়, এজন্য সেই সাঙ্গ লৌহের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও চিহ্ন সকল ব্যক্ত করাই কর্ত্তব্য। বীর চিন্তামণি

ও শার্ঙ্গধর পদ্ধতি নামক গ্রন্থে এতদনুরূপ একটা বচন আছে, তাহা এই—

"বক্ষস্তে প্রায়শো যস্মাৎ সাঙ্গাঃ খড়্গাদি কর্ম্মসু।
নাম ভেদেন চিহ্নানি লৌহানামভিদধ্মহে॥"

খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্রের উপাদান প্রধান প্রধান সাঙ্গ লৌহের নাম দশটী। যথা—রোহিণী, নীলপিণ্ড, ময়ূর গ্রৈবক, ময়ূর বজ্র, তিত্তিরাঙ্গ, সুবর্ণ বজ্র, শৈবল মালান, মৌষল বজ্র, কঙ্গোল বজ্র বা স্বর্ণক ও গ্রন্থিবজ্র। এতভিন্ন আরও কয়েক প্রকার লৌহ আছে, তাহা সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। এ সকলের লক্ষণ বা চিহ্ন উক্ত গ্রন্থে অতি বিস্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে। যথা—

রোহিণী।

"ক্ষুদ্রাঙ্গং সুদৃঢ়ং যস্য নীল মীষৎ প্রতীয়তে।
রোহিণীং তাং বিজানীয়াৎ তৎক্ষতে বহু বেদনা॥"

যাহার অবয়ব ক্ষুদ্র (ক্ষুদ্র কাকরের ন্যায় আকার বিশিষ্ট) অথচ অত্যন্ত কঠিন, এরূপ লৌহে যদি অল্প নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে রোহিণী বলিয়া জানিবে। এই রোহিণী লৌহের দ্বারা ক্ষত হইলে ক্ষত স্থানে অত্যন্ত বেদনা জন্মে।

নীলপিণ্ড।

"নীলপিণ্ড সমাঙ্গঞ্চ নীলপিণ্ডং বিদুর্বুধাঃ॥"

যাহা নীলপিণ্ড অর্থাৎ নীল বড়ীর ন্যায় তাহা নালপিণ্ড বলিয়া জানিবে।

ময়ূর গ্রৈবক।

"ময়ূরকণ্ঠ সংস্থান মঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।
ময়ূর গ্রৈবকং লৌহং তং বিদুর্মুনি পুঙ্গবাঃ॥"

যাহার অবয়ব ময়ূরের কণ্ঠ তুল্য—তাদৃশ লৌহকে মুনিগণ ময়ূর গ্রৈবক বলিয়া জানেন।

ময়ূর বজ্রক॥

"নাগকেশর পুষ্পাভ মঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।
ময়ূর বজ্রকং প্রাহুর্লৌহশাস্ত্রবিদো জনাঃ॥"

যাহার অঙ্গে নাগকেশর ফুলের আভা দৃষ্ট হয়—লৌহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে ময়ূর বজ্র নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

তিত্তিরাঙ্গ।

"তস্মিং স্তিত্তিরি পক্ষাভমঙ্গং লৌহে প্রতীয়তে
দুর্লভং তন্মহামূল্যং তিত্তিরাঙ্গং সুপাকজম্॥"

যে লৌহের অঙ্গ তিত্তির পক্ষীর পক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হয়—সেই লৌহই তিত্তিরাঙ্গ নামে বিখ্যাত। এই তিত্তিরাঙ্গ লৌহ অতি দুর্লভ ও অতি মূল্যবান্ এবং ইহা অতি সুপাকজাত অর্থাৎ সুধাতু লৌহ। এই সুধাতু লৌহের দ্বারা যে কোন অস্ত্র নির্ম্মিত হয়, সমস্তই উত্তম ও গুণবান্ হয়।

সুবর্ণ বজ্রক।

"সুবর্ণ সদৃশাকারা যস্য ভূমিঃ প্রতীয়তে।
সুবর্ণ বজ্রকং বিদ্যাৎ বহুমূল্যং মহাগুণম্॥"

যাহার অঙ্গে সুবর্ণাকার চিহ্ন প্রতীত হয়—সে লৌহকে সুবর্ণ বজ্র বলিয়া জানিবে। এই সুবর্ণ বজ্র নামক লৌহও বহুমূল্য ও গুণবান্।

শৈবাল মালান।

"অবিচ্ছিন্নং সুসূক্ষ্মাঙ্গং দূর্ব্বাভাঙ্গমপাকজম্।
যস্মিন্ শৈবলমালান মাহুস্তং মুনি পুঙ্গবাঃ॥"

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, যে লৌহে অবিচ্ছন্ন সুসূক্ষ্ম অঙ্গ (আঁস্) থাকে এবং তাহার আভা যদি দূর্ব্বাদলের ন্যায় হয়, তবে তাহাকে শৈবল মালান আখ্যা প্রদান করিবেক।

মৌষল বজ্র।

"শুক্লং পার্শ্বদ্বয়ং যস্য মধ্যে স্বর্ণ ময়াঙ্গকম্।

ধূম্রবৎ সীমসংস্থানং মৌষলং বজ্রকং বিদুঃ॥"

যাহার পার্শ্বদ্বয়ে শ্বেতাভা স্ফুরিত হয়, মধ্যে স্বর্ণরেখা দৃষ্ট হয়, সংহত করিলে সংঘাত স্থান ধূম্রবর্ণ হয়, তাদৃশ লৌহকে মৌষল বজ্রক বলিয়া জানিবে।

• কঙ্গোল বজ্র বা স্বর্ণক।

"মৃণালনীলপ্রতিমং বিদরৈরগ্রসংস্থিতৈঃ।
কঙ্গোলবজ্রকং প্রাহুঃ স্বর্ণকং লৌহচিন্তকাঃ॥"

লৌহতত্ব অনুসন্ধায়ীরা বলিয়া থাকেন যে, যাহাকে ভাঙ্গিলে তদগ্রভাগে মৃণালের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র সকল দেখা যায়—তাহাকে কঙ্গোল বজ্রক অথবা স্বর্ণক বলিয়া জানিবে।

গ্রন্থি বজ্র।

"অঙ্গং প্রতীয়তে যত্র বহুগ্রন্থি সমন্বিতম্।
দুর্লভং তন্মহামৌল্যং গ্রন্থি বজ্রক মুচ্যতে॥"

যাহার সর্ব্বাঙ্গ গ্রন্থিল অর্থাৎ যাহার অনেক স্থানে গাঁইট আছে বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহার নাম গ্রন্থি বজ্র। এই গ্রন্থি বজ্র লৌহও দুর্লভ ও মহামূল্য।

এতদ্ভিন্ন নিরঙ্গ লৌহও অনেক প্রকার আছে। তাহাদের নাম ও চিহ্ন সকল লৌহার্ণব গ্রন্থে বিবৃত আছে। রোহিণী, পাণ্ড ও রুক্ষ, এই তিন প্রকার মাত্র। নিরঙ্গ লৌহ অস্ত্রের উপযুক্ত। রুক্ষ বা কান্ত লৌহ নিরঙ্গমধ্যপাতী। আজ কাল্ ইংলিশ লৌহে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। তজ্জন্য আর কেহ কষ্টসাধ্য ও বহুমূল্য দেশী লৌহ আহরণ করেন না। এমন কি, এ দেশীয় লোকেরা প্রায় দেশী লৌহের স্বরূপ, চিহ্ন, গুণাগুণ সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে লৌহের আকর আছে কি না, তাহাও কেহ জ্ঞাত নহেন বা অনুসন্ধান করেন না। করিবারও প্রয়োজন নাই। কারণ, এখন কেবল অলাবুচ্ছেদনের উপযুক্ত বঁটি নির্ম্মাণের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র লৌহের প্রয়োজন হয়—পরন্তু তাহা অল্প মূল্যের মৃৎকল্প ইংলিশ লৌহের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারে। পূর্ব্বে এ দেশে ইংলিশ লৌহের আগমন ছিল না এবং মেষ, মহিষ, হয়, হস্তী, কাষ্টযষ্টি, লৌহযষ্টি ও অস্থি প্রভৃতি বৃহৎ ও সারবান বস্তু-চ্ছেদনের উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তদুপযুক্ত লৌহেরও প্রয়োজন হইত। প্রয়োজন বুঝিয়া কুশলীপরীক্ষক পুরুষেরাও দেশে দেশে এবং ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া লৌহের অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও পরীক্ষা করিতেন। এখন আর কিছুই করিতে হয় না, চারিটী পয়সা ফেলিয়া দিলেই দিব্যি এক খানি প্রস্তুত বঁটি পাওয়া যায়। ফল এ সকল প্রসঙ্গাগত কথায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণে প্রকৃত কথায় মনোনিবেশ করুন।

উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত কোন এক লৌহের দ্বারা অসি নির্ম্মাণ করিবেক। অসি নির্ম্মাতার যদি নৈপুণ্য না থাকে তবে উত্তম লৌহ পাইলেও তিনি উত্তম অসি প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন না। কোন্ লৌহকে কিরূপ প্রকারে ও কতবার পোড় দিয়া পিটিতে হয় তাহা জানা আবশ্যক; পরন্তু পায়ণ অর্থাৎ পানের গুণেই তাহার ধার তীক্ষ্ণ ও দৃঢ় হয়। এজন্য শিল্পিকে অগ্রে অস্ত্রের পায়ণ কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ হইতে হয়। পায়ণ কার্য্যটী যদি উত্তম বা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তবেই অস্ত্রের উত্তমতা জন্মে, নচেৎ সমস্তই বিফল হয়। পায়ণ কার্য্যের পাকটী লিপির দ্বারা শিক্ষা করা যায় না। তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও স্বহস্তে তৎকার্য্য

সাধন—এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই শিখা যায়। অন্য কোন প্রকারে শিক্ষা করা যায় না। তথাপি পণ্ডিতেরা পায়ণের দ্রব্য ও প্রক্রিয়াগুলি যথাসাধ্য লিখিতে ক্রটী করেন নাই। বৃহৎ সংহিতা প্রোক্ত অসির পায়ণ বিধিটী এস্থলে পাঠকবর্গের সুগোচরার্থ উদ্ধৃত করিলাম।

পায়ণ অর্থাৎ পান্ দিবার বিধি।

অসি প্রস্তুত হইলে তাহা পরিষ্কৃত করিয়া ধারের মুখে লবণ কি অন্য কোন ক্ষার, মৃত্তিকাদ্রবে মিশ্রিতকরণপূর্ব্বক প্রলেপ দিয়া, সেই প্রলিপ্ত ধারটী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে জল, কি অন্যান্য দ্রবদ্রব্য পান করানকে পায়ণ বলে। দগ্ধ করিয়া জলে কি অন্য কোন তরল দ্রব্যে নিক্ষেপ করিলেই তাহা পান করান হয়। অসিকে যে যে দ্রব্য পান করাইলে উত্তম হয়, মহর্ষি উশনা অর্থাৎ অসুর গুরু শুক্রাচার্য্য তাহা বলিয়া গিয়াছেন। যথা——

"ইদমৌশনসঞ্চ শস্ত্র পানং
রুধিরেণ শ্রিয়মিচ্ছতঃ প্রদীপ্তাম্।
হবিষা গুণবৎ সুতাভি লিপ্সোঃ
সলিলে লাক্ষায় মিচ্ছতশ্চ বিত্তম্॥
বড়বোষ্ট্রকরেণুদুগ্ধপানং
যদি পাপেন সমীহতেহর্থসিদ্ধিম্।
ঝষপিত্ত মৃগাশ্ব বস্ত দুগ্ধৈঃ
করি হস্ত ছিদয়ে সতাল গর্ভৈঃ॥
আর্কংপয়োহুড়ু বিষাণ মষী সমেতম্
পারাবতাখু শকৃতাচ যুতং প্রলেপঃ।
শস্ত্রস্য তৈল মথিতস্য ততোহস্য পানম্
পশ্চাচ্ছিতস্য ন শিলাসু ভবেদ্বিঘাতঃ॥
ক্ষারে কদল্যা মথিতেন যুক্তে।
দিনোষিতে পায়িত মায়সং যৎ।
সম্যক্ শিতং চাশ্মনি নৈতিভঙ্গং
ন চান্য লৌহেষ্বপি তস্য কৌণ্ঠ্যম্॥"

অর্থ এই যে, যিনি শ্রীবৃদ্ধি ইচ্ছা করেন, তিনি শস্ত্রকে রুধির পান করাইবেন। অর্থাৎ শস্ত্রের ধারা দগ্ধ করিয়া রুধিরে নিক্ষেপ করিবেন। (১) আর যিনি গুণবান পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক তিনি শস্ত্রকে ঘৃত পান দিবেন। (২) এবং যিনি অক্ষয় ধন কামনা করেন, তিনি অসিকে জলপান করাইবেন(৩)এইরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত অসিকে ঘোটকীর দুগ্ধ, উষ্ট্রের দুগ্ধ, হস্তিনীর দুগ্ধও পান করাইবেন (৪।৫।৬) আর যদি হস্তীর শুণ্ড কাটিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি অস্ত্রকে মৎস্যের পিত্ত, মৃগীর দুগ্ধ, কুক্কুরের দুগ্ধ ও ছাগীর দুগ্ধ পান করাইবেন। (৭।৮।৯।১০) (জনশ্রুতি আছে যে, মহারাণা প্রতাপসিংহের নাকি এতদ্রূপ তরবারি ছিল।) আকন্দের আটা, হড়ু বিষাণ (?), কয়লা, পারাবত ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্রিত ও মর্দ্দিত করিয়া তৈল মথিত শস্ত্রের ধারে প্রলেপ দিবেক। অনন্তর তাহাকে পূর্ব্বোক্ত কোন দ্রব্য পান করাইবেক। পরে তাহাকে সুশাণিত করিবেক। এইরূপ করিলে সে অস্ত্র প্রস্তরেও কুণ্ঠিত হইবে না। অর্থাৎ পাথরে চোট মারিলে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইবেক; ভাঙ্গিয়া যাইবে না। (১১) অপিচ অস্ত্র কদলী ক্ষারে অক্ষিত করিয়া একদিন এক রাত্রি রাখিবেক। পশ্চাৎ তাহাতে পান্ দিয়া উত্তমরূপে শাণিত করিবেক। এইরূপ করিলেও সে অস্ত্র প্রস্তরে ভাঙ্গিবে না এবং অন্য লৌহেও কুণ্ঠিত হইবে না।(১২)

এইরূপ আরও কয়েক প্রকার পায়ণবিধি আছে, পরন্তু সে সকল তীরের ফলার জন্য বিহিত। বিষ কিম্বা বিষবৎ দ্রব্য পান

করাইলে অস্ত্র অতি ভীষণাকার ধারণ করে। বিষ পায়িত অস্ত্রের দ্বারা অত্যল্প রক্তপাত ঘটনা হইলেই তথা প্রাণসংহারক হইয়া উঠে।

অস্ত্রের পান্ দিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গন্ধ বহির্গত হয়। সেই সকল গন্ধের দ্বারা অস্ত্রের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ জানা যায় বলিয়া বর্ণিত আছে। এবং পানের সময় অস্ত্রকে যে দগ্ধ করিতে হয়, তৎ-কালের যে বর্ণ বা রঙ হয়, তাহা দেখিয়াও ভবিষ্যৎ শুভাশুভ অনুমিত হয়। যথা——

"করবীরোৎপল গজমদ
ঘৃত কুঙ্কুম কুন্দ চম্পক সগন্ধঃ।
শুভদোহনিষ্টো গোমূত্র
পঙ্কভেদঃ সদৃশ গন্ধঃ॥
কূর্ম্মবসাসৃক্ ক্ষারোপমশ্চ
ভয় দুঃখদো ভবতি গন্ধঃ।
বৈদূর্য্য কণক বিদ্যুৎ প্রভো
জয়ারোগ্য বৃদ্ধি করঃ॥"

করবীর, উৎপল, হস্তিমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম, কুঁদফুল ও চাঁপাফুলের ন্যায় গন্ধ নির্গত হইলে জানিবে যে, সে অস্ত্র শুভদায়ক হইবে। আর যদি গোমূত্র কিংবা পঙ্ক ঘটন, কূর্ম্ম, বসা, রক্ত, কিম্বা ক্ষীর তুল্য কোন গন্ধ বহির্গত হয়, তবে জানিবে যে, সে অস্ত্র অশুভদায়ক। দাহকালে যদি বৈদূর্য্য, কণক কি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা বহির্গত হয়, তাহা হইলে সে অস্ত্র জয় ও আরোগ্য বৃদ্ধি করিবে। নচেৎ অশুভ বৃদ্ধি করিবে। এ সকল কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই, পরন্তু প্রাচীনদিগের মতামত বর্ণন করিবার জন্যই এ সকল সঙ্কলন করিলাম। অপিচ অসি সম্বন্ধে আরও কয়েকটী লক্ষণানুযায়ী নাম আছে, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

১ ধবল গিরি।

"রূপ্যায়ত সমা ভূমিরঙ্গং শ্বেতং প্রতীয়তে।
ং ধবল গিরিং পাণ্ড্যং পাণ্ডিজ্ঞাঃ প্রবদন্তিহি॥"

পাণ্ড্য লৌহজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, যাহার ক্ষেত্র রূপার ন্যায় ও অবয়ব শুভ্র, তাহা পাণ্ড্য লৌহ সমুদ্ভব এবং তাহার নাম ধবলগিরি।

২ কাল গিরি॥

"তন্বী পত্রাবলী কালা সৌবর্ণাঙ্গাসি পত্রিকা।
প্রাহুঃ কালগিরিঃ পাণ্ডি লৌহ শাস্ত্রবিশারদাঃ॥"

যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্বর্ণাকার অথবা কৃষ্ণাভযুক্ত পত্র ভাঙ্গাকার চিহ্ন দেখা যায়, তাহার নাম কালগিরি; ইহা লৌহ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন।

৩ কজ্জল গাত্র॥

"ধারা শুভ্রা ভবেৎ যস্য মধ্যং কজ্জল সন্নিভম্।
কৃষ্ণরঙ্গৈশ্চিতং গাত্রং বিদ্যাৎ কজ্জলগাত্রকম্॥"

যাহার ধার শুভ্রবর্ণ, মধ্যে কজ্জলবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে কাল দাগ, তাহাকে কজ্জল গাত্র বলিয়া জানিবে।

৪ কুটীরক।

"সূক্ষ্মং রজত পত্রাভমঙ্গং কৃষ্ণাসি পত্রিকা।
কুটীরকঃ সমাখ্যাতা তৎক্ষতে শ্বয়থুর্ভবেৎ॥"

যাহার অঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রজত পত্রের চিহ্ন থাকে অথচ কৃষ্ণবর্ণ এতাদৃশ অসি পত্রিকা কুটীরক নামে খ্যাত। এই কুটীরক অসির দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরে শ্বয়থু অর্থাৎ শোথ জন্মে।

৫ কেতকী বজ্র।

"কেতকী পত্র সদৃশমঙ্গং যস্য প্রতীয়তে।
বিদগৎ কেতকং বজ্রংতৎ———॥"

যদঙ্গে কেতকী পত্রাকার চিহ্ন থাকে—সে অসির নাম কেতক বজ্র।

৬ কান্তি লৌহ বা নিরঙ্গ।

"নিরঙ্গং রৌপ্য পত্রাভমীষন্নীল নিভঞ্চ যৎ।
দুর্ল্ভং তন্মহামূল্যং কান্তি লৌহং প্রচক্ষতে॥"

যাহা কান্ত লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত ও যদঙ্গে রৌপ্য পত্রাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয় এবং বর্ণ অল্প নীল—এরূপ অসি দুর্ল্ভ ও মহামূল্য।

৭ দমন বজ্র॥

"অঙ্গং দমন পত্রাভ সঙ্গে যস্মিন্ প্রতীয়তে।
বিদ্যাদ্দমন বজ্রন্তু তীক্ষ্ণধারং মহাগুণম্॥"

যাহার অঙ্গে দমন পত্র অর্থাৎ দোনা নামক বৃক্ষের কিম্বা কুন্দ বৃক্ষের পত্রাকার চিহ্ন জন্মে—তাহার নাম দমন বজ্র। এই দমন বজ্র অসি প্রায়ই তীক্ষ্ণধার ও মহাগুণশালী হয়।

৮ কাল-খড়্গ॥

"কৃষ্ণ ভূমিস্সুবর্ণাভ মীষৎ বজ্রাঙ্গ সংগতম্।
ডাহুনীবজ্রকং বিদ্যাৎ কাল সংজ্ঞ মথাপরে॥"

যাহার ক্ষেত্র কাল, পরন্ত তাহার আভা যদি সুবর্ণ বর্ণ হয়, আর যদি তাহাতে অল্প বজ্র চিহ্ন থাকে, তবে তাহাকে "ডাহুনী বজ্র" বলিয়া জানিবে। কেহ বলেন, এতদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত খড়্গের নাম "কাল খড়্গ"।

৯ নকুলাঙ্গ॥

"উর্দ্ধগং কপিলাভাসমঙ্গং যস্মিন্ প্রতীয়তে।
নকুলাঙ্গন্ত তং বিদ্যাৎ স্পর্শ শুস্যাহি নাশনম্॥"

যাহার অঙ্গে উর্দ্ধগামী কপিল দ্যুতি দৃষ্ট হয়—তাহার নাম নকুলাঙ্গ। এই নকুলাঙ্গ অসির স্পর্শে সর্পও প্রাণত্যাগ করে।

১০ ক্ষুদ্র বজ্র॥

"আসীকা মালিকা যস্ত ক্ষুদ্রাঙ্গং কুণ্ডলীকৃতম্।
ক্ষুদ্র বজ্রক নামানং প্রাহ নাগার্জুনোমুনিঃ॥"

যাহার শরীরে কুণ্ডলীকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসীকামালা দৃষ্ট হয়—নাগার্জুন মুনি তাহাকে ক্ষুদ্র বজ্র নামে প্রখ্যাত করেন।

১১ মহৎ॥

"অন্তর্গাঢ়ং চিহ্ন হীনং বিশালং
মধ্যে স্থূলং স্থূলধারাতি তীক্ষ্ণম্।
রক্ষোবক্ষঃ চ্ছেদনার্থং মহান্তম্
কৃত্বা খড়্গাং দেব রাজোহতি হৃষ্টঃ॥"

যাহার অন্তর্ভাগ অতি গাঢ় অর্থাৎ কঠিন, গাত্র সর্ব্বপ্রকার চিহ্ন বর্জিত, মধ্যদেশ স্থূল, ধারও স্থূল, কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ,—দেবরাজ ইন্দ্র রাক্ষসগণের বক্ষ বিদারণের নিমিত্ত এতদ্রূপ মহান খড়্গ নির্ম্মাণ করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন।

১২ বামনাক্ষ॥

"বামনাক্ষং মহান্তস্তু যেন তন্তুর্ন জায়তে।
ছেদে গাঢ়ং চিহ্ন হীনংপ্রাহুঃ খড়্গাং বিচক্ষণাঃ॥"

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, অত্যন্ত গাঢ় অথচ যে মহান্ খড়্গ ছেদকালে যাহা ছেদ্য বস্তুতে তন্তু সৃষ্টি করে না, এবং যাহার অঙ্গে কোন চিহ্ন থাকে না, তাদৃশ খড়্গের নাম বামনাক্ষ।

১৩ মহিষাখ্য॥

"এরণ্ডবীজ প্রতিমমঙ্গং যস্মিন্ প্রতীয়তে।
মহিষাখ্যঃ সবৈ খড়্গো নীল মেঘ সমচ্ছবিঃ॥"

যে খড়্গের গাত্রে এরণ্ডবীজের ন্যায় চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং যাহার দীপ্তি নীল মেঘের ন্যায়, এতাদৃশ খড়্গের নাম মহিষাখ্য।

১৪ অঙ্গপত্র॥

"ধৃষ্টে যস্মিন্ ভবেৎ খড়্গো শরীরং প্রতিবিম্বিতম্।
অঙ্গ পত্রাভিধং খড়্গাং প্রাহুঃ খড়্গ বিচক্ষণাঃ॥"

খড়্গাকে মার্জন করিলে যদি তাহা দর্পনের ন্যায় শরীর প্রতিবিম্ব ধারণ করে—তবে তাহাকে খড়্গাতত্ত্ব নিপুণ পণ্ডিতেরা অঙ্গপত্র নামে উল্লেখ করেন।

১৫ গজবজ্র ॥

"যস্যাঙ্গে স্থূলরেখা ঘন মসৃণ রুচিঃ
সর্ব্বতো ব্যাপ্য তিষ্ঠেৎ
ধারা তীক্ষ্ণাতি সূক্ষ্মা প্রবিশতি রুধির
স্পর্শ মাত্রেণ খড়্গঃ।
যস্যাম্ভঃ পীয়মানং শময়তি নিখিলং
ব্যাধি মাধিং সমগ্রাং
বৈরি শ্রেণীং * * প্রবদতি গিরিশো
বজ্রমেতৎ গজাদি ॥,,

যাহার অঙ্গে স্থূলরেখা, অঙ্গরুচি অতি ঘন ও মসৃণ, ধার অতি তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম, রক্ত স্পর্শ মাত্রে যাহা অভ্যন্তর প্রবিষ্ট হয়, যাহার অঙ্গ ধৌত জলপান করিলে আধি-ব্যাধি বিনষ্ট হয়, দেবাদিদেব গিরিশ তাহাকে গজবজ্র নামে অভিহিত করেন।

বিভিন্ন দেশীয় অসির গুণাগুণ।

অসি সকল দেশে সমান হয় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত অসি উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যে যে দেশে যে যে প্রকারের অসি নির্ম্মিত হইত, তত্তাবতের তালিকা এই—

"লৌহং প্রধানং খড়্গার্থং প্রশস্তং তদ্বিশেষতঃ
খট্টা খট্টের ঋষিক বঙ্গ শূর্পারকেষু চ ॥
বিদেহেষু তথাঙ্গেষু মধ্যমগ্রাম বেদিষু।
সহগ্রামেষু চীনেষু তথা কালঞ্জরেষু চ ॥

অনেক প্রকার লৌহ আছে, পরন্ত তন্মধ্যে যাহা প্রধান অর্থাৎ উৎকৃষ্ট, তাহাই খড়্গের নিমিত্ত প্রশস্ত। খড়্গ নির্ম্মাণের লৌহ, ঔষধার্থ লৌহ হইতে স্বতন্ত্র এবং তাহার উৎকৃষ্টতাপকৃষ্ট বিচারও পৃথক। বিশেষতঃ খট্টী, খট্টের, ঋষিক, বঙ্গ, শূর্পারক, বিদেহ, অঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, চীন, কালঞ্জর, এই সকল স্থানে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অত্যন্ত প্রশস্ত।

খট্টা খট্টের জাতা যে দর্শনীয়াস্ত তে মতাঃ"

খট্টা ও খট্টর দেশজাত অসি সকল অত্যন্ত সুদৃশ্য জানিবে।

"কায়াচ্ছিদস্ত্বষিকা যে মর্ম্মজ্ঞা গুরবস্তথা।"

ঋষিক দেশ প্রভব অসি শরীরচ্ছেদ করিতে সমর্থ এবং গুরুভারযুক্ত। ঋষিক দেশ হিমালয়ের উত্তরভাগে ছিল।

"তীক্ষ্ণাশ্ছেদসহা বঙ্গা দৃঢ়াঃ শূর্পারকোদ্ভবাঃ।"

বঙ্গদেশ জাত অসি তীক্ষ্ণ ও ছেদ্দ ভেদে পটু এবং শূর্পরিক দেশীয় অসি সমধিক কঠিন। (লৌহিত্য নদীর পশ্চিমে অঙ্গ দেশের পূর্ব্বে বঙ্গ দেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে উহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। বর্ত্তমান দ্বারকার উত্তর পশ্চিম ভাগে শূর্পারক দেশ অবস্থিত ছিল)।

"অসহাশ্চৈব বিজ্ঞেয়াপ্রভাবন্তো বিদেহজাঃ।"
"অঙ্গদেশোদ্ভবাস্তীক্ষ্ণাঃ—————— ॥"

বিদেহ দেশ জাত অসি প্রভাবশালী ও অসহ্য তেজস্বী। বর্ত্তমান ত্রিহুত দেশকে বিদেহ বলিত। অঙ্গ দেশ জাত অসি তীক্ষ্ণ ও দৃঢ়। বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা ও চম্পারণ প্রভৃতি স্থান পূর্ব্বে অঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

"লঘবশ্চ তথা তীক্ষ্ণা মধ্যমগ্রাম সম্ভবাঃ।"

মধ্যমগ্রাম সম্ভূত অসি লঘুভার ও তীক্ষ্ণ। (এই মধ্যমগ্রাম এক্ষণে কোথায় তাহা নির্ণয় হয় না)।

"অসারা লঘবস্তীক্ষ্ণা বেদিদেশ সমুদ্ভবাঃ"

বেদিদেশ প্রভব খড়্গ হালকা, তীক্ষ্ণ, কিন্তু সারহীন। (পঞ্জাব ও কনোজ্ প্রভৃতি দেশের অংশ বিশেষকে বেদী দেশ বলিত।)

"সহগ্রামোদ্ভবাঃ খড়্গাঃ সুতীক্ষ্ণা লঘবস্তথা।"

সহগ্রাম জাত খড়্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, লঘু, অর্থাৎ হাল্কা। সহগ্রাম এক্ষণে অপরিচিত অবস্থায় আছে।

"নির্ব্বা নির্ম্মলা স্তীক্ষ্ণাশ্চীনদেশ সমুদ্ভবাঃ।"

চীনদেশীয় খড়্গ অত্যন্ত নির্ম্মল ও তীক্ষ্ণ। চীনদেশ আজিও সমভাবে পরিচিত আছে।

"কালঞ্জরাঃ কালসহা স্তীক্ষ্ণাশ্চ লক্ষণান্বিতাঃ।"

কালঞ্জর পর্ব্বতের সন্নিহিত দেশে যে সকল খড়্গ উৎপন্ন হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও সুলক্ষণযুক্ত। কালঞ্জর পর্ব্বত প্রয়াগের অনেক দূর দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আছে।

পরিমাণ ॥

৪ অঙ্গুলি পরিসর ও ৫০ অঙ্গুলি লম্বা অসি শ্রেষ্ঠ এবং ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ হইলে তাহা মধ্যম। ২৫ অঙ্গুলের ন্যূন হইলে তাহাকে অসি না বলিয়া অসিপুত্র বলা যায়। এইরূপ বিস্তারে ২ অঙ্গুলের ন্যূন হইলেও তাহা অসি নামে গণ্য হইবে না। বৃহৎ শার্ঙ্গধর, আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ ও বৈশম্পায়-নোক্ত ধনুর্ব্বেদ,—সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। যথা—

"শতার্দ্ধমঙ্গুলানাস্তু খড়্গং শ্রেষ্ঠং প্রকীর্ত্তিতম্।
তদর্দ্ধং মধ্যমং জ্ঞেয়ং ততো হীনং ন কারয়েৎ॥"
"পঞ্চাশদঙ্গুলোৎ সেধশ্চতুরঙ্গুল বিস্তৃতঃ।"

কেহ কেহ বলেন যে, ৩০ অঙ্গুলের অধিক দীর্ঘ অসি নিংস্ত্রিংশ নামে খ্যাত ও তাহাই উত্তম। বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থেও এই-রূপ লিখিত আছে। যথা—

"অঙ্গুলশতার্দ্ধমুত্তম উনঃস্যাৎ পঞ্চবিংশতিং খড়্গঃ।"

গঠন ॥

পদ্ম পুষ্পের পাবড়ীর অগ্রভাগ যেরূপ, অসির অগ্রদেশ যদি সেইরূপ গঠনের হয়, তবে সে অসি উত্তম এবং করবীর পত্রের তুল্যাকার হইলে, তাহা তদপেক্ষা উত্তম। যাহার অগ্রভাগ মণ্ডলাকার অর্থাৎ সুগোল কিম্বা কিঞ্চিৎ বক্র—সে অসি তত প্রশস্ত নহে। যথা—

"খড়্গঃ পদ্মপলাশাগ্রোহ মণ্ডলাগ্রাশ্চ শস্যতে।
করবীর পলাশাগ্র সদৃশশ্চ বিশেষতঃ॥"

মণ্ডলাগ্র অসি এক্ষণে "বগী" নামে খ্যাত। কোন কোন অস্ত্রবিৎ যোদ্ধা ইহাকেও প্রশংসা করিয়া থাকেন। বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থেও ইহার এবং অন্যান্য প্রকার খড়্গের প্রশংসা আছে। যথা—

"গোজিহ্বা সংস্থানো নীলোৎপল বংশপত্র সদৃশশ্চ।
করবী পত্র শূলাগ্র মণ্ডলাগ্রাঃ প্রশস্তাঃ ভুঃ।"

গোজিহ্বা, সুঁদী নাইল্ ফুলের পাবড়ি, বাঁশের পাতা, করবীর ফুলের পাতা ও শূলের অগ্রভাগের তুল্যাকার খড়্গ ও মণ্ডলাগ্র খড়্গ প্রশস্ত অর্থাৎ উত্তম।

ধ্বনি ॥

আঘাত করিলে যদি কাক-স্বরের ন্যায় কর্কশ ধ্বনি বা শব্দ উত্থিত হয় কিম্বা অং—ইত্যাকার শব্দ হয়, তবে সে তরবারি রাজাদিগের পরিত্যাজ্য। পরন্তু যাহার শব্দ মধুর, কিঙ্কিনী ধ্বনি সদৃশ অর্থাৎ কন্-কনে এবং দীর্ঘ অর্থাৎ বহুক্ষণ স্থায়ী,—সেই খড়্গই শ্রেষ্ঠ খড়্গ—এবং রাজারা এতদ্রূপ খড়্গই ধারণ করিবেন। যথা—

"আহতে যত্র খড়্গোস্যাৎ ধ্বনিঃ কাকস্বরোপমঃ।
অং-আকার ধ্বনির্বস্যা ৎ স বর্জ্জ্যো নরপুঙ্গবৈঃ॥"
"দীর্ঘঃ সুমধুরঃ শব্দো যস্য খড়্গস্য ভার্গব!
কিঙ্কিনী সদৃশস্তস্য ধারণং শ্রেষ্ঠ মুচ্যতে॥"

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর, অগ্নিপুরাণ ও কল্পদ্রুমধৃত যুক্তি কল্পতরু গ্রন্থে খড়্গ সম্বন্ধে কতকগুলি সুচিহ্ন কুচিহ্নের কথা আছে, তাহা পশ্চাৎ বলা যাইবে। তৎপশ্চাৎ খড়্গ যুদ্ধের সঞ্চরণ মার্গ অর্থাৎ গতি সকল

বলা যাইবে। এক্ষণে বৃহৎ সংহিতার লিখিত বর্ণাদি দোষ এবং শার্ঙ্গধরের লিখিত খড়্গের কোষ ও তাহার পূজা প্রভৃতি কয়েক প্রকার অবান্তরিত বিষয় বলা যাইতেছে।

"অঙ্গুলমাসাজ্ জ্ঞেয়ো ব্রণোঽশুভৌ বিষম পর্ব্বস্থঃ।"

শ্রীবৃক্ষোবর্দ্ধ মানাত পত্র শিবলিঙ্গ কুণ্ডালা-জানাম্॥

সদৃশাঃ ব্রণাঃ প্রশস্তা ধ্বজায়ুধ স্বস্তিকানাঞ্চ॥"

"কৃকলাস কাক ক্রব্যাদ কবন্ধ বৃশ্চিকাকৃতয়ঃ।
খড়্গে ব্রণা ন শুভদা বংশানুগাঃ প্রভূতাশ্চ॥"

"স্ফুটিতোহ্রস্বঃ কুণ্ঠোবংশচ্ছিন্নোন-দৃঙ্মনোনুগতঃ।
অস্বন ইতি চানিষ্টঃ প্রোক্তাবিপর্য্যস্তইষ্টফলঃ॥"

কণিতং মরণায়োক্তং পরাজয়ায় প্রবর্ত্তনংকোশাৎ।
বয়মুদ্গীর্নে যুদ্ধং জ্বলিতে বিজয়ো ভবতি খড়্গে॥"

"নাক্কারণং বিবৃয়োন্ন চি ঘট্টয়েচ্চ।
পশ্যেন্ন তত্র বদনং ন বদেচ্চ মূল্যম্॥"

"দেশং ন চাস্য কথায়ৎ ন প্রতিমানয়েচ্চ
নৈবস্পৃশেৎ নৃপতির প্রয়য়োঽসি যষ্টিম॥"

"নিষ্পন্নো নাচ্ছদ্যো নিকষৈঃ কার্য্যঃ প্রমাণযুক্তঃ সঃ।
মূলে ম্রিয়তেস্বামী জননী তস্যাগ্রতশ্ছিন্নে।"

"কাকোনুক সদর্থাভা বিষমাঙ্গুলি সংস্থিতাঃ।
বংশানুগাঃ প্রশস্তাশ্চ ন শস্তাস্তে কদাচন।"

"খড়্গং প্রশস্তং মণিহেমযুক্তং
কোষে সদা চন্দনচূর্ণযুক্তম্।
সংস্থাপয়েৎভূমিপতিঃ প্রযত্নাৎ
রক্ষেৎতথৈ ন স্বশরীর যচ্চ॥"

"শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ভাষিতানি
চিহ্নানি খড়্গস্য শুভাশুভানি।
বিজ্ঞায় ভূমি পতয়ঃ সদৈব
সন্ধারয়েয়ুং সমুদে কৃপাণম্॥"

অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি অঙ্গুল হইতে শতার্দ্ধ অঙ্গুল পর্য্যন্ত খড়্গ নির্ম্মাণ করিলে, যদি তাহাতে ব্রণ অর্থাৎ চিহ্ন বিশেষ উৎপন্ন হয়, তবে তাহার শুভাশুভ লক্ষণ অঙ্গুলি পরিমাণ দ্বারা নির্ণয় করিবেক। বিষমাঙ্গুলি স্থানে চিহ্নপাত হইলে, তাহা অশুভ বলিয়া স্থির করিবেক। চিহ্ন অনেক প্রকার হইতে পারে, পরন্তু তন্মধ্যে শ্রীবৃক্ষ, বর্দ্ধমান, পর্ব্বত, ছত্র, শিবলিঙ্গ, কুন্তল, পদ্ম, ধ্বজ, কোন প্রকার অস্ত্র ও স্বস্তিক অর্থাৎ ত্রিকোণ তুল্য চিহ্নই শুভদায়ক। আর কৃকলাস (গিড়গিটে) কাক, কাঙ্কপক্ষী, মাংসাশী জন্তু, মস্তকশূন্য জীব ভয়দায়ক হয়। স্ফুটিত ভাঙ্গা অথবা সচ্ছিদ্র, হ্রস্ব, কুণ্ঠ এবং দেখিতে কুদৃশ্য ও মনের বিরক্তিজনক ও শব্দবর্জিত,—এরূপ খড়্গ অনিষ্টকারী হয়। খড়্গে যদি অকস্মাৎ শব্দ জন্মে, তবে জানিবে যে তাহা মরণের উপদেশ করিতেছে। খড়্গ যদি আপনা আপনি কোষ হইতে বহিরাগত হয়, তবে জানিবে যে নিশ্চিত পরাজয় হইবে। খড়্গ যদি বিনা কারণে উদ্গীর্ণ হয়, তবে জানিবে যে শীঘ্রই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং খড়্গ যদি আপনা আপনি অত্যন্ত প্রজ্বলিত হয়, তবে জানিবে যে যুদ্ধে জয় হইবে।

বিনা কারণে অসিকে উলঙ্গ করিবে না। বিনা কারণে অসিকে ঘর্ষণ করিবে না। খড়্গগাত্রে আত্ম প্রতিবিম্ব অবলোকন করিবে না। উত্তম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইলে বিনা প্রয়োজনে অসির মূল্য ব্যক্ত করিবে না। কোন্ দেশের অসি তাহাও বলিবেক না। কোনও সময়েই অসিকে অসম্মান করিবেক না। রাজা অশুচি হইয়া

অসি দৃষ্টি স্পর্শও করিবেন না। নির্ম্মাণের পর বিষমাঙ্গুলি হইল দেখিয়া সমাঙ্গুলি করিবার জন্য তাহাকে ছিন্ন করিবে না। নির্ম্মাণের পর সমাঙ্গুলি করিতে হইলে শান যন্ত্রের দ্বারা ইচ্ছামত প্রমাণযুক্ত করিবে। যদি মূলভাগ ছিন্ন করা হয়, তবে সে অসি ধারণ করিলে মৃত্যু হইবে। যদি অগ্রভাগে ছিন্ন করা হয়, তবে সে অসি ধারণ করিলে জননীর মৃত্যু দেখিতে হইবে। কাক, উলুক, কি বসার ন্যায় আভাযুক্ত, বিষমাঙ্গুলি পরিমাণ (বিযোড় অর্থাৎ ৪।৯।১৭ইত্যাদি) ও বংশানুগ অসি কোন কাযেই শুভদায়ক হয় না। উত্তম অসিকে মণি ও স্বুবর্ণ ভূষিত ও চন্দনচূর্ণযুক্ত করিয়া সদা সর্ব্বদা কোষ মধ্যে রক্ষা করিবেক। যেরূপ নিজের শরীর যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়, রাজা সেইরূপ অসিকেও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। পদ্ধতি ও যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে খড়্গ সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা বার্ত্তা আছে। তত্ত্বাবতের সার সংগ্রহরূপ এই প্রস্তাব। এবারে এই স্থানেই শেষ করা গেল। ভবিষ্যতে ইহার অবশিষ্ট কার্য্যগুলি অর্থাৎ যুদ্ধকালে ইহা কিরূপে ব্যবহৃত হয়, সে গুলি বর্ণন করা যাইবেক। ক্রমশঃ

শাক্য চরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ দর্শন।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষপাতী। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত সমাজেও আজি কালি বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তর আলোচনা হইতেছে। এক সময়ে পাশ্চাত্য মহাদেশে বেদের যেরূপ চর্চ্চা হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা বেদজ্ঞান প্রচারের যেরূপ সহায়তা হইয়াছে, এখন বৌদ্ধধর্ম্মের সেইরূপ চর্চ্চা হইতেছে, এবং কালে বেদজ্ঞানের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ দর্শনের অনেক গূঢ় রহস্য পাশ্চাত্য সমাজে প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়। এক সময়ে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর যত স্থানে এবং যত লোকের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল, কোন কালে কোন ধর্ম্ম কোন দেশে সেরূপ বহু বিস্তার লাভ করে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে যত লোকের বিশ্বাস, অদ্যাপি আর কোন ধর্ম্মের উপাসক তত হয় নাই। পৃথিবীর তৃতীয়াংশ লোক এখনও বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস করে। ধর্ম্ম বিশ্বাস মত পৃথিবীর অধিবাসী সকলকে এইরূপে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধ	... শতকরা ...	৩১. ২ জন
খৃষ্টান	... ,, ...	৩০. ৭ ,,
মুসলমান	... ,, ...	১৫. ৭ ,,
হিন্দু	... ,, ...	১৩. ৪ ,,
পৌত্তলিক	... ,, ...	৮. ৭ ,,
য়িহুদী	... ,, ...	০. ৩

সভ্য পৃথিবীতে প্রাচীন কোন ধর্ম্ম যদি পুনরধিকার লাভে সমর্থ হয়, সে বৌদ্ধধর্ম্ম।

বৌদ্ধধর্ম্মের চর্চ্চা এখন বহুলভাবে, অধিকতর আগ্রহ, অধিকতর ধীরতা, একাগ্রতা ও গভীরতার সহিত সিদ্ধ হইলেও আজি কালি নূতন আরম্ভ হয় নাই। প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে একজন যুবক কার্য্যোপলক্ষে অজ্ঞাত অপরিচিত পার্ব্বত্য নেপাল প্রদেশে প্রেরিত

হইয়াছিলেন। তিনি সেখানে যে সকল হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া ইয়ুরোপে প্রেরণ করেন, তাহা দেখিয়া অবধি সভ্যদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের চর্চ্চা বিশেষ রূপে আরম্ভ হইয়াছে। সেই যুবকের নাম ব্রায়ান হাউটন হজসন। হজসন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সরকারে প্রবেশ করেন। কয়েক বৎসর এদিক ও-দিক ঘুরিয়া এবং কিছুদিন নেপালের সহ-কারী রেসিডেণ্ট থাকিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পাকা রেসিডেণ্ট রূপে নিযুক্ত হন। তিনি দশ বৎসর এই কার্য্য করিয়া পেন্সন লইয়া স্বদেশে চলিয়া যান। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করেন। নানাবিধ বিদ্যা চর্চ্চায় দার্জ্জিলেঙ্গে তাঁহার নয় বৎসর কাটিয়া যায়। স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য এত বয়সে বিদেশে আসিয়া নয় বৎসর কত জনে বাস করিতে পারে? নেপালে থাকিবার সময় হজসন ৩৮১ তোড়া হস্তলিপি সংগ্রহ করেন। এক এক তোড়ায় কতগুলি পুথি ছিল, এবং ইহাদের মধ্যে কতগুলি একই পুস্তক, অদ্যাপি জানা যায় নাই। ঐ সকল পুস্তক হজসন চারিদিকে বিতরণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে ৮৫, লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে ৮৫, ইণ্ডিয়া আফিসের পুস্তকালয়ে ৩০, অক্স-ফোর্ড বোডলিয়ান লাইব্রেরিতে ৭ এবং পারিস এসিয়াটিক সোসাইটিতে ১৭৪ তোড়া দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের মতও বিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি এসিয়াটিক রিসা-র্চ্চেস্ এবং এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে অনেকগুলি প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। হজ-সনের পূর্ব্বে ইয়ুরোপীয়েরা চীন জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাইয়াছিলেন সত্য বটে, কিন্তু হজসন গোলকুণ্ডা হইতে যে সময়ে হীরক লইয়া তাঁহাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন, তদ-বধি ইয়ুরোপে প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। যে সময়ে হজসন তাঁহার পুস্তক সকল এসিয়াটিক সোসাইটিতে উপহার দেন, ঠিক সেই সময় কসমা ডি কোরোস নামে হঙ্গেরি দেশীয় একজন ভ্রমণকারী মঙ্গোলিয়া তিব্বত প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ভাল রূপে শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিস্তর বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতদেশীয়েরা আপনাদিগের ভাষায় অনুবাদ করিয়াছে, তাহারা সেই সকল গ্রন্থকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বস্তানজ্যুর ও কাজ্যুর নামে অভিহিত করে। হঙ্গেরির পর্য্যটক এই সকল গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া এসিয়াটিক রিসার্চে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারই অব্যবহিত পরে রুসিয়ান অধ্যাপক স্মিত সাহেব মোগল ভাষায় অনুবাদিত কতকগুলি বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং টর্ন্র্যর সাহেব সিংহল হইতে কতকগুলি পালি বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ইয়ুরোপে প্রেরণ করেন। ওদিকে হজসন প্রেরিত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া ফরাসী প্রত্নবিৎ বর্ন্ফ "বৌদ্ধধর্ম্ম" নামে এক-খানি গ্রন্থ ফরাসী ভাষায় রচনা করেন এবং "সদ্ধর্ম্ম" পুণ্ডরিক নামে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। টর্ন্র্যরের পরে গোগার্লি ও হার্ডি সাহেব সিংহলের পালিগ্রন্থ হইতে যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক কয়েক খানি পুস্তক প্রচার করেন, তেমনি সেণ্ট হিলেয়ার সাহেব ফরাসী ভাষায় আর কয়েক খানি পুস্তক লিখেন, হজসনের মত

শ্রীমলট সাহেব সিংহল হইতে অনেক গুলি পুথি সংগ্রহ করিয়া পারিসের পুস্তকালয়ে উপহার দিয়াছিলেন। ক্রমে ব্রহ্মদেশ ও চীন হইতেও অনেকগুলি পুস্তক সংগৃহীত হয়। খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে অনেক গুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সটানিস্‌লাস জুলিয়েন নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত চীন ভাষা হইতে হুয়েন্থসাঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা য়ুরোপে প্রচারিত হয়। কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত পর্য্যটকেরা বিদেশে বৌদ্ধ মত ও আচরণ সম্বন্ধে যাহা যাহা দেখিয়াছিল, তাহাই কিয়ৎ পরিমাণে য়ুরোপে ঘোষণা করিয়াছিল। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম দেখিয়া বৈদিক ধর্ম্মের কল্পনা করা যেমন বিড়ম্বনা, বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিয়া শাক্যমুনির ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোন অনুমান করা তেমনি বিফল। তখনও মূলগ্রন্থ পড়িয়া অতি অল্প লোকেই আপন মতামত প্রকাশ করিত। অধুনা একদিক হইতে যেমন সংস্কৃত ও পালি, চীন ও জাপান ভাষায় রচিত মূলগ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে, রাজেন্দ্রলাল, বিল, ওল্‌ডেনবর্গ রিস ডেবিস, ফসবোল প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তেমনি মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল সূত্র সকলের রহস্য বিচার করিতেছেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস কি, এখন যত সাহসের সহিত বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বে তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সাংখ্যদর্শনের সম্বন্ধ কি? ইহা একটী অতি সুন্দর প্রশ্ন। মোক্ষমূলার সাংখ্যদর্শনকে শাক্যমুনির পরস্তন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার এ মতটী কতদূর সত্য তাহাও একবার বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। ডাক্তার ব্যালানটাইন্ ও হল, কাউয়েল ও গফ এবং রাজেন্দ্রলাল ও স্মরণীয় জয়নারায়ণের গুণে সাংখ্যদর্শন এখন আর দুষ্প্রাপ্য নহে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল পাতঞ্জলীয় যোগসূত্র প্রকাশিত ও অনুবাদিত করিয়া দেশের যে কত উপকার করিয়াছেন বলা যায় না। আবার যে গবেষণার সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন সকলের তুলনা করা হইয়াছে, দেখিলে কৃতজ্ঞ হইতে হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল হইতে সামান্য ইতিহাসকার পর্য্যন্ত বলিতেছেন, হিন্দুদিগের অত্যাচারে বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। এ কথাটীও সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কোন্ পথে কোন দেশে তাহারা চলিয়া গেল? তাহাদের বংশধরেরা এখন কোথায় কি ভাবে বাস করিতেছে, কি ভাষা ব্যবহার করিতেছে, কোন ধর্ম্ম পালন করিতেছে, এগুলি বড় সুন্দর প্রশ্ন। এ সকলেরও মীমাংসার চেষ্টা করিতে হইবে।

ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সংস্কৃত কোন কালে কথিত ভাষা ছিল কিনা সন্দেহ। থাকিলেও শাক্যসিংহের বহুপূর্ব্বে উহা পুস্তকের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। এই জন্য শাক্যসিংহ পালি ভাষায় কথা কহিতেন। অনেকে বলেন পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী অপেক্ষাকৃত সমিচীন। সংস্কৃত ভাষায় যে সকল বৌদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া যায়, সে সকল আধুনিক ও পালি ভাষা হইতে অনুবাদিত। এ কথাই বা কতদূর সত্য?

শাক্যসিংহের সময়ে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? কি হেতু এ ঘোর পরিবর্ত্তন সম্ভব হইল? হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ ছিল? রাজদরবারে বৌদ্ধধর্ম্মের কত আদর ছিল? নাগার্জ্জুন ও শঙ্করাচার্য্যের হস্তে বৌদ্ধধর্ম্মের কি গতি হইয়াছিল? এ সমস্তগুলিই দেখিতে হইবে।

এ সকল আনুষঙ্গিক কথা। বিদেশীয়গণ স্ব স্ব-স্বভাব-প্রণোদিত হইয়া, সহস্র চেষ্টা করিলেও, শিক্ষা ও অবস্থাদোষ-জাত ভ্রমান্ধকার একেবারে পরিহার করিতে পারিবেন, সম্ভব নহে। দেশীয়গণের চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত, বৌদ্ধধর্ম্ম কি গুণে এক সময়ে এত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস কি?—বৌদ্ধ দর্শনের সূত্র কি? লোকে বলে বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর নাস্তিক ধর্ম্ম। ঈশ্বর না মানিলে আবার ধর্ম্ম কি? মোক্ষমূলার বলেন, নির্ব্বাণ অর্থাৎ বিনাশই বৌদ্ধধর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য। কথাটা ভাল। নাস্তিকের উদ্দেশ্য বিনাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? রহস্য পরিত্যাগ করিলে, এত শিক্ষা, এত যোগ, এত সাধনা পতঙ্গবৎ বিনাশের জন্য? বৃদ্ধ পণ্ডিত গোল্‌ডষ্টুকর মৃত্যুশয্যায় উইল করিয়া গিয়াছেন, যেন ১৯২০ বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহার হস্তলিপি সকল কেহ মুদ্রিত বা প্রকাশিত না করেন। কি উদ্দেশ্যে?—কেন এ ভয়ঙ্কর অভিশাপ? সে যাহা হউক, পতঙ্গ যেমন মৃত্যুর লোভে অগ্নি সাধনা করে, বৌদ্ধ যতীগণ এত যোগ সাধনা কেবল বিনাশের লোভে করিতেন। পতঙ্গ ও মনুষ্য বুদ্ধির প্রভেদ নাই। এ গুরুতর কথাগুলির একবার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

আর শাক্যমুনির অপূর্ব্ব জীবন-চরিত স্বদেশীয়গণকে শুনাইতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন-চরিত সংগ্রহ করিলে তাহা যেমন প্রকৃত হয়, ললিত বিস্তর, মহাবস্তুবদান বা চীন আখ্যায়িকা হইতে বুদ্ধদেব-চরিত সংগ্রহ করিলে তাহাও তভই বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকে।

এই গুরুভার কার্য্য আমরা সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিব, সম্ভব নহে। তবে আমরা আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করিব, এই মাত্র। যে সকল বিষয় ভ্রমপূর্ণ, অস্ফুট বা অপক্ক থাকিবে, সময়ক্রমে উপযুক্ততর লোক সে সকল সংশোধিত ও পরিস্ফুট করিতে পারিবেন। একেবারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিতে পারিব না বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া আমাদের মতে বিধেয় নহে।

আমাদিগের পাঠকগণের নিকট এ গুরুতর কার্য্যে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি। যে স্থান দুষ্ট বা অস্পষ্ট বোধ হইবে, সেগুলি আমাদিগকে বলিয়া দিলে লেখক বাধিত হইবেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন সত্য কেহ সংগ্রহ করিয়া থাকিলে, লেখককে উপহার দিলে তিনি পরম আপ্যায়িত হইবেন।

ক্রমশঃ।

নবলীলা

প্রথম খণ্ড—প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূচনা।

ধীরে ধীরে সৃষ্টির কার্য্যকলাপ সমাধা হয়। বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, এ সকল ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়। যদু একদিন বালক ছিল, আজ বড় হইয়াছে, বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে, আজ যদু পৃথিবীর কত মহৎ কার্য্য সমাধা করিতেছে; ইহা একদিনে হয় নাই। আমিও একদিনে হই নাই, তুমিও এক দিনে হও নাই,—অনেক সময় গিয়াছে, তবে তুমি আমি মানুষ হইয়াছি। একদিনে কিছু তুমি 'তুমি' হও নাই, আমি 'আমি' হই নাই, আমাদের জন্মের পূর্ব্ব হইতে কত সময় পৃথিবী দিয়াছে, তবে তুমি 'তুমি' হইয়াছ, আমি 'আমি' হইয়াছি। এই সময়ের মধ্যে তোমার আমার কতবার পতন হইয়াছে, কতবার উত্থান হইয়াছে,—তবে আজ আমরা এই বর্ত্তমান অবস্থা পাইয়াছি। তোমার আমার কথা ছাড়িয়া দি,—ঐ সমাজ, ইহাও কতদিনের ফল—ইহার মধ্যেও কত উত্থান, কত পতন। বীজের পতন, বৃক্ষের উত্থান,—ফুলের পতন, ফলের উত্থান;—দেখ ঐ বীজ আর ঐ ফল, ইহার মধ্যে কত উত্থান, কত পতন;—এই উত্থান ও এই পতনের মধ্যে রহিল কি?—ঐ বৃক্ষ। আমার মধ্যে কি দেখি?—বালকের পতন, যুবকের উত্থান, যুবকের পতন—বৃদ্ধের উত্থান।—ইহাতে হইল কি? হইল—আমার জীবন। সমাজের উত্থান পতন আর গণনা করিব কি?—ইহার মধ্যে কত ঢেউ, কত উত্থান, কত পতন, মানব তাহা ভাবিতেও অক্ষম। ধীরে ধীরে উত্থান পতনের অভিনয় হয়—ধীরে ধীরে সৃষ্টির কার্য্য সমাধা হয়। কোন জাতি একদিনে উন্নত হয় নাই—কোন দেশ একদিনে সভ্য হয় নাই। সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া যে বড় হইতে চায়, সে মূর্খ। সুলোচনা এক দিন বালিকা ছিল—হাসিত, খেলিত, বেড়াইত, আজ সে যুবতী হইয়াছে,—আজ সে গম্ভীর হইয়াছে। জননীর চক্ষে আজও যেন সে বালিকা রহিয়াছে, কিন্তু পৃথিবীর চক্ষে সুলোচনা আজ যুবতী—স্থির বুদ্ধি। এক দিনে ইহা হয় নাই। কত উত্থান, কত পতন, কত পরিবর্ত্তনের পর আজ সুলোচনা যুবতী হইয়াছেন। সুলোচনা হিন্দুসমাজের কুক্ষিগত অন্ধকারের মধ্যে পরিপালিত, কিন্তু তবুও বুদ্ধি সুমার্জ্জিত,—ইহা একদিনে হয় নাই। অনেক শিক্ষায়, অনেক উপদেশে সুলোচনা আজ এইরূপ হইয়াছেন। ভাল মন্দ পৃথিবী বিচার করুক, আমরা সুলোচনার বর্ত্তমান অবস্থা যথাযথ বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হই।

"মা, আমি কখনই যাব না, যতই বল না কেন, আমি কখনই ঐ কুৎসিত স্থানে যাব না। দিদি যায় যাক্, কিন্তু আমি কোন

মতেই যাব না।” এই কথা বলিয়া সুলোচনা আজ কোমর বাঁধিয়া বসিয়াছেন। “যাবিনে, যাবিনে, যাবিনে?” তিনবার জননী কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুলোচনা পুনঃ ধীর-স্বরে বলিলেন,—না।

জননী ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, পাড়ার আর সকল মেয়ে ফল-বিয়ের বাড়ীতে কাদামাটীর জন্য মিলেছে, আমার মেয়ে হয়ে তুই সেখানে যাবিনে? আমার মেয়ে হয়ে তুই খ্রীষ্টানি মত লয়ে আপন জিদ্ বজায় রাখ্‌বি? তা কখনই হবে না, আজ তোর লেখাপড়ার সাধ মিটায়ে, খ্রীষ্টানি মত ভেঙ্গে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ! যে ঘরের মেয়ে, এ ঘরে খ্রীষ্টানি মত? এই বলিয়া জননী সুলোচনার কেশ ধরিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। সুলোচনা আর সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সুলোচনার ক্রন্দনের স্বর এবং মাতার প্রহারের শব্দ শ্রবণ করিয়া পাড়ার ছোট বড় সকল স্ত্রীলোক একত্রিত হইল। একত্রিত হইয়া সুলোচনার স্বভাব সমালোচনা আরম্ভ করিল।

একজন বলিল,—ওমা, এমন মেয়েত কখনও দেখিনি, সর্ব্বনাশী দেশের জাত্ মান্ সব ডুবালে! এ কুবুদ্ধি কে শিখালে?

একজন বলিল,—কে শিখালে, একথা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কেন? আমি তখনি বলেছিলাম—স্কুলে পড়্‌তে দিও না। ওত পড়াশুনা নয়, ও পরকাল নষ্ট করা। তা আমার কথা ত তখন ভাল লাগে নি! আজ আর দেখ্‌ছ কি? একে নিয়ে শেষ অনেক ভুগ্‌তে হবে।

একটী যুবতী বলিল,—লেখাপড়ার দোষ দিচ্চ কেন? আমরা কি লেখা পড়া শিখি নাই? সুলোচনা বা কখানা বই পড়েছে, আমরা কত বই পড়েছি, কিন্তু এর মত শিক্ষা ত আমাদের আজও হয় নাই। খ্রীষ্টানি স্কুলে দেওয়াতেই এই ফল ফলেছে।

একটী বালিকা বলিল,—আমি ত খ্রীষ্টানি স্কুলে পড়ি নাই, কিন্তু আমার পণ্ডিত মহাশয়ও বলেছেন, ‘এই সকল জঘন্য কার্য্যে কখনই যোগ দেওয়া উচিত নয়। আপনারা যে প্রকার নির্লজ্জের ন্যায় ব্যবহার করেন, কোন্ শিক্ষিত লোক তাতে আহ্লাদ প্রকাশ কর্‌তে পারে? ছি ছি, আপনারা আর বাহাদুরি করিবেন না।

যুবতী মুখ বক্র করিয়া, ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—আর তোর মুখ নেড়ে বক্তিতে কর্‌তে হবে না; আমাদের বাড়ীতে ত আর শিক্ষিত লোক নেই, তোর পণ্ডিত মহাশয়ই দেশের মধ্যে একজন,—না? আমাদের বাবুরা আর লেখাপড়া জানে না,—না?

বালিকা ধীরে ধীরে বিনীত স্বরে বলিল,—সব জানি, আর বল্‌বেন না। কেবল নাটক, কেবল ছাই ভস্ম, আপনাদের বাবুকেও জানি, আপনাকেও জানি।

এই কথা বলা হইতে না হইতে একটী প্রাচীনা বলিয়া উঠিলেন,—এছুঁড়ীর বুঝি মা বাপ নাই, এ ছুঁড়ীকে শাসন করে, এমন বুঝি কেহ নাই? এই বলিয়া বালিকার চিবুক ধরিয়া দন্ত কিড়মিড় করিয়া বলিলেন—তুই যদি আমার গর্ভে জন্মাতিস্, তবে আজই গলা টিপে মেরে ফেল্‌তাম।

পূর্ব্বোক্ত যুবতী বৃদ্ধাকে বলিলেন—ভাল করলেন্ না, ভাল করলেন্ না, বিনোদ বাবুর বোন্‌কে এরূপ কথা বলে ভাল কর্‌লেন্ না, এর ফল ভাল হবে না।

এই রূপ নানা প্রকার তর্কের স্রোত চলিয়াছে, এদিকে সুলোচনা প্রহারে হতচেতন হইয়া পড়িয়াছেন। জননী নানা লোকের উৎসাহে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া এত প্রহার করিয়াছেন যে, সুলোচনার জ্ঞান নাই। নিষ্ঠুর জননী, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বলিতে বলিতে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া আর সকল মেয়ের সহিত কুৎসিৎ দেশাচারে যোগ দিতে চলিলেন।

সুলোচনার ভগ্নী কুলকামিনী এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্বেই বিনোদ বাবুর বাড়ীতে সংবাদ দিতে গিয়াছিলেন, জননীর দলবল গৃহের বাহির হইতে না হইতে বিনোদ বাবুর সহিত সুলোচনার ভগ্নী গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুলোচনা এ সকল কিছুই জানেন না, তিনি যেন ঘোর নিদ্রায় বিচেতন হইয়া আছেন। বিনোদ বাবু ও কুলকামিনী সুলোচনার মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। বিনোদ বাবুর দু নয়ন হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল। বিনোদ বাবু একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে ভগ্নীকে বলিলেন—'আমার জন্যই সুলোচনার এত কষ্ট সহ্য করিতে হইল। আমি যদি অনুরোধ না করিতাম, তাহা হইলে সুলোচনার এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না! সুলোচনার অদৃষ্টে যে কত কষ্ট আছে, তা কে জানে? আমার সহিত তোমাদের আলাপ পরিচয় না হইলেই ভাল ছিল! এই বলিয়া বিনোদ বাবু কাঁদিতে লাগিলেন। সুলোচনার ভগ্নী অধোবদনে রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উভয় সঙ্কট।

স্বামী স্ত্রীর জন্য কাঁদে, ভ্রাতা ভ্রাতার জন্য কাঁদে, জননী পুত্রের জন্য কাঁদে, এদৃশ্য জগতে বিরল নহে। কিন্তু ইহাতে প্রেমের অপরিসীম মাহাত্মের পরিচয় পাওয়া গেল না। রাজা সুখ-সিংহাসন ছাড়িয়া দীন দুঃখীর কুটীরে বসিয়া যখন সহানুভূতির অশ্রুতে গণ্ডস্থল ভাসাইতে থাকেন, তখন সেই দৃশ্যে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। ধনীর পুত্র বিনোদ বাবু আজ অসহায়াদিগের জন্য অশ্রুতে গণ্ডস্থল ভাসাইতেছেন, এ দৃশ্য জগতে চিরকাল অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত থাকিবে। বিনোদ বাবু অধিকক্ষণ সেই বিষাদময় চিত্রের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, দুঃখাশ্রু সম্বরণ করিয়া সে স্থান হইতে উঠিলেন। বিনোদ বাবুর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে. আঘাত লাগিবারই কথা,—বিনোদ বাবু কত কষ্ট করিয়া দুটী ভগ্নীকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। কিন্তু আজ দেখিলেন, আজ বুঝিলেন,—তাঁহার আর হাত নাই। উভয়কে যদি দেশান্তরে লইয়া যান, তবে হয় ত সকল গোল চুকিয়া যায়, কিন্তু বিনোদ বাবুর এখন সে সাহস নাই—সে ইচ্ছা নাই। ইহার পূর্ব্বেই ঐ গ্রামে দলাদলী আরম্ভ হইয়াছে,—বিনোদবাবুকে লইয়া, সুলোচনাকে লইয়া। লোকেরা বলে, বিনোদবাবুর স্বার্থ আছে বলিয়া সুলোচনাকে মানুষ করিয়াছেন। গ্রামের লোকেরা জানিত, বিনোদবাবুর স্বভাবে কালিমা নাই। কিন্তু গ্রামের দুষ্ট লোকদিগের চক্রান্তে—দেবসদৃশ বিনোদ বাবু আজ সকলের চক্ষের বিষ। গ্রামের

দুষ্ট লোকদিগের ইচ্ছা, সুলোচনাকে অভিসার পথে লইয়া যায়। সুলোচনার জননী অর্থের দাসী, ধর্ম্ম কর্ম্ম এ সকলের বড় একটা ধার ধারেন না। অর্থের আশায় জননী সুলোচনাকে পাপের হ্রদে ডুবাইতে প্রস্তুত, কিন্তু বিনোদ বাবুর জন্য আজ পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। একমাত্র বিনোদ বাবুর মধুর কথায় ভুলিয়া সুলোচনা সকল প্রকার প্রলোভনকে তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছেন, এই জন্য জননী ক্রোধে অধীর,—সুলোচনার প্রতি—বিনোদ বাবুর প্রতি। বিনোদবাবুকে কিছুই বলিতে পারেন না—ধনীর সন্তান, ক্রোধের বেগ সুলোচনার উপরেই পড়িয়াছে। সর্ব্বনাশী মনে করিয়াছে কথায় না পারিলে প্রহারে পারিব—প্রহারে না পারিলে মারিয়া ফেলিব। বিনোদ বাবুর পূর্ব্বে আশা ছিল, ইহাদিগকে পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন, কিন্তু আজ সে আশা গিয়াছে। বিনোদবাবুর আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই চটিয়া গিয়াছে,—বিনোদ বাবুর নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্যের নিকট শুনিয়াই চটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর স্বভাব বিনোদ বাবু চেষ্টা করিয়া ফিরাইতে পারিবেন, আশা ছিল না; কিন্তু তবুও কয়েক জনকে বলিয়াছিলেন, 'সুলোচনাকে আমি সহোদরার ন্যায় মনে করি, আমার প্রতি কেন সন্দেহ কর? বিবাহিত অবস্থায় আমি কলঙ্কের পথে যাইব, তোমরা কেন মনে এ সন্দেহকে স্থান দেও?' এ কথায় তাহারা উত্তর করিল,—"পৃথিবীর সকলি আমরা জানি, এই স্থানে দেবতাদিগের দেবত্ব লোপ হয়, মানুষ কোন্ ছার জীব! আজ সুলোচনা তোমার সহোদরা, কিছুদিন পরে নিশ্চয় দেখিব আর এভাব নাই। আমরা সন্দেহবাদী। কেন সন্দেহবাদী? পৃথিবীকে জানিতে আর আমাদের বাকী নাই, একে একে অনেক বড় লোক দেখেছি, সকলের পতন ঐ এক স্থানে।" বিনোদ বাবু পরাস্ত হইয়াছেন, আজ তাঁহার সমস্ত আত্মীয় বন্ধু বান্ধব তাঁহার বিরোধী। শেষ ফল এই হইয়াছে, ঐ দ্বিতীয় বিবাহের বাড়ীতে গ্রামের সকল লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, কেবল বিনোদবাবুর হয় নাই। বিনোদবাবুর নিমন্ত্রণ হয় নাই বলিয়া বিনোদ বাবুদের বাড়ীর কেহই যায় নাই। যায় নাই বটে, কিন্তু সকলেই বিনোদ বাবুর প্রতি অসন্তুষ্ট, আজ সকলেই রাগান্বিত। জাত্ মান সব বিনোদের জন্য গেল, ইহা ভাবিয়া বিনোদ বাবুর জননী কাঁদিতেছেন। বিনোদ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বড়ই হিংসা পরতন্ত্র ছিলেন, তিনি আজ প্রতিজ্ঞা করেছেন—'সকলের ঘরের খবর বাহির করে, সকলকে একঘরে করে তবে ছাড়ব।' বিনোদ বাবুর প্রতিবেশী মণ্ডলী এই কথা লইয়া কাণাকাণি করিতেছে। বিনোদ বাবুর স্ত্রী মুখ ভার করিয়া আছেন, 'স্বামীর চরিত্রের কথা শুনে প্রাণে আঘাত পাইয়াছেন, মনোদুঃখে মুখ ভার করে আছেন। সমস্ত দিন এই ভাবে, এই আন্দোলনে গিয়াছে; বিনোদ বাবু সকল কথা শুনেছেন,—তাঁহার মুখ আজ একটু বিষণ্ণ, চিন্তায় মলিন। অপরাহ্নে সুলোচনাকে ঐ অবস্থায় দেখিলেন। দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই ধার্য্য করিতে পারিতেছেন না। আজ স্ত্রীর মনের সন্দেহ জাল ছিন্ন করিবেন, না ভ্রাতার ক্রোধকে প্রশমিত করিবেন, না জননীকে

শান্ত করিবেন,—না অন্যান্য সকলকে সন্তুষ্ট করিবেন;—না এদিকে সুলোচনার জন্য ভাবিতে বসিবেন? কেবল ভাবিলে হইবে না—সুলোচনার ভগ্নী বিনোদবাবুকে চুপে চুপে ভিতরের সকল সংবাদ দিয়া বলেছেন, দুই চারি দিনের মধ্যে উদ্ধার করিতে না পারিলে, হয় সুলোচনা পাপে ডুবিবে, না হয় আত্মহত্যা করিয়া মরিবে। এই হৃদয়-বিদারক কথা শুনিয়া বিনোদ বাবুর প্রাণ আজ অস্থির হইয়াছে; কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। গ্রামের মধ্যে মহা আন্দোলন-স্রোত চলিয়াছে। বিনোদ বাবুর জননী কাঁদিতেছেন, স্ত্রী মুখ ভার করিয়া আছেন, এ দিকে সুলোচনা প্রহারে অচেতন হইয়া রহিয়াছেন। এ সকলের মূলেই আমি, ইহা ভাবিতে ভাবিতে বিনোদ বাবু ভ্রাতার ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন।

জীবনগতি নির্ণয়।

চতুর্থ অধ্যায়। (১)

বিবর্ত্তন-বিকশিত জীবনগতি।

বিশাল বিশ্বসংসার মধ্যে—কি জড়জগতে, কি প্রাণিজগতে, কি নৈতিক জগতে, কি আধ্যাত্মিক জগতে—সর্ব্বত্রই বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশ (Evolution) এবং পরিবর্ত্তন সম্ভূত-বিলয় (Dissolution) পরিলক্ষিত হয়। ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতিশয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু কিম্বা পরমাণু সমূহ, স্বকীয় আভ্যন্তরিক গতি অথবা পারমাণব-গতি বিসর্জ্জন নিবন্ধন, প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে রূপান্তরিত হইয়া, সংযোগাবদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি পূর্ব্বক, ইন্দ্রিয়গম্য স্থূলাকৃতি ধারণ করিলে, প্রাগুক্ত বস্তু কিম্বা পরমাণুর ঈদৃশ পরিবর্ত্তনকে বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশ বলা যায়। কিন্তু পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়গম্য স্থূলাকার এবং সংযোগাবদ্ধ বস্তুর পরমাণু কিম্বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ সকল, আভ্যন্তরিক গতি অথবা পারমাণব গতি-প্রাপ্তি-নিবন্ধন, প্রক্ষিপ্ত এবং সংযোগ-রহিত হইয়া নিরাকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, বস্তুর এবম্বিধ পরিবর্ত্তনকে পরিবর্ত্তন-সম্ভূত বিলয় বলা যায়।

কিন্তু এই স্থানে উল্লেখ করা উচিত যে, বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশ ও পরিবর্ত্তন-সম্ভূত-বিলয়, এই দুইটী বিষয়কে কেবল আংশিক রূপে ব্যাখ্যা করা হইল। এই দুইটী বিষয় পাঠকগণের সহজে উপলব্ধি হইতে পারে, এই অভিপ্রায় ইহাদের জটিল ভাগ পরিত্যাগ করা হইল, এবং পূর্ণাবয়বসম্পন্ন এবং সর্ব্বলক্ষণ-সংযুক্ত সংজ্ঞা প্রদান করিতে কোন চেষ্টা করা হইল না। পারমাণব-গতি অথবা স্বকীয় গতি বিসর্জ্জন দ্বারা বস্তুর সংযোগ এবং প্রাগুক্ত গতি গ্রহণ দ্বারা বস্তুর বিয়োগ বিকাশ ও বিলয়ের এই অংশটী কেবল এই স্থানে উল্লিখিত হইল। বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশের এবং পরিবর্ত্তন-সম্ভূত বিলয়ের অপরাপর লক্ষণ ও কার্য্য যথাস্থানে উল্লিখিত হইবেক।

অগ্নিদ্বারা কোন বস্তু দগ্ধ করিলে তাহার আকৃতি বিলুপ্ত হয়; কিন্তু তাহার একটী

পরমাণুও বিনষ্ট হয় না। অগ্নি সংযোগে বস্তুর পরমাণু সকল পারমাণব গতি প্রাপ্ত হয়। এবং সেই পারমাণব গতির আতিশয্য প্রযুক্তই পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পদার্থ-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণ পারমাণব গতিকেই (molecular motion) উত্তাপ (heat) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুত পারমাণব গতি এবং উত্তাপ এতদুভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না।

এক একটী পরমাণু যেরূপ জড়পদার্থের এক একটী অবিভাজ্য অংশ. সেই প্রকার এক একটী নর নারী সমাজ যন্ত্রের এক একটী অবিভাজ্য অংশ স্বরূপ। জড়পদার্থের পরমাণুর ন্যায় প্রত্যেক নর নারীর জীবনেও পারমাণব গতির বিদ্যমানতা উপলব্ধি হয়। এবং সেই পারমাণবগতির আতিশয্য প্রযুক্তই প্রত্যেক নর নারী সমাজ যন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আবার জড়জগতস্থ দুইটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু স্বীয় স্বীয় আভ্যন্তরিক গতিবিবর্জ্জিত না হইলে একটী অপরের সহিত মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ দুইটী ভিন্ন ভিন্ন জাতি, কি সম্প্রদায়, স্বীয় স্বীয় আভ্যন্তরিক গতি পরিত্যাগ না করিলে পরস্পর মিলিত হইয়া এক জাতি হইতে পারে না। পারমাণব গতির হ্রাস দ্বারা মনুষ্যদিগের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সংস্থাপিত হয়।

আমরা জড় জগতের মধ্যে, অতি সূক্ষ্ম-বালুকণা হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ, উপগৃহ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যত কিছু বস্তু নিরীক্ষণ করি, তৎসমুদায়ের প্রত্যেকের মধ্য হইতে উত্তাপ অথবা পারমাণবগতি নির্গত হইয়া অপরাপর বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এবং পক্ষান্তরে আবার প্রত্যেক বস্তুই অপরাপর বস্তু হইতে উত্তাপ গ্রহণ করিতেছে। * উত্তাপ বিসর্জ্জন দ্বারা বস্তুর পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহের মধ্যস্থিত সংযোগ সুদৃঢ় ও পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং উত্তাপ গ্রহণ দ্বারা বস্তুর যোগাকর্ষণ শিথিল হয় এবং অতি কঠিন বস্তু সকলও তরলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জড়জগতে ঈদৃশ উত্তাপ উদ্গীরণ এবং উত্তাপ-গ্রহণ-ক্রিয়া নিবন্ধন নানাবিধ পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু জড়জগতের পরিবর্ত্তনের ন্যায় জাতীয় জীবনের মধ্যে কিম্বা বৃহৎ মনুষ্য সমাজ মধ্যেও পারমাণব গতি বিসর্জ্জন ও গ্রহণ-নিবন্ধন অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তনের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

জড়জগতে যেরূপ বায়ব পদার্থ (Gaseous substance) মধ্যে সমধিক পারমাণব গতির অবস্থিতি অনুভূত হয়, সেই প্রকার সর্ব্বতোভাবে জাতীয় একতাশূন্য আদিম অসভ্য জাতির প্রত্যেক নর নারীর জীবনে পারমাণব গতির আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাগুক্ত অসভ্য-জাতীয় প্রত্যেক নর নারী, শুদ্ধ কেবল স্ব স্ব ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, পরস্পরের সহিত নিঃসংশ্রব ভাবে অরণ্যে আহারান্বেষণার্থ বিচরণ করিয়া থাকে। আপন আপন উদর নিবৃত্তির চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তা নাই, এবং আত্মরক্ষা ভিন্ন জীবনের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। এই প্রকার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-ভাবপূর্ণ আত্মসুখ চিন্তা এবং আত্ম-

* "Every mass from a grain of sand to a planet, radiates heat to other masses, and absorbs heat radiated by other masses; and in so far as it does the one it becomes integrated, while in so far it does the other it becomes disintegrated." Herbert Spencer's First Principle.

সুখান্বেষণ মানবজীবনে যে গতি প্রদান করে, তাহাকেই জীবনের পারমাণব গতি বলা যায়

আবার জড়জগতে বায়ব পদার্থ অপেক্ষা তরল পদার্থ (liquid) মধ্যে যেরূপ অপেক্ষাকৃত পারমাণব গতির ন্যূনতা পরিলক্ষিত হয়, সেই প্রকার অপেক্ষাকৃত সমুন্নত অসভ্য-জাতীয় লোকদিগের জীবনে পারমাণব-গতির কিঞ্চিৎ হ্রাস দেখা যায়। বিবাহ পদ্ধতি এবং কৃষিকার্য্য ইত্যাদি যে সকল অপেক্ষাকৃত সমুন্নত অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহারা শুদ্ধ কেবল আপন উদর পূর্ণ করিবার চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয় না। তাহাদিগের আত্মসুখ চিন্তার সহিত আপন আপন স্ত্রী পুত্রের সুখ চিন্তা মিশ্রিত হইয়া তাহাদের জীবনে পরিবর্ত্তিত গতি উৎপাদন করে। ইহাদিগের জীবনে বিশুদ্ধ পারমাণব-গতি লক্ষিত হয় না। এই প্রকারে মনুষ্য ক্রমে ক্রমে যতই প্রক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে সংযোগাবদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যতই অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়, ততই তাহাদের জীবনের পারমাণব গতি হ্রাস হইতে থাকে; এবং তন্নিবন্ধন ক্রমে তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়। জাতীয় একতা এবং সামাজিক-বন্ধন-সম্ভূত জীবন গতিকেই বিবর্ত্তন-বিকাশিত জীবন-গতি বলা যায়। কিন্তু মনুষ্যের চিন্তা, ভাষা, নৈতিক ভাব, এবং ধর্ম্মভাব সমুদায়ের মধ্যেই বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশ পর্য্যবেক্ষিত হয়। সুতরাং বিবর্ত্তন-বিকশিত জীবনগতি নির্ণয় করিতে হইলে অগ্রে প্রাগুক্ত এক একটী বিষয় সম্বন্ধীয় বিবর্ত্তন ও বিকাশ পর্য্যালোচনা করা অত্যাবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু পারমাণব-গতি বিসর্জ্জন এবং গ্রহণ সম্বন্ধীয় দুই একটী ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ না করিলে বিষয়টী সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবেক না। অতএব প্রথমতঃ পারমাণব গতি বিসর্জ্জন দ্বারা যে, জগতের ভিন্ন ভিন্ন অসভ্য জাতির মধ্যে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহারই দুই একটী উদাহরণ দিতেছি।

উত্তর ইয়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন নামধারী বর্ব্বর জাতির অতি পূর্ব্বকালীয় আদিম অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইঁহাদের মধ্যের এক এক জাতীয় লোকের জীবনের পারমাণব-গতি অপরাপর জাতীয় লোকের সংঘর্ষণ দ্বারা ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইত। এবং এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতির পারস্পরিক সংঘর্ষণ এবং তন্নিবন্ধন পারস্পরিক পারমাণব গতির বিনিময় দ্বারা প্রত্যেক জাতির মধ্যে ক্রমে জাতীয় একতার সূত্রপাত হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ বর্ব্বর জাতি কর্ত্তৃক রোমরাজ্য বিনষ্ট হইবার বহু পূর্ব্বে, তাহাদের মধ্যের এক এক জাতি যে, নিকটস্থ অপরাপর জাতিকে আক্রমণ করিত এবং পর্য্যায়ক্রমে আবার অপরাপর জাতি কর্ত্তৃক আক্রমিত হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু জড় জগতের মধ্যে যেরূপ প্রত্যেক বস্তু হইতে উত্তাপ নির্গত হইয়া অপরাপর বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং প্রত্যেক বস্তু আবার অপরাপর বস্তু হইতে উত্তাপ গ্রহণ করে, এবং এবম্বিধ পারস্পরিক উত্তাপ বিনিময় দ্বারা প্রত্যেক বস্তুই ক্রমে সংযোগ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি পারস্পরিক সংঘর্ষণে জাতীয় জীবনের উত্তাপ বিসর্জ্জন এব

ত্যাগ গ্রহণ দ্বারা ক্রমে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়।

উত্তর ইয়ুরোপের কোন এক শ্রেণীস্থ বর্ব্বর জাতির মধ্যে ক্রমে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ভক্ষ্য দ্রব্যের অপ্রচুরতা প্রযুক্ত তাহারা নিকটস্থ জাতিকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু জাতীয় সমুদায় লোক দলবদ্ধ না হইলে অপর জাতিকে আক্রমণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজনানুরোধে তাহাদিগকে সময়ে সময়ে দলবদ্ধ হইতে হইত। কিন্তু সামাজিক সংযোগ-বিবর্জ্জিত বিচ্ছিন্নাবস্থাপন্ন অসভ্যদিগকে দলবদ্ধ হইতে হইলে, অগ্রে তাহাদিগর আপন আপন জীবনের পারমাণব-গতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, দলপতি কি সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করিতে হইত, এবং এই প্রকার দলবদ্ধ হইবার উদ্যোগই, অসভ্যদিগের জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও পারমাণব-গতি বিদূরিত করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় একতা ক্রমে সংস্থাপন করিয়াছিল।

আবার প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া আক্রান্ত জাতিও আপনাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিত, এবং তদ্রূপ দলবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিত। এই প্রকারে, আদিম অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের পারস্পরিক আক্রমণই জাতীয় একতার সূত্রপাত করিয়াছিল।

কিন্তু অসভ্য-জাতীয় লোকের ব্যবহারের মধ্যেই যে, কেবল এই প্রকার পারমাণব-গতি বিসর্জ্জন ও গ্রহণের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন সুসভ্য জাতির পারস্পরিক বৈর-নির্যাতন স্পৃহার মধ্যে নিয়তই ঈদৃশ অবস্থা দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ইলবার্ট সাহেবের পাণ্ডুলিপি (Ilbert's Bill) সম্বন্ধে যে ভয়ানক আন্দোলন হইতেছে, তন্মধ্যেও ঈদৃশ পারমাণব-গতি বিসর্জ্জনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। একদিকে ইংরেজগণ আপনাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ বিস্মৃত হইয়া সকলে একতানে এবং সমস্বরে ভারতবাসীদিগকে নানা প্রকার নিন্দা করিতেছেন; অপরদিকে ভারতবাসী ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আপনাদিগের মধ্যগত সর্ব্বপ্রকার মতভেদ বিস্মৃত হইয়া জাতীয় একতা সংস্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। ইলবার্ট সাহেবের পাণ্ডুলিপি এই দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির প্রত্যেক নর-নারীর জীবন হইতে পারমাণব-গতি বিনাশ করিতেছে।

কিন্তু জনবিশেষের জীবনের পারমাণব-গতি বিসর্জ্জন দ্বারা যেরূপ জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়, পক্ষান্তরে আবার চির-প্রতিষ্ঠিত অতি সুসভ্য সমাজস্থ লোকের জীবনে পারমাণব গতি প্রবিষ্ট হইলে, সেই পারমাণব গতির আতিশয্য প্রযুক্ত, অনতিবিলম্বে সমাজ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। রোমানজাতির শৈশবাবস্থাই ইহার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থল। জনবিশেষের জীবনের পারমাণব-গতির আতিশয্য প্রযুক্ত সুগঠিত রোমীয় সমাজ-যন্ত্র অচিরাৎ কালমধ্যে শ্রী ও সৌষ্ঠববিহীন হইয়া, বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন গতি-বিশিষ্ট লোকসমষ্টির স্তূপাকারের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। রোমান জাতির মধ্যে যে সময়ে ঘোর স্বার্থপরতা ও বিলাস-প্রিয়তার ভাব প্রবেশ করিল, যখন প্রত্যেক নর-নারী আত্ম-সুখান্বেষণে প্রমত্ত হইয়া জীবনের পারমাণব গতি দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল, যখন প্রভুত্ব-লাভ-ইচ্ছা প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয় হইতে স্বদেশানুরাগ এবং

ত্যাগ স্বীকারের ভাব একেবারে বিদূরিত করিল, যখন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার এবং পরাক্রমশালীর অযথোচিত তোষামদ জাতীয় ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইল, যখন পূর্ব্বকালীয় বীরত্বের পরিবর্ত্তে ভীরুতা, শূরত্বের পরিবর্ত্তে কাপুরুষতা, দয়ার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরতা, কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতা, বন্ধুতার পরিবর্ত্তে বিশ্বাসঘাতকতা রোমীয় নর-নারীর জীবনে সমুপস্থিত হইয়াছিল, যখন ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা প্রযুক্ত নারীজাতির হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম যোগাকর্ষণ স্বরূপ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত প্রদত্ত হইল, সেই সময়ে রোমান জাতির সামাজিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, এবং দীর্ঘকালব্যাপি-বিবর্ত্তন-বিকশিত সমাজ-যন্ত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া, প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকার রাশীকৃত স্তূপাকার ইষ্টক খণ্ডের ন্যায়, রোমীয় সমাজভুক্ত জনসমষ্টির জীবন প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমাদিগের জন্মভূমি ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণও জনবিশেষের জীবনের পারমাণব গতির আতিশয্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে।*

সমুদায় পৃথিবীর পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপা, বীরপ্রসবিনী, রত্নগর্ভা, অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধনরত্নে পরিপূর্ণা, সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি সর্ব্বশাস্ত্র সমালঙ্কৃতা, পুণ্যাত্মা মহর্ষিগণের এবং ধর্ম্মাত্মা প্রজাবৎসল রাজাগণের আবাসভূমি, স্বর্গতুল্যা প্রাচীন ভারতভূমি বর্ত্তমান সময়ে এতাদৃশ নর পিশাচে পরিপূর্ণ হইয়া, নরকের ন্যায় কেন প্রতীয়মান হইতেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ভারতবাসী নর নারীর জীবনের পারমাণব-গতির আতিশয্যই ইহার একমাত্র মূল কারণ। সহস্রাধিক বৎসর-ব্যাপী বিবর্ত্তন (Evolution) দ্বারা যেরূপ ত্যাগ স্বীকারের ভাব, এবং সত্যানুরাগ, ধর্ম্মানুরাগ ও লোকানুরাগের ভাব রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির এবং ভীষ্ম প্রভৃতির জীবনে বিকশিত হইয়াছিল, কালের কুটিলগতি দ্বারা মুসলমানদিগের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তৎ সমুদায় একেবারে বিলুপ্ত হইল। এবং তখন সেই সকল সৎগুণের পরিবর্ত্তে ভারতভূমি ঘোর বিলাসের আবাস স্থান হইল। তৎকালীয় বিলাসপ্রিয়তা এবং ভোগইচ্ছাই ভারতের সর্ব্বনাশের মূল। ক্ষত্রিয়দিগের পুরুষ পরম্পরা পদ্ধতি অনুসারে যে ব্যায়াম ও অস্ত্র-শিক্ষার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা ভারতের শেষাবস্থায় একেবারে রহিত হইল; কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রথা শতগুণে বৃদ্ধি হইল। সুতরাং ক্ষত্রিয় তনয়গণ যৌবনের প্রারম্ভেই সর্ব্বপ্রকার আত্ম-নিগ্রহ ও শরীর সঞ্চালন পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব বিলাস ভবনে দুগ্ধফেননিভ শয্যোপরি শত শত সুকুমারী কামিনীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। ঈদৃশ বিলাসপ্রিয়তাই ঘোর স্বার্থপরতার ভাব দেশের মধ্যে আনয়ন করিল; এবং ভারতের নর নারী স্বার্থপরতা নিবন্ধন পশুজীবন লাভ করিয়া কেবল ভোগ ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিলেন। পুরাকালে যে সকল ক্ষত্রিয় সন্তানগণ সত্যব্রত এবং প্রতিজ্ঞাপালন জন্য প্রফুল্ল হৃদয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেন, তাহাদিগের বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার সকল ভারতের শেষাবস্থায় জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা দ্বারাই পরিচালিত হইতে

* পরে এই বিষয় সম্বন্ধে আরো আলোচনা করিব।

লাগিলেন। স্বার্থপরতা এবং আত্ম-সুখ-চিন্তাই যে মানব জীবনের পারমাণব-গতির উৎপাদক শক্তি, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ যে, জন বিশেষের জীবনের পারমাণব-গতির আতিশয্য, তাহা এক্ষণে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবেক।

ক্রমশঃ

লোক-সংখ্যা।

প্রথম প্রস্তাব।

বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, আজ কাল আমাদিগের দেশে যে প্রকার দারিদ্র্যের প্রভাব, এমন আর কোন দেশেই নাই। ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, আমরা অত্যন্ত দরিদ্র ও অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। কেবলমাত্র সংসারের অপরিহার্য্য গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহে আমরা যেরূপ অক্ষম, এমন আর কোন জাতি জগতে এক্ষণে বর্ত্তমান আছে কি না, সন্দেহ। পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা আমাদিগের আহার ও পরিচ্ছদ সামান্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বসতি, শীত নিবারণ জন্য অধিক মূল্যের পশমী বস্ত্রাদি আমাদিগের না হইলেও চলে, এবং অতি অল্পমাত্র লোকেই তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতি সামান্য শাকান্নে আমাদিগের উদর পূরে। বহুমূল্য-সাপেক্ষ মদ্য আমাদিগের পেয় নহে, এবং মাংসভোজীর সংখ্যাও এদেশে তুলনায় অতি অল্প। আমরা যেরূপ সামান্য বস্তু আহার ও সামান্য বস্ত্র পরিধান করি, এমন আর কোন জাতিই করে না। বিলাসের সামগ্রীও আমাদিগের অধিক প্রার্থনীয় নহে, এব আমাদিগের বাসগৃহও তাদৃশ ব্যয়সাধ্য নহে শাকান্ন আহার করিয়া, কেবলমাত্র দশ হস্ত পরিমিত একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া, ও সামান্য পর্ণ-কুটীরে শয়ন করিয়া যে বলিল,—আমার দিন যায় না, তাহার আবার দারিদ্র্যের অবশিষ্ট রহিল কি ?

সংসারের এত সামান্য পদার্থের অভিলাষী হইয়াও যাহার অভাব ঘুচিল না, এত প্রকার সুবিধা সত্বেও যাহার দারিদ্র্য মোচন হইল না, বাস্তবিক তাহার ন্যায় দুঃখী ও দরিদ্র জগতে আর নাই। যাহা অতি অল্পমাত্র ব্যয়সাধ্য, সে সকল দ্রব্যেও আমরা বঞ্চিত। ইয়ুরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, ও আসিয়া, জগতের এই চারিটী মহাদেশের কোন সভ্যদেশেই জীবিকা নির্ব্বাহ আমাদিগের ন্যায় এত অল্প ব্যয়সাধ্য নহে। কিন্তু এত সুবিধা সত্বেও আমরা ভিখারীর জাতি, আজ আমাদিগের ন্যায় দরিদ্র সংসার মধ্যে দ্বিতীয় নাই। অন্যান্য দেশেও বিস্তর দরিদ্র ও ভিক্ষুক আছে বটে, কিন্তু কোন দেশের সমগ্র জাতিই দরিদ্র ও ভিক্ষুক নহে। আমাদিগের দেশে যে একেবারেই ধনী লোক নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা এত অল্প যে, অঙ্গুলী দ্বারা গণনা করা যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আমাদিগের এই দারুণ দরিদ্র ও অন্নাভাবের

কারণ কি? কোন দেশের দরিদ্রতা ও অন্নাভাবের কারণ নিরূপণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় অনুসন্ধান করিতে হয়। (ক) ভূমির উর্ব্বরতা। (খ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের স্বচ্ছলতা। (গ) লোক সংখ্যা।

(ক) ভূমির উর্ব্বরতা সম্বন্ধে আমরা যেমন সৌভাগ্যশালী, তেমন আর কোন জাতিই নহে। ভারতের অধিকাংশ স্থলই সমতল ভূমি এবং উর্ব্বরা। যথাকালে মেঘ আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া ভূমিকে ফলবতী করিয়া থাকে, এবং নদী সমূহ হইতেও বিস্তর উপকার লাভ হইয়া থাকে। পতিত জমী বড় অধিক নাই; প্রায় সকল জমীতেই কোন না কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে যে সকল পতিত জমী ছিল, তাহাতেও এক্ষণে প্রায় সর্ব্বত্রই আবাদ চলিতেছে, এবং ভূমির করবৃদ্ধি হওয়াতে বিলক্ষণ অবগত হওয়া যাইতেছে যে, সর্ব্বত্রই ভূমির অভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, এক্ষণে প্রায় সেই পরিমাণেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফল কথা, ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্বন্ধে ও উৎপাদিত শস্য সম্বন্ধে আমরা বিশেষ হ্রাস দেখিতে পাই না।

বাণিজ্যের নিমিত্ত বিস্তর পরিমাণে উৎপন্ন-শস্য দেশ হইতে চলিয়া যায় বটে; কিন্তু ব্যবসায়কে সভ্যতার একটী অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, বাণিজ্যের অনুরোধে কিয়ৎপরিমাণে শস্যহানি স্বীকার করিতেই হইবে। বাণিজ্য রাজ-অনুমোদিত। বণিকদিগের অপেক্ষা অধিক মূল্যে শস্যক্রয় করিতে না পারিলে বহির্বাণিজ্য বন্ধ করা সহজ নহে। এদিকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব বৃদ্ধি-নিবন্ধন বিক্রেতাদিগের অর্থের প্রয়োজন অধিক, সুতরাং উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। যাহারা স্বহস্তে শস্য উৎপন্ন করে, তাহারা প্রচুর শস্য না রাখিয়া অর্থের জন্য অধিকাংশই বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়; সুতরাং সাধারণের পক্ষে সকল দ্রব্যেরই মূল্য বৃদ্ধি হইয়া যায়। অতএব বহির্বাণিজ্যের দ্বারা যে দেশের অপকার হয় নাই, তাহা আমরা একেবারে বলি না। কিন্তু বাণিজ্য সভ্যতার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ এক বস্তুর বিনিময়ে অন্য বস্তুর আবশ্যকতা স্বীকার করিলে, বাণিজ্যের তত দোষ দেওয়া যায় না। তবে দ্রব্যের অল্পতা এবং তন্নিবন্ধন মূল্যবৃদ্ধি কি কারণে ঘটিতেছে, তাহা আমরা ক্রমে দেখিব।

(খ) যদিও আমরা ফরাসি, ইংরাজ ও আমেরিকানদিগের ন্যায় বিলাস-প্রিয় নহি, তথাপি ইংরাজ শাসনের ও ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে কিয়ৎপরিমাণে আমাদের অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ শাসনের গুণে সামান্য কৃষক হইতে ধনাঢ্য-ব্যক্তি সকলেরই উত্তম উত্তম পণ্যদ্রব্যের আবশ্যক হইয়াছে। এই আবশ্যকতা নিবন্ধন শস্যের মূল্য অবশ্যই কিছু বৃদ্ধি হইবে। যদি এই দেশেই সমস্ত পণ্যদ্রব্য মিলিত, তাহা হইলে এত মূল্য বৃদ্ধি হইত না; কিন্তু এদেশে পণ্যদ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হয়; অধিকাংশই ভিন্ন দেশ হইতে আনীত হইয়া অভাব মোচন হইতেছে। নানা কারণে এবিষয়ে যে পরিমাণে উন্নতির প্রয়োজন, তাহা আমরা করিতে পারি নাই। রাজপুরুষদিগের দোষে দেশীয় দ্রব্যের আদর (protecton) নাই। ইংলণ্ডের বস্ত্রাদির শুল্ক

নাই এবং আমাদিগেরও এ বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ দেখা যায় না। এদিকে পণ্য-দ্রব্যের অভাব বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু দেশে কিছুই উৎপন্ন হইতেছে না, সুতরাং তাহার মূল্য অধিক হইবে আশ্চর্য্য কি? দ্রব্যের অভাব হইয়াছে, কিন্তু দ্রব্য নাই, এমন স্থলে যদি কেহ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে, তবে সে যে অধিক মূল্যে তাহা বিক্রয় করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সকল দ্রব্য ক্রয়ে অর্থের অভাবে, দেশের শস্য উদ্বর্ত্ত না হইলেও, অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতে হয়, কিন্তু শস্যেরও মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, সুতরাং পণ্যদ্রব্য ও শস্য উভয় সামগ্রীর জন্যই অধিক মূল্য লাগিল। যদি বহির্বাণিজ্য না থাকিত, এবং শস্য উদ্বর্ত্ত হইত, তাহা হইলেও এ অভাব মোচন করা যাইতে পারিত। এদেশে শস্য উদ্বর্ত্ত হয় কি না, তাহা ক্রমে অনুসন্ধানে বুঝা যাইবে।

(গ) ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা স্বাভাবিক নিয়মে পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর বৃদ্ধি হইয়াছে ও দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যে সংখ্যা ছিল, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাহা অপেক্ষা বিস্তর বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার উপর আবার বাণিজ্য ব্যবসায়ের নিমিত্ত দেশ দেশান্তর হইতে বিস্তর লোক আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। এই কারণেও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু এখান হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য লোক দেশান্তরে যায় না। মরিসস্ প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে কুলী চালান দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাহারাও আবার সময়ে সময়ে সন্তান সন্ততিসহ দেশে ফিরিয়া আসিয়া থাকে।

বংশ বৃদ্ধিতে সুফল ফলিতেছে কি না, আমরা সে বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া যাহাতে বংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে বিশেষ মনোযোগী আছি। বংশ লোপ হওয়া আমাদিগের ধর্ম্ম ও নীতিবিরুদ্ধ। ক্রমে দেশে এত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে যে, আর স্থান হয় না। কয়েকটী মাত্র পরিবার লইয়া হিসাব করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝা যায়। এক একটী পরিবারের মধ্যে এখন বহু গোষ্ঠী হইয়াছে, এবং পুরাতন ভদ্রাসনে তাহাদের স্থান না হওয়াতে অনেকে স্থানান্তরে নুতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং অনেকে বা অতি কষ্টে সেই পুরাতন বাটীতেই বাস করিতেছে। পুরাতন শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে সকলেই বিবাহ করে, সকলেই সন্তানোৎপাদনে তৎপর, সুতরাং দিন দিন দেশে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে আশ্চর্য্য কি? একশত বৎসরের হিসাব ধরিলে দেখিতে পাই যে, এক জনের গড়ে প্রতি ২৫ বৎসরে একটী করিয়া সন্তান উৎপন্ন হইলে, শত বৎসরে একের স্থানে পাঁচ জন হইয়াছে। এই পাঁচ জনের মধ্যে প্রথম পুরুষের মৃত্যু ধরিয়া দেখা যায় যে, প্রতি শত বৎসরে লোক সংখ্যা চারি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। ফলতঃ বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধীয় এই নিয়মেই প্রায় এ দেশে লোক সংখ্যার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

এক শত বৎসরের হিসাব লইলেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, শত বৎসর পূর্ব্বে যে দ্রব্যের একটীর মাত্র প্রয়োজন হইত, এক্ষণে তাহার চারিটীর প্রয়োজন হইয়াছে। যদি অন্য দেশ হইতে আহার্য্য বা অন্যান্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী না আনীত হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের মূল্যও চারি গুণ বৃদ্ধি হওয়া অসঙ্গত

নহে। ফলতঃ শত বৎসরে আমাদিগের দেশে আহার্য্য দ্রব্যের চারি গুণেরও অধিক মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। একে ত দেশে অন্য দেশ হইতে আহার্য্য সামগ্রী আইসে না, তাহার উপর আবার দেশের উৎপন্ন দ্রব্য অন্যান্য দেশে বাহির হইয়া যাইতেছে, এরূপ স্থলে দ্রব্যাদির মূল্য আর হ্রাস হইবে, আশা করা যাইতে পারে না।

আমাদিগের দেশে লোক সংখ্যা যে বিস্তর বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই লোক সংখ্যার বৃদ্ধি নিবন্ধনই যে, আমরা জগতের সমস্ত জাতি অপেক্ষা মিতব্যয়ী এবং সামান্য ও স্বল্পাহারী হইয়াও সর্ব্বাপেক্ষা হীন ও দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি, ইহাতে বোধ হয় আর কাহারও সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে যে শস্যে নিজের উদর পূরণ করিতে পারিতাম, এক্ষণে তাহাতে চারি পাঁচ জনের ভরণ পোষণ চালাইতে হইলে কাজেই উদর পূরে না, এবং অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া অতি হেয় ও জঘন্য কর্ম্মও করিতে হয়। আহার ব্যতিরেকে মনুষ্য কোন মতেই বাঁচিতে পারে না, কিন্তু সেই আহার্য্য দ্রব্য আমার গৃহে নাই, সুতরাং জঘন্য উপায় দ্বারা অবশ্যই তাহা উপার্জ্জন করিতে হইবে। যদি আমি বাস্তবিকই নীতি ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান হই, তাহা হইলে সদুপায়ে আহার সংগ্রহ করিব, নচেৎ অবশ্যই আমাকে দস্যু-বৃত্তি বা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। পূর্ব্বাপেক্ষা দেশে যে আজি কালি দুষ্কর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা আদালতের বিবরণে বিলক্ষণ অবগত হওয়া যাইতেছে। আমাদিগের মতে, এই দুষ্কর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, একমাত্র দেশের লোক সংখ্যার বৃদ্ধি, আহার্য্যের অপ্রাচুর্য্য, শ্রম ও অর্থের অভাব। বস্তুতঃ আহার্য্য দ্রব্যের অল্পতা এবং লোক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইলে, দেশ নানা প্রকার অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়; এবং নানা প্রকারে দুষ্কর্ম্ম ও দুরভিসন্ধির দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য, নীতি ও ধর্ম্ম-দুর্ব্বল লোকেরা, সহজেই প্রলোভিত হইয়া থাকে। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যখন যে দেশে অভাব অল্প, দুষ্কর্ম্মের সংখ্যা সে দেশে সে সময়ে অধিক থাকে না।

যাহা হউক, লোক সংখ্যার বৃদ্ধি সহকারে অভাবের যে বৃদ্ধি হয়, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দেশে যে পরিমাণে শস্য ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাতে যে পরিমাণ লোকের সহজে সংকুলান হইতে পারে, লোকসংখ্যা তাহার অধিক বৃদ্ধি হইলে সে শস্যে কখনও চলে না। সুতরাং দেশের অমঙ্গল ঘটে। প্রায় আপামর সাধারণকে সেই অমঙ্গলের জন্য কষ্ট ভোগ করিয়া বৃথা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। সেই অমঙ্গল নিবারণের চেষ্টাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কি নিয়মে ও কি পরিমাণে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ফল কি, এবং কি উপায়ে তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে, তাহা ক্রমে বিবৃত হইবে।

নারী-জীবনে প্রাচীন হিন্দু এবং ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ফলাফল।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই ইংলণ্ডীয় সভ্যতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইংলণ্ডীয় সভ্যতা ভারতের প্রাচীন সভ্যতা হইতে যে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু কোন দেশের সভ্যতাই একেবারে দোষ পরিশূন্য হইতে পারে না। প্রত্যেক নর নারীর হৃদয় একেবারে দোষশূন্য না হইলে, জাতীয় সভ্যতা কখনও সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে না। সকল দেশীয় এবং সকল জাতীয় সভ্যতাই দোষ, গুণ, সৎ; অসৎ ভাবে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় সভ্যতার মধ্যে যেরূপ অনেকানেক সদ্ভাব ও সদ্গুণ রহিয়াছে, সেইপ্রকার আবার তন্মধ্যে কতকগুলি দোষের অঙ্কুরও দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার মধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার ও দূষিত ভাব থাকিলেও, হিন্দু সভ্যতা যে একেবারে সদ্ভাব ও সদ্গুণশূন্য, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা এবং ইংলণ্ডীয় সভ্যতার মধ্যে যে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেন না তৎসম্বন্ধে কোন মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু নারী-জীবনে ইংলণ্ডীয় সভ্যতা এবং প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইংলণ্ডীয় সভ্যতার প্রভাবে নারী-জীবন যেরূপ সমুন্নত এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সেই প্রকার নারী-জাতির উন্নতি-সাধনোপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। আবার অনেকানেক সুশিক্ষিত লোক স্বীয় দেশ-প্রচলিত সভ্যতা সম্বন্ধে এতাদৃশ পক্ষপাতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন যে, তাহারা ইংলণ্ডীয় সভ্যতাকে "বিষকুম্ভং পয়োমুখং" বলিয়া যারপরনাই ঘৃণা করিয়া থাকেন।* কিন্তু বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, কোন এক দেশের কিম্বা কোন এক জাতির সভ্যতাই যে কেবল উন্নতির অনুকূল এবং অপর দেশের কিম্বা অপর জাতির সভ্যতা যে কেবল উন্নতির প্রতিকূল, তাহা সম্ভবপর নহে। প্রত্যেক দেশের সভ্যতার মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দোষ গুণের অঙ্কুর রহিয়াছে; এবং তন্নিবন্ধন প্রত্যেক দেশীয় জাতীয় জীবন এবং জাতীয় চরিত্র, অপরাপর দেশীয় জাতীয় চরিত্র হইতে এতাদৃশ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মনুষ্যের সামাজিক জীবন বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, এক এক দেশীয় নর নারীর জীবন তৎতদ্দেশীয় প্রচলিত সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ। দেশ-প্রচলিত জাতীয় সভ্যতা, যন্ত্রের ন্যায় কার্য্য বলিয়া জাতীয় চরিত্র গঠন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ চরিত্র গঠন সম্বন্ধে দেশ-প্রচলিত সভ্যতার শক্তি

* 'ভারতী'তে উক্ত সম্পাদকের মতামত দেখ।

ও প্রভাব অত্যল্প লোকেই অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। কি ধনী কি দরিদ্র, কি মূর্খ কি জ্ঞানী, কি সুশিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি বৈজ্ঞানিক কি কৃষক, কেহই স্বদেশ প্রচলিত সংস্কার ও আচার ব্যবহারের শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে পারেন না। অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন দেশ-সংস্কারক কিম্বা ধর্ম্ম-সংস্কারকদিগের কার্য্যকলাপের মধ্যেও স্বদেশ-প্রচলিত সংস্কার এবং আচার ব্যবহারের প্রভাব সময়ে সময়ে বিকশিত হয়। দেশীয় আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শাসন প্রণালী, শিক্ষাপদ্ধতি ও ধর্ম্ম-সংস্কার প্রভৃতিই দেশ-প্রচলিত সভ্যতার এক একটী অঙ্গ বিশেষ। মানব-মণ্ডলীর অজ্ঞাতসারে এই স্বদেশ-প্রচলিত সভ্যতা যন্ত্রে তাহাদিগের জীবন ও চরিত্র গঠিত হইতে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক নরনারীর প্রকৃতি ও সামাজিক অবস্থানুসারে তাহাদের প্রত্যেকের জীবনে দেশ-প্রচলিত সভ্যতা বিভিন্ন প্রকারের ফলোৎপাদন করে। বর্ত্তমান ভারত-সভ্যতার ফল কৃষকের জীবনে যে ভাবে প্রকাশিত হয়; ভূম্যাধিকারীর জীবনে সেইভাবে বিকশিত হইতে পারে না। ইহাদিগের পরস্পরের সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতা নিবন্ধনই পরস্পরের জীবনে বিভিন্ন প্রকারের ফল সমুৎপন্ন হয়। আবার সেই সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতাও যে প্রচলিত সভ্যতামূলক, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং কোন একটী দেশ-প্রচলিত সভ্যতার ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এতাদৃশ নানাবিধ গুরুতর প্রশ্ন সমুপস্থিত হয় যে, অল্পায়তন-বিশিষ্ট প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রকার প্রশ্নের মীমাংসা সন্নিবেশিত হইতে পারে না। আমরা এই নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইংলণ্ডীয় এবং প্রাচীন ভারত-সভ্যতার সকল প্রকার দোষগুণ সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। এই প্রবন্ধে কেবল নারী-জীবনে ইংলণ্ডীয় সভ্যতা দ্বারা কি প্রকার ফল সমুৎপন্ন হইতেছে, এবং প্রাচীন ভারত সভ্যতা দ্বারাই বা নারীজীবনে পুরাকালে কিরূপ ফল উৎপন্ন হইত, তাহারই সমালোচনা করিব। "ভারত-সভ্যতা" না বলিয়া "প্রাচীন ভারত-সভ্যতা" বলিবার মুখ্যাভিপ্রায় এই যে, ভারতের বর্ত্তমান সভ্যতা ক্রমান্বয়ে মুসলমান ও ইংরেজদিগের শাসন-নিবন্ধন মুসলমান ও ইংরাজ সভ্যতার সহিত মিশ্রিত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ভারতের বর্ত্তমান সভ্যতা প্রাচীন ভারত সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

প্রাচীন ভারত সভ্যতার নিয়মানুসারে নারীজাতিকে একেবারে অবরুদ্ধা হইয়া জীবন যাপন করিতে হইত না। ভারত-ললনাদিগের বর্ত্তমান অবরুদ্ধাবস্থা মুসলমান-দিগের শাসন সময়ে প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়। এই প্রথাটী যে মুসলমানদিগের শাসনপ্রণালী এবং তাহাদের জাতীয় রীতি নীতির অনিবার্য্য ফল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নারীজীবনে ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ফলাফলের সহিত প্রাচীন ভারত-সভ্যতার ফলাফলের তারতম্য করিতে হইলে, ইংলণ্ডীয় আদর্শ নারীজীবনের সহিত প্রাচীন ভারতের আদর্শ নারী-জীবনের তুলনা করিয়া দেখা উচিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যেক দেশ-প্রচলিত সভ্যতার মধ্যে নানাবিধ ভাল মন্দ, সদাসৎ, উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট ভাব ও অবস্থা উৎপাদক শক্তি বা বীজ নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং জন-সাধারণের মধ্যে যে সকল লোকের জীবনে কোন

দেশ-প্রচলিত সভ্যতার উৎকৃষ্ট ভাবোৎপাদক বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহাদিগের জীবনই উক্ত সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী সৎফল-স্বরূপ। পক্ষান্তরে সভ্যতা নিবন্ধন দোষগুলি যে সকল লোকের জীবনে বিকশিত হয়, তাহারাই সভ্যতা-সম্ভূত কুফল বলিয়া পরিগণিত হয়। দেশ-প্রচলিত সভ্যতার উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভাব প্রত্যেক জীবনকেই যুগপৎ স্পর্শ করিয়া থাকে, কিন্তু মৃত্তিকাভেদে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বীজ অঙ্কুরিত হয়, সেই প্রকার জন-সাধারণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে সম্ভাবোৎপাদক বীজ এবং কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে অসম্ভাবোৎপাদক বীজ অঙ্কুরিত হয়।

ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে থেকারে, তাঁহার ভেনিটীফেয়ার নামক পুস্তকে মিস এমেলিয়া সেড্‌লি এবং মিস্ রেবেকা সার্প, এই দুইটী কামিনীর চরিত্র যেরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংলণ্ডীয় সভ্যতার সদ্‌গুণগুলি মিস্ এমেলিয়া সেড্‌লির জীবনে বিকশিত হইয়াছিল, এবং তাহার কুফল সকল মিস্ রেবেকা সার্পের জীবনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। আবার ডিকেন্সের ডেবিড কপারফিল্‌ড নামক গ্রন্থে মিস্ মর্ড ষ্টোনের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে সহজেই বুঝিতে পারি যে, ইংলণ্ডীয় সভ্যতার স্বার্থপরতা, কর্কশতা এবং কাঠিন্যের ভাব যে সকল নারী-জীবনকে আশ্রয় করে, তাঁহারাই মিসমর্ডষ্টোনের রূপধারণ করেন। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডীয় সভ্যতাসম্ভূত সুশিক্ষা প্রাপ্ত নারীগণ কপারফিল্‌ডের দ্বিতীয় স্ত্রী এগ্‌নেসের ন্যায় কোমলহৃদয়া এবং কর্ত্তব্য পরায়ণা হইয়া অতি মনোহর নারী-জীবন লাভ করিতে পারেন।

প্রাচীন ভারতসভ্যতা-সম্ভূত সৎগুণগুলি যে সকল নারী হৃদয়ে বিকশিত হইত, তাহারা সীতার ন্যায় সুকোমল পবিত্র জীবন লাভ করিতেন। আর ভারত-সভ্যতা-সম্ভূত দূষিত ভাবগুলি যে সকল নারী হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইত, তাহারা কৈকেয়ীর ন্যায় স্বার্থপরতা, অভিমান, এবং কুটিলতার মূর্ত্তিমতি অবতারস্বরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারত সভ্যতার সৎগুণের অবশ্যম্ভাবী ফল সীতা এবং দূষিত ভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল কৈকেয়ী। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডীয় সভ্যতার সৎগুণের এবং সুশিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল মিস সেড্‌লি ও এগ্‌নেস্ এবং কুশিক্ষা ও দূষিত ভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল মিস্ রেবেকা সার্প প্রভৃতি।

কিন্তু পাঠকগণের মধ্যে যাহাদিগের ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই, তাহারা মিস সেড্‌লি, এগ্‌নেস্ এবং রেবেকার চরিত্র কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা জানেন না। সুতরাং তাহাদিগকে বুঝাইবার সুবিধার জন্য আমরা আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণ হইতে চারিটী স্ত্রীলোকের জীবনালেখ্য অবলম্বন পূর্ব্বক নারী-জীবনে ইংলণ্ডীয় এবং প্রাচীন ভারত-সভ্যতার পৃথক পৃথক ফলাফল সমালোচনা করিব।

আমরা এই মাত্র বলিয়াছি যে, ভারত-সভ্যতার সৎগুণের অবশ্যম্ভাবী ফল সীতা এবং দূষিত ভাবের ফল কৈকেয়ী। কিন্তু ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ফলাফল প্রাচীন ভারতবাসিনী নারীদিগের জীবনালেখ্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইতে পারে না। ইংলণ্ড এবং ভারতের আচার ব্যবহারের মধ্যে এতাদৃশ গুরুতর প্রভেদ রহিয়াছে যে, প্রাচীন ভারতের নারীদিগের মধ্যে ইংলণ্ডীয় নারী

জীবনের পূর্ণাবয়বসম্পন্ন এবং সর্ব্বাংশে সমতুল্য আদর্শ দুষ্প্রাপ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মহর্ষি বাল্মীকি, বালীর স্ত্রী তারার চরিত্র যেরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, ইংলণ্ডীয় সভ্যতার আভ্যন্তরিক সৎগুণ গুলি যে সকল স্ত্রীলোকের জীবনে বিকশিত হয়, তাহাদিগের আদর্শ স্থান তারা। এবং ইংলণ্ডীয় সভ্যতার দোষ গুলি যে সকল নারীজীবনে বিকশিত হয়, তাহাদিগের আদর্শস্থান রাবণ সহোদরা শূর্পণখা। এই চারিটী স্ত্রীলোকের চরিত্র মহর্ষি বাল্মীকি কর্ত্তৃক যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে নারীজীবনে ইংলণ্ডীয় সভ্যতা এবং ভারত-সভ্যতার কিরূপ বিভিন্ন ফল সমুৎপন্ন হইতে পারে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

সীতা এবং তারা উভয়ই অতিশয় সাধ্বী এবং পতিপ্রাণা ছিলেন। তাহাদের উভয়ের হৃদয়ই স্নেহ দয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি সৎগুণে সমালঙ্কৃত ছিল। কিন্তু তারার যেরূপ সাংসারিক অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতা জ্ঞান ছিল, সীতার সেইরূপ কিছুই ছিল না। সংসারের কোন কুটিল ভাব সীতা কখনও বুঝিতে পারিতেন না। সীতার হৃদয়ের সেই অতলস্পর্শ গভীর প্রেম কোন প্রকার বাক্য কি ভাষা দ্বারা প্রকাশিত হইত না, কিন্তু তারা স্বীয় হৃদয়ের প্রেম বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে পারিতেন, এবং সংসারের মধ্যে কি ভাল, কি মন্দ, কে ভাল লোক, কে মন্দ লোক, তাহা অনায়াসে নির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। সীতা কেবল রামচন্দ্রকেই চিনিয়া ছিলেন। সংসারের অপর লোকের মনের ভাবগতিক কিছুই বুঝিতেন না, রামচন্দ্র ভিন্ন অপর কাহারও মনোরঞ্জন করিতে জানিতেন না। তারার বাক্‌পটুতা ছিল, তিনি প্রণয়াস্পদ বাক্য দ্বারা অন্যের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন। কোন আকস্মিক ঘোর বিপদ ইত্যাদি দ্বারা হৃদয় উদ্বেলিত না হইলে, সীতার মুখ হইতে বাক্য বিনির্গত হইত না। কিন্তু তারা সকল সময়েই প্রগল্‌ভা ছিলেন এবং সংসারের সন্ধি বিগ্রহ সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন। সীতা বাক্য দ্বারা মনোগত ভাব, জীবনের সকল অবস্থায় এবং সকল সময়ে, ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। জীবনের তিনটী অবস্থায়ই কেবল তাঁহার সেই অতলস্পর্শ গভীর হৃদয় হইতে বাক্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই তিনটী অবস্থায় তাঁহার হৃদয়-ভাব যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ সীতার স্বভাব প্রকৃতি বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রথমতঃ রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে করিয়া বনগমনে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, তিনি রামচন্দ্রের নিকট স্বীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সীতার হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধভাবের এবং প্রগাঢ় দাম্পত্যপ্রেমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সীতা মায়ামৃগ মারীচের আর্ত্তনাদ শ্রবণে রামচন্দ্রের বিপদাশঙ্কা মনে করিয়া লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের অন্বেষণে যখন বনে গমন করিতে বলিয়াছিলেন, সেই সময় লক্ষ্মণ তাহাকে একাকিনী আশ্রমে রাখিয়া বনে গমন করিতে অসম্মত হইলে, তিনি কুপিত হইয়া, লক্ষ্মণকে অবিশ্বাস পূর্ব্বক, তাহার প্রতি যে সকল কঠোর

বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে সহজেই প্রতিপন্ন হইবেক যে, সীতা সাংসারিক ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতেন না। এবং কে সৎ লোক, কে অসৎ লোক, তাহার বুঝিবার শক্তিও ছিল না। লক্ষ্মণ রামচন্দ্র এবং সীতার সহিত একত্রে প্রায় চৌদ্দ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং এতাদৃশ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহাদিগের সেবা সুশ্রূষা করিয়াছিলেন এবং সতত তাঁহাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁহাকে হঠাৎ যে সীতা এই প্রকার অবিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহাতে সহজেই প্রকাশ পায় যে, সীতার সাংসারিক অভিজ্ঞতা একেবারেই ছিল না। তৃতীয়তঃ, রাবণ সীতাকে প্রলোভন দেখাইয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলে, রাবণকে তিনি যে ভাবে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইবেক যে, বিশুদ্ধ ভাব এবং পবিত্র প্রেমে সীতার জীবন পরিপূর্ণ ছিল, এবং শুদ্ধ পবিত্র ভাব দ্বারাই তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল। আমরা বাল্মীকির রামায়ণ হইতে প্রাগুক্ত তিনটী ঘটনা উপলক্ষে সীতার মুখ হইতে যে সকল বাক্য বিনির্গত হইয়াছিল, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ তদ্দৃষ্টেই সীতার প্রকৃতি ও স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রথমতঃ রামের সহিত একত্রে বনে গমন করিবার জন্য সীতার ব্যাকুলতা দেখুন—

আর্য্যপুত্র! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্রস্তথা স্নুষা।
স্বানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বংস্বং ভাগ্যমুপাসতে॥
ভর্ত্তুর্ভাগ্যন্তু নার্য্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি॥
ন পিতা নাত্মজো নাত্মা নমাতা ন সখীজনঃ।
ইহপ্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা॥
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশ কণ্টকান্॥
প্রাসাদাগ্রৈর্বিমানৈর্বা বৈহায়সগতেন বা।
সর্ব্বাবস্থাগতা ভর্ত্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে॥
অহং দুর্গং গমিষ্যামি বনং পুরুষবর্জ্জিতম্।
নানা মৃগগণাকীর্ণং শার্দ্দূলগণ সেবিতম্।
সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ।
অচিন্তয়ন্তী ত্রীন্ লোকান্ চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্।
শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
সহরংস্যে ত্বয়া বীর! বনেষু মধুগন্ধিষু॥
সাহংত্বয়া গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয়ঃ।
নাহং শক্যা মহাভাগ! নিবর্ত্তয়িতুমুদ্যতা॥
ত্বয়া চ সহ গন্তব্যং ময়া গুরু জনাজ্ঞয়া।
ত্বদ্বিযোগেন মে রাম! ত্যক্তব্যমিহ জীবিতম্।

* * * * *

যদি মাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি
বিষমগ্নিং জলং বাহমাস্থাস্যে মৃত্যু কারণাৎ॥

* * * * *

যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা।
ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম! ময়া সহ॥

সীতা, যে সংসারের ভাব ও অবস্থা বুঝিতে অসমর্থা ছিলেন, এবং রামচন্দ্রের বিপদাশঙ্কা মনে হইলে একেবারে হতবুদ্ধি ও বিবেকশূন্যা হইয়া পড়িতেন, তাহা বাল্মীকি রচিত নিম্নোদ্ধৃত কবিতাগুলি দ্বারা প্রতিপন্ন হইবেক।

সৌমিত্রে! মিত্ররূপেণ ভ্রাতুস্ত্বমসি শত্রুবৎ।
যস্ত্বমস্যামবস্থায়াং ভ্রাতরং নাভিপদ্যসে॥
ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণ! মৎকৃতে।
লোভাত্তু মৎকৃতে ন্যূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্॥
ব্যসনং তে প্রিয়ং মন্যে স্নেহো ভ্রাতরি নাস্তি তে।
তেন তিষ্ঠসি বিশ্রব্ধং তমপশ্যন্ মহাদ্যুতিম্॥

অনার্য্য কৰুণারম্ভ নৃশংস! কুলপাংসন।
অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ॥
নৈতচ্চিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ! যদ্ভবেৎ।
ত্বদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু॥
সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেক মেকোঽনুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা॥
তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে! তবাপি ভরতস্য বা।
কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্॥
উপসংশ্রিত্য ভর্ত্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্ জনম্॥
সমক্ষং তব সৌমিত্রে! প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্॥
রামং বিনা ক্ষণমপি নৈব জীবামি ভূতলে॥

সীতা যে সাধু চরিত্র গুরুজনবৎসল লক্ষ্মণকে ঈদৃশ দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলেন, ইহাতে সহজেই দেখা যায় যে, তাঁহার বিবেকশক্তি পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিল না। বস্তুতঃ ভারত-সভ্যতা-সম্ভূত সৎগুণ পরিপূর্ণ নারীর জীবন অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য হইলেও অবিবেকতা নিবন্ধন দুর্ব্বলতা এবং চপলতা পরিশূন্য হইতে পারে না। ভারত-প্রচলিত সভ্যতা সাধারণতঃ নারীগণকে বিবেকশূন্য এবং চিন্তাশূন্য করিয়া তুলে। প্রাচীন কালে যে, ভারতে বিচক্ষণা নারী একেবারেই ছিল না, তাহা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু সাধারণতঃ নারী জীবনে ভারত সভ্যতার ফলাফল নির্ণয় করিতে হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে, ভারত সভ্যতা নারী-জীবনে পরিপক্ক বিবেচনা ও চিন্তাশক্তি প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু ভারত-সভ্যতা ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং পবিত্র ভাব সম্বন্ধে নারী হৃদয়কে অত্যন্ত সুদৃঢ় করিত। যদিও সাংসারিক অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ভারত নারী-দিগের আচরণে দৃঢ়তা থাকিত না, এবং ভারত নারীগণ সর্ব্বদাই সাময়িক উত্তেজনা দ্বারা পরিচালিত হইত, কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের হৃদয়স্থিত দৃঢ়তা কিছুতেই বিচলিত হইত না। ইহার মূল কারণ এই যে, ভারত সভ্যতা ধর্ম্মমূলক। পক্ষান্তরে অন্যান্য দেশীয় সভ্যতা নীতিমূলক। সাংসারিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ভারত নারী-গণ অনেক স্থলেই অবিবেকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং পবিত্রতা রক্ষা করিতে এই ভীরু স্বভাবা বিচলিত-চিত্তা নারীগণ যে প্রকার অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিতেন, তাহা দেখিলে একেবারে বিস্মিত হইতে হয়। ভিন্ন দেশীয় লোক বোধ হয় কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, বিবেকশূন্য, বিচলিত-চিত্ত ভারত নারীগণ কখনও ঈদৃশ বীরত্বের ভাব স্বীয় স্বীয় হৃদয়ে পোষণ করিতে সমর্থা হই তেন। রাবণ সীতাকে প্রলোভন দ্বারা বশী-ভূত করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি রাবণের প্রতি যেরূপ ঘৃণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলে সহজেই প্রতিপন্ন হইবেক যে, সাংসারিক বিবেকশূন্য হিন্দু মহিলাগণের ধর্ম্ম-বীরত্ব বিলক্ষণ ছিল। রাবণ সীতার নিকট স্বীয় শক্তি ও প্রভুত্বের কথা, আত্মশ্লাঘা পূর্ব্বক বলিবামাত্র, সীতা তাহাকে এইরূপে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া-ছিলেন।

যদন্তরং সিংহ শৃগালয়োর্বনে।
যদন্তরং স্যন্দনিকা সমুদ্রয়োঃ॥

সুরাগ্র্য সৌবীরকয়োর্যদন্তরং।
তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ॥

যদন্তরং কাঞ্চন সীস লোহয়ো-
র্যদন্তরং চন্দন বারিপঙ্কয়োঃ
যদন্তরং হস্তি বিড়ালয়োর্বনে
তদন্তরং দাশরথে স্তবৈব চ॥

যদন্তরং বায়স বৈনতেয়য়ো-
যদন্তরংমজ্জু মদ্গুরয়োরপি
যদন্তরং সারস গৃধ্রয়োর্বনে
তদন্তরং দাশরথে স্তবৈবচ।
জীবেচ্চিরং বজ্রধরস্য হস্তাৎ
শচীং প্রধর্ষ্যা প্রতিরূপরূপাম্
ন মাদৃশীং রাক্ষস! ধর্ষয়িত্বা
পীতামৃতস্যাপি তবাস্তি মোক্ষঃ॥

সীতার প্রকৃতি যেরূপ ছিল, তাহা প্রদর্শিত হইল। কিন্তু ইংলণ্ডীয় সাধ্বীর আদর্শ তারা যেরূপ অতিশয় সাধ্বী ও পতিপ্রাণা ছিলেন, আবার তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা ও সেই প্রকার অতিশয় প্রখর ছিল। সুগ্রীব বালী কর্ত্তৃক প্রথম দিবস যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপর দিবস পুনরায় সুগ্রীব বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলে, তারা বালীকে যেরূপ সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তারার বিলক্ষণ চিন্তাশক্তি ও সদ্বিবেচনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সময় তারা বালীকে এই প্রকার বলিয়াছিলেনঃ—

তং তু তারা পারিষজ্য স্নেহাদ্দর্শিত সৌহৃদা।
উবাচ ত্রস্ত সংভ্রান্তা হিতোদকমিদং বচঃ॥
সাধুক্রোধমিমং বীর, নদী বেগ মিবাগতম্।
শয়নাদুত্থিতঃকাল্যং ত্যজভুক্তামিবস্রজম্॥

* * * * *

বীর! তে শক্র বাহুল্যং ফল্গুতাবান্ বিদ্যতে।
সহসাতব নিষ্ক্রামো, মমতাবন্ন রোচতে॥
শ্রূয়তামভিধাস্যামি যন্নিমিত্তং নিবার্য্যতে।
পূর্ব্বমাপতিতঃ ক্রোধাত্ সত্বামাহ্বয়তে যুধি।
নিষ্পত্য চ নিরস্তস্তে হন্যমানোদিশো গতঃ॥
ত্বয়া তস্য নিরস্তস্য পীড়িতস্য বিশেষতঃ।
ইহৈত্য পুনরাহ্বানং শঙ্কাং জনয়তীব মে॥
দর্পশ্চ, ব্যবসায়শ্চ যাদৃশস্তস্য নর্দ্দতঃ।
নিনাদস্য চ সংরম্ভো নৈতদল্পংহি কারণম্॥
নাসহায়মহং মন্যে সুগ্রীবং তমিহাগতম্।
অবষ্টব্ধ-সহায়শ্চ যমাশ্রিত্যৈষো গর্জ্জতি॥
প্রকৃত্যা নিপুনশ্চৈব বুদ্ধিমাংশ্চৈব বানরঃ।
না পরীক্ষিত বীর্য্যেন সুগ্রীবঃ সখ্যমেষ্যতি॥

* * * * * * *

শূর! বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিন্ন চেচ্ছাম্যভংসূয়িতুম্
শ্রূয়তাং ক্রিয়তাঞ্চৈব তব বক্ষামি যৎপ্রিয়ম্॥
যৌবরাজ্যেন সুগ্রীবং তূর্ণং সাধ্বভিষেচয়।
বিগ্রহং মা কৃথা বীর! ভ্রাত্রা রাজন্ যবীয়সা।
অহংহিতে ক্ষমং মন্যে তেন রামেন সৌহৃদম্॥
সুগ্রীবেন চ সংপ্রীতিং বৈরমুৎসৃজ্য দূরতঃ।
লালনীয়োহি তে ভ্রাতা যবীয়ানেষ বানরঃ।
তত্রবা সন্নিহস্থোবা সর্ব্বথা বন্ধুরেবতে॥
নহি তেন সমং বন্ধুং ভুবি পশ্যামি কঞ্চন।
দান মানাদি সৎকারৈঃ কুরুষ প্রত্যনন্তরম্॥
বৈরমেতৎ সমুৎসৃজ্য তব পার্শ্বে স তিষ্ঠতু।
সুগ্রীবো বিপুল গ্রীবো মহাবন্ধুর্মত স্তব।
ভ্রাতৃসৌহৃদমালম্ব্য নান্যা গতিরিহাস্তি তে।
যদি তে মৎপ্রিয়ং কার্য্যংযদি চাবৈবিমাং হিতা
যাচ্যমানঃ প্রিয়ত্বেন সাধুবাক্যং কুরুষমে॥

তারা যে অতিশয় পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কবিতাগুলি দ্বারাই সহজে প্রতিপন্ন হইবেক।

ততঃ সমুপজিঘ্রন্তী কপিরাজস্য তন্মুখং।
পতিং লোকশ্রুতং তারা মৃতং বচন মব্রবীত্॥
শেষে ত্বং বিষমে দুঃখমকৃত্বা বচনেমম।
উপলোপচিতে বীর! সুদুঃখে বসুধাতলে॥
মত্তঃ প্রিয়তরা নূনং বানরেন্দ্র, মহীতব।
শেষেহিতাং পবিষজ্য মাংচনপ্রতিভাষষে॥

* * * *

মম চেমা গিরঃ শ্রুত্বা কিং ত্বং ন প্রতিবুধ্যসে।
ইদং তদ্বীর শয়নং তত্র শেষে হতো যুধি॥
শায়িতা নিহতা যত্র ত্বয়ৈব রিপবঃ পুরা।

বিশুদ্ধসত্ত্বাভিজন ! প্রিয়যুদ্ধ মম প্রিয় !
মামনাথাং বিহায়ৈকাং গতস্তমসি মানদ !
শূরায়নপ্রদাতব্যা কন্যা খলুবিপশ্চিতা ॥
শূরভার্য্যাং হতাং পশ্য সদ্যো মাং বিধবাং কৃতাং
অবভগ্নশ্চ মে মানো ভগ্নামে শাশ্বতী গতিঃ।
অগাধে চ নিমগ্নাস্মি বিপুলে শোকসাগরে।
অশ্মসারময়ং নূনমিদং মে হৃদয়ং দৃঢ়ং
ভর্ত্তারং নিহতং দৃষ্ট্বা যন্নাদ্য শতধা কৃতং
সুহৃচ্চৈব চ ভর্ত্তা চ প্রকৃত্যা চ মম প্রিয়ঃ।
প্রহারে চ পরাক্রান্তঃ শূরঃ পঞ্চত্বমাগতঃ
পতিহীনা তু যা নারী কামং ভবতু পুত্রিণী
ধনধান্য সমৃদ্ধাপি বিধবেত্যুচ্যতে বুধৈঃ

আবার শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তারা তাহার নিকট এই প্রকারে খেদোক্তি করিয়াছিলেন।

যেনৈব বাণেন হতঃ প্রিয়ো মে।
তেনৈব বাণেন হি মাং জহীহি ॥
হতাগমিষ্যামি সমীপমস্য
ন মাং বিনা বীর ! রমেত বালী
স্বর্গেপি শোকঞ্চ বিবর্ণতাঞ্চ
ময়া বিনা প্রাপ্স্যতি বীর ! বালী
রম্যে নগেন্দ্রস্য তটাবকাশে
বিদেহ কন্যা রহিতো যথাত্বম্
ত্বং বেথ তাবত্ বনিতা বিহীনঃ
প্রাপ্নোতি দুঃখং পুরুষঃ কুমারঃ
তত্ত্বং প্রজানন্ জহি মাং ন বালী
দুঃখং মমাদর্শনজং ভজেত ॥
যচ্চাপি মন্যেত ভবান্ মহাত্মা
স্ত্রীঘাত দোষস্তু ভবেন্ন মহ্যম্ ॥
আত্মেয়মস্যেতি হি মাং জহি ত্বং
ন স্ত্রীবধঃ স্যান্মনুজাগ্রপুত্র ॥
শাস্ত্র প্রয়োগদ্বিবিধাচ্চ বেদা।—
—দনন্য রূপাঃ পুরুষস্য দারাঃ ॥
দার প্রদানাদ্ধি ন দান মন্যৎ।
প্রদৃশ্যতে জ্ঞানবতাং হি লোকে।
ত্বঞ্চাপি মাং তস্য মম প্রিয়স্য।
প্রদাস্যসে ধর্ম্মমবেক্ষ্য বীর ! ॥
অনেন দানেন ন লপ্স্যসে ত্ব।—
—মধর্ম্ম-যোগং মম বীর ! ঘাতাৎ ॥
আর্ত্তামনাথামপনীয়মানা—
—মেবং গতাং নার্হসি মামহন্তুম্ ॥
অহং হি মাতঙ্গবিলাসগামিনা।
প্লবঙ্গমানা মৃষভেণ ধীমতা।
বিনা বরার্হোত্তমহেমমালিনা।
চিরং ন শক্ষ্যামি নরেন্দ্র ! জীবিতুম্

তারা সীতার ন্যায় একেবারে শোকে মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইতেন না। সীতার হৃদয় অতলস্পর্শ গভীর প্রশান্ত সাগরের ন্যায় প্রেম-হিল্লোলে সর্ব্বদাই উথলিত হইত। কিন্তু তারার হৃদয়ের প্রেমস্রোত সুগভীর নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়া কখন উথলিত হইত, কখন বা প্রশান্ত ভাব ধারণ করিত। সীতা অল্পভাষী, তারা বহুভাষী। সীতা অপরের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন না, তারা বাক্‌পটুতা প্রকাশ দ্বারা সকলেরই মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন। একদা লক্ষ্মণ, সুগ্রীবের প্রতি অত্যন্ত কোপান্বিত হইলে, সুগ্রীব স্বয়ং প্রথমতঃ তাঁহার সমীপে উপস্থিত না হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তারাকে তৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবং তারা ঈদৃশ বাকপটুতা দ্বারা লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন যে, তাহা পাঠ করিলে, তারা যে ইংলণ্ডীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় অত্যন্ত সুচতুরা ছিলেন, তাহা সকলেরই প্রতিপন্ন হইবে। তারা লক্ষ্মণকে যেরূপে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী—

প্রলম্বকাঞ্চী গুণ হেম সূত্রা।
সলক্ষণা লক্ষ্মণ সন্নিধানং।
জগাম তারা নমিতাঙ্গ যষ্টিঃ॥
সা পান যোগাচ্চ নিবৃত্তলজ্জা
দৃষ্টি প্রসাদাচ্চ নরেন্দ্রসূনোঃ
উবাচ তারা প্রণয়প্রগল্ভং
বাক্যং মহার্থং পরিশান্তরূপম্
কিং কোপমূলং মনুজেন্দ্রপুত্র!॥
কস্তেনসন্তিষ্ঠতি বাঙ্‌নিদেশে
কঃ শুষ্কবৃক্ষং বনমাপতন্তং
দবাগ্নি মাসীদতি নির্ব্বিশঙ্কঃ॥
ন কোপকালঃ ক্ষিতিপাল পুত্র!।
ন চাপি কোপঃ স্বজনে বিধেয়ঃ।
ত্বদর্থ কামস্য জনস্য তস্য।
প্রসাদমপ্যর্হসি বীর! সোঢুম্॥
কোপং কথং নাম গুণ প্রকৃষ্টঃ।
কুমার! কুর্য্যাদপকৃষ্টসত্ত্বে॥
কস্ত্বদ্বিধঃ কোপবশং হি গচ্ছেত্।
সত্ত্বাবরুদ্ধস্তপসঃ প্রসূতিঃ॥
জানামি কোপং হরিবীরবন্ধো
জানামি কার্য্যস্য চ কালসঙ্গম্॥
জানামি কার্য্যং ত্বয়ি যত্ কৃতং ন
স্তচ্চাপি জানামি যদত্র কার্য্যম্॥
তচ্চাপি জানামি তথা বিষহ্যং॥
বলং নরশ্রেষ্ঠ! শরীরজস্য
জানামি যস্মিংশ্চ জনাহববদ্ধং॥
কামেন সুগ্রীবমসক্তমদ্য॥
ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি।
ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রপন্নঃ॥
ন দেশ কালৌ হি যথার্থ ধর্ম্মৌ।
অবেক্ষ্যতে কামরতি র্মনুষ্যঃ
তং কামবৃত্তং মম সন্নিকৃষ্টং।
কামাভিযোগাচ্চ বিমুক্তলাজম্॥
ক্ষমস্ব তাবৎ পরবীর হন্তঃ।
ত্বদ্ভ্রাতরং বানরবংশ নাথম্॥
মহর্ষয়ো ধর্ম্মতপোঽভিরামাঃ
কামানুকামাঃ প্রতিবদ্ধ মোহাঃ॥
অয়ং প্রকৃত্যা চপলঃ কপিস্তু।
কথং ন মজ্জেত সুখেষু রাজা॥

তারা যে কি প্রকার সুচতুরা নারী ছিলেন, তাহা ইহা দ্বারাই বিশেষরূপে প্রকাশিত হইতেছে। তারা এবং সীতা ইহাদিগের প্রকৃতি এবং চরিত্রের বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে ভারতের গিন্নি কৈকেয়ী এবং বিলাতি গিন্নি শূর্পণখা, এতদুভয়ের মধ্যে যে বিভিন্নতা রহিয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি। কৈকেয়ী এবং শূর্পণখা উভয়ই অত্যন্ত স্বার্থপরায়ণা এবং আত্মকামা ছিলেন। কিন্তু কৈকেয়ীর চরিত্রে কোন দৃঢ়ভাব ছিল না। কৈকেয়ী সহজেই অপরের পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হইতেন। পক্ষান্তরে শূর্পণখা অন্যের কথায় ভুলিবার পাত্রী ছিলেন না। কৈকেয়ী ভীরু, শূর্পণখা তেজস্বিনী। কৈকেয়ী গৃহস্থিত আত্মীয় স্বজনের সহিত কলহ ও বিবাদ করিতে সমর্থা। শূর্পণখা ঘরে বাহিরে হাটে বাজারে সকলের সহিত বাক্যুদ্ধ করিতে পারিত। কৈকেয়ী গৃহে বসিয়া আপন কুঅভিসন্ধি সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিত, কিন্তু শূর্পণখার কুচিন্তা উপস্থিত হইলে সে কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করিত। কৈকেয়ী নারী-প্রকৃতি সুলভ লজ্জা বিবর্জ্জিত ছিল না। শূর্পণখার সহিত লজ্জার কোন সম্বন্ধ ছিল না। কৈকেয়ী এবং শূর্পণখা উভয়ই অত্যন্ত অভিমানিনী এবং প্রাজ্ঞমানিনী ছিলেন। কিন্তু কৈকেয়ী কেবল নিঃশব্দে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন দ্বারা স্বীয় অভিমান ব্যক্ত করিতেন। শূর্পণখার অভিমান বিশেষ ধুমধাম সহকারে প্রকাশিত হইত।

শূর্পণখার স্ত্রী-প্রকৃতিসুলভ নির্লজ্জতার পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত বাল্মীকির কবিতা দ্বারাই প্রকাশিত হয়।

অহং প্রভাবসম্পন্না স্বচ্ছন্দবলগামিনী।
চিরায় ভব ভর্ত্তা মে সীতয়া কিং করিষ্যসি॥
বিকৃতা চ বিরূপা চ ন চেয়ং সদৃশী তব।
অহমেবানুরূপা তে ভার্য্যারূপেন পশ্যমাম্॥
ইমাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্।
অনেন সহ তে ভ্রাত্রা ভক্ষয়িষ্যামি মানুষীম্॥
ততঃ পর্ব্বত শৃঙ্গানি বনানি বিবিধানিচ।
পশ্যন্ সহময়া কামী দণ্ডকান্ বিচরিষ্যাসি॥

উপসংহারে এইমাত্র বলিতেছি, প্রাচীন ভারত-সভ্যতা এবং ইংলণ্ডীয় সভ্যতার এক একটী করিয়া দোষ গুণ উল্লেখ করিলে, এই দ্বিবিধ সভ্যতার প্রকৃতি ও স্বভাব সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। কিন্তু প্রাচীন ভারত-সভ্যতার উৎকৃষ্ট বিভাগের ফল সীতা এবং নিকৃষ্ট বিভাগের ফল কৈকেয়ী; আর বর্ত্তমান ইংলণ্ডীয় সভ্যতার উৎকৃষ্ট বিভাগের অবশ্যম্ভাবী ফল তারা এবং নিকৃষ্ট বিভাগের ফল শূর্পণখা। এই প্রকারে সভ্যতার দোষ গুণ প্রদর্শিত হইলে, এই উভয় সভ্যতার বিভিন্নতা পাঠকগণের সহজে উপলব্ধি হইতে পারিবে। কিন্তু বর্ত্তমান ভারত-সভ্যতা প্রাচীন ভারত-সভ্যতা হইতে অনেকাংশে রূপান্তরিত হইয়াছে, সুতরাং নারী-জীবনে বর্ত্তমান ভারত সভ্যতার ফলাফল উল্লেখ করিতে হইলে, আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে, বর্ত্তমান ভারত-সভ্যতা দ্বারা ভারতে অসংখ্য অসংখ্য কৈকেয়ী প্রস্তুত হইয়া প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহস্বার্থপরতার অনলে প্রজ্বলিত করিতেছেন। প্রাচীন ভারত-সভ্যতা নিবন্ধন ভারতে অনেকানেক সীতা জন্মগ্রহণ করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান ভারত-সভ্যতায় তিন জাতীয় স্বার্থপরতা ও ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দুদিগের প্রাচীন স্বার্থপরতা এবং মুসলমানি ও ইংরাজজাতীয় স্বার্থপরতা, এই ত্রিবিধ স্বার্থপরতাই বর্ত্তমান সভ্যতার জীবনীশক্তি।

বর্ত্তমান সময়ের হিন্দু সভ্যতাকে কখনও বিশুদ্ধ হিন্দুসভ্যতা বলা যাইতে পারে না। বর্ত্তমান হিন্দু মহিলাগণের অবরুদ্ধাবস্থা মুসলমান সভ্যতার ফল। বর্ত্তমান সময়ের হিন্দু নারীগণের ঘোর বিলাসপ্রিয়তা ইংরাজি সভ্যতাসম্ভূত। যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে, ইংলণ্ডীয় সভ্যতা প্রবর্ত্তিত না হইলে নারীজীবন সমুন্নত হইবেক না, তাহাদিগের সহিত আমরা সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য না হইলেও আমরা এই পর্য্যন্ত স্বীকার করি যে, স্ত্রীজাতির অবরুদ্ধাবস্থা বিদূরিত না হইলে, নারীজীবন সমুন্নত হইতে পারে না।

শঙ্করাচার্য্য

শঙ্করের জন্ম।

এই সময়ে মহাদেব, কেরল দেশে, বৃষপর্ব্বতে, লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হইলেন। রাজশেখর নামে জনৈক রাজা স্বপ্নে বারম্বার তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়া, তথায় এক অতি উৎকৃষ্ট মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই মন্দিরের অনতিদূরে কালটি নামে এক অতি মনোরম্য ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রাম ছিল।

তথায় বিদ্যাধিরাজ নামে জনৈক স্থিরমতি, খ্যাতনামা পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম শিবগুরু। শিবগুরু সেই সময়ে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস করিতে ছিলেন। তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত গুরুর সেবা করিতেন, ভিক্ষালব্ধ অন্ন অগ্রে গুরুকে নিবেদন করিয়া পশ্চাতে আপনি ভোজন করিতেন, এবং সায়াহ্নে ও প্রাতে হোম করিতেন। প্রত্যহ পাঠান্তর, তিনি বেদের দুরূহ অর্থ সম্বন্ধে বিচার করিতেন। এইরূপে বিধিপূর্ব্বক পাঠ-সমাপন এবং বেদে অধিকার-লাভ হইলে পর, শিষ্যবৎসল গুরু স্বীয় শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন— "বৎস, সাঙ্গ বেদ তোমার অধ্যয়ন হইয়াছে, তাহার অর্থবোধও তোমার হইয়াছে, তুমি দীর্ঘকাল আমার আলয়ে বাস করিলে। তুমি সত্য সত্যই অতি ভক্তিমান্, এখন গৃহে ফিরিয়া যাও, হয় ত তোমার বন্ধুবান্ধবেরা তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। গৃহে যাইয়া তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন কর। বাছা, আর এখানে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। জীবন অনিত্য, যাহা ভবিষ্যতে করিবে বলিয়া ভাবিতেছ, বর্ত্তমানেই তাহা করিয়া রাখ, কল্যকার কার্য্য অদ্যই শেষ করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিলে যেরূপ শস্য হয়, অকালে সেরূপ হয় না; বিবাহাদি বয়স থাকিতেই করা কর্ত্তব্য, নতুবা নিষ্ফল হইবে। পিতা মাতা সর্ব্বদা তোমার বয়স গণনা করিতেছেন, উপনয়ন হইলেই মাতাপিতা সন্তানের বিবাহ কামনা করেন। বিবাহ হইলেই আশা হয়, পিণ্ড লোপ হইবে না। বিশেষতঃ সস্ত্রীক না হইলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অধিকার জন্মে না। যেমন অর্থ বোধ না হইলে বিচারে ফল হয় না, সেইরূপ অর্থবোধও নিষ্ফল, যদি ক্রিয়ানুষ্ঠান না হয়।" শিষ্য উত্তর করিল, "হে গুরো, আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য বটে, তথাপি এমন কোন নিয়ম নাই যে, গুরু গৃহে বেদাধ্যয়ন করিলে গৃহী হইতেই হইবে, অন্য আশ্রম গ্রহণ করা যাইবে না। যাহার নিত্যানিত্য বিবেক, এবং অনিত্যে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, সে সন্ন্যাস আশ্রয় করিবে, আর অপর সকলে গৃহী হইবে, গার্হস্থ্যই সাধারণ পথ। আমি সন্ন্যাসপূর্ব্বক আজীবন আপনার নিকট অবস্থান করিব, সবিনয়ে দণ্ডাজিন ধারণ করিয়া হোম করিব, এবং নিরন্তর বেদ পাঠ করিব। স্ত্রীসঙ্গ ততক্ষণই সুখকর, যাবৎ না তাহা সম্যক্ অনুভূত হয়, অনুভূতির পর আর তাহাতে সুখের লেশও থাকে না। হে মহাত্মন্, জাজ্বল্যমান্ সত্য গোপন করিতেছেন কেন? যজ্ঞানুষ্ঠানে স্বর্গ-ফল লাভ হয় বটে, কিন্তু বিধিমত যজ্ঞানুষ্ঠান এ সংসারে দুষ্কর। আর গৃহী যদি নিঃস্ব হয়, নরক-যন্ত্রণাও বরং তাহার পক্ষে ভাল, তাহার আর ইচ্ছানুরূপ ভোগ অথবা দান করিবার শক্তি থাকে না। যদিও ধনে গৃহীর গৃহ পূর্ণ হইতে পারে কিন্তু কিছুতেই তাহার ধন-তৃষ্ণা যায় না, এবং মোহের এমনই বিপাক, গৃহী সেই পূর্ণতা-জনিত কোন সুখভোগে অধিকারী হয় না। আবার বহু কষ্টে বাসনানুরূপ ধন একবার সঞ্চয় করিলেও পূর্ব্ব-সঞ্চিতের ক্ষয় হয়, এবং নূতন অর্থলাভের প্রয়োজন হয়।" গুরু শিষ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময় পুত্রকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য শিবগুরুর পিতা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাধিরাজ

বিনীতভাবে পুত্রের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ বহু অর্থ প্রদান করিলেন। শিবগুরু পিতার সঙ্গে দেশে চলিয়া গেলেন। শিবগুরু গার্হস্থ্যের এত দোষ প্রদর্শন করিয়া কিরূপে নিরাপত্তিতে স্বয়ং গৃহী হইতে চলিলেন? শিবগুরু যুবক ছিলেন। পাঠক তুমিও যদি যুবক হও, কে বলিতে পারে, তোমারও উচ্চ আস্ফালনের এইরূপ পরিণাম হইবে না? বহুকাল পরে শিবগুরু গৃহে আসিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে দেখিতে আসিল শিবগুরু প্রত্যেককে যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। পিতাও, পুত্রের বেদগত পারদর্শিতা দেখিয়া, বহু আলাপ করিতে লাগিলেন; এবং ন্যায়, সাংখ্য, ও বৈশেষিক প্রভৃতি সিদ্ধান্তে তাঁহার ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা করিবার জন্য অনেক প্রশ্নও করিলেন। শিবগুরুও আহ্লাদের সহিত যথাযোগ্য উত্তর দান করিলেন। সন্তানের শাস্ত্রাধিকার ও বিচার-নিপুণতা দেখিয়া পিতার মনে পরম আনন্দ হইল। পুত্রের আলাপ সহজেই প্রীতিকর, শাস্ত্রযোগে তাহা দ্বিগুণ প্রীতিকর না হইবে কেন?

ইতিমধ্যে শিবগুরুর বিবাহের প্রস্তাব আসিতে আরম্ভ হইল; অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া স্বীয় কন্যা তাঁহাকে সম্প্রদান করিবার মানসে তদীয় গৃহে আগমন করিল। বিবাহের পূর্ব্বেই তাহার গৃহ বিবাহশালার শোভা ধারণ করিল। অনেকেই বহু অর্থসহ কন্যা দানে সম্মত হইল, কিন্তু বিদ্যাধিরাজ মখপণ্ডিত নামে এক জন সদ্বংশজ ব্রাহ্মণের নিকট, স্বীয় পুত্রার্থে, তাঁহার কন্যা যাচ্ঞা করিলেন। বিবাহ কোথায় হইবে? কন্যাকর্ত্তা বলিতেছেন, আমার গৃহে যাইয়া বিবাহ হইবে; বরকর্ত্তা বলিতেছেন, না, আমার গৃহেই হইবে। এইরূপ মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। কন্যাকর্ত্তা আবার বলিলেন, যদি আমার গৃহে যাইয়া বিবাহ হয়, তবে সঙ্কল্পিত অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করিব। বরকর্ত্তা উত্তর করিলেন, যদি কন্যা আমার গৃহে আনিয়া সম্প্রদান কর, তবে বিনা অর্থে বিবাহ করাইব। ইতিমধ্যে জনৈক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কন্যাকর্ত্তাকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "যদি আমরা স্থির না করিয়া চলিয়া যাই, তবে হয় ত অপর কেহ তোমাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত করিয়া, স্বীয় কন্যা এই পাত্রে অর্পণ করিবে।" তাহার পরামর্শে কন্যাকর্ত্তা আপত্তি পরিত্যাগ করিলেন এবং বিদ্যাধিরাজের কথায় অনুমোদন করিলেন।

দেবার্চ্চনাপূর্ব্বক শুভ মুহূর্ত্তে বাগ্দান ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, এবং বিবাহের লগ্ন স্থির করিবার জন্য উভয় পক্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদের সমাগম হইল। অনন্তর শুভক্ষণে শাস্ত্রীয় বিধি মতে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর, সকলে সবান্ধবে আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইল। নবদম্পতি পরস্পরের মুখ-কমল সলজ্জ নিরীক্ষণ করিয়া, হরপার্ব্বতীর ন্যায় সর্ব্বদা সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। গৃহে অগ্ন্যাধান না করিলে যজ্ঞ ফলে অধিকার হয় না, অতএব শিবগুরু গৃহে অগ্নি স্থাপিত করিলেন, এবং স্বর্গলাভের ইচ্ছায় বহু ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; সেই সকল যজ্ঞভাগ লাভ করিয়া, দেবগণ আপনাদিগের প্রিয়তম অমৃতও বিস্মৃত হইলেন। তিনি কল্পতরুর ন্যায় হইয়া দেবগণ, পিতৃগণ, অথবা মনুষ্যগণ, সকলকে নিজনিজ অভিলষিত দ্রব্য দানে প্রীত করিলেন। সেই

পরোপকারী, নিত্যবেদাধ্যায়ী মহাত্মার সদনুষ্ঠানে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এবং বৎসরের পর বৎসর সকল যাইতে লাগিল। রূপে যদিও তিনি কন্দর্প তুল্য, বিদ্যায় যদিও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং ধনে দেশের অগ্রগণ্য, তথাপি তাঁহার গর্ব্বের অথবা ঔদ্ধত্যের লেষমাত্রও ছিল না। পৃথিবীর ন্যায় তিনি ক্ষমাশীল, এবং তৃণের ন্যায় বিনীত। ক্রমে শিবগুরু বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন, কিন্তু সন্তানমুখ দেখিতে পাইলেন না। ধন শস্য, অথবা পশ্বাদি, সুরম্য ভবন, সম্মান, অথবা বন্ধু সমাগম, পুত্রবিহীন হইয়া তাঁহার কিছুতেই আর সুখ হইল না। এই ঋতুতে সন্তান হইল না, হয়ত আগামীতে হইবে, আগামীতে না হইলে, হয়ত পর ঋতুতে হইবে, এইরূপ আশায় আশায় তাঁহার দিন চলিয়া গেল। হায়, এত সদনুষ্ঠানের পরও সন্তান হইল না! ইহা ভাবিয়া শিবগুরুর আর মনস্তাপের সীমা রহিল না। তিনি মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্বীয় ভার্য্যাকে বলিতে লাগিলেন,—"হে সুভগে, আমাদের আর দুঃখের সীমা কি? অর্দ্ধ বয়স চলিয়া গেল, কিন্তু পুত্রমুখ দেখিতে পাইলাম না। ইহলোকে আমাদের আর আশা কি? পুত্রলাভ পরলোকেও মঙ্গলের কারণ হয়; ভাবিয়া আর কোন উপায় দেখিতেছি না। বৃথাই পিতা আমায় জন্ম দিয়াছিলেন। হে ভদ্রে, পুত্রবিহীন হইলে কে আমাদিগকে স্মরণ করিবে? সন্তান পরম্পরায় সংসারে লোকের নাম থাকে। ফলিত বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, ফলপুষ্প শূন্য বৃক্ষের কেহ আদর করে না।" গৃহিনী উত্তর করিলেন:—"হে নাথ, চল আমরা শিবরূপ কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করি, তাঁহার প্রসাদে অমোঘ ফল লাভ করিতে পারিব। সেই ভক্তবৎসল ভিন্ন কেইবা আমাদের বাসনা পূর্ণ করিতে পারে, আর কাহাকেইবা ডাকিব। তাঁহারই তপস্যার বলে উপমন্যু ক্ষীরসমুদ্রের অধিপতি হইয়াছিলেন।" স্ত্রীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া শিবগুরু, ভগবান্ উমাপতির আরাধনা করিতে মানস করিলেন। শিব সেই সময়ে কেরল দেশস্থ বৃষাদ্রিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শিবগুরু সেই দেব মন্দিরের নিকটস্থিত নদীতে স্নান করিয়া শিবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কিছুদিন কন্দমাত্র আহার করিয়া কাটাইলেন। পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র শিবচরণামৃত পানে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নির্ম্মল-স্বভাবা ভার্য্যাও এইরূপে নিয়ম ও কৃচ্ছাদি দ্বারা শরীর ক্ষয় করিতে করিতে বৃষাদ্রিনাথের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই ভাবে দম্পতির বহুদিন অতিবাহিত হইল। এক দিন শিবগুরু অবসন্ন হইয়া নিদ্রিতের ন্যায় পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে দয়ার্দ্র হইয়া ভক্তবৎসল মহাদেব ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার নয়নগোচর হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন--"ওহে বিপ্র, তুমি কি চাও, কেনইবা এইরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছ?" তখন শিবগুরু উত্তর করিলেন—"হে দেব, আমি পুত্র কামনা করিতেছি।" মহাদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "হে বিপ্র, বল দেখি, তুমি কি সর্ব্বজ্ঞ, বহুগুণ-সম্পন্ন একটীমাত্র পুত্র চাও, অথবা মূর্খ অল্পগুণবিশিষ্ট, দীর্ঘায়ু বহুসংখ্যক পুত্র চাও?" শিবগুরু উত্তর করিলেন "হে দেব, আমার বহুগুণযুক্ত, খ্যাতনামা, সর্ব্বজ্ঞপদভাক্ একটীমাত্র পুত্রই হউক।" "তোমাকে তাহাই প্রদান করিলাম, তোমার

বাসনা পূর্ণ হইবে, আর তপস্যা করিও না, গৃহিনীকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া যাও,” এই রূপ বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। তখন বিপ্রবরের সংজ্ঞা হইল। গৃহিনীকে আপন সুস্বপ্ন জানাইলেন। উভয়ের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সেই স্ত্রীরত্ন বলিতে লাগিলেন—“নিশ্চয় আমাদের সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন একটী পুত্র জন্মিবে।” তাঁহারা গৃহে ফিরিয়া গিয়া স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিতেন।

শিবগুরু একদা অসংখ্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। সেই দিন তিনি যখন সকলের প্রসাদান্ন ভোজন করিতেছিলেন, তখন শৈব-তেজ সেই অন্ন মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাঁহার পতিপরায়ণা স্ত্রীও সেই ভুক্ত-শেষ অন্ন আহার করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হইলেন। দিন দিন গর্ভস্থ সন্তান বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি অলস হইলেন; যাহা কিছু গুরুভারযুক্ত, কি অলঙ্কার, কি গন্ধপুষ্প, সকলই তাঁহার পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়া পড়িল। তাঁহার দোহদজনিত কষ্ট আরম্ভ হইল; কোন আহারীয় বস্তুতে আর রুচি রহিল না। সেই কষ্টের কথা শুনিতে পাইয়া দূর হইতে তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা নানা প্রকার অপূর্ব্ব দ্রব্যাদি লইয়া আসিতে লাগিল; তিনি সেই সকল আস্বাদন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। একদিন স্বপ্নে তিনি দেখিলেন, এক ধবল বর্ণ বৃষ তাঁহাকে বহন করিতেছে, এবং চতুর্দ্দিকে বিদ্যাধর-গণ সবিনয়ে তাঁহার মহিমা গান করিতেছে। কোথাও বা তাঁহার জয়ধ্বনি হইতেছে। কোথাও বা “রক্ষ রক্ষ” “আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর” এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদা সাত্ত্বিক ভাবের উদ্রেক হইত, বিষয় সুখে আর তাঁহার স্পৃহা রহিল না। এইরূপে গর্ভস্থ শিশুর অলোক-সামান্য প্রভাব সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর শুভলগ্নে সতীর এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। সূর্য্য, কুজ, ও রবিসুত তখন তুঙ্গস্থ ছিল, এবং বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ। শিশুর মুখ-জ্যোতিতে রাত্রিকালে সূতিকাগৃহে যেন আর প্রদীপের প্রয়োজন রহিল না। পুত্রমুখ-দর্শনে শিবগুরু আহ্লাদ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন, এবং পুত্রের জন্ম দিন উপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে গো, ধন, ভূমি প্রভৃতি দান করিলেন। সেই শুভদিনে যেন সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুরাও নিজ নিজ হিংসাবৃত্তি হইতে বিরত হইয়া, প্রেমে একে অন্যের গাত্র কণ্ডূয়ন করিতে লাগিল। মহীরুহগণ বিবধ ফলফুলে সজ্জিত হইয়া মহীমাতার অঙ্ক শোভিত করিল। নদী সকল ধারাবাহী আনন্দের ন্যায় পর্ব্বত হইতে নির্ম্মল জলধারা বহন করিতে লাগিল। পর্জন্য যেন প্রেমে সহসা অশ্রুবর্ষণ করিল। সেই দিন উপনিষৎ সকলের মুখে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার আবির্ভাব হইল, এবং ব্যাসদেবের হৃদয়কমল সহসা বিকশিত হইল। গন্ধ-বহ সুগন্ধিতে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। অনন্তর জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতেরা বালকের জন্ম আলোচনা করিয়া বলিতে লাগিল, “এই সন্তান সর্ব্বজ্ঞ হইবে, স্বতন্ত্র শাস্ত্রপ্রণয়ন করিবে, এবং পণ্ডিতদিগকেও বিচারে জয় করিবে। এই শিশু কালে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন হইবে, এবং যতকাল পৃথিবী থাকিবে, ততকাল তাহারও নাম থাকিবে।” শিবগুরু সন্তানের আয়ুর কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলেন, এবং পণ্ডিতেরাও

নিজ হইতে সে বিষয়ে কিছু বলিলেন না। শিশুকে দেখিবামাত্র দর্শকের মনে আনন্দের সঞ্চার হইত বলিয়াই হউক, অথবা বহু তপস্যার পর শঙ্করের প্রসাদে এই সন্তান লাভ হইয়াছে বলিয়াই হউক, পিতা ইহার নাম শঙ্কর রাখিলেন। বালেন্দুর ন্যায় কলায় কলায় শিশু বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিশু হাসিতে শিখিল, ক্রমে হামা দিতে আরম্ভ করিল, পরিশেষে দুই পায় চলিতেও শিখিল। বালকের মুখে যখন কথা ফুটিল, সেই অমৃতবর্ষী অর্দ্ধস্ফুট শব্দ শুনিয়া কোকিলকুল লজ্জিত হইল, বালকের মন্দমধুর গতি হংসকুলকেও পরাজিত করিল। পণ্ডিতেরা তাহার মস্তকে চন্দ্রচিহ্ন, কপালে নেত্র চিহ্ন, এবং স্কন্ধে শূল চিহ্ন দেখিয়া, শিশুকে শিবের অবতার বলিয়া মনে করিল। সন্তানের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতাপিতারও মনের আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই রূপে, লোক সকল যখন পথহারা হইয়া অন্ধ পথিকের ন্যায় বিপথে ভ্রমণ করিতেছিল, মোক্ষমার্গ যখন কণ্টকময় অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, তখন জীবের দুঃখ মোচনের জন্য, মেঘের অন্তরাল হইতে শারদীয় পূর্ণশশধরের ন্যায়, ভগবান্ শঙ্কর ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন।

প্রভাতে।

সাধের বাগানখানি, শত ফুল ফলে সাজি
আজি কি সুন্দর!
শাখায় শাখায় পাখী, বসিয়ে গাহিছে গান
কত মোহকর!
সুনীল আকাশ গায়, ঐ যায় ভেসে যায়,
গীতের ঝঙ্কার!
আমারি শ্রবণে সুধু, তেমন পশে না ভাল;
হৃদয় আমার
তুমিই পাষাণ একা? সকলি গলিয়ে গেছে
দেখ একবার!
তরুণ অরুণরাগে, রঞ্জিত আকাশ ওই—
পড়িছে গলিয়া
পাতায়, সরসী বুকে, প্রস্ফুটিত পুষ্প মুখে,
হাসিয়া হাসিয়া!
গলিত উষার রাগে, গলিত পাখীর তান্
গিয়াছে মিশিয়া;
গলিত সুবাস সহ, ওই দেখ সমীরণ
পড়িছে গলিয়া!
এমন প্রভাতে আজি, থেকো না হৃদয় তুমি
কঠিন, পাষাণ,
প্রকৃতির মত আজি, গলিয়ে গলিয়ে গাও
বিশ্বব্যাপী গান!
ক্ষুদ্র এই কারাগারে, হৃদয় রে, কত দিন
থাকিবে এমনি!
ভাই বলে জগতেরে, ফের দেখি দ্বারে দ্বারে,
কর দেখি বিশ্বপ্রেমে সংগীতের ধ্বনি!!
মলিন বিষাদ মুখে, যত আছে ভাই বোন,
এ জগতে তোর,
হৃদয়ের চারি ধারে—হোক্ ক্ষুদ্র—, বাঁধ সবে
দিয়ে প্রেম ডোর!
গলিয়ে হৃদয় গুলি, এক হয়ে যাবে যবে,
সর-বারি প্রায়—
স্বরগের রাগ পাবি, রঞ্জিতে গলিত বপুঃ,
আয় তবে আয়,
ওই বিহগের গীতে গলিয়ে ভাসিয়ে যাই
সবাকার প্রাণে;
জগতে মিশাই আমি, আমাতে জগৎ খানি
মিশুক এখানে।

বিবিধ প্রসঙ্গ ও সমালোচন।

যে প্রকার দেখা যাইতেছে, জাতীয় ধন ভাণ্ডার আমাদের আশানুরূপ ফল প্রসব করিতে সমর্থ হইবে, বোধ হয় না। এই অভিনব প্রস্তাবের মধ্যে তেমন গভীর চিন্তা দেখিতেছি না,—তেমন উৎসাহ দেখিতেছি না, তেমন স্বার্থশূন্যভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না। যে গভীর চিন্তায় ভারতের একতার বীজ নিহিত, যে উৎসাহে ভারতের হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের সূত্র সংবদ্ধ,—যে স্বার্থ শূন্য ভাবে শত্রুকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করা যায়,—তাহা দেখিতে পাইতেছি না। গভীর চিন্তার পরিচয় পাইলাম না তখনই, যখন শুনিলাম অনুষ্ঠান সভায় জমিদার শ্রেণীর প্রতি অনুদার ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে,—যখন শুনিলাম, প্রকাশ্ত সভায় সর্ব্বশ্রেণীর মধ্য হইতে ট্রষ্টি নিযুক্ত করা হয় নাই,—কিন্তু চুপে চুপে বঙ্গদেশের কয়েক জনকে ট্রষ্টি নিযুক্ত করা হইতেছে,—যখন শুনিলাম টাকার দ্বারা কি কি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে, এ কথার উত্তর বেঙ্গলিপত্র দিতেছেন, এবং বাঙ্গালার কোন কোন সম্পাদক তাহা লইয়াই আনন্দে উৎফুল্লচিত্তে নৃত্য করিতেছেন। জাতীয় ধনভাণ্ডারের ট্রষ্টি নিযুক্ত করিতে কে অধিকারী হইল?—আমরা বুঝিলাম না। বেঙ্গলিপত্রের নিকট কে প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছিল?—আমরা জানিলাম না। ভারতের অসংখ্য লোকের মধ্যে অনেকেই জানিতে পারিল কি?—বোধ করি অতি অল্প লোকেই পারিয়াছে। চিন্তার পরিচয় হইল। তেমন উৎসাহ নাই,—কেন বলি? যাঁহাদিগের সহিত মতের মিল হইল না, তাঁহাদিগকে অশেষ প্রকারে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করা হইল, কিন্তু সকলকে এক করিতে চেষ্টা হইল না,—ইহার ফল এই হইল, এতদিনেও দশসহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইল না। স্বার্থশূন্য ভাব নাই;—ইহার উৎকৃষ্ট পরিচয় এই—জাতীয় একতা সংস্থাপন করিতে যাইয়া নূতন দলাদলির সৃষ্টি করা হইল। এ সকল কথা ভাবিতে বসিলে কাঁদিতে ইচ্ছা করে। জাতীয় ধনভাণ্ডারের প্রধান ২ উদ্‌যোগ-কর্ত্তারা পূর্ব্বে কলিকাতার বড় বড় জমিদারদিগের বাড়ী বাড়ী ঘুরিলে তাঁহাদিগকে একত্র করা যাইত না, আমরা মনে করি না। যশমানকে পৃথিবীতে যে তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিতে না পারিল, তাহার দ্বারা পৃথিবীর কোন মহৎ কার্য্য সমাধা হইবে, কখনই আশা করা যায় না। জমিদারগণ অগ্রসর হইল না, সুতরাং তাহাদিগকে বাদ দেও, তাহাদিগের বাড়ীতে পদার্পণ করিও না, দলাদলির এ স্বার্থময় যশ মানের কালিমা হিতৈষীদিগের চরিত্রে সাজে না। অন্যকে তিরস্কার করিতে রাস্তার মুটে মজুরও পারে, কিন্তু সদ্ভাব স্থাপন করিতে কয় জনে পারে?'—আর যে না পারে তাঁহার বা মহত্ব কি? ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এমন বৃহৎ ব্যাপারে সামান্য সামান্য ত্রুটিতে ভয়ানক অনিষ্ট হইতে চলিল। ভারতের প্রত্যেকের এ সময়ে এ সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত;—প্রত্যেকের এ রোগের প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। কেবল হুজুগেমাতিলে দেশ সংস্কার হয় না।

স্বায়ত্তশাসন।—ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে আমরা স্বায়ত্তশাসনের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি। অথচ তুলনা করিলে স্বায়ত্তশাসনের নিকট ইলবার্ট বিল কিছুই নহে। ইলবার্ট বিল পাশ হইলে গবর্ণমেণ্টের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাহেবদিগের বিচারাধিকার পাইলেই আমরা স্বর্গে উঠিব, ইহা আমরা মনে করি না। স্বায়ত্তশাসনপ্রচলনে একদিকে গবর্ণমেণ্টের মহত্ব, অন্যদিকে আমাদের ভাবী অনেক মঙ্গলের আশা নিহিত রহিয়াছে। জলে না নামিলে কেহই সাঁতার শিখিতে পারে না,—কার্য্যক্ষেত্রে না খাটিলে কেহই কার্য্যদক্ষ হইতে পারে না। আমরা যে রাজনীতি সম্বন্ধে এত হীন, ইহার একমাত্র কারণ আমরা বুদ্ধি খাটাইবার স্থান পাই না। স্বায়ত্তশাসন আমাদের রাজনীতির 'ক খ' শিক্ষার প্রথম ক্ষেত্র,—যদি ইহা দেশে প্রচলিত হয়, তবে আশা আছে, আমরা এক দিন মানুষ হইতে পারিব। স্বায়ত্তশাসনের তুলনায় ইলবার্ট বিল ক্রীড়নক মাত্র, এই খেলার দ্রব্য লইয়া ব্যস্ত হইয়া আমরা আমাদের পরম মঙ্গলের পথ ভুলিয়া রহিয়াছি। দেশের অধিকাংশ সম্পাদকগণ ঐ বিল লইয়া ব্যস্ত। ইলবার্ট বিল যে অবস্থায়ই হউক, নিশ্চয় পাশ হইবে। ষ্টেট সেক্রেটরি কিম্বারলির উত্তর এবং বিলাতের বড় বড় লোকের মতামত শুনিয়া আর কাহারও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নহে। আমরা আমাদের সকল সহযোগীকে অনুরোধ করি, এই সময়ে স্বায়ত্তশাসনের কথা লইয়া একবার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হউন। শীতঋতু আসিতেছে, রীপন সিমলাশৈল পরিত্যাগ করিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এ সময়ে আর উদাসীনতা ভাল দেখায় না।

প্রকৃততত্ত্ব। আচার্য্য আনন্দস্বামী কর্তৃক বিবৃত। পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য প্রশংসার্হ। পুস্তকখানি ধর্ম্মবিষয়ক, এই জন্য আমরা বিশেষ যত্ন সহকারে ইহা পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানির লেখা ভাল, কিন্তু সকল মতের সহিত আমরা ঐক্য হইতে পারিলাম না। যাহা হউক, পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

লীলাবতী—অর্থাৎ ব্যক্তগণিত। শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক ভাস্করাচার্য্যকৃত মূলের অনুবাদ—পূর্ব্বার্দ্ধ। অনুবাদক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে এই পুস্তকের জন্য আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। তিনি লীলাবতীকে উদ্ধার করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহার শেষার্দ্ধ অদ্যাবধিও কেন প্রকাশিত হইল না, আমরা বুঝিলাম না। আশা করি তিনি শেষার্দ্ধ প্রকাশের সময়ে প্রচলিত পাটীগণিতের নিয়মগুলি যোজনা করিয়া দিয়া পুস্তকখানিকে বিদ্যালয়ের উপযুক্ত করিবেন।

শ্মশান ও জীবন, এবং ষোল বচ্ছুরী পেত্নী। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। রাজকৃষ্ণ বাবু সুকবি; অতি সহজ সহজ কথায় গভীর ভাব ঢালিয়া দিতে পারেন। কিন্তু বহুল গ্রাম্য শব্দ ব্যবহারে পদ্যগুলি কিছু শ্রুতিকঠোর হইয়া থাকে। শেষোক্ত গ্রন্থখানিতে এ দোষ যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। 'ষোলবচ্ছুরী পেত্নী' এই কদর্য্য নামটী রাজকৃষ্ণ বাবু ইচ্ছা করিলেই পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। ভাল কথা বলিবার সময়ে, এ প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করা যদি আবশ্যক হয়, তবে এদেশের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা বলিতে হইবে। রাজকৃষ্ণ বাবুকে আমরা অনুরোধ করি, তিনি এ প্রণালী পরিত্যাগ করুন। ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়-ভাণ্ডারে যে অমূল্য শক্তি ঢালিয়া রাখিয়াছেন, উপযুক্ত রূপ খাটাইতে পারিলে, তাহার দ্বারা দেশের অনেক উপকার

হইবে। আশা করি, তিনি সেই শক্তির অপব্যবহার করিবেন না। আলোচ্য পুস্তক দুখানিতে কবিত্বের ছলনে অনেক গুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ধৈর্য্যসহকারে যাঁহারা পুস্তক দুখানি পাঠ করিবেন, তাঁহারা সুখী হইবেন, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

উৎসর্গ।—শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র দে প্রণীত। গ্রন্থকারকে আমরা নিরুৎসাহিত করিতে চাহি না। তিনি এই শক্তি সাধনায় নিযুক্ত থাকুন, অবশ্য এক দিন ভাল কবি হইবেন। কিন্তু কবিতা লিখিলেই ছাপাইতে হইবে, এ বাসনাটীকে পরিত্যাগ করুন। যাহাতে জগতের কোন প্রকার উপকার নাই, এমন পুস্তক প্রকাশ করিয়া ফল কি?

আবর্জ্জনা।—রুচী ভাল, স্থানে স্থানে কবিত্বও আছে, কিন্তু নানা কারণে এই গ্রন্থকারকেও আমরা কিছুদিন অপ্রকাশ্যে থাকিতে পরামর্শ দি। নীরব জগতে সাধনা করুন, অবশ্যই এক দিন সিদ্ধ হইবেন,—অবশ্য একদিন জগতের উপকারে লাগিবেন। বলা বাহুল্য, গ্রন্থকারের আজও সে দিন উপস্থিত হয় নাই।

সুখ (পার্থিব ও আধ্যাত্মিক) এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির লেখা সরল, উদ্দেশ্য ভাল, মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

সারিমালা। এই পুস্তকখানি কোন্ শ্রেণীর লোকের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা বুঝিলাম না। নৌ-সঞ্চালন উৎসব ভাল বটে, কিন্তু সারিমালা প্রচারে তাহার কি উন্নতি হইতে পারে? নিরক্ষর মাঝীরা এ পুস্তক কখনও হাতে করিবে, বোধ হয় না। পুস্তকের গানগুলি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই, তবে 'গৃহযাত্রা' নামক গীতটী আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে।

বৈষয়িক তত্ত্ব;—মাসিক পত্র, তাহিরপুর হইতে প্রকাশিত। আমরা কেবল প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, কাগজখানি আছে কি উঠিয়া গিয়াছে, আমরা জানি না। প্রথম সংখ্যা মন্দ হয় নাই, কিন্তু বাহ্যাড়ম্বর কিছু অধিক বোধ হইল, কাগজখানি স্থায়ী হইলে মঙ্গলের আশা করা যায়।

তরঙ্গিণী—মাসিক পত্র। কেবল বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের কাগজ পাইয়াছি, ভাদ্র মাসের অর্দ্ধেক অতীত হইল, আষাঢ় শ্রাবণের কাগজ তবুও পাওয়া গেল না। তরঙ্গিণীর রুচি অতি জঘন্য। তরঙ্গিণী এ প্রকার কুরুচির সহিত আর বাহির না হয়, ইহা আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

সিন্ধুদূত। কোন এক নির্ব্বাসিত ফরাসী সাধারণ তান্ত্রিক বীরবরের উক্তি। বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই নবীন বাবুই একদিন 'ভুবনমোহিনী' সাজিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হতভাগ্য বাঙ্গালায় আমরা অনেক দেখিলাম। যে কারণেই হউক; নবীন বাবুর আর সে দিন নাই—আজ নবীন বাবুর বক্ষ স্ফীত হইয়াছে। এমন একজন সুলেখক কেন ছদ্মবেশে পূর্ব্বে ছলনা করিয়াছিলেন, আমরা বুঝি না। যাহা হউক, আজ অবশ্য আমরা নবীন বাবুর সাহসের প্রশংসা করিব। তাঁহার সিন্ধুদূত পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম, স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব আছে।

নীলিমা, Gleams of the New Light, Sankaracharja. ইয়ুরোপে তিন বৎসর, নিশীথ চিন্তা, বিধবা ও মানব-প্রকৃতি ভবিষ্যতে সমালোচিত হইবে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, নব্যভারতের বিনিময়ে আমরা নিম্নলিখিত পত্রিকাগুলি পাইয়াছি। সাধারণী, সহচর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, তত্ত্বকৌমুদী, ধর্ম্মবন্ধু, সারস্বত পত্র, পরিদর্শক, সঞ্জীবনী, ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন, প্রতিনিধি, ভারতহিতৈষী, প্রভাতী, আসাম নিউচ, ইণ্ডিয়ান নেসন, আদর্শ, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, রঙ্গপুর দিক প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান একো, ভারতমিহির, বঙ্গবাসী, সময়, প্রবাহ, বামাবোধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, বিজ্ঞানদর্পন, তরঙ্গিণী, বৈষয়িক তত্ত্ব, সখা, আর্য্যরঞ্জন, হিন্দুদর্শন, ভিষক, Voice of India, কিরণ, ঊষা, এবং ভারতসুহৃদ।

মহাশক্তি।

শক্তি কি? জড়তত্ত্ববিৎ বলিবেন,—শক্তি, গতি বা ক্রিয়ার নামান্তর মাত্র। এই ঘটনাময় জগতে প্রতিনিয়ত কার্য্যের পর কার্য্য সংঘটিত হইতেছে। এই কার্য্য পরম্পরার অনাদি অনন্ত শৃঙ্খলের মধ্যেই আমরা শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। পার ত, একটী একটী করিয়া সমস্ত কার্য্য বা ঘটনা বন্ধ করিয়া দেও, দেখিবে, সমুদায় শক্তি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। আমরা আর শক্তি বলিতে কিছুই বুঝিব না। কার্য্য বা ক্রিয়ার সংঘটন হইতে শক্তির পৃথক্ অস্তিত্ব কিছুই নাই। পরমাণু পরমাণুটীকে টানে, শক্তি প্রকাশ সেই খানে, পরমাণুসমষ্টি বা রাশি সমূহ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, আবার একটী পরমাণুপুঞ্জ অপরটী হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চায়; যুগপৎ এই দ্বিবিধ ক্রিয়ার সংযোজনাতে চক্রগতি নামে একটী মহাফল উৎপন্ন হইয়া, শক্তি সঙ্কাশ করে। অনন্ত আকাশ এই শক্তি-সাগরের মহাধার; গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য সেই মহাসাগরের অগণ্য, অসংখ্য বুদ্‌বুদ্ মাত্র।

দৈহিক বল এবং ভারিত্বও শক্তি। বৃহৎ পরমাণুপুঞ্জ, ক্ষুদ্র পরমাণু-রাশির আকর্ষণ বিনাশ করিয়া তৎপ্রতি যে অতিরিক্ত আকর্ষণ প্রয়োগ করে, তাহা হইতেই ভারিত্ব উৎপন্ন হয়। দৈহিক বল ও এই ভারিত্বের সংগ্রাম ক্রিয়াকালে উক্ত উভয় শক্তির অনুভূতি বা প্রকটন হইয়া থাকে। সুতরাং ঘটনার পরে ঘটনার সংঘটন ব্যতীত শক্তি আর কিছুই নহে। জড়তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা জড়বাদী এই যুক্তির উপরে উঠিতে পারে না। বোধ হয়, এইরূপ যুক্তি হইতেই এবম্বিধ মীমাংসা উপস্থিত হইয়াছে যে,—"ঘটনার ফল ঘটনা। এ বিশ্ব সংসার ঘটনা-শৃঙ্খল অথবা ঘটনা মহাসমুদ্রের অসম্পূর্ণ বুদ্‌বুদ মাত্র। তদ্ভিন্ন সৃষ্টির মূলে কোন শক্তি নাই। বস্তুতঃ শক্তি আকাশকুসুম বই কিছুই নয়"

ধর্ম্মজীবী আধ্যাত্মিকপ্রাণী হিন্দু সন্তানকে জিজ্ঞাসা কর,—"শক্তি কি?" অমনি উত্তর পাইবে,—"শক্তি দেবতা।" হিন্দুর কোটি কোটি দেবতা—কোটি কোটি দেবদেবী, কোটি কোটি শক্তির আধার মাত্র। প্রাচীন আর্য্য, প্রকৃতির মনোহর গম্ভীর ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া, সুগন্ধ মলয়ানিলে অভিষিক্ত হইতে হইতে, বসন্তের মোহিনী উষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, যে জগৎ অন্ধকারে ঢাকা ছিল, তাহা হাসিতেছে! যে বিশ্ব সংসার নীরবে ঘুমাইতেছিল, তাহা অগণ্য অসংখ্য ফুল্ল কুসুম-নয়ন খুলিয়া চাহিয়া আছে, সুগায়ক বিহঙ্গ, কলরব ছলে

ত্রিভুবন মাতাইয়া মধুর মধুর গাইতেছে দেখিলেন,—একটী আলোকধারা—তপ্ত-কাঞ্চন প্রবাহ সদৃশ একটী জ্যোতির স্রোত, কি মন্ত্র বলে জানি না, এ অন্ধকার, মলিন, নিদ্রিত, অচেতন বিশ্বকে জাগাইতেছে, হাসাইতেছে, গাওয়াইতেছে! বুঝিলেন, আলোকের গর্ভে কি যেন অস্ফুট শক্তি নিহিত আছে, সেই শক্তির এ কার্য্য। অন্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ আলোকের মূল প্রবাহ কোথায়?" অমনি প্রকৃতি, নীরব গম্ভীরে একথার উত্তর দিল—"ঐ অরুণরাগরঞ্জিত সূর্য্যমণ্ডলে!" ভক্তির স্বভাব-প্রসূত সন্তান, জ্ঞানবীর আর্য্য, অমনি স্তম্ভিত হইয়া, নমস্কার করিলেন—

"নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে।
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।"
ইত্যাদি

এই শক্তি প্রভাবে "সূর্য্য" হিন্দুর পূজ্য দেবতা। শক্তি প্রভাবেই ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ হিন্দুর উপাস্য। প্রকৃতির অবিকৃত পবিত্র সন্তান—আর্য্যের সরল প্রাণ—যেখানে শক্তি দেখিয়াছে, সেখানেই হৃদয়ের ভক্তিশ্রদ্ধা ঢালিয়া দিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাই অনন্ত শক্তিময় বিশ্বরাজ্যে হিন্দুর দেবতার সংখ্যাও অনন্ত। কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন দেবতাই সেই অগণ্য,অসংখ্য দেবতার মূল এবং আদি দেবতা

সৃষ্টির মূলে অনুসন্ধান করিলে, আদৌ ত্রিবিধ শক্তির কার্য্য আমাদের চক্ষুতে ভাসিতে থাকে। গঠন, পালন এবং ধ্বংস, এই তিনটী কার্য্যের সমবেত ফল হইতেই এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের ক্রম-বিকাশ সম্পাদিত হইতেছে, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকে আর বুঝাইয়া বলিতে হয় না। হিন্দুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই শক্তিত্রয়ের অবতার বই কিছুই না, ইহাও পুরাতন কথা। তার একটুকু সূক্ষ্ম দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, গঠন, পালন এবং ধ্বংস এই তিনটী কার্য্য, তিনটী পৃথক্ শক্তির ফল নয়, কিন্তু একটী মাত্র শক্তির। দার্শনিক জগতে এ স্থলে মত দ্বৈধ আছে। কেহ কেহ সৃষ্টি-শক্তি এবং রক্ষিণী শক্তির ভিন্নতা দেখিতে পান। আমরা নিত্য পরিদর্শনে দেখিতেছি, এ জগতে যত উৎপন্ন হয়, তত থাকে না। যত ফল ফলে, যত ফুল ফোটে, যত জীবের উৎপত্তি হয়, তত থাকিলে জগতে ধরিত না, বরং বিষম বিশৃঙ্খলাই ঘটিত। সুতরাং স্বীকার করা উচিত, সৃষ্টি শক্তি রক্ষার চিন্তায় সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। অতএব স্রষ্টা আর রক্ষাকর্ত্তা পৃথক্, এক নয়, অনেক পাশ্চাত্য দর্শন-কারের এই মত। সাঙ্খ্যের পুরুষ প্রকৃতির মধ্যেও কতক পরিমাণে ইহার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের মূলে যে দর্শনের অস্ফুট আভা আমরা দেখিতে পাই, তাহা মত আরও পার্থক্যের দিকে। যদি সৃষ্টি শক্তি আর রক্ষিণী শক্তির ভিন্নতা সম্ভবপর হয়, তবে ধ্বংসের অপরাধ? সৃষ্টির কার্য্য, উৎপন্ন করা। সে পালন-নিরপেক্ষ হইয়া যেমন তাহাই করে, রক্ষিণী শক্তিও তেমনই ধ্বংস নিরপেক্ষ হইয়া কেবল রক্ষাই করিবে. ইহাই ত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। তবে ধ্বংস কেন? অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ধ্বংস শক্তি, সৃষ্টি ও পালনী শক্তির অতীত কিছু,—পৃথক কোন শক্তিবলে এ জগতে ধ্বংস কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এই ধ্বংস ব্যতীত বিশ্ব ব্যাপারে মহতী বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হইয়া এ সুখের সংসারকে দুঃখের

আগার বিপদের রঙ্গক্ষেত্র এবং বিষের ভাণ্ডার করিয়া তুলিত। ইহার এই সৌন্দর্য্য, এই বৈচিত্র্য, এই আনন্দ ও কুতূহলোদ্দীপক ভাবের কিছুই থাকিত না। থাকিত কি? একবার বলিয়াছি, আবার বলি,—"থাকিত দুঃখ, বিপদ, আর বিষ,—আর থাকিত অন্ধকার। ধ্বংস এই সকল অশিব বিনাশ করিয়া, বিশ্বে মঙ্গল সুধাসিন্ধু উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং ধ্বংস শক্তির অবতার শিব। হিন্দুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের মূল এই, এরূপ বলিলে আমাদের অনধিকার চর্চ্চা হয় কি? কোন অগাধ বুদ্ধি বাঙ্গালী লেখক এ কথায় সায় দিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে বলিতে হইল, হিন্দুর ত্রিমূর্ত্তি বাদ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা গেল, তাহা অনেকাংশে ত্বদীয় সুতীক্ষ্ণ চিন্তার ছায়ামাত্র। আমরা বিশ্বাস করি, উক্ত ত্রিমূর্ত্তি বাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই যুক্তি ঠিক। কিন্তু আরও কিছু বলিবার আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিশ্ব ব্যাপারের মূলে যে কার্য্যত্রয় দেখিতে পাই, তাহা একই শক্তিসম্ভূত। যে হিন্দু ত্রিমূর্ত্তিবাদী বা মূল শক্তিত্রয়ের অধিষ্ঠাতা দেবত্রয়ে বিশ্বাসী, প্রথমে দেখি,—তাঁহারাই আমাদের কথায় সায় দেন কিনা? হিন্দু শাক্ত,—হিন্দু মহাশক্তির মহামন্ত্রে দীক্ষিত। বাঙ্গালী পাঠকের নিকট এই 'মহাশক্তি" শব্দটী এত পরিচিত যে, ইহার উচ্চারণ মাত্র অনেকের ভগ্ন হৃদয়তন্ত্রীর ছিন্ন তার গুলি, আপনি বাজিয়া উঠিয়া, শারদীয় মহোৎসবের প্রাণভূতা দশভুজার স্তুতি গানে প্রবৃত্ত হয়। বাঙ্গালী মৃত—মৃতের নিকট দুঃস্বপ্নও স্বর্গ সঙ্গীতের সুরধারা স্বরূপ, তাই দশভুজাই মৃত বাঙ্গালীর মহাশক্তির মহাদর্শ। পূজনীয় প্রাচীন আর্য্য-মহাপুরুষের মহতী কল্পনা আজ আমাদিগকে কি বুঝাইয়া দিতেছে? মহাশক্তি কে?—মহাশক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের জননী,—মহাশক্তি ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যে শক্তির অনন্ত ধ্যানে নিমগ্ন সেই শক্তিই মহাশক্তি। এই মহাশক্তিই আদ্যাশক্তি, এক এবং মূল শক্তি। যখন কিছু ছিল না, অনাদি অনন্ত কারণ-সলিলে ইনিই ভাসিতে ছিলেন! ইঁহাতেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ময় এই বিশ্ব এবং আদি জ্যোতি নিহিত ছিল, ইঁহা হইতেই এই আনন্দময়, এই জ্যোতির্ম্ময়, মনোহর জগৎ ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়া, ইঁহাতেই অবস্থিতি করিতেছে! এই মহাশক্তি দেবের আরাধ্য, নরের আরাধ্য—ইঁহারই স্তুতিগানে, স্থাবর জঙ্গম চরাচর বিশ্ব নিয়ত নিমগ্ন। অতএব একই তিন, তিনই এক। এক মহাশক্তিরই প্রয়োগত্রয় হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়; বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের প্রকাশ; আবার এই তিনের নির্ব্বাণে সেই এক আদ্যাশক্তি কিম্বা মহা শক্তিরই আবির্ভাব। সুতরাং তিন ভাবনার ফল মাত্র, একই মূল। তবে এখন সাহস করিয়া বলিতে পারি,—হিন্দুও বলেন, "বিশ্ব-মূল নিহিত কার্য্যত্রয় একমাত্র শক্তি সম্ভূত।" এই মহাশক্তিই আর্য্য হৃদয়-কমলে অধিষ্ঠিত মহাদেবী; তাই প্রাচীন আর্য্য মহাশাক্ত। মৃত বাঙ্গালী-হিন্দু আজ, ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ডে, সেই পূর্ব্ব পুরুষ পরম্পরাগত অনন্ত অনাদি পিপাসার সন্তর্পণে উদ্যত, তাই তাহাকে শতধিক! আর কিছু বলিব না। তবে পাঠক, এই পুরাতন কথায় ভুলিবেন কেন? এখন দেখি নূতন বিজ্ঞান, এই মহাশক্তি সম্বন্ধে কিছু বলে কি না।

নিত্য পরিদর্শন, সকল বিজ্ঞানের মূল বীজ। বট বীজ হইতে যেমন বট বৃক্ষের, বর্ণমালা হইতে যেমন মহাকাব্যের উৎপত্তি, লক্ষাধিক বৎসর পূর্ব্বের সেই ফলমূলাহারী, পশু শ্রেণীভুক্ত, পূর্ব্বতন পুরুষদের অস্ফুট-পরিদর্শন হইতেই আজ উনবিংশ শতাব্দীর এই উন্নত বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে। জীবনের এই নিত্য পরিদর্শনে আমরা দেখিতে পাই,—গঠন, স্থিতি, ধ্বংস এই তিনটী কার্য্য যেন কোন একমাত্র ইচ্ছাসূত্রে পরিচালিত হইয়া, সুনিপুণ কারিকরের ন্যায়, এই সুন্দর বিশ্বকে, মনের মতন সাজাইয়া ক্রমে সুন্দরতর এবং সুন্দরতম করিতেছে। যেখানে যেটীর দরকার সেখানে সেটীকে বসাইতেছে, যেখানে যেটীর দরকার শেষ হইয়াছে, অমনি তাহাকে অন্তর্হিত করিতেছে। এই শৃঙ্খলা না থাকিলে, জগতে কি সৌন্দর্য্য এবং উদ্দেশ্যহীনতা পরিলক্ষিত হইত, তাহা কল্পনা করিতেও ভয় হয়! এমন কি, আমরা উক্ত কার্য্যত্রয়ের একটীকে বাদ দিয়াও বিশ্ব রক্ষার কল্পনা করিতে পারি না। এই রূপে এই তিনটী প্রধান কার্য্যের মূলগত সাম্যের স্থূল ভাব অবলম্বন করিয়া, যখন আর একটুকু সূক্ষ্মতর চিন্তায় প্রবৃত্ত হই, তখন দেখিতে পাই, ফুলটী ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িলে, একটী ফল উৎপন্ন হয়। ফুল যদি ফুটিয়াই থাকে, তবে ফল কখনও হইতে পারে না। সুতরাং যিনি ফল গড়িলেন, তিনিই ফুল ভাঙ্গিলেন। আবার ফুলটী একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না; যাই সময়টী পূর্ণ হয়, অমনি ফুলটী, ফলটীকে আপনার স্থান ছাড়িয়া দিয়া পলাইতে বাধ্য হয়। অতএব যিনি ফলের স্রষ্টা, তিনি যেমন ফুলের ধ্বংসের হেতু; তেমনই স্থিতির নিয়ামক। সুতরাং এই স্থানে গঠন, স্থিতি ধ্বংস তিনই একের কার্য্য। এক স্থানে যদি এই ত্রিবিধ কার্য্য একের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সর্ব্বত্রই তাহা সম্ভবনীয়। আর একটুকু পরীক্ষার রাজ্যে যাও, দেখিবে,—যে আকর্ষণী শক্তি ফুলের গঠন কার্য্যে প্রযুক্ত, তাহাই তাহার পতন এবং ধ্বংসের কারণ, আর সেই শক্তিই তাহার স্থিতির প্রাণ। এ কথাটী কেবল ফুলে নয়, বৃক্ষ, পর্ব্বত, গ্রহ, নক্ষত্র সকলেতেই সমান রূপে খাটিতে পারে। এই রূপে পরীক্ষার পরে পরীক্ষা করিয়া যুগ যুগান্তে মানব সাধারণ যে জ্ঞান সঞ্চিত করিয়াছে, আজ নবীন বিজ্ঞানবিৎ তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেছেন, কি ধূলিকণা, কি জল বিন্দু, আর কি সূর্য্যমণ্ডল ও গ্রহাদি, সকলই এক মাত্র শক্তির ফল, একমাত্র নিয়মের অধীন। এক বিশ্বব্যাপী মহাশক্তিই জগতের প্রাণ। সেই শক্তিই মূল শক্তি, তাহাই এক এবং আদ্যাশক্তি। তাহার ভাব অনাদি অনন্ত। সেই মহাশক্তির চিন্তায় আমাদের প্রাণ অধীর হয়, বুদ্ধি মন স্তম্ভিত হয়, এবং হৃদয় বিস্ময় রসে প্লাবিত হইয়া যায়। অতএব প্রাচীন হিন্দু আর নূতন বৈজ্ঞানিকের মতের পার্থক্য অতি অল্পই। কিন্তু যাহা হউক, জড়বাদীর মতে—যাঁহারা শক্তি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে আমরা এতক্ষণ বুদ্ধিহীনের ন্যায়, নিরর্থক শূন্যে সৌধ রচনা করিয়া, তাহাতেই রাজ সুখভোগের চেষ্টা করিতেছিলাম। তাঁহারা বলেন, শক্তি আকাশকুসুম, শক্তি মনের সংস্কার, শক্তি বা মহাশক্তি কিছুরই অস্তিত্ব নাই। একথা প্রস্তাবের প্রথমেই বিবৃত হইয়াছে। এখন দেখি,

ইহার উত্তর আছে কিনা। কিন্তু বিস্তীর্ণ উত্তর এ প্রস্তাবের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং স্থূল ভাবে. দুই একটী কথা বলিয়াই আমাদের বিষয় শেষ করিব।

আমরা হাত, পা নাড়ি, অঙ্গ সঞ্চালন করি, ভারী জিনিস তুলি, এ সকল শক্তির কার্য্য কি না? তুমি বলিতে পার, তোমার ইচ্ছা একটী ঘটনা, স্নায়ুর কার্য্য তৎপরবর্ত্তী ঘটনা এবং ঐ সকল কার্য্য তৃতীয় ঘটনা স্থানীয়। কিন্তু তোমাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, এই ঘটনা তিনটীর যোগ অনিবার্য্য এবং সম্বন্ধ স্থির। অর্থাৎ ইচ্ছার যোগ বা সংঘটনাতে স্নায়ু সঞ্চালন, স্নায়ুসঞ্চালনাতে হাত পা নাড়াদি কার্য্যের প্রকাশ। ইহার একটী ঘটনার অঘটনাতে আর একটী ঘটিতে পারে না। সুতরাং এই তিনটী ঘটনার যোগ অনিবার্য্য। আর ইচ্ছার ঘটনা আগে, তৎপরে স্নায়ুসঞ্চালন, সর্ব্বশেষে কার্য্যের বিকাশ, অর্থাৎ এই তিনটী ঘটনার মধ্যে প্রথমত্ব, দ্বিতীয়ত্ব, তৃতীয়ত্ব এই সম্বন্ধত্রয় স্থির। ইহার ব্যতিক্রম অসম্ভব। কখনও আগে কাজটী, পরে স্নায়ু সঞ্চালনটী, তৎপরে বা ইচ্ছার ঘটনাটী ইত্যাদি কোনরূপ বিশৃঙ্খলা সম্ভবপর নয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সর্ব্বাগ্রে ইচ্ছার উদ্রেক ব্যতীত, শারীরিক সঞ্চালনাদি বা ভার তোলাদি কার্য্য কখনই সম্ভবিতে পারে না। বোধ হয়, এস্থলে ইচ্ছাকে ঐ সকল কার্য্যের হেতু বলিলে কোনই আপত্তি হইতে পারিবে না। এখন দেখ— বায়ু ঐ পাতাটী উড়াইল, উহা আমার বা তোমার ঐ ভারী বস্তুটী তোলার অনুরূপ কার্য্য কিনা? অবশ্য বলিতে হইবে, হাঁ, কারণ এই চাক্ষুস তুলনাতে—সাদৃশ্যে কোন ভুল নাই। এইরূপ, আমি টানিয়া ঐ ফলটী ছিঁড়িলাম, এও যে কথা, আর ঐ পৃথিবী টানিয়া ফলটী ছিঁড়িল, সেও সেই কথা। এখানে কার্য্যগত সম্পূর্ণ সাম্য আছে; কেবল একটীর নাম টানা, আর একটীর নাম মধ্যাকর্ষণ, এই নামগত অলিক পার্থক্য। আর একটী কথা,—একই জাতীয় দুইটী কার্য্যের একই জাতীয় হেতু অবধারণ করাতে দোষ কি? তুমি ফলটী টানিয়া ছিঁড়িলে, আর আমি ফলটী টানিয়া ছিঁড়িলাম, আমাদের উভয়ের এই কার্য্যের হেতু ইচ্ছা। ঐ বানর ফলটী টানিয়া ছিঁড়িল, উহার ঐ কাজের হেতুকেও আমাদের কাজের হেতুর জাতীয় বলিতে সঙ্কোচের কারণ নাই। তবে ঐ পৃথিবী যখন ফলটী টানিয়া ছেঁড়ে; তখন পূর্ব্বোক্ত জাতীয় হেতু প্রয়োগ করিতে সঙ্কোচ কেন? বস্তুতঃ আমার আর ঐ পৃথিবীর কার্য্য যখন একরূপ, আবার আমার কাজের পশ্চাতে যখন একটী স্থির সম্বন্ধযুক্ত, অনিবার্য্য রূপে সংঘটনীয় ঘটনা কিম্বা হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারি, তখন পৃথিবীর উক্ত কার্য্যের পিছনেও হেতুর সংযোগ ন্যায়সঙ্গত। আর এক জাতীয় কার্য্যের হেতুকেও, এক জাতীয় বলিতে দোষ নাই, বরং অন্য হেতু না জানা পর্য্যন্ত ঐ রূপ করিতে আমরা বাধ্য। অর্থাৎ আমাদের অভ্যাসই বল, আর সহজ প্রকৃতিই বল, আমরা ঐ রূপ না করিয়া পারি না। এইরূপে বিশ্ব কার্য্যের পশ্চাতে, আমরা ইচ্ছারূপ হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারি, গাঢ় চিন্তার চক্ষুতে এ কথার মর্ম্ম অতি সহজ। আবার শক্তির অনুভূতি মানবমাত্রের পক্ষেই অনিবার্য্য। কি আদিম অসভ্য বা বর্ব্বর,— কি সভ্যতম মহাপণ্ডিত, কেহই ইহার অতীত নয়। ঘটনাবাদীরাও এ কথা স্বীকার

করেন। পরন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ শক্তির তুলনাতেই বাহ্য শক্তির পরিচয় পাই। আমি যে পাথরখানি তুলিতে, শক্তি প্রয়োগ করি, বায়ু সেই পাথর তুলিল, সুতরাং বায়ুর শক্তি আছে, মনে করি। আবার আমার শক্তি ইচ্ছার ফল মাত্র। ইচ্ছা হইলে আমি পাথর নাড়িতে পারি, ইচ্ছার অভাবে তৃণ গাছটীও তুলিতে পারি না। সুতরাং আমার শক্তির জাতীয় শক্তিকে, যতক্ষণ অন্য কিছুর ফল না বলিয়া জানি, ততক্ষণ ইচ্ছার ফল মনে না করিয়া পারি না। জগতের শক্তি যে অন্য কিছুর ফল, ইহা কেহ জানে না। সুতরাং উহাও ইচ্ছার ফল মাত্র। এই রূপে যে দিক দিয়া যাই, সেই দিক্ দিয়াই দেখিতে পাই, এই বিশাল বিশ্ব ব্যাপারের মূলে একমাত্র মহতী ইচ্ছা বিরাজিত। আবার ইচ্ছার সঙ্গে চৈতন্যের যোগ অনিবার্য্য এবং স্থির, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না। অতএব সেই বিশ্বব্যাপী মহতী ইচ্ছা জীবন্ত এবং জলন্ত। এই জলন্ত, জীবন্ত মহতী ইচ্ছাই মহাশক্তি। এই মহাশক্তি যে এক এবং আদ্যাশক্তি ইহা বারম্বার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ঐ নৈশ আকাশে, অগণ্য, অসংখ্য নক্ষত্র হাসিতেছে, উহার প্রাণ এবং জীবন এই মহাশক্তি। ঐ মেঘের জল, বায়ু-তরঙ্গ, সাগরোচ্ছ্বস সেই মহাশক্তিরই ইঙ্গিত। ঐ ঝটিকার শব্দ, বজ্রনির্ঘোষ সেই মহাশক্তিরই ঘোষণা। ঐ প্রভাত সূর্য্যের আলোকে এবং পুষ্পরাশির শোভার মধ্যে সেই মহাশক্তিরই অট্ট অট্ট হাস্য বিরাজিত। প্রভাতের কলকণ্ঠ বিহঙ্গ এবং নদনদীকুল উচ্চরবে তাঁহারই জয় জয়ন্তী গানে উন্মত্ত। মানব, তোমার প্রাণে ডোব, হৃদয়ে প্রবেশ কর, দেখ—মহাশক্তির মহাবির্ভাবে তুমি বিভোর। তোমার নিশ্বাস, প্রশ্বাস, রক্তের প্রবাহ মধ্যে তিনি। তুমি তাঁহাদ্বারা অণুপ্রাণিত, তাঁহাতে জীবিত, তাঁহাতেই সংস্থিত। ইনি কে জান? ইনি সেই জগতের মহাজননী,—আর্য্যের মহাশক্তি রূপিনী বিশ্ববন্দিনী! আজ করজোড়ে ইহঁকে প্রণিপাত কর!

অসি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

অসি, খড়্গ ও তরবারি,—এ সকল পর্য্যায় শব্দ। এজন্যই আমরা "অসি" শীর্ষক প্রবন্ধে কখন খড়্গ, কখন বা তরবারি শব্দের উল্লেখ করিব। ইতিপূর্ব্বে এতৎ সম্বন্ধে আমরা যে প্রথম প্রস্তাবে লিখিয়াছি, তাহাতে সকল বক্তব্য পর্য্যাপ্ত হয় নাই। এজন্য আমরা এতৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রস্তাব লিখিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম প্রস্তাবে শুক্রনীতি, আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বীরচিন্তামণি, বৃহৎসংহিতা ও বৃহৎ শার্ঙ্গধর প্রভৃতির প্রমাণ ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। পরন্তু কল্পদ্রুম অভিধানে যে যুক্তিকল্পতরু ও খড়্গ পরীক্ষা নামক গ্রন্থের সংগ্রহ আছে, তাহার অত্যাল্প বাক্যও উদ্ধৃত করি নাই। সেই ত্রুটী পরিহার করিবার জন্যই এই দ্বিতীয় প্রস্তাবের আরম্ভ। প্রথমে ইহার কল্পদ্রুমধৃত খড়্গপরী-

ক্ষার একটী বঙ্গানুবাদ এবং ইহার শেষ ভাগে খড়্গাক্রিয়া অর্থাৎ খড়্গাযুদ্ধেরস স্মরণ-প্রণালী বর্ণন করিলাম। কল্পদ্রুম গ্রন্থে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক আছে, সে গুলিকে সুপ্রাপ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। তদ্দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাই বঙ্গভাষায় গ্রথিত করিলাম।

খড়্গের পরীক্ষা আটপ্রকারে নিষ্পন্ন হয়। সেইজন্যই খড়্গাবিজ্ঞান অষ্টাঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত। খড়্গের প্রথম বিজ্ঞেয় অঙ্গ, দ্বিতীয় রূপ, ৩য় জাতি, ৪র্থ নেত্র, ৫ম অরিষ্ট, ৬ষ্ঠ ভূমি, ৭ম ধ্বনি এবং তাহার ৮ম পরিমাণ।

খড়্গের অঙ্গ কি? তাহা শুন। খড়্গা গঠিত হইলে তাহার শরীরে যে নানা প্রকার চিহ্ন বা দাগ (রেখাকার কি ব্রণাকার প্রভৃতি) উৎপন্ন হয়, সেই সকল চিহ্নই খড়্গাশাস্ত্র মতে তাহার অঙ্গ। এই অঙ্গ সর্ব্বসমেত (১০০) এক শত প্রকার হইতে পারে, অধিক নহে।

খড়্গের রূপ কি? জাতি কি? নেত্র কি? অরিষ্ট কি? ভূমি কি? ধ্বনি কি? এবং পরিমাণই বা কি রূপ? এসমস্তই যথাক্রমে বর্ণন করা যাউক। রূপ—খড়্গে যে নীল রঙ্ কি কাল রঙ্, কি অন্য কোন রঙ্ দৃষ্ট হয়, সেই গুলিই তাহার রূপ।

জাতি—অঙ্গ নামক চিহ্ন থাকায় তদ্দ্বারা যে এক প্রকার নেত্র-প্রীতিকর প্রতীতি জন্মে, তাহাই খড়্গাগত জাতির লক্ষণ।

নেত্র—মাহাত্ম্য সূচক চিহ্নের নাম নেত্র।

অরিষ্ট—অপকৃষ্টতা বা অশুদ্ধতা বোধক চিহ্নের নাম অরিষ্ট।

ভূমি—অঙ্গাদির লক্ষণ ধারণের বা উৎপত্তি স্থানের নাম ভূমি (ক্ষেত্র)।

ধ্বনি—নখাঘাত কি কাষ্ঠিকাঘাত করিলে যে শব্দ হয়—সেই শব্দই তাহার ধ্বনি।

মান—তুলনা বা দীর্ঘতা বিশেষের নাম মান।

খড়্গা সম্বন্ধীয় এই আট প্রকার জ্ঞানের নাম খড়্গা বিজ্ঞান। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ অঙ্গ, রূপ, জাতি, নেত্র, ও অরিষ্ট, এই পাঁচ লক্ষণ কৃত্রিম হইতে পারে; পরন্তু শেষোক্ত অর্থাৎ ধ্বনি ও মান এই দুইটী লক্ষণ স্বাভাবিক ভিন্ন কৃত্রিম হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব খড়্গাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত উহা অতি বিচক্ষণতার সহিত পরীক্ষা করিবেন।

খড়্গাশাস্ত্রে ইহাও লিখিত আছে যে, খড়্গের অঙ্গ শত প্রকার, রূপ চারি প্রকার। রূপ চারি প্রকার, জাতিও চতুর্ব্বিধ, নেত্র ত্রিংশৎ, অরিষ্ট ও সেই পরিমাণ, ভূমি দুই প্রকার, ধ্বনি আট্ প্রকার, এবং মানও প্রধানতঃ দুই প্রকার।

শত প্রকার অঙ্গ বা চিহ্ন যাহা লৌহার্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহা এই—

রৌপ্যরেখা স্বর্ণরেখা, গজ শুণ্ডাকার চিহ্ন, এরণ্ডবীজাকার চিহ্ন, দমন অর্থাৎ দোনা নামক বৃক্ষের পত্র সদৃশ চিহ্ন, শুভ্র স্থূল রেখা, কৃষ্ণবর্ণ রেখা, সূক্ষ্ম অরুণ রেখা, মূল হইতে অগ্রপর্য্যন্ত তিনটী সূক্ষ্ম ও শুভ্র রেখা, পদ্মদলাকার রেখা, গদাচিহ্ন, তিল চিহ্ন, অগ্নি শিখাকার চিহ্ন, পিপ্পলী তুল্য চিহ্ন, গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট্ চিহ্ন, শালপান-পত্রাকার চিহ্ন, তিতির পক্ষীর পক্ষ তুল্য চিহ্ন, মালা চিহ্ন, জীরক চিহ্ন, ভ্রমর চিহ্ন, ঊর্দ্ধগামী কপিলবর্ণ শিখা চিহ্ন, মরিচ চিহ্ন, ফণিফণাকার চিহ্ন, অশ্বখুর চিহ্ন, ময়ূর পিচ্ছাকার চিহ্ন, সর্ব্ব শরীর কৃষ্ণবর্ণ ও ধার শুভ্রবর্ণ, মধুবুদ্বুদাকার চিহ্ন, কুণ্ডলীকৃত ও কোণযুক্ত

ক্ষুদ্র চিহ্ন, মক্ষিকা চিহ্ন, তুষাকার চিহ্ন, যবাকার চিহ্ন, ধান্যাকার চিহ্ন, তীসি নামক বীজের ন্যায় চিহ্ন, সর্ষপ বীজ চিহ্ন, সিংহাকার চিহ্ন, তণ্ডুল চিহ্ন, শিরা চিহ্ন, শিবলিঙ্গাকার চিহ্ন, ব্যাঘ্র নখাকার চিহ্ন, গোক্ষুর চিহ্ন, মকর পুচ্ছাকর চিহ্ন, নেত্রাকার চিহ্ন, কেশ চিহ্ন, স্থূল প্রকৃতি ও নিশ্চিহ্ন, তীক্ষ্ণধার ও নিশ্চিহ্ন, কাক পদাকার চিহ্ন, কপাল চিহ্ন, পত্রাবলী চিহ্ন অথবা পক্ষি-পক্ষ চিহ্ন, তুবরী নামক শস্যের আকার বিশিষ্ট চিহ্ন বিম্বীফলাকার চিহ্ন, প্রিয়ঙ্গু সদৃশ চিহ্ন, সর্ষপ পুষ্পাকার চিহ্ন, নীলীরস তরঙ্গের ন্যায় চিহ্ন, রক্তবর্ণ ত্রিরেখা চিহ্ন, যব পত্রাকার চিহ্ন, লশুন ত্বক্ তুল্য চিহ্ন, নিশ্চিহ্ন ও নির্ম্মল প্রকৃতি, মঞ্জিষ্ঠালতাকার বহুতর রেখা, শমীপত্রাকার রেখা, রোহিত মৎস্যের শল্কাকার রেখা, শফরী শল্কাকার রেখা, মারিষ পত্রাকার রেখা, ভৃঙ্গরাজ পুষ্পবৎ চিহ্ন, খুরবৎ ধার ও নিশ্চিহ্ন, ধারস্থান কখন তীক্ষ্ণ কখন বা মৃদু এবং ভূমি সকল, কখন বা নির্ম্মল, জল তরঙ্গের ন্যায় দৃশ্যমানতা, ধারমোটা ও অবয়ব নিশ্চিহ্ন, গুঞ্জ ফলাকার চিহ্ন, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বান চিহ্ন, দূর্ব্বাদলাকার বর্ণ ও ধার তীক্ষ্ণ, বিল্ল পত্রাকার দাগ, মসূর পত্রাকার দাগ, শোণ পুষ্প তুল্য রেখা বিশিষ্ট, শঠী পত্রাকার দাগ, বিড়াল লোমাকার চিহ্ন, কেতকী পত্রাকার দাগ, মুর্ব্বা (সূটী মুখ নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ) তণ্ডুর ন্যায় দাগ, অর্থাৎ অংশু চিহ্ন বিশিষ্ট, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও অন্য লৌহের ছেদক, কলায় পুষ্পাকার চিহ্ন, চম্পক কুসুমাকার চিহ্ন, বলা নামক লতার পত্রাকার চিহ্ন, বটের নামনার দাগ, বাঁশের ন্যায় নীলবর্ণ, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ পত্র শিরাকার রেখা, জ্যেষ্ঠী সদৃশ চিহ্ন, জালাকার চিহ্ন, পিপিলিকাকার চিহ্ন, নলপত্রাকার চিহ্ন, ঘর্ষণ করিলে কণা বাহির হয় এরূপ গুণবিশিষ্টতা, কুষ্মাণ্ড বীজবৎ দাগ, লোমবৎ চিহ্ন, সিজ বৃক্ষের কণ্টকাকার চিহ্ন, বদরী পত্রাকার চিহ্ন, বকুল পুষ্পাকার চিহ্ন, কাঁজির ন্যায় দৃশ্য অর্থাৎ নানা প্রকার মিশ্র চিহ্নযুক্ত, নিশ্চিহ্ন ও মহিষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, স্বাভাবিক নির্ম্মল, নৈর্ম্মল্যের উপর ঊর্দ্ধ রেখা ও বক্র রেখা।

এই সকল লক্ষণ যদি স্বাভাবিক অর্থাৎ খড়্গের গঠনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়, তবেই তাহা গ্রাহ্য নচেৎ কৃত্রিম করিলে অগ্রাহ্য। উল্লিখিত শুভ চিহ্নের মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্টতা বোধক এবং কতকগুলি নিকৃষ্টতা জ্ঞাপক। যে সকল চিহ্নের দ্বারা খড়্গের উত্তমতা জানা যায়, সেগুলি বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে।

রৌপ্যাঙ্গ ও স্বর্ণ রেখাঙ্গ,—এই দুই খড়্গ উত্তম। গজশুণ্ডাঙ্গ খড়্গ উত্তম, পরন্তু ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, রক্তস্পর্শ মাত্র ইহা শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং ইহা ধৌত করিলে যে জল নিসৃত হয়, তাহা পান করিলে অনেক ব্যাধি শান্তি হয়। এরণ্ডবীজ চিহ্নযুক্ত খড়্গাও উত্তম। দমন পত্রাঙ্গ খড়্গাও উত্তম, পরন্তু ইহার অন্য এক পরীক্ষা এই যে, ইহাতে জল রাখিয়া দিলে একদিন পরে সে জলে দমন পত্রের গন্ধ উৎপন্ন হইবে। স্থূলাঙ্গ খড়্গাও উত্তম, পরন্তু ইহার দ্বারা ক্ষত হইলে সর্ব্ব শরীরে শোথ জন্মে। অরুণাঙ্গ খড়্গাও ভাল, পরন্তু ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, সূর্য্য কিরণ স্পর্শে ইহা হইতে এক প্রকার তেজ নিঃসৃত হয় এবং ইহার সহিত পদ্মকোরক একত্রিত রাখিলে তাহা রাত্রিকালেও ফুটিয়া থাকে। তিলাঙ্গ খড়্গাও উত্তম, পরন্তু তাহার অন্য এই এক লক্ষণ

আছে যে, তদ্দারা ক্ষত হইলে, ক্ষত স্থান হইতে তিল তৈলবৎ বসা নির্গত হয়। অগ্নি-শিখাঙ্গ খড়্গের পরীক্ষা এই যে, তদুপরি শীতল জল রাখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ উষ্ণ হইয়া যাইবে। মালাঙ্গ চিহ্নযুক্ত উত্তম খড়্গের অন্য এক পরীক্ষা এই যে, তৎপ্রক্ষালিত জল সুগন্ধ। ইহার তৃতীয় লক্ষণ এই যে, ইহার উপর তপ্ত জল রাখিবামাত্র শীতল হইয়া যায়। এই খড়্গ আবার পিত্তরোগের ঔষধ বিশেষ। জীরকাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইবামাত্র জ্বর হইয়া থাকে এবং ভ্রমরাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিসূচিকা রোগ জন্মে। লাঙ্গলাঙ্গ খড়্গও উত্তম, পরন্তু তৎস্পর্শে সর্প মরিয়া যায়। মরিচাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরের রক্ত সমুদায় কটু অর্থাৎ ঝাল আস্বাদ হইয়া যায়, এবং ইহার ক্ষালন জলের দ্বারা পীনস রোগ নষ্ট হয়। সর্পফণাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরে বিষ বিকার উপস্থিত হয়, এবং ইহার স্পর্শমাত্রে ভেকেরা প্রাণত্যাগ করে। অশ্ব খুরাঙ্গ খড়্গও উত্তম, পরন্তু তাহার স্পর্শে অশ্বগণের বেগগতি জন্মে এবং তাহা দ্বারা অনেকবিধ রোগ নষ্ট হয়। সর্ষপ পুষ্প চিহ্নযুক্ত খড়্গও উত্তম। ইহা এত কোমল যে, ইহাকে কুণ্ডলীকৃত করা যায় এবং ছাড়িয়া দিলে আবার যে সেই হয়, অর্থাৎ ইহাতে স্থিতিস্থাপক গুণ অতি প্রবলরূপে থাকে। ময়ূর পিচ্ছাঙ্গ খড়্গও উত্তম। কোনও সর্প ইহার স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না এবং ইহার দ্বারা ক্ষত হইলে নিরন্তর বমি হয়। ক্ষৌদ্রাঙ্গ খড়্গও উত্তম। ইহার অন্য এক লক্ষণ এই যে, সর্ব্বদাই ইহাতে মধু-মক্ষিকা বসিতে চাহে। মক্ষিকাঙ্গ খড়্গের গাত্রে তৈলনিক্ষিপ্ত করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ শুষ্ক হইয়া যায়। সিংহাঙ্গ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইবামাত্র মনুষ্য উন্মত্ত হইয়া পড়ে। তণ্ডুলাঙ্গ খড়্গ অতি উত্তম। ইহার পরীক্ষা এই যে, ইহাতে জল পর্য্যুষিত হইলে তাহা তণ্ডুলোদকের ন্যায় দৃশ্য হইয়া যায়। মকর পুচ্ছ চিহ্নযুক্ত খড়্গের এই এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে, তৎস্পর্শে মৎস্য মাত্রেই মৃত হয়। নেত্রাঙ্গ খড়্গের এই এক আশ্চর্য্য গুণ থাকে যে, তৎধৌত জলের দ্বারা রাত্র্যন্ধতা নষ্ট হয়। বিম্ব ফলাঙ্গ খড়্গের পরীক্ষা এই যে, তাহাতে জল রাখিলে তাহা তিক্তাস্বাদ হইয়া যায়। সেই জলের দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মা বিকার নষ্ট হয়। লশুনাঙ্গ-খড়্গ-ধৌত জলের দ্বারা আমবাত রোগ নষ্ট হয়। প্রোষ্ঠীশল্ক চিহ্নযুক্ত খড়্গের এই এক মহৎ গুণ আছে যে, উহা জলে ভাসে। এই খড়্গ অতি দুর্লভ। চম্পক পুষ্পাঙ্গ খড়্গের জলও তিক্তস্বাদ হয়। লোম চিহ্নযুক্ত খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে সর্ব্বশরীরে ব্রণ হয়। সিজ্ পত্রাকার গাত্রও সিজকণ্টকাকার চিহ্ন এরূপ খড়্গের দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ, তৃষ্ণতা ও মূর্চ্ছা হয়, এবং ইহার অন্য এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে, যদি ইহাকে সর্প ফণার উপর স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই সর্প ফণা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই খড়্গের ধৌত জলের দ্বারা কুষ্ঠ-রোগ উপশান্ত হয়। বকুলাঙ্গ খড়্গের এই এক অসাধারণ লক্ষণ আছে যে, শাণ ঘর্ষণের সময় উহা হইতে বকুল-পুষ্পের গন্ধ নির্গত হয়।

এখনকার খড়্গে আর এ সকল লক্ষণ প্রায় দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ আর কিছু না, কেবল লৌহতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব। লক্ষণাক্রান্ত লৌহ এখন কেহ চিনেন না, সুতরাং লক্ষণাক্রান্ত খড়্গও জন্মে না। পূর্ব্ব-

কালের লোকেরা এ সকল বিষয়ে নিপুণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদের এ সকল কথা নিতান্ত অলীক বা গল্প কথা নহে। সে যাহা হউক, শত প্রকার চিহ্নের মধ্যে কোন্ কোন্ চিহ্ন তৎকালে পরিত্যজ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল, সেগুলিও বলা যাউক।

যবচিহ্ন, গোক্ষুর চিহ্ন, শিরা চিহ্ন, উপল চিহ্ন, কাকপদ চিহ্ন, কপাল চিহ্ন, তুবরী ফল চিহ্ন, ভৃঙ্গরাজ পুষ্প চিহ্ন, খুর চিহ্ন, জলতরঙ্গ চিহ্ন, মার্জার রোম চিহ্ন, বটারোহ (বটবৃক্ষের নামনা বা শিকড়) চিহ্ন, জ্যেষ্ঠী (গিঁগিটে) চিহ্ন, জাল চিহ্ন, (শাণ দিলে যদি রক্তবর্ণ শিখা বহির্গত হয়, তবে এচিহ্নও ভাল বলিয়া গণ্য), নিশ্চিহ্ন, স্থূলধার ও আঘাতসহ, কর্কন্থু অর্থাৎ বদরী পত্রের পৃষ্ঠের ন্যায় চিহ্ন; খড়্গ শাস্ত্রে এই সকল চিহ্ন চিহ্নিত খড়্গ পরিত্যজ্য বলিয়া উক্ত হই য়াছে। পূর্ব্বে যে চারি প্রকার রূপের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে সে সমুদায়ের প্রভেদ বর্ণনা করা যাউক।

রূপ।

নীলরূপ—যাহার ভূমি অর্থাৎ শেৎ নীল-রস, কলায় পুষ্পের কান্তি, গুঞ্জন অর্থাৎ গাজোর পুষ্পবৎ আভাযুক্ত, নীলম্ বা নীল-কাচের ন্যায় আভাযুক্ত, অথবা মরকত মণির ন্যায় কান্তি,—তাহার সেই সেই কান্তির নাম নীলরূপ।

কৃষ্ণরূপ—খড়্গের ক্ষেত্রে যদি কাল মেঘ, মসীরস অর্থাৎ সেহাই, কালসর্পের অঙ্গ, অন্ধকার, কেশকলাপ, কিম্বা ভ্রমরাকার বর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে তাহা খড়্গের কৃষ্ণরূপ।

পিঙ্গলরূপ—খড়্গের ভূমিতে বা গাত্রে যদি নব বর্ষার ভেকের রঙ, অথবা গোমেদ মণির রঙ প্রতিভাত হয়; তবে তাহা তাহার পিঙ্গলরূপ।

ধূম্ররূপ—খড়্গে যদি অনতি গাঢ় ধূমের কিম্বা শিরীষ পুষ্পের বর্ণ প্রতিভাত হয়—তবে তাদৃশ বর্ণ তাহার ধূম্ররূপ।

নাগার্জুন বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত চারি প্রকার রূপ ভিন্ন মিশ্ররূপও হইয়া থাকে।

জাতি।

পূর্ব্বে যে অসির জাতি বিভাগের কথা বলা হইয়াছে, সে সকল কথা এক্ষণে সবিস্তারে বর্ণন করা যাউক।

বিপ্রজাতি—খড়্গাতত্ত্ববিৎ নাগার্জুন বলিয়াছেন যে, বিশুদ্ধ চিহ্নযুক্ত, বিশুদ্ধ বর্ণযুক্ত, উত্তম নেত্রযুক্ত, উত্তম ধ্বনিযুক্ত, কোমলস্পর্শ, উত্তম গঠন, ও উত্তমধারযুক্ত খড়্গ ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া গণ্য। ইহার দ্বারা অত্যল্প ক্ষত হইলেই সর্ব্বাঙ্গে ঘোর যন্ত্রণা ও শোথ উপস্থিত হয়। মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ ও জ্বরাভিভূত হইয়া শীঘ্রই প্রাণ বিযুক্ত হয়। ইহার অন্য এক অদ্ভুত লক্ষণ এই যে, হরিতকি, আমলকী, ও বহেড়া, এই তিন দ্রব্য কুট্টিত করিয়া তাহা ধীরে ধীরে উল্লিখিত খড়্গের উপর এক দিবারাত্র রাখিয়া দিলে তাহার কষায় রসে উহা মলিন হইবে না, বরং অধিক পরিষ্কার হইবে। ইহার আরও এক পরীক্ষা আছে। যথা—নবোদিত সূর্য্য কিরণে শুষ্ক তৃণপুঞ্জের উপর এই ব্রাহ্মণ-জাতীয় অসিকে যদি কিয়ৎক্ষণ স্থাপন করা যায়—তাহা হইলে তৃণগুলি দগ্ধ হইয়া যাইবে। এই খড়্গ সুলভ নহে। ইহা স্বর্গীয়। পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গতুল্য কুশদ্বীপ ও হিমালয় প্রদেশে ইহা কখন কখন পাওয়া যায়।

ক্ষত্রজাতি—ধূম্রবর্ণ, সারযুক্ত তীক্ষ্ণধার, কর্কশধ্বনিযুক্ত, আঘাত সহ্যকারী,—এরূপ

খড়্গ ক্ষত্রজাতি বলিয়া গণ্য। ইহার দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ, তৃষ্ণা, মলমূত্র, বিষ্টম্ভ, অঙ্গ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যুও হইয়া থাকে। ইহা শাণ যন্ত্রে ধরিলে বহু বহ্নিকণা নিঃসৃত হয়, এবং বিনা সংস্কারে দীর্ঘকাল নির্ম্মল থাকে।

বৈশ্যজাতি—যাহা নীল ও কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত, সংস্কার করিলে অত্যন্ত নির্ম্মল হয়, এবং শাণ না দিলে খরতা জন্মে না, এরূপ খড়্গ বৈশ্যজাতি বলিয়া গণ্য।

শূদ্রজাতি—মেঘের ন্যায় বর্ণ, ধার মোটা, ধ্বনি মৃদু, সংস্কার করিলেও মালিন্য যায় না, শাণ দিলেও খরতা জন্মে না, ক্ষত হইলে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয় না,—এতদ্রূপ অসি শূদ্রজাতীয় এবং ইহা দূরে পরিত্যজ্য।

খড়্গে যদি জাতিদ্বয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে জারজ বা দ্বিজাতি খড়্গ বলিয়া জানিবে। তিন জাতির লক্ষণ থাকিলে ত্রিজাতি এবং উল্লিখিত চারি জাতির লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তাহা জাতি-সঙ্কর বলিয়া গণ্য করিবে।

নেত্র ॥

ইতিপূর্ব্বে আমরা অসির নেত্র আছে এবং তাহা ত্রিংশৎ প্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রিংশৎ নেত্র কি? তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিব।

নেত্র শব্দের অর্থ অন্য কিছু নহে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের চিহ্ন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের লৌহ একত্রিত করিয়া অসির গঠন নিষ্পন্ন হয়। তাহাতে অসির কায়ার ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন বা দাগ জন্মে। সেই সকল চিহ্ন বিশেষের নাম নেত্র। খড়্গতত্ত্ব বিশারদ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, নেত্রচিহ্ন ত্রিশ প্রকারের অধিক হয় না। কিরূপ চিহ্ন হইলে তাহা নেত্র বলিয়া গণ্য, তাহা ক্রমশঃ উদাহৃত হইতেছে।

চক্র——অসি অঙ্গে চক্রাকার চিহ্ন থাকিলে তাহা চক্রনেত্র। ইহা শুভ।

পদ্ম——পদ্মাকার কিম্বা পদ্মদলাকার চিহ্নের নাম পদ্ম-নেত্র। ইহাও ভাল।

গদা—উর্দ্ধগামী স্থূল গদাকার রেখার নাম গদা-নেত্র।

শঙ্খ—খড়্গ মধ্যে শঙ্খাকার চিহ্ন থাকিলে তাহা শঙ্খ-নেত্র।

ডমরু—ডমরু-তুল্য চিহ্নও তন্নামক নেত্র।

ধনুঃ--ধনুরাকার চিহ্ন ধনুর্নেত্র।

অঙ্কুশ—অঙ্কুশ (ডাঙ্গশ) সদৃশ চিহ্ন অঙ্কুশ-নেত্র।

ছত্র—ছত্রাকার চিহ্ন ছত্র-নেত্র।

পতাকা—পতাকাকার চিহ্ন পতাকা-নেত্র।

বীণা – বীণাকৃতি চিহ্ন বীণা-নেত্র।

মৎস্য—মৎস্য কিম্বা মৎস্যপুচ্ছ চিহ্ন মৎস্য-নেত্র।

শিব—শিবলিঙ্গাকার চিহ্ন শিব-নেত্র।

ধ্বজ—ধ্বজাকার চিহ্ন ধ্বজ-নেত্র।

এইরূপ অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, শূল, ব্যাঘ্র-নেত্র, সিংহ, সিংহাসন, গজ, হংস, ময়ূর, জিহ্বা, দণ্ড, খড়্গ, মনুষ্য পুত্রিকা, চামর, শিখা, পুষ্পমালা, ও সর্প নামক নেত্রের লক্ষণ জ্ঞাত হইবে। কোন খড়্গে এক নেত্র, কোন খড়্গে দ্বিনেত্র ও কোন খড়্গ বহুনেত্রও হইতে পারে, ইহাও জানিবে। ক্রমশঃ।

নরবলি

যে মেঘের বৃষ্টিতে তৃষ্ণার্ত্ত ধরা শীতল হয়, সেই মেঘের বজ্রাঘাতে বিন্ধ্যাচলের শৈলশিখর চূর্ণ বিচূর্ণিত হইয়া যায়। পতিপরায়ণা সতী পতিপ্রেমে প্রাণ উৎসর্গ করে, প্রেমানুরাগী যুবক প্রিয়তমার বিরহে সন্ন্যাসী হয়; সন্তানবৎসলা জননী সন্তানকে রক্ষা করিতে বিষধরের বিষাক্ত দংশন আপন বক্ষে পাতিয়া লয়। আবার পরের মঙ্গল করিতে শাক্যসিংহ রাজবৈভব তুচ্ছ করিয়া বৈশালীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিলেন, নৈরঞ্জনার সৈকত পুলিনে শতগ্রন্থি চীর পরিধান করিয়া উপবাসে দিনপাত করিলেন, চৈতন্য ও শঙ্কর গৃহত্যাগী হইয়া পথে পথে জীবন পাত করিলেন। মনুষ্যের মাহাত্ম্য একদিকে কত উচ্চ, অপরদিকে মনুষ্যের হীনতা আলোচনা করিলে গাছের বানরও মাঠের পশুকে তাহা অপেক্ষা উচ্চ জীব বলিয়া অনুমিত হয়।

নরহত্যার ন্যায় বীভৎস কার্য্য আর হইতে পারে না। অথচ নরহত্যা, সামাজিক কর্ত্তব্য কার্য্যের মত, বোধ হয় পৃথিবীর সকল দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রচলিত ছিল। পিতা মাতা, সন্তান সন্ততি, আত্মীয় শত্রু, দেবতার মনরঞ্জনার্থ বা স্বর্গবাসের অধিকারী হইবার জন্য কোথায়ও সমুদ্র জলে নিক্ষিপ্ত, পর্ব্বত শিখরে পিণ্ডীকৃত, ভূগর্ভে জীবন্ত-প্রোথিত বা জলন্ত অনলে দগ্ধীকৃত হয়। প্রেম বা ভক্তিজনিত ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সভ্যসমাজে সম্ভব। অসভ্যের কৃতজ্ঞতা প্রখর নহে। বিশেষতঃ অদৃষ্ট দেবতাবিশেষ বিনা লাভে তাহাদের উপকার করিয়া থাকে, একথা অসভ্যেরা বুঝে না। অসভ্যধর্ম্মের নিমিত্ত-কারণ বিপদ ভয়। চতুর্দ্দিকে শত্রু পীড়িত হইয়া অত্যাচার সহ্য করিয়া বিপদভয়, কাপুরুষতা, বা হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য অসভ্য চরিত্রে বিশেষ রূপে বিকশিত হয়। জিঘাংসা প্রবৃত্তি অসভ্যদিগের বড় তীক্ষ্ণ, সে জিঘাংসা প্রবৃত্তি এই মানসিক দৌর্ব্বল্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। আবার যে প্রবৃত্তিতে আমরা নিজে চালিত হই, সে প্রবৃত্তি অন্যের প্রতি আরোপ করা স্বাভাবিক। এই জন্য অসভ্যধর্ম্মে দেব চরিত্র এত জিঘাংসা কলুষিত। অসভ্যের অধিকাংশ ধর্ম্মকার্য্য নিষ্ঠুর জিঘাংসা পরায়ণ অসুরের কোপনতার নিবৃত্তি হেতু, কৃতজ্ঞতা মূলক ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রম-বিকাশে, সভ্যসমাজ অনুমোদিত ধর্ম্ম সকলে, দেবচরিত্রের রাক্ষসীভাব অনেক ন্যূন হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু এখনও একেবারে নিরাকৃত হয় নাই। এক দিন হইবে; কিন্তু সে কত দিন পরে, সমাজতত্ত্বের সাধ্য নাই সাহস করিয়া নিরূপণ করে।

ভারতবর্ষে নরবলি নানা অসভ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। আর্য্য-সন্তানেরাও এ অপকর্ম্মে কলঙ্কিত। ঋগ্বেদে শূনঃশেপ প্রোক্ত সাতটী সূক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বলিদানার্থ যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া শূনঃশেপ দেবগণের নিকট কাতরভাবে যে প্রার্থনা করিয়াছেন, এই সূক্তচয়ে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শূনঃশেপের আখ্যা-

য়িকা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং কথঞ্চিত পরিবর্ত্তিত আকারে সাঙ্খ্যায়ন সূত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকট আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিদান করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। রোহিত তাঁহার সন্তান। মায়া মোহে বহুদিন পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্র আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন নাই। অবশেষে রোহিত বয়স্ক হইয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করেন। এদিকে প্রতিজ্ঞা অপালন হেতু বরুণের কোপে হরিশ্চন্দ্রের ব্যাধি জন্মে. তখন অজিগর্ত্তকে একশত গাভী মূল্য দিয়া হরিশ্চন্দ্র অজিগর্ত্তের পুত্র শূনঃশেপকে ক্রয় করেন. এবং অজিগর্ত্ত স্বয়ং ছুরিকা হস্তে পুত্রকে বলিদান দিবার জন্য যুপপার্শ্বে উপস্থিত হন। এই হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতের আখ্যায়িকা কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া রামায়ণ, মহাভারত, ও ভাগবতাদি পুরাণ মধ্যে কি মনোহর মূর্ত্তিধারণ করিয়াছে। বেদের নানা স্থানে পুরুষমেধ যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালক্রমে এই নরবলির পরিবর্ত্তে পশুবলি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এখন আবার পশুবলির পরিবর্ত্তে কোথায় কোথায় ইক্ষু কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ বলির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় *। বাজসেনেয় এবং তৈত্তিরিয় সংহিতায় ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ বলিদান করিবে, ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয় বলিদান করিবে, "ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভতে,ক্ষত্রায় রাজন্যং। মরুদ্ভো বৈশ্যং। তপসে শুদ্রং। তমসেতস্করং" ইত্যাদি পদ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ মধ্যে মহাপ্রস্থান ও তুষানল ব্রতের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাপ্রস্থান ব্রতাবলম্বীরা সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিত এবং তুষানল ব্রতে জ্বলন্ত অনল মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত। আপস্তম্ব ও শায়নাচার্য্য নরবলির যথাযথ অর্থ করিয়াছেন। শথপথ ব্রাহ্মণে পুরুষমেধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। কিন্তু এ সময়ে প্রকৃত মনুষ্য-বলি না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে পশু বিশেষের বলিদান করিলেই যথেষ্ট হইত। সুতরাং শথপথ ব্রাহ্মণ রহিত হইবার সময়ে নরবলির হ্রাস হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। মোক্ষমূলরের মতে খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শথপথব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল। কেবল পুরুষমেধ বলিয়া নহে, অশ্বমেধ যজ্ঞ কালেও নরবলির আবশ্যক হইত। যখন মনুষ্যেরা নরবলির প্রতি নিষ্প্রবৃত্তি হইয়া উঠে, তখনই কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ নিবারিত হয়। মাঝে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপে সকল প্রকার বলিদান প্রথার হ্রাস হয়। অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিতেন। আবার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতাপ যখন হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম যখন কালক্রমে তন্ত্রধর্ম্মে পরিণত হইয়া পড়ে, তখন পুনরায় নানা প্রকার বলিদান রীতির পুনরভ্যুদয় হয়। কাপালিক প্রভৃতি কয়েক প্রকার তান্ত্রিকেরা ছাগ মহিষ বলিদানে সন্তুষ্ট না হইয়া নরবলিরও আরম্ভ করে। "কালীকরাল বদনার" রাক্ষসী মূর্ত্তী এই সময়ে সৃষ্ট হয়। হিমালয়ের অপর পার্শ্ববর্ত্তী তিব্বত দেশীয়েরা চামুণ্ডার পূজা করে এবং তন্ত্রমতে তাঁহার নিকট নরবলি প্রদান করিয়া থাকে। কালিকাপুরাণ সপ্তস্বরে নরবলির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছে, বোধ হয় এই নরবলির রূপান্তরে,অদ্যাপি আত্মীয় জনের আরোগ্য লাভ হইলে, হিন্দু ললনা আপন বক্ষ চিরিয়া

* কিরূপে ধর্ম্মাচারণে পরিবর্ত্তন প্রণালী প্রচারিত হয় "মানব প্রকৃতি" নামক গ্রন্থে দেখ।

শোণিতসুধা কাঞ্চন পাত্রে লোল-রসনা মহা-দেবীকে উপহার দিয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় অনার্য্যজাতি সকলের মধ্যেও নরবলির প্রবল প্রভাব। কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন, অনার্য্য বর্ব্বরদিগের নিকট সভ্য আর্য্যগণ এই কলুষিত রীতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন, কালী অসভ্যদিগের দেবতা, সহবাস সুযোগে আর্য্য দেবালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে। বস্তুতঃ অসভ্যদিগের রক্ত পিপাসুতা, কালীর ভয়ঙ্করী কৃষ্ণমূর্ত্তি ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, এ অনুমান আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয়, এবং অনার্য্যদিগের প্রতি এই কলুষাচারের উদ্ভাবকতা আরোপ করিতে পারিলে হৃদয় কথঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা এ অনুমান স্বীকার করি না, (১) ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতির অতি প্রাচীনতম অংশে নরবলির উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময়ে আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সংস্রবে আসিয়া থাকিলেও তখনও বিজয়ী ও পরাজিত প্রভু ও দাসের ভাব বড় প্রখর ছিল। বেদ রচনা কালে দৃপ্ত আর্য্যগণ পরাস্ত দস্যু রাক্ষসদিগের সামাজিক বা ধর্ম্মনৈতিক রীতি গ্রহণ করিবে বিশ্বাস হয় না। (২) প্রাচীন পার্শীগণ ভিন্ন পৃথিবীর আর সকল আর্য্যসন্তানদিগের মধ্যে নরবলির প্রথা প্রাচীন কালে সকল স্থানে প্রচলিত ছিল। পারস্য-আর্য্যগণ অতি নিরীহ কৃষি-জীবী-জাতি, তাহাদের মধ্যে নরবলিরূপ বীভৎস প্রথা প্রচলিত না হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু এই একটী জাতি ভিন্ন যখন আর সমস্ত আর্য্য জাতির মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যখন তাহারা কেহ অনার্য্য সহবাসে এই রীতি শিক্ষা করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না, তখন কেবল ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ অনার্য্য দিগের নিকট এই কুশিক্ষা লাভ করিয়াছিল, সহসা বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ আর্য্য-জাতি চিরদিন দেব-ভক্তির জন্য বিখ্যাত। যাহাকে ভক্তি করি, তাহাকে জগতের উৎকৃষ্ট দ্রব্য উপহার দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হয়। মনুষ্য সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ। সুতরাং মনুষ্য প্রাণের মত উৎকৃষ্ট উপহার দ্রব্য আর কোথায় পাওয়া যাইবে? এই সকল বিবেচনা করিয়া বোধ হয়, যে কারণে অন্যান্য সমাজে নরবলি প্রথার উপায় হইয়াছিল, সেই সেই কারণে ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজেও এই রীতির প্রচার হয়।

আরও একটী বিবেচ্য বিষয় আছে। মানুষের দেবতা মানুষের মত, মনুষ্য যতই কেন শিক্ষিত বা সভ্য হউক না, কোথাও মনুষ্যের দেব প্রকৃতি মানব-প্রকৃতির সীমার বহির্ভাগে দেখা যায় না। কেহ বা কয়েকটী গুণের পরিমাণ অল্প করিয়া অন্য গুণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেবতায় আরোপ করে। মনুষ্যও দেবপ্রকৃতির গুণ দোষে পরিমাণের ন্যূনাতিরেক আছে মাত্র, তাহাদের প্রকার-ভিন্নতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ কল্পনার মূলে স্মৃতি, স্মৃতির মূলে অনুভূতি। যাহা কখন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই, তাহা কখন কল্পনা করিতে পারি না। মনুষ্য দেখিয়াছি, সুতরাং মনুষ্যের আকৃতি, প্রকৃতি কল্পনা করিতে পারি; সিংহ দেখিয়াছি, সুতরাং সিংহের আকৃতি কল্পনা করিতে পারি। আবার সেই জন্য নরসিংহ মূর্ত্তিও কল্পনায় আনা যায়। কিন্তু "আহালাহালু" কি, কখন দেখি নাই শুনি নাই, সুতরা কল্-

নই আহালাহালুর কল্পনা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। মনুষ্য দেবতা দেখে নাই। সৃষ্ট সহস্র প্রকার জড়পদার্থ দেখিয়াছে। সেই সহস্র জড়-পদার্থের মধ্যে মনুষ্য যাহাকেই শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে, তাহারই অনু-রূপে দেবতা কল্পনা করিয়াছে। মনুষ্যের নিকট মনুষ্য সৃষ্টির সর্ব্বপ্রধান পদার্থ বলিয়া অনুমিত হয়; সুতরাং মনুষ্যের দেবতার আকার মনুষ্যের মত। আমাদের দেহ মনে দয়া দাক্ষিণ্য, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কাম ক্রোধ যাহা কিছু আছে, আমাদের দেবতায় আমরা তাহাই আরোপ করিয়াছি; মাত্রার কিছু ইতর বিশেষ আছে মাত্র। যদি বানরগণের দেবতা থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তাহারা তাহা-দিগকে দীর্ঘ লাঙ্গুল বিশিষ্ট,—তাহাদের বাস-স্থান তরু শাখায়, তাহাদের প্রমোদ বনে আম্র ও কদলী-ক্ষেত্র আরোপ করিত, তবে সে আম্র আকারে বড়, মিষ্টতায় অধিক, আর বারমাস ফলে, এই মাত্র প্রভেদ থাকিত। সন্ন্যাসীর মহাদেব জটাধারী, গাঁজাখোর, ঋষির দেবতার দীর্ঘশ্মশ্রু, বাঙ্গালীর কার্ত্তিক শান্তিপুরে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া,—ঢাকাই চাদর গায়ে, চুল ফিরাণ, ছড়ি হাতে, চীনা-বাড়ীর জুতা পায়, অপরূপ বাঙ্গালী বাবু। রাজসূয় দরবারে যুধিষ্ঠিরকে পাণ্টালুন ও চাপকান পরিতে দেখিয়াছি। মুসলমান আখুঞ্জি ও মোক্তাবের আমলে যুধিষ্ঠির চাপকানের বোতাম সম্বন্ধে বামাচারী কি দক্ষিণাচারী ছিলেন ঠিক জানি না। আর কয়েক বৎ-সর পরে নারায়ণের ভোগে মদ দিতে হইবে কি না, কে বলিতে পারে? যদি এখন বাঙ্গালী সমাজে নূতন দেবতার কল্পনা আব-শ্যক হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহাতে পাণ্টালুন, চাপকান চোগা সামলা ও সুরা আরোপ করিতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভাবি-তাম, শ্যামামূর্ত্তি সাবান মাখিয়া সাদা হইবেন ও গাউন পরিবেন; কিন্তু ইলবার্ট বিলের করুণায় সে আশঙ্কা দূর হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে, দেবতাকে নরমাংস উৎসর্গ করিতে হইত বলিয়া ভক্তেরা তাহার প্রসাদ পাইতেন, অথবা যাহারা নরমাংস সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া গ্রহণ করিত, তাহারা নরমাংস উৎসর্গ করিত?

আমোদ প্রমোদ।

আমোদ প্রমোদ চাই। চারিদিকে এত শুষ্কতা, এত কঠোরতা; রোজ রোজ এত পরিশ্রম, সংসারের সেবার জন্যে এত বাঁধা নিয়মে চলা ফেরা, ইহাতে কি একটুকু আমোদ প্রমোদ না হইলে প্রাণ বাঁচে? দেখ, প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী গ্রন্থে এ শিক্ষা কত দিতেছে। তোমার আমার জীবন ধারণের জন্যে কি কি চাই?—বায়ু চাই, জল চাই, খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, যানাদি চাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল হইলেই ত মানুষের প্রাণ বাঁচে? পশুপক্ষীর প্রাণ বাঁচে, আর মানুষ কি কেবল ইহাই লইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিত না? পারিত, কিন্তু জড়স্বভাব পশু হইয়া পারিত, এমন মানুষ

হইয়া পারিত না। শুদ্ধ পানভোজন ও পরিশ্রম, এ কি কঠোর, কি নীরস ভাব। তাই দেখ, শ্যামলকান্তি প্রকৃতি, সুনীল অনন্তবিভ্রান্ত গগণ, সুনীল অকূল প্রসারিত সাগর তোমাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে! এমন শ্যামল ছবি যদি দিক্‌প্রসারিত না হইত, তবে কি আমরা মরিয়া যাইতাম? আবার দেখ বাগানে সুগন্ধি ফুল ফোটে! ফুল মানুষে খায় না, সুগন্ধি সকল ফুলই তিক্ত, সকল ফুল ঔষধে লাগে না; তবু বাগান ভরা বন ভরা এত ফুল! তবু যত্নে অযত্নে এত ফুল ফোটে। ফুলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে না এমন লোক ত ঢের দেখিতে পাই! তবে ত দেখিলাম, ফুল না হইলেও লোকে বাঁচে; তবে এ সংসারে এত ফুলের বন্দোবস্ত কেন? তাই ত বলিতেছিলাম, কেবলই দরকার, কেবলই নিয়ম, এ বড় কঠোর কথা। ভোজন বড় আরামের কথা,—সদ্য গাওয়া ঘিতে ভাজা তপ্ত তপ্ত লুচি, দেশী বিদেশী নানা প্রকার মিষ্টান্ন, তারকেশ্বরের অনুগ্রহ-পচিত পোলোয়া কালিয়া কোর্ম্মা; জাতিভয় পরিত্যাগ করিয়া বলিতে গেলে, কোর কাটলেট্ পুডিন্‌ প্রভৃতি নামোচ্চারণ মাত্রেই রসনা হইতে জলবিন্দু নির্গতকারী আরও অন্যান্য চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয়াদি বড়ই তৃপ্তিদায়ক, একথা খুব মানি। কিন্তু রোজ রোজ কি কেবল খাইয়া খাইয়াই বাঁচা যায়? নিয়ম করিয়াছ, আর অমনি জিনিসের সুখ নষ্ট হইয়া গেল! যে কুসুমের গন্ধ, প্রকৃতির শোভার কথা পাড়িয়াছিলাম, নিয়ম হইলে তাহাও কঠোর, তাহাও কর্কশ। রোজ রোজ দেখি, সেই একই ফুল, এবং সেই ফুলে সেই একই গন্ধ, কতক্ষণ বল তবে আর সে গন্ধে চিত্ত উৎফুল্ল থাকিবে? দেখ, শিশু যখন খেলা করে, তখন কত ভিন্ন ভিন্ন রকমের পদার্থ সে চাহিয়া থাকে। সকাল বেলার লাল পুতুলটী আর তাহার চক্ষে তেমন সুন্দর বোধ হইতেছে না; সে এখন আর কিছু চায়। আজি তুমি পর্ব্বতের গম্ভীর শোভায় আকৃষ্ট হইয়াছ, দু দিন থাক, ও পর্ব্বত তোমার চোখে তেমন শোভাময় বোধ হইবে না। আবার নূতন চাহিবে; সে নূতন আবার পুরাতন হইবে। নিয়ম করিয়া যদি সুখভোগের বন্দোবস্ত করিয়া রাখ, তবে এ অনন্ত বিশ্বরাজ্যের সমুদায় পদার্থই তোমার চোখে বিষময় হইয়া যাইবে। নিয়ম করিও না; দেখিবে যাহাকে লোকে কারাগার ভাবে, তুমি সেই কারাগারেও কত সুখ পাইতেছ! সাধ করিয়া ক্ষুদ্র সুখে আপনাকে পোর, সাধ করিয়া কারায় বন্দী হও, দেখিবে কত সুখ! ভ্রমর, মুক্ত বায়ুতে, শূন্য আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু দেখ সে, যখন ক্ষুদ্র কুসুমের মধ্যে ডুবিয়া মধু পান করে, তখন সে কত আনন্দ পায়! সাধের কারা সুখের খনি; আর নিয়মে বাঁধা স্বাধীনতা বড় বালাই। নিয়মে কেবল শুষ্কতা, কেবল কঠোরতা, কেবল নীরসতা। তাই বলি এই নিয়মময় জীবনে, এই বাঁধা বাঁধির সংসারক্ষেত্রে, কিছু পরিবর্ত্তন চাই, কিছু নূতন চাই, কিছু শ্লথ ভাব চাই, কিছু আমোদ প্রমোদ চাই। কিন্তু ভয় হইতেছে, আমার এ কথায় কেহ কোন খারাপ ভাব না লইয়া থাকেন। কোন একটা কথা লিখিতে অগ্রসর হইতে গেলেই দুই দিকের মুখ চাহিতে হয়। ইন্দ্রিয়বিলাসী না ভাবে, আমি তাহারই পক্ষ সমর্থনের জন্য আসরে নামিয়াছি। আবার আর একদিকে, পিউরিটানদিগের রুদ্রমুখ মনে হইলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

দোহাই পিউরিটান সম্প্রদায়! দোহাই বিশুদ্ধ-রুচি শুকবদন মহাত্মাগণ! আমি আমোদ প্রমোদের কথা পাড়িয়াছি বলিয়া আমাকে ভস্ম করিবেন না!

কিন্তু একটী কথা, আমোদ প্রমোদ চাই বটে, কিন্তু কি প্রকার আমোদ প্রমোদ প্রার্থনীয়? এটী বড় শক্ত কথা। বাঙ্গালীর কাছে আমোদ প্রমোদের কথা পাড়; সে হয় তবলায় চাটি বসাইবে, আর না হয় কুৎসিৎ হাস্যরসের অবতারণা করিবে। বাঙ্গালীর হাতে পাখোয়াজ বাজে না; খোল বাজে না; বাঙ্গালী সুগম্ভীর অথচ সরস গল্প জানে না। বহুদিনের পরাধীনতা, বহুদিনের কুশিক্ষা এবং অশিক্ষা! আর কি এ জাতির হাড়ে মনুষ্যত্ব আছে? পাতলাম আর ইন্দ্রিয় সেবা বাঙ্গালী সার আমোদ বলিয়া ভাবে। ফুরফুরে কাপড়, নধর কচি বপুঃ, চাঞ্চল্য এবং ভীরুতাময় হৃদয়, বাঙ্গালীর ভিন্ন এ জগতে আর কাহার আছে? টপ্পার সুর বাঙ্গালীর কর্ণে সুধা বর্ষণ করে। বাঙ্গালী ভাবে,—রাগিনী, আগা গোড়া কোমল গান্ধারে কেন গীত হয় না? এ বাঙ্গালা ভূমে, শুধু তাই কেন, এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে, বসন্ত ঋতুরাজ। বসন্তের নাতি-শীতোষ্ণ সমীরণ আর কোকিলের পঞ্চমে গীত কুহুধ্বনি; উন্মত্ত বাঙ্গালীর চক্ষে কাজেই বসন্ত ঋতুরাজ। আর ঐ গরিব বেচরা শরৎ! শরৎকাল বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে বসন্ত অপেক্ষা হীন। জলাশয় সচ্ছজলে পূর্ণ, সে সচ্ছ জল কুমুদ কহ্লারে পূর্ণ; মাঠ হরিৎ-বর্ণ শস্যে পূর্ণ, দিক্-বেড়া আকাশ পরিষ্কার নীলিমায় রঞ্জিত। আর শরতের জ্যোৎস্না-ময়ী রজনী? অহো কি মধুময় সৌন্দর্য্য!! নির্ম্মল আকাশে প্রস্ফুটিত চন্দ্রের নির্ম্মল স্নিগ্ধ আলোক! ঐ আলোকে নীলাকাশ, শুভ্র-শূন্য, সচ্ছসলিল বক্ষ এবং হরিৎবর্ণ শস্য-ক্ষেত্র প্রভাসিত এবং পরিস্ফুট। দেশটা বড় শাস্ত্রভক্ত; বসন্ত যে ঋতুরাজ ইহাও শাস্ত্রের কথা। নহিলে আজি এই শোভাময়ী প্রকৃতির জীবনদায়িনী সুমধুর গম্ভীর হাসির অপমান করার অপরাধের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করিতাম। এত ভাব প্রখরতা, এত নীরব অথচ পরিস্ফুট কবিত্ব, এত জলন্ত অথচ ধীর প্রবাহিনী বক্তৃতা বাঙ্গালীর সহ্য হয় না; তাই বসন্ত ঋতুরাজ!! ইহাই যে জাতির হাড়ের পরিচয়, তাহাদের সমক্ষে আমোদ প্রমোদের কথা পাড়িতে প্রকৃত পক্ষেই একটু শঙ্কা হয়।

চব্বিশ ঘন্টা ধরিয়া কি গণিত শাস্ত্র,প্রকৃতি-বিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা সম্ভবপর ব্যাপার? এই জন্যেই সময়ে সময়ে কাব্য নাটক প্রভৃতির আলোচনা প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় বলিয়া যাহা তাহা পাঠ্য হইতে পারে না। বৈচিত্র্য চাই বলিয়া ঘৃণিত পদার্থ উপাদেয় বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই স্থানেই বাঙ্গালীর শিক্ষার স্থান। আমোদ করিতে বাধা নাই বলিয়া জঘন্যতার অবতারণা অমার্জ্জনীয়। রুচিটাকে ঘসিয়া মাজিয়া সাফ্ কর, একটু গম্ভীর হও, একটু ভিতরে ঢোকো। নহিলে তোমাকে আমো-দের নামে ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে বদ্ধ হইতে দেওয়া যাইবে না। গম্ভীর বিষয়ের মধ্য হইতে আমোদ লাভ করিতে শিক্ষা কর; আপা-ততঃ একটুকু তিক্ত বোধ হইবে, কিন্তু পরে বড় মধুরস্বাদ পাইবে। নাটক পড়িবে বলিয়া রোমিও জুলিয়েট নয়, এণ্টনি ক্লিওপেত্রা-নয়; গান গাইবে বলিয়া নিধুর টপ্পা নয়; হ্যামলেট পড়, ফষ্টাস্ পড়, জাতীয় সঙ্গীত

গাও, শেলীর প্রেমগীতি গাও। কথাগুলি ইংরাজী হইল?—আচ্ছা কমলাকান্তের দপ্তর পড়, কৃষ্ণকান্তের উইল পড়, আনন্দ মঠ পড়, শকুন্তল-তত্ত্ব পড়। কেবল মৃণালিনী খুঁজিলে চলিবে কেন? শিক্ষিত বাঙ্গালী বলিবেন, আমাদের কাছে কি হ্যামলেট, ফাউষ্ট নূতন কথা? এ কথার উত্তরে একটু কিছু শক্ত কথা বলিতে চাই। দেখ তোমরা তুই এক জন হ্যামলেট পড়িয়াছ,—আর ঐ পবিত্র গ্রন্থের অবমাননা করিয়াছ। তুমি ইন্দ্রিয়াসক্ত বাঙ্গালী কবি, যে কবিতায় আপনার ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য দেখাইয়াছ, সেই কবিতায় "মৃত প্রেয়সীর গায়" হ্যামলেটের পুষ্পবৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়াছ। দুর্গন্ধময় নরকে স্বর্গের পারিজাত নিক্ষেপ! ইহা অপেক্ষা অধিক অবমাননার কার্য্য এ জগতে কি আছে? যাহারা চাঞ্চল্যের চস্‌মা চোখে পরিয়াছে, তাহাদের নিকট সকলি চঞ্চল, সকলি অস্থির।

আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, হ্যামলেটে প্রণয়ের কথা তেমন নাই। প্রণয়ের কথা নাই—কেননা নায়িকা বলেন নাই যে, "কেন না হইনু আমি যমুনার জল" অথবা নায়ক সেই শব্দচ্ছটাময় "সেই মুখখানির" কথা ভাবিয়া কাঁদেন নাই। আমি যদি ঐ শ্রী হস্তের দস্তানা হইতাম, তবে ঐ টুক্ টুকে কপোল দেশ স্পর্শ করিতে পারিতাম" একি সাধারণ প্রণয়ের কথা! বাঙ্গালীর গলা প্রাণে ঢলাভাব বড় মধুর!! কিন্তু বাঙ্গালী তোমার সেই চক্ষু কই, যদ্বারা নীরব প্রেমের গভীরতা এবং মাধুর্য্য সন্দর্শন করিবে? মাতার কুৎসিৎ আচরণে আজি হ্যামলেট দুর্ব্বলতার নাম স্ত্রীলোক রাখিয়াছেন, স্ত্রীচরিত্রে হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, তবুও বিশ্বাসবতী প্রেমময়ীর হৃদয় হইতে আপন আসন নড়ান নাই। আজিও বলিতেছেন, এ জগৎ মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবাসি এ সত্যের অপলাপ হইতে পারে না। কিন্তু হ্যামলেট নাকি যমী, বাহ্যাড়ম্বর বিরহিত, অফিলিয়া নাকি কেবল ভালবাসে, কিন্তু কথা কয় না, সর্ব্বদাই ভালবাসায় আত্মবিস্মৃত, সেই জন্যেই বাঙ্গালীর কাছে এ প্রণয়ে মাধুরী নাই। পিতৃ আজ্ঞা, সকল কাজের উপরকার কাজ প্রতিশোধ-গ্রহণ, কাজেই হ্যাম্‌লেটকে বিবাহাদির ভাব দূর করার প্রয়োজন। কিন্তু ইহা কি সম্ভব? হৃদপিণ্ড ছিন্ন করা যায়, কিন্তু প্রাণের প্রতিমাকে ত হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করা যায় না, আজ হ্যাম্‌লেট পাগল, আজি প্রিয়তমা-অফিলিয়ার নিকট হইতে জন্মশোধ বিদায় লইতে গিয়াছেন! সেই বিদায়ের দিনের দৃশ্যের কথা অফিলিয়া আপন মুখে পিতাকে বলিতেছেন। একবার বর্ণনাটা পাঠ করিয়া দেখুন, স্ত্রীত্যাগের ভাবে হ্যামলেটের অন্তরে কেমন তোলপাড় হইতেছিল। তবে বাহ্য দৃশ্য দেখিয়া সে কথাটা বুঝিয়া লইতে হইবে।

হ্যামলেটের(Act II, Scene I.)পড়িয়া দেখ;—একি সাধারণ কথা, এ কি সাধারণ ভাব! কিন্তু বাঙ্গালী এভাবের তলায় ডুবিতে জানেনা। এণ্টনি বলিতেছেন—"Let Rome in Tibre melt" "যাক্ টাইবরের জলে রোমনিমগণ" আর বাঙ্গালী পাঠক ভাবিতেছেন, কি প্রণয়ের গভীরতা!! এমন ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জাতির কাছে আমোদ প্রমোদের কথা পাড়া বিড়ম্বনা! বোধ করি এই সকল কারণেই আমাদের আধুনিক সংস্কারকেরা আমোদ প্রমোদের নামে এত চটা। কিন্তু একটী কথা, তরল আমোদে লিপ্ত

হওয়া যেমন অন্যায়, একেবারে আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করাও তেমনি অন্যায়। তরল ভাবও নরকের দিকে টানে, আবার পিউরিটানস্বও তেমনি ঘাত প্রতিঘাতের অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলে সময়ে সেই ঘৃণিত দেশে ফেলিয়া দেয়। পিউরিটানদিগের বাড়া বাড়িতেই শেষে দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে এত উপদ্রব। এই সমস্ত কারণেই আমোদ প্রমোদ চাই। যে আমোদে শিক্ষা পাই, যাহার গতি রুচি সংস্কারের দিকে, নিতান্ত না হইলেও অন্ততঃ রুচিদূষিত করিয়া দিবার দিকে নয়, এমন আমোদ প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। ভাল ভাল কাব্য নাটক সৃষ্টি কর, অভিনয় ক্ষেত্রে জাতীয় ভাব গঠনের বীজ বপন কর, দেশের রুচি শোধরাও; আমোদ প্রমোদ করিতে দেও, কঠোর শুষ্ক জীবনে ফুল ফুটিবে, তরলতা ঘুচিয়া গাম্ভীর্য্য আসিবে, রূপমোহ ঘুচিয়া প্রণয় আসিবে, বৃথা বর্ণিত অদ্ভুত পদার্থে ভালবাসা ঘুচিয়া সংসারের কোণের অতি প্রয়োজনীয় খুটী-নাটীর প্রতি দৃষ্টি ও ভালবাসা জন্মিবে, সংসারটা সুখময় হইয়া উঠিবে। এজন্য নিতান্তই উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। দেশের রুচি বড় তরল, বড় অগভীর, বড় কু, বড় জঘন্য! যিনি এ দেশের লোকদিগকে সার আমোদ প্রমোদে মাতাইতে পারিবেন, তিনিই বাহাদুর লোক, তিনিই সমাজসংস্কারক। আর এক প্রকার আমোদের কথা বলিতেছি। পারিবারিক স্নেহ মমতা এবং ভালবাসায় প্রাণ ভিজান, সকল আমোদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমোদ। দেখ—চারিদিকে নীলিম আটলান্টিক সাগর মধ্যে একটী দ্বীপ। সেই দ্বীপে ফার্দ্দিনান্দের বিশ্বাস, আজি তিনি পিতা হারাইলেন, স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের আশা হারাইলেন, আর অবশেষে প্রস্পেরোর কঠোর কাষ্ঠ বহনাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে চলিলেন। রাজার ছেলে এত কষ্ট কি সহ্য করিতে পারে? শোকে বুক ফাটিতেছে নিরাশায় চারিদিকে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, তাহার পরে এই শারীরিক কষ্ট! এ কষ্টেও তিনি তত অবসন্ন নন। দুঃখের অশ্রু, ঈষৎহসিত কপোলে গড়াইতেছে, ইহার কারণ এই, পার্শ্বে শান্তিময়ী সুধাময়ী বনদেবী মিরান্দা বসিয়া আলাপ করিতেছেন। ৯টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আফিসে কাজ করিয়া উগ্রমূর্ত্তি সাহেবের বাক্য সুধা পান করিয়া বাঙ্গালী চাকুরে যখন ঘরে ফেরে, আর গৃহ লক্ষ্মী, তাঁহার সেদসিক্ত কপাল, কুসুম—কোমল করে পুঁছাইয়া কাছে বসান, তখন সেই বুকে, ফার্দ্দিনন্দ কি আরাম লাভ করিয়াছিল। এই আরাম, এ কষ্টময় জীবনের প্রকৃত সুখ রেখা। কিন্তু দুঃখ এই, অনেকেই এই আমোদ-লাভ-সুখে, ইচ্ছাপূর্ব্বক বা বাধ্য হইয়া, বঞ্চিত হইয়া, ইহার পরিবর্ত্তে যাহা অবলম্বন করেন, সেই জীবন্ত নরকের কথা মনে করিলেও পাপ আছে। কবে বাঙ্গালীর গৃহ প্রকৃত গৃহ হইবে, কবে এজাতি মাতা ভগ্নী জায়া প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে বসিয়া প্রকৃত আমোদ পাইবেন?

এখন একটী কথা, আমরা যে বাঙ্গালীর চরিত্র এত হীন করিয়া দেখাইলাম, ইহাতে কি সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে? যাঁহারা মনে করিয়াছেন যে, আমরা বৃথায় গালাগালী দিবার জন্যেই এ প্রবন্ধের অকারণ অবতরণা করিয়াছি, তাঁহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটী কথা বুঝিয়া লওয়া ভাল। বোধ হয় বিরোধী পক্ষ "বাঙ্গালী" বলিতে "অধিকাংশ বাঙ্গালী" এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

যদি তাহাই হয়, তবে একবার জাতীয় আধুনিক সাহিত্যাদি হইতে রুচি এবং চরিত্রের ছবি একবার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হওয়া যাউক। জাতীয় কাব্য সাহিত্য প্রভৃতিতে যে সাময়িক সমাজের ছবি প্রতিবিম্বিত থাকে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে ইংলণ্ডের নৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, ভিলিয়ার এবং ড্রাইডন প্রভৃতির গ্রন্থ তাহার বিশেষ পরিচয় স্থল। কবিকুলচূড়া সেক্ষপীরের সময়ে সাধারণ লোকে হাসি তামাসাটা বড় ভালবাসিত, কাজে কাজেই কবিগুরু তাঁহার প্রধান প্রধান নাটকের অতি গম্ভীর স্থল ফুলের (Fool) পাগলামদিয়া তরল করিয়া দিয়াছেন। সময়ের হাত কাটান বড় দায়; বিশেষ যাঁহারা সাধারণ শ্রেণীর নিকট কার্য্যের জন্য যশাদির প্রার্থী। তখনও বঙ্গদর্শন সৃষ্ট হয় নাই; তখনও বঙ্কিম বাবু বুঝিতে পারেন নাই দেশ ঠিক কি চায়, তখনও বোঝেন নাই যে, ঈশ্বরগুপ্তের সময় গিয়াছে কি না, কাজেই লোকপ্রিয় করিবার জন্য প্রথমবারের 'দুর্গেশনন্দিনী' স্থানে স্থানে এত কুরুচি পূর্ণ হইয়াছিল। গ্রন্থকার আপনিই দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ গেল বাঙ্গালার সমাজের একটু গৌরবের কথা। কিন্তু যে টুকু উন্নতি তা এই পর্য্যন্ত। এখনও বাঙ্গালী আগাগোড়া বসন্তের হিল্লোল চায়, কাজেই সুপাত্তা একটু প্রণয়ের কথা ছাড়িয়া পরিচয়ের কথা লিখিতে গিয়া গ্রন্থকর্ত্তা মালিনীর স্বর্গের কথা পাড়িলেন। পাছে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর গম্ভীর প্রেম পাঠকের কাছে এক ঘেয়ে হইয়া দাঁড়ায়, এইভয়ে দেবেন্দ্রের তামাকু সেবনের এত বর্ণনা!! এই জন্যেই কৃষ্ণকান্তের উইলে উড়িয়া ভাবিয়াছিল যে, রোহিণীর মুখে ফুঁদিলে তাহার জগন্নাথে পালাইতে হইবে; ইত্যাদি। পাঠকের মন রাখা চাই, কাজেই এসমুদয় বিষয়ের এত অবতারণা। বাঙ্গালী পাঠক যদি সুরুচি ভাল বাসিত, তাহা হইলে স্যাফল্যরাম গুড়ের পুত্রের নাম করণ মুচিরাম কেন হইয়াছিল, ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা হইত না। আরও কি প্রমাণ করিতে হইবে যে, বাঙ্গালী তরলমতি, বাঙ্গালী কুরুচির দাস? এ কথা প্রমাণ করিয়া আমাদের সুখ নাই, বরং দুঃখের ভাগ বড়ই বেশী। তবে কিনা প্রকৃত কথাটা বলা ভাল; রোগ নির্ণয় হইলে ঔষধ দেওয়া যায়, সেই জন্যেই এ সকল কথা লইয়া এত আলোচনা। আমোদ প্রমোদের ভাল ভাল পথ দেখিবার বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। রুচি সুধরাইবার জন্যে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। বর্ত্তমান রঙ্গভূমির কথা কিছু বলিলে হইত, কিন্তু পুঁথি বেড়ে যায়। অতএব এই স্থানেই বেদব্যাসকে বিশ্রাম দেওয়া যাউক।

আণ্ডামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী।

প্রথম প্রস্তাব।

সৃজন-চতুর বিধাতা এই অসীম বিশ্ব-রাজ্যে কতই যে অদ্ভুত আকার ও বিচিত্র স্বভাব-সম্পন্ন মনুষ্য সৃজন করিয়াছেন, তাহা ক্ষণকালের জন্য চিন্তা করিলে যারপরনাই বিস্মিত হইতে হয়। গভীর প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত ও সুসভ্য মানব! তোমার জ্ঞান যতই দূর-বিস্তৃত ও রুচিপরিমার্জ্জিত হউক না কেন, তুমি যদি ক্ষণকালের জন্য কুটিল আত্মাভিমান পরিহার পুরঃসর তোমার নিম্নতম অসভ্যজাতীয় কদাকার লোকদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের স্বভাব, জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলনে রত হও, তাহা হইলে তুমি বিশ্ব-বিধাতার অনন্ত কৌশল ও অপার মহিমার জীবন্ত পরিচয় পাইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে। দেখিবে, সুশিক্ষা ও সুসংস্কারের সমুজ্জ্বল আলোক যাহাদের অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়-দ্বার স্পর্শ করে নাই—যুগ যুগান্তর হইতে যাহারা সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ সরল জ্ঞান ও সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইতিহাস-চক্ষুর অগোচরে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভাশুভ ঘটনা নিয়মিত করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও তোমার চিন্তা ও শিক্ষার সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত রহিয়াছে।

প্রিয় পাঠক! আজি আমরা আপনাদিগকে বঙ্গোপসাগরস্থিত আণ্ডামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী দুইটী অদ্ভুত জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অতি অল্পকাল গত হইল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট পোর্টব্লেয়ারে বন্দী-নিবেশ (Convict Settlement) সংস্থাপিত করিলে, বঙ্গদেশীয় কারাসমূহের পরিদর্শক ডাক্তার মাওয়েট সাহেবের যত্নে উল্লিখিত জাতিদ্বয়ের বিষয় কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু আজিও সাধারণ্যে উহাদের জাতিগত কোন বিশেষ বিবরণ প্রচারিত হয় নাই। শতবৎসর পূর্ব্বে উহাদের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার বিবরণ জানিবার কোন উপায় নাই। উহাদের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আজি তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আগামী অন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী (International Exhibition) উপলক্ষে আণ্ডামান ও নিকোবরবাসী কতিপয় মনুষ্য কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল। আণ্ডামানবাসীদের মধ্যে চারিটী পুরুষ ও দুইটী স্ত্রী এবং নিকোবরবাসীদের মধ্যে তিনটীই পুরুষ ছিল। উহাদের মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উল্লিখিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়েই উহারা এতদূর আনীত হইয়াছিল। আলিপুর প্রাণি-বাটিকায় উহাদের বাসস্থান প্রদত্ত হয়। এই অভিনব মনুষ্যদিগকে দেখিবার জন্য প্রতিদিন কলি-

কাতা ও উহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম এবং বহুদূর হইতে সহস্র সহস্র মনুষ্যের সমাগম হইত। এমন কি, বঙ্গ সমাজের দূষিত অবরোধপ্রথার কঠোর অনুশাসনে যে সকল পুরসুন্দরীরা কখনও কোন অভিনব বস্তু দেখিতে গৃহের নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে পদার্পণ করেন নাই, তাঁহারাও এই অবসরে আপন আপন গুরুজনের তত্ত্বাবধানে উহাদিগকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। এই সকল নর-নারীর নিকট আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ কতদূর আদরণীয় হইবে জানি না; কিন্তু যাঁহারা উল্লিখিত মনুষ্য কখনই দেখেন নাই এবং তাঁহাদের বিষয় কিছুই অবগত নহেন, আশা করি ইহা তাঁহাদের কিছু উপকারে আসিবে!

মাসাধিক কাল উহারা এখানে ছিল, সুতরাং উহাদের প্রকৃতি ও রীতিনীতি শিক্ষা করিতে আমরা বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলাম। সর্ব্বদা উহাদের সহিত মিলিয়া উহাদের কার্য্যাদি পর্য্যালোচনায় এবং প্রায় ১০ বৎসর হইতে যে ভারতবাসী পিতার ন্যায় যত্ন ও স্নেহে উহাদের তত্ত্বাবধান লইতেছেন, তাঁহার নিকট হইতে এবং উহাদের দেশ হইতে প্রত্যাগত কতিপয় সুদক্ষ গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর নিকটে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহাই পাঠক-সমাজে উপহার দিতে অগ্রসর হইলাম।

আণ্ডামান দ্বীপবাসী।

আকার ও গঠনপ্রণালী।—এই জাতীয় পূর্ণবয়স্ক ও দীর্ঘাবয়ব পুরুষের শরীরের দৈর্ঘ্য ৫ ফিট, বক্ষস্থলের বেষ্টন ২ ফিট ৯ইঞ্চ; স্ত্রীর দৈর্ঘ্য ৪ ফিট, ৯ ইঞ্চ, বক্ষস্থলের বেষ্টন ২ ফিট ৭ ইঞ্চ। ইহারা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ—আফ্রিকার নিগ্রোদিগের অপেক্ষা গাঢ়তর। ইহাদের শরীর সুদৃঢ় ও সবল; মস্তক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং পশমের ন্যায় কোমল ও সঙ্কোচশীল কটাবর্ণের এক প্রকার অতি অপরূপ অনতিদীর্ঘ জটিল চুলে আবৃত। মনুষ্যের মস্তকে এরূপ কেশ পূর্ব্বে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই; কোন পশুর গাত্রজাত লোমও এরূপ নহে। আমাদের দেশীয় উড়িয়াদের ন্যায় উহারা মস্তকের কতকাংশের কেশ মুণ্ডন করে বলিয়া উহা অতি কুৎসিত দেখায়। ইহাদের চক্ষু কিয়ৎপরিমাণে বৃহৎ উজ্জ্বল এবং দেখিতে অতি সুশ্রী; গ্রীবা ক্ষুদ্র ও ঈষৎ স্থূল; মুখে গোঁপ দাড়ীর লেশমাত্র নাই, এই জন্য এবং আকারের খর্ব্বতা প্রযুক্ত পূর্ণবয়স্ক যুবকদিগকে অল্প বয়স্ক বলিয়া বোধ হয়। এখানে যে কয়টী পুরুষ আনীত হইয়াছিল, তাহাদের সকলেই পূর্ণবয়স্ক যুবক, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিলে ১৭, ১৮, অথবা ২০ বৎসরের অনধিক বয়স্ক যুবক বলিয়া অনুমান হইত। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা যতদিন বালিকা থাকে, ততদিন তাহাদের মস্তক সূক্ষ্ম পশমের ন্যায় অপরূপ জটিল গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ কেশজালে শোভনীয় থাকে, কিন্তু বালিকা বয়স অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেই মস্তকের সমস্ত কেশ মুণ্ডন করে এবং আর তাহা বর্দ্ধিত হইতে দেয় না। ইহাদের নাসিকা ঈষৎ ক্ষুদ্র এবং নাসামূল অল্প স্থূল; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তরাজি সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ এবং সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্র উল্কী মালায় বিভূষিত। কোন কোন দেশের নরনারীর অঙ্গে যেমন নীল, পীত, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণের নানাবিধ চিত্রিত উলকীর চিহ্ন দেখা যায়, ইহাদের শরীরের ঘোর কৃষ্ণচর্ম্মের উপর সেরূপ কোন চিত্রিত চিহ্ন নাই—ইহা-

দের উল্‌কী সমান শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিষ্কার ক্ষত চিহ্ন মাত্র। ইহারা দেখিতে অতি-কুৎসিৎ।

বাসগৃহ ও বেশভূষা।—ইহারা অতি কদর্য্য গৃহে বাস করে এবং উহার নির্ম্মাণ প্রণালী নিতান্ত কুৎসিত। প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ ও বর্ষার বারিধারা হইতে শরীর রক্ষার জন্য উহারা বন্য বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা ও তৃণপত্র দ্বারা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করে। যদি সূর্য্য-কিরণ প্রখর এবং বর্ষা প্রবল না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় ইহারা কোনরূপ বাসগৃহ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা অনুভব করিত না। আণ্ডামান দীপস্থ ক্ষুদ্র আণ্ডামান (Little Andaman) নামক স্থানের অধিবাসীগণ সচরাচর কোন গৃহে বাস করে না—তাহারা নিবিড় অরণ্যের সুশীতল ছায়াময় স্থানে তৃণপত্রের শয্যা প্রস্তুত করিয়া তথায় রজনীতে পরমসুখে অবস্থিতি করে এবং দিবাভাগে শিকার অন্বেষণে বনে বনে পর্য্যটন করে। আণ্ডামানবাসীরা যে গৃহ নির্ম্মাণ করে তাহা সচরাচর দীর্ঘে ৫।৬ হাত, প্রস্থে ৩।৪ হাত এবং উচ্চে ৪।৫ হাত। আমাদের দেশের নিকৃষ্ট ধাঙ্গড় কুলিরাও ওরূপ কদর্য্য গৃহে বাস করে না এবং উহাদের গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী তাহাদের অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। উহারা গৃহের চারিধারে হাড়ের মালা ঝুলাইয়া রাখে। কলিকাতায় যে কয়টী আণ্ডামানবাসী আনীত হইয়াছিল তাহারা আলিপুর প্রাণীশালায় তাহাদের দেশীয় প্রণালী অনুরূপ দুইখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, যে সকল দর্শক তাহা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন তাহাদের দেশের কুটিরগুলি তাহা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট নহে। ইহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে এবং কোনরূপ আচ্ছাদনে শরীর আচ্ছাদন করে না। মাছি ও মশার দংশন নিবারণ করিবার জন্য শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত এক প্রকার লালমাটির প্রলেপ দিয়া সর্ব্বাঙ্গ চিত্রিত করে। শরীর চিত্রিত রাখিতে ইহাদের বড়ই আমোদ। উল্‌কী ইহাদের অঙ্গের সর্ব্বপ্রধান ভূষণ। যখন ইহাদের বয়ঃক্রম ৪ কিম্বা ৫ বৎসর, তখন ইহাদের জননী বা জ্যেষ্ঠা ভগিনী একখণ্ড তীক্ষ্ণধার বোতল ভাঙ্গা কাচ দ্বারা ইহাদের শরীরের কোমল চর্ম্মের উপর শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্ন করে এবং ক্ষতমুখে এক জাতীয় বন্য বৃক্ষের পাতার রস, শূকরের চর্ব্বি ও সমুদ্র তীরস্থ মাটি মিশ্রিত প্রলেপ দেয়। প্রলেপ দিবামাত্রই ক্ষত মুখের শোণিতস্রাব ও বেদনা নিবারিত হয় এবং দুই চারিদিনের মধ্যেই ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া উজ্জ্বল উল্‌কী চিহ্ন প্রকাশিত হয়। উল্‌কী দিবার ভার স্ত্রীলোকদের উপর ন্যস্ত। তাহারা ইহাতে বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তাহারাই উক্ত তীক্ষ্ণধার কাচখণ্ডের দ্বারা পুরুষ ও আপন আপন সঙ্গিনীগণের মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই একরূপ বেশভূষা করে। কণ্ঠে রঞ্জিত হাড়ের মালা; বাহু, কোটিদেশ ও জানু প্রভৃতি স্থানে নারিকেল পাতার ন্যায় এক প্রকার শক্ত পত্র নির্ম্মিত নানাবিধ চিত্রিত ভূষণ পরিধান করে। কোন ধাতু নির্ম্মিত অলঙ্কার পরিধান প্রথা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত নাই। পোর্টব্লেয়ারের ভূতপূর্ব্ব কমিসনর ম্যান্ সাহেব কতিপয় আণ্ডামান্বাসী স্ত্রী-পুরুষকে সুসভ্য করিতে সাধ্যমত যত্ন পাইয়াছিলেন এবং এক্ষণে তত্রত্য সহকারী তত্ত্বাবধারক ই, এচ, ম্যান সাহেব স্ব-

ইচ্ছায় উক্ত ভার লইয়া উহাদের প্রতি একান্ত অনুরাগ ও গভীর ভালবাসার পরিচয় দিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের আন্তরিক যত্ন পাইলে ইহারা নিশ্চয়ই একদিন সভ্যতা পদবীতে পদার্পণ করিবে। গবর্ণমেণ্টের যত্নে আজিকালি দুই চারিজন আণ্ডামানবাসী পুরুষ ও রমণী বস্ত্র পরিধান করিতে শিখিতেছে

আহার, আমোদ ও ক্রীড়া।—বনজাত ফলমূল এবং মৎস্য, কচ্ছপ ও শূকর মাংস প্রভৃতি ইহাদের জীবন ধারণের প্রধান উপায়। ইহারা খাদ্য দ্রব্য অগ্নিতে পাক করিয়া ভক্ষণ করে না—অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে। কেহ কেহ বলেন, ইহারা শতবর্ষ পূর্ব্বে অগ্নির ব্যবহার জানিত না, সুতরাং আমমাংস ভক্ষণ করিত; কিন্তু এক্ষণে উহাদের মধ্যে কাঁচা মাংস ভক্ষণ অত্যন্ত দূষিত ও নিষিদ্ধ। ইহারা অত্যন্ত আমোদপ্রিয়। মল্লযুদ্ধ ও নৃত্যগীতে ইহাদের বিলক্ষণ আমোদ। যখন ইহারা স্ত্রী পুরুষে মিলিত হইয়া নৃত্যগীতে মত্ত হয়, তখন ইহাদের অপার আনন্দ। স্ত্রী তালে তালে করতালি দিতেছে এবং পুরুষ বন্যগান গাইতে গাইতে তালে তালে নাচিতেছে, এ দৃশ্য অতি আমোদজনক। কোন সুসভ্য ও সুরুচিসম্পন্ন দর্শকের মন এই অদ্ভুত নৃত্যগীতে মোহিত হইবে না, কিন্তু তাহাদের সরলতা ও প্রফুল্ল মুখশ্রী দর্শনে আমোদিত হইবে। পুরুষ ও স্ত্রীর নৃত্য প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন, একের লালিত্যবিহীন ও কর্কশ, অপরের লালিত্যময় ও সরলভাবব্যঞ্জক। আণ্ডামান রমণীর নৃত্যে এদেশীয় নর্ত্তকীদিগের নৃত্যের ন্যায় কুটিল অঙ্গ ভঙ্গী নাই। ইহারা স্ত্রীপুরুষ বিলক্ষণ সন্তরণপটু। বাল্যকাল হইতেই সন্তরণ শিক্ষা করে এবং তীর ধনুক লইয়া ক্রীড়া করে, এবং ১০। ১২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সন্তরণ ও ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ নিপুণতা লাভ করে। ইহারা নির্ভয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ইতস্ততঃ সন্তরণ করে; ভীষণ হাঙ্গর বা কুম্ভীর দেখিয়া ভীত হয় না; বরং তাহারা উহাদিগকে নিকটে দেখিলে প্রাণভয়ে বেগে পলায়ন করে। দীর্ঘকাল জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিলে ইহাদের কিছুই ক্লেশ জন্মে না। ইহারা সময়ে সময়ে সমুদ্রের তীরের নিকটস্থ জলে মগ্ন হইয়া বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য ধরিয়া অতুল উৎসাহের সহিত তাহাকে লইয়া তীরে উঠে। ইহারা ২০০ শত ফিট দূরস্থ মৎস্য ও হাঙ্গর প্রভৃতি জলচর জন্তুকে তীর-বিদ্ধ করিয়া তীর বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয়, এবং নিমেষ মধ্যে তাহাকে তীরে উত্তোলন করে। বন্যবরাহ ও খরগোশ প্রভৃতি পলায়নোন্মুখ প্রাণীকে দুই শত ফিট দূর হইতে তীর বিদ্ধ করিয়া ধরাশায়ী করে। শিকার-লব্ধ প্রাণী সংগৃহীত হইলে ইহারা সকল বন্ধু বান্ধবে মিলিত হইয়া একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করে। অগ্নি প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিলে উহাতে মৃত প্রাণীগুলিকে নিক্ষেপকরে, এবং যতক্ষণ তাহারা দগ্ধ না হয়, ততক্ষণ উহারা অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া বিবিধ ক্রীড়া ও কৌতুক করিতে থাকে। অনন্তর নৃত্য গীতান্তে মহা আমোদের সহিত সকলে মিলিয়া দগ্ধমাংস ভক্ষণ করে, এবং ভোজনান্তে ক্ষণকাল নিদ্রা যায়। পশুর দল যেমন একত্র জড়াজড়ি হইয়া নিদ্রা যায়, ইহারাও সেই রূপ ভাবে নিদ্রা যায়। ম্যান্ সাহেব যাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খাদ্য দ্রব্য অগ্নিতে পাক করিয়া ভক্ষণ করিতে শিক্ষা

করিয়াছে। উহাদের মধ্যে দুই একজন এক্ষণে দগ্ধ মাংস খাইতে ভাল বাসে না।

স্বভাব ও আচার ব্যবহার।—ইহারা স্বভাবতঃ অতিশয় সরল; ইহাদের প্রশান্ত ও গম্ভীর মুখশ্রী দর্শন করিলেই বোধ হয়, সরলতা ইহাদের জাতীয় প্রধান গুণ; কিন্তু ইহারা সহসা উত্তেজিত হইয়া থাকে। যদি কেহ কথনও ইহাদের প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করে বা কোনরূপে ইহাদের ক্রোধ উৎপাদন করে, তাহা হইলে ইহারা ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং তৎ-ক্ষণাৎ অত্যাচারকারীকে দীর্ঘ লৌহ-ফলক বিশিষ্ট তীক্ষ্ণধার তীর বিদ্ধ করিয়া অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ইহারা সত্যবাদী, ভ্রমেও মিথ্যা কহে না। বোধ হয়,মিথ্যা কথা বলিয়া কোনরূপ স্বার্থ-সিদ্ধির প্রয়োজন হয় না বলিয়া ইহারা মিথ্যা কথা বলে না। ইহাদের মধ্যে কোন গ্রাম নাই, এবং ইহারা পরস্পর সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে না। সন্তান যত দিন অল্পবয়স্ক থাকে এবং কর্ম্মক্ষম না হয়, ততদিন তাহারা একত্র এক পরিবার মধ্যে বাস করে। সন্তান কর্ম্মক্ষম হইলেই পিতা মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পৃথক স্থানে অবস্থিতি করে। এক রক্তে যাহাদের জন্ম এবং কিছু-দিনের জন্য যাহারা এক পরিবার মধ্যে প্রতি-পালিত হইয়াছে, তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে দূরে থাকিলেও তাহাদের মধ্যে স্নেহের বন্ধন কদাপি শিথিল হয় না। ইহারা অত্যন্ত সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় এবং কোন ভয়ে বিচলিত হয় না। তীর ও ধনুক ইহাদের জাতীয় প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। ইহারা কোন বিজাতীয় লোকের সহিত মিলিতে ভাল বাসে না। কোন বিজাতীয় লোক ইহাদের দ্বীপে পদার্পণ করিলে, ইহারা সুযোগ পাইলেই তাহাকে আক্রমণ করে। আণ্ডামান দ্বীপে ভারতবর্ষীয় দণ্ডগ্রস্ত বন্দী নিবেশ সংস্থাপনের জন্য তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ মাওয়েট সাহেব স্বদলে উক্ত দ্বীপের সমীপ-বর্ত্তী হন, তখন ইহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিতে সাধ্যমত যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু অবশেষে বৃটিশ বন্দুক ও বেয়নেটের ভয়ে ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়াছিল।

ইহাদের রমণীগণ স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত। স্বামীও স্ত্রীকে অতিশয় ভাল বাসে। এই অসভ্য ও অনক্ষর জাতির মধ্যে সতীত্বের অত্যন্ত আদর। স্ত্রী স্বামীর সহবাস পরিত্যাগ করিয়া অপর পুরুষের নিকটে যায় না। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে বা স্বামীর মৃত্যু হইলে পুনরায় বিবাহ করে। যদি কেহ কথনও কোন রমণীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে, তাহা হইলে অত্যাচারী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাউন্ সাহেব স্বপ্রণীত 'মনুষ্যজাতি' (The Races of mankind) নামক বৃহৎ গ্রন্থে ইহাদের বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত সার বিবরণ লিখিয়াছেন,তাহার অনেক স্থলে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাদের মধ্যে কোন রূপ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত নাই, সতীত্বের বিন্দুমাত্র মূল্য নাই, এমন কি জননী ও তাহার কন্যাগণ এক স্বামীর পত্নীরূপে পরিগণিত হইতে পারে। তিনি "They wander about from place to place, herding promiscuously together, and having no idea of marriage as it exists even among the lowest race. Mother and daughters may be the wives of the same husband." তাঁহার

শেষোক্ত কথা গুলি নিতান্ত অমূলক। ইহাদের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য বিবাহ-প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা আমরা ক্রমে উল্লেখ করিব। ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই; ব্যভিচারের উপর উহাদের অনন্ত ঘৃণা। বস্তুতঃ এই অসভ্য জাতির মধ্যে সতীত্বের যেরূপ আদর, অনেক সুসভ্য জাতির মধ্যে সেরূপ নাই। ইহারা কোনরূপ মদ্যপান করে না, কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অত্যন্ত তামাকু সেবন করে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

প্রশ্নোত্তর।

প্রচণ্ড নিদাঘতপ্ত দিবা অবসানে,
তুলিয়া মালতী জাতি বেল মতিয়ার,
সরসীর শ্যাম তটে বসিয়া বাগানে,
আনন্দে গাঁথিছে প্রিয়া সুচিকণ হার!
আনত আনন মাথা শ্যামকেশ পাশ
এলাইয়া খেলা করে সায়াহ্ন বাতাস!

১

চলিলাম উপবনে, গৃহ পরিহরি,
পরিতপ্ত স্বেদসিক্ত জুড়াইতে কায়,
শশিকর স্পর্শে সন্ধ্যা উঠিছে শিহরি
চমকি সরলা যেন সঙ্কোচে লজ্জায়!
উপনীত হইলাম এমন সময়,
যেখানে ফুটেছে সেই হেম-কুবলয়!

২

দেখিনু গাঁথিছে মালা হয়ে সাবধান,
কি জানি কেমন জানি মনে হ'ল ভুল,
প্রাণভরা ভালবাসা,—বুকভরা প্রাণ,
দেখিনু রয়েছে তার কোলভরা ফুল।
জিজ্ঞাসিনু প্রেয়সীরে হেতু না বুঝিয়া
প্রাণ—প্রেম—ফুল,—মালা গাঁথিছ কি দিয়া?

৩

তুলিয়া কমল মুখ করিলা উত্তর,—
দেখ এই শূন্য বক্ষ—কোথা প্রেম প্রাণ?
নব পদ্মরাগ-রক্ত কাটিয়া অধর
কহিলা, তোমারে তা'যে করেছি প্রদান!
নাহি প্রেম—নাহি প্রাণ—দেখ শূন্য হিয়া,
শূন্য মনে বসি মালা গাঁথি ফুল দিয়া?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

আশঙ্কা।

স্বর্ণময় কত দেশে ভীষণ সাহারা মরু!
কত গিরি, নদ নদী, কত বন, কত তরু
ভেঙ্গে গেছে, শুকায়েছে লুপ্তশেষ চিহ্নতার;
কুহুময় কুঞ্জে সুধু পেচকের চীৎকার।
হেথায় সাগর ছিল—অকূল,—তরঙ্গময়ী,
আজি তথা তুমি আমি, কে বিজিত, কেবা জয়ী?
চমকি চপলা হের, নিমেষে লুকায়ে যায়,
বিমল বিমানে ধূম্র মেঘমালা আসি ধায়!
বসন্ত, শরৎ দেখ কত দিন পরে পরে
আসে, আর দুই দিনে চলে যায় স'রে স'রে।
শারদ চাঁদনী রেতে তাই প্রিয়ে কাঁদিতেছি,
শঙ্কিত পরাণে তোর মুখ খানি দেখিতেছি!!
স্তব্ধতা-রাক্ষসী মোরে কি যেন গো কি কহিছে,
আয় প্রিয়ে স'রে আয়; আর(ও) কাছে—
আর(ও) কাছে।

শ্রীবিঃ

সম্ভাষণ।

কুসুম কোরক কতই কোমল,
সরসী সলিল শীতল কত?

প্রফুল্ল প্রভাতে ফুল্লফুল দল
শিশির সিঞ্চিত, সুগন্ধি কত ?
তোমার মতন কোমল, বিমল,
শীতল, সুবাস, সুহাসী মাখা
কি আছে লো বালা ? প্রেম পরিমল
এমন মধুর যায় কি দেখা ?
প্রেমের জগৎ চরণে তোমার,
রূপের জগতে রাণী তু'বালা !
হৃদয় ফুলটী লইয়ে আমার,
করিবে কি রাণী করিবে খেলা ?
চাই না কঠোর স্বাধীন জীবন,
চাই না এমন প্রকাণ্ড সংসার !
প্রেমের দাসত্ব মধুর কেমন,
কত ভাল তোর প্রেম কারাগার !!

আয়রে আমার প্রভাত-হিল্লোল,
আয়রে আমার কুসুম বাস,
আয়রে আমার বড়ই কোমল
বড়ই সুরভি ফুলের রাশ !
আয়রে আমার চাঁদনী রজনী,
আয়রে আমার শরৎ শশী,
আয়রে আমার প্রেম-নির্ঝরিণী
দুদণ্ড তোমার পাশেতে বসি।
আয়রে আমার ললিত, বিভাস,
আয়রে জীবন্ত সঙ্গীত খানি,
আয়রে প্রেমের মধুর সুহাস,
আয়রে হৃদয়ে হৃদয়-রাণি !

শ্রীবিঃ

জীবনগতি নির্ণয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। (২)

বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকশিত জীবন গতি।

"We have become quite familiar with the idea of an evolution of structures throughout the ascending types of animals. To a considerable degree we have become quite familiar with the thought that an evolution of functions has gone on *pari passu* with the evolution of structures Now advancing a step, we have to frame a conception of the evolution of conduct, as correlated with the evolutions of structures and functions."—Herbert Spencer's Data of Ethics.

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশের যেরূপ সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন এবং সর্ব্ব লক্ষণ সংযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। শুদ্ধ-কেবল পারমাণব গতি বিসর্জ্জন দ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ কিম্বা পরমাণু সকল সংযুক্ত হইলেই যে তাহারা বিবর্ত্তিত হইয়া বিকশিত হইল, তাহা নহে। বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশ এই বিষয়টী সম্বন্ধে কোন প্রকার ভ্রমাত্মক সংস্কার উপস্থিত না

হয়, তজ্জন্য এই স্থানে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জড় পদার্থ কি পরমাণু সমূহের কেবল বাহ্যিক সংযোগ হইলেই যে তাহারা বিবর্ত্তিত হইয়া বিকশিত হয়, এই রূপ বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্নাবস্থাপন্ন উপলখণ্ড যদি একত্র করিয়া এক স্থানে স্তূপাকারে স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে বস্তুর ঈদৃশ সম্মিলন দ্বারা উপলখণ্ড গুলি পরস্পরের সহিত বিবর্ত্তিত হইয়া বিকশিত হয় না।

যদি বস্তুর সূক্ষ্মাংশ কিম্বা পরমাণুসমূহ স্বকীয় পারমাণব গতি অথবা আভ্যন্তরিক গতি বিলোপান্তর, প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে রূপান্তরিত হইয়া সংযোগাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্রূপ সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি-নিবন্ধন যদি সংযোগ-প্রাপ্ত প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ, অন্যান্য সকল পরমাণু কিম্বা অংশের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি ও গুণ লাভ করে, এবং তন্নিবন্ধন যদি সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু পূর্ব্বের অসংযুক্ত অবস্থা-সম্ভূত স্বকীয় একবিধ প্রকৃতি ও গুণের না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার হয়, এবং প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে আবার সংযুক্ত বস্তুর মধ্যস্থিত প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ বিভিন্নতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহার প্রত্যেকেই যে বিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকারে বিকশিত হইল, এই প্রকার বলা যাইতে পারে।*

* "Along with the change from a diffused to a concentrated state, there goes on a change from a homogeneous to a heterogeneous state. The components of the Mass while they become entegrated also become differentiated." Herbert Spencer.

মানব জীবনের কার্য্য কলাপ, তাহাদের চিন্তা, তাহাদের নৈতিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং ভাষার উন্নতি সমুদায়ের মধ্যেই ঈদৃশ বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশের স্রোত অবিশ্রান্ত এবং অনিবার্য্যরূপে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু এই বিষয়টী সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, এই জন্য প্রথমতঃ সামাজিক কার্য্য-বিভাগ (Division of works) অথবা শ্রম বিভাগ (Division of labour) পদ্ধতির যেরূপে কার্য্য কলাপের বিবর্ত্তিত বিকাশ উপস্থিত হয়, তাহাই উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে।

আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বয়ং আপনার বস্ত্র নির্ম্মাণ করিত, স্বয়ং আপনার ভক্ষ্য বস্তু সমুদায় আহরণ করিত, স্বয়ং আপনার ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র, শস্ত্র, নির্ম্মাণ করিত। তখন কোন বিনিময়-প্রথা প্রচলিত ছিল না। জীবন ধারণার্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তন্তুবায়ের কার্য্য, রজকের কার্য্য, ধীবরের কার্য্য, শিল্পীর কার্য্য, ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার কার্য্যই করিতে হইত। কিন্তু শ্রমবিভাগ (Division of labour) পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে পর, প্রত্যেকে মনুষ্য সমাজস্থ অপরাপর লোকের নির্ম্মিত বস্তু সকল সম্ভোগ করিতেছে। তন্তুবায় কৃষকের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, এবং কৃষক তন্তুবায়ের আহারোপযোগী শস্য উৎপাদন করিতেছে। রজক সকলের বস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে, এবং জীবন ধারণার্থ যে যে বস্তু প্রয়োজন, তাহা সমাজস্থ অপরাপর লোকেরা প্রস্তুত করিতেছে। ধীবর সকলের জন্য মৎস্য আহরণ করিতেছে, কিন্তু ধীবরের প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারোপযোগী বস্তু কৃষক, শিল্পী, তন্তুবায়, রজক, কর্ম্মকার ইত্যাদি

অপরাপর ব্যবসায়ী লোকেরা অযাচিতরূপে সংগ্রহ করিতেছে। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় একখানি কোদালি প্রস্তুত করিতে হয় ত কোন ব্যক্তির বহু পরিশ্রম এবং দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক হইত, কিন্তু এইক্ষণ এক ঘণ্টার মধ্যে তাহা প্রস্তুত হইতে পারে। বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং পিতা পিতামহ উপার্জ্জিত অতুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, স্বদেশ মুখোজ্জলকারী বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীর বিলাসপ্রিয় (সুতরাং অলস স্বভাবসম্পন্ন) সন্তান অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে বিলাসভবনে বসিয়া স্বর্ণ বিনির্ম্মিত হুকায় অবিশ্রান্ত তাম্রকুট সেবন করিতেছেন, অথচ দেশ দেশান্তরের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ লোক তাঁহার জীবন ধারণার্থ প্রয়োজনীয় বস্তু সকল তাঁহাকে আনিয়া দিতেছে। ম্যানচেষ্টারের তন্তুবায়গণ ইংলণ্ডে বসিয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ শিল্পিগণ তাঁহার শরীর ও গৃহকে সুসজ্জিত করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছে। রজক তাঁহার বস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে, সূত্রধর তাঁহার জন্য সুন্দর কাষ্ঠাসন প্রস্তুত করিতেছে; কৃষক তাঁহার আহারের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট চাউল প্রস্তুত করিতেছে, ধীবর তাহার জন্য মৎস্য আহরণ করিতেছে, সুরা ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ী লোকেরা তাঁহার অকাল মৃত্যুর অব্যর্থ উপায় সংঘটন করিতেছে এবং অনেকানেক বাঙ্গালা নাটক-রচয়িতাগণ তাঁহার জঘন্য রুচি উৎপাদন জন্য শত শত পুস্তক লিখিতেছেন। এই প্রকারে তিনি, পিতার পিতামহের বিগত কালের পরিশ্রমের বিনিময়ে, জগতস্থ সকল লোকের জ্ঞান ও পরিশ্রমোৎপন্ন ভাল মন্দ সর্ব্ব প্রকার ফল সম্ভোগ করিতেছেন। কিন্তু ঈদৃশ শ্রমবিভাগ (Division of labour) পদ্ধতির প্রবর্ত্তন দ্বারা নর নারীর জীবনই যে বিবর্ত্তন-বিকশিত গতিকে আশ্রয় করিল, তাহা বোধ হয় এইক্ষণে সহসাই উপলব্ধি হইবেক। পরমাণু সমূহ পারমাণব-গতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরস্পরের গুণ ও ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে ঈদৃশ পরিবর্ত্তনকে বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশ বলা যায়। কিন্তু শ্রম-বিভাগ পদ্ধতির মধ্যেও এতাদৃশ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। একজাতীয় প্রত্যেক মনুষ্য আপন আপন জীবনের পারমাণব গতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এক সমাজস্থ হইল; এবং তন্নিবন্ধন প্রত্যেকের জ্ঞান ও পরিশ্রমের ফল অপরাপর প্রত্যেকে ভোগ করিতে সমর্থ হইল। শ্রমবিভাগ-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত না হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই স্বহস্তে কৃষকের কার্য্য, রজকের কার্য্য এবং তন্তুবায়ের কার্য্য করিতে হইত, কিন্তু শ্রমবিভাগ পদ্ধতি প্রচলিত আছে বলিয়াই কবি আপন গৃহে বসিয়া কল্পনাদেবীর অর্চ্চনা করিতেছেন, কৃষক ক্ষেত্রে বসিয়া দিন রাত্র পরিশ্রম পূর্ব্বক তাঁহার আহারার্থ শস্য সঞ্চয় করিতেছে। সুতরাং প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া নুতনাকারে বিকশিত হইল। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, "নদীর জল সমুদ্র জলের সহিত মিশ্রিত হইলে যেরূপ এক হইয়া যায়, সেই প্রকার প্রত্যেক নর নারী মনুষ্য-সমুদ্র স্বরূপ এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজে প্রবিষ্ট হইবামাত্র স্বতন্ত্র জীবনগতি বিবর্জ্জিত হইয়া জীবনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সমাজ যন্ত্রের অঙ্গীভূত হয়।" এইক্ষণ বোধ হয় সহজেই উপলব্ধি হইবেক যে, আমরা প্রত্যেকেই

এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজের একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ; সুতরাং শরীরের কোন একটী অঙ্গ অকর্ম্মণ্য হইলে তদ্বারা যেরূপ সমুদায় শরীরের অপকার হয়, সেই প্রকার সমাজের কোন এক ব্যক্তির জীবন দূষিত হইলে তদ্বারা অপরাপর সকল লোকেরই অনিষ্ট হইতে পারে।

হীনবুদ্ধি কৃষক মনে করিতে পারে যে, বিশ্ব সংসারে তাহার স্ত্রী পুত্র ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির মঙ্গল সাধনের দ্বারা তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। জ্ঞানহীন ও ধর্ম্মভাব-বিবর্জ্জিত প্রজা-পীড়ন-কারী ভূমাধিকারী মনে করিতে পারেন যে, বঙ্গীয় প্রজাদিগের উন্নতি দ্বারা তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে; ভূম্যধিকারীগণের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী, দেশহিতৈষী নামধারী সম্বাদপত্রের সম্পাদকগণ আত্ম-বিস্মৃতি-নিবন্ধন নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের উন্নতির বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইতে পারেন; কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ভারত-যুবকদিগের অন্তরাত্মা হইতে এবম্বিধ কুসংস্কার অতি সত্বর অপনীত হউক। যে সমাজের মধ্যে কিম্বা যে জাতির মধ্যে কোন এক শ্রেণীস্থ লোক অপর শ্রেণীস্থ লোকদিগকে অত্যাচার দ্বারা জন্ম-নিবন্ধন স্বাভাবিক অধিকার (Natural rights) হইতে বিচ্যুত করিয়াছে, সেই সমাজ কিম্বা সেই জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কখনও হইতে পারে না। প্রত্যেক মনুষ্যের জীবন-গতি, সমাজের ভাল মন্দ সকল প্রকার অবস্থা দ্বারা অবস্থান্তরিত হয়। সুতরাং এক সমাজস্থ এক শ্রেণীস্থ লোকের অবনতি অপরাপর শ্রেণীস্থ লোকদিগকে যে অবনত করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে, বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশের অপর দুই একটী প্রয়োজনীয় অঙ্গের উল্লেখ করা উচিত বোধ হইতেছে। আমাদিগের প্রদত্ত বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশের শেষোক্ত সংজ্ঞাটীও পূর্ণাবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। আমরা প্রথমতঃ বলিয়াছি যে, পরমাণু কিম্বা অংশ সকল স্বকীয় পারমাণবগতি কিম্বা আভ্যন্তরিক গতি বিলোপান্তর সংযোগাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহারা বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে রূপান্তরিতাবস্থায় বিকশিত হইতে থাকে। তৎপরে কথিত হইয়াছে যে, সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি-নিবন্ধন যদি সংযোগ-প্রাপ্ত প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ, অন্যান্য যে সমস্ত পরমাণু কিম্বা অংশের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি ও গুণ লাভ করে, এবং তন্নিবন্ধন সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থের কিম্বা বিষয়ের প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ পূর্ব্বস্থিত একবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার না হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে বিবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার হয়; তবেই তাহারা যে বিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তরে বিকশিত হইল, এই প্রকার বলা যাইতে পারে। কিন্তু সংযোগোৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের অংশ কিম্বা পরমাণু সকলের মধ্যে এবম্বিধ পারস্পরিক প্রকৃতি ও গুণের বিনিময় দ্বারা যে আর একটী নুতন প্রকারের পরিবর্ত্তন সমুপস্থিত হইতে থাকে, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হয় নাই। অর্থাৎ পরমাণু কিম্বা অংশ সকল পারমাণব কিম্বা আভ্যন্তরিক গতি বিলোপান্তর সংযোগাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, একদিকে যেরূপ তাহাদিগের মধ্যে পারস্পরিক প্রকৃতি ও গুণের বিনিময় হয়, অপরদিকে আবার তাহারা অনির্দ্দিষ্টাবস্থা (indefinite condition) হইতে নির্দ্দিষ্টা-

বস্থা (definite condition) এবং বিশৃঙ্খলা-বস্থা হইতে শ্রেণীবদ্ধাবস্থা (from confusion to order) ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইতে থাকে।*

বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশের এই অঙ্গটী এবং তৎসম্বন্ধীয় অপর দুই একটী বিষয় আমাদিগের প্রদত্ত শেষোক্ত সংজ্ঞাতেও উল্লিখিত হয় নাই। শেষোক্ত সংজ্ঞাতে এই সকল বিষয় উল্লেখ না করিবার মুখ্যাভিপ্রায় এই যে, বিবর্ত্তন নিবন্ধন বিকাশের এক একটী অঙ্গ উদাহরণ দ্বারা ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত না হইলে তাহার জটিল সংজ্ঞা † পাঠকদিগের কখনও হৃদ্বোধ হইবেক না।

সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ সংযোগ-প্রাপ্তি নিবন্ধন পরস্পরের প্রকৃতি ও গুণসম্ভূত ফলাফল প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকেই রূপান্তরিত গতি ও শক্তি লাভ করে। গতি ও শক্তির পরিবর্ত্তন ভিন্ন তাহাদের কখন বিনাশ হয় না। সুতরাং প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশের মধ্য-স্থিত সেই রূপান্তরিত গতি ও শক্তি তাহা-দিগের প্রত্যেককেই প্রকৃতির সমতা ও বৈষম্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধরূপে সংস্থাপনও করিতে থাকে। অর্থাৎ সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট পরমাণুদিগের মধ্যে সমজাতীয় ভাব এবং বিষম প্রকৃতিবিশিষ্ট পরমাণু কিম্বা অংশ সকলের মধ্যে বিষম জাতীয় ভাব আন-য়ন করে। শক্তি ও গতির বিলয়শূন্য অবস্থিতিই (persistence of force and continuity of motion) সংযোগ উৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের অংশ কিম্বা পরমাণু সমূহকে ঈদৃশ শ্রেণীবদ্ধরূপে সংস্থাপন করিতে থাকে। যদিও আমরা ইতিপূর্ব্বে বারম্বার বলিয়াছি যে, পারমাণব কিম্বা আভ্যন্তরিক গতির বিলোপান্তর পরমাণু কিম্বা অংশ সকল সংযোগাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তদ্দ্বারা এই প্রকার বুঝিতে হইবে না যে, পরমাণু কিম্বা অংশের আভ্যন্তরিক গতি সম্পূর্ণরূপে বিলোপ হইয়া যায়। পারমাণব গতির আংশিক বিলয় অথবা আংশিক অবস্থতাবস্থাই বিলোপ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

সংযোগ-উৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের পরমাণু কিম্বা অংশ সকল অনির্দ্দিষ্টাবস্থা হইতে নির্দ্দিষ্টাবস্থা এবং বিশৃঙ্খলাবস্থা হইতে শ্রেণীবদ্ধাবস্থা যেরূপে প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা এক এক দেশীয় সামাজিক পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারিবেক। মনুষ্যদিগের পারস্পরিক সং-যোগ দ্বারা সমাজগঠিত হইলে, শ্রেণীবিভাগ কিম্বা জাতিবিভাগ পদ্ধতি প্রভৃতি স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই সমুপস্থিত হইতে থাকে। মনুষ্যগণ সামাজিক বন্ধন দ্বারা সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি-নিবন্ধন পরস্পরের প্রকৃতি ও গুণ-সম্ভূত ফলাফল ভোগ করিতে থাকে, এবং তন্নিবন্ধন প্রত্যেকেই রূপান্তরিত জীবনগতি প্রাপ্ত হয়। পরে তাহাদের সেই রূপান্তরিত

* "At the same time that Evolution is a change from the homogeneous to the heterogeneous, it is a change from the Indefinite to the Definite. Along with an advance from simplicity to complexity, there is an advance from confusion to order—from undetermined arrangement to determined arrangement." Herbert Spencer.

† "Evolution is an integration of matter and concomitant dissipation of motion; during which the matter passes from an indefinite, incoherent homogeneity to a definite, coherent heterogeneity; and during which the retained motion undergoes a parallel transformation." Herbert Spencer,

প্রকৃতি কিম্বা জীবনগতির পারস্পরিক সমতা ও বৈষম্যানুসারে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রকৃতি সম্বন্ধীয় ঈদৃশ সমতা ও বৈষম্যের সমানুপাতানুসারেই (proportionally) মানবমণ্ডলী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে থাকে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আদিম অবস্থায় মনুষ্যগণ পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া কাল যাপন করিত। কিন্তু কালক্রমে শ্রম-বিভাগ (Division of labour) পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত অন্যান্য কারণবশতঃ মনুষ্যগণ ক্রমে সমাজবদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু মনুষ্যসমাজের আদিম অবস্থায় হয়ত এক ব্যক্তি রাজা হইয়া অপর সমুদায়কে শাসন করিত। তৎকালে শাসন কার্য্যের সমুদায় ভার এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং শাসনপ্রণালী অনির্দ্দিষ্টাবস্থায় ছিল। তৎপর কালক্রমে সামাজিক আয়তন বৃদ্ধি সহকারে এবং সামাজিক সংযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজা, মন্ত্রী, বিচারক, শান্তিরক্ষক, ব্যবস্থাপক-সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে শাসন কার্য্যের ভার বিভক্ত হইয়া শাসনপ্রণালী সেই অনির্দ্দিষ্টাবস্থা হইতে নির্দ্দিষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। আবার আদিম অবস্থায় শ্রম-বিভাগ পদ্ধতি কথঞ্চিত রূপে প্রবর্ত্তিত হইলে, কোন ব্যক্তি হয় ত দুই মাস রজকের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং অপর দুই মাস তন্তুবায়ের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত। কোন ব্যক্তি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যবসা অবলম্বন করিত না। কিন্তু কাল সহকারে এক শ্রেণীস্থ লোক কেবল রজকের কার্য্য করিতে লাগিল এবং অপর শ্রেণীস্থ লোক তন্তুবায়ের ব্যবসা অবলম্বন করিল। এই প্রকারে অনির্দ্দিষ্টাবস্থা হইতে প্রত্যেক শ্রেণীস্থ লোক বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশ দ্বারা ক্রমে নির্দ্দিষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ঈদৃশ শ্রেণী বিভাগ বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশের অনিবার্য্য ফল। জনবিশেষের স্বাধীন ইচ্ছা কিম্বা অনিচ্ছা দ্বারা ঈদৃশ শ্রেণী বিভাগ নিবারিত কিম্বা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না, এবং ঈদৃশ শ্রেণী বিভাগ আবার জনবিশেষের প্রচারিত নিয়ম দ্বারা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আর্য্য মহর্ষিগণ সামাজিক ঈদৃশ প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা করিয়া ভারতের অশেষবিধ অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সভ্যতা সম্বন্ধে কথঞ্চিত উন্নতি লাভ করিলে আর্য্য মহর্ষিগণ সামাজিক অবস্থার গতিরোধ করিয়া সমাজের সাম্যাবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তদুপযোগী সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সকল প্রাচীন মহর্ষিদিগের মধ্যে অনেকেই সামাজিক সাম্যাবস্থার ফলাফল ও মঙ্গলসাধন, উপকারিতা ও অনুপকারিতা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সেরূপ অভিজ্ঞতা ছিল না। জগদ্বিখ্যাত ফরাশি দার্শনিক অগস্ত কমৃত বলিয়াছেন যে, কি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ, কি অপরাপর দেশের প্রাচীন দার্শনিকগণ, সামাজিক গতি সম্বন্ধীয় নিয়ম বিষয়ে সকল দেশের প্রাচীন দার্শনিকেরা নিতান্ত অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।*

"Social order was regarded by the ancients as stationary and its theory under this provisional aspect was admirably sketched out by the great Aristotle. The social speculations of

বস্তুতঃ ভারতবাসী আর্য্য-মহর্ষিগণ সামাজিক গতি সম্বন্ধীয় নিয়ম বুঝিতে না পারিয়াই সামাজিক সাম্যাবস্থাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।

যে সকল কারণ বশতঃ সামাজিক শ্রেণী বিভাগ হয়, তাহা সামাজিক বৈষম্যাবস্থা এবং সামাজিক বিশ্লেষণ (social segregation) সম্বন্ধীয় নিয়ম ব্যাখ্যা করিবার সময় বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইবে। ঈদৃশ শ্রেণীবিভাগ যে বিবর্ত্তন নিবন্ধন বিকাশের অনিবার্য্য ফল, তাহাই কেবল এই স্থানে উল্লিখিত হইল।

নবলীলা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

রাত্রি হইয়াছে, দিবসের আন্দোলন একটু একটু থামিয়া আসিতেছে,—লোকের ভিড়, লোকের চলাচল্‌তি একটু থামিয়া আসিয়াছে। গোপনে কোথায় কি পরামর্শ চলিতেছে, কে জানে, কিন্তু বাহিরের আন্দোলন একটু থামিয়াছে। জননী শিশু সন্তানকে ঘুম পাড়াইতেছেন আর বলিতেছেন, বিনোদ বাবুদের বাড়ীতে যেও না, বিনোদ বাবুরা একঘরে হয়েছেন। শিশু সন্তানেরা ভাল মন্দ কিছুই জানে না, তাহারা বলিতেছে,—কেন যাব না মা? বিনোদ বাবু বড় ভাল বাসেন, কত ভাল জিনিস খেতে দেন। জননী আর কিছু না বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছেন,—বিনোদ বাবুদের বাড়ী গেলে মার খাবে। বালকেরা চুপ করিতেছে। গৃহের কর্ত্তা আসিয়া গৃহের সকলকে বলিতেছেন, সাবধান, পাড়ার ওদিকে কেহ যেও না। এই প্রকারে ঘরে ঘরে একটু একটু কথাবার্ত্তা হইতেছে, কিন্তু বাহিরের আন্দোলন আর নাই। পাড়ায় পাড়ায় দিবসে যে কমিটী বসিয়াছিল, সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমিটী ভাঙ্গিয়াছে বাহিরে কি ধার্য্য হইয়াছে, জানি না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে আপন আপন ঘর ঠিক করিবার চেষ্টা হইতেছে। বিনোদ বাবুদের বাড়ীর মেয়েদের সহিত যে সকল মেয়েদের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল, তাহাদের প্রাণে এ সকল বাজিতেছে, তাহারা একটু আধটু প্রতিবাদ করিয়া তিরস্কৃত হইতেছে।

বিনোদ বাবুর জননীকে পাড়ার একটী মেয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত, সে নিষেধ সত্ত্বেও বিনোদ বাবুদের বাড়ীতে এসেছে; এসে, বিনোদ বাবুর জননীর নিকট বলিতেছে, "ওমা, দেশের হলো কি, জোর করে সকলকে ঘরে বেঁধে রাখ্‌তে চায়। আমি ত তা পারিনে, এতকাল যাদেরে আত্মীয় ভেবেছি, আজ হঠাৎ কেমন করে তাহা-

---

antiquity are entirely devoid of the conception of progress. Their historical field was too narrow to indicate any continuous movement of Humanity." Auguste Comte.

দের বাড়ী পর্য্যন্ত যাওয়া বন্ধ করব।" বিনোদ বাবুর জননী ধীর স্বরে বলিলেন,—"তুমি আর এস না মা, কেন বিবাদের পথ খুল্‌বে? দলাদলিতে লোকের বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পায়, হঠাৎ তোমাকে অপমান করবে, তুমি আর এস না।"

স্ত্রীলোক;—তা তো থাকতে পারিনে, আপনি বলেন তার কি বল্‌ব, কিন্তু আমিতো আপনার নিকট মনের সকল কথা না বলে পারিনে।

এই সময়ে নিকটে স্ত্রীলোকের পদ শব্দ শ্রুত হইল। জননী বলিলেন--দেখ, হয় ত কেহ তোমাকে খুঁজতে এসেছে?

এই সময়ে হঠাৎ একটী স্ত্রীলোক আসিয়া জননীর পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। জননী বুঝিলেন—স্ত্রীলোকটী সুলোচনার ভগ্নী। বিনোদ বাবুর মাতা বলিলেন,—'কাঁদিস্ কেন, কি হয়েছে বল?

সুলোচনার ভগ্নী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আপনি যদি সদয় না হন, আপনি যদি রক্ষা না করেন, তবে আজ আমার প্রাণের সুলোচনা ভেসে যায়!

অনন্তদেবীর প্রাণে আঘাত লাগিল, ক্রন্দনে হৃদয় ব্যথিত হইল, বলিলেন, কোন ভয় নাই, কি হয়েছে বল্।

কুলকামিনী বলিল,—গ্রামের সকল মাতাল জুটেছে, আজ আর সুলোচনার রক্ষা নাই; আপনি যদি আজ রক্ষা না করেন, তবে আমরা জন্মের মত ভেসে যাই। আর আমার প্রাণে সয় না!

অনন্তদেবীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, বলিলেন,—কি?—গোপালপুরের এই অবস্থা? জোর করে ধর্ম্ম লোপ করবে, তা কখনই হবে না। এই বলিয়া অনন্তদেবী গম্ভীর স্বরে বিনোদবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশচন্দ্রকে ডাকিলেন। সুরেশচন্দ্র আসিলে জননী বলিলেন, সুরেশ, বিনোদের অপরাধ ভুলে যাও—গোপালপুরে জোর করে কাহারও ধর্ম্মলোপ করবে, ইহা আমি সইতে পারিনে। এখনই লোকজন লয়ে তুমি যাও। সুলোচনাকে উদ্ধার করে আন। টাকার জন্য ভয় ক'র না, যত টাকা লাগে আমি দিব।

আগুনে ঘৃত নিক্ষিপ্ত হইল, সুরেশচন্দ্র ইতি পূর্ব্বেই ক্রোধে অধীর হইয়াছিলেন, জননীর আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ লোকজন লইয়া চলিলেন। বিনোদ বাবু আশু বিপদ গণনা করিয়া বারম্বার দাদাকে নিষেধ করিলেন, কিন্তু সুরেশ জননীর আদেশ লঙ্ঘন করিবার লোক নহেন, তিনি বেগে চলিলেন। বিনোদ বাবুও অগত্যা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সুরেশচন্দ্র যে সময়ে লোক জন লইয়া উপস্থিত হইলেন, সে অতি ভয়ানক সময়, সে সময়ের ঘটনা লিখিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। কুলকামিনীর জননী মদে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে, গৃহের অভ্যন্তর হইতে আর্ত্তনাদের করুণ স্বর গগণ ভেদ করিয়া উঠিতেছে;—পাষণ্ড দল আমোদে মত্ত। "দিদি, আমাকে বিষ দে, আমাকে বিষ দে, আর বাঁচব না, আজই মরি, দা কই?—হায়,হায়, দিদি এমন নিঃসম্বল করে আমাকে ফেলে তুই কোথায় গেল। বুঝেছি—আমার সহায় সংসারে কেহ নাই —আকাশে কি দেবতারা নাই? তাঁরা কি আমাকে রক্ষা করবেন না? রে পাষণ্ড, আমাকে ধরিস্‌নে, এখনই তোর বুকে লাথি মারব। ঐ দেখ্—স্বর্গে দেবতারা আমার সহায়—আমার সহিত তোরা পারবি? কখনই না। আয়, আয়,

কাছে আয়। আজ আগে তোদের মেরে তবে বিষ খেয়ে মরি। উঃ পারিনে, উঃ পারিনে, পাষণ্ডদের সহিত আর পার্‌লেম না,—বিনোদ বাবু, তুমি কোথায়? দিদি গেল, তুমিও গেলে? হায়, হায়, তবে আমার আর বুঝি উপায় নাই।" এই প্রকার আর্ত্তনাদের ধ্বনি গৃহভেদ করিয়া আকাশে উঠিতেছে, এমন সময়ে সুরেশচন্দ্র রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকজন লইয়া উপস্থিত হইলেন। সুলোচনা উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন, তাঁহার করুণ স্বরে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হয়, বিনোদ বাবু এতক্ষণ শান্তভাবে ছিলেন, কিন্তু সুলোচনার স্বর শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন,—সুরেশ ও বিনোদ উভয়ে বীরের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুরেশ ও বিনোদ যখন দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, তখন পাষণ্ডেরা ভীত হইয়া পলায়ন তৎপর হইল,—সুলোচনা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মৃত্তিকায় পড়িলেন। সুরেশের লোকেরা পাষণ্ডদিগকে প্রহার আরম্ভ করিল। তুমুল কাণ্ড বাধিয়া গেল—চতুর্দ্দিক হইতে আরো লোক আসিতে লাগিল, উভয় দলে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বিনোদ বাবুর আদেশে সুলোচনাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। এদিকে দুই ভাই মত্ত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কতক্ষণ পরে পাষণ্ডদিগের দল পরাজিত হইল। যখন ২।৩টা খুন হইল, তখন তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করিল। সুরেশ ও বিনোদ বাবু উভয়ে সুলোচনাকে লইয়া বাড়ীতে আগমন করিলেন। সুলোচনা তখন অচেতন, কিছুই জানিলেন না। দলাদলির আগুনে ঘৃত নিক্ষিপ্ত হইল—আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দলাদলির প্রথম অধ্যায়।

পরদিন কমলমণি, সুলোচনার মাতা, বক্ষে আঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। কমলমণির স্বার্থ কেবল অর্থ, আজ যদি কেহ কতকগুলি টাকা কমলমণির হস্তে দিতে পারিত, তবে কমলমণি নিঃশব্দে আবার সংসার পাতিতেন, আবার সুখ অন্বেষণ করিতেন। কিন্তু অর্থ দিয়া কেহই—বিনোদ বাবুর দলের কেহই কমলমণির মনের আগুন নির্ব্বাণ করিল না;—সুতরাং কমলমণি বিপক্ষে যোগ দিলেন, সুরেশ ও বিনোদের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় রত হইলেন। প্রথমতঃ গোপালপুরের আপামর সাধারণ জুটিয়া বিনোদ বাবুদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিল; পরে ধোপা নাপিত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল—গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র করিয়া দিল,—'কমলমণির হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া বিনোদ ও সুরেশ সুলোচনা ও কুলকামিনীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের জাতি গিয়াছে। গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সুরেশচন্দ্রদের বাড়ীতে প্রকাশ্যে যাতায়াত বন্ধ করিল, অর্থের প্রলোভন ছাড়িতে না পারিয়া গুপ্ত দ্বার খুলিল। ধোপা নাপিত বন্ধ হইল—চতুর্দ্দিকে নিন্দার রোল উঠিয়া গেল। সুরেশের এ সকল সহ্য হইল না, তিনি দেশের লোকদিগকে যথেচ্ছা গালি দিয়া স্থানান্তর হইতে ধোপা নাপিত আনায়ন করিলেন—ব্রাহ্মণ আনিলেন। ক্রমে চাকর চাকরাণী পলায়ন করিল; সুরেশ স্থানান্তর হইতে চাকর চাকরাণী আর জুটাইয়া আনিতে পারিলেন না। গোপালপুরে একটী স্কুল ছিল, স্কুলের শিক্ষ-

কেরা বিনোদের সহিত অকৃত্রিম ভালবাসায় জড়িত ছিল; তাঁহারা বিনোদের সহিত সাক্ষাতাদি করিত বলিয়া গ্রামের লোকেরা তাঁহাদিগের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল। একজন শিক্ষক তাঁহাদের গ্রাম হইতে এক-জন চাকর আনিয়া দিয়াছিল বলিয়া তাঁহার হুঁকা বন্ধ হইল।—কেবল তাহা নহে, তাঁহাকে স্কুল হইতে তাড়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল। স্কুলের শিক্ষকদিগকে গ্রামের লোকেরা পদে পদে অপমান করিতে লাগিল—পদে পদে নির্যাতন করিতে লাগিল। শিক্ষকেরা একত্রিত হইয়া উপরি-তন কর্ম্মচারীদিগকে এ কথা জানাইলে গবর্ণ-মেণ্ট হইতে যখন বিশেষ কোন বন্দোবস্ত হইল না, তখন একে একে শিক্ষকেরা স্কুল পরিত্যাগ করিল। অবশেষে স্কুলটী এক প্রকার উঠিয়া গেল। গ্রামের লোকেরা বলিল, —ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষাই সর্ব্বনাশের মূল, শিক্ষায় প্রয়োজন নাই। ইহা বলিয়া বালক-দিগকে জ্যাটামির দলে ভর্ত্তি করিয়া দিল—দলাদলির "ক খ" শিক্ষা দিতে লাগিল। স্কুলের যে দশা ঘটিল—পোষ্টাফিসের প্রায় তাহাই ঘটিল। গ্রামের লোকেরা পোষ্টপিয়নকে প্রথমতঃ বিনোদ বাবুদের বাড়ীতে পত্র বিলি করিতে নিষেধ করিল, পিয়ন সে কথা অগ্রাহ্য করিল—সুতরাং একদিন তাহাকে প্রহার সহ্য করিতে হইল। পিয়ন কর্ম্মত্যাগ করিল—গ্রামের ভাবগতিক দেখিয়া পোষ্টমাষ্টারও স্থানান্তরে গমনের অভিমত জানাইলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। কিয়দ্দিবস পরে ডাক-ঘর হইতে চুরি আরম্ভ হইল। এই প্রকারে পোষ্টাফিসটীও যায় যায় হইল। স্কুল গেল—পোষ্টাফিস যায় যায় হইল,—সেদিকে কাহা-রও দৃষ্টি নাই—এদিকে এই আন্দোলনের সময় মদের আদর অত্যন্ত বাড়িল. পূর্ব্বে অনেক দূরে মদের দোকান ছিল, ক্রমে যখন আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন দোকানীরা আসিয়া গোপালপুরে ঘর বাঁধিল। একদিকে গোপালপুরের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা, অন্যদিকে কি হইল, তাহাও বলিতেছি। সেই রজনীতে যাহারা প্রহার সহ্য করিয়াছিল, তাহারা সে কথা গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে কাহাকেও বলিল না—পাছে তাহারা বিরক্ত হয়। কোন প্রকার মকর্দ্দমাও উপস্থিত করিল না। এমন কি, কমলমণি যদি সকলের বাড়ী বাড়ী যাইয়া মেয়েদের দুর্দ্দশার (?) কথা—অপহরণের কথা না বলিতেন, তবে সেই রজনীর ঘটনা আর কেহই জানিতে পারিত কি না সন্দেহ ছিল। সেই জন্যই বলিতেছিলাম—কমলমনির হাতে, যদি কেহ অর্থ-সংযোগ করিত, ঐ পর্য্যন্ত গোলমাল চুকিয়া যাইত। তবে ঐ লোকগুলি মিলিয়া ভিতরে ভিতরে সুরেশচন্দ্রের অনিষ্টের চেষ্টায় রত হইল। প্রথমতঃ ইহারা প্রতিজ্ঞা করি-য়াছিল, সুরেশ বা বিনোদকে যেখানে পাইবে, সেইখানে ধরিয়া প্রহার করিবে, কিন্তু সে আশা পূর্ণ করা বড়ই কঠিন হইল। সুরেশ ও বিনোদ যখন বাড়ীর বাহির হই-তেন, তখন ৩।৪ জন করিয়া অস্ত্রধারী সর্দ্দার ইঁহাদিগের সঙ্গে থাকিত। এদিকে নিরাশ হইয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, সুরে-শের বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করিবে। কিন্তু তাহাও হতভাগ্যদের দ্বারায় ঘটিয়া উঠিল না, সুরেশ ও বিনোদ গোপালপুরের মধ্যে অর্থ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী; স্ত্রীলোক দূরে থাকুক, কোন চাকরকে অপমান করিতে পারে, এমন লোক গোপালপুরে নাই। অব-

শেষে তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল—সুরেশদের বাড়ীতে পড়িয়া চুরি করিবে। একদিন রাত্রে ইহারা কয়েকজন জুটিয়া সিঁদ কাটিয়া সুরেশদের গৃহে প্রবেশ করিল। এ সম্বন্ধে ইহাদিগের সকলেই অপরিপক্ক, গৃহে প্রবেশ করিয়াই ইহারা ধরা পড়িল। সুরেশচন্দ্র নিজহস্তে উত্তম মধ্যম প্রহার করিয়া পরদিন ইহাদিগকে পুলিসে চালান দিলেন। পুলিস আসিয়া গ্রামে পড়িয়া ইহাদিগের বাড়ী অনুসন্ধান করিল,—কতপ্রকার নির্যাতন করিল;—কেহ কেহ অর্থ দ্বারা নির্যাতনের হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেন; যাহাদের অর্থ ছিল না, তাহাদিগকে অশেষ প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইল,—পরে কয়েকজনকে শ্রীঘরে পর্য্যন্ত পদনিক্ষেপ করিতে হইল।

গ্রামে এই প্রকার চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল পড়িয়া গেল—দলাদলিতে গ্রামের স্কুলটী উঠিয়া গেল—পোষ্টাফিসটী যায় যায় হইল, ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের ঘরের তণ্ডুল শেষ হইয়া আসিল,—অনেক দরিদ্র লোকের অভাব বাড়িয়া উঠিল—কেহ কেহ শ্রীঘরে গমন করিল। দলাদলিতে গোপালপুরের লোকেরা মত্ত—এসকলকেই তাহারা উন্নতির লক্ষণ মনে করিল;—গোপালপুরের বর্ত্তমান অবস্থায় কাহারও অশ্রুপাত হইল না। দলাদলির প্রথম অধ্যায় শেষ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দলাদলির অনল গৃহে!

সেই রজনীতে সুরেশচন্দ্র লোকজন লইয়া যখন সুলোচনাকে উদ্ধার করিতে গমন করেন, তখন কুলকামিনী, সুলোচনার ভগ্নী, সুরেশচন্দ্রের জননীর নিকটই ছিলেন। যখন সুলোচনাকে লইয়া সুরেশ ও বিনোদ বাবু গৃহে ফিরিলেন, তখন কুলকামিনীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। বিহগ-শিশু শিকারীর ভয়ে ভীত হইয়া যে প্রকার জননীর পক্ষপুটের আড়ালে অঙ্গ ঢাকিয়া নিরাপদ মনে করে, কুলকামিনী ও সুলোচনা আজ অনন্তদেবীর স্নেহ-পক্ষপুটে আপনাদিগকে ঢাকিয়া সেই প্রকার নিরাপদ মনে করিলেন। অনন্তদেবী উভয়কে আপন আশ্রয়ে জননীর ন্যায় রাখিলেন—আপন আশ্রয়ে পালনকরিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে যখন দলাদলির আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তখন সেই উত্তাপ অন্তঃপুর পর্য্যন্ত পৌছিল। দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছে,—বিনোদ বাবু ও সুরেশচন্দ্র সুলোচনা ও কুলকামিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইহাদিগকে অপহরণ করিয়াছে। ক্রমে এই সংবাদ অন্তঃপুরে পৌছিল—সুরেশের স্ত্রী আনন্দময়ী, এবং বিনোদের স্ত্রী শান্তময়ীর হৃদয় মন বিষাদে মলিন হইল, মুখ ভার হইল। পাড়ার দুষ্ট মেয়েরা ঐ কথায় রং চড়াইয়া এমন ভাবে ইহাদিগের নিকট উপস্থিত করিতে লাগিল যে, অবশেষে ইঁহারা সুলোচনা ও কুলকামিনীকে ঘোরতর বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। অনন্তদেবী পুত্রবধূদিগকে ও ইহাদিগকে সমান চক্ষে দেখিতেন, ইহাও ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। অসহায় সুলোচনা ও কুলকামিনীর এ অবস্থা বুঝিতে বাকী রহিল না। অল্প সময়ের মধ্যে ইহারা সকলি বুঝিতে পারিলেন। এক দিকে বাহিরের দলাদলির আন্দোলনে সুরেশচন্দ্র ও বিনোদের অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, এদিকে অন্তঃপুরে হিংসার অনল জ্বলিয়া উঠিয়া ইহাদিগের হৃদয়ের শান্তি

বিনাশে উদ্যত—এই চিন্তা সুলোচনা ও কুলকামিনীর হৃদয়ে কালিমা আনয়ন করিল ;—উভয়ের মুখ মলিন হইল, উভয়ের শরীর কৃশ হইয়া আসিতে লাগিল। কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, উভয়ের অন্তরে এই চিন্তা, উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকিতেন। অনন্তদেবী ভাল মন্দ কিছুই জানেন না—তিরস্কার করিয়া সময়ে সময়ে বলেন—'হা লো, দিন দিন তোদের এপ্রকার ভাব দেখ্‌ছি কেন? বাড়ীর মেয়ের মত কাজ কর্ম্ম কর্‌বি, না অলস হয়ে বসে থাকিস্‌। অনন্তদেবী এমন কর্কশ কথাই বা কেন বলেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, শান্তময়ী ও আনন্দময়ী আজ কাল সর্ব্বদাই ইহাদিগের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া থাকেন। স্পষ্ট কোন কথা শাশুড়ীর নিকট বলিতে পারেন না, কিন্তু নানা রকমে শাশুড়ীর মনে সন্দেহের গরল ঢালিয়া দিতে ইহারা চেষ্টা করিতেছেন। শাশুড়ী ঠাকুরুণ ইহাঁদিগকে সমান চক্ষে দেখেন, ইহা ইহাদের প্রাণের অসহ্য। এজন্য ইহারা সময়ে সময়ে মুখ ভার করিয়া থাকেন, কখনও বা শাশুড়ীকে অলক্ষিত ভাবে ঠাট্টা করেন, কখনও শাশুড়ীর কথাকে অগ্রাহ্য করেন। এই প্রকার করিয়াও অনন্তদেবীর মন যখন বিরক্ত হইল না, তখন ইহারা গৃহকার্য্যে শিথিলতা দেখাইতে লাগিলেন। যদি শাশুড়ী এজন্য তিরস্কার করিতেন, তাহা হইলে বধূরা বলিতেন, আমরা চারিজনে সমান কাজ করিব, ভাগ করিয়া দিন। শাশুড়ী বলিলেন, এরা কি তোদের সতিন, হ্যাঁলো, এদের প্রতি তোদের এত হিংসা কেন? দুই চারি দিনের জন্য এরা এসেছে, এরা আবার কাজ কর্ম্ম কি কর্‌বে? শান্তময়ী বলিলেন, তবে আমারও কর্‌ব না। এই প্রকার জিদ্‌ রক্ষা করায় গৃহের কার্য্যাদিতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। অনন্তদেবীর মন ক্রমে ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিল; তখন সুলোচনা ও কুলকামিনীকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তদেবী, বধূদিগের গূঢ় অভিসন্ধি কি, তাহা জানিতেন না। অনন্তদেবী যখন ইহাদিগের প্রতি একটু একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন সুরেশ ও বিনোদ একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। ইহারাও ভিতরের কোন সংবাদই জানিতেন না, জানিতে পারেন নাই। ইহারা মনে ভাবিলেন, জননীর তিরস্কারেই সুলোচনা ও কুলকামিনী মলিন ও কৃশ হইতেছে। জননীর প্রতি ইহাদের উভয়ের শ্রদ্ধা ছিল, তাহার একটু হ্রাস হইল। জননীকে ইহাঁরা ভালবাসার একটী প্রতিমূর্ত্তি মনে করিতেন, কিন্তু জননীও যখন ইহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইলেন, তখন ইহারা মনে ভাবিলেন, গৃহে অশান্তির আগুন না রাখিয়া ইহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া ভাল। সুলোচনা ও কুলকামিনী ভিতরের সকল সংবাদই জানিতেন, ইহাঁরা এই প্রস্তাবে আরো অসন্তুষ্ট হইলেন; মনে ভাবিলেন, পৃথক থাকিয়া ইহার পর সুরেশ ও বিনোদ বাবুর সহিত আমরা যদি কথাও বলি, তাহা হইলেও লোকের মনে সন্দেহ হইতে থাকিবে। বধূরা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অনন্তদেবী সম্মত হইলেন না। সুরেশ ও বিনোদ জননীকে বলিলেন—তোমার জন্যই আমরা ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে চাই, তুমি ইহাদিগকে আপনার কন্যার ন্যায় পালন করিতে পারিতেছ না। অনন্তদেবীর প্রাণে সন্তানদিগের এই কথা অসহ্য হইল, তিনি অশ্রু ফেলিয়া বলিলেন, দ্যাখ সুরেশ, দ্যাখ বিনোদ, আমি

একদিনও ইহাদিগকে পরের ন্যায় দেখি নাই, যদি দেখে থাকি, ভগবান যেন আমার সর্ব্বনাশ করেন।

বিনোদ বাবু ধীর স্বরে বলিলেন, তবে ইহারা দিন দিন মলিন হইতেছে কেন? ইহাদের মনে কিসের চিন্তা?

অনন্তদেবী বলিলেন,—আমি তা কিছুই জানি না, দোহাই তোদের, আমাকে অবিশ্বাস করিস্‌নে, আমি তাহার কিছুই জানিনে! সুরেশচন্দ্র ও বিনোদ বাবু জননীর কথায় আশ্বস্ত হইলেন, স্থানান্তরে রাখা স্থগিত হইল। ইহারা উভয়ে কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। সুলোচনা ও কুলকামিনীর নিকটে বসিয়া ইহারা নির্জ্জনে এই মলিন ও বিষণ্ণ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুলোচনা কিছুই বলিল না— কুলকামিনী বলিল,—আমাদের অবস্থা আমরা সকল সময়েই ভাবি—ভাবিয়া ভাবিয়াই এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। সুরেশচন্দ্র বলিলেন,—তোমাদের কিসের ভাবনা?—আমরা থাকিতে তোমাদের কোন চিন্তা নাই। তোমরা যাহা বলিবে আমরা তাহাই করিব।

সুরেশের এই কথা আনন্দময়ী আড়ালে থাকিয়া শুনিলেন। তাঁহার মনে পূর্ব্বে যে সন্দেহ ছিল, সেই সন্দেহ আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল;—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'হয় আমি বিষ খাইয়া মরিব, না হয় ইহাদিগকে মারিব।'

সুরেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া কুলকামিনী বলিলেন,—আপনারা আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন, ইহা কেহ আপন ভগ্নীর জন্যও করে না,—আমাদের জন্য আপনারা কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, আজও সহ্য করিতেছেন, ইহা ভাবিলেও চক্ষে জল আসে। আমাদের দ্বারা যদি আপনাদের আরো অনিষ্ট হয়, তবে তাহা আমরা কি প্রকারে সহ্য করব?

বিনোদ বাবু বলিলেন,—কি অনিষ্ট? আমাদের কি অনিষ্ট হইবে?

সুলোচনা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। কুলকামিনী মুখ নত করিয়া বলিলেন, অনুসন্ধান করুন, জানিতে পারিবেন।

বিনোদ বাবু পুনঃ বলিলেন,—কোথায় অনুসন্ধান করিব?

কুলকামিনী পুনঃ ধীরে বলিলেন—গৃহে। সুলোচনার অন্তর শিহরিয়া উঠিল—শরীর রোমাঞ্চিত হইল। কুলকামিনীর শেষ কথা শুনিয়া সুরেশচন্দ্র ও বিনোদ বাবু উঠিয়া গেলেন।

সুলোচনা কুলকামিনীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—দিদি, কি সর্ব্বনাশ করিলি?'

দিদি কি সর্ব্বনাশ করিল, তাহা দিদি বুঝিল না।

ইতিহাসে নাস্তিকতা।

মানবজাতির সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, এই প্রত্যক্ষবাদী উনবিংশ শতাব্দীতেও ঐতিহাসিক আলোচনার আবশ্যকতা এতদূর প্রতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে, মনুষ্যসমাজের উন্নতির জন্য নূতন কোন সুব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে পণ্ডিত মাত্রেই অতীতসাক্ষী ইতিহাসের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, মনুষ্য সমাজের নিমিত্ত কোন নূতন

প্রণালী উদ্ভাবন করিতে গেলে যদি অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পুরাবৃত্তকেই অবলম্বন করিতে হয়; কেননা, পুরাবৃত্তের মত অভিজ্ঞতাদাতা আর দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক ব্যক্তি জ্ঞানাভ্যুদয়ের সময় হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসরের সহস্র সহস্র লোকের অভিজ্ঞতা একত্র করিলে এক ব্যক্তির ত কথাই নাই, এক বংশের লক্ষ লক্ষ লোকের অভিজ্ঞতাও অতি যৎসামান্য বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব এইরূপ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ইতিহাস, নাস্তিকতা সম্বন্ধে যাহা সাক্ষ্য দেন, তাহা অবশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই শিরোধার্য্য করিবেন, সন্দেহ নাই।

নাস্তিকতাকে তিনটী সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম—যে মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য; দ্বিতীয়—যে মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্দেহযুক্ত; তৃতীয়—যে মতে ঈশ্বর একজন আছেন, কিন্তু মনুষ্য তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে না। আমরা এই তিনটী মতকেই কার্য্যতঃ নাস্তিকতা নামে অভিহিত করিব। এই তিন মতেই (অন্ততঃ কথায়) নীতির আবশ্যকতা স্বীকার করেন।

এখন প্রশ্ন এই নাস্তিকতা কতকাল অবধি মনুষ্য সমাজে প্রচলিত? এই নাস্তিকতা কি কোন একটী মনুষ্য সমাজকেও শান্তি প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াছে?

আসিয়াতে ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথমে মনোবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই হতভাগ্য দেশে সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন কোন ইতিহাস না থাকাতে কত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে নাস্তিকতার মত প্রচারিত হয়, নির্ণয় করা সুকঠিন।

চার্ব্বাকদর্শন, সাঙ্খ্যদর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শন অল্পাধিক পরিমাণে নাস্তিকতানুমোদক। কপিলমুনি স্বয়ং নাস্তিক ছিলেন কি না বলা দুষ্কর। অনেকে বলেন, তিনি "ঈশ্বর অসিদ্ধ" মাত্র বলিতেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। কিন্তু চার্ব্বাক যে ঘোর নাস্তিক ছিলেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব মত বিষয়ে নাস্তিক ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি যেরূপ এক নিশ্চল উদাসীন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, তাহাতে তাঁহাকেও কার্য্যতঃ নাস্তিক বলা যাইতে পারে। যদিও এই তিনটী দর্শনের প্রারম্ভ-সময় নির্ণয় করা আমাদের দুঃসাধ্য, তথাপি মোটামোটী ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই তিনটী দর্শনই খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ ৪।৫ শতাব্দী পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধদর্শন, সাঙ্খ্য ও চার্ব্বাক দর্শনের পরবর্ত্তী।

শেষোক্ত দুইটী দর্শন সম্বন্ধে ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, ইহাদের দ্বারা একটী ক্ষুদ্রতম সম্প্রদায়ও সংগঠিত হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। বুদ্ধের মত প্রচারিত হইলে, বোধ হয় ভারতবর্ষের এমন কোন প্রদেশ ছিল না, যেখানে তাঁহার মতাবলম্বী লোক ছিল না। এখন বিবেচ্য এই, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে কি কারণে তাড়িত হইল। পণ্ডিতেরা দুইটী সুযুক্তিসম্পন্ন অনুমান উপস্থিত করিয়া থাকেন। প্রথম,—ব্রাহ্মণেরা আপনাদের সম্মান রক্ষার্থ সর্ব্বত্রই বৌদ্ধধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এই যুক্তির একটী সমান্তরাল দৃষ্টান্ত আমাদের বঙ্গদেশে এখনও দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণব-

ধর্ম্মও প্রথমে জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না। তজ্জন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প; সমাজের অপেক্ষাকৃত নীচ-শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। ব্রাহ্মণেরা এইরূপে আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ সাধন করিবার মানসে, আদিরস-ঘটিত ইন্দ্রিয়-সুখ-প্রদ নূতন নূতন তন্ত্র পুরাণাদি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে লোকের বিশ্বাস ভোগবিলাসবিহীন শুষ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইতে আরম্ভ করিল। বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল; বুদ্ধদেব বিষ্ণুর অবতার হইয়া নিম্বকাষ্ঠ বিনি-র্ম্মিত বিকৃত হস্তপদ বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পুরীতে দার পরিগ্রহ করতঃ বৎসর বৎসর জামাতারূপে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এইরূপে যোগী ধ্যানমুগ্ধ উদা-সীন বুদ্ধকে ঘোর সাংসারিক বিলাসপ্রিয় দেবতার সাজে সজ্জিত করা হইল। কিন্তু বুদ্ধ একটী মন্ত্র কখনও ভুলিতে পারেন নাই; তিনি জাতিভেদ কখনও স্বীকার করেন নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া চতুর ব্রাহ্মণেরা ব্যবস্থা দিলেন, যে, "কেবল পুরী-তেই ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলে একত্র ভোজনাদি করিতে পারিবে।" পুরীসন্ধি লিখিত হইল; হিন্দু-বৌদ্ধ-সংগ্রাম শেষ হইল। দ্বিতীয় যুক্তিটী এই,—যদিও বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি তৎ-কাল-প্রচলিত সমুদায় নীতি অপেক্ষা উৎ-কৃষ্ট ছিল. তথাপি দুর্ব্বল হৃদয় মনুষ্যের দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, এরূপ একজন দয়াবান ঈশ্বরে বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত না থাকাতে, সংসারের তীব্র দুঃখানলে বিদগ্ধ আত্মা "হা ঈশ্বর তুমি যা কর" বলিয়া যে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখ অনুভব করে, বৌদ্ধধর্ম্ম-দীক্ষিত ব্যক্তি সেই সুখের অভাব দেখিয়া নব্য শুষ্ক নীতিবাদ হইতে সরস (পৌরাণিক) হিন্দু ধর্ম্মে পুনর্দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল।

যদি কেবল প্রথম কারণটীই সত্য হইত, তবে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই বলা যাইত না। কিন্তু ইহা ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, দ্বিতীয় কারণটীই ভারত-বর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের বহিস্কৃত হইবার মূল। প্রথম কারণটী দ্বিতীয়ের অনেকটা সাহায্য করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু যাঁহারা বলেন, কেবল প্রথম কারণটীও সত্য হইতে পারে, তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনা একটী সুবিস্তীর্ণ দেশে বদ্ধমূল হইয়া একটী সত্য ধর্ম্মের মূলোৎপাটন করিয়া আপন রাজ্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয়। বোধ করি ঘোর নাস্তিকও এরূপ কথা বলিতে সাহসী হইবেন না। বৌদ্ধধর্ম্ম সত্য হইলে, বৌদ্ধধর্ম্ম মানব হৃদয়ের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইলে, পৌরাণিক ধর্ম্ম কখনও ইহাকে ধ্বংস করিতে পারিত না। অশ্লীল হইলেও পৌরাণিক ধর্ম্মে মানবাত্মার নির্ভরের জন্য দেব দেবীর পূজা নিহিত ছিল। তবুও কিছু ধরিবার ছিল। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য যে দিগ্বিজয়ে এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার দ্বারা নাস্তিকতা মতের অসা-রতা ও অশান্তিপূর্ণতা প্রদর্শন, এবং প্রকৃত ধর্ম্মবীরের ন্যায় ঈশ্বরবাদ মতের যাথার্থ্য ও শান্তিপূর্ণতা প্রতিপাদন হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের সমকালেই জৈন ধর্ম্ম ইহাকে অঙ্গহীন করে। ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইয়া চীন, তিব্বৎ, জাপান, ব্রহ্ম ইত্যাদি প্রদেশে কিরূপ আকারে ধারণ করিয়াছে,

পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কোন দেশে স্বয়ং বুদ্ধদেব, বিগ্রহে বর্ত্তমান থাকিয়া, কোন দেশে বা পুরোহিত পরম্পরার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া ঈশ্বররূপে পূজিত হইতেছেন।

ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্ম-প্রাপ্ত দেশ গুলির বিবরণ অবগত হওয়া গেল। আসিয়ার অবশিষ্ট দেশ গুলির মধ্যে আরব, পারস্য, এমন কি—পেলেষ্টাইনেও নাস্তিকতা লোকের অবিদিত ছিল না। আমাদের বিশ্বাস, একেশ্বরবাদ এবং নাস্তিকতা প্রায় এক সময় হইতেই আবির্ভূত; কারণ একেশ্বরবাদে সন্দেহ হইলেই নাস্তিকতা আসিয়া পড়ে। আসিয়ার প্রায় সকল শিক্ষিত প্রদেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতে কোন না কোন রূপ একেশ্বরবাদ চলিয়া আসিয়াছে; সুতরাং নাস্তিকতাও যে সেই প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এখন দেখিতে হইবে, এই সুবিশাল ভূভাগ আসিয়াতে এমন কোন স্থল আছে কিনা, যেখানে নাস্তিকতা প্রাচীন কাল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে। আমরা সকলেই জানি, এরূপ কোন দেশ আসিয়াতে নাই। এমন কি, কোন সময়ে কোন দেশে কোন একটী নাস্তিক সম্প্রদায় যে দুই এক শতাব্দী বর্ত্তমান থাকিয়া মনুষ্যসমাজের উপকার করিয়াছে, তাহারও কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, নাস্তিকতার প্রকৃত ইতিহাস লিখিত না হইতে পারে। আমরা বলি, নাস্তিকতার জন্য পৃথক ভাবে কোন ইতিহাস লেখা না হউক, অন্য কোন গ্রন্থে এরূপ কোন সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না কেন? অথচ নাস্তিক মধ্যে মধ্যে ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব্যবস্থাগ্রন্থে নাস্তিকদিগের প্রতি কিরূপ দণ্ডবিধান করা উচিত, তদুল্লেখই আমাদের বাক্যের এক প্রসিদ্ধ প্রমাণ। তবে আমরা দেখিলাম আসিয়াতে নাস্তিকতা অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ হইয়া আজ পর্য্যন্ত কোথাও ইহার জীবন্ত ভাব প্রদর্শন করিতে সক্ষম, কিম্বা মনুষ্য সমাজের কোন প্রকার উন্নতির পক্ষে সহায় হয় নাই। এখন একবার ইউরোপের দিকে দৃষ্টি করুন। এখানে অতি প্রাচীন কালের কথা বলিলেই দুইটী জাতির কথা সর্ব্বপ্রথমে মনে হয়,—গ্রীক এবং রোমান্। এই উভয় জাতির মধ্যে গ্রীকদিগের কথা জানিলেই রোমানদিগের কথাও জানা যাইবে; কারণ রোমানেরা মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে প্রায় কিছুই লিখেন নাই। উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে রোম, গ্রীসের শিষ্য মাত্র ছিলেন। সুতরাং আমরা ইউরোপের শিরোভূষণ গ্রীসে প্রাচীন কাল হইতে নাস্তিকতা কি অবস্থায় চলিয়া আসিতেছে জানিতে পারিলেই, তৎকালীন নাস্তিকতার ইতিহাস জানিতে পারিব।

খ্রীষ্ট জন্মের আনুমানিক ৩২৩ বৎসর পূর্ব্বে পাইরো নামক একজন গ্রীক পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথমে গ্রীসে সন্দেহবাদ প্রচার করেন। কথিত আছে, তিনি জ্ঞানলাভ মানসে ৩২৬ খ্রীঃ পূঃ মহাবীর আলেক্জান্দারের সহিত ভারতবর্ষে আগমন করেন; এবং একদল দিগম্বর যোগী হইতে মনোবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন। সুতরাং আমাদের অনুমান বোধ হয় নিতান্ত অলৌকিক হইবেনা যে, পাইরো ভারতবর্ষ হইতেই

প্রথমে সন্দেহবাদ শিক্ষা করিয়া গ্রীসে প্রচারিত করেন। কিন্তু উক্ত দিগম্বর যোগীদিগের মত যে সন্দেহবাদ ছিল বোধ হয় না। যাহা হউক, ইহাতে আমাদের পাইরো সম্বন্ধে অনুমানেরও কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। পাইরোর পর হইতেই গ্রীসে সন্দেহবাদ নানা আকার ধারণ করে. সুতরাং এখন আমরা বলিতে পারি যে, খ্রীষ্টের অন্ততঃ তিনশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসে নাস্তিকতার সূত্রপাত হয়। এত কাল মধ্যে ইউরোপীয় ইতিহাসে একটী ধর্ত্তব্য নাস্তিক সম্প্রদায়েরও উল্লেখ নাই। এপিকিউরিয়ানেরা পৃথক কোন সমাজ সংগঠন করিয়া স্বীয় মত প্রচারে সাহসী হন নাই। মধ্যে মধ্যে যে যে পণ্ডিত ঐ মতাবলম্বী হইতেন, তাঁহারা অসংস্কৃত প্রাচীন সমাজের ভিতরেই লুক্কায়িত থাকিতেন।

এখন প্রাচীনকালের দুইটী সুসভ্য ও সুপণ্ডিত দেশ—আসিয়া এবং ইউরোপের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। পাঠক দেখিতে পাইলেন নাস্তিকতা কোথাও জীবন্তভাব দেখাইতে সমর্থ হয় নাই—কোথাও পরদুঃখে ব্যথিত হইয়া মানবজাতির কল্যানার্থ জীবনোৎসর্গ করে নাই। প্রাচীন কালের আর একটী অতি ক্ষুদ্রতম অথচ সভ্যতম দেশ অবশিষ্ট রহিয়াছে। সেইটী ভয়ানক অসভ্যজাতি পরিবেষ্টিত সুসভ্য মিসর। পাঠককে বলিতে হইবে না যে, মিসর ভারতবর্ষের ন্যায় ঈশ্বর-পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত।

আমরা অতি সংক্ষেপে, যথাসাধ্য, নাস্তিকতার একখানি ঐতিহাসিক চিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। পাঠকেরা দেখিয়াছেন যে, আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতির কোন প্রদেশেই এই দুই সহস্রাধিক বৎসর মধ্যে নাস্তিকতা মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হয় নাই।

লোক সংখ্যা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পৃথিবীর সমুদায় উদ্ভিদ এবং প্রাণীই বর্দ্ধনশীল। এমন বৃক্ষলতা বা প্রাণী নাই যাহার সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে না। একটী সামান্য বীজ হইতে এত বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে যে অতি অল্প দিনেই সেই বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপিয়া ফেলিতে পারে। একটী বীজ হইতে একটী বট বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই বৃক্ষে প্রতি বৎসরে অসংখ্য ফল ফলে এবং প্রতিফলে অসংখ্য বীজ থাকে। যদি এই সমুদায় বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং সকল বৃক্ষই স্থান ও পোষণোপযোগী সামগ্রী পাইয়া বৃদ্ধি হয় এবং তাহারাও ফলবান হইয়া প্রতিবৎসর ফল, ও ফল হইতে বীজ উৎপাদন করে এবং সেই বীজ হইতে পুনরায় বৃক্ষ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি, তাহা হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে আর বট বৃক্ষের স্থান হয় না। ইহার উপর আবার প্রত্যেক বৃক্ষ যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিনই যদি বীজ উৎপন্ন করে এবং সেই বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া আবার বীজ উৎপন্ন করে ইত্যাদি, তাহা হইলে অতি অল্প দিনেই শতসহস্র পৃথিবীকে একটীমাত্র

বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষে ব্যাপিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু তাহা হয় না। তাহার কারণ এই যে, যত জীব উৎপন্ন হয়, সংসারে তত আহার এবং স্থান নাই। আহার এবং স্থানের অল্পতা প্রযুক্ত অবশ্যই সকল জীব বাঁচিতে পারে না। যাহারা সুবিধামত স্থান ও আহার পায়, কেবল তাহারাই বাঁচিয়া থাকে, অবশিষ্ট সকলে এই স্বাভাবিক নির্ব্বাচন নিয়মে মরিয়া যায়। এই প্রকারে মরিয়া গেলেও ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সংসারে যত স্থান ও আহার আছে তাহার অতিরিক্ত প্রাণী সৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবলমাত্র স্থান ও আহার অভাবে সমুদায় অতিরিক্ত উদ্ভিদ এবং প্রাণী বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যদি সকলেই স্থান ও আহার পাইত তাহা হইলে সকলেই বাঁচিতে পারিত, সে বিষয়ে আর সংশয় কি? তাহা না হইয়া ইহাই সপ্রমাণ করিতেছে যে, সংসারে উৎপন্ন প্রাণীর সীমা নাই; কিন্তু তাহাদিগের জীবন ধারনোপযোগী সামগ্রীর সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব আহার অপেক্ষা জীবের উৎপত্তি অধিক, এই ঘটনাটীকে প্রাণী বৃদ্ধির আমরা একটী সাধারণ নিয়ম বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

লোকসংখ্যা এই নিয়মেই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যূন তিনটী করিয়া সন্তান জন্মে এবং তাহাদিগের আবার প্রত্যেকের তিনটী করিয়া জন্মে ইত্যাদি এবং সকলেই যদি মনুষ্যের সাধারণ জীবনকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে এই সঙ্কীর্ণ পৃথিবীতে মনুষ্যময় করিতে কয় দিন লাগে? কিন্তু সকল মনুষ্যই জীবিত থাকে না। এবং সকলেই সমান সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করে না; এই জন্য এখনও পৃথিবীতে মনুষ্যের স্থান হইতেছে। আহারের দোষে, আবাস-স্থানের দোষে, মনুষ্যের নিজের বা পৈতৃক কর্ম্মদোষে এবং স্বভাবের অপরিজ্ঞাত কৌশলে লোকসংখ্যা এখনও এত বৃদ্ধি হয় নাই যে, সকলের স্থান হয়না বা আহার মিলে না। কিন্তু এই বৃদ্ধিকে যদি কোন প্রকারে নিবারণ করা না যায়, তাহা হইলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যে, মনুষ্য পরিবার পৃথিবীর আর কোন স্থানেই স্থান ও আহার পাইবে না, তাহাতে আর সংশয় নাই।

জীবের যে প্রকার উৎপাদিকা শক্তি, সে শক্তির যথেষ্ট পরিচালনা হইয়া যদি জীব উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে কোন এক প্রকার জীবেরই এই জগতে স্থান হইত না। যেমন সকল উৎপন্ন জীব রক্ষা পায় না, তেমনই আবার উৎপাদিকা শক্তিরও যথেষ্ট পরিচালনা হয় না। সমস্ত শক্তি পরিচালিত হইলে, এবং সকল জাতীয় জীবমাত্রেই রক্ষা পাইলে কি হইত তাহা চিন্তা করা যায় না। এবং সংখ্যাবাচক শব্দে প্রকাশ বা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

মনুষ্য ছাড়িয়া দিয়া তদপেক্ষা দীর্ঘকালে উৎপন্নশীল প্রাণীদিগের হিসাব লইয়া দেখিলেও বুঝা যায় যে, সকল প্রাণী রক্ষা পাইলে অতি অল্প দিনেই প্রাণী সংখ্যা অসংখ্য হইয়া পড়িত। উত্তম উত্তম ঘোটক ও ঘোটকী সকলকে উৎপন্ন করিতে দেওয়া হয় না। ঘোটক উৎপন্ন করিবার জন্য স্বতন্ত্র এক প্রকার ঘোটক পালিত হইয়া থাকে। এই সকল উৎপাদনকারী পালিত ঘোটকের সংখ্যা যে অতি অল্প, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি এই সকল পালিত ঘোটক হইতেই যে দেশের সমুদায় ঘোটকের অভাব মোচন হইয়া থাকে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ইহা হইতে অবশ্যই স্বীকার করিতে

হইবে যে, যাহাদিগকে কয়েকটী ব্যতিরেকে একেবারে সন্তান উৎপন্ন করিতে দেওয়া হয় না, তাহারও প্রচুর পরিমাণে সেই কয়েকটী হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা বিলম্বে প্রসব করে এবং ৩০ বৎসর বয়সের কমে সন্তানোৎপাদন করে না। ৩০ বৎসর বয়স হইতে ৯০ বৎসর পর্য্যন্ত উৎপাদিকা শক্তি ধরিলে এবং প্রতি ৩০ বৎসরে এক যোড়া করিয়া সন্তান প্রসব করিলে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, পাঁচশত বৎসর পর একটী হস্তী-দম্পতী হইতে ১,৫০,০০,০০০ এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ হস্তী উৎপন্ন হইবে। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডারউইন হিসাব করিয়া প্রাণীগণের এ প্রকার বৃদ্ধি স্থির করিয়াছেন যে, অতি অল্প দিবসেই এক এক জাতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী এত বৃদ্ধি হইতে পারে যে, পৃথিবীতে তাহাদিগের স্থান হওয়া অসম্ভব।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীগণ যে দিন দিন অসংখ্য রূপে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। কোন কোন গৃহ-পালিত প্রাণী অতি অল্প দিনে এত বৃদ্ধি হইয়া যায় যে, অধিকাংশই আরণ্য হইয়া যায়। বিড়াল কুক্কুর ইত্যাদি কতকগুলি প্রাণীর শাবক এত বৃদ্ধি হয় যে, প্রায়ই তাহাদিগকে বন্ধু-বর্গের মধ্যে বিতরণ করা হইয়া থাকে। আমাদিগের কোন এক বন্ধু এক যোড়া শ্বেত শশক পালন করিয়াছিলেন। এক বৎসর পরে তাহাদিগের এত শাবক হইয়াছিল যে, যাঁহারা যাঁহারা লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই নিরাশ হন নাই। আমাদিগের দেশময় যে লোহিতবর্ণের ছোট ছোট এরাণ্ডা বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, জানা যায় যে অনুমান ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা একে বারেই ছিল না। কিন্তু আজ কাল তাহাদিগের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, আর মারিয়া তাহাদিগকে শেষ করা যায় না। এত করিয়া তাহাদিগের বংশ নাশ করিবার চেষ্টা না করিলে বোধ হয় এতদিন সমগ্র দেশ এই লোহিত এরণ্ড বনে পরিণত হইত। অষ্ট্রে-লিয়াতে সম্প্রতি শশক সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কৃষকেরা কোন প্রকারেই শস্য পাইত না। কয়েকটী মাত্র শশক তথায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং কোন প্রকার প্রতিবন্ধক না পাওয়াতে ও আহার্য্য প্রচুর পরিমাণে থাকাতে কয়েকটী মাত্র হইতে সমুদায় দেশ শশকের উৎপীড়নে নিতান্ত পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ফ্রান্সে কোন সময়ে পতঙ্গভূক্ ক্ষুদ্র পক্ষী বিনষ্ট হওয়াতে পতঙ্গ জাতি এত বৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং এত শস্য হানি করিত যে, দেশান্তর হইতে ক্ষুদ্র পক্ষীর আমদানি করা ব্যতিরেকে অন্য উপায় ছিল না। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মিল, ডারউইন প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীগণের বৃদ্ধি অসীম, এবং কোন এক প্রকার প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌কে যদি সমস্ত পৃথিবী ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তাহারা প্রচুর আহার বা পোষণোপযোগী সামগ্রী পায়, তাহা হইলে কয়েক বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদিগের স্থান হয় না।

উদ্ভিদ্ জাতি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে, প্রাণীগণ আহার পাইলে তাহা অপেক্ষা আরও অধিক বৃদ্ধি হইতে পারে। পৃথিবী ভিন্ন উদ্ভিদ্ আর কোথায় জন্মাইতে পারে? কিন্তু পৃথিবীর স্থানের সীমা আছে। সমস্ত স্থান অধিকৃত হইয়া গেলে তাহাদিগের আর,

বৃদ্ধি হইবার উপায় নাই। আহার পাইয়া প্রাণীগণ বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের এপ্রকার স্থানাভাব হইবে না।

যদি আহার মিলে,আর কোন প্রকার বিনাশের উপায় না থাকে এবং ছোট বড় সকলেই উৎপাদনশীল হয়, তাঁহা হইলে কোন এক প্রকার প্রাণী অতি শীঘ্র এত বৃদ্ধি হইতে পারে যে, তাহা সংখ্যা করা কি তাহাদিগের সংখ্যার বিষয় চিন্তা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু সকল প্রাণীরই এই পৃথিবীতে আহার পাওয়া অসম্ভব, কেন না পৃথিবী যে পরিমাণে শস্য বা তৃণ উৎপন্ন করে, তাহা স্থান সাপেক্ষ। সমগ্র ভূমিতে যে তৃণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার পরিমাণের সীমা আছে কিন্তু প্রাণী সংখ্যার সীমা না থাকিলে সীমাবিশিষ্ট তৃণ শস্যে কখন অসংখ্য প্রাণীর জীবন ধারণ হইতে পারে না। যদি প্রাণীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের আহারোপযোগী সামগ্রীর আধিক্য জন্মে, তাহা হইলেই সেই সকল প্রাণী বাঁচিতে পারে, নচেৎ আহারাভাবে অবশ্যই অনেককে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। প্রকৃতি যাহাদিগের পক্ষে অনুকূল হইবে, অর্থাৎ যাহারা আহার সংগ্রহে পটু হইবে, তাহারাই কেবল বাঁচিতে পারিবে এবং অবশিষ্ট সকলকে স্বভাবতঃই বিনষ্ট হইতে হইবে। বিনাশ পাইতে কেহই ইচ্ছা করে না এবং ক্ষুধা তৃষ্ণার যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা প্রাণীদিগের নাই এবং হইতেও পারে না। এই জন্য সকলেই বাঁচিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু সকলের বাঁচিবার প্রাকৃতিক উপায় নাই। আহারের জন্য কাজে কাজেই একে অন্যকে বিনাশ করিয়া তাহার প্রাপ্ত-আহার বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। এইরূপে ক্রমে মহা অনিষ্ট, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় যে সকল প্রাণীর নিমিত্ত আহার প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, সেই সকল প্রাণী ব্যতিরেকে, অপর সকলে নিধন প্রাপ্ত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে পরিমাণে আহারের কুলান হইতে পারে, প্রাণীগণ যদি তাহা অপেক্ষা অধিক কিম্বা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অতিরিক্ত সংখ্যা বিনষ্ট হইবে।

এক্ষণে কথা এই যে, উৎপন্ন আহার্য্য দ্রব্যে যে সংখ্যক প্রাণীর উদর পূরণ হইতে পারে, তাহার অধিক জীব উৎপন্ন হইতে পারে কিনা? যুক্তি, ভূয়োদর্শন ও প্রমাণ দ্বারা ইহা এক প্রকার মীমাংসা হইয়াছে যে, যে পরিমাণে আহার মিলে, তাহার অধিক প্রাণী সংখ্যা বাঁচিতে পারে না, কিন্তু আহার্য্যের অধিক প্রাণীসংখ্যা যে জন্মিতে পারে না, তাহা নহে। কোন প্রকার জন্মের প্রতিবন্ধক না থাকিলে, অর্থাৎ কোন নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক অন্তরায় যদি না থাকে, তাহা হইলে প্রাণী সংখ্যা অবশ্যই জন্মিবে, কিন্তু আহারের অপ্রতুল হইলে তাহাদিগকে কাজে কাজেই নিধন প্রাপ্ত হইতে হইবে। যদি তাহাদিগের পিতা মাতা নিজ নিজ আহার হইতে কিছু কিছু প্রদান করিয়া শাবককে জীবিত রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে অনুপযুক্ত আহারে যত দিন জীবন ধারণ করিতে পারে, ততদিন জীবন ধারণ করিয়া অবশেষে মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। যে প্রাণী যত আহার করিতে পারে এবং যাহার শরীর রক্ষার জন্য যত আহারের প্রায়োজন যদি তত না যোটে, তাহা হইলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া, পূর্ণ আহার পাইলে যত দিন বাঁচিত, তাহা অপেক্ষা অল্প-

সময় মধ্যে যে বিনষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং যে প্রাণী জন্মিয়া আহারাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে, তাহার জন্মে ফল কি? যদি জন্ম মাত্র আহারাভাবে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে জন্ম যে বিড়ম্বনা মাত্র, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে,যত জীবের আহার যোটে তাহার অধিক জীব জন্মিলে আহার মিলিবে না। সুতরাং যদি জীবের ক্ষমতাধীন হয় এবং বৃথা অপত্যোৎপাদন অনিষ্টকর ও মৃত্যুহেতু বলিয়া বুঝিবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে অপত্যোৎপাদন করিবার পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়া অপত্য না উৎপাদন করাই শ্রেয়ঃ। ইতর প্রাণীদিগের এই শ্রেয়স্কর বিষয় বুঝিবার শক্তি নাই এবং শাবক জন্মিলে আহার মিলিবে কিনা আদৌ তাহাও বুঝিবার উপযুক্ত জ্ঞান নাই, কিন্তু প্রকৃতি এই জ্ঞানের স্থানীয় হইয়া অতিরিক্ত জীবকুল ধ্বংশ করিবার বিস্তর উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন। মৎস্য, সর্প প্রভৃতি বিস্তর প্রাণীগণ আপন আপন শাবক ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং বানর বংশে পুরুষ জন্মিলে পিতাই নিজ সন্তান বধ করে। গুটীপোকা প্রভৃতি অনেক প্রাণীর আবার এমনই স্বভাব যে শাবক উৎপন্ন হইবার জন্য তাহারা স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইতর প্রাণীগণ অনেকেই অন্যান্য ইতর প্রাণীর দ্বারা বিনষ্ট হয় এবং কেহ কেহ বা মনুষ্যের দ্বারাও বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব বিলক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, যাহাদিগের বুদ্ধি শক্তি নাই, স্বভাব তাহাদিগের সংখ্যা-বৃদ্ধির বিষয়ে সতর্ক থাকিয়া তাহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইতে দেয় না। স্বাভাবিক এত প্রকার বিনাশের উপায় থাকিলেও সকল প্রাণী যে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতর প্রাণীগণের পক্ষে যে নিয়ম, মনুষ্যের পক্ষে তাহার অন্যতর নহে; অর্থাৎ ইতর প্রাণীগণের ন্যায় মনুষ্যের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। জগৎকে জীবসঙ্কুল করিবার প্রবৃত্তি জীব মাত্রেই স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ম্যালথাস্ স্থির করিয়াছেন যে, যে পরিমাণে আহার মিলে তাহার অধিক সন্তানোৎপাদন করা জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি অনুসারে জীব সংখ্যা অপর্য্যাপ্ত জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আহারের অভাব নিবন্ধন প্রকৃতি সকলকে জীবিত রাখে না। প্রকৃতি সকলকে জীবিত না রাখিলেও জীব সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং যত জীব সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, আহারীয় সামগ্রীর ততই হ্রাস হইতেছে, অর্থাৎ দশ জনের খাদ্যও তদতিরিক্ত জীবে ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। যাহা হউক, জগতের জীব সংখ্যার বিষয় চিন্তা করিলে এই সত্য অবগত হইতে পারা যায় যে, জীবমাত্রেই অতিরিক্ত সন্তানোৎপাদক শক্তিসম্পন্ন। যে পরিমাণে জীবের উৎপত্তি হইতেছে পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপন্ন শস্যাদি সে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে না, ইহাও এই সত্যের আনুষঙ্গিক ঘটনা। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ডারউইন, মিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক বাক্যে এই সত্য স্বীকার করিয়াছেন এবং আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই জীবোৎপাদিকা শক্তি যদি অব্যাহত প্রভাবে কার্য্য করিতে পায়, তাহা হইলে সংসারের অবস্থা যে কি হইতে পারে এবং কি পরিমাণে প্রাণী সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহা

চিন্তা করা যায় না। ম্যাল্‌থাস্ দেখিয়া শুনিয়া অবগত হইয়াছেন যে, প্রতিবন্ধক না পাইলে মনুষ্য সংখ্যা প্রতি পঁচিশ বৎসরে দ্বিগুণিত হইতে পারে। উত্তর আমেরিকাতে যথায় শস্যাদি প্রচুর এবং লোকের সামাজিক অবস্থা কলুষিত হয় নাই, তথায় পঁচিশ বৎসরের মধ্যেও লোকসংখ্যা, দেড়শত বৎসর হইল, দ্বিগুণিত হইয়াছিল। স্থানান্তরে সুবিধা সত্বে পঞ্চদশ বৎসরে লোকসংখ্যা দ্বিগুণিত হইয়াছে, তাহাও তিনি দেখিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তিনি বলিয়াছেন যে, এই উৎপাদিকা শক্তিও প্রচুর নহে, অর্থাৎ আরও সুবিধা থাকিলে লোকসংখ্যা আরও অল্প সময়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইতে পারিত। মিল ও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মনুষ্যের উৎপাদিকা-শক্তি সম্পূর্ণ রূপে উদ্ভাসিত হয় না, কিন্তু তথাপি দেখা গিয়াছে যে, পবিত্র শ্রমজীবী-লোকের দ্বারা উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়া, নূতন স্থানান্তরিত আগন্তুক লোকের সংখ্যা ছাড়িয়া দিয়াও ক্রমাগত কয়েকপুরুষ ধরিয়া লোক সংখ্যা বিশ বৎসরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাও তাঁহার মতে যথেষ্ট নহে; কারণ তিনি আরও বলেন যে, স্বাস্থ্যকর ও শস্যসঙ্কুল দেশে লোকসংখ্যা কেবলমাত্র দ্বিগুণ হওয়া অতি সামান্য বৃদ্ধি। বাস্তবিক লোক-সংখ্যা যে কি পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা আমরা দেখি নাই। যথায় অত্যন্ত শীঘ্র শীঘ্র লোক সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তথায়ও দেখা যায় যে, সকল প্রকার সুবিধা যাহা যাহা থাকিতে পারে তাহা থাকে নাই। আমেরিকাতে অতি শীঘ্র লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও দেখা যায় যে, গড়ে লোকের জীবন-কাল দীর্ঘ নহে এবং অবিবাহিত ব্যক্তি ও বেশ্যা সংখ্যার দ্বারা উৎপাদিকা শক্তির বিস্তর অপচয় হইয়াছে; সুতরাং আমেরিকাও সকল প্রকার প্রতিবন্ধকের হস্ত অতিক্রম করিতে পারে নাই। অতএব এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কে আর সত্যের অপলাপ করিবার জন্য একথা বলিবে যে, আহারের পরিমাণের অধিক জীবসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে না? কি উপায়ে ইহার দমন হইতে পারে, তাহাতে সকলের মত ঐক্য না হইতে পারে, অর্থাৎ কেহ এক প্রকার কেহ বা অন্য প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিন্তু ইহা অবশ্যই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃতির আহারোৎপাদিকা শক্তি অপেক্ষা জীবোৎপাদিকা শক্তি অধিক।

ক্রমশঃ।

কবি এবং কবিতা।

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হিঁশুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ নাগেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইলু
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ান না গেলি॥
কত বিদগধ জন রস অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥"

কবি এবং কবিতা সমালোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই বিদ্যাপতির এই কবিতাটী প্রস্তাবের শীর্ষস্থানে উদ্ধৃত করিলাম কেন? অনেকে বলেন,—বিদ্যাপতি বঙ্গবাসী নন, মিথিলানিবাসী। তিনি যে স্থানবাসীই হউন, তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। তাঁহার কবিতা বা গীতাবলী বাঙ্গালী মাত্রেরই আদরের বস্তু, এ কথাতে বোধ হয় অধিক মত-দ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় কথা,—বিদ্যাপতির রুচি ভাল নয়। অনেকে বলেন, তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিত ছিল। পৃথিবীর অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদের অপ্রতুল নাই! অথচ কালিদাস কবিশ্রেষ্ঠ,—সৃষ্টির অমূল্য রমণীরত্ন শকুন্তলার স্রষ্টা, ধর্ম্ম ও নীতিবীর পুরুষপ্রধান (১) দুষ্মন্তের চরিত্র রচয়িতা। অনেকের মতে কুমারসম্ভব এক খানি আধ্যাত্মিক রাজ্যের গূঢ় চিত্রস্বরূপ কাব্য। সাঙ্খ্যদর্শনের অতি নিগূঢ়, উচ্চ ও পবিত্র ভাব ইহাতে কাব্যাকারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহারও লেখক মহাকবি কালিদাস। দীলিপ ও সুদক্ষিণার ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশুদ্ধ স্বভাব কালিদাসেরই লেখনীপ্রসূত। হৃদয়-স্পর্শী অজবিলাপের স্রষ্টাও এই জগদ্বিখ্যাত মহাকবি। ইংরেজি ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মুখে মহাকবি সেক্সপীয়রের চরিত্রেরও সুযশ শুনা যায় না। কিন্তু এণ্টোনিয় প্রভৃতির সুমহৎ উদার চরিত্রের রচয়িতা তিনিই। যদিও কবির চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে সোণায় সোহাগার যোগ হয়, স্বর্গে মন্দাকিনীর সুধাময় স্রোতের আবির্ভাব হয়, তথাপি চরিত্রে ত্রুটি থাকিলে যে কবিতা ভাল হয় না এবং তাঁহার গর্ভে সুরুচি ও গূঢ় পবিত্র ভাব নিহিত থাকিতে পারে না, এ কথা বলিতে পারি না। ইহার মূলে যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার আলোচনার স্থল এ প্রস্তাব নয়। তবে স্থূল ভাবে জানা উচিত যে, সতেজ বৃক্ষের দশ খানি ডালের মধ্যে এক খানি ডাল মরিয়া শুকাইয়া গেলেও, সে সুগন্ধিপুষ্প এবং সুমিষ্ট মনোহর ফল-প্রসূ হইতে পারে। সমাজ ও সংসর্গদোষে এবং

(১) শকুন্তলাতত্ত্বের সুবিজ্ঞ রচয়িতা চন্দ্রনাথ বাবুরও এই মত। কেবল মত নয়, উক্ত গ্রন্থে নানা যুক্তি ও উদাহরণ দ্বারা এ কথা সমর্থিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম মতের জটিলতার দরুন প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের চরিত্রের কোন অংশে দোষস্পর্শ হইলেও তাহার প্রতিভাসূর্য্য চির-মেঘাচ্ছন্ন হয় না।

কালিদাসের কুমার সম্ভবের ন্যায় বিদ্যাপতির কবিতার নিম্নেও গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত। বিদ্যাপতির নায়িকা রাধা। এই রাধার মানসিক অবস্থাই প্রস্তাবের শীর্ষোদ্ধৃত কবিতায় পরিস্ফুট হইয়াছে। রাধা কে? রাধা সিদ্ধি রূপিনী(২)। রাধা, অনন্ত প্রেমস্বরূপিনী। অনন্ত প্রেমস্বরূপিনী বলিলাম, কেন না অনন্ত প্রেমের দিকেই মানবজীবনের গতি এবং তাহাই লক্ষ্য। লক্ষ্য লাভই সিদ্ধি। রাধা অনন্ত প্রেমময়ী, তাই সিদ্ধিরূপিনী। অনন্ত প্রেম সুধাধারা, সেই অনাদি অনন্ত প্রেমসিন্ধু ব্রহ্মাণ্ডপতি হইতেই প্রসৃত, তৎপ্রতিই প্রধাবিত এবং তাঁহাতেই সন্নিহিত। এই প্রেম-পূত বারিতে জগতের পাপ-মলিনতা বিধৌত করিয়াই স্বয়ং বিধাতা হরি। প্রেম বিনা হরি নাই, হরি বিনা প্রেম নাই--প্রেম এবং হরি অভিন্ন, অবিযুক্ত এবং নিত্য সম্বন্ধ-সম্বদ্ধ। তাই রাধা হরির মিলন অবশ্যম্ভাবী। সুনিপুণ কবি বিদ্যাপতি প্রেমকে বিশ্লিষ্ট করিয়া প্রেম-প্রতিমা রাধার সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাগবত এই অভাবনীয় মহতী সৃষ্টির প্রথম অবতারক। বিদ্যাপতি তাহারই ছায়ায় দাঁড়াইয়া "ভাব-সম্মিলন" নামক পরিচ্ছেদে প্রেমময়ী রাধার মুখ হইতে, সুকৌশলে, অনন্ত প্রেম প্রকৃতির যে সুস্পষ্ট ছবিখানি তুলিয়াছেন, প্রসঙ্গের প্রারম্ভেই সেই কথা কয়টী লিখিত বা উদ্ধৃত হইয়াছে। এখানে বুঝিতে হইবে, প্রেম নিজেই যেন নিজের ভাবে উন্মত্ত হইয়া আপনার বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—"সখি! ভালবাসার সুমধুর আস্বাদনের কথা আমায় কি জিজ্ঞাসা করিতেছ? যতই বর্ণনা করি, প্রেম ক্ষুধা ..ন পলে পলে ততই নূতন ভাব ধারণ করে। আমি জন্মাবধি রূপ দেখিলাম, কিন্তু দেখিবার সাধ মিটিল না, সেই মধুর আলাপ শুনিলাম, কিন্তু তাহা আমার শ্রবণপথ স্পর্শও করিল না। ইত্যাদি।" কি অনন্ত অতৃপ্তি! কি অন্তরস্পর্শী সুগভীর ভাব! প্রেম আপনিই স্রষ্টা, আপনিই দর্শক। প্রেমের সৃষ্টি পলে পলে তিলে তিলে নূতন। প্রেমের রাজ্যে পুরাতনের বসতি নাই। ভালবাসা অমূল্য স্পর্শমণি স্বরূপ। তাহার স্পর্শে পথের ধূলিমুষ্টি বহুমূল্য মাণিকরূপ ধারণ করে। প্রেম অপূর্ব্ব মোহমন্ত্র। ইহার বাতাসে মরুভূমি নন্দনে পরিণত হয়। অবিকৃত অনন্ত প্রসারিত ভালবাসাই যথার্থ সাম্য-মহাসঙ্গীত। প্রেমের রাজ্যে ছোট নাই, বড় নাই, ধনী নাই, দরিদ্র নাই, কুলীন নাই, অকুলীন নাই; পণ্ডিত মূর্খে, সুরূপে কুরূপে ভেদ নাই। এ রাজ্যে আলোক অন্ধকার সমান। তাই ভাল বেসে বেসে, একেবারে গ'লে গেলেও সাধ মেটে না, প্রাণের ক্ষুধা—অন্তরের পিপাসা দূর হয় না। যতই ভালবাসি, সে ক্ষুধা, সে পিপাসা ততই নূতন, ততই প্রবল, ততই বর্দ্ধনশীল। ভালবাসার অদম্য বেগে হিমালয়ের ন্যায় বাধা বিঘ্ন ভাসিয়া যায়; গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। অনন্ত প্রেম প্রবাহের প্রতিরোধ নাই। ইহা অবিরাম, অনবরত। তাই ভালবাসার বস্তুকে দেখিতে দেখিতে, সেই রূপ সাগরে ডুবিয়া, মজিয়া, গলিয়া, মিশিয়া গেলেও দে[illegible] এক[illegible] শেষ হয় না।

(২) "রাধ্নোতি সিদ্ধ্যতি", পদার্থ মুক্তাবলী দেখুন।

প্রেম মধুমাখা বিশ্রান্তালাপ চির দিন শুনিলেও বোধ হয় যেন কিছুই শোনা হইল না। এই প্রেম যত উন্নত. যত উদার, ইহার প্রসার যত অপরিমেয়, অতৃপ্তি ততই গভীর। অনাদি অনন্ত ভালবাসার অতৃপ্তি অনাদি, অনন্ত। বিদ্যাপতির কণ্ঠ এই অনাদি অনন্ত প্রেমের মহা সঙ্গীতে সন্নিরত। এমন উচ্চ, এমন মহৎ ব্রত কার?

যেমন বিষয়, বিদ্যাপতি তেমনই কবি। বিদ্যাপতির কবিতা পড়িতে পড়িতে বোধ হয়, কবির হৃদয় যেন অনন্ত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত। সেই উচ্ছ্বাস যেন অনর্গল কবিতা-প্রবাহে ঢালিতে গিয়া, কবি অনাদি অনন্ত-প্রসার, সুগভীর, তরঙ্গোচ্ছ্বসিত ভাব মহাসিন্ধুর অবতারণা করিয়াছেন :—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ।
তবু হিয়ে জুড়ান না গেলি॥"

এর চেয়ে সুগভীর ভাব বাঙ্গলা কবিতা পড়িয়া কে কোথায় পাইয়াছেন? ইহার মধ্যে যে সুগভীরতম অতৃপ্তির ভাব লুক্কায়িত, যে প্রেম পিপাসার অনন্তময়ী সমুজ্জ্বল ছায়া প্রতিভাত তাহার পরিমাণ করিতে, তাহার মাহাত্ম্য অবধারণে কে সমর্থ? কয়টী হৃদয় আকাশ অপেক্ষা এই অসীম ভাব মাধুর্য্য অনুভব করিয়া শেষ করিতে পারে? ইহার মধ্যে কি স্বপ্ন এবং জাগ্রত ভাবের, সুধা এবং গরলের, সুখ এবং যাতনার, পিপাসা এবং তৃপ্তির প্রকৃত সমাবেশ হয় নাই?

আবার বিদ্যাপতির কবিতার প্রতিপদ যেন তাড়িতময়। এক একটী পংক্তি যেন তাড়িত-প্রবাহস্বরূপ। পাঠ মাত্র পাঠকের হৃদয় আমূল বিলোড়িত করিয়া দেয়। তাঁহার একটী প্রাণকে যেন সমগ্র মানব-প্রাণের সহিত,কোন অলক্ষিত সূত্রে বান্ধিয়া, আলোড়িত করিয়া তোলে।

"বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥"

এই সুখ দুঃখ পূর্ণ বৈষম্যময় সংসারে, এই বিপত্তরঙ্গসঙ্কুল ভব সাগরে, এই ঘাত প্রতিঘাত-বন্ধুর জনসমাজে, প্রতি ব্যক্তিকেই কি জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে ঘুরিতে ঘুরিতে বিদ্যাপতির সহিত সম হৃদয় হইয়া, এই ভাবের উষ্ণতাময় স্পর্শ, অন্তরের অন্তরে লুকাইয়া অনুভব করিতে হয় না? কবি কি বস্তুতঃই বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করিয়া এই স্থানে সমগ্র মনুষ্য হৃদয়ের উপর আপনার হৃদয়ের আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন নাই? আর না। বিদ্যাপতিকে নিয়া অনেক কথা বলিলাম, অনেক সময় কাটাইলাম।

কবি এবং কবিতার সমালোচনা করিতে গিয়া বিদ্যাপতিকে আনিলাম কেন? আনিলাম—পাঠক মাত্রেরই বোধগম্য কবি-হৃদয় এবং কবিতার একখানি সাধারণ ছবি দেখাইতে। বিশুদ্ধ বাঙ্গলা ভাষায় কি কবি এবং কবিতা নাই? কবিকঙ্কন, কবিরঞ্জন, ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ কি কবি নন? সংক্ষেপে এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিব—হাঁ। ইহারা সকলেই কবি। "ভারতসঙ্গীত" এবং "রাণী ভবানীর উক্তিতে" যে অনন্তকবিতাপ্রবাহ ঢালিয়া, কবিদ্বয় সেই হৃদয়-বিলোড়ী তাড়িত স্রোতের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসনীয়। কিন্তু অতি অল্প কথায় এত সুগভীরতম ভাব প্রকাশ করিতে বিদ্যাপতির ন্যায় সুনিপুণ কারিকর কয়টী আছে? পাঠক এ কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করুন্। আমাদের সংস্কারানুসারে কাজ করিলাম। এখন সাধারণ ভাবে প্রস্তাবের অবতারণা করিব।

কবি কে? বিশেষরূপে এ বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন অতি অল্প। কবিতা কাহাকে বলে, এ কথার বিচারের সঙ্গে সঙ্গে কবির চরিত্র আপনিই চিত্রিত হইয়া পড়ে। এই জন্য এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে কবি এবং কবিতা পৃথকরূপে সমালোচিত হইবে না।

কবিতা কি? অনেকে মনে করেন, ছন্দ বন্ধ বিশিষ্ট রচনা মাত্রই কবিতা। এই ছন্দ কূপ-নিবদ্ধ প্রাণ ভেকের ন্যায় সেই সঙ্কীর্ণ কূপান্ধকারেই চির দিন নিমগ্ন থাক্। অনন্ত গগনবিহারী মুক্তপক্ষ, মুক্তকণ্ঠ, প্রাণবিহঙ্গের অনন্তধারাবাহী, সঙ্গীত-সুধা-রস-স্বরূপ কবিতা, কোন কূপের বস্তু নয়, পৃথিবীর সীমা বদ্ধ মহাসাগরেও তাহা ধরে না। কবিতা সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং মুক্তাবস্থাপন্ন, অনন্ত প্রসারিত হৃদয়ের অনন্ত ভাবোচ্ছ্বাসের অনর্গল প্রবাহ মাত্র। ইহা বাক্যের অতীত, চিন্তার অতীত। অনেকে কথাটী শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইবেন। কি, বাক্য যে কবিতার প্রকাশক, চিন্তা যে কবিতার অস্থি, তাহা বাক্য এবং চিন্তার অতীত? —বাক্য কি কবিতার প্রকাশক? বাক্য অনেক সময় কবিতা-জ্যোতিকে মেঘাচ্ছন্ন করে, এবং সর্ব্বদাই কবিতার প্রতিরোধক। বাক্য জড়ের জন্য, সীমাবদ্ধ জড় জগতেরই প্রকাশক। অন্তর্জ্জগতের সীমাশূন্য বস্তু কবিতাকে সে কিরূপে প্রকাশ করিবে? এক গাছি লৌহতার যতক্ষণ তাড়িত হইতে বিযুক্ত থাকে, ততক্ষণ তাহা স্পর্শ করিলে কোনই বিশেষ শক্তির আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাতে তাড়িত সঞ্চালিত হইলে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশ করিতে থাকে। এক গাছি রজ্জু তাড়িত যন্ত্রে সংযোজিত হইলে, স্পর্শ মাত্র হস্ত কম্পিত হয়, সমস্ত শরীর মধ্যে এক রূপ আলোড়ন পরিলক্ষিত হইতে থাকে। সেইরূপ জড়তাময় বাক্যের মধ্যেও কোন বিশেষ শক্তি নাই। কিন্তু যখন তাহাতে কবিহৃদয় নিঃসৃত তাড়িত প্রবাহ সঞ্চারিত হয়, তখনই তাহার ক্ষমতা অসীম, তখনই তাহা অত্যদ্ভুত। তখন তাহা সঞ্জীবনী মন্ত্র রূপে মৃত শবদেহে জ্বলন্ত চেতনার সঞ্চার করে, মৃত প্রাণে জ্বলন্ত অগ্নি প্রবাহ ঢালিয়া দেয়। কখনও তাহা মধুর জ্যোৎস্নাপূর্ণ শরৎ যামিনীর নিস্তব্ধ ক্রোড়ে, মধুময় স্বপ্ন করে, সুপ-সুধাজড়িত বাসরীর সঙ্গীত শ্রবণ করায়, কখনও বা শোক ও বিষাদের অনন্ত সাগর রচনা করিয়া, মানবের প্রাণকে তাহাতে ডুবাইয়া দেয়। কিন্তু তাড়িতপ্রবিষ্ট রজ্জু যে প্রকার অনন্ত আকাশব্যাপী, বিশ্বের মজ্জাগত, সেই অনন্ত তাড়িত মহা সমুদ্রের সামান্য ঈঙ্গিত জ্ঞাপন ভিন্ন একটী কণিকাও প্রকাশ করিতে অসমর্থ, কবির বাক্যও কবিতা সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক কাজের জিনিষ নয়। কবিত্বপূর্ণ বাক্য কবিতার ঈঙ্গিত ভিন্ন আমাদিগকে আর কিছুই দিতে পারে না। প্রভাতের প্রাক্কালীন অস্ফুট আলোক যেমন আমাদিগকে প্রত্যহই মধ্যাহ্ন সূর্য্যের অনন্ত গগনব্যাপী জ্যোতিরাশির সমাচার ঘোষণা করে, কবিবাক্যও কবি-হৃদয়ের সেই অনন্ত উচ্ছ্বসিত ভাবপুঞ্জের সম্বাদমাত্র জ্ঞাপন করে। বরং জগতের ভাষা অসম্পূর্ণ এবং সীমাবদ্ধ বলিয়া এ আভাসকেও ভাল রূপে ফুটিতে দেয় না। এই জন্যই বলিয়াছি, ভাষা বা বাক্য সর্ব্বদাই কবিতার প্রতিরোধক। আবার কবির ভাবোদ্বেলিত হৃদয় যখন ভাষা রচনা করে না, কবি পৃথিবীর অভিধান, পৃথিবীর ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার শাস্ত্র খুলিয়া মুখের রচিত বাক্যে কবিতা

লিখিতে বসেন, তখন কি হয়? একবার বলিয়াছি—আবার বলি—তখন গভীর ঘন ঘটায় নির্ম্মল কবিতা জ্যোতি ঢাকিয়া যায়। এই জন্য এক জন রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিয়াও কবি নন, আর অপর ব্যক্তি দুইটি চারিটি কথা লিখিয়াই কবি। সুতরাং কবিতার রাজ্যে বাক্যের আদর নাই, বাক্যের জীবনের আদর। এই জীবন্ত বাক্যও কবিতার প্রকাশক নয়, কেবল মাত্র আভাস প্রদান করে। কবিতার জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া নিয়াই ইহার জন্ম।

"লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ান না গেলি॥"

বিদ্যাপতির বিরহকাতরা নায়িকার প্রাণে যে অনন্ত উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হইয়াছিল, উল্লিখিত কবিত্বপূর্ণ বাক্যাবলী কি তাহার সামান্য ঈঙ্গিত ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাপন করিতে পারিতেছে? মহাকবি কালিদাসের অজ বিলাপ হইতে কয়েকটি পংক্তিও উদ্ধৃত করিতেছি। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক তদ্দৃষ্টে এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন।

"বিললাপ স বাষ্পগদ্গদং সহজামপ্যপহায় ধীরতাং।
অভিতপ্তময়োঽপি মার্দ্দবং ভজতে কৈব কথা শরীরিষু।
কুসুমান্যপি গাত্রসঙ্গমাৎ প্রভবন্ত্যায়ুরপোহিতুং যদি।
ন ভবিষ্যতি হন্ত সাধনং কিমিবান্যৎপ্রহরিষ্যতো বিধেঃ।
অথবা মৃদুবস্তু হিংসিতুং মৃদুনৈবারভতে প্রজান্তকঃ।
হিমসেকবিপত্তিরত্র মে নলিনী পূর্ব্বনিদর্শনং মতা॥
স্রগিয়ং যদি জীবিতাপহা হৃদয়ে কিং নিহিতা ন হন্তি মাং।
বিষমপ্যমৃতং কচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া॥ ইত্যাদি॥"

এখানেও অজের হৃদয়নিহিত শতমুখী উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে না পারিয়া বাক্য পরাস্ত।

প্রকৃত কবিতা বাক্যের ন্যায় চিন্তাকেও অতিক্রমন করে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাঁহার চিন্তা হৃদয় দ্বারা চালিত না হইয়া, হৃদয় চিন্তা দ্বারা পরিচলিত, তিনি কষ্ট কবি। তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া বোধ হয়, যেন মস্তিষ্ক নিঙড়াইয়া, বহু কষ্টে তিনি কবিত্ব রসের অবতারণ জন্য চেষ্টা করিতে গিয়াও সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছেন। উদার কবিতা, অমৃত রসের ন্যায় হৃদয় ভাসাইয়া বহিতে থাকে, চিন্তা তাহার তরঙ্গ বা লহরীস্বরূপ। এস্থলে কবির হৃদয় দ্বারা চিন্তা পরিচালিত। কবির হৃদয় নির্ম্মল দর্পণ অথবা বিমল সুধারসপূর্ণ সুগভীর স্বচ্ছ সরোবর। বিশ্ব কবির কবিতালহরীরূপ প্রকৃতির ছায়া যখন তাহাতে পতিত হইয়া প্রতিফলিত হইতে থাকে, তখন অদ্ভুত দৈবশক্তি প্রভাবে তথা হইতে মহাসমুদ্র গর্জ্জিয়া উঠে। উহার প্রতি উচ্ছ্বাসে চিন্তাও গভীর জ্ঞান তরঙ্গ বহিয়া ছুটিতে থাকে। এজন্য কবিতা অন্ধ হইয়াও জগতের চক্ষু, নিজে অন্ধকার হইয়াও বিশ্বকে মধ্যাহ্ন আলোকে দেদীপ্যমান করে। যেখানে চিন্তা পরিচালক, সেখানেই বাক্য মূখের এবং জীবনহীন। এই জন্য দার্শনিক জগতে অনেকেই নীরস রুক্ষ বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিষয়টীকে প্রস্তরবৎ কঠিন ও দুষ্পাঠ্য করিয়া তোলেন। চিন্তাবীর জনষ্টুয়ার্ট মিল আপনার হৃদয়ের যাতনাকর শুষ্কতা দূর করিবার আশাতে কবিতাময় গ্রন্থ পাঠ করিতেন। বস্তুতঃই শুষ্ক তর্ক ও চিন্তার উষ্ণ বাতাসে

হৃদয় মরুতুল্য ভীষণ হইয়া উঠে। এই ভীষণ হৃদয়ের বাক্যও, কাজেই, দুষ্পাঠ্য এবং নীরস মুখাগ্রজাত বাক্যে পরিণত হয়। এই জন্যই শাব্দিক কবি(৩) এবং কষ্ট-কবি একই পদার্থ। এখন হইতে এই উভয়-বিধ দোষাশ্রিত কবিকেই "কষ্টকবি" এই একমাত্র নামে অভিহিত করিব।

কষ্ট কবির প্রধান এবং প্রথম দোষ, তিনি পরপদাঙ্কানুকারী। অন্যের চিন্তার অনুকরণ তাঁহার প্রাণের সম্বল। চিন্তা-মাত্রেরই ভিত্তি পূর্ব্ববর্ত্তী চিন্তারাশির ফল চিন্তা যে কবির মূল ধন, এ জগতে তাঁহার এক বা বহু সংখ্যক ধনীও থাকে। এইজন্যই দেখি, কষ্টকবিদের মধ্যে কেহ কালিদাসের, কেহ ভবভূতির, কেহ সেক্সপিয়রের, কেহ মিল্টনের, কেহ বা অন্য কোন কবির গোঁড়া। তাঁহাদের প্রতি কথাটীতে, প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতি হাইতোলাটীতে সেই সকল মহাজনদের কথা, চিন্তা, হাব ভাব নিরা-পত্তিতে প্রকাশ পাইতে থাকে। মূল কথা, এই কবিতাব্যবসায়ীদের অন্ততঃ দুই এক জন প্রকাশ্য ধনী না হইলে, পদে পদে তাহা-দের কারবার বন্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটে। প্রকৃত কবি কাহারও পদ-চিহ্নিত পথে চলেন না। প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়মে, অজ্ঞাত-সারে, শত শত ব্যক্তির যত্ন-সঞ্চিত ধন, তাঁহার মূল ধনে মিশিতে পারে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করেন, সে ধন তাঁহার নিজস্ব। তিনি অন্যের নিকটে ধার নিতে বা ভিক্ষা করিতে জানেন না। এ জগতে গুরু বা শিক্ষক হইতে পারে, এ কথাও যেন তিনি বুঝেন না। তিনি বালক বা উন্মত্তের ন্যায় আপনি হাসেন, আপনি কাঁদেন, আপনার ভাবেই ভোর। কানন-গর্ভস্থ পুষ্পের ন্যায় আপনার জন্য আপনি ফোটেন, আপনার সৌরভে আপনি মত্ত, আপনার রূপে আপনি মোহিত। তাঁহার প্রাণে যখন জোয়ার আসে, ভাবের বন্যা উচ্ছ্বসিত হয়, তখনই তিনি মজিয়া যান, যখন দুই পাড় ছাপিয়া উঠে, তখনই কবিতাস্রোত ঢালিয়া দেন। সেই তরঙ্গে জগৎ ভাসিয়া যায়, যুগ যুগান্ত শেষ হয়, প্রলয় মহা প্রলয় চলিয়া যায়, তথাপি সেই ঢেউ মিশিয়া যায় না। এই জন্যই বাল্মীকি এবং হোমর, কালিদাস এবং সেক্সপীয়রের কীর্ত্তি জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি নামে বিখ্যাত। বস্তুতঃ প্রকৃত কবিতা কিছুরই সাপেক্ষ নয়, প্রকৃত কবি সম্পূর্ণ নির্মুক্ত এবং স্বাধীন; এই জন্য যে জাতি অধীন, যে জাতির হৃদয় পরের ছাঁচে ঢালা, যে জাতি অনুকরণপ্রিয়, সে জাতিতে প্রকৃত কবি জন্ম গ্রহণ করেন না। এই কারণে বাঙ্গালী, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৃদয়বান্ হই-য়াও হৃদয় কল্পতরুর অমৃতময় ফলস্বরূপ প্রকৃত কবিত্বে বঞ্চিত। স্ত্রীজাতির হৃদয়রাজ্যে অদ্বিতীয় প্রভুত্ব, অথচ রমণীকুলে গার্গীর ন্যায় দার্শনিক, লীলাবতীর ন্যায় গণিতবিদ্ জন্মিয়াছেন, কিন্তু সৃষ্টি হইতে অদ্যাবধি কোন মহাকবি জন্মেন নাই। কারণ অবলা বামাকুল পুরুষের অত্যাচারে চিরবন্দিনী এবং পরাধীনা।

শাব্দিক কবি সুন্দর সুন্দর শব্দে কুসুম-হার গাঁথেন। "ছুটিল" "ফুটিল" "টুটিল" এই সকল সুকোমল শব্দ নিয়াই তিনি ব্যস্ত। কখনও জ্যোৎস্নায় ভাসিতে ভাসিতে চাঁদের কিরণ ভাঙ্গিয়া খান, কখনও সাঁঝের আকাশে সিন্দুরে মেঘে চ'ড়ে ছুটিয়া বেড়ান, স্বপ্নে বাঁশীর

(৩) প্রভাত চিন্তার "নীরব কবি" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

গান শোনেন, আর পল্লীর সঙ্গে ঘুমিয়া ঘুমিয়া খেলা করেন। শরতের চাঁদ, বসন্তের ফুল, পাপিয়া, কোকিল, মলয় বাতাস, বর্ষার নবীন মেঘ, বিজলী আর রামধনু তাঁহার কবিতার উপাদান। তাঁহার নাচনীছন্দের তরঙ্গ তালে তালে উঠে, তালে তালে পড়ে, কিন্তু মনুষ্যের প্রাণের উপর দিয়া পদ্মপত্রের জলের মত আস্তে সরিয়া যায়। এইরূপ কবিতা মনুষ্য-মনে কোন স্থায়ী ভাবের উদ্রেক করিতে পারে না। শ্রীহর্ষের "নৈষধ চরিত" জয়-দেবের "গীতগোবিন্দ" এই জাতীয় কবিতা গ্রন্থ। ছোট ছোট নরম নরম মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি নানা সুললিত ছন্দে বাঁধিয়া, যূঁই ও বেল ফুলের মালা গাঁথিলেই যদি কবি হওয়া যায়, তবে সেক্‌সপীয়রের অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র ইংরেজ কবির এবং কালিদাস অপেক্ষা অনেক বাঙ্গালী কবির যশ এজগতে জয়লাভ করিতে পারিত। কিন্তু হৃদয়ের ভাষা আপনা হইতেই সহজ এবং সাধারণের বোধগম্য হয়। প্রকৃত কবি ভাষার অনু-সন্ধান করেন না, কিন্তু ভাষা আপনিই তাঁহার কবিতার অনুসরণ করে। সৌন্দর্য্য, বৈচত্র্য, রস এবং ছন্দ প্রকৃত কবিতার সংস্পর্শে জীবন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই সকল তাঁহার জীবনী শক্তির মূল নয়। সে জীবনীশক্তির প্রাণ, কবিহৃদয় যে জলন্ত ভাবোচ্ছাসে অনুপ্রাণিত সেই স্বর্গীয় সুধা স্বরূপ মহা পদার্থ। নির্ম্মল অরুণ জ্যোতি স্পর্শে প্রভাতিক কাননে মুকুল গুলি যেমন ফুটিয়া উঠে, এই বৈদ্যুতিক কিরণ সংযোগে, কি ভাষা, কি ছন্দ, কি সৌন্দর্য্য, রস, বৈচিত্র্য সকলই আপনি ফুটিয়া উঠে এবং যে পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারও প্রাণে ঐ সকল ফুটাইয়া দেয়। প্রকৃত কবির কিছুরই অধীন নয়। গদ্য, পদ্য, মুখের কথা, হাব ভাব, যাহাতে ইহার সংযোগ হয়, তাহারই মধ্যে এই মহাশক্তির তাড়িত স্পর্শ অনুভূত হইতে থাকে। অনেক নীরব চরিত্র, মানবপ্রাণে যেরূপ মহা প্রলয় উপস্থিত করে, তাহাতে সে সকলকে জলন্ত কবিতা না বলিয়া পারা যায় না। এই জন্য জগতের সাধু ভক্ত মহাজনই প্রকৃত মহা কবি নামে বাচ্য। বুদ্ধ, চৈতন্য ও খ্রীষ্টের এক একটী বাক্যের কত মূল্য? তাঁহাদের দেদীপ্যমান জীবনেরই বা কত শক্তি! কত যুগ গিয়াছে, কত যুগ যাবে, তথাপি সে কবিতার গর্ভে কত ভাব, কত অর্থ লুক্কায়িত তাহা কেহই বুঝিবে না। অনন্ত সংখ্যক সেক্‌সপিয়র, অনন্ত সংখ্যক কালিদাসকে চূর্ণ করিয়া, একটী মূর্ত্তি গড়াইলেও তাঁহাদের একটী ক্ষুদ্র পদাঙ্গুলের সহিত তুলনার যোগ্য হইতে পারে না। সমস্ত জগতের সহিত একটী বালুকণার তুলনা সম্ভবপর কিন্তু এই সকল সামান্য কবির সহিত সেই সকল দেব কবির তুলনা হইতে পারে না। পাঠক! বিদ্যাপতির যত্ন-সঞ্চিত, প্রবন্ধের শির্ষোদ্ধৃত, সেই পার্থিব মলিনতা জড়িত ভস্মমুষ্টি বিস্মৃত হইয়া এক বার এই দেবদুর্ল্লভ মহারত্নের কথা ভাবুন। বুঝিবেন,—কবিতা কি? কবিতা মুকের সঙ্গীত, কবিতা স্বপ্নের দৃশ্য, কবিতা বাক্য এবং চিন্তার অতীত। কবিতা স্বর্গের অমৃত কবিতা দেবভোগ্য। কবিতা সঞ্জীবনী মন্ত্র, কবিতা পরিত্রাণের সম্বাদ। কবিতা প্রেম এবং ভক্তির মহাস্রোত। এই মনোমোহন আনন্দের অনাদি অনন্ত ভাণ্ডার, সৌন্দর্য্যময় বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, যে মহাকবির কবিতাসিন্ধুর বুদ্ বুদ মাত্র, এখন আমরা সেই নির্ম্মল কবিতা এবং আদি কবি মহাকবিকে, স্মরণ করি। কবিতার চরম ফল এই, কবির জীবনের উদ্দেশ্য ইহাই।

কলিকাতা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে।

অদ্য মহানগরী কলিকাতার কতকগুলি প্রাচীন কথা পাঠকদিগকে উপহার দিব। যাহা বলিব তাহা হয় প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি, না হয় কোন নব্য বা প্রাচীন গ্রন্থে পড়িয়াছি, নিজে তাহার সত্যতা কখন পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, সুতরাং কিছু কিছু ভুল হইবার সম্ভাবনা। কেহ সে ভুল সংশোধন করিয়া দিলে, নিতান্ত বাধিত হইব। আমার এই প্রবন্ধ লিখিবার আর এক উদ্দেশ্য এই যে, দেখা দেখি আরও পাঁচ জনে যিনি যাহা জানেন লিখিবেন এবং ক্রমে কলিকাতার অনেক পুরাতন খপর বাহির হইয়া পড়িবে।

এই যে কলিকাতা নামক স্থান এক্ষণে নানা অট্টালিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছ, "সিটি অফ পেলেসেস" নাম দিলেও যথাযথ বর্ণনা হয় না, ভাব দেখি দুই শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৬৮৩ সালে ইহার কিরূপ অবস্থা ছিল। বাগবাজার হইতে খিদিরপুর পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূভাগে তিনটী ছোট ছোট গ্রাম ছিল। যেখানে এইক্ষণে ফোর্ট উইলিয়ম বিরাজমান, সেখানে গোবিন্দপুর, লালদিঘি ও গঙ্গার মাঝখানে কলিকাতা, হাটখোলার উত্তর সমস্ত সুতানুটী। কলিকাতা বলিলে যেমন ঐ ক্ষুদ্র গ্রামটী বুঝাইত, তেমনি একটী বৃহৎ পরগণাও বুঝাইত। সুতানুটি বলিলে একটী তালুকও বুঝাইত। একটী রাস্তা দিয়া এই তিনটী গ্রামে যাওয়া যাইত। সেইটী এখন চিৎপুর রোড। প্রতি গ্রামে দুই [illegible] এক ঘর ভদ্র লোক, কতক জেলিয়া, ঘর কত শোণার বেনে মাত্র বাস করিত। চিৎপুর রোডের অল্প দূরেই জলা জঙ্গল ছিল, এমন কি সময়ে সময়ে বাঘেরও দৌরাত্ম্য হইত। সেইরূপ গ্রাম এক্ষণে গঙ্গার ধারে প্রায়ই দেখা যায় না। কোঠা বাড়ী এক একটা ছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু দোতালা একেবারেই ছিল না। কারণ তখন নবাবের হুকুম ব্যতিরেকে কেহই দোতালা বাড়ী করিতে পারিত না, এবং নবাবের হুকুম আনাইতে পারে এইরূপ লোক এ তিন গ্রামে না থাকাই সম্ভব। ইহার মধ্যে আবার শুনিয়াছি, গোবিন্দপুর নূতন পত্তন। আন্দুলের দত্ত চৌধুরী বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্ত নামক এক ব্যক্তি ঐ গ্রাম পত্তন করেন এবং এই হইতেই হাটখোলার দত্তদিগের উৎপত্তি হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হাট্‌খোলার দত্তেরা হাট্‌খোলায় আসিয়াছেন কি না সন্দেহ। সুতানুটীতে অনেক দিন হইতে একটী হাট ছিল, কিন্তু সে হাট কাহা কর্ত্তৃক স্থাপিত, জানিবার কোন উপায় নাই। কলিকাতার নিকটে কালীঘাট বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ পীঠ স্থান ছিল, এবং চিৎপুরের কালীর নিকট নরবলী হইত বলিয়া বহুকাল প্রসিদ্ধ ছিল। শুনিয়াছি, ইংরাজেরা যখন প্রথম মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আইসেন, তখন তাঁহারা হাট্‌খোলার ঘাটে জাহাজ লাগাইয়া এক জন ধোবাসিয়া চাহিয়া পাঠান। হাটের লোকে ধোবাসিয়ার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ঐ হাটখোলার বসাকদিগের নিকট আসিয়া

উপস্থিত হন। বসাকেরা একজন ধোবা পাঠাইয়া দেন। তদবধি ধোবারা অনেক দিন ইংরাজদের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। সে কালে কান্তধোবা বলিয়া একজন ইংরাজের অনুগ্রহে বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বের কথা আমরা যতই কেন বলি না, সবই একটু ঘোর ঘোর বোধ হইবে, পরিষ্কার হইবে না। আমাদের বোধ হয়, বাঙ্গালায় ইংরাজ বাণিজ্যের সূত্রপাত হইতেই সুতানুটীতে ইংরাজদিগের কিছু না কিছু কারবার ছিল, কারণ নিজ হুগলীতে যখন ইংরাজদের খুব কারবার চলে, তখনও সুতানুটীর উপর তাঁহাদের বিলক্ষণ টান ছিল দেখা যায়। বোধ হয় চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের যেমন বরাহনগরে ছোট খাট একটী কুঠী ছিল, সুতানুটীতেও ইংরাজদের সেইরূপ অল্প বিস্তর কিছু কারবার ছিল। যখন মোগলের সহিত যুদ্ধে ইংরাজকে হুগলীর ব্যবসা ফেলিয়া পালায়ন করিতে হয়, তখন তাঁহারা দিন কতক চানকে ও দিন কতক সুতানুটীতে ছিলেন। যাহা হউক ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে তাঁহারা কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর এই কয়েক খানি গ্রামের জমীদারি ক্রয় করিতে অনুমতি পান। এবং ঐ সময়ে তাঁহারা লালদিঘি ও গঙ্গার মধ্যে পুরাণ কেল্লাটী নির্ম্মাণ করেন এবং তদবধি কলিকাতায় তাঁহাদের ভরাভর হয়। তদবধি চার্ণক সাহেব কলিকাতার সংস্থাপনকর্ত্তা এবং তাঁহার সময় হইতেই ইংরাজদের চাণকের বাগান ও আলীপুরের বেলভেডিয়ার উৎপত্তি। ভাব চার্ণক সাহেবকে এদেশীয় লোকে অত্যন্ত ভালবাসিত, তিনি এদেশীয় একটী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছিলেন। কলিকাতার একটী প্রসিদ্ধ গোরস্থানে তাঁহার গোর অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়। ১৬৯৮ সাল হইতে ১৭৫৭ পর্য্যন্ত কলিকাতার প্রথম যুগ বলিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা একটী সামান্য গ্রাম হইতে একটী নগরের আকার ধারণ করে। ফরাসীদের হাতে যেমন ফরাসডাঙ্গা, ওলন্দাজদের হাতে যেমন চুঁচুড়া, দিনামারদের হাতে যেমন শ্রীরামপুর একটী ছোট খাট সহর, ইংরাজদের হাতেও কলিকাতা তেমনি ছোট খাট সহর হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত চারিটী সহরই এই যুগের মধ্যে উৎপত্তি, তন্মধ্যে ফরাসডাঙ্গাই কিছু বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, কারণ ফরাসী গবর্ণর ডিউপ্লের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি ইউরোপ হইতে এ যুগের মধ্যে কেহ আর আইসেন নাই।

এই যুগে কলিকাতায় বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী লোক আসিয়া বাস করে এবং বহু সংখ্যক অট্টালিকা নির্ম্মিত ও বাজার সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে চিৎপুর রোডের পশ্চিমে বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বাস হয়, এবং পূর্ব্বে বড় বড় বাগান প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। জলা ও জঙ্গল কাটিয়া বাগান প্রস্তুত করা বড় সহজ ছিল না, প্রায়ই জলার মধ্যস্থলে পুষ্করিণী কাটিয়া সেই মাটী চারিদিকে ছড়াইয়া বাগানের জন্য জমী বাহির করিতে হইত। যে কেহ ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে দিয়া যাতায়াত করেন, তিনি দেখিতে পাইবেন যে, এখনও উক্ত রেলওয়ের উভয় পার্শ্বে এই উপায়ে জমী বাহির করা হইতেছে; কিন্তু এখন হয় বেলগাছিয়া অঞ্চলে, পূর্ব্বে হইত চিৎপুর রোডের নিকটে। এই সময়ের দুইটী বাগানের কিছু ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে, একটীর নাম হালসী বাগান ও অপরটীর নাম উমীচাঁদের বাগান। হালসী-

বাগান গোবিন্দরাম মিত্রের বাগান, উহা ইংরাজ জমীদারির বাহিরে, কিন্তু গোবিন্দরাম মিত্রই বহুকাল অবধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্লাক জমীদার ছিলেন। ১৭৪২ খৃঃ অব্দে যখন মহারাষ্ট্রখাত খনন হয়, তখন গোবিন্দরাম মিত্রের অনুরোধে ইংরাজেরা হাল্সী বাগান খাতভুক্ত করিয়া লন। মহারাষ্ট্রখাত এখনও কলিকাতার মিউনিসিপালিটির সীমা। অনেকে মনে করেন, বাগ্‌বাজারের খালই বুঝি মহারাষ্ট্রখাত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বাগ্‌বাজারের খালের একটু দক্ষিণে একটী খানা আছে, সেই খানা ক্রমে ক্রমে আসিয়া সারকিউলার রোডের পূর্ব্ব দিকের খানার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। ঐ খানা বরাবর বাগ্‌বাজারের খালের মুখ হইতে সিয়ালদহ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র খাত নামে অভিহিত ছিল। মহারাষ্ট্রখাত কলিকাতার চতুর্দ্দিকে কখনই ছিল না। মহারাষ্ট্রখাত শেষ হইবার পরেই বহুবাজারের রাস্তা ঐ রাস্তা তৎকালেও বিদ্যমান ছিল। উহা দ্বারা পূর্ব্ব দিক হইতে আসিয়া একেবারে পুরাণ কেল্লায় উঠা যাইত। বহুবাজারের রাস্তার পর দক্ষিণ দিকে আরও একটা খাল ছিল, কিন্তু এখনও তাহার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। অনেকে বলেন, তাহার কিয়দংশ বুঁজাইয়া ত্রিকরো নামক রাস্তা হইয়াছে। তৎকালেও চৌরঙ্গি নামক স্থান ছিল এবং সেই স্থানেই সাহেবেরা বাস করিতেন। কিন্তু সে চৌরঙ্গির সহিত এখনকার চৌরঙ্গির তুলনা হয় না। তখনকার চৌরঙ্গিতেও জলা ও জঙ্গল ছিল। তখন মহারাষ্ট্র খাতের মধ্যে অনেক জায়গায় চাষবাস হইত। এমন কি, ১৭৭৮ সালে যখন ওয়ারন্ হেষ্টিংস মহারাজা নবকৃষ্ণকে সুতানুটীর তালুকদারী প্রদান করেন, তখনও ঐ তালুকের মধ্যে অনেক জায়গায় চাষ বাস হইত, কারণ ঐ দলিলে চাষবাসের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

ইংরাজেরা ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে তিন গ্রামের জমীদারি পাইয়া আপনাদিগের কাউন্সেলের এক জনকে জমীদার করিতেন, তিনি দুই হাজার টাকা করিয়া মাহিয়ানা পাইতেন। চারি পাঁচ মাস অন্তর জমীদার বদল হইত। অর্থাৎ কাউন্সেলের সকল মেম্বরেরাই কিছু দিন করিয়া দুই হাজার টাকা মাহিয়ানা মারিতেন। তিনি কাজ কর্ম্ম কিছুই করিতেন না, কখনও দুই একটা সহী করিতেন। তাঁহার অধীনে একজন ব্লাক জমীদার থাকিতেন, তাঁহারই হাতে জমীদারির ভার থাকিত। ব্লাক জমীদারের মাহিয়ানা ত্রিশ টাকা ছিল। কুমারটোলির মিত্রদিগের আদিপুরুষ গোবিন্দ রাম মিত্র ১৭২০ খৃঃ অব্দে ব্লাক জমীদার পদে নিযুক্ত হন, তাঁহার পূর্ব্বে ঐ পদে কে ছিলেন তাহা জানা যায় না। কিছু দিন পরে গোবিন্দরাম মিত্রের বেতন ত্রিশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা হয়, কারণ তিনি কোম্পানির নিকট আর্জী করেন যে, ত্রিশ টাকায় ব্লাক জমীদার নামক উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সম্ভ্রম রক্ষা করা হয় না। গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির চিৎপুর রোডের ধারে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গোবিন্দরাম মিত্রের এক জন কর্ম্মচারী বনমালী সরকার তৎকালের এক জন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। হাটখোলার দত্ত মহাশয়েরা ধনে, মানে ও কুলমর্য্যাদায় কলিকাতার সর্ব্ব প্রধান ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সরকারি কোন কাজে কখন লিপ্ত হয়েন নাই। নকুড় ধর নামক এক ব্যক্তি এই সময়ে অসাধারণ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি জাতিতে সুবর্ণ বণিক্। ইংরাজ

মহলে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। ইংরাজেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্যই করিতেন না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন চাকরি পাইতে হইলে লোকে নকুড় ধরের নিকট উমেদারি করিত। এমন কি ১৭৪৮।৪৯ সালের প্রসিদ্ধ নবকৃষ্ণও নকুড় ধরের নিকট উমেদারি করিতেন এবং ১৭৫০ সালে নকুড় ধর তাঁহাকে হেষ্টিংস সাহেবের মুন্সি করিয়া দেন। নকুড় ধরের প্রকাণ্ড কারবার ছিল। নকুড়ধর নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র রাজা সুখময়। সুখময়ের বংশধরেরা অদ্যাপি নকুড়ধরের অতুল ঐশ্বর্য্য-উপভোগ করিতেছে। বড় বাজারের মল্লিকেরাও তৎকালে বিলক্ষণ ধনী ছিলেন। ইহাদের বাণিজ্য ও ব্যবসায় বিলক্ষণ বিস্তৃত ছিল। উল্লিখিত কয়টি পরিবার ভিন্ন কলিকাতায় অন্য কোন প্রসিদ্ধ পরিবারের উল্লেখ এযুগে পাওয়া যায় না। পাথুরিয়া ঘাটার প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের আদি অন্বেষণ করিয়া এযুগে কিছু পাওয়া যায় না। যে দুই একজন ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়, তাঁহারা গোবিন্দ রাম মিত্রের অধীনে বাজার ইজারা লইতেন, অর্থাৎ গোবিন্দ রাম মিত্র অল্প টাকায় বেনামি করিয়া সমস্ত বাজার গুলি ডাকিয়া লইতেন, এবং পরে বিলক্ষন লাভ করিয়া ঐ গুলি বিলি করিতেন। যে সকল লোককে বিলি করিতেন, তাহাদের মধ্যে দুই একজন ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়। তৎকালে বাজার ইজারা লওয়ায় বিলক্ষণ লাভ ছিল। বাজারে দ্রব্যাদি আসিলে জমীদার চাল, ডাল, লবণ, তৈল, সকল দ্রব্যেরই উপর কর লইতেন। সুতরাং তৎকালে বাজার করায় জমীদারের বিলক্ষণ লাভ ছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইজারদার ও বিলক্ষণ লাভ করিত। কোম্পানী জমীদার হইয়া যে কয়টী বাজার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বন্দোবস্তের ভার গোবিন্দ রাম মিত্রের হাতে ছিল। গোবিন্দ রাম মিত্র তাহা হইতে বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করিত। বর্ত্তমান ঠাকুর পরিবারের স্থাপয়িতা দর্পনারায়ণ ও নীলমণি আগামী যুগের লোক। এই সময়ে কলিকাতায় বহুসংখ্যক অট্টালিকা প্রস্তুত হয়, তাহার মধ্যে ইংরাজদিগের গবর্ণরের বাটী, কৌন্সিলা বাটী, চর্চ্চ, কোর্ট হাউস প্রভৃতিই প্রধান। লালদিঘি কলিকাতার অতি প্রাচীন পুষ্করিণী। ১৭৫৭ খৃঃঅব্দ হইতে কলিকাতার তৃতীয় যুগের উৎপত্তি। এই যুগে প্রথমে রাজা নবকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাব। রাজা নবকৃষ্ণ পলাশী যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে দাদাকে লিখিয়া পাঠান,—দাদা দালান দেও, এইবারেই পূজা করিতে হইবে। তিন মাসের মধ্যে দালান প্রস্তুত হইল। নবকৃষ্ণ মহাসমারোহে পূজা করিলেন, সমস্ত ইংরাজদিগের নিমন্ত্রণ হইল। কলিকাতার, এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষের যুগ পরিবর্ত্তন হইল। এই সালে ইংরাজেরা নূতন কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে গোবিন্দপুর গ্রামটীর সমস্ত লোককে উঠাইয়া দিতে হয়। গোবিন্দপুরের অধিবাসীরা এওয়াজি যে জমী পান, তাহাতে সাঁখারিটোলা, ডিঙ্গেভাঙ্গা, বহুবাজার, মলঙ্গা প্রভৃতি স্থানে লোকের বসবাস হয়। তাঁহারা যখন গোবিন্দপুর হইতে উঠিয়া এই সকল স্থানে বাস করেন, তখনও এখানে বাঘের ভয় বিলক্ষণ ছিল। এই সময়ে মুরশিদাবাদের ও প্রধান প্রধান লোক আসিয়া কলিকাতায় বাড়ী করেন। তাহার মধ্যে দেওয়ান দুর্লভরামের পুত্র রাজা

রাজবল্লভ বাগবাজারে এবং মহারাজা নন্দ কুমার, এখন যেখানে বিডন্ স্কোয়ার হইয়াছে, তাহার সন্নিকটে প্রকাণ্ড বাটী নির্ম্মাণ করেন। মহম্মদ রেজাখাঁ কলিকাতায় আসিলে চিৎপুরে থাকিতেন, কিন্তু কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকটও তাঁহার এক প্রকাণ্ড বাটী ছিল। অতএব পলাশী যুদ্ধের পরই মুরসিদাবাদ অবসন্ন হইতে লাগিল এবং কলিকাতার জাঁক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে কোম্পানীর চাকরি করিয়া কলিকাতার লোকে খুব বড়মানুষ হইতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে নীলমণি ঠাকুর পাথুরিয়া ঘাটার ঘোষেরা ও জোড়াসাঁকোর সিংহেরা প্রধান। এই সময়ে পল্লীগ্রাম হইতে অনেক উদ্যমশীল ব্যক্তি বড় মানুষ হইবার আশায় কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। জাহাজের কাপ্তেন ধরাই ইহাদের প্রধান ব্যবসায় ছিল। কলিকাতায় যে সকল বড় বড় বাটী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মূল অন্বেষণ করিতে গেলে কাপ্তেন ধরা ব্যবসায়ই দেখিতে পাওয়া যাইবে। পল্লীগ্রামের এই সকল লোক নদীর ধারে বহুদূর অগ্রসর হইয়া মুচিখোলা, ফলতা প্রভৃতি স্থানে অপেক্ষা করিত। জাহাজের নিশান দেখিয়া জানিত এ বাঁড়ুজ্যে মহাশয়ের জাহাজ, এ পিতুড়ী মহাশয়ের জাহাজ, ওটা দত্ত মহাশয়ের জাহাজ। নূতন জাহাজ দেখিলেই তাঁহারা তাড়াতাড়ি আক্রমণ করিতেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকার করিয়া লইতেন। এখন যেমন সমস্ত ব্যবসায় ইংরাজদিগের হাতে গিয়াছে, তখন এরূপ হয় নাই। অনেক দেশীয় লোকও এ ব্যবসায়ের লাভের অংশ ভোগ করিত। এই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের লোকও ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আগমন করেন। যখন আমেরিকানেরা প্রথম এদেশে আসেন, তখন তাঁহারা প্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকারকে তাঁহাদের মুরুব্বি করিয়া লন। মার্কিনদেশে ও এদেশে এখনও অনেকে জানেন যে, রামদুলাল সরকারই ভারতবর্ষের সহিত আমেরিকা বাণিজ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা। তৎকালে যে সকল সমৃদ্ধিশালী লোক কলিকাতায় বাস করিতেন, তাঁহাদিগের উদারতা অত্যন্ত অধিক ছিল। নবকৃষ্ণ ও রামদুলালের দানশক্তি চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে। ইংরাজ ইতিহাস লেখকেরা নবকৃষ্ণকে বিলক্ষণ গালি দিয়া থাকেন। বাঙ্গালীরাও নবকৃষ্ণের প্রতি তত শ্রদ্ধাবান নহেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ দেখিলে তাঁহাকে বিলক্ষণ উন্নতমনা বলিয়া বোধ হয়। তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, মাতৃ শ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকা খরচ করেন, কিন্তু তিনি মুসলমানদিগের মস্‌জিদ ও খ্রীষ্টানদের চার্চ্চ নির্ম্মাণেও সাহায্য করেন। পাথুরীয়া গির্জ্জার জমী নবকৃষ্ণের প্রদত্ত। হাতীবাগানের জমীও নবকৃষ্ণের প্রদত্ত। রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট নামক রাস্তাটী সমস্তই নবকৃষ্ণের ব্যয়ে নির্ম্মিত। পূর্ব্বযুগে যেমন নকুড়ধর ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে পরস্পর মিল করাইয়া দিতেন, এ যুগে রাজা নবকৃষ্ণ ঠিক তেমনি ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে কোন অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে নবকৃষ্ণের নিকট উমেদারি করিতে হইত। নবকৃষ্ণ অনেক লোকের চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন। রামবাগানের দত্তেরা নবকৃষ্ণের কেরাণীর বংশ। নবকৃষ্ণের এক পঞ্চরত্ন সভা ছিল, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার প্রধান রত্ন। কলিকাতার প্রাচীনতত্ব বলিতে গিয়া আমরা নবকৃষ্ণের এত কথা বলিলাম, তাহার কারণ

এই যে, নবকৃষ্ণই কলিকাতার এই তৃতীয় যুগের প্রধান ব্যক্তি। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস সাহেব তাঁহাকে সুতানুটী তালুক মৌরুসি দিয়া তাঁহার পদমর্য্যাদা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেন।

সেকালে কলিকাতায় বহু সংখ্যক কেরাণী ছিলেন। তাঁহারা কিছুই ইংরাজী জানিতেন না, ইংরাজী জানিলে তাঁহাদের কেরাণীগিরি করিতে হইত না। কেরাণীরা কেবল কপি করিত। আসলে যদি মাছি মরিয়া থাকিত, নকলেও তাহারা মাছি মারিয়া রাখিত। সেই অবধি মাছি মারা কেরাণী প্রসিদ্ধি জন্মিয়াছে। সেকালের লোকে কিরূপ ইংরাজী লিখিতেন, তাহার এক উদাহরণ দিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

বিশ্বম্ভর মিত্র নামে একব্যক্তি একজন সাহেবের নিকট কর্ম্ম করিত। সাহেব হুগলী গিয়াছেন, সন্ধ্যার সময় ঝড়ে সাহেবের জানালার কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। বিশ্বম্ভর মিত্র লিখিতেছেন ;—

Sir,

Yesterday vesper a great hurricane the valves of the window not fasten great trapidetion and palpitation and then precipetated into the precinct. God grant master long long life and many many post

P. S.

No tranquility since valve broken I have sent carpenter to make re unite.

পাঠকবর্গ এই ইংরাজী দেখিয়া হাসিবেন না। এখনও অনেকে costly লিখিতে costive লিখিয়া থাকেন। তবে সেকালের ইংরাজী দেখিয়া হাসিবার কারণ কি ?

শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

সংস্কৃত ও প্রাকৃত—সংস্কৃত ভাষায় কি কথা বার্ত্তা চলিত ? বৌদ্ধধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ কি কি ? পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তৎ প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন—" ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, অতি দুশ্রব ও দুরুচ্চার্য্য বলিয়া বেদের ভাষা সাধারণের ব্যবহার্য্য হয় নাই। ফলতঃ বেদের সংস্কৃত কঠিন বলিয়া যেরূপ সাধারণের ব্যবহারার্থ পুরাণাদির কোমল সংস্কৃত সৃষ্ট হইয়াছিল, বোধ হয় সেইরূপ উক্ত পুরাণাদির সংস্কৃতও দুরুচ্চার্য্য বোধ হওয়াতে উহা হইতেও কোমলতর প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।" আমরা এই খানে তিনটি ভাষার পরিচয় পাইলাম। বৈদিক ভাষা, কাদম্বরি কিরাতার্জ্জুনীয়ের ভাষা হইতে অনেক ভিন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা এ কথা স্বীকার করি না যে, দশ জন লোক সভা করিয়া পরামর্শ করিয়া কোন দিন কোন একটী নূতন ভাষার সৃষ্টি করিতে পারেন। কি পুরাতন ভাষার বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। বেদের ভাষা দুরুচ্চার্য্য বলিয়া পণ্ডিতগণ পরামর্শ করিয়া সংস্কৃত ভাষার

সৃষ্টি করিলেন. এ কথার কোন অর্থ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ভাষা জীবন্ত, কুম্ভকার মৃত্তিকার মত তাহাকে ইচ্ছামত আকৃতি বিশেষে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। আবার বৈদিক ভাষা কঠোর কি সংস্কৃত ভাষা কোমল আমরা তাহারও বিচার করিতে চাহি না। যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভবভূতি পড়িয়া বেদ অধ্যয়নের চেষ্টা করেন, বৈদিক সময়-প্রচলিত প্রাচীন ভাষা তাঁহাদিগের কঠোর বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু বৈদিক ভষার যাঁহারা চর্চ্চা করিয়াছেন, বেদের প্রাঞ্জল, স্বাভাবিক, অসংযত, তেজস্বী ভাষার মধুরতায় তাঁহারা মোহিত হইয়াছেন। কালিদাস ও ভবভূতির ভাষা তাঁহাদিগের নিকট জীবন শূন্য, তেজ শূন্য, শৃঙ্খলবদ্ধভাবে সমুদয় মনোহারিত্ব হারাইয়াছে। বস্তুতঃ এলোরা গিরিগুহার সৌন্দর্য্য হইতে তাজ মহলের সৌন্দর্য্য বিভিন্ন, কিন্তু কাহার সৌন্দর্য্য অধিক, ভিন্নরুচি লোক ভিন্নরূপ নির্ণয় করিবেন। বৈদিক সূত্র রচনা হইবার সময় ব্যাকরণের সৃষ্টি হয় নাই। আর্য্য মাত্রেই সেই ভাষায় কথা বার্ত্তা চালাইত। ঘৃণিত দস্যুগণের সহিত আর্য্যদিগের কোন সংস্রব না থাকায় অনার্য্য ভাষা আর্য্য ভাষাকে কলুষিত করিতে পারে নাই। ক্রমে অনার্য্যদিগের সহিত আর্য্যদিগের ঘনিষ্ঠতা যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, নানা জাতি একত্র হইয়া যত একটী সমাজ গঠিত হইতে লাগিল, সংসর্গ দোষে আর্য্য ভাষার মধ্যে তত অনার্য্য কথা প্রবেশ করিতে লাগিল, আর্য্য ভাষার স্বাধীনতা যথেচ্ছাচারে পরিণত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সময় বৈয়াকরণেরা সূত্র রচনা করিয়া ভাষার স্বাধীনতা সংযত করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্লেদ ও মলা দূরীভূত করিয়া বিশুদ্ধ সংস্কৃত করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার আরম্ভ এই খানে। বৈদিক ভাষা সংস্কৃত হইলেও কোন প্রত্নবিৎ বৈদিক ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা বলিয়া উল্লেখ করেন না। সে ভাষা যখনতেজে তেজস্বিনী, জীবন্ত ও পরিবর্ত্তনশীল, তখন তাহার আকৃতি প্রকৃতির সীমা ও প্রকার নির্ণীত হয় নাই। বৈদিক গ্রন্থ সমূহে সংস্কৃত ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায় না। রামায়ণ ও মৃচ্ছকটিকে সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাণিনি সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু পাণিনীয় শিক্ষার মধ্যে "সংস্কৃত" শব্দ বর্ত্তমান অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অনার্য্যেরা পূর্ব্বে আপনাদের স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহার করিত, ক্রমে আপন ভাষা পরিত্যাগ করিয়া রাজজাতির আর্য্য ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। সেই সঙ্গে আপনাদের ভাষার কতক গুলি শব্দ আর্য্য ভাষাকে উপহার দিয়াছিল। পরন্তু আপনাদিগের অস্ফুট কণ্ঠে আর্য্য ভাষার উচ্চারণ সকল একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছিল। ব্যাকরণকারেরা যে সময় হইতে সূত্র বন্ধনে ভাষাকে সংযত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সংস্কৃত করিয়াছিলেন, সেই অবধি আর্য্য সমাজে দুইটী ভাষা ভিন্ন পথে ধাবিত হয়। শিক্ষিত লোকদিগের ও গ্রন্থাদি রচনা করিবার জন্য সংস্কৃত ভাষা ও সাধারণ সকলের জন্য প্রাকৃত ভাষা। এক দিকে সংস্কৃত ভাষা দিন দিন যত সঙ্কুচিত, নিয়ত ও কৃত্রিম হইতে লাগিল, অপর দিকে প্রাকৃত ভাষার দিন দিন ততই শ্রীবৃদ্ধি ও বহুল ভাবে প্রচার আরম্ভ হইল। প্রাকৃত প্রধানতঃ আর্য্য ভাষা হইতে সঞ্জাত, তথাপি প্রাকৃত ভাষায় অনার্য্য শব্দও বিরল নহে; কিন্তু আর্য্যজাতির স্বজাতি গৌরব এত অধিক

ছিল যে, অনার্য্যদিগের নিকট তাঁহারা কোন বিষয়ে ঋণী এ কথা বৈয়াকরণেরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্র প্রাকৃত-কোষ লিখিতে গিয়া প্রাকৃত শব্দের এই রূপ অর্থ করিয়াছেন "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং ততঃ আগতং বা প্রাকৃতং সংস্কৃত মূলক-মিত্যর্থঃ"। হেমচন্দ্র "দেশী শব্দ সংগ্রহ" নামে আর এক খানি অভিধান রচনা করিয়াছিলেন। নাম শুনিয়া আমাদের আশা হইয়াছিল যে, যে সকল অনার্য্য শব্দ প্রাকৃত মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে; এই গ্রন্থে তাহাদিগের দর্শন পাওয়া যাইবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না—ইহাও মধ্যে আর্য্য শব্দের রূপান্তর জাত কতকগুলি শব্দের সংস্কৃত ভাষায় অর্থ ও ব্যবহারের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। জাতি গৌরবের এমনি তেজ হেমচন্দ্র অভিধান লিখিতে বসিয়া প্রকৃত "প্রাকৃত" বা অনার্য্য শব্দ গুলির উল্লেখ করিতে পারিলেন না। কেবল "তদ্ভব" ও "তৎসম" লইয়া অভিধান দুই খানি পূর্ণ করিয়াছেন। যে সকল অনার্য্য শব্দ প্রাকৃত ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের কতকগুলি এই স্থলে উল্লেখ করা গেলঃ——বাপ্পা কে লকে, গোদং, পোত্ত, পোত্তা, ছিনালিয়া, খুঁটা, গোহো, লখলিয়া, হুদে, জোহহ, অরত্তরদি, ভুক্কত্তং, ঢাক্কেহি, খদা বিয্যাম, মড়মড়ায়িয্যাম, ছল্লি, উয়া, বুত্তে, খুপ্পে, বাস্থ, গালৈয্যাম, দোঘাত্তা, কদপ্পা, গরিল্ল, তরখি, নিদোল ইত্যাদি (Muir's Sanskrit Texts Vol II P. 27)

যাহা হউক এইরূপে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি। যে কারণে জনসন্ আপন মাতৃভাষা এক জন নিগ্রোর মুখে শুনিলে উহা ইংরাজি বলিয়া সহজে স্বীকার করিতে চাহিতেন না, যে কারণে তাঁহার ইংরাজী ও টমের ইংরাজিতে এত প্রভেদ হইয়াছে, ঠিক সেই কারণে আর্য্য ও প্রাকৃত ভাষার এত প্রভেদ হইয়াছে। আবার প্রাচীন আর্য্য ভাষা অপেক্ষা ব্যাকরণ পীড়িত সংস্কৃত ভাষা হইতে এই ভাষার বিভিন্নতা আরো অধিকতর হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র ইংরাজি ভাষায় রচিত এক খানি নিগ্রো বাইবেল হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার সহিত ইংরাজের ইংরাজি পাঠক অনুগ্রহ করিয়া তুলনা করিয়া দেখিবেন।

1. Drie deh na bakka, dem holi wan bruiloft na bana nagalilse, en mamna va jesus been ce dapef.

2 Ma dem ben kali jesus nanga him disciple toe na kom nada bruiloft. (1)

এই স্থানে ডাক্তার রাম দাস সেন প্রণীত ঐতিহাসিক রহস্য দ্বিতীয় ভাগে উদ্ধৃত একটু পালি ভাষা তুলিয়া দেওয়া যাউক। পাঠকগণ তুলনা করিয়া দেখিবেন সংস্কৃত ও পালি এবং ঐ উভয় ইংরাজির সমানুপাতে প্রভেদ কত।

"মিখান্তিলোক মহিতম্ অভিবন্দি জগান
বুদ্ধন চ ধম্ম মমলানগণ মুত্তমঞ্চ
সখু স তম বচনাথ বরাম সুবোধম্
ব্যাখামি সুত্তহিত মেথা সুসন্ধি কপান্।"

---

(1) 1 Three days after back, them hold one marriage in bona of Galilee and mamma of Jesus been there.

2. But them been call Jesus with him disciples to come to that marriage.

Indo Aryans vol II, 278.

প্রাকৃত ভাষার জন্ম এই রূপে হইলেও প্রাকৃত কত প্রাচীন ভাষা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যদি বৈদিক গ্রন্থ-নিচয়ের রচনা কাল আমরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে পারিতাম তাহা হইলে প্রাকৃত ভাষার জন্মকাল এক রূপ নির্ণয় করা যাইত। কিন্তু আমাদিগের সে সাধ্য নাই, পালি বৈয়াকরণ কাত্যায়ণ (কচ্চায়ন) ইহাকে মূল ভাষা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সমাগধী মূল ভাষা নরেয় আদি কপ্পিক
ব্রাহ্মণ স্সুস্টু ল্লাপ সমবুদ্ধচ্চাপি ভাষবে—

কাত্যায়ণের এ কথা আমরা পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ স্বীকার করিতে পারি না; আর প্রাকৃত শব্দর ভাষা, আর্য্য ও অনার্য্য উভয় ভাষাই বহু প্রাচীন এ কথা ধরিয়া কাত্যায়ণ যে প্রাকৃতকে মূল ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বোধ হয় না। আমরা প্রাকৃত ভাষার জন্মকাল বৈদিকগ্রন্থাবলী রচনার পরন্তন, এক্ষণে এই মাত্র বলিতে পারি। অপর দিকে বররুচি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, মহেন্দ্র পালি ভাষার রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ সকল সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা অশোক বর্দ্ধন স্বপ্রতিষ্ঠিত স্মরণি সকলে প্রাকৃত ভাষায় রচিত অনুজ্ঞা সকল খোদিত করাইয়াছিলেন। মাকিদনপতি সিকন্দরের ভারতবর্ষ আক্রমণ সময়ে সাধারণ লোকে প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন করিত। প্রত্নবিৎ উইলসন সাহেব এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। শাক্যসিংহ সাধারণ শ্রোতৃগণকে আপন ধর্ম্ম মত বুঝাইবার জন্য প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেন, তাঁহারও পূর্ব্বতন পাণিনির শিক্ষাগ্রন্থে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়। "প্রাকৃতে সংস্কৃতে বাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়ম্ভুবা" এই সকল দেখিলে পাণিনির পূর্ব্বে এবং প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ সকল রচিত হইবার পরে প্রাকৃত ভাষার জন্ম হইয়াছিল বলিতে হইবে, পুরাণ রচনা হইবার যে পরে নহে সে বিষয় সন্দেহ নাই। সংস্কৃত উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রাকৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাকৃত ভাষার জন্ম হইবার পূর্ব্বে আর্য্য সন্তানদিগের আর্য্য বা প্রাচীন সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা ছিল না। দ্বিতীয় ভাষার স্বত্বা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেওয়া দূরে থাকুক কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ এ পর্য্যন্ত তাহার ইঙ্গিত করেন নাই। সুতরাং তখন সেই সংস্কৃত (আর্য্য) ভিন্ন আর্য্য-সন্তানেরা আর কোন্ ভাষায় কথোপকথন করিতেন? (নূতন) সংস্কৃত ভাষা উৎপত্তি হইবার পরে ইচ্ছা করিলে আর্য্যগণ প্রাকৃত ভাষায় স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বতন আর্য্যগণের আর্য্যভাষা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। যাঁহারা বলেন সংস্কৃত কখনও বাক্য কথন ভাষা ছিল না, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলে বাধিত হইব। অপর পক্ষে আর্য্যগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন কবিবার কয়েকটী প্রমাণও পাওয়া যায়। প্রমাণের সংখ্যা অধিক নহে বলিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই নাই। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সহস্র সহস্র লিখিত গ্রন্থ রহিয়াছে কিন্তু ইহার কোন খানিতে "ইংরাজেরা ইংরাজীতে কথা কহে" বা "বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহে" এরূপ কোন লেখা পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। সহস্র বৎসর পরে আমাদিগের সন্তানগণকে আমাদিগের বাক্য কথন ভাষা সম্বন্ধে যদি কেহ প্রশ্ন করে, তাহারা কি প্রমাণ দেখাইয়া আপন কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন

করিবে আমরা বুঝিতে পারি না। রামায়ণ আরণ্য কাণ্ডে লিখিত আছে

ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপং ইল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ

নিষ্ঠুর ইল্বল ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া সংস্কৃত কথা বলিয়া শ্রাদ্ধ উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করে।

সুন্দরাকাণ্ডে হনুমান জানকীর অন্বেষণে গিয়া ভাবিতেছেন, আমি কি ভাষায় কথা কহিব? আমি বানর, আমার বানুরে ভাষা তাঁহার তো বুঝিবার সাধ্য নাই, সংস্কৃত না বলিলে তিনি বুঝিবেন না, অথচ ব্রাহ্মণের মত সংস্কৃত বলিলে হয়ত জানকী আমাকে ছদ্মবেশী রাবণ বলিয়াও অনুমান করিতে পারেন।

অহংহ্যতি তনুশ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ
বাচঞ্চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাং
যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতং
রাবণং মন্যমানামাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি।

রামায়ণ আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত, অর্থাৎ যে ভাষা কেবল গ্রন্থ লিখিবার ভাষা বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। সে সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বার্ত্তা চালাইতেন, কুলনারীগণ পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিতেন।

এতৎ সম্বন্ধে ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎগণের মত এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাউক।

"I incline to the opinion of those who deny that the *Sanskrit Bhasa* properly so called was ever the common spoken language of the whole Arian people and assign it to the learned alone......The Sanskrit language and the Prakrito dialects had a common and simultaneous origin; the latter did not spring out of the former, but rather, being connected by a natural bond with the ancient language, have often a more antique fashion than the sanskrit, which being shaped and circumscribed by the rules of grammarians, has sacrificed the truth of analogy for the sake of regularity. The Prakrito tongues are nothing else than ancient Vedic dialects in a state of degeneracy; while the Sanskrit Bhasha is the sum of the Vedic dialects constructed by the labour and zeal of grammarians and polished by the skill of learned men." Professor Wiber.

"I consider that in his accounts of the origin of the Prakrito dialects, Professor Wiber has gone too far in stating them to be contemporaneous with the Veda dialect......I incline to the opinion that the language of the Rigveda was at one time universally spoken, not through the whole of India but the Punjab, that is the original seat of the Arians. The dialects spring from it, because the greater part of the population were non-Arians, and naturally corrupted a language which was forced upon them......I agree with Professor Wiber in believing that Sanskrit proper, that is the language of the epic poems, the law books, nay even that of the Brahmans, was never actually spoken, except in schools or by the learned. Professor Aufrecht.

"The inscription of the Sinha prince Rudra Daman which dates from the year 85 B. C. is written in Sanskrit prose of an artificial character, with long-compound-words. From this fact we may infer that Sanskrit was no longer spoken by the common people, but only by the Brahmins and other persons in the higher classes...I do not believe in a contemporaneous devolopment side by side of the Sanskrit and Prakrit tongues out of the one common source of the Indo-Arian language, but assume that it was not till long after the immigration of the Indo-Arians that the Prakrits were formed in the several provinces of India...It

is in the period between Vikramaditya and the later Gupta kings that the appellation Sanskrit for the classical language and Prakrit for the forms of speech springing from it must have arisen. It has been mentioned that Sansrit was never the common popularkdialect of the Arian Indians. I must dissent from this view...It may be asumed that in the time of Asoke the great part of the people in the countries inhabited by the Arian Indians, spoke the local dialects and that only the Brahmans and the principal persons spoke Sanskrit." Professor Lassen.

"The language which we now call Sanskrit was once, as both the ancient and modern dialects which have issued from it, distinccly show, the prvelent popular speech in the greatest part of India...Sanskrit must have died out before Asoke, who lived in the 3rd century B.C....It becomes highly probable that the period when Buddism arose *i. e.* about the 6th ecntury B. C., Sanskrit was no longer the speech of the people...If we assume about three centuries far the time of its gradual extinction, the period when Sanskrit was the ordinary language of the people is thrown back to about the 9th century before Christ...Out of the variety of local developments which the Sanskrit underwent, its different derivative languages arose" "I will therefore content myself with repeating the main results of the investigation These results are : that from the period when the Sanskrit speaking race immigrated into India down to perhaps the ninth century B. C. Sanskit became diffused as the prevailing vernacular dialect over the whole of Hindusthan as far as the southern borders of the Mahratta country...From the ninth century B. C. the Sanskirt began to die out derivative dialects became developed from it and in the sixth century B. C. it had become extinct as a vernacular language."

Professor Benfey.

প্রাকৃত "সংস্কৃত" ভাষা হইতে উৎপন্ন নহে—প্রকৃত সংস্কৃতের পরস্তনও নহে। প্রাচীন আর্য্যভাষা একরূপে সংস্কৃত হইয়াছে, অন্যরূপে অন্য ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রাকৃত হইয়াছে। এই মিশ্রণকার্য্য সংস্কৃত ভাষা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও, হইয়াছিল, পরেও হইয়াছিল। সুতরাং প্রাকৃত ভাষার আরম্ভ সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণবদ্ধ হইবার পূর্ব্বতন বলিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈদিক গ্রন্থ রচণার পরে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। এতদ্দ্বারা ইহা বুঝিতে হইবে না যে. সকল প্রকার বৈদিক গ্রন্থ, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, ছন্দ, কল্প, ব্যাকরণ প্রভৃতি রচনা শেষ হইয়া গেলে প্রাকৃতের সূচনা হইয়াছিল। অনেক বৈদিকগ্রন্থ, পাণিনি ও শাক্যসিংহের অভ্যুদয়ের পরে রচিত হইয়াছে। আমরা প্রাকৃতের উৎপত্তি পাণিনির পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিয়াছি। আচার্য্য গোল্ড ষ্টুকার বিশিষ্ট রূপে প্রমাণ করিয়াছেন, পাণিনির সময়ে অথর্ব্ববেদ, আরণ্যক, শুক্ল যজুর্ব্বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ ও কেন উপনিষদ রচিত হয় নাই প্রাতিশাখ্য সকলও পাণিনির পরস্তন। অপর পক্ষে পাণিনি, ঋক, কৃষ্ণ যজু ও সামবেদের উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে একথাও বলা আবশ্যক এ তিনখানি বেদও এক সময়ে রচিত হয় নাই। ঋকৃবেদের কোন কোন মণ্ডল পাণিনি আধুনিক বলিয়াছেন, ওদিকে প্রাকৃতভাষা পাণিনির পূর্ব্বতন বলিয়া আমরা নির্ণয় করিয়াছি, সুতরাং প্রাকৃতভাষা ঋগ্বেদাদির আধুনিক মণ্ডল সকল অপেক্ষাও প্রাচীন কি না আমরা বলিতে পারি না। সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, ঋক্, যজু ও সামবেদের প্রাচীনতর অংশ সকল রচিত হইবার পরে প্রাকৃতভাষার

উৎপত্তি হইয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শ্যাপর্ণদিগকে অশুদ্ধভাষী বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে "পুত্যায়ৈ বাত্তোবদিতায়" পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে এই কারণে ব্রাত্যদিগকেও ধিক্কার করা হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অসুরগণ ম্লেচ্ছভাষী বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার না করিতে সাবধান করা হইয়াছে, "তস্মাৎ ব্রাহ্মণো ন ম্লেচ্ছেৎ"

বহুকাল অবধি প্রাকৃতভাষায় কোন গ্রন্থ রচিত হয় নাই, হইয়া থাকিলেও অদ্যাপি সেগুলি পাওয়া যায় নাই। বৌদ্ধেরা সর্ব্ব প্রথমে প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন. পণ্ডিতদিগের সহিত শাক্যসিংহের মত বিভিন্নতা হেতু অনেকবার বিচার করিতে হইলেও আপন মত সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য তাঁহাকে সাধারণের নিকট সাধারণ ভাষায় সেগুলি বিবৃত করিতে হইত। শাক্য সিংহের রচিত কোন গ্রন্থ নাই; বৌদ্ধ গ্রন্থ সমুদায় তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যের সঙ্কলিত। সকলেই বলেন তথাগতের উপদেশ তাঁহারা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বৌদ্ধগ্রন্থ সকল প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়া পরে পালিভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল বা প্রথম হইতেই পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল; সংস্কৃত গ্রন্থগুলি তাহার অনুবাদ, তদ্ভাবে ভাবিত বা তাহার পরস্তম, এক্ষণে ইহার বিচার করা যাইবে। প্রথমে প্রাকৃত ও পালি ভাষার সম্বন্ধ কি অনুসন্ধান করা যাউক, প্রশ্নের মীমাংসা তাহা হইলে হয়ত সহজ হইতে পারে। বররুচি তাঁহার প্রাকৃত প্রকাশগ্রন্থে চারিটী প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন, পৈশাচী, মাগধী, শৌরসেনী এবং মহারাষ্ট্রী। এতদ্ভিন্ন পালি নামে একটী প্রাকৃতভাষা প্রচলিত ছিল। সিংহলের বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থ সকল এই ভাষায় লিখিত। গাথা নামে আর একটী প্রাকৃতভাষা এক সময়ে বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মাননীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার ইণ্ডো-অ্যারিয়ণ গ্রন্থে গাথা ভাষার আলোচনা করিয়াছেন। হড্‌সন সাহেব পূর্ব্বে গাথা ভাষার উল্লেখ করিয়া থাকিলেও ইউরোপীয় বা দেশীয় পণ্ডিত সমাজ এতদ্ সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিয়াছেন সে ডাক্তার বাহাদুরের নিকট। ললিতবিস্তর নামক উত্তর দেশীয় বৌদ্ধ সমাজ সম্মানিত বুদ্ধ জীবনী গ্রন্থে গাথা ভাষায় প্রণীত অনেক কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল কবিতা সকল এই ভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম গাথা ভাষা হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই ছয়টী ভাষার পরস্পর সম্বন্ধ কি? ইহারা সকলে এক সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল বা বিভিন্ন সময়ে উদিত হইয়াছিল। ইহাদের কেহই এখন বাক্য-কথন ভাষারূপে প্রচলিত নাই। কতদিন পূর্ব্বে ইহাদের মৃত্যু হইয়াছে? আমরা বলিয়াছি শাক্য সিংহ সাধারণ লোকের সমক্ষে প্রাকৃতভাষায় আপন মতামত প্রকাশ করিতেন। সে কোন্ প্রাকৃত? প্রাকৃতভাষা সম্বন্ধে বররুচি কৃত প্রাকৃত প্রকাশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাকৃত প্রকাশ দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম নয়টী পরিচ্ছেদ এক মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃতের আলোচনায় সমাপ্ত হইয়াছে।

দশম পরিচ্ছেদে পৈশাচী, একাদশে মাগধী এবং দ্বাদশে শৌরসেনী ভাষার আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ভাষাকেই বররুচি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর করিয়াছেন। পৈশাচী সম্বন্ধে তিনি বলেন "পিশাচানাং ভাষা পৈশাচী" "প্রকৃতিঃ

শৌরসেনীঃ" "পৈশাচী শৌরসেনী ভাষা হইতে উৎপন্ন ইহা পিশাচদিগের ভাষা"; মাগধী সম্বন্ধে বলেন "মাগধানাং ভাষা মাগধী" "প্রকৃতিঃ শৌরসেনী" "মাগধী মাগধদিগের ভাষা ইহাও শৌরসেনী হইতে উৎপন্ন" "শৌরসেনী" সম্বন্ধে বলেন, "প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং" ইহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। সুতরাং বররুচির মতে শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী এই দুইটী মূল প্রাকৃত। শৌরসেনী সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ইহা তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; আবার মহারাষ্ট্রী সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম উল্লেখ করিয়া শেষে বলিয়া দিয়াছেন "শেষঃ সংস্কৃতাৎ" অর্থাৎ প্রত্যয়, সমাস, লিঙ্গ, তদ্ধিত প্রভৃতির নিয়ম সংস্কৃতের মতন। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়ও যে সংস্কৃত মূলক ইহা প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে। শৌরসেনী সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম উল্লেখ করিয়া শেষ বলিয়া দিয়াছেন ইহার অবশিষ্ট মহারাষ্ট্রীয় ভাষার মত।

পৈশাচী ভাষার উদাহরণ কোন সংস্কৃত নাটকে পাওয়া যায় না। পিশাচ বলিয়া কোন জাতিরও উল্লেখ আমরা কোথায়ও পাই নাই। রাক্ষসেরা যে ভাষায় বেণীসংহার নাটকে কথা কহিয়াছে, সে অর্দ্ধ মাগধী। যাহা হউক বররুচির মতে পৈশাচী জাতি বিশেষের ভাষা "মাগধী" বররুচির মতে বোধ হয় ভাটদিগের ভাষা হইবে। মগধবাসীদিগের ভাষাও বুঝাইতে পারে। বররুচির লিখিবার প্রণালী দেখিলে বোধ হয় বররুচির পূর্ব্বে এই সকল ভাষায় কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া আমরা স্থির করিতে পারিলাম না যে, এই সকল ভাষা এক বা ভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পণ্ডিতগণের সাধারণ বিশ্বাস, ইহারা এক সময়ে ভারতবর্ষে বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ছিল। মাগধী পূর্ব্ব ভারতের, শৌরসেনী মথুরা ও রাজপুতনা অঞ্চলের, এবং মহারাষ্ট্রী, মহারাষ্ট্র গুজরাট, মধ্য ভারতবর্ষ, প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষা। অধ্যাপক কাওয়েল প্রভৃতির মতে বররুচি খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বশতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; আমার মতে তাঁহাদের ভ্রম হইয়াছে। আমি দেখাইব খ্রীষ্ট জন্মের সময়ও তাহার দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্যবর্ত্তে পালী বা সেইরূপ কোন ভাষা প্রচলিত ছিল। বোধ হয় খ্রীষ্ট জন্মের ২। ৩ শত বৎসর পরে মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভাষার আবির্ভাব হইয়াছিল এবং সেই সকল ভাষা হইতে ক্রমে বর্ত্তমান উড়িয়া, বাঙ্গালা, হিন্দি, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। আমার বোধ হয় পালিভাষার পূর্ব্বে গাথা ভাষা প্রচলিত হইয়াছিল। গাথা অন্য সকল প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন আর্য্য ভাষার অতি নিকট আত্মীয়। বোধ হয় প্রাকৃত জনগণ সম্বোধনে শাক্যসিংহ এই গাথা ভাষা ব্যবহার করিতেন। ললেন মিয়ুর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করেন বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষা সকল খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করে নাই। তাহার পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, পালি প্রভৃতি ভাষায় বহুকাল পর্য্যন্ত কথা বার্ত্তা চলিয়াছিল। সংস্কৃত নাটক-সমূহে প্রাকৃত জনেরা প্রাকৃতভাষী বলিয়া সর্ব্বত্র বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সময়ে সিংহল, ব্রহ্ম, প্রভৃতি বৌদ্ধদেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাম্রফলকে, গিরিগাত্রে বা স্মরণী-স্তম্ভ সকলে তাৎকালিক যে সকল প্রচারলিপি পাওয়া গিয়াছে, সে সকল প্রায়ই প্রাকৃত

ভাষায় রচিত। সুতরাং প্রাকৃতের যে এক সময়ে সর্ব্বত্র প্রচার ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিয়ুর মতে, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী মাগধী প্রভৃতি ভাষার পরস্পর পার্থক্য অতি সামান্য। তাঁহার মতে এই সকল ভাষা যুগপৎ ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিল; তাহাদিগের মধ্যে যে কিছু বিভিন্নতা দেখা যায়, সে কেবল স্থান সাপেক্ষ। যে কারণে যশোহর কৃষ্ণনগরের কথন ভাষায় কিছু পার্থক্য জন্মিয়াছে, সেই কারণেই শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী ভাষায় পার্থক্যের উদয় হইয়াছিল। আবার পালি ভাষার সহিত মহারাষ্ট্রীয় শৌরসেনী প্রভৃতি ভাষার সৌসাদৃশ্য অনেক। তথাপি কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। সে বিভিন্নতা স্থান সাপেক্ষ নয়। কাল সাপেক্ষ। অর্থাৎ পলি ভাষা কাল ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। বররুচি পালি ভাষার উল্লেখ করেন নাই। এ জন্য কেহ কেহ পালি ভাষাকে বররুচি উল্লিখিত মহারাষ্ট্রী মাগধী প্রভৃতি ভাষার পরন্তন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ-প্রচলিত মাগধী ভাষা হইতে পালি ভাষার জন্ম। সিংহল ভাষী বৌদ্ধরা পালি ভাষাকে মাগধী ভাষা বলিয়া উল্লেখ করে, পালিকে মাগধী ভাষা জাত বলিয়া বিবেচনা করিবার ইহাও একটী কারণ। মগধ দেশ হইতে মহেন্দ্র পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী সিংহলে লইয়া প্রচার করেন, ইহাও পালির মাগধী নাম হইবার একটী কারণ হইতে পারে। বস্তুতঃ মাগধী ও পালির সৌসাদৃশ্য এত অধিক যে, সহসা একটীকে অপরটী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। পালির মাগধী বা অন্য কোন নাম করণ করা হউক তাহাতে আমার কোন আপত্য নাই। পালি বা মাগধী কে কাহার পূর্ব্বে, ইহা মীমাংসা করিতে পারিলে ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক রহস্য উদ্ভাসিত হইতে পারিবে; পালী ও মাগধী ভাষার লক্ষণ সকল পরীক্ষা করিলে পালী যে ঐ সকল ভাষার পূর্ব্বতন সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সিংহলের বৌদ্ধেরা কাত্যায়ণ পথানুসরণে পালিকে প্রাচীনতম ভাষা বলিয়া গৌরব করেন।

স মাগধী মূল ভাষা নরেয় আদি কপ্পিক।
ব্রাহ্মণ সমুট্‌ঠলাপ সমবুদ্ধ চ্চাপি ভাবরে।

এ বহুভাষিতার যে কোন অর্থ নাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র দ্বিতীয় বৌদ্ধ সমিতির পরে পালি ভাষায় রচিত কতকগুলি বৌদ্ধ গ্রন্থ লইয়া সিংহলে ধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। সাধারণের বুঝিবার জন্য তাঁহার সময়ে "অথ কথা" নামক টীকা সকল সিংহল ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। বুদ্ধঘোষ সেই সকল টীকা আবার পালি ভাষায় অনুবাদ করেন। সিংহল হইতে বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয়। চীনবাসীরা অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থও স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং অশোকের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মমত যে পালি ভাষায় প্রকটিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। ডাক্তার কানিংহাম প্রভৃতি বিশেষ গবেষণা বলে নিরূপণ করিয়াছেন, অশোক খৃঃ পূর্ব্ব ২৬৪ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং খৃঃ ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে পালী ভাষা মগধে প্রচারিত ছিল স্থির হইল। হইতে পারে অশোকের সময় পালী ভাষায়

লোকে আর কথা বার্ত্তা কহিত না, সংস্কৃতের স্থায় পালি ভাষাও কেবল গ্রন্থরচনা ও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সমাজে কথন ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে পালি আরও প্রাচীন হইয়া পড়ে। যাহা হউক অশোকের পরে যে পালি ভাষার উৎপত্তি হয় নাই, এই বিষয়ের স্থির নিশ্চয় হইল। অশোকের সময় কি উপায়ে লোকে কথা বার্ত্তা চালাইত কিছু পরে বিচার করা যাইবে। আপাততঃ পালি ভাষা সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কি অবধারণ করিয়াছেন দেখা যাউক।

"Dr. Kuhn like most of the European scholars rejects the identification of Pali with Magadhi and on the strength of its very marked similarity to the language of the Girnar Asoka Inscription, takes with Professor Westerguard the dialect of Ujjayini to have been its chief source."
Royal Asiatic Society Report 1874-75

"The sacred dialects of the Budhas and the Jains are nothing else than Prakrito and the period and circumstance of its transfer to Ceylon and Nepal are connected with the rise and progress of that religion which is professed by the principal nations. to the north and east of Hindustan."
Professor Wilson.

"Prakrit is the general term under which are comprised the various dialects which appears to have arisen in India, out of the corruption of Sanskrit, during the centuries immediately preceding our era...When the Greeks under Alexander came in contact with India, Prakrit seems to have been the spoken dialect of the mass of the people. The language of the rock inscriptions of king Asoka, which record the name of Antiochus, and the greek princess about 200 B. C. is also a form of Prakrit and similarly we find it on the bilingual coins of the Greek kings of Bactria."
Professor Cowell.

"It has been formerly assumed that Pali arose from the special Prakrit dialect called Magodhi but according to the views expressed by Lassen in his Indischi Alterthum Skundi, an hypothesis of this kind is not tenable, since the peculiarities of this dialect are not compatible with those of the Pali language...... Whether the oldest works of the Boudho religion were written in Pali may be a matter of doubt. It is more probable on the contrary that the language in which the founder of the Budha religion conveyed his doctrine to the people was not yet that special language but a mixture of classical and popular Sanskrit (গাথা) such as it still appears in the Budhist suttas. At a later period however Pali became the classical language in which the Budhists wrote their sacred metaphysical and profane works."
Professor Max Muller.

"Although it be sufficiently clear both from the authority of the native grammarians and by a comparison of Sanskrit and Prakrit that the latter are derived from the former, yet the latter Prakrits do not represent the derivative form of speech which stands nearer to the Sanskrit, and we are in a position to point out a dialect which approaches yet more closely to the latter than the Prakrits do, I mean the Pali."
John Muir.

"These two dialects (Soursini and Maharastri) stand the nearest to the Pali, though it is decidedly older than they are." Professor Lassen.

" Professor Wiber maintains the essential, identity of Pali with the vernacular dialect of Magadha in the sixth century B. C."

"A comparison of the Pali with the language of the inscriptions which have descended to our own time, leaves no doubt that the two forms of speech are mostly closely connected. Both are but comparatively little removed from the Sanskrit."
Professor Spiegel.

"Pali is shewn both by internal and external indications to have been the vernacular dialect of Central India. This language was already in popular use at the period of the rise of Budhism. It was probably the dialect of a considerable portion, I mean the western portion of Bengal. The Pali varies in many particulars from the language of Maghod and approximates to the principal Prakrit or Maharastri dialect."

Professor Benfey.

"When the Pali as a derivative from Sanskrit is compared with other dialects having the same origin, it is found to approach far more closely than any of those others to that common source. It stands, so to speak, on the first step of the ladder of departure from the Sanskrit, and is the first of the series of dialects which break up that rich and fertile language."

Professor Barnouf.

দেখা গেল সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, পালি ভাষা বররুচি উল্লিখিত মহারাষ্ট্রী সৌরসেনাদি ভাষার পূর্ব্বতন। কেবল পালি একটী প্রদেশ বিশেষের বা আর্য্যাবর্ত্তের বহুব্যাপী ভাষা রূপে প্রচারিত হইয়াছিল, এতৎ সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ আছে। লাসেন প্রভৃতি পালিকে মধ্য ভারতবর্ষের ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অপরে মগধ দেশীয় ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমার বোধ হয় পালি এক সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই সময়ে ইহার আকার প্রকার ব্যাকরণ নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার পরে সিংহলে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথমে কোন স্থান হইতে পালি ভাষার সূত্রপাত হইয়াছিল, এখনও নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। পালি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কেহ কেহ পালিশব্দ শ্রেণী সংজ্ঞাপক বুঝিয়াছেন। ডাক্তার কানিংহাম পল্লী হইতে পালি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করেন। পালি নামধেয় কয়িয়া নগরেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোকের রাজত্ব কালে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিপাদক যে সকল অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, সে সকলের ভাষা প্রায় পালি ভাষার মত। তথাপি কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। এই সকল অনুশাসনের ভাষাও এক নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় অনুশাসনের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। এই সকল ভাষার পরে পালি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল বলা যায় না। কারণ এই সকল অনুশাসন লিখিত হইবার সময়েই ব্যাকরণ বদ্ধ প্রকৃষ্ট পালি ভাষা সিংহলে প্রচারিত হইয়াছিল। আবার বোধ হয় পালি ভাষা পূর্ব্বেই সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সাধারণ ভাষা রূপে ব্যবহৃত হইত। অশোকের সময় বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে পালি ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছিল। এইরূপান্তর হইবার পূর্ব্বেই পালি ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। পালি ভাষার যে সকল রূপান্তর হইয়াছিল, সেই সকল ভাষার রূপান্তর ক্রমে দৃঢ়তর হইয়া কালক্রমে মহারাষ্ট্রী, সৌরসেনী প্রভৃতি ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। অশোক অনুশাসন উল্লিখিত ভাষার সহিত পালি ভাষার সহিত সম্বন্ধ কি, এই প্রশ্নের ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কি মীমাংসা করিয়াছেন দেখা যাউক।

ক্রমশঃ।

অসি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অরিষ্ট।—এই অরিষ্টও চিহ্ন বিশেষ। যে চিহ্ন থাকায় অসি অমঙ্গল প্রদ হয়,সেই সকল চিহ্নের নাম অরিষ্ট। এই অরিষ্ট চিহ্ন ৩০ প্রকার। নেত্র চিহ্নের সহিত অরিষ্ট চিহ্নের প্রভেদজ্ঞান নিতান্ত সহজ নহে। এজন্য অরিষ্ট চিহ্নের লক্ষণগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরন্তু খড়্গাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, নেত্র চিহ্নের স্থান-নিয়ম আছে, কিন্তু এই অরিষ্ট চিহ্নের কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই। খড়্গের যে কোন স্থানে অরিষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হইলে তাহা পরিত্যাগ করা বিধেয়। অরিষ্ট চিহ্নের লক্ষণগুলি এই—

ছিদ্রারিষ্ট—ছিদ্রতুল্য চিহ্ন।

কাকপদ—কাকপদাকার চিহ্ন।

রেখা—উর্দ্ধ বা তির্য্যক ভাবে রেখা চিহ্ন।

ভিন্ন—ভাঙ্গা বলিয়া ভ্রম জন্মে এরূপ চিহ্ন।

ভেকশির—ব্যাঙের মস্তকাকার চিহ্ন।

মূষিক—মূষিকার চিহ্ন।

বিড়াল নেত্র—বিড়ালের চক্ষুর ন্যায় চিহ্ন।

শর্করা—দেখিতে কিম্বা স্পর্শ করিলে কাঁকরদার বলিয়া ভ্রম হয়, এরূপ চিহ্ন।

নীলী—নীল রসের দাগ লাগার ন্যায় চিহ্ন।

মশক—মশকাকার চিহ্ন-নিচয়।

ভৃঙ্গমা—অনেক বিন্দু চিহ্ন বা ভ্রমরপদ চিহ্ন।

সূচী—উর্দ্ধ বা তির্য্যক্ ভাবের সূচীবৎ রেখা চিহ্ন।

বিন্দু—উপরি উপরি বা অধঃ অধঃ বিন্দু ত্রয় বা বিষম বিন্দু সমূহের পঙক্তি চিহ্ন।

কালিকা—অধঃ অধঃ ত্রি বিন্দু পঙক্তির চিহ্ন।

দারী—বহুস্থানে ঐ বিন্দু চিহ্ন।

কপোত—কপোত পক্ষীর পক্ষাকার চিহ্ন।

কাক—কাকাকৃতি চিহ্ন।

খর্পর—খর্পরাকার চিহ্ন (খর্পর—নরক পালাকার পাত্র)।

শকল—খণ্ডলৌহ সংলগ্ন আছে বলিয়া ভ্রম হয়, এরূপ চিহ্ন।

ক্রোড়—শূকরাকার চিহ্ন।

কুশ পত্রক—কুশ গুচ্ছাকার চিহ্ন।

জাল—মধ্যস্থল কিম্বা অন্য কোন স্থান নিম্ন বলিয়া জ্ঞান হয়, এরূপ চিহ্ন।

করাল—অগ্রভাগ দীর্ঘ অথচ পল্লবিত, এরূপ রেখা চিহ্ন।

কঙ্কপত্র—কঙ্ক পত্রাকার চিহ্ন (কঙ্ক—পক্ষী বিশেষ)।

খর্জ্জুর—খর্জ্জুর-বৃক্ষাকার চিহ্ন।

শৃঙ্গ—গোশৃঙ্গাকার চিহ্ন।

পুচ্ছ—গোপুচ্ছাকার চিহ্ন।

খনিত্র—খনিত্র (খোন্তা) তুল্য চিহ্ন।

লাঙ্গল—লাঙ্গলাকার চিহ্ন।

বড়িশ—বড়িশাকার চিহ্ন (বড়িশ—মৎস্য বেধন বড়্শী)।

এই সমস্ত অরিষ্ট চিহ্ন উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেক। নচেৎ অরিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত অসি হইতে ভর্ত্তার বিবিধ বিপদ উত্থিত হইয়া থাকে।

ভূমি।

অসির ভূমি আছে এবং তাহা দ্বিবিধ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পরন্তু তাহার কোন লক্ষণ বলা হয় নাই। সুতরাং ভূমি জ্ঞানের নিমিত্ত এক্ষণে তদুভয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

ভূমি শব্দের এক অর্থ ক্ষেত্র অর্থাৎ কায়া। এস্থলে সে অর্থ বলিবার কোন অভিপ্রায় নাই। উহার দ্বিতীয় অর্থ জন্মস্থান। এস্থলে সেই অর্থই প্রতিপাদ্য। পরন্তু কেবল খড়্গের জন্মস্থান নহে, লৌহের জন্মস্থানও বক্তব্য। উৎপত্তি স্থানের গুণে খড়্গে যে উত্তমাধম গুণ জন্মে, তাহাই এই ভূমি পরীক্ষার বক্তব্য।

খড়্গের ভূমি দ্বিবিধ। দিব্য ও ভৌম। স্বর্গ নামক স্থানে যে সকল লৌহ ও খড়্গ জন্মে সে সমস্তই দিব্য এবং ভারতভূমিতে যে সকল লৌহ ও খড়্গ জন্মে সে সকল ভৌম। এই দ্বিবিধ খড়্গের সামান্য লক্ষণ এই যে, পুরাকালের দেবগণ ও দানবগণ হইতে প্রথমতঃ খড়্গের জন্ম হয়। তদনুরূপ খড়্গ কোন কোন পুণ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে যে সকল খড়্গ স্থূলধার, অত্যন্ত হালকা, নির্ম্মল চিহ্নযুক্ত, সুন্দর নেত্র যুক্ত, অরিষ্টহীন, সুরূপ, সংস্কার না করিলেও নির্ম্মল থাকে, দুর্ভেদ্য, ভাঙ্গিলে আর যোড়া দেওয়া যায় না, ধ্বনি উত্তম, যাহার দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ ও অস্ত্র পাক জন্মে,—সেই সকল খড়্গ দিব্য বলিয়া জানিবে। এই দিব্য খড়্গ প্রাপ্ত হইলে জয় ও শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ভৌম খড়্গের লক্ষণ পরিজ্ঞানার্থ অগ্রে লৌহ জ্ঞানের আবশ্যক আছে। সে সম্বন্ধে এই রূপ কিংবদন্তি আছে যে, পুরাকালে মহাদেব যখন বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন তখন সেই ভক্ষ্যমান বিষ, বিন্দু বিন্দু ক্রমে দেশে দেশে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই সকল বিষ হইতে সেই সেই দেশে কালায়স অর্থাৎ কৃষ্ণ লৌহ বা ইস্‌পাত জন্মিয়াছিল। আর তৎপূর্ব্বে যে অমৃত উৎপন্ন হয়, তাহা দেবতা কর্ত্তৃক পীত হইয়াছিল, সেই পীয়মান অমৃতের বিন্দু যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে শুদ্ধ লৌহের জন্ম হইয়াছিল। বিষ-জন্মা লৌহ সকল অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণ ও কর্কশ। এ লৌহ শরীরে প্রবেশ করিলে মূর্চ্ছা, দাহ, জ্বর, মল মূত্র বিষ্টম্ভ, শোথ, হিক্কা ও বমী উপস্থিত হয়। আর যাহা অমৃত জন্মা—তাহার বর্ণ কর্বুর ও স্পর্শ মৃদু। এ লৌহের দ্বারা শরীর দৃঢ়, পালিত্যনাশ, মালিন্য নাশ, জরা ও ব্যাধি বিনাশ হয়। এই শুদ্ধ লৌহ বারাণসী, মগধ, সিংহল, নেপাল, অঙ্গদেশ, সুরাষ্ট্র এবং অন্য কোন কোন পুণ্যস্থানে উৎপন্ন হয়। বারাণসী জাত শুদ্ধ লৌহের দ্বারা যে সকল অসি প্রস্তুত হয়, সে সকল অসি স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণধার, সুচিহ্নশালী, লঘু অর্থাৎ হালকা, সুসংশ্লিষ্ট ও অভেদ্য। মাগধ অসি সকল কর্কশ, স্থূলধার, গূঢ়চিহ্নযুক্ত, গুরু অর্থাৎ ভারযুক্ত, ও দুঃসন্ধেয়। নেপাল দেশজাত অসি নিশ্চিহ্ন, নিশ্চল, মলিন, লঘু ও স্থূলধার। কলিঙ্গ দেশীয় অসি গুরু ও অত্যন্ত কর্কশ। সিংহল দ্বীপ জাত অসি ৪ চারি প্রকার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কোন অসি সুচিহ্নযুক্ত, ভারি, কর্কশ ও স্নিগ্ধধার। কোন অসি লঘু, ও স্নিগ্ধ ও স্থূলধার। কোন কোন অসি মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত। ওড়, কলি, ভদ্র, পাণ্ডি, অয়স্কান্ত ও বজ্র প্রভৃতি বহুপ্রকার শুদ্ধ লৌহ আছে। তন্মধ্যে এক মাত্র বজ্র লৌহই অস্ত্রের উপযুক্ত, অবশিষ্ট লৌহ সকল ঔষধের উপযোগী।

ধ্বনি।

ধ্বনি অর্থাৎ শব্দের দ্বারাও খড়্গের উত্তমাধম পরীক্ষা হইয়া থাকে। সেই ধ্বনি অষ্ট প্রকার, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কিন্তু কি কি প্রকার? তাহা পরিষ্কার করিয়া

বলা হয় নাই, এজন্য এস্থানে তাহাও বলা আবশ্যক হইতেছে।

খড়্গের ধ্বনি প্রথমতঃ দ্বিবিধ। ঘোর ও তার। এই দুয়ের অন্তঃর্গত প্রথমতঃ ৪। খড়্গে নখাঘাত করিলে যদি হংসকণ্ঠধ্বনির ন্যায় ধ্বনি বহির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হংসধ্বনি বলা যায়। হংসধ্বনিযুক্ত খড়্গ উত্তম বলিয়া গণ্য। ১

খড়্গে নখাঘাত করিলে যদি কাংস্য-ধ্বনির ন্যায় ধ্বনি বহির্গত হয়, তবে তাহাকে কাংস্যধ্বনি বলা যায়। ২

অসিতে আঘাত করিলে যদি মেঘগম্ভীর-ধ্বনি উত্থিত হয়, তবে তাহাকে অভ্রধ্বনি বলিব। ইহাও ভাল। ৩

খড়্গে আঘাত করিলে যদি ঢক্কাধ্বনির ন্যায় ভারধ্বনি বহির্গত হয়, তবে তাহাকে ঢক্কাধ্বনি বলিব। ইহাও ভাল। ৪

অসিতে নখাঘাত করিলে যদি কাকস্বরের ন্যায় বিস্বর বহির্গত হয়, তবে তাহাকে কাক-ধ্বনি বলাযায়। ইহা অত্যন্ত অধম। ৫

নখাঘাত করিলে যদি তরবারি হইতে বীণাধ্বনির অনুরূপধ্বনি জন্মে, তাহা হইলে তাহা তন্ত্রীধ্বনি বলিয়া গণ্য। ইহাও ভাল নহে। ৬

নখাঘাত প্রাপ্ত অসির অঙ্গ হইতে যদি গর্দ্দভের ন্যায় ভ্যাদ্‌ভেদে শব্দ বহির্গত হয়, তবে তাহার নাম খরধ্বনি। ইহা অত্যন্ত মন্দ। ৭

আঘাত প্রাপ্ত হইবা মাত্র খড়্গ হইতে যদি প্রস্তরাঘাত তুল্য ধ্বনি জন্মে, তবে তাহাকে প্রস্তর ধ্বনি বলা যায়। ইহাও অত্যন্ত অধম। ৮

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ধ্বনির তারতম্য বুঝিতে অক্ষম হইলে এই সামান্য লক্ষণের অনুসরণ করিবে। কি? না গম্ভীর ও তারধ্বনি ভাল, এবং উত্তান ও মন্দ্রধ্বনি মন্দ। ধ্বনি যদি উত্তম হয়, তবে অন্য কোন সুচিহ্ন না থাকিলেও তাহা গ্রাহ্য ও উত্তম বলিয়া গণ্য। যেমন অন্ধ ও কুরূপ মনুষ্য সুস্বর ও সুগায়ক হইলে সে উত্তম বলিয়া মান্য গণ্য হয়, এবং সর্ব্বসুলক্ষণ মনুষ্যও কুস্বর ও কুগায়ক হইলে নিন্দা প্রাপ্ত হয়, খড়্গ সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে। খড়্গের ধ্বনি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, অসিতে নখ, কঠিন ও ক্ষুদ্র দণ্ড, লৌহ শলাকা, লোষ্ট্র ও কাঁকরের আঘাত করিবে। আঘাতটী যেন আল্‌গোচে করা হয়, এবং খড়্গকেও যেন আল্‌গোচে রাখা হয়। অতঃপর তাহা হইতে যে ধ্বনি উত্থিত হইবে—সেই ধ্বনির সহিত পূর্ব্বোক্ত পদার্থের ধ্বনির তুলনা করিবে। তুলনা করা অভ্যস্ত হইলে তখন অনায়াসেই ধ্বনির তারতম্য বা প্রভেদ জ্ঞাত হইতে পারিবে।

মান।

অসির মান অর্থাৎ কায়ার দীর্ঘতা, খর্ব্বতা ও ওজনের অল্পাধিক্য প্রভৃতি উত্তমাধম গুণের জ্ঞাপক। এজন্য দ্বিবিধ পরিমাণের প্রতিও দৃষ্টি করা আবশ্যক।

পরিমাণ প্রথমতঃ দ্বিবিধ। উত্তম ও অধম। যাহা বিশাল ও লঘু তাহা উত্তম-মান এবং যাহা খর্ব্ব ও গুরু—তাহা অধম মান। ইহাও আবার ত্রিবিধ। আদি, মধ্য ও অন্ত্য। যাহার দীর্ঘতা ২০ মুষ্টি, বিস্তৃতি ৬ অঙ্গুলি এবং ওজনে ৮ পল, তাহা মধ্যম। যাহা ১২।৮ কি ৯ মুষ্টি আয়ত উক্ত মানের এক চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি এবং ওজনে তত পল, সে খড়্গ ভাল নহে।

এসম্বন্ধে খড়্গতত্ত্ববিৎ নাগার্জুন যাহা

বলিয়াছেন, তাহাই খড়্গের উত্তমাধম পরিমাণ জ্ঞানের উৎকৃষ্ট উপায়। যথা—

"যাবত্যো মুষ্টয়ো দৈর্ঘে তদৰ্দ্ধাঙ্গুলয়ো যদা।
প্রসরে তচ্চতুর্থাংশ মিতি বৈমান মুত্তমম্॥
যাবত্যো মুষ্টয়ো দৈর্ঘে প্রসরে তৃস্ত্রিভাগিকঃ।
পলৈ স্তদৰ্দ্ধৈ স্তুলিতঃ স খড়্গো মধ্য উচ্যতে॥
যাবত্যো মুষ্টয়ো দৈর্ঘ্যে তুর্য্যাংশঃ প্রসরেস্তুতৎ।
অধমঃ কীৰ্ত্তিতঃ খড়্গঃ স্তৎসমো বাধিকঃ পলৈঃ।'

যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অঙ্গুলির চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি ও ওজন। ইহাই খড়্গের উত্তম পরিমাণ। যথা (২০ মুষ্টি দীর্ঘ, ২॥ অঙ্গুল বিস্তৃতি ও ২॥ পল ওজন)।

যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অৰ্দ্ধ অঙ্গুলির তিন্ ভাগের এক ভাগ বিস্তৃতি এবং তাহার অৰ্দ্ধ পল ওজন। ইহাই মধ্যম পরিমাণ। যথা ২০ মুষ্টিদীর্ঘ, ৩ অঙ্গুলি বিস্তৃতি এবং ৫ পল ওজন।

যত মুষ্টি দীর্ঘ,তত অঙ্গুলির ৪ ভাগের একভাগ বিস্তৃতি এবং তাহার অৰ্দ্ধ সমান বা অধিক পল ওজন। ইহা অধম পরিমাণ। ভোজদেব খড়্গের পরিমাণাদি সম্বন্ধে অন্যবিধ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—

দীর্ঘতা লঘুতা চৈব খর বিস্তীর্ণতা তথা।
দুর্ভেদ্যতা সুস্থতা খড়্গানাং গুণ সংগ্রহঃ॥,,
খৰ্ব্বতা গুরুতা চৈব মন্দতা তনুতা তথা।
সুভেদ্যতা দুর্ঘটতা খড়্গানাং দোষ সংগ্রহঃ॥

দীর্ঘ, লঘু অর্থাৎ হাল্কা, তীক্ষ্ণ, বিস্তৃত দুর্ভেদ্য, সুগঠন,—এই গুলিই খড়্গের গুণ। এবং খৰ্ব্ব অথচ ভারি, নরমধার, সরু, ভঙ্গপ্রবণ ও গঠন ভাল নহে,—এই গুলিই খড়্গের দোষ। এই সকল গুণ দোষ বিচার পূর্ব্বক রাজা গুণযুক্ত অসিই ধারণ করিবেন, সদোষ অসি পরিত্যাগ করিবেন।

অসিই রাজাদিগের যুদ্ধ কালের প্রধান সহায়। এজন্য রাজাদিগের বা যোদ্ধাদিগের অসির ধারণ ও সঞ্চালন ক্রিয়া শিক্ষা ও অভ্যস্ত করিতে হয়। যুদ্ধ শাস্ত্রের লিখিত ৩২ প্রকার করণ অর্থাৎ সঞ্চালন-ক্রিয়া ও ভ্রমণ মার্গ সকল জ্ঞাত হইয়া তাহা উত্তমরূপ অভ্যস্ত করিতে হয়। বাম হস্তে চৰ্ম্ম (ঢাল) উদ্যত করিয়া দক্ষিন হস্তে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার সঞ্চরণ মার্গে অবস্থান করতঃ ছেদ, ভেদ, ছিদ্রকরণ, (ফুটান) বিদীর্ণ করণ ও প্রোথিত করণ, প্রভৃতির দ্বারা শত্রু-বল নষ্ট করিতে হয়। ৩২ প্রকার করণ অর্থাৎ গতি ও সঞ্চালন ক্রিয়ার নাম এই

" ভ্রান্ত মুদ্ভ্রান্ত মাবিদ্ধ মাপ্লুতং বিপ্লুতং স্থতম্।
সংযান্তং সমুদীর্ণঞ্চ নিগ্রহ প্রগ্রহৌ তথা॥
পাদাবকর্ষ-সন্ধানে শিরো ভুজ পরিভ্রমৌ।
পাশ পাদ বিবন্ধাশ্চ ভূম্যুদ্ভ্রমণকে তথা॥
গত প্রত্যাগতাক্ষেপাঃ পাতনোত্থানকে প্লুতম্।
লাঘবংসৌষ্ঠবং শোভা স্থিরত্বং দৃঢ় মুষ্টিতা॥
তির্য্য গূৰ্দ্ধপ্রচরণে দ্বাত্রিংশৎ করণান্যহো।"
বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ।

১ ভ্রান্ত, ২উদ্ভ্রান্ত, ৩ আবিদ্ধ, ৪ আপ্লুত, ৫ বিপ্লুত, ৬ স্থত, ৭ সংযান্ত, ৮ সমুদী, ৯ নিগ্রহ, ১০ প্রগ্রহ, ১১ পদাবকর্ষণ, ১২ সন্ধান, ১৩ মস্তক ভ্রামণ, ১৪ ভুজভ্রামণ, ১৫ পাশ, ১৬ পাদ, ১৭ বিবন্ধ, ১৮ ভূমি, ১৯ উদ্ভ্রমণ, ২০ গতি, ২১ প্রত্যাগতি ২২ আক্ষেপ, ২৩ পাতন, ২৪ উত্থানক, ২৫ প্লুতি, ২৬ লঘুতা, ২৭ সৌষ্ঠব, ২৮ শোভা

২৯ স্থৈর্য্য, ৩০ দৃঢ়মুষ্টিতা, ৩১ তির্য্যক্‌প্রচার, ৩২ উর্দ্ধপ্রচার।

কিরূপ কিরূপ ক্রিয়ার উপর এই সকল নাম সংযোজিত হইয়াছে সে সকল বর্ণনার দ্বারা বুঝা ও বুঝান যায় না। খড়্গ যুদ্ধের ক্রিয়া গুলি চক্ষে না দেখিলে কেবল নামের দ্বারা উক্ত ক্রিয়া বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা নাই। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদেও ৩২ প্রকার খড়্গ-ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। যথা—

"ভ্রান্ত মুদ্ভ্রান্তমাবিদ্ধমাপ্লুতং বিপ্লুতং সৃতম্।
সম্পাতং সমুদীশঞ্চ শ্যেনপাত মথাকুলম্॥
উদ্ধূতমবধূতঞ্চ সব্যং দক্ষিণ মেবচ।
অনালক্ষিতি বিস্ফোটৌ করালেন্দ্র মহারবৌ॥
বিকরাল নিপাতৌ চ বিভীষণ ভয়ানকৌ।
সমগ্রার্দ্ধ তৃতীয়াংশ পাদ পাদার্দ্ধ বারিজা॥
প্রত্যালীঢ় মথালীঢ়ং বরাহং লুলিতং তথা।
ইতি দ্বাবিংশতো জ্ঞেয়া খড়্গ চর্ম্ম বিধৌরণে

পূর্ব্বোক্ত নামের মধ্যে কোন কোন নাম ইহাতেও দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে সকল নামের ক্রিয়া ও পূর্ব্বোক্ত নামের ক্রিয়া এক রূপ কি ভিন্ন রূপ তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। ফল খড়্গ সঞ্চালন ক্রিয়া গুলি প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে প্রকৃতরূপে বোধগম্য করান যায় না।

আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদের অন্যস্থানে লিখিত আছে যে, কৃপাণের দ্বারা হরণ, ছেদন, ঘাত, বলোদ্ধরণ, আয়তী করণ,—এই পাঁচ কার্য্য হয়। এই ধনুর্ব্বেদে আরও লিখিত আছে যে, অসি রাখিবার স্থান কটিদেশ।

"কট্যাং বদ্ধা ততঃ খড়্গং বাম পার্শ্বাবলম্বিনম্।
দৃঢ়ং বিগৃহ্য বামেন নিষ্কর্ষে দক্ষিণেন তু॥"

খড়্গকে বাম পার্শ্বাবলম্বী করিয়া কটিদেশে বন্ধন করিবেক। যুদ্ধের সময় তাহার কোষ বাম হস্তে দৃঢ় ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তন্মধ্য হইতে অসিকে নিষ্কাসিত করিবেক। এতদ্ভিন্ন পট্টিশ ও অসিপুত্রিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন খড়্গের কার্য্য "আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্র" নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে।

যোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর নিরাকার সত্য, কিন্তু মন স্থির করিবার কোন আশ্রয় চাই, নিরাকারে মন স্থির হইতে পারে না, সুতরাং কোন বস্তু বা প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া মন স্থির করিতে হইবে। নতুবা চিত্ত সংযম হওয়া অসম্ভব। চিত্তসংযমের পক্ষে যেমন প্রাণায়ামাদির প্রয়োজন, সেইরূপ প্রতিমাদিরও প্রয়োজন। দেখা যাউক, বাস্তবিকই এই যুক্তিটী যোগতত্ত্বের অনুমোদনীয় কিনা। জড়ীয় বস্তু জড়ীয় বস্তুর সহিত যোগ হইবে, আর চেতন বস্তু চেতনের সহিত যোগ হইবে। জড়ীয় বস্তু জড়াকর্ষণে জড়ের প্রতি অনুগমন করে, চেতন আধ্যাত্মিক আকর্ষণে আত্মার দিকে অনুগমন করে, এই অনাত্ম ও আত্ম পদার্থের স্বাভাবিক গুণ। যোগতত্ত্ব এই স্বাভাবিক গুণকে লঙ্ঘন করিতে সচেষ্ট নহে। ইহাও বিবেচ্য যে, মানবাত্মা জড় কি চেতন। যদি মানবাত্মা

জড় হয়, তবেও জড়ীয় উপকরণে জড় দ্বারা চেতনের সহিত যৌগিক সম্বন্ধ হইতে পারে না। আমরা হস্তদ্বারা কি আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারি, চর্ম্ম দ্বারা ঘৃৎতত্ব অনুভব করিতে পারি, আর এই কর্ণ দ্বারা কি বিবেকের শ্রবণ মীমাংসা করিতে পারি। তাহা কখনই পারি না। তবে কেমন করিয়া বলা যায়, জড়ে ও চেতনে যোগ হইতে পারে। আমরা স্বীকার করি, আত্মা নিরাকার। জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছা আত্মার স্বরূপ, এই জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছাময় আত্মা অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সত্তা, অনন্ত ইচ্ছাপূর্ণ মহান ঈশ্বরে যুক্ত হইতে পারে। যোগসাধকদিগের পক্ষে সাকারাদি উপলক্ষ্য রাখিয়াও লক্ষ্যে অর্থাৎ ঈশ্বরে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব, কারণ যখন আমরা যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক চিত্ত সংযমনে প্রবৃত্ত হইব, তখন আমাদিগের একনিষ্ঠ স্থৈর্য্যের প্রয়োজন; সেই সময়ে যদি আমাদের মন, হস্ত পদ মুখ নাসিকা কর্ণ বিশিষ্ট কোন প্রতিমার প্রতি ধাবিত হয়, তখন মনের একনিষ্ঠতা থাকে না। মন কখন নেত্র কখন নাসিকায়, কখন মুখে, কখনও বা পদের প্রতি ধাবিত হইয়া থাকে। সুতরাং মন স্থির করিবার জন্য যদি তুমি প্রতিমাকে অনুকূল মনে কর, সেই প্রতিমাই তোমার মনকে বহুবিধ করিয়া চিত্তের একাগ্রতাকে বিনষ্ট করিবে। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য এক জাতীয় পদার্থ হইয়া থাকে। আমার লক্ষ্য জ্ঞানগর্ভ ও নীতি পূর্ণ পুস্তক পাঠ করা। উপলক্ষ্য বর্ণ পরিচয় প্রভৃতি। বর্ণ পরিচয় না হইলে জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি পাঠ স্বরূপ লক্ষ্য উপস্থিত হইতে পারি না। এখানে লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য এক জাতীয়, সুতরাং নিরাকার ঈশ্বরে মন স্থির করিবার উপলক্ষে সাকার প্রতিমাদি হইতে পারে না। কারণ যোগীদিগের লক্ষ্য ও ঈশ্বর, উপলক্ষ্যও ঈশ্বর। এক সর্ব্ব নিয়ন্তা, সর্ব্বব্যাপী মহান ঈশ্বরই যোগীদিগের পরম লক্ষ্য ও চরম গতি।

এখন দেখা যাউক, এই সম্বন্ধে যোগশাস্ত্র কি বলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহারাজা অলর্ককে মহামনা দত্তাত্রেয় যে যোগ শিক্ষা দেন, সেই যোগ পদ্ধতিতে কতিপয় শ্লোক দ্বারা যোগের উপসর্গ নির্ণয় করেন। সেই মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে আমরা এই স্থানে এই শ্লোক তিনটী উদ্ধৃত করিলাম।

"দেবত্ব মম বেশত্বম্ রসায়ন চচক্রিয়া,
মরুত প্রপতনং যজ্ঞং জলাগ্ন্যা বেশনং তথা। ১
শ্রদ্ধানাং সর্ব্বদানানাং ফলানি নিয়মাংস্তথা,
তথোপবাসাৎ পুর্ত্তার্চ্চ দেবতাভ্যশ্চনাদপি। ২
তেভ্যস্তভ্যশ্চ কর্ম্মেভ্য উপসৃষ্টোভি বাঞ্ছতি,
চিত্তমিত্থং বর্ত্তমানং যত্নাৎ যোগী নিবর্ত্তয়েৎ।
ব্রহ্মসঙ্গী মনঃকুর্ব্বন্নু পর্সর্গাৎ প্রমুচ্যতে।"

দেবত্ব ও ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা, রসায়ন প্রভৃতি ক্রিয়া, বায়ুত্যাগ, যজ্ঞ জল ও ও অগ্নিতে উপবেশন করিয়া তপস্যাদি শ্রাদ্ধ এবং সকল প্রকার দানের ফল এবং জাতি বিচার প্রভৃতি নিয়মাদি, উপবাস, পুর্ত্তকার্য্য ও দেবতাদির অর্চ্চনা, এই সকল ক্রিয়াতে যদি চিত্ত নিমগ্ন থাকে, তথাপিও যোগীগণ যত্ন দ্বারা মনকে পুর্ব্বোক্ত কার্য্যসমূহ হইতে নিবৃত্ত করিবে। এই সব উপসর্গ যখন মনকে বিচলিত করিবে, তখন যোগী স্বীয় মনকে পরব্রহ্মের সঙ্গী করিয়া অর্থাৎ অনবরত পরব্রহ্ম চিন্তনে নিযুক্ত থাকিয়া মনকে পুর্ব্বোক্ত উপসর্গ হইতে মুক্ত করিবে।

যোগশাস্ত্র, আমাদের বিশ্বাস, ও যুক্তি দ্বারা এই স্থিরীকৃত হইল যে, এক অনন্ত মহান ঈশ্বরই যোগীদিগের এক মাত্র লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য।

আমরা যোগ শাস্ত্রকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। হটযোগ ও রাজযোগ। হট- আবার দুই প্রণালীতে সাধিত হইয়া থাকে, তান্ত্রিক ও অতান্ত্রিক। বৌদ্ধ যোগীরাও তান্ত্রিক শাখার হটযোগাবলম্বী। রাজযোগের শাখা প্রশাখা নাই। যাঁহারা রাজযোগ করেন, তাঁহাদের প্রত্যেক বিষয়ই জ্ঞান ধর্ম্ম ও নীতির অনুমোদিত। তবে বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি ধর্ম্ম পিপাসু লোক এক প্রকার যোগ সাধনাতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাঁহারা হটযোগী কি রাজযোগী, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। তাঁহারা বলেন, আমরা রাজযোগী, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের সাধন প্রণালী যে প্রকার গোপনীয় ভাবে রক্ষা করেন, তাহাতে এই মাত্র বুঝা যায় যে, ইহাঁরা যে প্রকার যোগীই হউন, এই শ্রেণীর যোগীরা আর্য্য রাজযোগের সহিত তত সংশ্রব রাখেন না; কারণ আর্য্য রাজযোগ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। কিন্তু তাঁহাদের যোগ প্রণালী অতি গোপনীয়। সে যাহা হউক, এখন আমরা ক্রমে হটযোগ ও রাজযোগের বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

বর্ষায় নদ নদী খাল নালা জলপূর্ণ হইয়াছে। বর্ষা এখন আর নাই, আকাশে জল ভরা ধূম্র মেঘ আর হুড় হুড় হুড় হুড় করিয়া ডাকিতেছে না; মেঘ একেবারে নাই অথবা যে গুলি আছে তাহারাও "তোয়াবশেষেণ হিমাভং"; এখন শরৎ কাল। কিন্তু নদী খাল প্রভৃতি সেই রূপ জলপূর্ণই আছে। দেশে বিদেশে চলা ফেরার এমন সুবিধা বাঙ্গালা ভূমে আর শীঘ্র হইবে না। কুলবধুরা পিত্রালয়ে যাইতেছেন; আত্মীয়তা কুটুম্বিতা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে উৎসব। আমি অন্য উৎসবের কথা ভাবিতেছিনা, কেবল এই পারিবারিক আনন্দ, এই পারিবারিক উৎসবের কথা বলিতেছি। আজ ছিন্ন বস্ত্র ছাড়িয়া যাহার যেমন সাধ্য সে সেই রূপ নূতন বাস পরিধান করিয়াছে। কিন্তু সুখের দিন ত বসিয়া থাকে না। মেয়েরা কেহবা পিত্রালয়ে, কেহবা শ্বশুরালয়ে আবার এখন ফিরিয়া যাইবে, পুরুষেরা অনেকেই কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য অতি দূরদেশে চলিয়া যাইবে; সকল উৎসব ফুরাইয়াছে, অমাবস্যাও গিয়াছে; আজি বিদায়ের দিন। এখন ছাড়াছাড়ি, বিদায়, —কাহাদিগের সঙ্গে অধিক? অনেক স্ত্রী, অনেক মাতা, পতি, পুত্র প্রভৃতির সঙ্গে হয়ত পতি বা পুত্রের কার্য্যস্থলেই যাইবেন; কাজেই এসময়ে ভ্রাতা ভগ্নীর বিচ্ছেদই সর্ব্বাধিক কষ্টপ্রদ। ভাই ভগ্নীকে ছাড়িবেন, ভগ্নী ভাইকে ছাড়িবেন, একবৎসরের জন্য, অথবা কে জানে কতদিনের জন্য কত কালের জন্য! তাই আজি বাঙ্গালির ঘরে ঘরে একটী

বিদায়ের উৎসব ; এ উৎসবের নাম ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া। ভাই বোনের সম্বন্ধ, এত মধুর, এত পবিত্র, এত উন্নত, অন্য কোন জাতির মধ্যে লক্ষিত হয় না, তাই অন্য কোন জাতি এ উৎসবের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেনা। তাই অন্য কোন জাতির মধ্যে এ উৎসব নাই। কেবল সহোদরা ভগ্নীকে গণনায় না আনিলে দেখা যাইবে যে, সকল জাতির মধ্যেই ভাই ভগ্নীতে বিবাহ চলে। কিন্তু হিন্দুজাতি এচিন্তা মনেও স্থান দিতে পারে না। ইউরোপে সামাজিক বিজ্ঞানের বড় প্রাদুর্ভাব, সেখানে অন্তত, সেই মতাবলম্বীদিগের মধ্যে সহোদরা ভগ্নী পর্য্যন্ত ভ্রাতার অপবিত্র দৃষ্টির বহির্ভাগে নয়। এই রাক্ষসী ভাবে হিন্দু জাতির হৃদয় চিরদিন কাঁপিয়াছে; এবং ইচ্ছা করি চিরদিনই যেন কাঁপে। এই পবিত্র ভাবের গূঢ়মর্ম্ম হিন্দুব্যতীত কেহ জানে না। তুমি মুসলমান, তুমি ইংরাজ তুমি ইউরোপীয়, তুমি আসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী, আজি লজ্জাপরিত্যাগ কর ; যাহা সৎ তাহা পরের নিকট হইতে শিক্ষা করায় লজ্জা কি? তোমরা সকলে হিন্দুর কাছে এই পবিত্র ভাব অবনত মস্তকে শিক্ষাকর। তোমাদের যাহা ভাল তাহা আমরাও তোমাদের চরণতলে বসিয়া শিখিতেছি, এবং শিখিব। মাতাকে পূজা, স্ত্রীকে আদর, কন্যাকে স্নেহ, ইহা হিন্দু বৎসর ভরিয়া করিয়া থাকে, কিন্তু আজি ভাই ভগ্নী পরস্পরকে পূজা করিবেন, আদর করিবেন, প্রাণে প্রাণে বাঁধন দিবেন। ইহার ফল অক্ষয় স্বর্গ, অনন্ত সুখ, অনন্ত পবিত্রতা। বহুকাল পরে, অনেক সভ্যতার ও উন্নতির-ছড়াছড়ির পরে, কাম্‌তে কমৎ এসত্যের আংশিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন ; তিনি যে পূর্ণ ভাবে করেন নাই, তাহার পরিচয় ঈশ্বরপূজা ত্যাগে। যাক্ সে কথা এখানে হইবে না। ভগ্নী কি বলিয়া ভাইকে ফোঁটা দিয়া থাকেন,—জান? "ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যম দুয়ারে পোলো কাঁটা"। এই পবিত্র উৎসবে এই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতেও ইহার অনুরূপ শ্লোক আছে, কিন্তু আজি কেহ পুরোহিত ডাকে না, সংস্কৃত পড়েনা, প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথা কয়। প্রেমের কাছে হৃদয়ের স্বাভাবিক ভাবের কাছে, পুরোহিত, পৌত্তলিকতা এগুলি কি থাকা সম্ভব? তাই আজি ভগ্নী ভ্রাতার কপালে ফোঁটা দিতেছেন—আর বলিতেছেন ; "ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যম দুয়ারে পোলো কাঁটা।" এ মন্ত্রের অতি গভীর অর্থ, অতি পবিত্র অর্থ। মানুষ মৃত্যুভয় ভোলে কখন—জান? যখন এই চরাচর বিশ্ব, হৃদয়ের সহিত প্রেমে বাঁধা পড়ে। এই বিশ্বে, এ বিশ্বের পরপারে সেস্থানে সেস্থানে, স্বর্গে নরকে, যেখানে যে আছে সকলি যখন প্রেমে বাঁধা পড়িল, তখন মরিয়া যেখানে যাইব সেওত প্রেমের রাজ্য! কাজেই মৃত্যুভয় দূর হয়। এই জন্যে ভায়ের কপালে ফোঁটা দিলে "যম দুয়ারে" সত্য সত্যই কাঁটা পড়ে। এখন একটী কথা লইয়া অপ্রেমিক লোকে তর্ক করিতে পারেন ; তিনি বলিতে পারেন ; ভাই ভগ্নী পবিত্র ভাবে বদ্ধ হইল ; কিন্তু সেই পবিত্র ভাবের ডোরে জগৎ বদ্ধ হইল, এ কোন্ ন্যায়? ইহাতে ন্যায় আছে। তুমি যদি প্রকৃত প্রাণে এক জনকেও ভাই বলিয়া বুকে লইতে পার, এক জনকেও ভগ্নী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পার, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, জগৎ শুদ্ধ লোক, জগৎ শুদ্ধ জীবজন্তু তোমার

ভাই ভগ্নী হইয়া গিয়াছে। ললিত, লীলাবতীকে আজি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া বলিতেছেন, নীল বর্ণের চসমা চোকে পরিলে যেমন সকল পদার্থ নীল বর্ণে রঞ্জিত দেখায়, আজি প্রেমে ডুবিয়া জগৎকে তেমন প্রেমময় বোধ হইতেছে। এখন বোধ হয়, একথা বুঝিতে আর কষ্ট হইতেছে না যে, ভাই ভগ্নী পরস্পরকে ভালবাসিয়া জগৎকে ভাই ভাই বলিয়া ভাবে; যম দুয়ারে সত্য সত্যই কাঁটাপড়ে। আপত্তির আরও এক কথা উঠিতে পারে। কেহ বলিতে পারেন, এত প্রাণের কথা। উৎসব করিলেই ত সব হয়, তবে আবার একটা ফোঁটা দেওয়া কেন? তাঁহাদিগকে বলি, এ ফোঁটা দিবার আর এক উদ্দেশ্য আছে; আমরা এখন বড় হইয়াছি, এখন আর ভাই ভগ্নীতে মিলিয়া খেলা করি না; কিন্তু এক দিন করিতাম। সে বাল্যকালে। সে কাল আর নাই। এখন যদি ভগ্নী একটী ফোঁটা দিতে আসেন, তবে আবার সেই বাল্যকাল মনে পড়ে। সেই সুখের দিন, সেই সংসার অনভিজ্ঞতার সময়, সেই পবিত্র যুগ স্মৃতিপটে আসিয়া উদিত হয়। ইহাতে অনেক সুখ আছে। কত লোকে আজি শুষ্ক হৃদয় হইয়া সংসারের আঘাতে ব্যথিত হইয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে "Ah happy years, once more who would not be a boy" বাল্যকালে যে কোকিল ডাকিয়া মন ভুলাইয়াছিল, সেই কোকিল বুড়া বয়সের কাণের কাছে আবার যাই ডাকিয়াছিল, অমনি কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ বাল্যচিন্তায় ভোর হইয়াছিলেন। এই ফোঁটা দিবার সময় আমরাও বাল্য চিন্তায় ভোর হই, সেই সুখময় স্মৃতি আমাদের হৃদয়কে আনন্দিত করে; তাই এই পদ্ধতি। এ উৎসবে সমগ্র হিন্দু জাতি মাতিয়া উঠে, পৌত্তলিক হউক, ব্রাহ্ম হউক, সকল হিন্দুই মাতে; সকলি পবিত্র হয়, সকলি অখণ্ড স্বর্গীয়সুখ লাভ করে। বাঙ্গালীর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পবিত্র ভাব জগৎ ভরিয়া একদিন অনুকারিত হইবে। এক দিন সকলেই এই পবিত্র সম্বন্ধের পবিত্র ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। কিন্তু জড়প্রাণ ইংরাজের এখনও ঢের দেরী।

শঙ্করাচার্য্য।

শঙ্কর-শিষ্যগণের জন্ম।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবতারত্ব কেবল সাধুদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের প্রচলিত প্রণালী মাত্র। বাস্তব ঘটনা বলিয়া ইহাতে বিশ্বাস করা যেরূপ অলীক, কুসংস্কার বলিয়া অবতারত্বে আপত্তি করাও সেইরূপ ভ্রমাত্মক। আমরা শঙ্কর চরিত্রের এই অংশ পরিত্যাগ করিতে পারিতাম, কিন্তু যখন ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব লিখকগণ তাহা করেন নাই, আমরাও গল্প যেরূপ চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হইতেছিনা; বিশেষতঃ তাহা হইলে ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষাকরা কঠিন হইবে। আমরাও

শঙ্কর এবং তৎশিষ্যগণকে দেবাবতার বলিয়াই উল্লেখ করিতেছি।

এদিকে অপরাপর দেবগণ সাধু পণ্ডিতদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণু বিমলনামে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিলেন, সংসারে তাহার নাম পদ্মপাত হইল। তাহার অপর নাম সনন্দন। পবন প্রভাকর নামে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিলেন, সংসারে তাহার নাম হস্তামলক হইল। আবার পবনদেবেরই অন্যাংশ তোটক নামে অবতীর্ণ হইল। নন্দী ভূতলে জন্ম ধারণ করিয়া উদঙ্ক নামে পরিচিত হইলেন। ব্রহ্মা সুরেশ্বর নামে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহারই নামান্তর 'মণ্ডনমিশ্র বা বিশ্বরূপ হইল। বৃহস্পতি আনন্দগিরি নামে এবং বরুণ দেব চিৎ-সুখ অথবা চিদ্‌বিলাস নামে জন্ম গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, বৃহস্পতি চার্ব্বাকদর্শন প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ব্রহ্মার শাপে মণ্ডন নামে, এবং নন্দী শিবের আদেশে আনন্দগিরি হইয়া জন্ম ধারণ করেন। সরস্বতীদেবীও সেই সময়ে উভয়ভারতী হইয়া জন্মিয়াছিলেন। এইরূপে অপরাপর দেবগণও ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। তবে বুঝি দেবলোক কিছুদিনের জন্য দেবশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়া রহিল! বিদ্যালয়ের শীত বা গ্রীষ্মাবকাশের ন্যায় বুঝি দেবগণ সৃষ্টি ও পালন কার্য্য হইতে কিছু দিনের অবকাশ গ্রহণ করিলেন। ফলতঃ অবতারত্বের মূলে এই মাত্র বৈজ্ঞানিক সত্য রহিয়াছে যে, কি সাধু কি অসাধু, যাহা কিছু শক্তি সকলই ঈশ্বরের; এতদ্ভিন্ন অর্থে ইহা কেবল বাক্যাড়ম্বর মাত্র। শাস্ত্রকারগণ এই অর্থেই বেদবিরোধী বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অবতার এবং ধর্ম্ম নিন্দুক দেহাত্মবাদী চার্ব্বাককে বৃহস্পতির অবতার বলিয়া উল্লেখ করেন।

বলিতে পার, যদি তাহাই হইবে, তবে সকলের মধ্যেই ত এক ঐশী শক্তিই কার্য্য করিতেছে, তোমায় আমায় কেন অবতার বলা যায় না? যদিও আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যাহার বল নাই, তথাপি সকলকে বলবান্ বলা যায় না। সেইরূপ যাহাদের মধ্যে এই ঐশী শক্তি অসাধারণ ভাবে কার্য্য করে, তাহাদিগকেই অবতার বলা যায়। শাস্ত্রে অবতার সম্বন্ধে একই আখ্যায়িকা অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। তাহাতেই প্রমাণ হয়, লিখকগণ গল্পচ্ছলেই এইরূপ বলিতেছেন, ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করেন না। সরস্বতীর অবতারের গল্প মাধবাচার্য্য যেরূপ দিতেছেন, হর্ষচরিতেও প্রায় অবিকল সেইরূপ। সেই একই গল্প যাঁহারই যখন প্রয়োজন হইয়াছে তিনিই তখন অবাধে ব্যবহার করিয়াছেন। গল্পটী এই—পুরাকালে ঋষিগণ ব্রহ্মার নিকট বেদ পাঠ করিতে ছিলেন। রাগীলোকের মুখে প্রায়ই কথা ঠেকে। কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসার মুখে পড়িবার সময় কথা ঠেকিয়াছিল, তরলমতি সরস্বতী শুনিয়া আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দুর্ব্বাসা দেখিতে পাইয়া ক্রোধে অধীর হইলেন, নেত্রদ্বয় অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। ভ্রূকুটি সহকারে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন "হে দুর্ব্বিনয়ে, তুমি যাইয়া ভূতলে জন্ম-গ্রহণ কর।" শাপগ্রস্ত হইয়া সরস্বতী ভয়ে জড়সড় হইলেন। দুর্ব্বাসার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন—অপরাপর মুনিগণ ও সরস্বতীর কাতরতা দেখিয়া স্নেহবশে দুর্ব্বাসাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন—

"হে ভগবন্, তাঁহার অপরাধ ক্ষমা কর, পিতা কি সন্তানের অপরাধ গ্রাহ্য করে।" ঋষি প্রসন্ন হইয়া সরস্বতীর শাপ মোচনের সময় অবধারণ করিয়া দিলেন; "মর্ত্ত্যলোকে শঙ্করের সঙ্গে তোমার সমাগম হইলে পর, তুমি পুনরায় দেবলোকে ফিরিয়া আসিবে।" হর্ষচরিতেও গল্পটি প্রায় অবিকল এইরূপ। অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসা সামগান করিতে করিতে মন্দপাল ঋষির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহাতে এক স্থানে বাক্যস্খলন হইয়াছিল, শুনিয়া সরস্বতী উপহাস করিলেন, দেখিবামাত্র দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ করিলেন যে, তিনি যাইয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্ম-গ্রহণ করেন, এবং একটি সন্তান হওয়ার কাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। উভয় আখ্যায়িকা কোন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে, অথবা মাধবাচার্য্য হর্ষ-চরিত হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, কেবল প্রয়োজন ভেদে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। যাহা হউক, সরস্বতী শোনতীরে বিষ্ণুমিত্র নামে ব্রাহ্মণের কন্যা হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম উভয়ভারতী হইল। তাঁহার গুণ ও জ্ঞানের সীমা রহিল না। বিদ্যা সকল যেন স্ব স্ব বাস-ভূমির ন্যায় স্বভাবতঃই তাঁহাকে আশ্রয় করিল। অথবা বিধাতা যাহার জীবনে যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, কে তাহা পরিহার করিতে সক্ষম? সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, ও বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র সকল, বেদচতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ্ প্রভৃতি বেদাঙ্গ, এবং সমস্ত কাব্য শাস্ত্র তাঁহার আয়ত্ত হইল। তাঁহার এই রূপ অলোক-সামান্য বিদ্যাবত্তা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। এ দিকে ব্রহ্মা ও বিশ্বরূপ নামে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অপর দুই নাম মণ্ডনমিশ্র ও সুরেশ্বর। বিশ্বরূপ বিখ্যাত পণ্ডিত ভট্টপাদের প্রধান শিষ্য, তাঁহার ও শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি।

ক্রমশঃ—

নবলীলা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শান্তিময়ী না গরলময়ী?

সেই দিন রাত্রে সুলোচনা ও কুল-কামিনী শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু সুলোচনার চক্ষে নিদ্রা নাই—ভাল মন্দ কত কি চিন্তা মনের ভিতরে আগুন জ্বালিয়া দিতেছিল। সুলোচনা ভাবিতেছিলেন—আমাদিগের পরিণাম—আর কত দিন এখানে থাকিব—পরে কোথায় যাইব—পরে কি দশা হইবে! মানুষ ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিণামের কি ঠিক করিতে পারে? মানুষ পারে কি না পারে, জানি না। সুলোচনা পারিলেন না—মন ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইল, ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল, নিদ্রাকর্ষণের জন্য

চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পোড়া নিদ্রা আজ অসময়ে সুলোচনার চক্ষে বসিল না। অবশেষে সুলোচনা বিরক্ত হইলেন, —অবশেষে সুলোচনা উঠিয়া বাতি জ্বালিয়া পড়িতে লাগিলেন। কুলকামিনী তখন অচেতন ছিলেন, এ সকল কিছুই জানিতে পারেন নাই। রাত্রি অধিক হইল, মনুষ্য জগৎ নীরব, নিস্তব্ধ,—নিদ্রার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়াছে; সুলোচনা তখনও পড়িতেছেন। পুস্তক পড়িতেছেন? তাহা নহে—পূর্ব্বেও যাহা, এখনও তাহাই পড়িতেছেন—আপনার পরিণাম—দিদির পরিণাম। এই প্রকার ভাবিতেছেন—এমন সময়ে সহসা সেই কক্ষে বিকটাকৃতি একজন মনুষ্য উপস্থিত হইল। দেখিয়াই মনুষ্যকে চিনিলেন—সেই রজনীর একজন নৃশংস। সুলোচনা ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, চিৎকারের পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হইলেন। কুলকামিনী চিৎকার শুনিয়াই উঠিলেন। বিনোদ বাবুও চিৎকার শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহে প্রবেশ করিতে করিতেই সেই নৃশংস অন্য দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। বিনোদ বাবু লোকের পশ্চাৎবর্ত্তী না হইয়া সুলোচনার মস্তকে তৈল জল দিতে লাগিলেন, কুলকামিনী বাতাস দিতে লাগিলেন। বিনোদ বাবু আজ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, বাড়ীর ভিতরে কি প্রকারে বাহিরের লোক প্রবেশ করিল, এই চিন্তায় মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইল।

চিন্তার ফল ভাল হইল না—মন সন্দেহে পূর্ণ হইল,—বুঝিলেন, বাড়ীর কেহ হয়ত দরজা খুলিয়া দিয়াছে। কেন দরজা খুলিয়া দিয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী শান্তময়ী গৃহের বাহিরে গিয়াছিলেন,—তাঁহার প্রতিই সন্দেহ হইল। কুলকামিনীর কথা তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল—শান্তময়ীর প্রতি অত্যন্ত সন্দেহ হইল, তিনি অধিকক্ষণ সুলোচনার নিকটে থাকিতে পারিলেন না—ত্রস্ত হইয়া সদর দরজার নিকটে গেলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন, দরজা বন্ধ। তৎপরে খিড়কির দরজার নিকটে গেলেন। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে শরীর শিহরিয়া উঠিল,—দেখিলেন, শান্তময়ী ও আনন্দময়ী একটী পুরুষের সহিত নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছেন;—এই সময়ে এ দিকে কেহ আসিবে তাহা ইহারা ভাবে নাই, নির্ভয়ে কথা বলিতেছেন। বিনোদ বাবুকে দেখিয়াই তিন দিকে তিন জন বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিল, কাহাকেও ধরিতে পারিলেন না। বিনোদ বাবু বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িলেন, বাড়ীর ভিতরে আর কোন লোক আছে কি না, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন, না গৃহে যাইয়া শান্তময়ীকে ধরিবেন? এক জনের দ্বারা দুই দিক রক্ষা পাইল না,—অন্য কাহাকে ডাকিলেন না,—গোলমাল হইবে, পাড়ার লোকেরা জানিবে, এই আশঙ্কায় অন্য কাহাকেও ডাকিলেন না,—বাড়ীর আর কোন স্থান অনুসন্ধান করিবার জন্যও ব্যস্ত হইলেন না; ব্যস্ত হইয়া আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। বিনোদ বাবু মনে ভাবিয়াছিলেন, 'গৃহে যাইয়া দেখিবেন, শান্তময়ী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন, ভয়ে জড়সড় হইয়াছেন। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে দেখিলেন, তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। বিনোদবাবু মনে ভাবিলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?—না, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে; ইহা মনে ভাবিয়া

তৎক্ষণাৎ শান্তময়ীকে ধীর স্বরে ডাকিলেন। শান্তময়ী স্বামীর ডাক শুনিলে অন্যদিনও যে প্রকার ভাবে উঠিতেন, অদ্যও ঠিক সেই ভাবে উঠিলেন,—উঠিয়া ঠিক অন্যান্য দিনের ন্যায় বলিলেন "কি চাই ?" বিনোদ বাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল, সকলি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, বিস্ময়ে বলিলেন, তুমি কতক্ষণ পূর্ব্বে গৃহে আসিয়াছ ?

শান্তময়ী বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, তুমি কি স্বপ্ন দেখিতেছ ? আমি কোথা থেকে ঘরে আস্‌ব ?

বিনোদ বাবু ক্রোধ স্বরে বলিলেন, কোথা থেকে ? তা তুমি যেন কিছুই জান না ?—শীঘ্র বল।

শান্তময়ী যেন আকাশ হইতে নামিলেন, বলিলেন, ওমা তুমি বল্‌ছ কি, ক্ষেপেছ নাকি ? তুমি কোথা থেকে ক্ষেপে এসেছ—মাতাল হয়েছ নাকি ?

বিনোদ বাবু একটু নত হইলেন—বলিলেন, এ বেশ কথা, উল্টা চাপ, এ বেশ চালাকি শিখেছ, দাঁড়াও আমি আস্‌ছি " এই বলিয়া বিনোদ বাবু সুলোচনাদের গৃহের দিক চলিলেন, ভাবিলেন, এতক্ষণ সেখানে না যাইয়া ভাল করি নাই। শান্তময়ী বিনোদ বাবুকে গমনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, এস, যেওনা যেওনা, কথা আছে।

বিনোদ বাবু স্ত্রীর প্রতি সন্দেহযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না, যদি শান্তময়ী নির্দ্দোষী হয়, তবে কেন অকারণ তাহার মনে কষ্ট দি, ইহা মনে করিয়া অপর গৃহে প্রবেশ করিলেন। শান্তময়ী এবার ভাল ভাবে বলিলেন, কি হয়েছে, বলত ?

বিনোদ বাবু বলিলেন, কি হয়েছে, আমি বল্‌ব ? না তুমি বল্‌বে ?

শান্তময়ী বলিলেন, আচ্ছা বল কি জান্‌তে চাও ?

বিনোদবাবু।—তোমার কি কথা আছে বল ?

শান্তময়ী। একটী প্রতিজ্ঞা কর, পরে বল্‌ছি।

বিনোদ বাবু।—কি প্রতিজ্ঞা বল।

শান্তময়ী।—প্রাণান্তেও এ কথা কাহাকে বলিবে না।

বিনোদ বাবু—আচ্ছা বল্‌ব না।

শান্তময়ী,—আজ বৈকালে দিদির হাতের লেখা এক খানি কাগজ পেয়েছি—তাহা তোমাকে দেখাইতেছি। এই বলিয়া কাগজ খানি বিনোদ বাবুর হাতে দিলেন। বিনোদ বাবু কাগজ খানি দেখিয়া অবাক হইলেন, বলিলেন, এ কাগজ তুমি কোথায় পাইলে ?

শান্তময়ী।—দিদির বালিসের নীচে।

বিনোদ বাবু।—এর পূর্ব্বে আমাকে দেখাও নাই কেন ?

শান্তময়ী—কিসের পূর্ব্বে!

বিনোদ বাবু।—বাড়ীতে লোক প্রবেশের পূর্ব্বে—সন্ধ্যার সময়ে।

শান্তময়ী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, লোক আসিয়াছে, ওমা সে কি ?

বিনোদবাবু সকল কথা বলিলেন। তাঁহার মনের সন্দেহের ভাব একটু কমিয়া আসিল, বলিলেন, সন্ধ্যার সময় দেখাও নাই কেন ?

শান্তময়ী—সময় পাই নাই। এই বলিয়া শান্তময়ী বলিলেন, চল আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, বাড়ীতে লোক ঢুকিয়াছে, অথচ তুমি নিশ্চিন্ত মনে এখানে আছ, এখনই চল।

বিনোদ বাবু বলিলেন, আমি নিশ্চিন্ত নাই, এই জন্যই যাইতেছিলাম, তুমি ডাকিলে, তাই আসিলাম।

এই বলিয়া বিনোদ বাবু অগ্রে অগ্রে চলিলেন। এবার দাদাকে ডাকিলেন, বাড়ীর আর সকলকে ডাকিলেন, মনের সন্দেহ একটু ঘুচিয়াছে—বড়ীর সকলকে ডাকিলেন। সকলে মিলিয়া সুলোচনাদের ঘরে যাইয়া দেখিলেন, সে ঘরে কেহই নাই; এক জন মাত্র পুরুষের শরীর আহত অবস্থায় মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিয়াছে; আর গৃহে কেহই নাই,—সুলোচনা নাই, কুলকামিনী নাই। বিনোদ বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সকলে অবাক হইয়া এদিক ওদিক অনুসন্ধানে ছুটিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গৃহ সুখে বিষ!

পরে যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিল। সেই রাত্রেই সহৃদয়তাকে বুকে বাঁধিয়া বিনোদ বাবু জননীর নিকটে গেলেন—যাইয়া সকল ভাঙ্গিয়া বলিলেন। শুনিয়া অনন্ত দেবীর গম্ভীর মূর্ত্তি একটু চঞ্চল হইল—শান্ত ভাবে একটু উৎকণ্ঠ মিশিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নির্ভীক চিত্তে বলিলেন,—যা হয়েছে তা ত শুনিলাম, এক্ষণে কি চাও?

বিনোদ বাবু বলিলেন, আপনার অনুমতি চাই।

অনন্তদেবী—কি অনুমতি চাও?

বিনোদ বাবু—আমাদের বাড়ীতে এই প্রকার ঘটনা ঘটিল, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না; প্রথম অনুমতি শত্রু নিপাতের—দ্বিতীয় অনুমতি আমার গৃহ পরিত্যাগের। আমি একবার এই অনাথাদিগের জন্য জীবন ভাসাইব; কিন্তু আপনার অনুমতি ভিন্ন এক পা অগ্রসর হইতে পারি না। আপনার প্রসন্ন মুখের প্রসন্ন অনুমতি পাইয়া নির্ভীক হৃদয়ে গৃহ হইতে বাহির হইতে চাই।

অনন্তদেবী বলিলেন—বিনোদ, তুমি মূর্খ, সৎকার্য্য করিবার সময় আবার অনুমতির আবশ্যক কি? আমি কি কখনও কোন ভাল কার্য্য করিবার সময় তোমাদিগকে বাধা দিয়াছি? অনাথাদিগকে আমি আর পর ভাবি না, উহারা আমার প্রাণের বস্তু—উহাদিগকে তোমাদিগের সহোদরের ন্যায় মনে করি। ভগ্নী যখন গৃহের বাহিরে, তখন যে ভাই নিশ্চিন্ত মনে গৃহে থাকে, সে পাষণ্ড। শত্রু দমন পরের কথা—তুমি অগ্রে যাইয়া সুলোচনা ও কুলকামিনীকে উদ্ধার কর। যদি উদ্ধার করিতে না পার—তবে আর গৃহে ফিরিও না—ভগ্নী শূন্য গৃহে আর ফিরিও না।

অনন্তদেবীর প্রশস্ত হৃদয়ের গম্ভীর অথচ মধুময় বাক্য কয়েকটী বিনোদ বাবুর হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলিল; তখনি জননীর চরণে প্রণিপাত করিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া সুরেশ বাবুর নিকটে আসিলেন। সুরেশচন্দ্র বলিলেন, আমি বাড়ী থাকিয়া শত্রুদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করি, তুমি ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে যাও। আমার মনে হয়, পাষণ্ডেরা ইহাদিগকে দূরে লইয়া গিয়াছে। বিনোদ বাবু দাদার নিকট বিদায় লইয়া শান্তময়ীর নিকটে আসিলেন। শান্তময়ী তখন নিশ্চিন্ত মনে ছিলেন; কণ্টক পরিস্কৃত হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ছিলেন, সহসা বিনোদকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—এ বেশে কোথায় যাইতেছ?

বিনোদ বাবু—আমার প্রাণ আজ অস্থির হয়েছে—তুমি তা কি বুঝিবে? আমি এক্ষণই সুলোচনাদের উদ্দেশে গৃহ পরিত্যাগ করিব।

শান্তময়ীর হৃদয় চঞ্চল হইল, বলিলেন, তুমি একাকী যাইবে? তাহারা কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা কেমনে জানিবে? তুমি যে'ও না।

বিনোদ বাবু বলিলেন, তোমার মুখে এর চেয়ে আর অধিক উৎসাহের কথা কি শুনিব,—তুমি স্বার্থের দাসী বইত নও! এতদিন পরে আজ জননীর আদেশে গৃহ পরিত্যাগ করিব—ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমাকে পুনঃ তোমার স্বার্থময় বন্ধনে জড়িত হইতে না হয়।

শান্তময়ী স্বামীর এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ক্রন্দন স্বরে বলিলেন—আমি জানি, আমি বুঝি, আমি তোমার উপযুক্ত ভার্য্যা নহি, কিন্তু কি করিব, তোমার মন যোগাইয়া চলিতে চেষ্টার ক্রটী কখনও করি নাই। দুঃখিনী, জ্ঞানহীনা অবলাকে পরিত্যাগ করে যে'ও না,—আমার সকল ক্রটী সংশোধন করিতে চেষ্টা করিব। আজ তুমি আমাকে ক্ষমা কর—আজ আমার কথা শুন।

বিনোদ বাবু আর কথা শুনিলেন না, অনেক সময় বৃথা যাইতেছে দেখিয়া তখনি গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বিনোদ বাবু বুঝিলেন, এ বড়ই বিষম সমস্যা, এ কণ্ঠক পরিষ্কার করা বড়ই কঠিন। দেখিতে দেখিতে শান্তময়ী বিনোদ বাবুর পাদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন,—বলিলেন, অপরাধ ক্ষমা কর—গৃহে ফের, যা হয়েছে তা হয়েছে, আর হবে না।

বিনোদ বাবু ক্রোধ স্বরে বলিলেন—কি হয়েছে, আর কি হবে না? আমি যখনি সৎকার্য্য করিতে যাই তখনি তুমি বাধা দেও; ধিক তোমার জীবনে! মনে করিও না, আমি তোমার স্বার্থময় কথায় ভুলে আজ কর্ত্তব্য পথ হতে বিরত হব। তুমি যদি আজ এই স্থানে প্রাণত্যাগ কর, তবুও আমি ফিরিব না। এই বলিয়া বিনোদ বাবু বলপূর্ব্বক শান্তময়ীর হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন, এবং দ্রুত পদনিক্ষেপ করিয়া চলিলেন। শান্তময়ী কতক্ষণ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু যখন বুঝিলেন, স্বামীকে ধরিতে পারা সহজ কথা নয়, এবং যখন জানিলেন তাহার রোদনের স্বর আজ স্বামীর কর্ণকুহর পর্য্যন্ত পৌছিতেছে না, তখন আস্তে আস্তে বিষণ্ণ মনে গৃহের দিকে ফিরিলেন। শান্তময়ী গৃহের দিকে ফিরিয়াছেন যখন বিনোদ বাবু বুঝিলেন, তখন পুনঃ গ্রামের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া সকল স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, আকাশের কেবল নক্ষত্র-মণ্ডলী জ্বলিতেছে,—নিম্নে সবই অন্ধকারে আচ্ছন্ন. বিনোদ বাবু এ বাড়ী ও বাড়ী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এ ঘরে ও ঘরে কানপাতিয়া কথা শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথায়ও কোন সাড়া শব্দ পাইলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটী কুকুর কেঁউ ডাকিয়া উঠিতে লাগিল; দুই একটা পেচক বা অন্য পক্ষীর স্বর শুনিলেন, আর কোন শব্দই কর্ণে প্রবেশ করিল না। গ্রামের সকল স্থান অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু কোথাও সন্ধান পাইলেন না। সুলোচনাদের অনুসন্ধানের জন্য পূর্ব্বে আর যে সকল লোক বাহির হইয়াছিল, তাহাদেরও কোন সন্ধান পাইলেন না। মনে ভাবিলেন, হৃদয়শূন্য অর্থের দাসদিগের

দ্বারা পৃথিবীর কোন সৎকার্য্য হয় না, তাহারা অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে সকলেই আপন আপন স্বার্থের পথে গিয়াছে। শান্তময়ীর ব্যবহার, ভৃত্যদিগের ব্যবহার, এই গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে বিনোদ বাবুর মনে এক অভূতপূর্ব্ব চিন্তার উদ্রেক করিল—"পৃথিবীর সকলই স্বার্থের দাস সকলেই স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত।" এই কথাটী ভাবিতে ভাবিতে বিনোদ বাবু পুনঃ গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। তখন রজনী প্রভাত হয় হয় হইয়াছে, এমন সময়ে বিনোদ বাবু গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন।

পাশ্চাত্য মায়াবাদ বা অভূত বাদ।

(Idealism)

৪। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়-বোধ ও সম্ভবনীয় ইন্দ্রিয়-বোধ।

আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক প্রস্তাবে আমরা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা এবং ইন্দ্রিয়-ঘটিত কতিপয় প্রাকৃতিক তত্ত্বের উল্লেখ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমাদের ইন্দ্রিয়-বিষয় সমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ (Sensations) মাত্র, মানসিক অবস্থা পরম্পরা মাত্র, জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া, মন-নিরপেক্ষ হইয়া থাকা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব; জ্ঞানের অস্তিত্বেই ইহাদের অস্তিত্ব, মনের অস্তিত্বেই ইহাদের অস্তিত্ব; যে কোন মন দ্বারা ইহারা অনুভূত হউক না কেন, জ্ঞাত হওয়াতেই ইহাদের অস্তিত্ব ("Their *esse* is percepi.") এই বিষয়ে আর অধিক বলিব না; পাঠক আমাদের প্রথম সংখ্যক প্রস্তাবের জড়বস্তু বর্ণনা স্মরণ করিয়া দেখুন, আমাদের বিগত প্রস্তাবদ্বয়ে ব্যাখ্যাত যুক্তির আলোকে তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন কি না।

সূক্ষ্মদর্শী ও বিশেষজ্ঞ পাঠক আমাদের বিগত প্রস্তাব দ্বয়ে একটি বিষয়ের অভাব লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন; আমরা বিস্তৃতির বিষয় কিছু বলি নাই। এই বিষয়টী এত গুরুতর, এই বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝাইতে হইলে এত বলা আবশ্যক যে, আমরা ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবের জন্য রাখা আবশ্যক বোধ করিতেছি; সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে সম্প্রতি কিছু বলিব না।

আমাদের বিগত প্রস্তাবের অঙ্গীকারানুসারে এখন আমরা ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্বন্ধীয় কয়েকটী আনুষঙ্গিক প্রশ্নের মীমাংসা করিব। এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা না করিলে পাঠক মায়াবাদের জড়তত্ত্ব সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবেন না।

প্রথম প্রশ্ন এই—আমাদের ইন্দ্রিয় বিষয় সমূহ যদি আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ মাত্রই হয়, মানসিক অবস্থা মাত্রই হয়, তবে তো আমাদের জ্ঞান হইতে, মন হইতে অন্তর্হিত হওয়া মাত্রই ইহারা অন্ততঃ আমাদের সম্বন্ধে বিনষ্ট হইয়া যায়; কেন না জ্ঞাত হওয়াতেই যখন ইহাদের অস্তিত্ব, তখন বলিতে হইবে জ্ঞাত না হওয়াতেই ইহাদের বিনাশ। অথচ আমরা বিশ্বাস করি ইন্দ্রিয়-

গ্রাহ্য বিষয় সমূহ আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের পরোক্ষেও—আমাদের জ্ঞাত না হইবার সময়েও—স্থায়ীরূপে বর্ত্তমান থাকে। এই বিশ্বাস কি অমূলক? যদি অমূলক না হয় তবে ইহার অর্থ কি? হেতু কি? পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, আমাদের প্রথম সংখ্যক প্রস্তাবে আমরা এই প্রশ্নের কতক উত্তর দিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম, আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সমূহ আমাদের অজ্ঞাতাবস্থায় পরমাত্মার সর্ব্বদর্শী জ্ঞানের বিষয়রূপে স্থায়ীভাব রূপে বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু এই উত্তরে বোধ হয় সকলে সন্তুষ্ট হইবেন না; কেহ কেহ হয়তঃ বলিবেন, ঈশ্বরাস্তিত্ব প্রমাণের পূর্ব্বে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া কোন প্রশ্নের মীমাংসা করা যুক্তিশাস্ত্র বিরুদ্ধ; অপর কেহ কেহ হয়তঃ বলিবেন, মানিলাম আমাদের অজ্ঞাতাবস্থায় ইন্দ্রিয় বিষয় সমূহ পরমাত্মার জ্ঞান বিষয়রূপে ভাবরূপে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু ইহাতে প্রশ্নের সম্যক মীমাংসা হইল না; ইহারা পরমাত্মার ভাব রূপে থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধে কি একেবারে বিনষ্ট হয়? আর যদি না হয় তবে কি অর্থে বর্ত্তমান থাকে। আমরা এই উভয় আপত্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া এই প্রশ্নের সম্যক উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমাদের মন কতক গুলি স্বাভাবিক অনতিক্রমনীয় নিয়মের অধীন; এই নিয়ম গুলির অস্তিত্ব এত প্রত্যক্ষ যে, কেহই তাহা অস্বীকার করিবেন না। আমাদের বর্ত্তমান প্রয়োজনের জন্য এই কয়েকটীর উল্লেখ আবশ্যক (১) মন স্বভাবতঃ কল্পনা ও আশার অধীন। কোন ইন্দ্রিয়-বিষয় প্রত্যক্ষ করিলে, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়বোধ অনুভব করিলে সেই ইন্দ্রিয় বোধের অবর্ত্তমানতাতে ও মন তাহা কল্পনা করিতে পারে এবং স্বভাবতঃই আশা করে আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী সংঘটিত হইলে সেই ইন্দ্রিয়বোধ পুনরায় অনুভূত হওয়া সম্ভব। পুনঃ পুনঃ আশা সফল হইলে এই আশা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়। (২) মন ভাবযোগের নিয়মাধীন। যে সকল ইন্দ্রিয়বোধ পরস্পর সদৃশ, অথবা যাহারা এক কালীন্ বা অব্যবহিত পূর্ব্বাপর সময়ে অনুভূত হইয়াছে, তাহারা একত্রে চিন্তাপথে উদিত হয়। (৩) ভাবযোগ সমূহ পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমশঃই দৃঢ়তর হইয়া উঠে। দুটি ইন্দ্রিয়-বিষয় যদি সর্ব্বদাই যুগপৎ প্রত্যক্ষীভূত এবং চিন্তিত হয়, কখনই বিযুক্তাবস্থায় প্রত্যক্ষীভূত বা চিন্তিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে এমন সুদৃঢ় ভাবযোগ নিবদ্ধ হইয়া যায় যে, এই বিষয়দ্বয়কে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া চিন্তা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কেবল তাহাই নহে; এই বিষয়দ্বয় বিযুক্তাবস্থায় থাকিতে পারে ইহা বিশ্বাস করাও প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে।* এই নিয়মের অশুভ ফলের মধ্যে অনেক লৌকিক সংস্কার এবং অনেক ভ্রান্ত দার্শনিক মত গণনীয়। এই বিষয় বিশেষ রূপে প্রদর্শন করার স্থানাভাব।

আমাদের ইন্দ্রিয়-ঘটিত অভিজ্ঞতার উপর এই সকল নিয়মের কি ফল হয় এখন দেখা যাক্। আমি বর্ণ, গন্ধ, শীতলতা, মসৃণতা, কোমলতা প্রভৃতি গুণ-যুক্ত একটী পুষ্প প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার অবস্থিতির

---

* See J. S. Mill's "Examination of Hamilton" Chap. XI. The Psychological theory of Belief in an external world.

স্থান হইতে অপসৃত হইলাম। এখন প্রশ্ন এই, আমার প্রত্যক্ষীকৃত পুষ্পটী আমার অনুপস্থিতিতেও বর্ত্তমান আছে কি না? মায়াবাদের মতে পুষ্পটীর অর্থ কি! মায়াবাদের মতে পুষ্পটী বর্ণ গন্ধ কোমলতা প্রভৃতি কতিপয় ইন্দ্রিয়বোধের সমষ্টি মাত্র, সুতরাং পুষ্পটী আমার জ্ঞান পথ হইতে অপসৃত হইল ইহার অর্থ এই যে, কতকগুলি ইন্দ্রিয়বোধ, কতকগুলি মানসিক অবস্থা আমার মন হইতে অন্তর্হিত হইল; সুতরাং যদি আমিই পুষ্পটীর এক-মাত্র জ্ঞাতা হই, তবে বলিতে হইবে, আমি যতক্ষণ ইহাকে পুনরায় প্রত্যক্ষ না করি ততক্ষণ প্রকৃতার্থে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। মায়াবাদকে ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, আধুনিক প্রকৃতবাদী দার্শনিকগণ—যাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহকে ইন্দ্রিয়বোধ-মাত্র বলিয়া স্বীকার করেন—তাঁহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ণাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের ইন্দ্রিয়াতীত কারণরূপী জড় পদার্থের বিষয় যাহাই হউক, এই সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর পক্ষে মন-বিচ্যুত হইয়া থাকা অসম্ভব। সুতরাং মায়াবাদী, প্রকৃতবাদী উভয় শ্রেণীর দার্শনিকই স্বীকার করিবেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বর্ণ কোমলতাদি ইন্দ্রিয়-বোধসমষ্টি যে পুষ্প, জ্ঞাতার অনুপস্থিতিতে তাহার প্রকৃতার্থে কোন অস্তিত্ব নাই। অথচ লৌকিক বিশ্বাস এই যে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধসমষ্টি-রূপ যে পুষ্প তাহা জ্ঞাতার অনুপস্থিতিতেও বর্ত্তমান থাকে। এই বিশ্বাস কি অমূলক? প্রকৃতার্থে এই বিশ্বাস যে অমূলক তাহা নিঃসন্দেহ। পুষ্পটী যদি মানসিক অবস্থা সমষ্টিই হইল, তবে কতকগুলি মানসিক অবস্থা অন্তর্হিত হইয়াছে অথচ সেই মানসিক অবস্থা সমূহই বর্ত্তমান আছে, এই পরস্পর বিরোধী বাক্যদ্বয় কিরূপে এককালীন্ সত্য হইবে? সুতরাং প্রকৃতার্থে এই বিশ্বাস অমূলক। কিন্তু এক অর্থে ইহা সত্য; সেই অর্থ এই,— পুষ্পটী প্রত্যক্ষ করিবার আনুষঙ্গিক ঘটনার পরিবর্ত্তন হওয়াতে পুষ্পটী অপ্রত্যক্ষ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার মন পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলীর প্রথম নিয়মের অধীন থাকাতে আমার বিশ্বাস আছে যে, আনুষঙ্গিক ঘটনা সমূহ পুনরায় সংঘটিত হইলেই পুষ্পটী পুনরায় প্রত্যক্ষীভূত হইবে—পুষ্প নামধেয় ইন্দ্রিয়বোধ সমষ্টি পুনরায় অনুভূত হইবে। উক্ত নিয়মানুসারে আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যে স্থানে আমি পুষ্প দর্শন রূপ চাক্ষুষ (Visual) ইন্দ্রিয় বোধ অনুভব করিয়াছিলাম, সেখানে উপস্থিতি এবং চক্ষুরুন্মিলন এই আনুষঙ্গিক ঘটনা কতিপয় সংঘটিত হইলেই সেই চাক্ষুষ ইন্দ্রিয়বোধ পুনরায় অনুভব করিব। আবার, সেই নিয়মানুসারেই জানি কোন বিশেষ দিকে হস্ত প্রসারণ এবং কোন বিশেষ প্রকারে অঙ্গুলি সঙ্কুচন প্রভৃতি কতিপয় আনুষঙ্গিক ঘটনা সংঘটিত হইলেই শীতলতা জ্ঞান নামক স্পর্শবোধ অনুভব করিব, এবং অঙ্গুলি সংযোগে ঈষৎ বলপ্রয়োগ নামক ঘটনা সংঘটিত হইলেই পুষ্পের কাঠিন্যজ্ঞান নামক মাংসপৈশিক (Muscular) ইন্দ্রিয়বোধ অনুভব করিব ইত্যাদি। (বলা বাহুল্য যে এই সকল আনুষঙ্গিক ঘটনা সমূহও মানসিক অবস্থা পরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে।) অতঃপর, পাঠক ইতিপূর্ব্বেই বুঝিয়া থাকিবেন, পুষ্পরূপ

ইন্দ্রিয়বোধ-সমষ্টির অঙ্গীভূত দর্শন, স্পর্শ কাঠিন্য-বোধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় বোধ সমূহ আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় নিয়মানুসারে পরস্পর এরূপ সংবদ্ধ হইয়া গিয়াছে যে, আমাকে সর্ব্বদাই ইহাদের বিষয় একত্র ভাবিতে হয়। সমকালীন অথবা অব্যবহিত পূর্ব্বাপর সময়ে অনুভূত বর্ণবোধ, স্পর্শবোধ ও কাঠিন্যবোধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বিষয় এককালীন্ আমার চিন্তা পথে উদিত হয়, এককালীন চিন্তাপথে উদিত হইয়া একটি বস্তু রূপে প্রতিভাত হয়। আমি যখন একটির বিষয় ভাবি তখন অপর কয়েকটীর ভাবনা যুগপৎ আমার মনে উদিত হয়। অতঃপর, তৃতীয় নিয়মের ফল এই হইয়াছে যে, এই সমষ্টিবদ্ধ ইন্দ্রিয়-বোধ সমূহের একটিকে যখন অনুভব করি, তখন অপর কয়েকটীকে বস্তুতঃ অনুভব করিবার পূর্ব্বেই অথবা বস্তুতঃ অনুভব না করিলেও ইহারা অনুকূল অবস্থা সংঘটনে অনুভূত হইবেই হইবে এই বিশ্বাস এত প্রত্যক্ষভাবে আমাদের মনোমধ্যে উদিত হয় যে, বিশ্বাসের পক্ষে ইহাদের বস্তুতঃ অনুভূত হওয়া না হওয়ার ফল সমান। পুষ্পটীর বর্ণ প্রত্যক্ষীভূত হইলেই ইহার শীতলতা কাঠিন্য প্রভৃতি বিশ্বাস পথে উদিত হয়; গন্ধও শীতলতা অনুভূত হইলেই অননুভূত বর্ণ ও কাঠিন্যবোধের স্থির সম্ভাবনা বা বিশ্বাস মনোমধ্যে উদিত হয় ইত্যাদি। ফলতঃ এই সকল ইন্দ্রিয়বোধ প্রতিনিয়তঃ একত্র অনুভূত হওয়াতে আমাদের মনের অবস্থা এরূপ হইয়া গিয়াছে যে, ইহারা পরস্পর হইতে বিযুক্তাবস্থায় থাকিতে পারে ইহা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে কার্য্যতঃ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণশূন্য বিস্তৃতি, বিস্তৃতিশূন্য বর্ণ, স্পর্শবোধশূন্য কাঠিন্য, কাঠিন্য কোমলতা শূন্য স্পর্শ বোধ, এই সমুদায় কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কার্য্যতঃ অসম্ভব।

এতক্ষণে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমার এক সময়ে প্রত্যক্ষীকৃত পুষ্পটী আমি এখন প্রত্যক্ষ করিতেছি না, অথচ ইহা এখন বর্ত্তমান আছে, এই বিশ্বাস কোন্ অর্থে সত্য আর কোন্ অর্থে অসত্য? প্রথমতঃ ইহা এই অর্থে সত্য নয় যে, আমার পূর্ব্বানুভূত পুষ্প নামধেয় ইন্দ্রিয়বোধ সমষ্টি আমার মন-বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; ইহার মতন অসঙ্গত কথা আর কি হইতে পারে? দ্বিতীয়তঃ ইহা এই অর্থেও সত্য নয় যে, সেই ইন্দ্রিয়বোধ সমষ্টি এখন বস্তুতঃ আমার মনোমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে; আমার মনোমধ্যে যাহা আছে তাহা সেই বোধ সমষ্টির স্মৃতি মাত্র, কল্পনা মাত্র। অপরতঃ এই বিশ্বাস এই অর্থে সত্য যে, সেই পূর্ব্বানুভূত পুষ্পনামধেয় ইন্দ্রিয়বোধ সমষ্টি অনুভূতির অনুকূল অবস্থা সংঘটনে পুনরায় অনুভূত হইবার নিত্য সম্ভাবনা রহিয়াছে। জীবনের অভিজ্ঞতা ও পূর্ব্বোক্ত নিয়মাবলী অনুসারে আমি জানি, সেই বোধ সমষ্টি ক্ষণিক এবং অনুভবের বিষয় নহে, যখনই আনুষঙ্গিক ঘটনা সমূহ সংঘটিত হইবে তখনই সেই বোধ সমষ্টি অনুভূত হইবে। সুতরাং সেই বোধ সমষ্টি অনুভূত হইবে। উহাদের প্রথমানুভূতির সময় হইতে এখন এক মুহূর্ত্তও গত হইতেছে না যখন অনুকূল অবস্থা সংঘটনে উহাদের পুনরানুভূতি সম্ভব নয়; উহাদের পুনরায় অনুভূত হওয়া নিত্যই সম্ভব। সুতরাং সেই বোধসমূহ এখন আমার

পক্ষে বাস্তবিক ইন্দ্রিয়বোধ (actual sensations) নহে বটে, কিন্তু উহারা যে এখন কিছুই নয় তাহাও নহে; এখন আমার পক্ষে উহারা নিত্য সম্ভবনীয় ইন্দ্রিয়বোধ (permanently possible sensations) অথবা জন ষ্টুয়ার্টমিলের নামাকরণানুসারে ('permanent possibilities of sensation") অতএব যদি মায়াবাদীকে জিজ্ঞাসা করা যায়. তোমার অননুভূত অবস্থায় ইন্দ্রিয়-বিষয় সমূহ বর্ত্তমান থাকে ইহা বিশ্বাস কর কিনা?—তিনি বলিবেন. হাঁ বিশ্বাস করি. এবং এই এই অর্থে করি,—প্রথমতঃ, উহারা তখন আমার সম্বন্ধে বাস্তবিক ইন্দ্রিয় বোধ রূপে বর্ত্তমান থাকে না বটে, কিন্তু নিত্য সম্ভবনীয় ইন্দ্রিয়বোধ রূপে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। দ্বিতীয়তঃ তখন উহারা আমার সম্বন্ধে বাস্তবিক ইন্দ্রিয় বোধ রূপে বর্ত্তমান থাকে না বটে, কিন্তু বাস্তবিক অনুভূতির অনুকূলাবস্থাপন্ন অপর অসংখ্য জীবাত্মার বাস্তবিক ইন্দ্রিয় বোধ রূপে বর্ত্তমান থাকে। এবং তৃতীয়তঃ (যদি মায়াবাদী আস্তিক হন তাহা হইলে বলিবেন) উহারা আমাদের উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি, সকল সময়েই উহাদের কারণ রূপী সর্ব্বদর্শী পরমাত্মার বাস্তবিক বোধ রূপে স্থায়ী—ভাবরূপে বর্ত্তমান থাকে।

অনন্ত আকাশে এমন অসংখ্য জড়বস্তু বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহারা আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞানের অতীত; সেই সমুদায় এখন আমাদের সম্বন্ধে কি? আমাদের সম্বন্ধে এখন সেই সমস্ত নিত্য সম্ভবনীয় ইন্দ্রিয়বোধ মাত্র; বাস্তবিক অনুভূতির অনুকূল ঘটনা সংঘটিত হইলেই উহারা আমাদের বাস্তবিক ইন্দ্রিয়বোধ রূপে অনুভূত হইবে। কিন্তু পরমাত্মার পক্ষে উহারা সর্ব্বদাই বাস্তবিক বোধ রূপে—সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাঁহার অনন্ত জ্ঞানেই উহাদিগের স্থায়ী অস্তিত্ব; তাঁহার নিয়ত কার্য্যশীল শক্তিতেই মানবাত্মার সমক্ষে ইহাদের আবির্ভাব। ক্রমশঃ পাঠকের সমক্ষে এই সকল বিষয়ের অলোচনা উপস্থিত করিব।

আমরা ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্বন্ধীয় একটী মাত্র আনুষঙ্গিক প্রশ্নের মীমাংসা করিলাম; আরো কয়েকটী প্রয়োজনীয় প্রশ্ন আছে, ক্রমে সমুদায়ের মীমাংসা করিব।

লোক সংখ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ফ্রান্স দেশীয় কোন তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের নিকট হইতে কত দিনে, কোন্ দেশে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার একটী তালিকা পাওয়া যায়। যথা,

তুরস্ক ৫৫৫, সুইজারল্যাণ্ড ২২৭, ফ্রান্স ১৩৮, স্পেইন ১০৬, হল্যাণ্ড ১০০, জর্ম্মাণ ৭৬, রুসিয়া ৪৩, ইংল্যাণ্ড ৪৩, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ২৫।

আমাদিগের দেশে কি নিয়মে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে একণে দেখা যাউক। কি নিয়মে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাহা স্থির করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে অধিবাসী সংখ্যার গণনা করা আবশ্যক। কিন্তু লোক সংখ্যা গণনা করিবার উত্তম কোন রীতি প্রচলিত হয় নাই বলিলেই হয়। ১৮৭২ ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে যে গণনা হইয়াছিল, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের যে গণনা হয়, তাহার উপর কথঞ্চিৎ নির্ভর করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের গণনা যে যথার্থ হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের বোধ হয় না। যাহা হউক, মোটের উপর ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে, দশ বৎসরে ১,২৭,৯১,২১০ জন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এই সংখ্যার উপর বিশ্বাস করিলে দেখা যায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে যে অধিবাসীর সংখ্যা ২৩, ৯ ৭৫,০,০০০ ছিল, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাহার সংখ্যা ২৫, ২৫,৪১,২১০ হইয়াছে এবং এই নিয়মে বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ১৮৭ বৎসরে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইবে। এত দীর্ঘকালের উপর আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কোন কোন পরিবার ও ক্ষুদ্র পল্লী লইয়া আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি যে, লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইতে ৫০ বৎসরের অধিক লাগে নাই। যদিও এই হিসাবে সমগ্র দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হউক, তথাপি এমন অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে, ইহার দ্বিগুণ সময়ে অর্থাৎ ১০০ বৎসরে সমগ্র দেশের লোক-সংখ্যা দ্বিগুণ হইতেছে। জন্ম অপেক্ষা একণে মৃত্যু সংখ্যা অধিক, এমন কি মৃত্যু সংখ্যা প্রায় জন্ম সংখ্যার দ্বিগুণ। তথাপি যদি ১০০ বৎসরে অধিবাসীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে কি এত বড় বিস্তীর্ণ দেশের পক্ষে সামান্য বৃদ্ধি হইল—১৮৭ বৎসরে দ্বিগুণ হইলেও কি সামান্য বলা যায়? আবার যদি মৃত্যু-সংখ্যা অধিক না হইয়া জন্ম সংখ্যা অধিক হইত এবং যে সংক্রামক পীড়া, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাবে একেবারে অতি অল্প সময়ে বহুতর লোক বিনষ্ট হয় তাহা নিবারিত হইত, তাহা হইলে যে ৫০ বৎসরের মধ্যেই লোক সংখ্যা দ্বিগুণ হইত, তাহাতে সংশয় কি? যাহা হউক, কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না পাইলেও আমাদিগের দেশে লোক সংখ্যা যে দিন দিন বিস্তর পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং আরও বলিতে হইবে যে, যে অনুপাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে সে অনুপাতে সেই লোক সংখ্যার আহার্য্য দ্রব্যের বৃদ্ধি হইতেছে না। এই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ও আহার্য্যের এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য হেতু কি অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, এবং হওয়া সম্ভব, তাহা এইবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।

যে সময়ে ও যে অনুপাতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে, প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে সেই সময়ে ও সেই অনুপাতে লোক সংখ্যা বাস্তবিক বৃদ্ধি হয় না। যদি উৎপাদিকা শক্তি পূর্ণ মাত্রায় পরিচালিত হইত তাহা হইলে বহুকাল পূর্ব্বে জগৎ লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত এবং দাঁড়াইবার তিলমাত্র স্থান থাকিত না। পৃথিবীও বহুকাল পূর্ব্বে তাহাদিগকে পালন করিতে অসমর্থ হইতেন। অষ্ট্রেলিয়াতে যে সময়ে ও যে অনুপাতে শশক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল, যদি অদ্যাপি সেই অনুপাতে বৃদ্ধি হইতে থাকিত, তাহা হইলে কি হইত, কে চিন্তা করিতে পারে?

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন না কোন প্রকার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া অতিরিক্ত সংখ্যাকে বিনাশ করে এবং অপর্য্যাপ্ত সংখ্যার উৎপাদনে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। বসুন্ধরাও যে পরিমাণে শস্যোৎপাদনে সক্ষম এবং সেই শস্যে যে পরিমাণ জীবের প্রাণ রক্ষা সম্ভব, তাহার অতিরিক্ত জীবকে বক্ষে ধারণ করেন না।

উদ্ভিজ্জগতে এই অন্তরায়ের হেতু নিরূপণ করা কঠিন ব্যাপার নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবী সীমাবিশিষ্ট কিন্তু উদ্ভিদের বৃদ্ধির সীমা নাই। উদ্ভিদ্গণের মৃত্তিকা, রস প্রভৃতি ব্যতিরেকে জন্ম ও বৃদ্ধির উপায় নাই, কিন্তু এই মৃত্তিকা ও রসের সীমা থাকিলে যে উদ্ভিদের সীমা নাই, তাহা কি প্রকারে তিষ্ঠিতে পারে? যদি অপর্য্যাপ্ত উদ্ভিদ জন্মে, অবশ্যই তাহারা জন্মিয়াই মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। বৃক্ষ হইতে যে অসংখ্য বীজ পতিত হইবে,তাহারা স্থানাভাবে মৃত্তিকা ও রসের অভাবে সকলে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ফল ধারণোপযোগী বৃক্ষে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই মরিয়া যাইবে। সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, বৃক্ষ ও ওষধি সকল ঘন হইলে সকলেই বাঁচে না এবং বাঁচিলেও প্রচুর ফল ও শস্য উৎপন্ন করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীতে বীজ ভক্ষণ করে, জন্তুগণ ছোট ছোট বৃক্ষ লতা ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করে এবং ফল ও শস্যই মনুষ্যের প্রধান জীবনাবলম্বন। ডারউইন ৩৫৭টী বীজ রোপণ করিয়া ২৯৫ টীকে মরিয়া যাইতে দেখিয়াছেন; তিনি আরও কোন বেষ্টিত রক্ষিত স্থানে বৃক্ষ হইতে পতিত বীজ হইতে এক বর্গ গজ পরিমিত ভূমিতে ৩২টী বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছেন, কিন্তু অরক্ষিত ভূমিতে একটীও বৃক্ষ দেখিতে পান নাই।

প্রাণী জগতেও উক্ত প্রকার অন্তরায়ের দ্বারা অতিরিক্ত প্রাণীর ধ্বংশ হইয়া থাকে। উৎপাদিকা শক্তির যথেচ্ছ পরিচালনা করিয়া প্রাণীগণ সন্তানোৎপাদন করে, কিন্তু লয়কারী অন্তরায়ের দ্বারা সামঞ্জস্য হইয়া যায়। পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, প্রাণীগণ অনেকে আপন সন্তানকে বিনষ্ট করে, এতদ্ভিন্ন সেই জাতীয় ও অন্যান্য প্রাণীও মনুষ্য কর্ত্তৃক নিহত হইয়া অতিরিক্ত সংখ্যার হ্রাস সাধন করে এবং প্রকৃতি যাহাদিগের অনুকূল তাহারাই কেবল মাত্র জীবিত থাকে; যাহারা এই সকল অন্তরায়কে অতিক্রম করিতে সমর্থ এবং বল প্রয়োগে বা পলায়ন দ্বারা ধ্বংশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, তাহারাই কেবল মাত্র জীবিত থাকে, আর অবশিষ্ট সকলে নিধন প্রাপ্ত হইয়া জগতে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করে।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীগণই জীবিত থাকিবার জন্য নিয়ত উদ্যমশীল ও প্রকৃতির সহিত চিরবিবাদে রত। এই বিবাদের নামই সভ্যতা। যে যত বিবাদ করিয়া প্রকৃতির হস্ত অতিক্রম করিয়াছে, সে তত সভ্য হইয়াছে। আজীবন সকলেই প্রকৃতির সহিত বিবাদ করিতেছে। কেহ বিবাদে জয়ী হইয়া বাঁচিতেছে ও উন্নত হইতেছে, কেহ বা পরাজিত হইয়া অবনত ও নিধন প্রাপ্ত হইতেছে। বিস্তর পরিমাণে জীবকুল জন্ম গ্রহণ করাতে এবং আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সকলের হৃদয়েই বলবতী হওয়াতে সকল প্রাণীই প্রকৃতির সহিত বিবাদ বিসম্বাদে রত আছে। এই বিবাদ প্রকৃতির সহিত, এক জাতীয় অন্য

জীবের সহিত, বা অন্য জাতীয় জীবের সহিত চলিয়া আসিতেছে। যদি প্রকৃতি এবং জাতীয় বা বিজাতীয় জীব, জীবের জন্ম, বর্দ্ধন ও পোষণের প্রতিপক্ষ না হইত, তাহা হইলে এই বিবাদের প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, জীবের জীবন রক্ষার বিস্তর প্রতিবন্ধক বিদ্যমান আছে এবং এই প্রতিবন্ধক থাকাতেই সংসার সুশৃঙ্খলে চলিতেছে, নতুবা এক মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইত। কৃত্রিম উপায় দ্বারা জীবকুলের উৎপত্তি হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু আহার্য্য দ্রব্যের বৃদ্ধি সম্ভব নহে। যদিও কোন কোন উদ্ভিদ্ ও প্রাণী বিস্তর জন্মিতেছে, কিন্তু সকলেই সে প্রকারে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কারণ যে পৃথিবী সকলের আহার ও আবাসের হেতু, সেই পৃথিবী স্বয়ংই তাহাদিগের সকলকে স্থান ও আহার দানে অসমর্থ। সুতরাং প্রকৃতির অবস্থা দর্শনে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীই জীবিত থাকিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কোন না কোন সময়ে বিস্তর সংখ্যাই নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধ্বংশ রজ্জু শ্লথ হইলেই তাহারা অসংখ্য হইয়া পড়িবে; এবং তাহা হইলে যে এক মহা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

যদি উদ্ভিদ্ ও জীবের আতিশয্য হেতু ধ্বংশ কোন সময়ে অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে মনুষ্য কি সেই ধ্বংশের অংশভাগী হইবে না? ইহার উত্তরে আমরা বলি, অবশ্যই ধ্বংশের অংশভাগী হইবে; উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পক্ষে যে নিয়ম, মনুষ্যের পক্ষে তদ্বিপরীত নহে।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতের সহিত তুলনাতে খাদ্যের যে অভাব দেখা যায়, তাহা প্রজা বৃদ্ধির অন্তরায় বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ নহে। দুর্ভিক্ষ ব্যতিরেকে এ প্রকার অন্তরায়কে অবশ্য গৌণ বলিতে হইবে। অপ্রতুল নিবন্ধন যে কারণে লোকের সামাজিক দুষ্ক্রিয়া ও পীড়াদি উপপন্ন হয়, এবং এতদ্ভিন্ন যে সামাজিক বা প্রাকৃতিক কারণে মনুষ্যকে দুর্ব্বল, সুতরাং অবশেষে বিনষ্ট করে, সেই সকল কারণকেই লোক বৃদ্ধির সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ অন্তরায় বলা যাইতে পারে। মনুষ্যের পক্ষে এই সকল কারণ যেমন স্বাভাবিক, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পক্ষেও প্রায় তদ্রূপ বলিতে হইবে। ইহারা সকলেই কষ্ট, অভাব ও পীড়া হইতে উৎপন্ন এবং সকলেই জীবন্নাশক ও লোকের পরম শত্রু।

ক্রমশঃ

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ইউরোপে তিন বৎসর।—শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস, প্রণীত। মূল্য ।।০ আনা। আমরা এই পুস্তক খানি পড়িয়া সুখী হইলাম। সহজ বাঙ্গালায় বিলাতের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সুন্দর প্রণালীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তক খানি পূর্ব্বে ইংরাজিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন নানা কারণে আমরা ইহার প্রশংসা করিতে করিতে পারি নাই। রমেশ বাবু সে সকল কারণ অপনয়ন করিয়া ইংরাজিভাষানভিজ্ঞ স্বদেশীয়

দিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া গ্রন্থখানিকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। সমালোচ্য গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। রমেশ বাবু অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন, বাঙ্গালায় অনুবাদ না হইলে তাঁহার পুস্তক এত বিক্রয় হইত না। বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় পুস্তক খানির কাপিরাইট ক্রয় করিয়া ভাল কাগজে, উত্তম অক্ষরে পুস্তক খানিকে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তক খানির মূল্য সুলভ হইয়াছে। আমরা আশা করি, গুরুদাস বাবুর উদ্যম ফলপ্রসূ হইবে এবং মনোবাঞ্চা পূর্ণ হইবে।

বিধবা।—শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস প্রণীত। সহর সেরপুরে মুদ্রিত, মূল্য ১॥০। ব্রজনাথ বাবু সুলেখক, সে বিষয়ে আমাদের একটুও সন্দেহ নাই। তাঁহার চিন্তাশীলতার প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। কিন্তু তাঁহাকে আমরা অবশ্য বলিব, তাঁহার 'বিধবা' লিখিবার চেষ্টা ও উদ্যম বিফল হইয়াছে;—বিধবার সকল কথাই যেন পুরুষে বলিতেছে,—সকল দুঃখই যেন পুরুষে প্রচার করিতেছে। বিধবার কাহিনী বিধবা বলিতেছে, পুস্তক খানিকে এরূপ না করিয়া, বিধবার কাহিনী পুরুষে বলিতেছে, এরূপ করিলে ইহা এক খানি উপাদেয় গ্রন্থ হইত, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অধীত হইত। এক মাত্র অস্বাভাবিক উক্তির দোষে 'বিধবার' কথা আদর করিয়া কেহ শুনিবে না,—শুনিলেও ভ্রুকুঞ্চিত করিবে। 'উদ্ভ্রান্তপ্রেম' আর "বিধবা" এক শ্রেণীর পুস্তক। উদ্ভ্রান্তপ্রেমে অস্বাভাবিক উক্তি নাই বলিয়া বঙ্গসমাজে উহা এত আদৃত হইয়াছে। ব্রজনাথ বাবু ভাল ভাবে আমাদের কথা কয়েকটী ভাবিয়া দেখিবেন। আমরা তাঁহার বাঙ্গলা লেখার ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। আমরা তাঁহাকে বাঙ্গলা সাহিত্য সংসারের উচ্চ স্থানে অধিষ্টিত দেখিলে অত্যন্ত সুখী হইব।

নীলিমা—উপন্যাস। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই। এরূপ কুরুচি পূর্ণ উপন্যাস অদ্যাবধিও প্রচার হইতেছে, ইহা বঙ্গ-সমাজের অত্যন্ত লজ্জার কথা। পুস্তক খানি সমালোচনার জন্য প্রেরিত না হইলেই ভাল ছিল।

নিশীথচিন্তা।—ইয়ঙ সাহেবের নাইট থটস্. শ্রীনিমাইচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত, মূল্য ৵০। পুস্তকের অনুবাদ ভাল হইয়াছে। কবিত্ব সম্বন্ধে যদি কিছু দোষ থাকে, তবে তাহা ইয়ঙ সাহেবের। পুস্তকের রুচি ভাল।

মুক্তাহার।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০। নামের প্রলোভনে ভুলিয়া আমরা একটী একটী করিয়া এই হারের সমস্ত মুক্তাগুলি পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু দু তিনটী ভিন্ন নিখুঁত মুক্তা পাইলাম না;—দেখিলাম—"বিলাতি মুক্তার" ন্যায় ইহার অনেকগুলি 'মুক্তাই' প্রভাশূন্য। 'কালচক্র' নামক মুক্তাটী পুস্তক খানিকে উজ্জল করিয়াছে, নচেৎ 'রুচি ভাল' এ আকর্ষণে ভুলিয়া এ পুস্তক কেহ পড়িত না। সকল কবিতাই মুক্তার ন্যায় হয় না, এ কথাটী লেখকের স্মরণ রাখা উচিত ছিল। যাহা হউক, দুই এক স্থলে তাঁহার যে প্রতিভা দেখিয়াছি, তাহাতেই আমরা সুখী হইয়াছি। ধর্ম্ম-ভাবোদ্দীপক কবিতা প্রায় দৃষ্ট হয় না, 'ব্রহ্মসঙ্গীত' সম্মুখে রাখিয়া একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। বিশেষতঃ জিনিষ ভাল না হইলে কেবল দেশের অভাব দেখাইয়া কেহ কোন জিনিষের আদর বাড়াইতে

পারে না। ভূমিকায় প্রকাশকের ও সকল কথা না লিখিলেই ভাল হইত।

সমালোচক কাব্য।—প্রথমখণ্ড মূল্য /০। নামের সহিত এ পুস্তকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ব্যঙ্গোক্তিতে লেখক বিশেষ কৃতী বলিয়া বোধ হইল। লেখকের কবিতা লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা আছে। তবে কথা এই, এ প্রকার পুস্তক প্রচারের উপকারিতা কি কিছু আছে? আমাদের ত তাহা বোধ হয় না। সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হইয়া তর্ক যুক্তির দ্বারা কাহাকে পরাস্ত না করিয়া গোপনে এ প্রকার ইষ্টক নিক্ষেপ কেন?

ঘোড়ার ডিম, ও কুপোকাৎ—খে,সগল্প নং ১ ও নং ২। মূল্য /০ করিয়া। সহজ ভাষায় অনেক ভাল ভাল কথা এই পুস্তক দুখানিতে আছে। পুস্তক দুখানি কবিত্বপূর্ণ। সাধারণ লোকের মধ্যে এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়। যে শ্রেণীর পাঠক হউন, পুস্তক দুখানি পড়িয়া সুখী হইবেন।

রামের বনবাস।—পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্যকাব্য। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত, মূল্য ১৲ টাকা। অভিনয়ের জন্য যে এই প্রকার নীতিপূর্ণ পৌরাণিক দৃশ্যসকলের অবতারণা হইতেছে, ইহা বঙ্গদেশের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। রাজকৃষ্ণ বাবু স্বভাব-কবি, যাহা কিছু লেখেন, সকলই চলন-সই হয়। রামের বনবাস যাহা হওয়া উচিত, তাহাই হইয়াছে। তবে বাল্মীকের কবিত্বের উপর আর কাহার লেখনী চলিবে?

আর্য্যগাথা।—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ।০। গ্রন্থের উদ্বোধনে লেখকের নব উৎসাহ, নবতেজ, নবসৌন্দর্য্য স্ফুরিত দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম, বারবার লেখককে অন্তরে ধন্যবাদ দিলামঃ—

"গাইব প্রমত্ত হয়ে আইস সঙ্গীত মোর,
ঘুমায়েছে আর্য্যজাতি ভাঙ্গিব যে ঘুম ঘোর।
জাতীয় অমৃত গানে, ঢালিব আর্য্যের কানে,
উঠিবে অর্ব্বুদ প্রাণ ঘোর নিদ্রা পরিহরি।
তৃণপত্র নিদ্রা যায়, ঢালিব স্ফুলিঙ্গ তায়,
প্রজ্বলিবে দাবানল অমনি হুঙ্কার করি।
—সে ভীম অনল দৃশ্য হেরিব নয়ন ভরি।"

এ প্রকার আশাপূর্ণ কথায় কাহার হৃদয় না নৃত্য করে? কিন্তু গাইতে গাইতে কবির হৃদয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল,—তখন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় কবি স্থানান্তরে গাইলেন——

"কেন জাগালাম আহা, জাগাব না আর,
ঘুমাও ঘুমাও বীণে সুখে আরবার;
যবে পড়ি পদতলে,
আমি ভাসি অশ্রু জলে,
কাজ নাই কাঁদি আজ হেরিয়া ভারত আর;
জাগাব না বীণে তোরে এ নিশি না হলে ভোর
ঘুমাও ঘুমাও বীণে সে দিন গিয়াছে তোর।"

কবির এই নিরাশার উক্তি শ্রবণ করিয়া আমাদের দুই এক বিন্দু অশ্রু পড়িল।

আর্য্যগাথায় অনেক হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীত আছে,—অনেক গুলিতে উচ্চ দরের কবিত্ব বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু সকল গুলি ভাল হয় নাই। সঙ্গীত গুলির অধিকাংশই প্রকৃতির বর্ণনা—এরূপ প্রকৃতির পূজক আমাদের দেশে যত অধিক হন, ততই ভাল। আমরা পুস্তক খানি পড়িলাম মাত্র—সঙ্গীতের তাল মান সুরে শুনিলাম না, এই এক আক্ষেপ রহিল। সুরে কেমন লাগিত জানি না; পড়িয়া কোন কবিতায় সুখী হইয়াছি, কোন কবিতায় ব্যথিত হইয়াছি—ভাল মন্দ দুই চক্ষের সম্মুখে পড়িয়াছে; সে সকলের উদাহরণ দিতে আর প্রবৃত্তি নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু হৃদয়বান লোক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি কালে ভাল কবি হইবেন; আর্য্যগাথা যাঁহারা পড়িবেন, তাঁহাদের আর ইহাতে সন্দেহ থাকিবে না।

চন্দ্রশেখর।

(সমালোচনা।)

শারদীয় পৌর্ণমাসীর রজত-কিরণে পৃথিবী হাসে, দেখিয়া মন প্রফুল্ল হয়—প্রকৃতির সে হাসিভরা মুখ দেখিয়া মন নিরানন্দ থাকিতে চায় না। বায়ু-প্রপীড়নে মন্দান্দোলিত নীল সরোবর হৃদয়োপরি সন্তরণশীল মরালগণকে দোলাইয়া দোলাইয়া আপনি দোলে, দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হয়—মনে করি মনুষ্যের সুখের জন্যই এ সৃষ্টি, এ বিপুল বিশ্ব যে অশেষ সৌন্দর্য্যের আধার, মনুষ্যই সে সৌন্দর্য্যের অধিকারী, মনুষ্যের আনন্দবিধানের জন্যই তাহার প্রয়োজনীয়তা—মনে করি প্রকৃতি ভোগ্যা, মনুষ্য ভোক্তা। আর যখন সেই দিগন্তব্যাপী, অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ সমুদ্র অপরিমেয় হইতেও অপরিমেয়, অনন্তবিস্তার, দ্বিতীয় নীল সমুদ্রবৎ নীলাকাশ দিগন্তে যে সমুদ্রের সহিত মিলিবার ছলে অনন্তের ভাব বৃদ্ধি করে—যখন সেই প্রভূত, স্থির গম্ভীর, দূরবিস্তারী, আপনার ভারে আপনি দোলায়মান নীলাম্বুরাশির দিকে চাহিয়া দেখি, দেখিয়া মন মুগ্ধ হয়, চিন্তাশক্তি পরাভূত হয়, সেই অনন্তের ভাবে ডুবিয়া গিয়া আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাই, প্রকৃতির সে গম্ভীর বিরাট মূর্ত্তি হৃদয় অধিকার করিলে, বালুকাকণাবৎ ক্ষুদ্র যে আমি, আমার কথা ভাবিবার স্থান থাকে না। সে অনন্ত সত্তার নিকট আমি কে? কীটাণুকীট হইতেও ক্ষুদ্র, গৌরববিহীন, গণনার অযোগ্য। প্রকৃতির সে বিরাট মূর্ত্তি, সে গাম্ভীর্য্যময় প্রশান্ত ভাব দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া থাকি; সে রূপে প্রকৃতিকে আর সুখসম্ভোগের উপাদান বলিয়া মনে হয় না, সে ভাবে প্রকৃতিকে ধ্যান করিতে প্রবৃত্তি হয়। কবির সৃষ্ট চন্দ্রশেখর চরিত্রও, গৌরব ও গাম্ভীর্য্যে, মহত্ত্ব ও মনোমুগ্ধকারিণী শক্তিতে, সেই সমুদ্রবৎ অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ। সে দেবতুল্য চরিত্রের, সে স্থির প্রশান্ত ভাবের আলোচনা করিতে গেলে, হৃদয় মন অভিভূত হয়, তাহার মহত্ত্বে, তাহার গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, মন সেই মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্যের ধ্যান করিতে থাকে। চন্দ্রশেখর-চরিত্রের গৌরব মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য হইলে, সে চরিত্রের কোন সার্থকতা বা সফলতা থাকিত না; কবি এ জন্য চন্দ্রশেখর-চরিত্র মনুষ্য বুদ্ধিতে, মনুষ্য কল্পনায় ধারণার অযোগ্য করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু এ চরিত্রের অপরিমেয় মহত্ত্ব মনুষ্য-ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। বীররমণী, চাতুর্য্যময়ী বিমলা সাহিত্য সংসারে অতুলনীয়া, প্রকৃতিলালিতা, স্বভাবসুন্দরী, বনচারিণী কপালকুণ্ডলা; সরলতার প্রতিমূর্ত্তি মৃণালিনী; প্রস্ফুটিত কমলবৎ ফুল্লাননা, চিরপ্রেমময়ী কমলমণি; এ সকলেরই প্রকৃতি বুঝিতে পারি, বুঝাইতে পারি। প্রতাপচরিত্রও ভাষাশক্তি অতিক্রম করে নাই। কিন্তু চন্দ্রশেখর-চরিত্রের প্রকৃতি আলোচনা করিতে গেলে বিচার-শক্তি বিমুখ হয়, সে চরিত্র বিচারাতীত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। চন্দ্রশেখর-চরিত্র বুঝিতে পারি,

বুঝাইতে পারি না। বস্তুতঃ গাম্ভীর্য্য ও গৌরব, মহত্ব ও মনোমুগ্ধকারিণী শক্তির এরূপ মাধুর্য্যময় সমাবেশ সাহিত্য জগতে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। যে গাম্ভীর্য্যময় গৌরবান্বিত, মহৎ ও মাধুর্য্য জড়িত চরিত্র দেখিয়া বাচাল গম্ভীর হয়, মূর্খের বিদ্যানুরাগ জন্মে; অপ্রণয়ী প্রণয় শিখে, দাম্ভিক বিনীত হয়; যে চরিত্রে স্বার্থপরে পরোপকারকামনা ও ক্রোধীতে ক্ষমাগুণের উৎপত্তি করে; যাহার প্রভাবে অসাধু সাধু হয়, মনুষ্য দেবতা হয়, সে চরিত্রের এরূপ জীবন্ত চিত্র পৃথিবীর সাহিত্যপটে আর কয়টি আছে, আমরা বলিতে পারি না।

মহত্ব, গৌরব, ও গাম্ভীর্য্য চন্দ্রশেখর চিত্রের প্রতি রেখায় দেদীপ্যমান। এ চিত্রের যে অংশেই দৃষ্টিপাত কর না কেন, দেখিবে, চন্দ্রশেখর সেই অংশেই মহান্, গৌরবান্বিত, গাম্ভীর্য্যময়। আবার সকল ভাবেই চন্দ্রশেখর মাধুর্য্য সমন্বিত। কলবাহিনী স্রোতস্বিনীবক্ষে, গভীর নিশীথ সময়ে, অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর, প্রস্ফুট চন্দ্রকর-প্রদীপ্ত দূরবিস্তারী সিকতাশ্রেণী দেখিয়া, প্রকৃতির তৎকালীন স্থির নিস্তব্ধ মূর্ত্তি ভাবিয়া সে অনন্তের ভাবে, সে গাম্ভীর্য্যের ভাবে পূর্ণ হইয়া, যিনি সেই কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর কলকল শব্দ বা মন্দবায়ু জনিত ক্ষুদ্র তরঙ্গাভিঘাতের মৃদু সঙ্গীত শুনিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, চন্দ্রশেখর-চরিত্রের স্থির প্রশান্ত ভাব, সে চরিত্রের মাধুর্য্য ও অনন্তের ভাব, মনকে কিরূপ বিমোহিত করে। তমোময়ী অমানিশায় ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি গগন আচ্ছন্ন করিয়া, সেই উর্দ্ধদেশ হইতে ভূতল পর্য্যন্ত নিবিড় কালিমায় আবৃত করিয়াছে, ভীম মেঘগর্জ্জনে গিরি, নদী, বন, প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে; এই মহৎ, গাম্ভীর্য্যময়, ভীষণ দৃশ্যের উপর বিদ্যুৎ চমকিল, চমকিয়া তাহার মহত্ব গাম্ভীর্য্য, ও ভীষণতা দ্বিগুণিত করিল, অথচ সেই মহত্বে, গাম্ভীর্য্যে, ও ভীষণতায় মাধুর্য্য মাখাইয়া দিল। যিনি প্রকৃতির এই বিরাট মূর্ত্তি ভীষণতাবিরহিত করিয়া কেবল তাহার মাধুর্য্যময় মহত্ব ও গাম্ভীর্য্যের কল্পনা করিতে পারেন, তিনি বুঝিবেন, চন্দ্রশেখর চরিত্রের মহত্ব কি অসীম, সে চরিত্রের গাম্ভীর্য্য কি মনোমুগ্ধকারী, আর সেই মহত্বে ও গাম্ভীর্য্যে মাধুর্য্যের কি আশ্চর্য্য সমাবেশ।

চন্দ্রশেখরের আকার দীর্ঘ, তাঁহার গঠন তদুপযোগী বলিষ্ঠ। শৈবলিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতাপ গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিতে গেল, চন্দ্রশেখর নৌকা হইতে জলে পড়িয়া প্রতাপকে তীরে উঠাইলেন। প্রতাপের সহিত সম্মিলনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া শৈবলিনী নৌকা হইতে পলায়ন করিয়া গঙ্গাতীরস্থ বন মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রমানন্দস্বামী ও চন্দ্রশেখর তাহার অনুসরণ করিয়া, সন্ধ্যার পর মেঘাড়ম্বর দেখিয়া, রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাহুতে বল কত?" চন্দ্রশেখর হাসিয়া এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর এক হস্তে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। চন্দ্রশেখরের শারীরিক গঠন সাহস, ও শক্তি বীরোপযোগী, চন্দ্রশেখর বলিষ্ঠকায়, শক্তিমান, ও সাহসী, অথচ পৌরুষভাব-বিহীন, তাঁহার প্রকৃতি শান্ত ও গাম্ভীর্য্যময়, তাঁহার কণ্ঠ মধুর। গঙ্গাতীরে, অন্ধকারে, দীর্ঘাকার পুরুষ দেখিয়া দলনীর ভয় সঞ্চার হইয়াছিল; চন্দ্রশেখরের মধুর, করুণ পরি-

পূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভয় দূর হইল। মহাঘোর অন্ধকারে, মনুষ্যশূন্য পর্ব্বতোপরে, কণ্টক বনে বসিয়া শৈবলিনী; চন্দ্রশেখর আসিয়া শৈবলিনীর গাত্রস্পর্শ করিলেন; শৈবলিনী প্রথমে ভয়পীড়িত হইল, পরে চন্দ্রশেখরের কোমল স্পর্শ অনুভব করিয়া, তিনি অতি সাবধানে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া পর্ব্বতারোহণ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়া, শৈবলিনী মনে করিল, কোন দেবতা তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছেন।

চন্দ্রশেখরের মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত, তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময়, তিনি তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসু। একদা বিদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কালে, দূর হইতে স্বগৃহ দেখিয়া, চন্দ্রশেখর আপনাপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কেন, বিদেশ হইতে আগমন কালে স্বগৃহ দেখিয়া হৃদয়ে আহ্লাদের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এতদিন আহার নিদ্রার কষ্ট পাইয়াছি? গৃহে গেলে বিদেশ অপেক্ষা কি সুখে সুখী হইব? এ বয়সে আমাকে গুরুতর মোহবন্ধে পড়িতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ গৃহমধ্যে আমার প্রেয়সী ভার্য্যা বাস করেন, এই জন্য আমার এ আহ্লাদ? লোক বলে, সকলই মায়া! কিছুই মায়া নহে, তাহারাই মায়ার মায়ায় মুগ্ধ। ভগবান্ বলিয়াছেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই আমি। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে কেন? সকলই ত সেই সচ্চিদানন্দ! আমার যে তরণী লইয়া আসিতেছে, তাহার প্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্ল কমলাননার মুখপদ্ম দেখিবার জন্য এত কাতর হইয়াছি কেন?" আপনার বিচার-শক্তির প্রভাবে, চন্দ্রশেখর যে তত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন, তাহা ভগবদ্বাক্যের বিরোধী জানিয়া ধর্ম্মাত্মা, বিনীতমনা চন্দ্রশেখর অমনি বলিতেছেন, "আমি ভগবদ্বাক্যে অশ্রদ্ধা করি না, কিন্তু আমি দারুণ মোহজালে জড়িত হইতেছি।" চন্দ্রশেখরের এ স্বগত প্রশ্নের এই মাত্র অর্থ নহে। সকলই সচ্চিদানন্দ, তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য, কাহারও প্রতি অশ্রদ্ধা হয় কেন, এ প্রশ্নের,—সামান্য ভারবাহকের সহিত তাঁহার হৃদয়াধিকারিণী শৈবলিনীর এ তুলনার,—গভীরতর অর্থ আছে। কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য, কাহারও প্রতি অন্যাপেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা হইবার অগণিত নৈসর্গিক কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যেখানেই এরূপ কোন কারণের অস্তিত্ব, সেই খানেই প্রেমের বা শ্রদ্ধার এরূপ ন্যূনাধিক্য প্রাকৃতিক নিয়ম। মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, চন্দ্রশেখরের হৃদয়েও সুতরাং ব্যক্তি বিশেষের প্রতি প্রেমের বা শ্রদ্ধার আধিক্য জন্মিত। কিন্তু একাপেক্ষা অন্যের প্রতি প্রেমাধিক্য হয় কেন? সকলের প্রতিই হৃদয়ের এক রূপ গতি না হইবার অর্থ কি? এরূপ অনুসন্ধানে হৃদয়ের স্বতঃ প্রবৃত্তি হইতে বুঝিতে হইবে যে, যে হৃদয়ে স্বভাবতঃ এরূপ ভাবের উদয় হয়, সে হৃদয় মনুষ্যমাত্রকে সমভাবে দেখিতে চায়, মনুষ্যমাত্রকেই ভালবাসা সে হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতা। এরূপ হৃদয়ে ঘৃণা, প্রতিহিংসাদি ক্ষুদ্র বৃত্তি সকলের অস্তিত্ব অসম্ভব। তোমার সংস্কার এ ব্যক্তি তোমার আপনার, এ তোমার প্রীতির পাত্র; এ ব্যক্তি তোমার পর, তোমার প্রীতি ভালবাসা ইত্যাদির সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ

নাই, অথবা এ ব্যক্তি নীচপদস্থ, নিকৃষ্ট স্বভাব, নিকৃষ্ট জাতীয়, এ তোমার অশ্রদ্ধার, তুচ্ছতাচ্ছল্যেরই পাত্র। তোমার হৃদয়ে উক্তরূপ প্রশ্নের উদ্রেক অস্বাভাবিক ও অসম্ভবপর। চন্দ্রশেখরের বুদ্ধি অপরিসীম। উন্মাদিনী শৈবলিনীকে গৃহে আনিয়া চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ফষ্টরের সঙ্গে গেলে কেন?" শৈবলিনী উত্তর করিল,—"প্রতাপের জন্য।" চন্দ্রশেখর চমকিয়া উঠিলেন—সহস্র চক্ষে বিগত ঘটনা-সকল পুনর্দ্দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতাপ কি তোমার জার?

শৈ। ছি! ছি!

চ। তবে কি?

শৈ। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল; এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম—ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন?

চন্দ্রশেখর অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অপরিসীম বুদ্ধির নিকট কিছুই লুক্কায়িত রহিল না। শৈবলিনীর গৃহপরিত্যাগাদি সকল কথার অর্থ চন্দ্রশেখর বুঝিলেন। চন্দ্রশেখরের বিদ্যানুরাগের তুলনা নাই। তাঁহার বিদ্যানুরাগ এক সময়ে তাঁহার প্রেমানুরাগ, তাঁহার রূপমোহকেও, পরাভূত করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়াধিকারিণী, অনুপমরূপলাবণ্যবতী শৈবলিনী পার্শ্বে শয্যোপরি নিদ্রা যাইতেন, তিনি অবিচলিত চিত্তে গভীর দার্শনিক তর্কে নিবিষ্ট থাকিতেন। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্বান সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্তু বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার অভিমান বা অহঙ্কার ছিল না—দাম্ভিকতা কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। বিদ্যা অসীম, মনুষ্য কোন বিদ্যায় জীবিত কাল অতিবাহিত করিয়াও তাহার শেষ সীমায় উপস্থিত হইতে পারে না; আবার মনুষ্য-বিদ্যায় প্রকৃতির সকল গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার মনুষ্যের সাধ্যাতীত। চন্দ্রশেখর এ সকল বুঝিতেন, তাই গভীর বিদ্যাসত্বেও আপনার শিক্ষিত বিদ্যাকে সামান্য মনে করিতেন, শিক্ষিত বিদ্যায় আপনাকে অপারদর্শী মনে করিতেন। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, "আমি মূর্খ, আমি কিছু জানি না, আমি কিছু বুঝি-না" এই রূপ জ্ঞানই যে প্রকৃত বিদ্বানের লক্ষণ বলিয়া কথিত আছে, সে কথা অর্থশূন্য নহে। জ্ঞানের অনন্তত্বা বোধই প্রকৃত বিদ্যা, এ কথার এই অর্থ। চন্দ্রশেখর জ্ঞানের এই অনন্ততা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর নবাব কাসেমআলী খাঁকে জ্যোতিষ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ইংরাজের সহিত কাসেম আলীর যুদ্ধকালে দলনীবেগমের অবস্থিতি-স্থান গণিয়া চন্দ্রশেখর বলিয়াছিলেন,—"আমি গণিতে পারিলাম না! সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি হইত তবে মনুষ্য সর্ব্বজ্ঞ হইত। বিশেষ জ্যোতিষে আমি অপারদর্শী।" চন্দ্রশেখরের বুদ্ধি শক্তি অসাধারণ এবং প্রতিভাস্বিতা, তিনি অদ্বিতীয় বিদ্বান এবং তাঁহার মন গভীর চিন্তাপ্রবণ। অথচ তিনি নিরহঙ্কার, দাম্ভিকতাশূন্য, সর্ব্বত্র বিনীতস্বভাব এবং সেই বিনীত ভাবে গম্ভীর।

হৃদয়েও চন্দ্রশেখর মহান ও গৌরবান্বিত; তাঁহার হৃদয় বৃত্তির উচ্চতা এবং গভীরতার পরিমাণ করিয়া উঠা যায় না; তাঁহার হৃদয় বৃত্তির বিকাশ মাধুর্য্যপূর্ণ। তিনি স্বার্থশূন্য, সমদর্শী, এবং ক্ষমাশীল; তাঁহার প্রেমানুরাগ মনুষ্য জগতে দৃষ্টান্ত শূন্য। আপনার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, আপনার

হৃদয়সর্ব্বস্ব শৈবলিনী, যাহার জন্য গৃহসুখ, আপনার শোণিততুল্য গ্রন্থরাশি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারও আশা পরিত্যাগ করিয়া, চন্দ্রশেখর আপনার শোক দুঃখ ভুলিয়া পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মনুষ্যাকারে দেবতা ভিন্ন কেহ পারে কি?—চন্দ্রশেখরের পরোপকার-ব্রত গ্রহণ সামান্য ভাবে দেখিলে আমরা তাঁহার গৌরব তত বুঝিতে পারি না। শৈবলিনীকে হৃদয়মন সমর্পণ করিয়াও চন্দ্রশেখর আপনার বহু যত্নে সঞ্চিত গ্রন্থরাশি পরিত্যাগ করিয়া রমণী-সুখ ইহ জন্মের সার করিতে পারেন নাই। আবার সেই শৈবলিনীর জন্য সেই শোণিততুল্য গ্রন্থরাশি আপনার হাতে দগ্ধ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। চিরলালিত সেই অধ্যয়নাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, আপনার হৃদয়সর্ব্বস্ব সেই শৈবলিনীকে হারাইয়া, চন্দ্রশেখরের মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। মনের এই অবস্থায়ও গুরু-উপদেশে চন্দ্রশেখর মনকে অনায়াসে বশীভূত করিয়া পরোপকার ব্রতে নিয়োগ করিলেন। এ সামান্য মনুষ্যের কার্য্য নহে। হৃদয়ের এরূপ শক্তি, এরূপ নিঃস্বার্থতা মনুষ্য জগতে বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বব্যাপী প্রেম যে হৃদয়ে অন্তর্নিহিত, সে হৃদয়ের প্রেমানুরাগ পাত্র-বিশেষে আবদ্ধ থাকিলে সেই পাত্রের অভাবে আবার সেই প্রেম বিশ্বসংসারে ছড়াইয়া পড়ে, সে হৃদয় সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। পাত্রবিশেষে আবদ্ধ থাকিয়া সে অনুরাগ স্ফূর্ত্তিলাভ করে, পরিপুষ্ট হয়, হইয়া সংসারের অধিকতর উপকারের হইয়া উঠে। আবার কখন কখন কোন মায়াবিনী রমণী আসিয়া কোন মহৎ অন্তঃকরণের প্রেমের উৎস খুলিয়া দিয়া নিজে অন্তর্দ্ধান হন, সেই মহদন্তঃকরণ ব্যক্তি তাঁহার অভাবে জগৎসংসারকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া শরীর মন জগৎসংসারের সেবায় নিযুক্ত করেন। শৈবলিনীকে না পাইলে চন্দ্রশেখরের মহৎ হৃদয়ের গতি পরিণামে বোধ হয় ইহাই হইত, তিনি শৈবলিনী-প্রেম বিশ্ব-প্রেমে পরিণত করিয়া পরোপকারে, পরের সেবায়, জীবন সমর্পণ করিতেন। কিন্তু হৃদয়ের এই রূপ স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রমানন্দ স্বামী তাঁহাকে পরোপকার ব্রত গ্রহণ করাইলেন। ইহাতে, চন্দ্রশেখর হৃদয়বৃত্তির প্রাবল্যে যথেচ্ছা নীত হইতেছেন, আপনার হৃদয় আপনার বশে আনিতে পারিতেছেন না, এরূপ মনে করিবার কারণ নিরাকৃত হইল বটে. কিন্তু শৈবলিনী-অভাবে সর্ব্বজনে চন্দ্রশেখরের প্রেমসঞ্চার, সর্ব্বজনের সেবায় চন্দ্রশেখরের স্বতঃ প্রবৃত্তি দেখিয়া তাঁহার মহৎ হৃদয়ের মহত্ত্ব সম্বন্ধে মনে যে এক অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধার ভাবের উদয় হইত, তাহা হইল না। চন্দ্রশেখর এক সময়ে জ্ঞানানুরাগে উন্মত্ত ছিলেন, আবার প্রেমানুরাগে উন্মত্ত হইলেন, ইহা যে কেবল তাঁহার হৃদয়-বৃত্তি সমূহের গভীরতার লক্ষণ, হৃদয়ের দুর্ব্বলতার প্রমাণ নহে, তাহাই দেখাইবার জন্য বোধ হয় কবির চন্দ্রশেখর চরিত্রের এ অংশ এই রূপ করা প্রয়োজন হইয়াছে।

চন্দ্রশেখর-চিত্রের এক একটী রেখা সে চিত্রের বিভিন্ন দেশ কিরূপ সৌন্দর্য্যময়, কিরূপ প্রভাম্বিত করিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্যা-

ষিত হইতে হয়। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর মুখে শুনিলেন, কেন শৈবলিনী তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, জানিলেন, তিনি যাহাকে হৃদয়মন সমর্পণ করিয়াছেন সে তাঁহাতে আশক্ত নহে, তাহার হৃদয়াধিকারী অন্য এক ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার হৃদয়স্বর্গে মালিন্যের রেখামাত্রও দেখা দিল না, বিষাদের চিহ্ন-মাত্রও লক্ষিত হইল না, চন্দ্রশেখর একবারও ভাবিলেন না—"হায়! যাহাকে এত ভাল বাসিয়াছি সে ভ্রমেও আমাকে হৃদয়ে স্থান দেয় নাই, হায়! কেন এ পাপীয়সীর জন্য এত কষ্ট করিলাম? শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখর বিন্দুমাত্রও অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না, অসন্তোষের ভাব তাঁহার মনে উদয়ই হইল না। তিনি শৈবলিনীর প্রতাপ-প্রণয়ের গূঢ় তত্ব দিব্য চক্ষে দেখিলেন, সে প্রণয়ে কোন দোষ আছে মনে করিলেন না। অন্যত্র চন্দ্রশেখর শৈবলিনী সম্বন্ধে বলিয়াছেন "এক্ষণে জানিলাম যে ইনি নিষ্পাপ।" ইহাতে দেখিলাম কি? দেখিলাম চন্দ্রশেখরের প্রেমানুরাগ গাম্ভীর্য্যে অতুলনীয়, সম্পূর্ণ স্বার্থ বিরহিত। সে সমুদ্র কিছুতেই টলিবার নহে। দেখিলাম, চন্দ্রশেখর-চরিত্রের ঔদার্য্য অমানুষিক,—সে ঔদার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। দেখিলাম, চন্দ্রশেখরের বুদ্ধি অনন্তদর্শী, সে বুদ্ধির নিকট কিছুই লুক্কায়িত থাকিতে পারে না, সূত্রমাত্র অবলম্বন করিয়া সে বুদ্ধি ঘটনার আমূল স্পর্শ করে, তাহার নৈসর্গিক সম্বন্ধ স্পষ্টালোকে দেখিতে পায়। একমাত্র রেখাপাতে, বুদ্ধির অনন্ততা হৃদয়ের অমানুষিক ঔদার্য্য, প্রেমের গাম্ভীর্য্য ও নিঃস্বার্থতা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

দার পরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, বলিয়া চন্দ্রশেখর তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহী ছিলেন। মাতৃ বিয়োগের পর দারপরিগ্রহ না করাতেই অধ্যয়নাদির অধিকতর অসুবিধা হয় দেখিয়া বিবাহ করিবেন, স্থির করিলেন। কিন্তু বিবাহ করিলে সুন্দরী বিবাহ করিবেন না, কারণ, সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হইলে অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটিবে। শৈবলিনীর রূপ দেখিয়া সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল; তিনি আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সংযমীকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম, তাঁহার ব্রত ভঙ্গ দেখিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলাম। চন্দ্রশেখর এতদিন আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, আজ হইতে ভক্তি ও প্রেম, হৃদয়ের এই উভয় স্থলেই অভিষিক্ত হইলেন।

চন্দ্রশেখর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বিদ্যালোচনা করিতেন। শৈবলিনী তাঁহার আহারীয় নিকটে রাখিয়া পার্শ্বে শয্যোপরি নিদ্রা যাইতেন। এক দিন অধ্যয়ন করিতে করিতে চন্দ্রশেখর পেচকের গভীর কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন—রাত্রি অধিক হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া গ্রন্থাদি যথা স্থানে রক্ষা করিলেন। আলস্য বশতঃ দণ্ডায়মান হইলে মুক্ত-বাতায়ন-পথে কৌমুদী-প্রফুল্ল প্রকৃতির শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বাতায়নপথে সমাগত চন্দ্রকিরণ সুপ্তা সুন্দরী শৈবলিনীর মুখে নিপতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর প্রফুল্ল চিত্তে দেখিলেন, তাঁহার গৃহসরোবরে চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে। তিনি দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, দাঁড়াইয়া, বহুক্ষণ ধরিয়া প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে শৈবলিনীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন;

সে সুষুপ্তি-সুস্থির মুখমণ্ডলের সুন্দর কান্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষে অশ্রুজল বহিল—ভাবিলেন, "হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি? এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত—শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব—অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নব যুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখ পরায়ণ—সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া, রমণীমুখপদ্ম কি ইহ জন্মের সারভূত করিব? ছি! ছি! তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবন তাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?" সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ প্রেমাপ্লুতহৃদয় প্রণয়ীর সহিত বিদ্যানুশীলন নিরত জ্ঞানামৃতপান-পিপাসুর এই বিবাদ কি সুন্দর! জ্ঞানীর এই জ্ঞানগর্ভ স্বগত বাক্য, প্রণয়ীর প্রণয়-পাত্রীর সুখ দুঃখ চিন্তাজনিত এই প্রেম-পূর্ণ অশ্রুবিসর্জ্জন, জ্ঞানোপাসকের জ্ঞানানুশীলনে এই জীবনোৎসর্গ, স্বার্থবিরহিত উন্নত মনের আত্মসুখপরায়ণ হইয়া নিরপরাধে অন্যকে দুঃখভাগিনী করিয়াছি জ্ঞানে এই ঔদার্য্যপূর্ণ আত্মতিরস্কারও গভীর অনুশোচনায় চন্দ্রশেখর-চরিত্র কি মধুর, কি গাম্ভীর্য্যময় হইয়াছে! চন্দ্রশেখর-চরিত্রের মহত্ব ও গৌরব কত বাড়িয়াছে!

চন্দ্রশেখরের গৃহ হইতে ফষ্টর শৈবলিনীকে লইয়া গেলে, সুন্দরী তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইল। ভাগীরথীতীরে নাপিতানীর বেশে শৈবলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে ঐ নাপিতানীর সাজে নৌকা হইতে পালাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে পরামর্শ দিল। শৈবলিনী বলিল, "কি সুখে? কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু,—"

সু। "কেন স্বামী? এ নারী জন্ম আর কাহার জন্য?"

শৈ। "সব ত জান———"

সু। "জানি। জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মত পাপিষ্ঠা কেহ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্লভ, তাঁহার স্নেহে তোমার মন উঠে না। কি না, বালকে যেমন খেলা ঘরের পুতুলকে আদর করে, তিনি স্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে জানেন না। কি না, বিধাতা তাঁকে সং গড়িয়া রাঙ্গতা দিয়া সাজান নাই—মানুষ গড়িয়াছেন। তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত, তুমি পাপিষ্ঠা; তাঁহাকে তোমার মনে ধরিবে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারী জন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ—অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে।"

সুন্দরী বুঝিয়াছিল সে সমুদ্র কত গভীর;

সুন্দরী আনিত গভীরতা জন্যই সে সমুদ্র বহিশ্চাঞ্চল্য শূন্য।

নবাবের ইংরাজের সহিত যুদ্ধকালে দলনী বেগমের অবস্থিতি স্থান গণিয়া চন্দ্রশেখর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন। দূর হইতে নিজ গৃহ দেখিতে পাইয়া তাঁহার মনে কত কথা উঠিতেছে, তিনি কত ভাবিতেছেন। অকস্মাৎ তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় সঞ্চার হইল; ভাবিলেন, গৃহে গিয়া যদি শৈবলিনীকে দেখিতে না পান? যদি উৎকট রোগে শৈবলিনী প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে? এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রশেখর অতি দ্রুতপদে চলিলেন। দেখিলেন, প্রতিবাসীরা তাঁহার মুখ প্রতি অতি গম্ভীর ভাবে চাহিয়া দেখিতেছেন—প্রাচীনেরা তাঁহাকে দেখিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। ইহার পূর্ব্ব রাত্রে ফষ্টর সাহেব শৈবলিনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখর কোন দিকে না চাহিয়া, আপন গৃহ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৃত্য দ্বার খুলিয়া চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল—তাঁহার কথার উত্তর না করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। চন্দ্রশেখর মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। দেখিলেন, উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই, চণ্ডীমণ্ডপে ধূলা। স্থানে স্থানে পোড়া মশাল—স্থানে স্থানে কবাট ভাঙ্গা। চন্দ্রশেখর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সকল ঘরেই দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। দেখিলেন, পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিয়া সরিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন, সে বাটীর বাহিরে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন চন্দ্রশেখর প্রাঙ্গণ মধ্যে দাঁড়াইয়া, অতি উচ্চৈঃস্বরে বিকৃত কণ্ঠে ডাকিলেন——"শৈবলিনি!" গৃহ মধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; কেহ উত্তর দিল না; সে বিকৃত কণ্ঠ শুনিয়া রোরুদ্যমানা পরিচারিকাও নিস্তব্ধ হইল। যিনি এই মর্ম্মভেদী বিকৃত কণ্ঠ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন, চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী-প্রেম কত গভীর। চন্দ্রশেখরের এই বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া হৃদয় চকিত, ভীত, ও রুদ্ধগতি হইয়া উঠে—সেই ভীতির, সেই চকিতের ভাবে অন্তরের মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত দুঃখভারে নিপীড়িত হইতে থাকে। আর একবার, শৈবলিনীকে জীবিতে বিকট নরক যন্ত্রণায় উন্মাদগ্রস্ত দেখিয়া, চন্দ্রশেখর যখন গদ্গদ কণ্ঠে সকাতরে রমানন্দ স্বামীর উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন "গুরুদেব! এ কি করিলে?" তখন বুঝিয়াছিলাম, শৈবলিনী-প্রেম সে হৃদয়ের প্রতি রক্তকণায় কিরূপ মিশিয়াছিল। কবি কেমন কৌশলে চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী দর্শনাকাঙ্ক্ষা ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়াছেন—প্রণয়পাত্রীর বিপদ আশঙ্কা, প্রতিবাসীগণের নিস্তব্ধ গম্ভীর দৃষ্টি, ভৃত্য ও পরিচারিকার বিনা বাক্যে রোদন, গৃহপ্রাঙ্গণের অপরিষ্কার অবস্থা, ইত্যাকার ঘটনার ক্রমিক সংযোজন দ্বারা শৈবলিনী-দর্শনব্যগ্র আর সেই দর্শনাশায় নিরাশোন্মুখ চন্দ্রশেখরের চিত্তকে কিরূপ বিকট উৎকণ্ঠা-প্রপীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। এই উৎকণ্ঠা-প্রপীড়িত হৃদয়ে, বিকৃত কণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে "শৈবলিনী" বলিয়া চন্দ্রশেখরের এই চিৎকার, অন্তর্জাত প্রাকৃতিক বিলোড়নসম্ভূত সমুদ্রের গভীর নির্ঘোষতুল্য; মেঘপুঞ্জ মধ্যে ক্রমসঞ্চিত বৈদ্যুতিক বহ্নি রাশির বজ্রনাদ তুল্য; গিরিগর্ভে রাসায়নিক ক্রিয়া-সম্ভূত রুদ্ধগতি বেগ বৃদ্ধি হইয়া গিরিদেহ বিদীর্ণ করিয়া ধূমরাশি বা দ্রব ধাতু উদ্গী-

রূপ তুল্য বস্তুতঃ চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে যখনই যে ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারই গাম্ভীর্য্যাবলোকনে বিমোহিত হইতে হয়।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনী অপহরণ বৃত্তান্ত শুনিলেন। তখন সযত্নে গৃহ-প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম-শিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয়, গ্রন্থগুলিন সকল একে একে আনিয়া একত্রিত করিলেন। একে একে প্রাঙ্গণ মধ্যে সাজাইলেন, —সাজাইতে সাজাইতে এক একবার কোন খানি খুলিলেন—আবার না পড়িয়াই তাহা বাঁধিলেন—সকল গুলিন প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। বহুযত্নসংগৃহীত, শোণিততুল্য প্রিয় সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি অগ্নিদগ্ধ করিয়া চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। শৈবলিনীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াও যে চন্দ্রশেখর এক দিন বলিয়াছেন "আমার এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আনিয়া রমণী মুখপদ্ম ইহজন্মের সারভূত করিতে পারিব না," সেই চন্দ্রশেখর আজ স্বহস্তে সেই গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ করিলেন, করিয়া শৈবলিনী শূন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া দেশত্যাগী হইলেন। এ অতি চমৎকার দৃশ্য! শৈবলিনীর জন্য চন্দ্রশেখরের বিকট উৎকণ্ঠা দেখিয়া হৃদয় উদ্বেগময় হইয়া উঠে; শৈবলিনী বিহনে তাঁহার বিকৃত কণ্ঠের কাতরোক্তি শুনিয়া মর্ম্মে পীড়িত হই; তাঁহার গ্রন্থদাহ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়; তাঁহার অন্তর্জগতের তুমুল ঝটিকার এই প্রবল অথচ গম্ভীর ও প্রশান্ত বাহ্যবিকাশ দেখিয়া নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া থাকি। আপনার জীবন-তুল্য গ্রন্থরাশি এই রূপে অগ্নিদগ্ধ করায় চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী-প্রণয়ের গভীরতা যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় আর কিছুতেই হইত না। কবি এক দিকে প্রবল প্রণয়াশক্তি, অন্য দিকে প্রবল বিদ্যানুরাগ রাখিয়া একের দ্বারায় অন্যের প্রকৃতি বিকাশিত করিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের প্রণয়গাম্ভীর্য্য দেখাইতেছে—তাঁহার জ্ঞানানুরাগ কত প্রবল, আবার সেই প্রবল বিদ্যানুরাগ, সেই অপরিমেয় প্রেমানুরাগের সহিত বিরোধভাব-সংশ্লিষ্ট হওয়ায় আমরা দেখিতেছি, তাঁহার শৈবলিনী-প্রণয়ের গভীরতা কত। চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে সমভাবে প্রবল মনুষ্য মনের দুইটি সুন্দর বৃত্তির এইরূপ দ্বন্দ্ব এবং সময়বিশেষে একের প্রাবল্যে অন্যের সঙ্কোচন চন্দ্রশেখর চরিত্রকে অতি মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। পরস্পর বিরোধ সম্বন্ধে সমুপস্থিত এই উভয় ভাবের কবি যেরূপ সামঞ্জস্য করিয়াছেন, তাহাও অতি কৌশলময়।

কাব্যের এক প্রধান ফল, মানবমনের উন্নতি সাধন। কাব্যে যেমন উন্নত ভাব মনের সহিত গাথিয়া দেয়, এরূপ আর কিছুতেই পারে না। কবি চন্দ্রশেখরকে মানব সমাজের শিক্ষাগুরু করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এ গুরু উপদেশে শিক্ষা দেন না। চরিত্রবল এ গুরুর শিক্ষার উপায়। গুরুর চরিত্রবল এবং গুরু চরিত্রে শিষ্যের অবিচলিত শ্রদ্ধাই শিক্ষার প্রকৃত মূল। তুমি কাহাকেও কিছু বলিও না, পাপাসক্তকে পাপাচারে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিও না, অসৎকে সৎ হইবার উপদেশ দিওনা। তুমি যে পবিত্রচেতা, পাপস্পর্শশূন্য, তোমার যে

উচ্চ নীতি, উচ্চ প্রকৃতি, প্রলোভনে তোমার অন্তরকে যে বিচলিত করিতে পারে না, একবার লোককে ইহা জানিতে দেও, একবার লোকে বিশ্বাস করুক যাহা কিছু অপবিত্র, যাহা কিছু নীচ, তাহা তোমাতে অসম্ভব, দেখিবে অর্থ বা ক্ষমতাজনিত প্রভুত্ব না থাকিলেও লোকে তোমাকে ভয় করিবে, পাপী তোমাকে ভয় করিবে, পাপী তোমাকে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করিবে, জ্ঞাতে হউক অজ্ঞাতে হউক তোমার চতুর্দ্দিকস্থ লোকে তোমার অনুকরণ করিতে থাকিবে ; তোমার চরিত্র বল অলক্ষিত ভাবে লোকের মন পবিত্রতার পথে লইয়া যাইবে। সে পরিবর্ত্তন কেহ দেখিতে পায় না, অথচ এই রূপ পরিবর্ত্তনই সমাজ সংস্করণের জীবন। আবার এই রূপ দৃষ্টান্ত মূলক শিক্ষায়ই ক্রমে সমাজের অধঃপাত সংঘটিত হইয়া থাকে। চন্দ্রশেখর প্রকৃত জীবনের দৃষ্টান্ত নহেন সত্য। কিন্তু কাব্যপ্রিয়, কাব্যের প্রকৃত ভাব প্রকৃতার্থ হৃদয়ঙ্গম করণে সমর্থ শিক্ষিত ব্যক্তির মনে চন্দ্রশেখরের ন্যায় চরিত্র পাঠের ফল, প্রকৃত দৃষ্টান্তের ফলাপেক্ষা ন্যূন নহে। রাত্রিকালে চন্দ্রশেখর দলনী ও কুল্‌সমকে লইয়া মুঙ্গেরে প্রতাপের গৃহে উপস্থিত হইলে, প্রতাপের ভৃত্য রামচরণ দ্বার খুলিয়া দিয়া, চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিল ; চন্দ্রশেখর রামচরণকে শয়ন করিতে যাইতে বলিলেন, কিন্তু রামচরণের সে রাত্র নিদ্রা আসিল না। রামচরণ ভাবিতে লাগিল "ঠাকুরজী এত রাত্রে দুই জন যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া আসিলেন কেন? রামচরণ চন্দ্রশেখরকে দেবতা মনে করিত—তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জানিত। সে বিশ্বাসের খর্ব্বতা হইল না। রামচরণ সিদ্ধান্ত করিল, "বোধ হয় এই দুইজন স্ত্রীলোক সম্প্রতি বিধবা হইয়াছে—ইহাদিগকে সহমরণের প্রবৃত্তি দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন,—কি জ্বালা, একথাটা এতক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না।' নিজ চরিত্রে যিনি অন্যের এই রূপ অগাধ ভক্তি, অবিচলিত বিশ্বাস সংস্থাপনে সমর্থ, তিনিই যথার্থ মানবসমাজের শিক্ষক, তিনিই মানবকুলের গুরু হইবার উপযুক্ত। আর এই রূপ ভক্তি ও বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন চরিত্র বলেই—আপনার চরিত্রমূলে অন্যের মনে আধিপত্য স্থাপনেই সমাজের প্রকৃত শিক্ষা। কেবল মাত্র উপদেশমূলে নীতিশিক্ষা শিক্ষার ভাণ মাত্র।

উদয়নালায় নবাব শিবির ইংরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, চন্দ্রশেখর ও রমানন্দ স্বামী, শৈবলিনীকে লইয়া, পলায়নোদ্যত যবন সেনার পশ্চাদ্‌গামী হইলেন। গমনকালে অকস্মাৎ প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রতাপ এক দল সুসজ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা লইয়া, রণমত্ত হইয়া, দর্পিত পদে, ইংরাজের সম্মুখীন হইতে যাইতেছেন। চন্দ্রশেখর প্রভৃতিকে নির্ব্বিঘ্ন স্থানে রাখিয়া আসিবার জন্য প্রতাপ সেনাদল লইয়া ফিরিলেন। তাঁহাদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, শৈবলিনী যাহা কাণে কাণে বলিল তাহা শুনিয়া, প্রতাপ যখন অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হন, তখন চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাও?"

প্রতাপ বলিলেন "যুদ্ধে।"

চন্দ্রশেখর নিষেধ করিলেন। প্রতাপ বলিলেন "কষ্টর এখনও জীবিত আছে, তাহার বধে চলিলাম।"

চন্দ্রশেখর দ্রুত বেগে আসিয়া প্রতাপের অশ্বের বল্গা ধরিলেন। বলিলেন "ফষ্টরের বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তাহার দণ্ড-বিধান করিবেন—তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে—যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে"

এই ফষ্টর চন্দ্রশেখরের জীবনসর্ব্বস্ব শৈবলিনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এই ফষ্টর শৈবলিনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল বলিয়া, চন্দ্রশেখর আপনার শোণিততুল্য গ্রন্থরাশি অগ্নিদগ্ধ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, গৃহত্যাগী হইয়া, অনাহারে, অনিদ্রায়, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

প্রতাপ চন্দ্রশেখরের কথা শুনিয়া বিস্মিত, পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখন লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, প্রতাপ, চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "আপনিই মনুষ্য মধ্যে ধন্য। আমি ফষ্টরকে কিছু বলিব না"

প্রতাপ চন্দ্রশেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, এরূপ মহতী উক্তি তিনি কখন লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। কে না এ কথা বলিবে? চন্দ্রশেখরের ন্যায় মহাপুরুষের পদধূলি গ্রহণ করিতে কাহার না প্রবৃত্তি হয়। বস্তুতঃ যে চরিত্র দেখিলে ভক্তি-স্রোত অনিবার্য্য হইয়া উঠে; যে চরিত্র দেখিয়া, মনুষ্যলোকে দেবতা বলিয়া ভ্রম জন্মে, স্বতঃই পূজা করিতে প্রবৃত্তি হয়; সে চরিত্রের এরূপ দৃষ্টান্ত আমরা আর কুত্রাপি দেখি নাই।

হিন্দু জাতির সামাজিক শিক্ষা জনিত সংস্কার বশতই হউক, বা মনুষ্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোন কারণই থাকুক, কৃতবিদ্য নব্যাপেক্ষা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যেন আমাদের অধিকতর ভক্তি করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমরা ভিক্ষাব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা বলিতেছি না; এবং নব্যে অভক্তির কোন কারণ আছে, ইহাও আমদের অর্থ নহে। পাণ্ডিত্য, প্রতিভাদি গুণে, আমরা নব্যকেও আদর করিয়া থাকি; অনেক সময়ে নব্যকে অন্তরের বন্ধু বলিয়া ভাল বাসি। কিন্তু ভক্তি শ্রদ্ধা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রতিই অধিকতর পরিমাণে হইয়া থাকে। হয়ত নব্যের সঙ্গে ভালবাসার এবং প্রাচীনের সঙ্গে ভক্তির স্বাভাবিক সম্বন্ধই ইহার কারণ। যেখানেই নব্যের ভাব, সেই খানেই আদর ও ভালবাসার স্বাভাবিক উৎপত্তি, যেখানেই প্রাচীনত্ব ও গাম্ভীর্য্য সেই খানেই ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রাবল্য। সর্ব্ব প্রকারে গাম্ভীর্য্যময় এবং ভক্তিভাজন করিবার জন্য কবি চন্দ্রশেখরকে ব্রহ্মর্ষি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর প্রাচীন সম্প্রদায়ের পণ্ডিত, কিন্তু প্রাচীন সম্প্রদায়ে নব্যের অপ্রিয় যাহা কিছু থাকিতে পারে, চন্দ্রশেখরে তাহার কিছুই নাই; পরন্তু নব্যে যাহা আদরের ও ভালবাসার, চন্দ্রশেখরে তাহা আছে। চন্দ্রশেখরে কবি নবীনের মধুরত্ব এবং প্রাচীনের গাম্ভীর্য্য এরূপ সুন্দর ভাবে মিশ্রিত করিয়াছেন যে, চন্দ্রশেখর সকল শ্রেণীরই প্রিয় ও অনুরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছেন। চন্দ্রশেখর শ্রেণীবিশেষের নহেন; যুবক ও বৃদ্ধ, প্রাচীন ও নব্য, সকলের নিকটেই চন্দ্রশেখরের সমান আদর, সমান ভক্তি, সমান ভালবাসা। চন্দ্রশেখর নাম

নির্ব্বাচনেও কবিকে সৌভাগ্যশালী মনে করিতে হইবে। এক দিকে কবি যেমন পূর্ব্বকালীয় সাধারণতঃ মাধুর্য্যবিহীন কোন নামে নায়ককে অভিহিত করেন নাই, অন্য দিকে তেমনই আধুনিক গাম্ভীর্য্যবিহীন চটকযুক্ত নাম পরিহার করিয়া, নায়ক-চরিত্রে নামের উপযোগিতা রক্ষা করিয়াছেন। দ্বাত্রিংশৎ বৎসরে চন্দ্রশেখরের সহিত কবি আমাদিগকে প্রথম পরিচিত করিয়াছেন। আর যখন চন্দ্রশেখরের মনোগতি ও জীবনগতির পরিচয় পাইলাম, তখন তাঁহার বয়স চত্বারিংশৎ বৎসর। বয়সেও কবি উভয় দিক সমাবেশের চেষ্টা করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর চরিত্রে, কবি দেখাইয়াছেন, যে চরিত্র সকলের নিকটেই সমভাবে আদৃত ও পূজিত, সকলেরই শিক্ষাস্থল ও আনন্দের কারণ হইতে পারে, সে চরিত্র কি কি উপকরণে গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

চন্দ্রশেখর চিত্র কল্পনায় অদ্বিতীয় হইলেও সে চিত্র প্রভাসিত করিতে কবির অধিক রেখাপাত করিতে হয় নাই। এত অল্প রেখাপাতে এরূপ মহত্বের প্রস্ফোটন সামান্য ক্ষমতার পরিচয় নহে। কবি শৈবলিনীমুখে চন্দ্রশেখর কি, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে অন্য ভাবে চন্দ্রশেখর কাব্যের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য বিধান হইয়াছে বটে,—সে সৌন্দর্য্যের জন্য সে বর্ণনা অপরিহার্য্য—কিন্তু চন্দ্রশেখর চরিত্র বুঝাইবার জন্য, সে বর্ণনা, তত প্রয়োজনীয় নহে। এ চিত্র লিখনে কবি যে বর্ণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেই এ চিত্র পূর্ণভাবে দীপ্তিমান। তবে কবি যে রূপ অল্প কথায় চন্দ্রশেখর চরিত্র প্রকটিত করিয়াছেন, সেই রূপ অল্প কথায় সে চরিত্র বুঝাইতে হইলে, কবি যেরূপ সুন্দর কৌশলময় উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অদ্ধাধিক অন্ধ শৈবলিনী রমানন্দ স্বামীর অনন্ত বুদ্ধি বলে দিব্য চক্ষু পাইল, অন্তরের ভিতর অন্তর হইতে সেই দিব্য চক্ষু দ্বারা চাহিয়া চিনিল চন্দ্রশেখর কি—দেখিল, "এ কি রূপ! এই দীর্ঘ, শালতরুনিন্দিত, সুভুজ বিশিষ্ট, সুন্দর গঠন, সুকুমারে বলময়, এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে ললাট,—প্রশস্ত, চন্দন-চর্চ্চিত, চিন্তারেখা বিশিষ্ট—এ যে স্বরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইহার কাছে প্রতাপ? ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! ঐ যে নয়ন জ্বলিতেছে, হাসিতেছে, ফিরিতেছে, ভাসিতেছে—দীর্ঘ, বিস্ফারিত, তীব্রজ্যোতি, স্থির, স্নেহময়, করুণাময়, ঈষৎরঙ্গপ্রিয়, সর্ব্বত্র তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু—ইহার কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুলিলাম—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! এই যে সুন্দর; সুকুমার, বলিষ্ঠ দেহ—নবপত্রশোভিত শালতরু,—মাধবী জড়িত দেবদারু, কুসুম পরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক শক্তি—আধ চন্দ্র আধ ভানু—আধ গৌরী আধ শঙ্কর—আধ রাধা আধ শ্যাম—আধ আশা আধ ভয়, আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া, আধ বহ্নি আধ ধূম—কিসের প্রতাপ? কেন না দেখিলাম, কেন মজিলাম—কেন মরিলাম! সেই যে ভাষা—পরিস্কৃত, পরিস্ফুট, হাস্যপ্রদীপ্ত, ব্যঙ্গ-রঞ্জিত, মৃদু, স্নেহ পরিপ্লুত, মধুর, পরিশুদ্ধ, কিসের প্রতাপ?—কেন মজিলাম—কেন মরিলাম, কেন কুল হারাইলাম? সেই যে হাসি—ঐ পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশি তুল্য, মেঘ-মণ্ডলে বিদ্যুত্তুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসব তুল্য,

আমার সুখস্বপ্ন তুল্য—কেন দেখিলাম না, কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, কেন বুঝিলাম না? সেই যে ভালবাসা, সমুদ্রতুল্য, অপার, অপরিমেয়, অতলস্পর্শ, আপনার বলে আপনি চঞ্চল—প্রশান্তভাবে স্থির, গম্ভীর মাধুর্য্যময়—চাঞ্চল্যে কুলপ্লাবী; তরঙ্গ ভঙ্গে ভীষণ, অগম্য, অজেয়, ভয়ঙ্কর,—কেন বুঝিলাম না, কেন হৃদয়ে তুলিলাম না—কেন আপনা খুইয়া প্রাণ দিলাম না! কে আমি? তাঁহার কি যোগ্যা—বালিকা, অজ্ঞান,—অনক্ষর, অসৎ, তাঁহার মহিমাজ্ঞানে অশক্ত, তাঁহার কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণুকণা—তাঁর কাছে আমি কে? জীবনে কুস্বপ্ন, হৃদয়ে বিস্মৃতি, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস—তাঁর কাছে আমি কে? সরোবরে কর্দ্দম, মৃণালে কণ্টক, পবনে ধূলি, অনলে পতঙ্গ! আমি মজিলাম—মরিলাম না কেন?" চন্দ্রশেখরের এই মোহময়ী মূর্ত্তি শৈবলিনীর চক্ষু সমীপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে, স্বামীধ্যানে চিত্ত তন্ময় হইয়া, শৈবলিনীর কর্ণ কেবল স্বামীর জ্ঞানপরিপূর্ণ, স্নেহবিচলিত বাক্যালাপ শুনিতে পাইতেছিল—ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবল মাত্র তাঁহার পুষ্পপাত্রের পুষ্পরাশির গন্ধ পাইতেছিল—ত্বক্ কেবল চন্দ্রশেখরের আদরের স্পর্শ অনুভব করিতেছিল। স্বামীধ্যানে নিমগ্নচিত্তা শৈবলিনী জ্ঞান হারাইয়া স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে এক বার দেখিল, "সে ভয়ঙ্কর নরকে ডুবিয়াছে, অগণিত শতহস্তপরিমিত, সর্পগণ অযুত ফণা বিস্তার করিয়া, শৈবলিনীকে জড়াইয়া ধরিতেছে; অযুত মুণ্ডে মুখব্যাদান করিয়া শৈবলিনীকে গিলিতে আসিতেছে; সকলের মিলিত নিঃশ্বাসে প্রবল বাত্যার ন্যায় শব্দ হইতেছে। চন্দ্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ সর্পের ফণায় চরণ স্থাপন করিয়া দাঁড়াইলেন; তখন সর্প সকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়া গেল। কখন দেখিল, এক অনন্ত কুণ্ডে পর্ব্বতাকার অগ্নি জ্বলিতেছে; আকাশে তাহার শিখা উঠিতেছে; শৈবলিনী তাহার মধ্যে দগ্ধ হইতেছে; এমত সময়ে চন্দ্রশেখর আসিয়া সেই অগ্নিপর্ব্বত মধ্যে এক গণ্ডূষ জল নিক্ষেপ করিলেন, অমনি অগ্নিরাশি নিবিয়া গেল; শীতল পবন বহিল, কুণ্ডমধ্যে সচ্ছসলিলা তরতরবাহিনী নদী বহিল, তীরে কুসুম সকল বিকশিত হইল, নদী জলে বড় বড় পদ্মফুল ফুটিল—চন্দ্রশেখর তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন। কখন দেখিল, এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আসিয়া শৈবলিনীকে মুখে করিয়া তুলিয়া পর্ব্বতে লইয়া যাইতেছে; চন্দ্রশেখর আসিয়া পূজার পুষ্পপাত্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া ব্যাঘ্রকে ফেলিয়া মারিলেন, ব্যাঘ্র তখনই ছিন্নশিরা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।" অসহ্য নরকযন্ত্রণায় শৈবলিনী দগ্ধ হইতেছে—শৈবলিনী অন্ধ, বধির, মূতা, অথচ জ্ঞান আছে, যন্ত্রণা বোধ করিতেছে; শৈবলিনী স্বামীকে ডাকিল, বলিল "এই খানে আসিয়া, চরণযুগল আমার মস্তকে তুলিয়া দাও—তাহা হইলেই আমি নরক হইতে উদ্ধার পাইব।" তখন শৈবলিনীর বোধ হইল "কে তাহাকে কোলে করিয়া বসাইল—তাঁহার অঙ্গের সৌরভে দিক্ পূরিল, সেই দুরন্ত নরকরব সহসা অন্তর্হিত হইল, পূতিগন্ধের পরিবর্ত্তে কুসুমগন্ধ ছুটিল। সহসা শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচিল, চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল—সহসা শৈবলিনীর বোধ হইল—এ মৃত্যু নহে, জীবন; এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত।" এ সকল দেবচরি-

ত্রের উপকরণ; চন্দ্রশেখরও মনুষ্যাকারে দেবতা। কবি শৈবলিনীর স্বপ্নদর্শনচ্ছলে এই দেবভাব সুন্দর প্রকটিত করিয়াছেন—এই বর্ণনায় চন্দ্রশেখর চরিত্রের অপরিমেয় গৌরব ও গাম্ভীর্য্য, মহত্ব ও মাধুর্য্য অতি অল্প কথায় উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

মানব প্রকৃতির চিত্রমূলক কাব্য, প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর কাব্য মানব প্রকৃতির যথাযথ চিত্র, অপর শ্রেণীর কাব্য, মানব প্রকৃতিতে কি সম্ভবে, মানব প্রকৃতি কোন্ ভাবে পরিণত হইলে সংসার সুখময় হইয়া উঠে, তাহারই আদর্শ। এক শ্রেণীর কাব্যের ফল জ্ঞান, অন্য শ্রেণীর কাব্যের ফল জ্ঞান ও উন্নতি। এক শ্রেণীর কাব্যে মানুষকে বলিতেছে, দেখ তুমি কি, অপর শ্রেণীর কাব্যে দেখাইতেছে মানুষ কি হইতে পারে, মানুষ কি হইলে ভূতলে স্বর্গ সৃষ্টি হয়। চন্দ্রশেখর এই শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্যের শ্রেষ্ঠতম। এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠতম বলিলে অত্যুক্তি হয় কি না বলিতে পারি না। নৈতিক জগতে এই শ্রেণীর কাব্যে যেরূপ বিপ্লব ঘটাইতে সক্ষম, অন্য কিছুতেই সেরূপ নৈতিক পরিবর্ত্তন সম্ভাবিত হয় না। ভারতে রামায়ণের এবং ইয়ুরোপে যীশুচরিতের ফল ইহার দৃষ্টান্ত। অদ্যাপি সভ্য জগতের একার্দ্ধ পরাহিতে সমর্পিত জীবন, ক্ষমার অবতার যীশুখ্রীষ্টের উপাসক, অপরার্দ্ধের নিকট, লোকরঞ্জনার্থ, রাজকর্ত্তব্যানুরোধে জীবনসর্ব্বস্ব প্রিয়জন বিসর্জ্জনকারী, নিঃস্বার্থতার প্রতিমূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্র ঈশ্বরের অবতার। আমরা এস্থলে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত কাব্যকেই কেবল কাব্য বলিতেছি না, এরূপ কাব্যের অস্তিত্ব অন্য রূপেও সম্ভবে। আমরা চন্দ্রশেখর-কাব্য সমালোচন করিতেছি না। তবে চন্দ্রশেখর এ কাব্যের জীবন স্বরূপ, তাই এ কাব্য সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে। চন্দ্রশেখর কাব্যের সুফল সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, চন্দ্রশেখর চরিত্রেও তাহা সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তনীয়। এক একটি মহাসত্য প্রচার জন্য এক এক খানি মহাকাব্যের সৃষ্টি। চন্দ্রশেখর মহাকাব্যে অনেক মহাসত্য প্রকটিত হইয়াছে, কবি অনেক মহৎশিক্ষার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। প্রধানতঃ পরোপকার মহাব্রত শিখাইবার জন্য চন্দ্রশেখর কাব্যের সৃষ্টি। দুঃখবিহীন, নিরবচ্ছিন্ন সুখপরিবৃত মনুষ্যজীবন কিরূপ তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। কিন্তু মনুষ্যজীবন কাব্যময় করিতে পারিলে, দুঃখেও সুখ হয় ইহা মনুষ্যকল্পনার ধারণের অযোগ্য নহে। হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেই কখন না কখন অনুভব করিয়াছেন যে,আপনার স্নেহের বা প্রেমানুরাগের পাত্রের দুঃখমোচন বা সুখবিধানের জন্য দুঃখস্বীকারেও সুখ জ্ঞান হইয়া থাকে। যদি এই জগৎ সংসারকে আপনার স্নেহ বা প্রেমানুরাগের পাত্র করিয়া জগৎ সংসারের সেবায় জীবন নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তবে যে সে কাব্যময় জীবনে দুঃখেও সুখবোধ হইতে পারে, এ কল্পনা নিতান্ত অমূলক নহে। পরোপকাররূপ মহাব্রত গ্রহণ করিয়া সকলে সকলের দুঃখ নিবারণে নিযুক্ত থাকিলে, পরস্পরের পরহিত চেষ্টায় কেবল সংসারের সাধারণ দুঃখভার হ্রাস হয় তাহা নহে, পরসুখ বিধানে এবং পরদুঃখ মোচনে সুখজ্ঞানে ব্যক্তিগত দুঃখও হ্রাস হইয়া ব্যক্তিগত সুখ বৃদ্ধি হয়। আর যে হৃদয়ে এরূপ বিস্তৃত সহানুভূতি সম্ভবে, দুঃখে সে হৃদয়ের

বিহ্বলতা জন্মাইতে পারে না। সুখ দুঃখ অনুভূত করিয়াও সে হৃদয় সমুদ্রবৎ অটল থাকে। যিনি এরূপ হৃদয়ের অধিকারী তিনি দুঃখেও অনেক স্থলে সুখানুভব করেন। এ সংসারে আমরা যাহাকে দুঃখ বলি, অনেক স্থলে সে দুঃখের মধ্যে সুখ নিহিত রহিয়াছে। সেই সুখের জন্য সে দুঃখও অনেক সময়ে বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে। মনুষ্যমন, মনুষ্যজীবন কাব্যময় করিতে প্যারিলে অনেক দুঃখই এই ভাব ধারণ করে—মনুষ্যজীবন এক প্রকার ইন্দ্রজালে পরিণত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় সুখের উৎপত্তি করে। চন্দ্রশেখর কাব্যে, এ ব্রতের দীক্ষা-গুরু রমানন্দ স্বামী; চন্দ্রশেখর শৈবলিনী বিরহে গৃহত্যাগী হইলে, রমানন্দ স্বামী তাঁহাকে এই ব্রত অবলম্বন করাইলেন। অনন্ত বুদ্ধিশালী, মানব হৃদয়ের কাণ্ডারী, রমানন্দ স্বামী জানিতেন, এই মহাব্রত গ্রহণই চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী বিচ্ছেদ দুঃখ ভুলিবার এক মাত্র উপায়। চন্দ্রশেখরও গুরুর উপদেশে এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়া দেখাইয়াছেন, যে আপন দুঃখ ভুলিয়া বিশ্বসংসারের দুঃখভার বহনের জন্য হৃদয় প্রস্তুত করণে হৃদয়ের যে অলৌকিক বীরভাব তাহা তাঁহাতে সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিল। চন্দ্রশেখর কাব্যের তৃতীয় মহাপুরুষ প্রতাপও পরহিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া পরোপকার ধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে। কিন্তু প্রতাপের পরোপকার পরহিতে জীবনোৎসর্গ নহে, তাহা প্রতাপের প্রবল লোকধর্ম্মানুরাগের পরিচয়, তাহা প্রতাপের নীতি বীরত্বের প্রমাণ। চন্দ্রশেখরের পরোপকার ব্রত গ্রহণের অর্থ স্বার্থের অস্তিত্ব বিলোপ এবং পরার্থে জীবনোৎসর্গ। প্রতাপ মানুষ—ধর্ম্ম পালন জন্য মনুষ্য প্রবৃত্তির বেগ রোধে বা আত্মনিগ্রহে যে ক্লেশের উৎপত্তি প্রতাপকে তাহা সহ্য করিতে হইয়াছে। চন্দ্রশেখর দেব প্রকৃতি, চরিত্রে যে সকল মহদ্ভাবের-অবতারণ করা হইয়াছে, তাহাই সে চরিত্রের প্রকৃতি, যখনই যে ভাব উদ্বোধের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সেই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাইয়াছি। প্রতাপের বীরত্ব প্রশংসনীয়, চন্দ্রশেখরের প্রকৃতি উচ্চ। রমানন্দ স্বামীর প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বোধ হয় কোন দেবতা স্বর্গ ছাড়িয়া ভূতলে আসিয়া, প্রচ্ছন্ন ভাবে মানব দুঃখের উপশম চিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্ন ছিলেন; চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া বোধ হয়, মনুষ্যের সুখ দুঃখ কি তাহাই দেখিবার জন্য, আপনার হৃদয়মহত্ত্বে সংসারকে—এই সুখ দুঃখময় মানবজীবনকে কি রমণীয় ভাবে সমাবৃত করা যাইতে পারে; মানুষকে তাহাই শিখাইবার জন্য, কোন দেবতা মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; আর প্রতাপ মানবশ্রেষ্ঠ, প্রতাপ দেখাইয়াছেন, মানুষও দেবতা হইতে পারে।

• ইয়ুরোপীয় জীবন কার্য্যমূলক, বিষয়োন্নতির উপযোগী, বিষয় বাসনা পরিলিপ্ত; হিন্দু জীবন কাব্যমূলক, হিন্দুর মতে বিষয় প্রকৃতি সুখের বিঘ্নকারী। বিষয়োন্নতি ও প্রতিপত্তিলাভ ইয়ুরোপীয় জীবনের লক্ষ্য; হিন্দু জীবনের লক্ষ্য, বিষয় সম্বন্ধ হইতে যত দূর সম্ভব বিচ্ছিন্ন থাকিয়া মনোজগতের সুখ সংবর্দ্ধন। ইয়ুরোপীয়ের লক্ষ্য বাহ্যাড়ম্বর; হিন্দুর লক্ষ্য আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য। ইয়ুরোপীয় সভ্যতা প্রকৃতির উপর মানবাধিপত্য বিস্তারে শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে, কার্য্যসৌকার্য্যার্থ এবং সামাজিক সুখ শান্তির জন্য, সামাজিক রীতি

প্রকৃতির উন্নতি; হিন্দুর মতে শরীরকে মনের অধীন করিয়া, অন্তর্জগতের উন্নতি সাধনই প্রকৃত সভ্যতা—সমাজনীতির উন্নতি সে উন্নতির অন্তর্গত। ইয়ুরোপীয় সভ্যতার অর্থ মনুষ্যের নীচ প্রকৃতির উন্নতি—পাশব প্রকৃতির চরিতার্থতা; হিন্দু সভ্যতার অর্থ মনুষ্যের উচ্চ প্রকৃতির উৎকর্ষসাধন—মনুষ্যের দেবভাবের পরিপুষ্টি সম্পাদন। ইয়ুরোপীয় সভ্যতার শিক্ষা "তোমার পদোন্নতির, তোমার সুখসাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা কর, যদি কোন প্রবৃত্তির পরিতোষ করিতে গেলে, যদি কোন প্রলোভনের অনুগামী হইলে, সামাজিক সুখশান্তির ব্যাঘাত জন্মে, তবে তাহা হইতে বিরত থাকিও. কারণ এরূপ সমাজকর্ম্ম প্রতিপালন না করিলে তোমার আমার সকলেরই অশান্তি জন্মিবে।" হিন্দু সভ্যতার শিক্ষা "শরীর সম্বন্ধীয় যাহা,তাহা কিছুই নহে—তাহা অধম প্রকৃতির উপযুক্ত, উত্তমের তাচ্ছল্যের জিনিস; হৃদয়ের উন্নতি কর, তোমাতে যে দেবভাব আছে তাহা পরিপুষ্ট করিয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন কর, তোমার নীচ প্রকৃতি, পাশব প্রবৃত্তি, আপনিই বিলুপ্ত হইবে, প্রলোভনে তোমাকে আকৃষ্ট করিবে না, তুমি দেবত্ব লাভ করিবে।" প্রতাপ-সৃষ্টি ইয়ুরোপীয় সমাজেও সম্ভবপর; কিন্তু হিন্দু মস্তিষ্ক ভিন্ন. চন্দ্রশেখর এবং তদুপরি রমানন্দ স্বামীর সৃষ্টি কতদূর সম্ভব বলিতে পারি না। প্রতাপকে ইয়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ আদর্শ ধরিলে, কবির মনোরম সৃষ্টি চন্দ্রশেখর ও রমানন্দ স্বামী দেখাইতেছে সে সভ্যতা এখনও কত নিকৃষ্ট, মানবজাতির পূর্ণোন্নতি হইতে এখনও কতদূরে। প্রতাপ বিষয়ী, কিন্তু বিষয় সম্বন্ধীয় নিকৃষ্ট ভাব বিরহিত; লোকধর্ম্মানুরাগ, নৈতিক উন্নতি, তাঁহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে—ইহাই হিন্দু সভ্যতার প্রারম্ভ। চন্দ্রশেখর বিষয় মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, কিন্তু বিষয় তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না; তিনি বিষয়স্পৃহাশূন্য, বিষয়ীর অন্তর্ভূত হইয়াও বিষয়ী নহেন—ইহাই হিন্দু সভ্যতার পার্থিব পূর্ণাবস্থা। রমানন্দ স্বামী বিষয় সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া মানব দুঃখ নিরাকরণ চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, সৃষ্টির কুশল কামনা করিতেছেন, নিজের জন্য কিছুই নহে, সকলই পরের জন্য—ইহাই হিন্দু সভ্যতার চরম, অতিবিষয়িক, বা স্বর্গীয় অবস্থা। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, বহু শতাব্দীর চিন্তায়, হিন্দু যাহা বুঝিয়াছিল, চন্দ্রশেখর-প্রণেতা আজ নূতন করিয়া বঙ্গ সমাজকে তাহাই শিখাইতেছেন। চন্দ্রশেখরের চরিতা কেবল কবি নহেন. তিনি সমাজের শিক্ষাগুরু। প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, রমানন্দ স্বামী—এই তিনের সম্মিলনে মানবোন্নতির পূর্ণাবস্থা, আর এই পূর্ণভাব বুঝিবার জন্য অসম্পূর্ণ, অধম প্রকৃতিরও প্রয়োজন। যেমন উত্তমের মধ্যে রমানন্দ স্বামী বুঝিবার জন্য চন্দ্রশেখরের প্রয়োজন, চন্দ্রশেখর বুঝিবার জন্য প্রতাপের প্রয়োজন, তেমনই প্রতাপের মহত্ব বুঝিবার জন্য অধম ফষ্টর ও তকির অস্তিত্ব অপরিহার্য্য। আবার জীবিত দৃষ্টান্তে সমাজধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা বুঝিবার জন্য, প্রতাপের নীতিবীরত্ব, চন্দ্রশেখরের হৃদয়মহত্ব, আর সুন্দরীর প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বুঝিবার জন্য শৈবলিনীর মতিভ্রমও আবশ্যক। হিন্দু সকল ছাড়াইয়া, বিষয় সম্বন্ধ একেবারে পরিহার করিয়া রমানন্দ স্বামীতে পরিণত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; মনুষ্য প্রকৃতি বিবেচনা করিলে, মানব সমাজের সর্ব্বাঙ্গে এরূপ

উন্নতি অসাধ্য বলিয়া প্রতীতি হয়। এ সকলের সমবায়েই মনুষ্য সমাজের প্রকৃত উন্নতাবস্থা, ইহা ছাড়াইয়া অধিকতর উচ্চে উঠিবার জন্য, অধিকতর সুখভোগের জন্য বোধ হয় মনুষ্যের সৃষ্টি হয় নাই, ইহাই বোধ হয় মানুষের ভাগ্য। সমাজে দশ বিশ জন রমানন্দ স্বামী, আর এই রূপ গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট পরহিত-ব্রতাবলম্বী দুই চারি শত চন্দ্রশেখর থাকিবে। অবশিষ্টের অধিকাংশ প্রতাপ হইবে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য দুই চারি জন ফষ্টর ও ভকিও থাকিবে। তাহা হইলেই মানবোন্নতির চরম হইল। মনুষ্যমাত্রেরই অধম প্রকৃতির বিলোপ করিয়া আমিশ্র দেবভাব সংস্থাপনের, মনুষ্যমাত্রকেই রমানন্দের ন্যায় সন্ন্যাসীতে পরিণত করিবার চেষ্টা অতি মহৎ হইলেও ভ্রমপূর্ণ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আর হিন্দু সভ্যতার পতনও, বোধ হয়, প্রধানতঃ এই ভ্রম হইতে উৎপন্ন। চন্দ্রশেখর কাব্যে ইয়ুরোপীয় সভ্যতার অভাব এবং হিন্দু সভ্যতার ভ্রম, এ উভয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর কাব্যে, কবি মানব সমাজের পূর্ণাবস্থার আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছেন। এ সামান্য সৃষ্টি নহে।

জীবন গতি নির্ণয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মনুষ্যদিগের সামাজিক অবস্থার বৈষম্য।

"They have neither assemblies for consultation nor *themistes*, but every one exercises Jurisdiction over his wives and children, and they pay no regard to one another." Homer's Odyssey.

The condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium." Herbert Spencer.

মানব জাতির আদিম অবস্থায় এক একটী পরিবার এক একটী স্বতন্ত্র জাতির ন্যায় অপরাপর পরিবার হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিত। প্রত্যেক পরিবারস্থ পিতা কিম্বা গৃহস্বামী আপন আপন পুত্র কন্যা ও অপরাপর পরিবারবর্গকে অপ্রতিহত ক্ষমতা সহকারে শাসন করিতেন। তৎকালে পিতা কিম্বা গৃহস্বামীর আদেশই গৃহস্থিত পরিবারবর্গের সম্বন্ধে এক মাত্র বিধান (আইন) বলিয়া পরিগণিত হইত। পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করিলে পিতা কিম্বা গৃহস্বামী তাহাদের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজা কিম্বা শাসন কর্ত্তাদিগের পারস্পরিক ব্যবহার ও কার্য্যের মধ্যে যদ্রূপ বাহ্যিক আড়ম্বর দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় এক একটী পরিবারের সহিত অপরাপর পরিবারের পারস্পরিক ব্যবহার তদ্রূপ বাহ্যিক আড়ম্বরপরিপূর্ণ ছিল। সেই সকল

বাহ্যিক আড়ম্বরপরিপূর্ণ কার্য্যকলাপই কাল-সহকারে বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান সভ্যতা সম্ভূত শিষ্টাচার রূপে বিকাশিত হইয়াছে।*

বর্ত্তমান সময়ে আমরা এক একটী নর নারীকে সমাজের এক একটী পরমাণু স্বরূপ মনে করি। কিন্তু পৃথিবীর আদিম অবস্থায় এক একটী পরিবার সমাজের এক একটী পরমাণু স্বরূপ ছিল। তৎকালে জন বিশেষের বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র অবস্থা কখন ব্যবহার ও কার্য্যেতে স্বীকৃত হইত না। এক একটী পরিবারের সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি, এবং ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র সকল পারিবারিক সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। পরিবারস্থ জনবিশেষের কোন প্রকার স্বতন্ত্র স্বত্ব ও অধিকার ছিল না। এক পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি অপর কোন পরিবারের বিরুদ্ধে অন্যায়াচরণ করিলে অনিষ্টকারী ব্যক্তির পরিবারস্থ সমুদায় লোককে (বিশেষতঃ গৃহস্বামীকে) তজ্জন্য অপরাধী হইতে হইত। ভারতবর্ষে ঈদৃশ আদিম সামাজিক অবস্থা কালসহকারে নানা প্রকার রূপান্তরিত হইয়া যে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রচলিতছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, রাজা-যুধিষ্ঠির শকুনির নিকট অক্ষ ক্রীড়ায় পরাজিত হইলে ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি সমুদায় ভ্রাতাগণই যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞা দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে এক দেশীয় রাজার সহিত অন্য কোন দেশীয় রাজার কোন সন্ধি সংস্থাপন উপলক্ষে যদ্রূপ নানাবিধ বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়; মানবদিগের আদিম অবস্থায়ও বিবাহ উপলক্ষে এক পরিবারে একটী কন্যা অপর পরিবারের কোন ব্যক্তির নিকট সম্প্রদান করিবার সময় তাদৃশ বাহ্য আড়ম্বর পরিপূর্ণ নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। বিবাহ উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় পুরা-প্রচলিত গোত্রান্তর প্রথা, এতাদৃশ সামাজিক ব্যবহারের বিদ্যমানতা বিলক্ষণ রূপে সপ্রমাণ করিতেছে। কন্যার পিতা কিম্বা কন্যা পক্ষীয় পরিবারের গৃহস্বামী অগ্নিসমক্ষে কন্যাকে স্বীয় গোত্র হইতে বিবর্জ্জিত করিয়া বিবাহার্থী বরের গোত্র ভুক্ত করিয়া দিতেন। গোত্রান্তর কার্য্যের প্রকৃত মৌলিক অর্থ—"এলেকা পরবর্ত্তন" (Change of Jurisdiction) গোত্রান্তর কার্য্য দ্বারা গোত্রান্তরিত কন্যা এক পরিবারের গৃহস্বামীর শাসনাধীন হইতে নির্মুক্ত হইয়া অপর পরিবারের গৃহস্বামীর শাসনাধীনে অর্পিত হইত। অর্থাৎ এক পরিবার হইতে বিসর্জ্জিত হইয়া অপর পরিবারের অঙ্গীভূত হইত। পুরাকালে কেবল কন্যাগণ গোত্রান্তরিত হইত না, সময় সময় যুবকগণও গোত্রান্তরিত হইয়া অপরাপর পরিবারের অঙ্গীভূত হইত। পুরুষদিগের ঈদৃশ গোত্রান্তরপ্রাপ্তির প্রথা হইতেই নানাদেশে দত্তক গ্রহণের প্রথা সমুৎপন্ন হইয়াছে।

কিন্তু কাল সহকারে এই প্রকার গোত্রান্তর প্রথা এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণ নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্নাবস্থাপন্ন পরিবার সমূহের মধ্যে সম্মিলন ও সদ্ভাব উৎপন্ন হইতে লাগিল। এবং তৎপরে কার্য্যবিভাগ কিম্বা শ্রম বিভাগ (division of labour)

* "As law differentiates from personal commands, as morality differentiates from religious injunctions, so *politeness* differentiates from ceremonial observance." Herbert Spencer.

পদ্ধতি বহুল পরিমাণে প্রবর্ত্তিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার পরস্পরের সহিত নানাবিধ সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল।* কিন্তু সমাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেই ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের পারস্পরিক সামাজিক অবস্থার বৈষম্য সমুপস্থিত হইল। বস্তুতঃ ভিন্ন ভিন্ন পরিবার পরস্পরের সহিত সামাজিক সূত্রে সম্মিলিত হইলে তাহারা সমান অবস্থাপন্ন হইয়া অধিক কাল সমভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। ঈদৃশ সামাজিক বৈষম্য যে সকল কারণে সমুৎপন্ন হয়, তাহাই এই পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইবেক।

এই পুস্তকের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এক একটী পরমাণু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কি ভাবে অবস্থিতি করে এবং কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহা নির্ণয় করা যেরূপ আমাদিগের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত, সেই প্রকার সামাজিক ভারাপৃষ্টমানব প্রকৃতি কল্পনাতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এক একটী জড় পদার্থকে আমরা পরমাণুর সমষ্টি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু জড়পদার্থ হইতে এক একটী পরমাণু তুলিয়া লইতে পারি না। মনুষ্য সমাজ হইতেও এক একটী নর নারীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার জীবনগতি নির্ণয় করা যায় না। বস্তুতঃ মানবমণ্ডলীর আদিম অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও একেবারে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য সংসর্গ শূন্য মানব জীবন কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহাদের সেই আদিম অবস্থাতেও তাহারা দুই চারি কি দশ বারটী মনুষ্য একত্রিত হইয়া (অর্থাৎ এক পরিবার ভুক্ত হইয়া) অবস্থিতি করিত। ঈদৃশ পরিবার ভুক্ত হইয়া বাস করিবার পূর্ব্বে আদিম মনুষ্যগণ পশ্বাদির ন্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে কিরূপে বিচরণ করিত, তাহা নিশ্চয়রূপে সহজে অবধারণ করা যায় না। ডারউইনের মতানুসারে মনুষ্যগণ পরিবার-ভুক্ত হইবার বহুপূর্ব্বে বানররূপে বিচরণ করিত; এবং সেই বানর দেহ হইতে মনুষ্যাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া বিকাশিত হইলে ক্রমে পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিল। কিন্তু বানর দেহ হইতে কি কি ঘটনা ও কিরূপ অবস্থা প্রযুক্ত মনুষ্যদেহ সমুৎপন্ন হইল, বানর জাতি কতদূর সমুন্নত হইলেই বা মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে পারে, এবং বর্ত্তমান সময়ে দুইটি প্রাচীন বানর কেন মনুষ্য হইতেছে না, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ডারউইন বোধ হয় উল্লেখ করেন নাই, অথবা ডারউইনের মত সম্পূর্ণ রূপে অবিশ্বাস করিলেও তাহা উপহাসাস্পদ বলিয়া মনে করি না। এই সম্বন্ধে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, এই সকল দুরূহ প্রশ্ন মীমাংসা করা আমাদিগের সাধ্যাতীত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বিজ্ঞান চক্ষে দৃষ্টি করিলে, মানব জাতির সৃষ্টি সম্বন্ধে বাইবেল ও বেদ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে যে প্রকার মত প্রতিপাদিত হইয়াছে, তদপেক্ষা ডারউইনের মত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। পরমেশ্বর যে সৃষ্টির প্রারম্ভে একটি স্ত্রী ও একটী পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং সমুদায় মানবমণ্ডলী তাহাদিগের বংশসম্ভূত, ঈদৃ-

* "In the social organism integrative changes are clearly and abundantly exemplified. Uncivilized societies display them when wandering families, such as we see among Bushmen, join into tribes of considerable number." Herbert Spencer.

যুক্তি বিরুদ্ধ মত কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই গ্রহণ করিতে পারে না। জগতের আদিম মনুষ্য প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেও তন্মধ্যে সামাজিক ভাব নিবন্ধন প্রত্যেক মানব জীবনে বিবর্ত্তনবিকাশিত জীবন গতি পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং একটী স্ত্রী ও একটী পুরুষ যে জগতে প্রথমতঃ সৃষ্টি হইয়াছিল, ঈদৃশ মত আমরা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করি না।

বিবর্ত্তনবিকাশিত জীবন গতির প্রকৃত অর্থ কি, তাহা এতদ্‌পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহ স্বীয় স্বীয় পারমাণব গতি কিম্বা আভ্যন্তরিক গতি বিলোপান্তর প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্নাবস্থা হইতে রূপান্তরিত হইয়া সংযোগাবস্থা প্রাপ্তিনিবন্ধন, যদি প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ যে সকল অন্যান্য পরমাণু কিম্বা অংশের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাদিগের প্রকৃতি ও গুণ লাভ করে, এবং তন্নিবন্ধন সংযোগোৎপন্ন পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ পূর্ব্বে অসংযুক্ত অবস্থা সম্ভূত স্বকীয় একবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার হয়, এবং প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে আবার প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ বিভিন্নতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহারা প্রত্যেকেই যে বিবর্ত্তিত হইয়া নুতন আকারে বিকাশিত হইল, এই প্রকার বলা যাইতে পারে।

কিন্তু বিবর্ত্তন নিবন্ধন বিকাশের এই সংজ্ঞাটী সাধারণের সহজ বোধগম্য করিবার জন্য উদাহরণ দ্বারা ইহার এক একটী অংশ পৃথক রূপে ব্যাখ্যা করা উচিত বোধ হইতেছে।

একটী পরিবারের মধ্যে-স্বামী স্ত্রী পুত্র ও কন্যা এই চারিটী লোক অবস্থিতি করিতেছে। এই পরিবারস্থ এক একটী লোক এক একটী পরিমাণু স্বরূপ। এই চারিটী পরমাণুর সংযোগ কিম্বা সম্মিলন দ্বারা একটী পরিবার গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ঈদৃশ চারিটী পৃথক পৃথক পরমাণুর সংযোগ কিম্বা সম্মিলন নিবন্ধন এক একটী পরমাণু কিম্বা লোক আপন আপন প্রকৃতি সম্বন্ধে যে যে প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বিবর্ত্তন বিকাশিত জীবন গতির অর্থ সম্বন্ধে সম্যক রূপে ব্যুৎপত্তি লাভ হইতে পারে।

প্রথমতঃ এই চারিটী পরমাণু কিম্বা চারিটী লোকের প্রত্যেকেরই জীবনের পারমাণব গতি কতক পরিমাণে হ্রাস না হইলে তাহারা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে সমর্থ হইত না। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে অপর তিন ব্যক্তির অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বিসর্জ্জন না করিলে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিত না। সুতরাং এইস্থানে বিচ্ছিন্ন অবস্থাপন্ন চারিটী পরমাণু কিম্বা চারিটী মনুষ্য স্বীয় স্বীয় জীবনের স্বতন্ত্রগতি বিসর্জ্জন নিবন্ধন সংযোগাবস্থা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু আবার এই সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি নিবন্ধন (অর্থাৎ একত্রিত হইয়া বাস করিতেছে বলিয়া) তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের অবস্থা পারস্পরিক ব্যবহার ও কষ্ট দ্বারা রূপান্তরিত হইতে থাকে। অর্থাৎ পিতার শারীরিক ও মানসিক কার্য্যকলাপের ফলাফল ও দোষ গুণ স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার জীবনের পরিবর্ত্তন করে; স্ত্রীর

শারীরিক ও মানসিক কার্য্যকলাপের দোষ গুণ স্বামী, পুত্র ও কন্যার জীবন রূপান্তরিত করে; পুত্রের কার্য্যকলাপের ফলাফল, পিতা মাতা ও ভগ্নীর জীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে; এবং কন্যার কার্য্যকলাপের ফলদ্বারা অপর তিন জনের জীবন গতি রূপান্তরিত হইতে থাকে। এই চারিটী লোকের মধ্যে কোন সংযোগ না থাকিলে এবং তাহারা প্রত্যেকেই পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া কালযাপন করিলে, একজনের কার্য্যকলাপের ফল অপরের জীবন স্পর্শ করিত না। সুতরাং সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি নিবন্ধন প্রত্যেকের জীবনগতি অপরাপরের কার্য্যকলাপের দ্বারা রূপান্তরিত হইতেছে।

কিন্তু ইহাদের পারস্পরিক কার্য্যকলাপ দ্বারা প্রত্যেকের জীবনগতি রূপান্তরিত হইলেও ইহারা সকলেই এক প্রকার জীবন প্রাপ্ত হয় না। ইহারা প্রত্যেকেই পরস্পরের গুণ ও প্রকৃতিসম্ভূত ফলাফল সম্ভোগের অধিকারী হইয়াও জীবনের অবস্থা সম্বন্ধে বৈষম্য ও বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগের মধ্যে এক জন পিতার প্রকৃতি, দ্বিতীয় মাতার প্রকৃতি, তৃতীয় পুত্রের প্রকৃতি এবং চতুর্থ কন্যার প্রকৃতি লাভ করিতেছে।

এইক্ষণ চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবেক যে, ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন দ্বারা কোন বস্তু কি বিষয় বিবর্ত্তিত হইয়া বিকাশিত হয়।

প্রথমতঃ—পরমাণু কিম্বা অংশ সকল স্বীয় পারমাণব গতি অথবা আভ্যন্তরিক গতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ—পরমাণু কিম্বা অংশ সকল পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রকৃতিই পরস্পরের সংঘর্ষণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় এবং প্রত্যেকেই অপরাপর সকলের প্রকৃতি ও গুণের ফলাফল লাভ করে।

তৃতীয়তঃ—প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ পরস্পরের গুণ ও প্রকৃতিসম্ভূত ফলাফলের দ্বারা রূপান্তরিত হইলেও তাহারা সকলে এক প্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে পারে না। প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে তাহারা প্রত্যেকেই বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। এবং সমজাতীয় ভাব (homogeneousness) পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষমাবস্থা। (heterogeneousness) লাভ করিতে থাকে।

সংযোগোৎপন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের অংশ কিম্বা পরমাণু সকল যে সমস্ত কারণ নিবন্ধন এক প্রকৃতিবিশিষ্ট না হইয়া প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে বিভিন্নতা লাভ করে, তাহাই বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। এবং আমরা এইক্ষণ তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

বিশ্ব-সংসারের সৃষ্টি কৌশলমধ্যে গতির অক্ষয় বিদ্যমানতা (continuity of motion) এবং শক্তির বিলয়শূন্য অবস্থিতিই (persistence of force) অবিশ্রান্ত পরিবর্ত্তনের মূলকারণ। যদি গতি ও শক্তির রূপান্তর ভিন্ন কোন প্রকার বিলয় সম্ভবপর হইত, তবে বিশ্বসংসারের পরিবর্ত্তনের স্রোত কোন এক সময়ে অবশ্য স্থগিত হইত। গতি ও শক্তির অবিনশ্বরত্ব প্রযুক্ত বিশ্বসংসার মধ্যে কোন পদার্থ অবস্থা, ঘটনা কিম্বা বিষয় পরিবর্ত্তন-শূন্য হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না। মনুষ্যদিগের সামাজিক অবস্থার বৈষম্যের মূল কারণ, শক্তির বিলয়শূন্য অবস্থিতি ও গতির অক্ষয় বিদ্যমানতা। কিন্তু শক্তি ও গতি সকল পরিবর্ত্তনেরই মূল

কারণ। সুতরাং কোন পরিবর্ত্তন বিশেষের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার অব্যবহিত কারণ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা উচিত। ক্রমান্বয়ে মধ্যবর্ত্তী অব্যবহিত কারণ সকল উল্লিখিত না হইলে আদি কারণ ও শেষ ফল, এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সংযোগ উপলব্ধি হইতে পারে না। বৃষ্টির কারণ সমুদ্র, এই প্রকার কথিত হইলে বৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। কিন্তু উত্তাপ দ্বারা সমুদ্র জল বাষ্পরূপে পরিণত হয়; এবং বাষ্প হইত মেঘের উৎপত্তি হয় ও মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, এই প্রকার মধ্যবর্ত্তী কার্য্য কারণ সকল উল্লিখিত হইলে সমুদ্র জল যে বৃষ্টির কারণ, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। অতএব সামাজিক বৈষমের অব্যবহিত কারণ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা উচিত।

পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহের সম্মিলন দ্বারা কোন সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয় সৃজিত হইলে প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ (mutual interdependence)ও অবস্থানের বিভিন্নতা নিবন্ধন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা উপস্থিত হয়। অসংখ্য অসংখ্য পরমাণু দ্বারা পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী সংস্থাপিত পরমাণু সকল পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থিত পরমাণু অপেক্ষা মধ্যাকর্ষণ দ্বারা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানের পরমাণু এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠস্থিত পরমাণু এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে।* আবার পৃথিবীর উপরিস্থিত পরমাণু সকল সূর্য্যের উত্তাপে যদ্রূপ রূপান্তরিত হয়, পৃথিবীর গর্ভস্থ পরমাণু সেই প্রকার সমভাবে সূর্য্যোত্তাপ দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় না। সুতরাং সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থের পরমাণু কিম্বা অংশ সকল স্ব স্ব অবস্থানানুসারে প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এতভিন্ন আরও অসংখ্য অসংখ্য কারণ নিবন্ধন সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহের মধ্যে বিভিন্নতা সমুপস্থিত হয়। আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি যে, সংযোগ-উৎপন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের পরমাণু কি অংশের সমজাতীয় অবস্থা সর্ব্বদাই অচিরস্থায়ী এবং বিচলস্পন্ন। (the condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium) অংশ কিম্বা পরমাণু সকল সংযুক্ত হইলে তাহাদিগের সমজাতীয় ভাব কখনও সমরক্ষিত হইতে পারে না। তাহারা বিষমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ভাবী পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত সেই ভাবে অবস্থিতি করে।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মানব জাতির আদিম অবস্থায় এক একটী পরিবার একটী পৃথক জাতির ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিত। কিন্তু কাল সহকারে সেই সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিবারের সম্মিলন দ্বারা সমাজ গঠিত হইলে, তাহাদের পরস্পরের অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্নতা উপস্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতা বিবর্ত্তন নিবন্ধন বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফল। তুলযন্ত্রের (scales) দুই দিকে সমান ভাব বিশিষ্ট বস্তু রাখিলে যদ্রূপ মুহূর্ত্তকাল সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করিতে না করিতে বিচলিত সমভাব প্রযুক্ত এক দিক নিম্নগামী এবং অপর

* "When a uniform aggregate is subject to a uniform force, its constituents, being differently conditioned, are differently modified."—Herbert Spencer.

দিক উপরে উঠিতে থাকে, সেই প্রকার মনুষ্যগণ সামাজবদ্ধ হইবামাত্র বিচলিত সমতা (unstable equality) প্রাপ্ত হইয়া বিষমাবস্থা লাভ করে। বস্তুতঃ বিচলিত সমভাব যে কেবল যন্ত্রবিজ্ঞানের (mechanic) তুলযন্ত্র প্রভৃতির কার্য্য মধ্যে পরিলক্ষিত হয়,তাহা নহে। বিশ্বসংসারের সমুদায় সংযোগ-উৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের পরমাণু কিম্বা অংশ সকল সংযোগ নিবন্ধন বিচলিত সমভাব প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক সুসভ্য জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে, সমাজাবদ্ধ মানবমণ্ডলীর জীবন বিচলিত সমভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিতি করে। ফরাশি দেশীয় রাজবিপ্লবের ইতিহাস (History of the French Revolution) মানবদিগের সামাজিক জীবনের বিচলিত সমভাবের বিদ্যমানতা স্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ করিতেছে। কিন্তু মানব জীবনের বিচলিত সমভাব সমাজগঠন কালে যদ্রূপ অনুভূত হয়, সমাজগঠন কার্য্য পূর্ণ হইলে আর তদ্রূপ থাকে না। সামাজিক উন্নতির (social progress) মধ্যেই কেবল বিচলিত সমভাব পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে সামাজিক শৃঙ্খলার স্থায়ীভাব (Social order) দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে মানব জীবনের বিচলিত সমভাব বিষমাস্থায় পরিণত হইয়া স্থায়ী বিষমাবস্থা অবলম্বন করে।

ফরাশিদেশের রাজা, ষোড়শ লুইর প্রাণদণ্ডের পর ফরাশিদিগের সামাজিক শৃঙ্খলার স্থায়ীভাব (social order) রাজবিপ্লব নিবন্ধন একবারে বিনষ্ট হইল। ঈদৃশ সামাজিক বিশৃঙ্খলার সময়ে মানব জীবন স্বভাবতঃই বিচলিত সমভাব (unstable equality) প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ তৎকালে পূর্ব্ব-প্রচলিত সামাজিক বিভিন্নতা একেবারে বিলোপ হইল। তখন রাজা প্রজা সকলেই সমান। এই সকলের "সমান অধিকার" "সকলের স্বাধীনতা" এবং "সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব" ("Equality" "liberty" and "Fraternity") ঈদৃশ চীৎকার দ্বারা ফরাশি রাজ্য নিনাদিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই চীৎকারের চরম ফল কি হইল? সমজাতীয় অবস্থা সর্ব্বদাই বিচলিত এবং অচিরস্থায়ী। সমাজের মধ্যে প্রত্যেক মনুষ্য মানবমণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থানুসারে সমাবস্থাপন্ন এবং সমভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না। সুতরাং ফরাশিদিগের সেই চীৎকার বৃথা হইল। তাঁহারা সমাজস্থিত সকল নর নারীর সমান অধিকার সংস্থাপন করিতে যাইয়া অবশেষে বীর চূড়ামণি নেপোলিয়ান বনাপার্টের অপ্রতিহত এবং কঠোর শাসন শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন।

রাজবিপ্লব দ্বারা ফরাশিদিগের সামাজিক শৃঙ্খলার স্থায়ীভাব (social order) প্রথমত বিনষ্ট হইল; এবং পূর্ব্ব-প্রচলিত সামাজিক বিভিন্নতা বিদূরিত হইল। রাজবিপ্লব নিবন্ধন যে কয়েক বৎসর ফরাশি রাজ্য অরাজক এবং বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল, তখনই কেবল রাজা প্রজা সকলেই সমান অবস্থাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু নৈসর্গিক নিয়ম কেহ পরাস্ত করিতে পারেনা। মানবদিগের সমজাতীয়ভাব এবং পরস্পরের তুল্যাবস্থা সর্ব্বদাই অচিরস্থায়ী এবং বিচলম্পন্ন। সুতরাং অচিরাৎ ফরাশি সমাজের মধ্যে আবার সামাজিক বৈষম্য উপস্থিত হইল, নেপোলিয়ান বনাপার্ট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া সামাজিক সম-

জাতীয় ভাব বিনাশ করিলেন এবং ফরাশি-দিগের সমাজে পুনরায় সেই সামাজিক বিভিন্নতা (social distinctions) প্রবর্ত্তিত হইল।

এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, যদি মানব প্রকৃতির উন্নতির কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা থাকে এবং কোন সমাজস্থ প্রত্যোক নর-নারী সেই নির্দ্দিষ্ট সীমা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই কেবল সামাজিক সমজাতীয় ভাব চিরকাল সমরক্ষিত হইতে পারে, এবং মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক নরনারী সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল সমভাবে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, সামাজিক সমজাতীয় ভাব অচিরস্থায়ী এবং বিচলম্পন্ন। অর্থাৎ (the condition of homogeneity is the condition of unstable equilibrium.)

ভারতে পৌত্তলিকতা।

বর্ত্তমান ও ভূত কালের ইতিহাস পাঠ করিলে প্রায় সমস্ত দেশেই ত্রিবিধ পৌত্তলিকতা দেখিতে পাওয়া যায়। অসভ্য বা বর্ব্বর পৌত্তলিকতা, (Fetichism) বৈদিক পৌত্তলিকতা বা প্রকৃতি পূজা, (Worship of Nature) পৌরাণিক পৌত্তলিকতা বা পুত্তল পূজা। (Idolatry.)

প্রস্তর বৃক্ষ ও সরীসৃপাদির পূজাকে আদিম, অসভ্য বা বর্ব্বর পৌত্তলিকতা বলে। প্রশান্ত ও দক্ষিণ মহাসমুদ্র দ্বীপবাসী অসভ্য লোক, আফ্রিকার অনেক অসভ্য জাতি এবং ভারতের অধিকাংশ আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে অদ্যাপি এই আদিম পৌত্তলিকতাই প্রচলিত রহিয়াছে। জনসমাজের প্রাথমিক অবস্থায় এরূপ পৌত্তলিকতাই স্বাভাবিক। যে সময়ে মানুষ প্রায় পশুর অবস্থায় থাকে, নগ্নদেহে ফল মূল বা আমমাংস ভক্ষণ করিয়া ভূগর্ভে বা তৃণকুটিরে জীবন ধারণ করে, তখন মানুষের অভিজ্ঞতা অতি সামান্যই থাকে, এবং চিন্তা শক্তিও অপরিস্ফুটই থাকিয়া যায়। সে সময়ে ভয়, বিদ্বেষ ও পাশব ভালবাসার অতিরিক্ত আর কোন ভাবই প্রায় উপলব্ধি করিতে পারে না। সুতরাং আপনার চারিদিকে জগতের যে সকল পদার্থ দেখিতে পায়, মানুষ তাহা লইয়াই তৃপ্ত থাকে। কিন্তু ধর্ম্মের ক্ষুধা—ভক্তির অযাচিত ও অস্ফুট অনুশাসন প্রতি মানবাত্মায় নিহিত; তাই অসভ্য অবস্থায়ও মানব জড় পদার্থের মধ্যে যাহার কিছু বিশেষ গুণ ও শক্তি দেখিতে পায়, তাহাতেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাহার পূজাকরে। পূজা করে বলিলে ঠিক হয় না,—তাহাকেই ভয় করে এবং সন্তুষ্ট রাখিতে যত্ন করে।

জন-সমাজের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-জ্ঞান ও ঈশ্বরোপাসনার আদর্শ উন্নত হইতে থাকে। সুতরাং তখন জড় পদার্থ সকলের পূজার স্থানে ক্রমে জড় প্রকৃতির পূজা আরম্ভ হয়। ভিন্ন ভিন্ন জড়ের পূজা

পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জড়ের উৎপাদক এক জড় পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী কল্পনা করিয়া উহার পূজা করিতে থাকে। তখন শীতল-সলিলা স্রোতস্বতী, তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্র এবং শস্যোৎপাদক মৃদু-বর্ষণকারী মেঘের স্বতন্ত্র পূজা না হইয়া জলের অধিষ্ঠাত্রী বরুণের কল্পনা হয়, এবং তাহার পূজা হইয়া থাকে। এইরূপে দাবাগ্নি, বাড়বাগ্নি ও বজ্রাগ্নির স্বতন্ত্র পূজা লুপ্ত হইয়া এক অগ্নির পূজা হইয়া থাকে। জনসমাজের সভ্যতার ক্রমের সঙ্গে তদ্রূপ হওয়াও স্বাভাবিক। কেন না, ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ হইলে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জড়কে জড় প্রকৃতির এক অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারে। জ্ঞানের অভাবে পূর্ব্বে ক্ষুদ্র জড়কেই ঈশ্বর মনে করিত। জ্ঞান কথঞ্চিৎ উন্নত হইলে, তাহা না করিয়া প্রকৃতির ঐ অঙ্গ বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী কল্পনা করিয়া থাকে। স্থূল জড় পরিত্যাগ করিয়া একটুক সূক্ষ্মতে গমন করিয়া থাকে। কেবল যে মানুষের জ্ঞানের উন্নতিতেই এরূপ হয়, তাহা নহে। মানুষের হৃদয় অর্থাৎ অন্তরের ভাবও প্রশস্ত হইয়া পড়ে; এইজন্য আর ক্ষুদ্র জড়ে অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঈশ্বর লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সেই সময়ে ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রার্থনা প্রভৃতিও উন্নত ও কিয়ৎ পরিমাণে আধ্যাত্মিক হইয়া থাকে।* প্রকৃতি পূজার এই কারণ। এই অবস্থার পরেই মানুষের একেশ্বরবাদী হইবার—প্রকৃততত্ত্বে উপস্থিত হইবার কথা। কেননা জড় জগতের প্রতি বিভাগে, জড় সৃষ্টির প্রতি অঙ্গে, এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনার পর, মানবের জ্ঞান আরো কিছু উন্নত হইলে মানুষ অবশ্যই দেখিতে পাইবে যে, জড় প্রকৃতির একই অধিষ্ঠাত্রী—জড় সৃষ্টির একই প্রাণ। কিন্তু জগতে ইহা ঘটে নাই, মানুষ প্রকৃতির পূজা পরিত্যাগ করিলেই বিশুদ্ধ একেশ্বর বাদে উপনীত হইতে পারে নাই। প্রকৃতি পূজার পর সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের জগৎময় কর্ত্তৃত্বের ভাব সকল সমাজ মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় বটে কিন্তু আর এক আপদ থাকিয়া মানুষের ধর্ম্মোন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া ঐ ভাবের উন্নতি ও প্রচার হইতে দেয় নাই। সে আপদ পৌরাণিক পৌত্তলিকতা।

বৈদিক পৌত্তলিকতা হইতে যে পৌরাণিক পৌত্তলিকতা হীন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ পৌরাণিক পৌত্তলিকতায় বহু ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে এবং ঈশ্বরের মহান ভাবের অনেক খর্ব্বতা হইয়াছে, এবং ধর্ম্ম জটিল হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ধর্ম্মের সরল সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের অনেক হ্রাস হইয়াছে। জনসমাজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির সঙ্গে এরূপ অবনতি কেন হইল?

অন্যান্য স্থানে পৌরাণিক পৌত্তলিকতার কেন সৃষ্টি হইল, ইহার পূর্ণ উত্তর দিতে পারি না। ভারতবর্ষে কেন হইল, তাহার কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি। পৌরাণিক পৌত্তলিকতার প্রধান কারণ নরপূজা (Hero-worship)। মানুষ বহুকাল অচেতন জড়ের পূজা করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারিল না। সূক্ষ্ম কল্পনা-প্রিয় হইয়া এবং কেবল জ্ঞান-লব্ধ প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে তৃপ্ত হইতে না পারিয়া, ভক্তির আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, বিশেষ ক্ষমতাশালী মনুষ্যকে

* ঋগ্বেদের প্রার্থনা সকল এ কথার সুন্দর পরিচয় স্থল।

দেবাবতার বা দেবাংশ বলিয়া পূজা করিতে লাগিল। সকল দেশেই এইরূপ দেবাংশ মনুষ্যদিগকে ইন্দ্র বরুণ যম ও সূর্য্য প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়া পৌরাণিক ধর্ম্মের (mythology) সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাতন দুই সভ্য জাতি হিন্দু ও গ্রীকদিগের প্রায় সমস্ত পুরাণের এইরূপে উৎপত্তি।

ভারতবর্ষে প্রকৃতি পূজা যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, মীশর, গ্রীশ বা অন্য কোন প্রাচীন সভ্য দেশে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল দেশেই আদিম বা বর্ব্বর পৌত্তলিকতার পরেই একযোগে প্রকৃতি পূজা ও পুত্তলপূজা দেখিতে পাওয়া যায়। মীশর দেশে সভ্যতার সময়েও লোকে কুম্ভীর, পলাণ্ডু, আইসিস (Isis) নামক বাস্তুদেবতা ও সূর্য্য প্রভৃতির পূজা করিত। অদ্যাপি ভারতবর্ষে লোকে সর্প, গঙ্গা, তুলসী ও অসংখ্য পুত্তলের পূজা করে। ভারতের বর্ত্তমান পৌত্তলিকতা ত্রিবিধ পৌত্তলিকতার মিশ্রণ মাত্র। যে ব্যক্তি শালগ্রাম ও সর্পের পূজা করে, সেই "জবা কুসুম সঙ্কাশং" বলিয়া সূর্য্যকে প্রণিপাত করিতেছে, আবার সেই কালীকৃষ্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতাদিগের মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিতেছে। ভারতে বর্ত্তমানে পৌত্তলিকতার তিন মূর্ত্তিই বিরাজিত। কিন্তু পুরাতন কালে গমন কর, এমন একদিন ছিল, যখন ভারতীয় আর্য্যগণ একমাত্র প্রকৃতি-পূজক ছিলেন, বৃক্ষলতা বা প্রতিমাপূজা করিতেন না। সেই প্রকৃতি পূজার মন্ত্র, প্রার্থনা ও অনুষ্ঠান সংগৃহীত হইয়া জগতের আদি গ্রন্থ বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদের পরে ভারতে এরূপ অবনতি কেন হইল? বেদের লিখিত প্রকৃতি পূজার লোপ হইয়া ভারতীয় আর্য্যসমাজে কেন আবার জড়ও পুত্তল পূজার প্রাদুর্ভাব হইল এ অতি দুরূহ প্রশ্ন। এরূপ হইবার তিনটী কারণ আমরা স্থির করি। (১) সাধারণ শিক্ষার অভাব, (২) জাতিভেদ (৩) বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিযোগিতা।

বেদে লিখিত প্রকৃতিপূজা বহু দোষ যুক্ত, কিন্তু তথাপি ধর্ম্মভাবের উচ্চতা ও সরলতা হেতু তৎকালে প্রশংসনীয়। বেদের পর বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদের সময়ে ত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিশ্বাস অনেক মার্জ্জিত ও উন্নত হইয়াছিল। অনেক স্থলে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদও স্বীকৃত হইয়াছিল। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই মহাবাক্য তৎকালেই ভারতক্ষেত্রে উচ্চারিত হইয়াছিল। আবার কেন নিকৃষ্টতর পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইল? ইহার প্রধান কারণ, সাধারণ শিক্ষার অভাব ও জাতিভেদ। ভারতবর্ষে জাতিসাধারণ জ্ঞান ও বিশ্বাসে উন্নত হইয়াছিল না। অজ্ঞান সমাজে উন্নত ধর্ম্মমত স্থান পায় না, পাইলেও তাহার উচ্চতা রক্ষা হয় না। ফিজি দ্বীপের অধিবাসীরা সর্পের পূজক ছিল; সুতরাং উপাস্য দেবতাকে খুব ভয় করাই তাহাদিগের ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণছিল। যখন ঐ স্থানে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রথম প্রচার হয়, তখন ঐ দ্বীপবাসীরা ভজনালয়ে উপাসনা কালীন ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিত। খ্রীষ্টীয় প্রচারকেরা শেষ কালে জানিতে পারিলেন যে, উহারা উপাস্য দেবতার ভয়েই ঐরূপ করিয়া থাকে। উহারা খ্রীষ্টধর্ম্মের মত গ্রহণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অজ্ঞানতা হেতু উহার উচ্চতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। ভারতে অতি অল্প সংখ্যক লোক জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনা করিতেন, অপর সাধারণ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং সাধা-

রণ লোক সমাজ মূর্খ জড়োপাসকই থাকিল।

যে অল্প সংখ্যক লোক জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনা করিতেন, তাঁহারাও আপনাদিদিগের মত ও বিশ্বাসের উচ্চতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কারণ—জাতিভেদ। ভারত-সমাজে প্রচারের ভাব কস্মিন কালেও ছিল না। যদি প্রচারের ভাব প্রবল থাকে, তাহা হইলে নিতান্ত বর্ব্বর সমাজেও অল্প কতক লোক আপনাদিগের উচ্চমত ও বিশ্বাস লইয়া অব্যাহত থাকিতে পারে। কেন না, প্রচারের ভাব প্রবল থাকিতে বাহিরের কুদৃষ্টান্ত ও মূর্খতায় তাহাদিগের তত অপচয় করিতে পারে না। বিশেষতঃ তাহাদিগের উচ্চমত ও বিশ্বাস ক্রমে প্রচারিত হইয়া জনসমাজে ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। ভারতে সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রীজাতি এবং সমাজের তিন চতুর্থাংশ শূদ্রদিগের বেদ বেদান্তের আলোচনায় অধিকার ছিল না। ভুলেই করুন, তার দুরভিসন্ধিতেই করুন, সমাজের পরিচালকেরা নিষ্ঠুর জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া কি করিলেন?—না, সমাজের যোড়শ ভাগের পঞ্চদশ ভাগ লোককে জ্ঞান ধর্ম্মের অনুশীলনে বঞ্চিত রাখিলেন। ষোল জনের মধ্যে একজন জ্ঞান ধর্ম্মের আলোচনা করিতে পারিল। সেও আবার জাতিভেদের খাতিরে আপনার ভাক্ত মর্য্যাদা (false position) রক্ষা করিবার জন্য, অপর সকলকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য নানা কৌশল ও কুটিল পথ অবলম্বন করিল। ইহার ফল কি হইয়াছে? না, অবশেষে মাকড়সা আপনার জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ দেখ, যে ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব পুরুষ "সত্যং শিবমদ্বৈতং" বলিয়া ভগবানের আরাধনা করিয়াছেন, সেই আজ মৃত্তিকা দ্বারা কুৎসিত মূর্ত্তি গড়াইয়া পশু-পূজায় পরিতৃপ্ত হইতেছে! তোমার কি সাধ্য, তাহাকে সহজে ঐ পতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার কর?

ভারতের বর্ত্তমান পৌত্তলিকতার অপর কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিযোগিতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতের বর্ত্তমান পৌত্তলিকতা ত্রিবিধ পৌত্তলিকতারই মিশ্রণ। উহাতে যেমন শালগ্রাম ও সর্পের পূজা আছে, তেমনই অগ্নি ও বরুণের পূজা আছে, আবার তেমনই কৃষ্ণ কালী ও অন্যান্য অসংখ্য পৌরাণিক দেবতারও পূজা আছে। অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার অভাব ও জাতিভেদের প্রভাবে আর্য্যগণ উচ্চতর প্রকৃতি পূজা হইতে সম্যক না হউক, অনেক দূর চ্যুত হইয়া পড়িয়াছিলেন; পুনরায় জড়োপাসনা (Fetichism) কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বন করিয়াছিলেন। তারপর কল্পনা-প্রিয়তা ও নর পূজায় পুরাণের যে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসান কালে তাহার বিপুল বৃদ্ধি পাইয়া ভারতবর্ষকে তেত্রিশ কোটী দেবতার ক্রীড়াভূমি করিয়াছিল। হায়, যে ভারতের লোকসংখ্যা তখন পঞ্চ কোটীও ছিল না, সেই ভারতে পূজা ও নৈবেদ্যের ভিখারী দেবতা তেত্রিশ কোটী। ভারতে অভাবনীয় ধর্ম্মদুর্ভিক্ষ ঘটিল; অনাহারে ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি হাহাকার করিতে করিতে মরিয়া গেল!!

বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান কালে ভারতে পুরাণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল কেন?—আর হইয়াছিল যে, তাহার প্রমাণ কি? কেন হইয়াছিল, তাহার কারণ আছে। বহু শতাব্দী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ভারতে একাধিপত্য

করিয়া ঘোরতর স্বেচ্ছাচার আরম্ভ করিয়াছিল, আমার আড়ম্বর এবং নিতান্ত অশ্লীলতা প্রভৃতি নানা দোষ ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্থলবর্ত্তী হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের অত্যাচারে ও ব্রাহ্মণের একাধিপত্যে আর্য্যাবর্ত্ত নিপীড়িত হইয়াই যেন আর্ত্তনাদ করিতেছিল। সকলেই জানেন, সেই আর্ত্তনাদে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জন্ম। অসার আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান বিলোপ করিয়া ধর্ম্মকে জ্ঞানময় ও অধ্যাত্ম করা, এবং ব্রাহ্মণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বিনাশ করিয়া সমাজে সাম্য স্থাপন করাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম সাধন করিয়াছিল। কিন্তু সেই সাম্য ও সেই ধর্ম্মজ্ঞান চিরস্থায়ী হইল না। সহস্র বৎসর আধিপত্য করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন হইতে লাগিল। নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের আলোচনা করিয়া, ভক্তি ও অনুষ্ঠান হইতে ক্রমেই দূরবর্ত্তী হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব লোপ পাইল; উহা নাস্তিকতাতে পরিণত হইল। নাস্তিকতা দুই এক ব্যক্তির জীবনকে দুঃখময় করিতে পারে বটে, কিন্তু লোকসমাজে তিষ্টিতে পারে না। কেননা মানব সমাজ—মানব হৃদয় মনের সমষ্টি, ধর্ম্ম বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোকসমাজ হইতে পলায়ন করিয়া জঙ্গলে ও মঠে আশ্রয় লইল।

ব্রাহ্মণেরাও সুযোগ পাইল। অপহরণকারী দুর্ব্বল বা স্থানান্তর হইলে, হৃত-সম্পত্তিকের সন্তানেরা যেমন সুযোগ পায়, লাঞ্ছিত ব্রাহ্মণেরাও তেমনই সুযোগ পাইল। তাহারা তাহাদিগের ধর্ম্ম মত ও আপনাদিগের প্রাধান্য প্রচার করিতে লাগিল। সেই প্রচারের উপায় পুরাণ-রচনা। কতক গুলি পুরাণের উপাখ্যান তত ভাল নয়। কিন্তু অধিকাংশ পুরাণের উপাখ্যান সুন্দর, উহাতে মনোহর কল্পনা আছে। ভারতের সাধারণ সমাজ নীরস জ্ঞানালোচনা ও নাস্তিকতা হইতে রক্ষা পাইয়া আগ্রহের সহিত পৌরাণিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণেরা শত কল্পনা যোজনা করিয়া জনসাধারণের সেই ধর্ম্মের ক্ষুধা পূরণ করিতে লাগিল। জনসাধারণ বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর লোক অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশ লোক শূদ্রদিগকে আয়ত্ত করিবার আর এক কৌশল ব্রাহ্মণগণ অবলম্বন করিল। তাহারা শূদ্রাদির পূর্ব্ব-পূজিত অনেক অনার্য্য দেবতাকে আর্য্যধর্ম্মে স্থান দিল। এইরূপে কালী ও শিব এবং অপরাপর অনেক দেবতা বর্ত্তমান ভারতীয় পৌত্তলিকতায় স্থান পাইয়াছে। বেদোক্ত প্রকৃতি পূজার সঙ্গে চড়ক পূজা প্রভৃতির তুলনা করিলেই ইহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতে পারে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময়ে যে ব্রাহ্মণগণ বহু পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এ স্থলে একটীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণ রচিত বুদ্ধপুরাণে লিখিত আছে যে, এক সময়ে দৈত্যগণ বড় ক্ষমতাশালী ও অত্যাচারী হইয়া উঠিল, উহারা বেদবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মের বাধা দিতে লাগিল। সকল দেবতা প্রতীকারের জন্য বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে, ভগবান বিষ্ণু মায়া মোহ রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। সেই মায়া মোহই বুদ্ধ। মায়া মোহ অর্থাৎ বুদ্ধ রূপে বিষ্ণু, দৈত্যদিগের মধ্যে অজ্ঞান ও কুশিক্ষা প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহাতেই ক্রমে তাহারা নির্ম্মূল হইল কি

আশ্চর্য্য কৌশল! পুরাণলেখক ব্রাহ্মণ দেখিল যে, মহাপুরুষ বুদ্ধের প্রচারিত মহান সত্য সকলের বিরুদ্ধে একটী কথাও সে কহিতে পারে, তেমন শক্তি তাহার নাই। অতএব বুদ্ধকে অস্বীকার বা আক্রমণ না করিয়া সে কুটিল কৌশল অবলম্বন করিল। বুদ্ধ দ্বারা তৎপচারিত মতকে ভ্রান্ত প্রমাণ করাইল। অপার বুদ্ধি কৌশল! কিন্তু এই কৌশল করিতে গিয়া স্বকীয় উপাস্য দেবতাকে ঘোরতর প্রবঞ্চক করিতেও কুণ্ঠিত হইলনা। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয় হওয়া চাই। বুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় বটে, হৃদয়ের হীনতারও একশেষ পরিচয় হইল। ভারতের ব্রাহ্মণ বহুকাল ধর্ম্মে পতিত।

এতক্ষণ ভারতের বর্ত্তমান পৌত্তলিকতার উৎপত্তির বিষয় বলিলাম। পৌত্তলিকতার ভ্রান্ততা ও অপকারিতা অনেকেই স্থূল ভাবে স্বীকার করেন, বিশেষ রূপে ভাবিয়া দেখেন না। এখন তাহারই আলোচনা করিব।

পৌত্তলিকতার ভ্রান্ততা বিষয়ে অগ্রে কয়েকটী কথা বলিতেছি। (১) ঈশ্বর অনন্ত। যে যাঁহাকে ঈশ্বর মনে করে, সেই তাঁহাকে কোনরূপে সীমাবিশিষ্ট মনে করিতে পারে না। অনন্ত ঈশ্বর ক্ষুদ্র আয়তনে আবদ্ধ হইবেন কিরূপে? তবে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেন কৈ?

(২) ঈশ্বর ইচ্ছাময়, ইচ্ছা শক্তি দ্বারা তিনি জগৎ কার্য্য সমাধা করেন। কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য যদি তাঁহাকে শরীর ধারণ করিতে হয়, তবে তাঁহার ইচ্ছা শক্তি খর্ব্ব হইয়া যায়।

(৩) আকার দিলেই কেবল এক বা একাধিক জড়ের আকার দিতে হয়। জড় পদার্থ মাত্রেরই কতকগুলি গুণ আছে, গুণবিহীন জড় ভাবিতেও পারা যায় না। সুতরাং আকারের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে জড়-গুণ বিশিষ্ট বা জড় স্বভাবের অধীন মনে না করিয়া পারা যায় না। ইহাতে উপাসকের মনে ঈশ্বরের ভাব খর্ব্ব ও হীন হইয়া পড়ে। আকার দেওয়া দূরে থাকুক, যাঁহারা নিরাকারবাদী, তাহারাও ঈশ্বরে মানুষী ভাব আরোপ করিয়া অনেক সময়ে ধর্ম্মকে হীন করিয়া ফেলেন। খ্রীষ্টান-দিগের পুরাতন ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিলে নিরাকার ঈশ্বরকেও ক্রোধোন্মত্ত দেখিতে পাওয়া যায়! ঈশ্বরে এইরূপে মানুষীভাব আরোপ করাকে ইংরাজীতে (Anthropomorphism) বলে। এটী বড় গুরুতর আপদ। যদি মহিষদিগের ঈশ্বর-জ্ঞান থাকিত,তাহা হইলে এ আপদে পড়িয়া তাহারাও ঈশ্বরকে দীর্ঘ শৃঙ্গ ও পুচ্ছবিশিষ্ট মনে করিত সন্দেহ নাই! ঈশ্বরকে মানুষের আকার দিতে যাইয়া ভরতের উপাস্য বিষ্ণু নিদ্রালু, শ্রীকৃষ্ণ লম্পট ও শিব মাতাল হইয়া পড়িয়াছে! পৌত্তলিকতায় বিড়ম্বনার সীমা নাই; অনন্ত অধ্যাত্ম ঈশ্বরের পূজার জন্য কদলি, তণ্ডুল ও ছাগ-শোণিতেরও প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ বলিতেছেন:—

"মন তোমার এই ভ্রম গেলনা।
জগৎকে সাজালেন যিনি, দিয়ে কত রত্ন সোণা,
তুমি কোন্ লাজে সাজাবে তাঁরে, দিয়ে ছাই ডাকের গহনা!
ব্রাহ্মাণ্ড যে মায়ের ছেলে, তাঁর কি আছে পর ভাবনা?
তুমি তাঁরে তুষ্ট করতে চাওরে হত্যা করে ছাগল ছানা!!"

(৪) পুত্তল নির্ম্মাণ করিয়া ঈশ্বরের প্রকৃত পূজাই হইতে পারে না। উপাসক মাত্রকেই এক দিকে ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তা ও অপর দিকে প্রাণস্যপ্রাণ বলিতে হয়। এরূপ বিশ্বাস ভিন্ন প্রকৃতি উপসনা কি রূপে হইবে? বাহিরের পুত্তল "প্রাণস্য-প্রাণ" কি রূপে হইবে? যদি ঈশ্বর বাহিরের পুত্তল হইয়াও ইচ্ছা শক্তিতে আমার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, কিম্বা যদি পুত্তল রূপে আমার গৃহে থাকিয়াও সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া থাকেন, তবে তো তিনি ঐ ক্ষুদ্র হস্তপদ দ্বারা কিছুই করিতেছেন না; নিরকার শক্তিস্বরূপ হইয়াই কার্য্য করিতেছেন। বাস্তবও ঈশ্বরকে আকার-বিশিষ্ট মনে করাই আমাদের নিকট অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত সাধক বলেন—

"বিশ্বেশ্বর হে, নও তুমি কেবল কাশীবাসী;
আমি যে দিকে ফিরাই আঁখি, সেই হয়
আমার বারাণসি।"

ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারেন না; ঐ রূপ কল্পনাই অসম্ভব। জ্ঞান তাঁহাকে পাইবার পথ পরিষ্কার করে, প্রেম তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী করে, বিশ্বাসে তাঁহাকে দেখা যায়, এবং বিবেকে তাঁহার আদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবান অতীন্দ্রিয়; তৃণ কাষ্ট মৃত্তিকা বা প্রস্তরে তাঁহার আকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মানুষী ধর্ম্ম আরোপ করা ধর্ম্মের ঘোরতর ব্যভিচার বই কিছুই নহে।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ব
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

"তিনি চক্ষুর গ্রাহ্য নহেন; বাক্য বা অপরাপর ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন; কঠোর তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। জ্ঞান প্রসাদে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।"

হায়, যে দেশে এ সকল বাক্য উচ্চারিত হইয়াছিল, এরূপ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, সে দেশের কি অধোগতি! মাটীর পূজা করিতে করিতে সে দেশের লোকের হৃদয় মন "মাটী" হইয়া গিয়াছে!

এ দেশের পুত্তল পূজকদিগের অনেকেরই মুখে একটী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বলেন—নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরই সত্য,কিন্তু ধর্ম্মার্থীরা প্রথমতঃ তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না; এ জন্যই তাঁহার রূপ কল্পনার আবশ্যকতা। শাস্ত্রেও লিখিত আছে "সাধকানাং হিতার্থে চ ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা।"

এই কথায় কিছু সার আছে কি না দেখা যাউক। এই শাস্ত্র বাক্যের কোন সার নাই, উহা কেবল পৌত্তলিকতার পোষণ জন্যই রচিত হইয়াছে। ঈশ্বরের রূপ কল্পনার প্রয়োজন কি? পরিদৃশ্যমান অনন্ত সৃষ্টিতেইত ঈশ্বর বিরাজিত। এই বিশ্বে ঐশী ভাব উদ্দীপক অনন্ত রূপ ও তত্ত্ব আছে। তবে দশ হস্ত, পঞ্চ মুণ্ড বা তিন চক্ষু বিশিষ্ট অস্বাভাবিক মূর্ত্তি গড়িয়া তাহাতে "প্রাণ প্রতিষ্ঠা" কর কেন? জগৎপ্রাণ ঈশ্বরের আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, কি মূর্খতা! ঈশ্বরের কি আবার রূপ কল্পনার প্রয়োজন আছে? ঐ শোন ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক কি বলিছেন——

"গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা মণ্ডলে চমকে মোতিরে।

ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতিরে।” (১)

অনন্ত মহান ঈশ্বরের আবার মাটীর মূর্ত্তি! প্রকৃত উপাসক বলিতেছেন “গগন রূপ থালে চন্দ্র সূর্য্যদীপ এবং তারকা রূপ অসংখ্য রত্ন জ্বলিতেছে, মলয় পবন ধূপের সুগন্ধ বিস্তার ও চামর ব্যজন করিতেছে। সমস্ত বনরাজি পুষ্পিত হইয়া তাঁহার আরতি করিতেছে।” যদি জড় জগতে ঈশ্বরকে দেখিতে চাও তবে এই রূপে দেখ। ঈশ্বরের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি হইতে পারে না, ঈশ্বরের মূর্ত্তির প্রয়োজন নাই। তিনি জড় প্রকৃতির প্রাণ, তিনি প্রাণস্য প্রাণ, তাঁহার সত্তা সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। তাই একবার বলি——

“এ জগতের মাঝে, যেথানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ;
বিবিধ বরণে বিভূষিত করে,
তদুপরে তব নামটী লিখেছ।
পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় তোমার দয়াল নামটী লেখা;
সুন্দর নামে নামাঙ্কিত পাখীর পাখা,
প্রেমানন্দ নাম নয়নে লিখেছ।”

আবার বলি——

আমার হৃদয় কানন ভূমি,
কত যে সাজালে তুমি,
পুণ্যের চন্দ্রমা হয়ে (তাতে) হতেছ উদয়;
(আবার) যখন পাপবিকারে,
পড়ে মোহ অন্ধকারে,
সংসার সাগর মাঝে, প্রাণ কাঁদে হাহাকারে,
(তখন)আশার আলোক হয়ে দাও হে অভয়।

কি জড় জগৎ, কি অধ্যাত্ম জগৎ, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও কার্য্যের পরিচয় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অতএব তাঁহার রূপ কল্পনার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মের রূপ কল্পনায় সাধকের “হিত” না হইয়া অহিত হয়। উহাতে নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা-শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। কেন না, যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল অন্ধকারে থাকা সাধন করে, পরে আলোতে আসা তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠে। যখন ঈশ্বর কি, তাহা একেবারেই বুঝিতে না,তখন যে বৃক্ষলতা বা মৃত্তিকা প্রস্তরের পূজা করিতে; তাহা মার্জনীয় ছিল। যদি বুঝিয়া থাক ঈশ্বর নিরাকার, নিরাকার সাধনই আরম্ভ কর। যদি বল নিরাকার সাধন বড় দুরূহ। উহা বাস্তবিক দুরূহ নহে। তুমি দুরূহ মনে করিলেই কি, জলে না নামিয়া সাঁতার শিখিবে কি রূপে? মাটী খাইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি বা দেহ পুষ্টি করিতে কেহ পারে কি?

বর্ত্তমান সময়ে এ দেশের পৌত্তলিকদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) যাহারা পুত্তল পূজায় প্রকৃত রূপে বিশ্বাসী। (২) যাহারা বিশ্বাসী নহে, অথচ ব্যবসায় বা লোকাচারের বশবর্ত্তী হইয়া পুত্তল পূজা করে। (৩) যাহারা পুত্তল পূজা করে না, কিন্তু আমোদ প্রমোদে বা পদ মর্য্যাদা রক্ষার জন্য পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া এবং পৌত্তলিকতার অপকারিতায় উদাসীন থাকিয়া প্রকারান্তরে পুত্তল পূজার প্রশ্রয় দেয়।

এই তিন শ্রেণীর লোককেই আমরা চতুর্ব্বিধ অপরাধে অপরাধী করি। তাঁহাদিগের প্রথম অপরাধ এই যে, তাঁহারা নিজ নিজ আত্মাকে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে হীন রাখিয়া অধোগতি প্রাপ্ত করিতেছেন।

দ্বিতীয় অপরাধ এই যে, তাঁহারা দেশের নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবনতি

(১) শিখদিগের আদি গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।

দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতেছেন। ধর্মোন্নতি ভিন্ন কোন সমাজে ঐ সকল দুরবস্থা বিদূরিত হয় না। দৈহিক বল, লোক বল, অর্থ বল বা বিজ্ঞান বল, এ সকলই নিকৃষ্ট; সামাজিকদিগের হৃদয় মনের বলই শ্রেষ্ঠ বল এবং সকল বলের মস্তকে অবস্থিতি করে। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ। লোক বল, অস্ত্র বল বা অর্থ বল বিহীন হইয়াও তাঁহারা সমাজে সর্ব্বময় কর্তৃত্ব করিয়াছেন। ধর্ম্ম মত শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্ম বিশ্বাস দৃঢ় না হইলে মানুষের অন্তরে সেই বল সঞ্চিত হয় না। পৃথিবীতে যখনই যে সম্প্রদায় উন্নত হইয়াছে বা অন্যের উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছে, তাহাদিগেরই ধর্ম্ম বিশ্বাস দৃঢ় ও ধর্ম্মমত উন্নত ছিল। বর্ব্বরদিগের উপরে ভারত-বিজয়ী আর্য্যদিগের, নর-বলিদাতাদিগের উপর বৌদ্ধদিগের, ধর্ম্ম হীন বৌদ্ধ বা নাস্তিকদিগের উপর পুনরায় ব্রাহ্মণদিগের, নিকৃষ্ট পুত্তল পূজকদিগের উপর মুসলমানদিগের, বিলাসী মুসলমানের উপরে শিখ্‌দিগের আধিপত্য ইহার প্রমাণ। বিদেশে আরও শত শত প্রমাণ আছে, সে সকলের উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

তাঁহাদিগের তৃতীয় অপরাধ এই যে, তাঁহারা সমাজে বিষম বৈষম্য ঘটাইয়া থাকেন। পৌরাণিক পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই পূজক বা পুরোহিত নামক এক শ্রেণীর লোক থাকা আবশ্যক। কেন না, ঈশ্বরকে বহু রূপে কল্পনা করিয়া বহুবিধ পূজার বিধি নির্দ্দেশ করিলে প্রতি ব্যক্তির পক্ষে তদ্রূপ ধর্ম্মপালন অসম্ভব—তেত্রিশ কোটী দূরে থাকুক, তেত্রিশ দেবতার ঐরূপ পূজা করাও প্রতি ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং কতকগুলি লোককে ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী করিয়া অসত্যে জীবন যাপন করিতে, অপর লোক সাধারণকে ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ও পূজকদিগের নিকট হীন করিয়া রাখিতে হয়। অনর্থক কি দারুন বৈষম্য—অন্তরে বাহিরে লোক সমাজের কি দুর্গতি!

তাঁহাদিগের চতুর্থ অপরাধ এই যে, পৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তাঁহারা সমাজের অনেক পরিশ্রম ও অর্থ অনর্থক নষ্ট করেন। সজনে, নির্জ্জনে, দিবসে, নিশীথে যখন ইচ্ছা, জীব হৃদয়স্থ দেবতাকে স্মরণ, মনন ও ধ্যান করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে। সে স্থলে অসংখ্য দেবতা কল্পনা করিয়া ও অসংখ্যরূপে পূজার ব্যবস্থা করিয়া কত অনাবশ্যক উপকরণের সৃষ্টি হইয়াছে। কর্ণপটহ-ভেদকারী ঢক্কা, নিরীহ ছাগ-শিশুসংহারী খড়্গ হইতে আরম্ভ করিয়া কুশুকোষ ও পীটম্বরী পর্য্যন্ত কত দ্রব্যে সমাজের কত অর্থ ও কত পরিশ্রমের অনর্থক প্রয়োজন হইয়াছে। সমাজের সুখ, সুবিধা বা অধ্যাত্ম মঙ্গলের জন্য এ সকল আয়োজনের কোন প্রয়োজন নাই। বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা সাত কোটী, ইহার মধ্যে হিন্দু পাচ কোটী হইবে। যদি শরৎকালে এই পাঁচ কোটী লোকের প্রতি সহস্র ব্যক্তির মধ্যে এক খানি দুর্গাপ্রতিমা প্রস্তুত হয়, এবং যদি প্রত্যেক প্রতিমায় গড়ে দশ টাকা করিয়া খরচ হয়, তবে দেখ প্রতি বর্ষে পঞ্চাশ হাজার প্রতিমা নির্ম্মিত হইতেছে এবং পাঁচ লক্ষ টাকা জলে যাইতেছে। প্রতিমা নির্ম্মাণে যত ব্যয় হয়, পৌত্তলিক পূজার অপরাপর কার্য্যেও তত ব্যয় হয়। সুতরাং দুর্গোৎসব রূপ পৌত্তলিকতায় বৎসরে দশ লক্ষ টাকা মাটী করিতেছে। এক দুর্গোৎসবে যত, সম্বৎসরে অপর সমস্ত পৌত্ত-

লিক অনুষ্ঠানে যদি তত ব্যয়, তবে প্রতিবর্ষে দরিদ্র বঙ্গভূমির বিংশতি লক্ষ টাকা আর কত পরিশ্রম নষ্ট হইতেছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলায় লাইসেন্স ট্যাক্সে বিংশতি লক্ষ টাকা হইয়াছিল। বঙ্গসমাজ তজ্জন্য কত আর্ত্তনাদ করিয়াছে। আর দেখ, ধর্ম্মহীনতা ও মূর্খতা কি ভয়ানক কর আদায় করিতেছে, কত রক্ত শোষণ করিতেছে! হে বঙ্গের নব্য শিক্ষিত যুবক, তুমি স্বদেশোদ্ধার করিতে, স্বদেশের ধন বৃদ্ধি করিতে কতই যত্ন কর, আমাদিগের কথা গুলি একবার ভাবিয়া দেখিবে কি?

শ্মশান সঙ্গীত।

(দেবঘরে সন্ধ্যা দেখিয়া)

১

কাহার বালিকা—
তুইরে মাধুরী? হেলি দুলি
সুখস্বপ্ন বরষিয়া, সন্ধ্যার আকাশ দিয়া
চলে যাস্, উড়াইয়া স্বর্ণ চুল গুলি?
ললিত সুন্দর ছবি! দেব কন্যাসম!
——দাহময় চিন্তা-মরুভূমে
সৃজিয়ে স্বপন কুঞ্জ; জীর্ণ প্রাণে মম
ফুটায়ে সুন্দর শত মন্দার কুসুমে।

২

তুইরে, সুন্দর
ফুটন্ত গোলাপ কলি সম;
কোমল পল্লব দিয়ে, চারুমুখ আবরিয়ে
ছিলি এতক্ষণ, শোভা! কান্ত, নিরুপম!
যাদুকর সান্ধ্য-রবি-কিরণ পরশে
খুলে গেল পল্লব তোমার;
চাহিলি জগতপানে, অমনি হরষে
হাসিল আকাশ, মুগ্ধ চাহিল সংসার।

৩

যেন শশি মাখা
অবাত কম্পিত সরোবরে
কোমল সুস্নিগ্ধতম, বাসন্ত মারুত সম
আসিল সুধীরে সন্ধ্যা, অমনি অম্বরে
জাগিল সৌন্দর্য্য ঢেউ,—স্বর্ণ মেঘ গুলি
নীলাকাশ সৌন্দর্য্যে উচ্ছাসি;
হৃদয়ের সরোবরে স্বপ্ন ঢেউ তুলি
কে তুই আসিলি নভে, দীপ্ত শোভারাশি!

৪

জীবন্ত সঙ্গীত!
ভাসাইয়া দূর নীলাম্বরে,
ঝরিছ মধুরতম, বরিষার বারি সম
স্বর্ণ জলধর হতে স্বর্ণ জলধরে;
মেঘের মিলিত কণ্ঠ! নভ হতে আসি
পরিশেষে ভাসাও সংসার;
হে মেঘ বিহঙ্গ গুলি! গগন উচ্ছাসি,
ঝরুক তোদের এই মিলিত ঝঙ্কার।

৫

কিন্তু হা জগৎ!
এ সুখ সহেনা তোর প্রাণে;
যদি সারাদিন খাটি, প্রাণেতে মাখিয়া মাটি,
আসি প্রক্ষালিতে তায় এ মধুর গানে,
শীতলিতে দগ্ধ প্রাণ স্নিগ্ধ শোভানীরে,

ধূইতে সন্তপ্ত অশ্রুরাশি,
সহেনা তোমার;—আন গভীর তিমিরে
লুকাইতে সঙ্গীতের বাল্য সুখ হাসি।

৬

কেন ফোটে ফুল?
কেন শোভে কুসুমে নীহার?
কেনরে বিহগস্বরে, মধুর অমিয় ঝরে?
কেন হাসে শিশু, তুলি লহরী শোভার?
শুকাবে শিশির, ফুল পড়ে যাবে ঝরে,
ফুরাইবে বিহগের গান,
না শুকাতে শিশু হাসি কোমল অধরে,
ঝরিবে নয়ন, হর্ষ হবে অবসান।

৭

হায় রে জগৎ!
সবই তোর দুই দিন তরে
চলে যায় বাল্যহাসি, লুকায় সৌন্দর্য্য রাশি,
না ফুরাতে একবার দেখা প্রাণভরে।
প্রতি দিন রাশি রাশি কত শোভা হায়
জনমিয়া হয় অবসান;
এ জগতে কত মৃত সঙ্গীত ঘুমায়;
জগৎ—অনন্ত মৃত-সঙ্গীত-শ্মশান।

৮

নবীন বালিকে!
না শুকাতে তোর শোভারাশি,
জীবনের সুখ-গান, না হইতে অবসান,
না মিলাতে সুখময় শৈশবের হাসি,
চলিলি, ঘুমাতে তুই—নিশার তিমিরে
আছে তোর শ্মশান যথায়,
যেই খানে সময়ের ভাগীরথী তীরে,
তোর প্রিয় ভগ্নী গুলি নীরবে ঘুমায়।

৯

কোথা যাস্? প্রাণে
আঁধারিয়ে বিষাদের ধূমে;
আমারে সদয় হয়ে, যথা যাস্ যারে লয়ে,
কোথায় ফেলিয়া যাস্ দগ্ধ মরুভূমে?
আমি যে তোদের শিশু সহোদর ভাই;
প্রকৃতিও জননী আমার;
আমিও তোদের সনে ঘুমাইতে চাই;
দূষিত সংসার বায়ু সহে না রে আর।

১০

কিন্তু ওই যায়
স্বর্ণ শোভা মিলায়ে তিমিরে;
ওই দেখ্ ডুবে যায়, সোণার প্রতিমা হায়,
নীরবে পশ্চিমে, ঘন অন্ধকার নীরে;
ডুবে যাও তার সঙ্গে ভবিষ্যত আশা!
ডুবে যাও বর্ত্তমান প্রীতি!
ডুবে যাও আজিকার স্নেহ ভালবাসা!
ডুবে যাও প্রিয়তম অতীতের স্মৃতি!

১১

নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর
নিশে! তোর কঠিন হৃদয়;
তোর ঘন তমসায় ডুবাতে এ প্রতিমায়,
হৃদয়, কোমল হলে কাঁদিত নিশ্চয়।
কাঁদিত ছিঁড়িতে এই শোভার মুকুলে,
কাঁদিত চাহি সে মুখ পানে,
বিধির কঠোর আজ্ঞা যাইতিস্ ভুলে;
নিশ্চয় হৃদয় তোর গঠিত পাষাণে।

১২

যাও শিশু তবে,
লও শেষ বিদায় চুম্বন;
ডুব ছবি সিন্ধুতলে, আমি ভাসি অশ্রুজলে,
দাঁড়ায়ে সৈকতে হেরি তোমার আনন,
—মজ্জিত স্বর্গীয় জ্যোতি! যাও আজ তবে,
—অশ্রুবারি ঝরিবে ধরায়;
মরণ সঙ্গীত দুখে গাবে ঝিল্লীরবে
আকাশ উপরে তোর;—যাও সুকুমার!

১৩

আমিও ভগিনি!

গাব তোর বিয়োগের গান ;
হৃদয়ের হৃদয়েতে, দিবরে কবর পেতে,
যতনে সমাধি তোর করিব নির্ম্মাণ
স্মৃতি দিয়া ; যাও তবে প্রিয় সহোদরে !
আমারও বরষিবে আঁখি,
তোর তরে,—আর অন্য ভগিনীর তরে,
যতনে হৃদয় মাঝে সবে দিব রাখি।

১৪

নিষ্ঠুর নিয়ম
জগতের, জানি সহোদরে !
রাখিব হৃদয়ে আনি, তোর মৃত দেহখানি,
বসি বিসর্জ্জিব অশ্রু সমাধি উপরে,
তাহাও সহেনা তার ; ঘন গরজিয়া
ঘটনাতরঙ্গকুল আসি,
স্মৃতির সমাধি গুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া,
লয়ে যায় ডুবাইতে মৃত শোভারাশি।

১৫

পার যতদিন
ঘুমাওরে ; স্বরগের পরী
তোদের শান্তির তরে, তোদের সমাধিপরে
প্রসারি কোমল পক্ষ রহিবে প্রহরী—
পারিবে না প্রেতগণ তোরে পরশিতে ;
এ হৃদয়ে ! সুখে নিদ্রা যাও ;
আমিও আসিব কভু অশ্রুবারি দিতে,
প্রাণের ভগিনি ! তবে ঘুমাও ঘুমাও।

নবলীলা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আঁধার জীবন পথে।

সুলোচনা ও কুলকামিনীর কপালে পরে কি ঘটিল, বলিতেছি। সুলোচনা ও কুলকামিনীকে চুরি করিতে যাহারা আগমন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাহিরে ছিল, কেহ কেহ ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। সুলোচনা একজনকে গুরুতর রূপে আঘাত করেন। একজন আহত হইলে আর সকলে পলায়ন করে। নিমেষের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। সুলোচনা ও কুলকামিনী আর অপেক্ষা না করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। কোথায় যাইবেন, কোন্ পথে হাটিবেন, কিছুই ঠিক নাই, তবুও বাহির হইলেন। বিনোদবাবুদের বাড়ীতে থাকা আর সঙ্গত বোধ হইল না, দুই ভগ্নি এক মত হইয়া প্রাণে প্রাণে মিলিয়া সেই রজনীতে বিপদকে আলিঙ্গন করিবার জন্য গৃহের বাহির হইলেন। যাহাদের গৃহে বিপদ, তাহাদিগকে বাহিরের বিপদ আর ভয় দেখাইতে পারিল না, উভয়ে গৃহের বাহির হইলেন। সুলোচনার হস্তে একখানি অস্ত্র ছিল, সেই অস্ত্রদ্বারাই একটী লোককে আঘাত করিয়াছিলেন। ভাল মন্দ বিচারের শক্তি নাই—ভবিষ্যত ভাবিবার সময় নাই, উভয়ে উভয়ের মুখ

চাহিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে যে তাহাদের জন্য গুপ্তচর নূতন বিপদের শৃঙ্খল হাতে করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাদের সে ধারণা ছিল না। অনাথাদিগের জন্য ঈশ্বর যে আরো বিপদ রাখিয়াছিলেন, ইহারা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। সুলোচনা ও কুলকামিনী ধরা পড়িলেন। কাহার হাতে? কমলমণির হাতে। কমলে আরো কণ্টক ছিল —মণিতে আরো গরল ছিল;—সেই কণ্টক, সেই গরল অনাথাদিগকে ধরিয়া বসিল। সুলোচনা ও কুলকামিনীর প্রাণ চমকিয়া উঠিল। কুলকামিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কমলমণি চতুর স্ত্রীলোক,—আজ ক্রোধের পরিবর্ত্তে ভালবাসার ফাঁদ পাতিলেন। বলিলেন,—মা তোদিগকে এই কয় দিন না দেখে আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে। আর কিছু চাইনে, একবার তোদিগকে ভাল করে দেখে মর্‌ব, এই সাধ হয়েছে। আমার মরবার দিন নিকটে, এই দ্যাখ্ কি হয়ে গিয়াছি! কমলমণি সুলোচনার হাত টানিয়া আপন বক্ষে জোরে চাপিয়া রাখিলেন। সেই বক্ষ চক্ষের জলে প্লাবিত হইল। কতক্ষণ এই ভাবে গত হইলে জননী পুনঃ বলিলেন,—মা, আর না, চল্, আমার অনেক ক্রটী ছিল, সে সব ক্ষমা কর্, মায়ের অপরাধ ধরিস্‌নে, চল্, শেষের কয়টা দিন তোদিগকে দেখে চলে যাই।

সুলোচনা বলিলেন,—কোথায় যাইতে বলিতেছ?—কলঙ্কের মধ্যে ডুবিতে?—কখনই হবে না। কখনই যাব না।

কমলমণি আরো নরম হইলেন, বলিলেন,—মা হয়ে আবার তোদের সর্ব্বনাশ কর্‌ব?—আমি মরেছি, আমি ডুবেছি, তোরা যদি আমায় ক্ষমা না করিস্, তোরা যদি মায়ের প্রতি দয়া না করিস্, তবে আর আমার পানে চাইতে কেহ নাই—পৃথিবীতে কোন মানুষ নাই—স্বর্গে কোন দেবতা নাই। মা, তোরা ক্ষমা কর, মা হয়ে তোদের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, দোহাই তোদের আমায় ক্ষমা কর, ঘরে চল্।

কুলকামিনীর কোমল হৃদয় বিগলিত হইল, বলিলেন—গ্রামে আর আমাদের মুখ দেখাবার পথ রাখ নাই, আর কোথায় যাইব?

কমলমণি বলিলেন, সব চাপা দিয়া রাখব, না পারি গোপালপুরের কার কি না জানি? সকলের ঘরের খপর বাহির করব। মা তোদের কোন ভয় নাই, তোদিগে কেহ কিছু বল্‌বে না, ঐ বিনে ব্যাটার ঘারে সব চাপায়ে দেব।"

সুলোচনার শরীর মন দুঃখে, ক্ষোভে অধীর হইল, কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"সর্ব্বনাশি,—নিষ্কলঙ্ক বিনোদ বাবুর উপর দোষারোপ ক'রে আমাদের মন ফেরাবি, মনে ভেবেছিস্। বামন হয়ে স্বর্গের চাঁদ ধরিবার সাধ তোর কখনই পূর্ণ হবে না—বিনোদ বাবুর স্বভাবের কিছুই কর্‌তে পার্‌বিনে—অন্ততঃ যত দিন আমি আছি। তোর মুখ দেখ্‌তে নেই—তুই না পারিস্ এমন কাজই নেই, ছেড়ে দে।" এই বলিয়া বলপূর্ব্বক জননীর হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন। তার পর কুলকামিনীকে বলিলেন—দিদি, তুই যাবি কি না, বল, আমি আর এখানে থাকব না, আমার প্রাণ যেন কেন অস্থির হইয়াছে।

কুলকামিনী হতবুদ্ধি হইলেন। কমলমণি সুলোচনা হাত ছাড়াইল দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন, আপন মূর্ত্তি

ধরিয়া বলিলেন, দেখি তুই কোথায় যাবি, এখনি তোকে ধরে মনের সাধ মিটাব—ঐ পাপে ডুবাব। এই বলিয়া কমলমণি অন্যান্য সকল লোকদিগকে ডাকিলেন। সে বিকট চিৎকারে চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া সুলোচনাকে ঘেরিয়া ফেলিল। সুলোচনা কৌশল ভিন্ন আর উপায় না দেখিয়া ধীরে ধীরে বশ্যতা স্বীকার করিলেন। বলিলেন, তোরা কেহ আমাকে ধরিস্‌নে, আমি মায়ের সহিত যাইতেছি। এই বলিয়া সুলোচনা ও কুলকামিনী চলিলেন। কমলমণি সকল লোকদিগকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে বলিলেন, কিন্তু তাহাতে সুলোচনা আপত্তি করায় সকলকে অন্য কাজে পাঠাইলেন। কমলমণি জানিতেন, সুলোচনা মিথ্যা কথা বলে না। সুলোচনা ও কুলকামিনীকে লইয়া কমলমণি গোপালপুর ছাড়াইয়া নিকটবর্ত্তী একটী নূতন গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সুলোচনা সে গ্রামের সে বাড়ী কখনও দেখেন নাই। সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে মন অগ্রসর হইল না—জননীকে বলিলেন,—মা, আমাদের বাড়ীতে চল্, এবাড়ীতে যাইব না। সুলোচনা চিন্তায় অন্যমনস্ক ছিলেন, গোপালপুর যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মাতা বলিলেন, আজ এখনেই থাকি। কাল বাড়ীতে যাইব, আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে। সুলোচনা অনিচ্ছার সহিত জননীর সহিত যাই সেই অপরিচিত বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, অমনি বহির্দ্দিক হইতে সে বাড়ীর দরজা বন্ধ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

জননী নহে, পিশাচী!

যখন বাহির হইতে দরজা বন্ধ হইল, তখন সুলোচনা মায়ের চক্রান্ত সকলি বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়াও কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। বিনোদ বাবুদের বাড়ীর বাহির হইলে এত বিপদে পড়িবেন, পূর্ব্বে সুলোচনা বা কুলকামিনী বুঝিতে পারেন নাই। সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া উভয়ে উভয়ের মুখ চাহিতে লাগিলেন। কুলকামিনী বলিলেন,—বোন্, আর তোকে বাঁচাতে পারিলাম না। কুলকামিনীর দুই চক্ষু দিয়া ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে আবার বলিলেন, তুই কি ভাবিতেছিস্?—আর বিনোদ বাবুকে দেখিবার সম্ভাবনা নাই—একবার ইষ্টদেবতাকে স্মরণ কর।"

কুলকামিনী আর কথা বলিতে পারিলেন না, অঞ্চল দ্বারা চক্ষু পুছিলেন।

সুলোচনা সকলি বুঝিতে পারিলেন; ধীর স্বরে বলিলেন,—যা হবে তা হবেই, আমি অবশ্য রক্ষা পাইব, এই দা দেখিতেছ না?

কুলকামিনী বলিলেন, তাই হো'ক।

আর কথা হইতে পারিল না। বাড়ীর ভিতরে যাইয়াই কমলমণি সুলোচনাকে এক দিকে, কুলকামিনীকে অন্য দিকে যাইতে বলিলেন।

সুলোচনা বলিল, তা দিদিকে ছেড়ে কখনই অন্য ঘরে যাব না।

কমলমণি আর কিছু না বলিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে পৃথক করিতে দুই জন লোককে আদেশ করিলেন।

সুলোচনা অগত্যা অপমানের ভয়ে ভগ্নীর সহিত পৃথক হইলেন। মনে ভাবিলেন—যত বিপদ থাকে, আসুক। সুলোচনা বিপদের সময়ে আজ নির্ভীক হইলেন।

সুলোচনাকে এক ঘরে আবদ্ধ করা

হইল, কুলকামিনীকে অন্য ঘরে। কমলমণি জানিতেন, কুলকামিনীকে হাত করিতে পারিলে সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে। কমলমণির আদেশে দুই জন অপরিচিত লোক সুলোচনার ঘরে প্রবেশ করিল। কমলমণি আপনি কতকগুলি টাকা ও অলঙ্কার লইয়া কুলকামিনীর নিকটে গেলেন। প্রথমতঃ কমলমণি বিনোদ বাবুদের নিন্দা করিতে লাগিলেন। নিন্দা শ্রবণে কুলকামিনী উষ্ণ হইলেন, বলিলেন, মা, তুই আর ও সকল কথা বলে আমার প্রাণে আঘাত করিস্‌নে। বেশি পীড়াপীড়ি কর বিত বিষ খেয়ে মর্‌ব।

চতুর কমলমণি অমনি প্রকারান্তরে বিনোদ বাবুদের প্রশংসা আরম্ভ করিয়া বলিলেন,—না তেমন কিছু নয়, বিনোদ বাবু ভাল লোক, তবে কি না বাড়ীর আর আর সকল লোক তেমন নয়।

কুলকামিনী আবার তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিলেন; কমলমণি অমনি আপন মেয়েদের প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। কুলকামিনী তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, মা তুই কি আমাকে পাগল না বোকা পেয়েছিস যে, যা ইচ্ছা তাই বলে আমাকে ভোলাবি? তোর মনের ভাব কি, বল্‌।

কমলমণি বলিলেন, এই দ্যাখ্‌ তোর জন্য কত অলঙ্কার এনেছি। সুলোচনা অলঙ্কার ভালবাসে না, তাকে আর কি দেব? এই দ্যাখ্‌ তোর জন্য কত গয়েনা প্রস্তুত করেছি।

কুলকামিনী বলিলেন, আমি ও সকলে আর ভুলব না—তুই কি চা'স স্পষ্ট করে বল্‌?

কমলমণি বলিলেন, তোদের নিকট আর কিছুই চাই না, কেবল এই চাই—তোরা আমার কথা মতে চল, সুখে থাক্‌।

কুলকামিনী বলিলেন, তোর কথা শোনার চেয়ে বিষ খেয়ে মরা সহস্র গুণে ভাল। তুই মা হয়ে কেমন করে আমাদিগকে ডোবাতে চাচ্ছিস? তোর নিকট যাহা সুখ, আমাদের নিকট তাহা বিষ। আমরা কখনই তোর কথা শুনে চল্‌ব না। মনের জেদ্‌ বজায় রাখ্‌তে না পারি, বিষ খেয়ে মর্‌ব। মা তুই ক্ষমা কর, আমাদের ছেড়ে দে। না জানি আজ তুই কি সর্ব্বনাশ ঘটাবি! সুলোচনাকে হয়ত আমি আর দেখ্‌তে পাব না? সে কখনই তোদের অত্যাচার সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। টাকার জন্য আপনি কুল দিয়া মজেছিস্‌—আবার আমাদিগকে মজাবি? কখনই তোর সাধ পূর্ণ হবে না! তুই বিষ—আমার বিষ, সুলোচনার বিষ। তোর পায়ে ধরি, ক্ষমা কর। যদি বেঁচে থাকি, যদি মনের বাসনা পূর্ণ হয়, তোর আকাঙ্ক্ষা মিটাব।

কমলমণি পাষাণ দিয়া বুক বাঁধিলেন, বলিলেন টাকা? তোদের টাকায় আমার ঘরকন্না হবে, তা মনেও ভাবিস্‌নে। আজ কথায় না পারি জোর করে তোদের মত ফিরাব, খ্রীষ্টানি মত লয়ে কখনই থাকৃতে পার্‌বি নে। এই বলিয়া কমলমণি কৃত্রিম ক্রোধভরে সে স্থান হইতে উঠিয়া সুলোচনার ঘরে আসিলেন। সুলোচনা তখন ভীমরূপ ধারণ করে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন, বলিতেছিলেন,—কেহ আমার নিকটে আস্‌বি ত অমনি এই দা দিয়া কাট্‌ব,—না পারি আমি মর্‌ব।" জননীকে দেখিয়া সুলোচার একটু সাহস হইল, হাজার হো'ক জননী ত। মায়ের মুখ দেখে সুলোচনার প্রাণে একটু বল আসিল। সুলোচনার ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণি অন্য লোকদিগকে

বলিলেন, তোমরা অন্য ঘরে যাও, আমি সুলোচনার মনের কথা শুনি।

অন্য লোকেরা গৃহান্তরে যাইতে না যাইতে সুলোচনা গর্জ্জিয়া জননীকে বলিলেন,—"মা, তুই ইহার বদলে হাতে তুলে বিষ দে, খেয়ে মরি—ম'রে বাঁচি! বুঝেছি—বুঝেছি, এই জন্য তোর গর্ভে জন্মেছিলাম। জননী নাম, কত আদরের, তা আমার নিকট বিষ হলো! তোর মনে কি এই ছিল,—মা হয়ে মেয়েকে মারিবার জন্য এনেছিস্? এনেছিস্ বেশ হয়েছে; তুই হাতে তুলে বিষ দে, খেয়ে বাঁচি—সংসারের যন্ত্রণার হাত এড়াই। তা দিবে নে, তা দিতে পারিস্‌নে, তা দিলে তোর স্বার্থ পূর্ণ হয় না। বুঝেছি, সব বুঝিছি। আজ এই দা দিয়া তোর সাম্‌নে আত্মঘাতী হব। মর্‌ব—মরিতেই জন্মেছি, মরিতেই এসেছি! পাপ হবে? হবে না,—কখনই পাপ হবে না—পবিত্রতার জন্য মরিব। লোকে তা বিশ্বাস করিবে না? —যে ঘরে জন্মেছি, লোকে তা শুন্‌বে না, তা জানি। কিন্তু স্বর্গের দেবতা শুনিবেন—আমার কান্না নিশ্চয় শুনিবেন,—শুনে আমাকে ক্ষমা করিবেন।" এই বলিয়া সুলোচনা হস্তের অস্ত্র উত্তোলন করিলেন।

এ দৃশ্য কমলমণির সহ্য হইল না, স্বার্থে কণ্টক পড়ে ভাবিয়া অস্ত্র ধরিলেন। তারপর বলিলেন,—মা সুলোচনা, স্থির হ, আমার কথা শোন্। আমার কথা শুনে তার পর মর্‌তে ইচ্ছা হয় মরিস্। তোর বিয়ে করার বড় সাধ ছিল, সেই জন্য আমি পাত্র ঠিক করেছি, তোকে কলঙ্কিত পথে আর যেতে হবে না, তোর বিয়ে দেব। তোর গায়ে গয়েনা না দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়, মা হয়ে কি তোর এবেশ দেখ্‌তে পারি? বাছার চুল গুলি শাদা পানা হয়ে গেছে, তেল সিন্দুর বিনে কি চুল ভাল দেখায়? মা, তোর মুখ খানি শুকায়ে গেছে, আর তোর কষ্ট পেতে হবে না, আয় তোকে তেল সিন্দুর ও গয়েনা পরায়ে দি।

সুলোচনা আবার বলিতে লাগিলেন,—আমার গায়ে গয়েনা—এই দায়ের আঘাত। ছেড়ে দে, গয়েনা পরিয়া তোর সাধ পূর্ণ করি। আমার রূপের জন্য তুই কাতর? ছেড়ে দে, অপরূপ বেশে আজ সাজিয়ে তোকে দেখাই। আমার বিয়ে দিবি?—ছেড়ে দে, এই দেহ এই মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত করে বরমাল্য বসুন্ধরাকে অর্পণ করি। সর্ব্বনাশি, তোর মনে কি এই ছিল? আজও তোর বাসনা মিট্‌ল না, এত কষ্ট দিয়াও তোর আশা পূর্ণ হলো না। বুঝেছি, আমি থাকৃতে তোর আশার নিবৃত্তি হবে না। একমুহূর্ত্ত ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, বাসনা মিটাই। দিলি না, দিবি না, ছেড়ে দিতে জানিস্‌নে? তবে আমার দিদিকে ডাকি। তোর ভয় নাই, তা জানি, কিন্তু দিদিকে পাইলে আমার উপায় হবে।" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"দিদি, দিদি, এক বার আয়, আমি জন্মের মত যাই, বিদায় দিয়ে যা, তোর সুলোচনার বেশ একবার দেখে যা। আজ অপূর্ব্ব সাজে সাজ্‌ব, দিদি একবার আয়।"

সুলোচনার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কুলকামিনী নিমেষের মধ্যে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া উন্মত্তের ন্যায় জননীকে বলিলেন—মা, সুরোকে ছেড়ে দে, আমাকে নিয়ে তুই থাক্। ধরিস্‌নে, ধরিস্‌নে, সুরোকে ছাড়্। আমি তোর নিকট বিকাইব, তোরই কথা মতে চলিব।

ছাড়, ছাড়। মা, সুরোর প্রাণে আর আঘাত করিস্ না। আমাকে নিয়ে তুই থাক্।

কমলমণি বলিলেন, সুলোচনাকে মরিতে দেব? তা হবে না।

কুলকামিনী সুলোচনাকে বলিলেন, প্রাণের বোন্, তুমি যাও, আমি মায়ের স্বার্থের দাসী হয়ে থাকি। দুইজনে কেন মরিব? পাপ হবে। তুমি মরিলে বিনোদ বাবু হাসিবেন, তিনি যে তোমার জন্য পাগল হইবেন। মরার বাসনা ছেড়ে দেও। বিধাতা আমাকে পাপের জন্য সৃষ্টি করেছেন, না হলে তোমাকে এত ভালবাস্‌তে পারিতাম না। তোমার জন্য আমি পাপে ডুবিব, মায়ের স্বার্থ পূর্ণ করিব, বোন্ তুমি যাও, আমি থাকি।

কুলকামিনীর দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, বলিলেন,—তোকে কোথায় যাইতে বলিতেছি? হায়, বোন্ হয়ে তোকে বিদায় দিতেছি, লোকে কি বল্‌বে? জননীর গৃহে মেয়ে সুখী হলো না, এ কথা শুনে লোকে কি বলবে? কাহাকেও কিছু বলিস নে।—এই ঘরে জন্মেছিলি, একথা বলিস্‌নে, মনের কথা মনেই রাখিস্। তুই যা, সেখানে থাকিস্, সেই ভাল; এই সর্ব্বনেশে স্থানের চেয়ে সব স্থান ভাল। বিনোদ বাবু তোর জন্য অস্থির হবেন্—এত ক্ষণ অস্থির হয়েছেন।

দিদির কথা শুনে সুলোচনার হৃদয়ের আগুন আরো জলিয়া উঠিল, বলিলেন, দিদি, তোকে ছেড়ে কোথায় যাব? তোকে ছাড়িলে পৃথিবীতে আমার দাঁড়াবার আর স্থান থাকে না,—তুই আমার বল, তুই ভরসা, তোর মুখের দিকে চেয়ে আজও বেঁচে আছি, তোর অদর্শন আমি সইতে পারব্ না। তা কখনই হবে না। আমার জন্য তুই এই সর্ব্বনাশীর স্বার্থের পথে হাঁটিবি, তা আমি সহ্য কর্‌তে পারিনে। তোকে ডুবায়ে আমি থাকতে পার্‌ব না, দিদি, মায়ের হাত ছেড়ে দে, আমি এখনই মরি। পারিস্‌নে? তুই চেষ্টা করিলে অবশ্য পার্‌বি।

কুলকামিনী উপায়ন্তর না দেখিয়া সুলোচনাকে বলিলেন, একটু স্থির হ।

তারপর জননীকে বলিলেন,—মা, ক্ষণকাল তুমি ছেড়ে দিয়া বাহিরে দাঁড়াও, আমি দুটো কথা বলি। আমরা মরিব না।

কমলমণি কি ভাবিয়া সুলোচনাকে ছাড়িয়া দিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন।

কুলকামিনী সুলোচনাকে বলিলেন,—মা কি বলে?

সুলোচনা—বিবাহের কথা বলে।

কুলকামিনী বলিলেন,—আমি আর উপায় দেখি না, তুমি বিবাহে সম্মত হও, তারপর ভাল মন্দ দেখিয়া একটা উপায় করা যাইবে।

সুলোচনা বলিলেন, প্রাণান্তেও প্রতারণা করিতে পারিব না, কখনই সম্মত হইতে পারিব না। দিদি, তোকে এ বুদ্ধি কে দিলে? ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হব?

কুলকামিনী—তুমি কি চিরকাল কাঁদিবে?

সুলোচনা—ঈশ্বর যদি কাঁদিবার জন্যই সৃষ্টি করে থাকেন, চিরকাল কাঁদিব, তুমি আমি সহস্র চেষ্টা করিলেও কিছু করিতে পারিব না। কান্নায় কি আমার অসুখ?—পৃথিবীতে যদি কিছু সুখ থাকে, তবে তা আমার চক্ষের জলে আছে। কাঁদিতে পারিতেছি বলিয়া আজও বেঁচে আছি।—এই জলের দ্বার যখন রুদ্ধ হইবে, তখন বেঁচে থাকিয়া মরার মতন হব। দুই বৎসর

কাঁদিয়া কত সুখ পেয়েছি, আজীবন কাঁদিলে কত সুখ পাইব, কে জানে?

কুলকামিনী—কাঁদিবার পথ কোথায়? মরিলে ত আর কাঁদিতে পারিবে না।

সুলোচনা—দিদি আর ত উপায় দেখি না।

কুলকামিনী—এক উপায় আছে—প্রতারণা।

সুলোচনা।—তা পারি না।

কুলকামিনী—দ্বিতীয় উপায় তুমি যাও, আমি থাকি, আমাকে পাইলে মা তোমার আশা ছেড়ে দিবে। আমি কিছু দিন থাকিয়া পরে পলাইব।

সুলোচনা—তুমি মায়ের স্বার্থের পথে যাইয়া পাপে ডুবিবে?

কুলকামিনী—ডুবিব না। মায়ের আর সকল কথা শুনিব, ঐ একটী কথা কেবল শুনিব না।

সুলোচনা—মা ছাড়িবে কেন? সম্মত হইলে তোমার সব করিতে হইবে।

কুলকামিনী—আজই মাকে বলিয়া রাখিব, একটী কথা ভিন্ন তোমার আর সকল কথা শুনিব।

সুলোচনা—মা সম্মত হবে কেন?

কুলকামিনী—এমন ভাবে বলিব, মা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।

সুলোচনা—প্রতারণা করিবে?

কুলকামিনী—করিব। আর উপায় দেখি না, এই পথই ধরিব। আমার মন বলে, এতে পাপ নাই।

সুলোচনা—আমি বলি, এতেও পাপ আছে। এ পথও অবলম্বন করা উচিত নহে।

কুলকামিনী—তবে তুমি কি বল?

সুলোচনা—এস উভয়ে মরি।

কুলকামিনী—এতেও ত পাপ। আত্ম হত্যা বিষম পাপ।

সুলোচনা—তা বুঝি, কিন্তু জীবিত থেকে পাপ করার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

কুলকামিনী—তোমার একথা ঠিক নহে।

সুলোচনা—তবে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। এই কথা শেষ হইতে হইতেই জননী গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখনও রজনী প্রভাত হয় নাই। কুলকামিনী সুলোচনাকে বেরিয়া বসিলেন।

আকাশের তারা।

আকাশের তারা, তোমরা কি? বাল্যকাল হইতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি, তোমরা কি? শৈশবাবস্থায়, সন্ধ্যাকালে মা যখন আকাশের চাঁদের দিকে আমার মুখ ফিরাইয়া দিয়া বলিতেন "আয় আয় চাঁদ আয়" তখন বুঝি চাঁদ দেখিতে দেখিতে একবার এদিক ওদিক চাহিতাম, ওই নক্ষত্র-মণ্ডলীরদিকে চাহিতাম, আর বুঝি ভাবিতাম,ঐ ক্ষুদ্র উজ্জল রত্ন গুলি কি? শিশু কি ভাবে কেহ জানেনা, বড় হইয়া কোন শিশুরই স্মরণ থাকেনা। কিন্তু তবুও আমার মনে কেমন হয়, একবার বুঝি ঐ নক্ষত্রগুলির দিকে চাহিয়া কি এক ভাবনা ভাবিতাম। ওয়ার্ডসোয়ার্থ বলিয়াছেন যে, আমরা ভাবিতাম ঐ আমাদের ঘরবাড়ী. এ দ্বিতীয় জন্ম স্থান পৃথিবী আমাদের নূতন

আবাস; ধূলিময় পৃথিবী আমাদের নূতন আবাস। হায় হায়, বালকের যদি ধূলায় আসক্তি না হইত, তবে বুঝি সে চিরজীবন নক্ষত্রই দেখিত। তাহার পরে আবার সেই বাল্যকালে প্রথম বিদ্যালয়ে যে দিন দেখিলাম, কবি অবাক হইয়া তোমার গুনব্যাখ্যা করিতেছেন, আমি সেই দিন হইতে কবির সেই কথা আর ভুলিলাম না, আজিও ভুলি- নাই; আজিও আমি নক্ষত্র খচিত আকাশ পানে চাহিয়া বলি, "How I wonder what you are." ওহে নক্ষত্রময়ী রজনী, নক্ষত্র আছে বলিয়া, অত আঁধারে নক্ষত্র ফোটে বলিয়া আদি কাল হইতে এ পর্য্যন্ত জগতের ভাবময় চক্ষুর সমক্ষে তুমি এত গভীর রহস্যময়ী। তোমার "নীলাম্বর- পাতে" ওই এক এক অবুদ্ধ, রহস্যময়, "গীত লেখা"। ঐ জলদ অক্ষরের লিপি কতবার পড়িয়াছি, ঐ জীবন্ত সঙ্গীত কতবার গাইয়াছি; পড়িয়া পড়িয়া পড়া শেষ হয় নাই, গাইয়া গাইয়া দেখিয়াছি ও গীতি অনন্ত গীতি।

ওহে আকাশের তারা, তোমরা কি? তোমরা ফুটিয়া উঠ বলিয়া, শান্ত জ্যোর্তিময় বলিয়া, কতবার ফুলের সহিত তোমাদিগকে তুলনা করিয়াছি; তোমাদিগকে ফুল বলিয়াছি। কিন্তু ফুল বলিলে অপমান করা হয়। ফুলের সহিত তোমার অনেক গুণের মিল আছে তাহা জানি, কিন্তু তোমাতে আরও এমন কিছু আছে যাহা ফুলে নাই। ফুল দেখিলেও পাপ প্রলোভনময়, হিংসা বিদ্বেষ- ময় সংসার ভুলি, তোমাকে দেখিলেও ভুলি; "কুসুমেও" যাঁহার "কান্তি" তোমাতেও তাঁহারই কান্তি। ফুলও হাস্য- ময়, তুমিও হাস্যময়। কিন্তু ফুলে গাম্ভীর্য্য নাই, তুমি অনন্ত গাম্ভীর্য্যময়। পাঠক পাঠিকা আপনারা কল্পনা করুন, আপনারা যেন সন্ধ্যার পূর্ব্বে একটী সাগর তটে এক পুষ্প বাটিকায় উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিতেছেন, তীরে কেবল ফুল ফুটিয়া আছে, আর ফুল গুলি বড়ই হাসিতেছে। আর ঐ নীল সাগরে এখন প্রবল তরঙ্গ নাই, ভীষণ ভাব নাই; কেবল ঐ সাগর জল অতিদূর— অতিদূরদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত; সাগর কেব- লই গাম্ভীর্য্যময়। আপনারা হয়ত একবার ঐ ফুলের শোভা, ঐ ফুলের হাসিতে গলিতে- ছেন; আর একবার ঐ সাগরের গাম্ভীর্য্যে ডুবিয়া যাইতেছেন। এমন সময় দেখিলেন, মাথার উপরে বিস্তৃত নীলাকাশে ছোট ছোট নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য! আপনারা অমনি দেখিলেন যে, কুসুমের শোভা, কুসুমের হাসি, সাগরের শোভা, সাগ- রের গাম্ভীর্য্য, একাধারে মিশিয়া গিয়াছে। আপনি এখন ফুল ভুলিয়াছেন, সাগর ভুলিয়াছেন, কেবল ঐ নক্ষত্রগুলির পানে কি এক নেশায় মাতিয়া চাহিয়া আছেন। সাগরের দিকে যে এক একবার দৃষ্টি পড়ি- তেছে, সে কেবল ঐ সাগর বক্ষে নক্ষত্র প্রতিবিম্ব দেখিবার জন্য। নক্ষত্রে ফুল ও সাগর একত্র মিশিয়া থাকে। এই জন্য নক্ষত্রে এবং ফুলে তুলনা হয় না; সেই কারণেই বলিতেছিলাম, ফুলের সঙ্গে নক্ষ- ত্রের তুলনা করিলে, নক্ষত্রকে অপমান করা হয়। ওহে নক্ষত্ররাজি, তোমরা ভুবনে অতুল!!

জড় বিজ্ঞানের আবিষ্কার,—তোমরা এক এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বৃহৎ জগৎ। ভাব বিজ্ঞানের আবিষ্কার,—প্রেম বিজ্ঞানের আবিষ্কার, তোমরা এক একটী এক এক

বৃহৎ বৃহৎ ভাবের জগৎ। এক জন কবি বলিয়াছেন যে, তুমি একবার ঐ নক্ষত্রের দিকে তাকাও, তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তোমার মনে হইবে তুমি একেবারে নির্জ্জনে বসিয়া আছ। এ বড় সত্য কথা। যখন দেখিবে, বাহিরে হাট ভিতরে হাট, বাহিরে লোক-কোলাহল, ভিতরে বাসনার কোলাহল, নিস্তব্ধ গৃহে দরজা বন্ধ করিয়াও নির্জ্জনতা লাভ হইতেছে না, তখন এক-বার ঐ আকাশের দিকে চাহিও, একবার একটী নক্ষত্রের দিকে চাহিও, তুমি দেখিবে, কোলাহল চলিয়া গিয়াছে, তুমি কোথায় এক জনপ্রাণী-শূন্য দেশে একাকী কেবল ভাবময় প্রাণটি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হই-য়াছ। তবে নক্ষত্র তুমি ভাবের একটী বৃহৎ জগৎ ভিন্ন আর কি? যাহা কিছু "ভাব" তাহা ত সকলই তোমাতে! যাহা কিছু পবিত্র, গম্ভীর, আনন্দপ্রদ, অনন্ত-মাখা, সকলই তোমাতে। এমন ভাব নাই, এমন চিন্তা নাই যাহা তোমাতে নাই। তোমরা অপরিবর্ত্তনীয় রূপে ঐ জীবন-প্রদ ভাব লইয়া, গূঢ়রহস্য হইয়া চিরদিন বিরাজ করিতেছ। শীতল সমীরণ কতবার স্বেদসিক্ত কপালে লাগিয়া আরাম দিয়াছে, আবার কতবার তাহার ভয়ে জড়সড় হইয়া কোথায় পালাইয়া গিয়াছি। কতবার বসন্তের নাতিশীতোষ্ণ সমীরণে প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, আবার কতবার তাহার প্রবাহ দুঃখের গভীর শ্বাসের মত এ বুকে ঠেকিয়াছে! পাখীর গানে কখনও হাসি-য়াছি, কখনও কাঁদিয়াছি। আসল কথা, এ সকল পৃথিবীর পদার্থে পার্থিব ভাব মিশিয়া রহিয়াছে; কিন্তু নক্ষত্র তুমি অপার্থিব দুঃখে সুখে, সম্পদে বিপদে, শোকে হর্ষে, যখনই তোমার দিকে তাকাই, তখনই সকল পার্থিব ভাব এ হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত হয়। আর কি এক আনন্দময়, কি এক অনন্তময় ভাবে, আমার ক্ষুদ্র, সনস্ত হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। তখন দেখি, ঐ আকাশের গায়ে যেমন, অমনি আমার হৃদয়ের স্থানে স্থানে কত শত উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। হৃদয় এবং আকাশ, উভয়েই যেন কি এক অনন্ত সৌন্দর্য্য, কি এক অনন্ত ভাবের কোলে ছুটিয়া যাইবে বলিয়া, মিশিয়া যাইবে বলিয়া, নীরব অধৈর্য্যে অধীর হইয়া উঠি-য়াছে। নক্ষত্র তোমাতে বিষাদের শ্বাস নাই, নিরাশার কাতরোক্তি নাই, পাপের অন্তর্দ্দাহ নাই; তুমি আমার বুকে আসিবে?

আমরা ধূলির ধূলি; এই ধূলির পৃথি-বীতে ধূলির শরীর লইয়া সর্ব্বদাই ধূলো খেলায় ব্যস্ত। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ধূলির ধনমান, ধূলির যশ গৌরব লইয়াই বাস করি; আধ্যাত্মিক রাজ্যের সন্তান ওয়ার্ডসোয়ার্থ সংসারের লোকের এই নির্জ্জীব কর্কশ ভাব দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি জড়প্রাণ স্বদেশীয়-দিগকে অথবা স্বদেশকে ডাকিয়া বলিলেন, "England you are too much with the world" মানুষ বুঝি ধুলায় একেবারে ডুবিয়া যাইত; ধুলায় বুঝি মানুষের চোখ একেবারেই কানা হইয়া যাইত, যদি সন্ধ্যার সময়, সারাদিনের পরিশ্রমের পর সুনীল আকাশ-গায় নক্ষত্র না ফুটিত। নক্ষত্র ফোটে বলিয়া অপার্থিব কথা আমাদের মনে পড়ে; একবার অন্ততঃ অপার্থিব ভাবে ভোর হই! নক্ষত্র, তোমরা স্বর্গীয় দূত! ফুলের বাস মাঝামাঝি, কিন্তু তোমরা একেবারে এই ধুলার রাজ্যের অতীত

প্রদেশে। নক্ষত্র, তুমি যদি স্বর্গের দূত নও তবে স্বর্গের দূত আর কে? গেবরিয়েল, বা মাইকেল ডাকাডাকি করিয়া লোককে স্বর্গের কথা চিন্তা করাইয়াছিল, ধূলির সন্তানকে স্বর্গ দেখাইয়াছিল, সেত পুরাণের কথা; সে কথা সত্য বলিয়া বুদ্ধিমান লোক মানিতে চায় না। কিন্তু তুমি যে অনেককে স্বর্গের দিকে টানিয়াছ, উচ্চ পবিত্র ভাবে পূর্ণ করিয়াছ, তাহার পরিচয় অনেক আছে। আরব দেশ ত জনসমাকুল দেশ নয় যেন মরুভূমি, চারি দিকে বালুকা ধূ ধূ করিতেছে; সূর্য্যতেজ বড় প্রখর; সবই যেন আগুন। এমন দেশেও কি মানুষ থাকে? যাহারা থাকে তাহারাও বুঝিপশু প্রায় হইয়া থাকে। তবে এমন দেশে, এই মরুভূমে ফুল ফুটিল কেন? মহম্মদের জন্ম হইল কেন? সে অপার্থিব ভাবে ভোর হইয়া উঠিল কেন? স্বর্গীয় দূত নক্ষত্র মহম্মদকে দেবতা করিয়াছিল। দিন, আরবে কি ভয়ঙ্কর, তাহার বর্ণনা করিয়াছি; কিন্তু রাত্রি আর এক রকম ব্যাপার; চারি দিক শান্ত, অতি শান্ত। পাহাড় গুলি আর তপ্ত নাই। তাহার পরে আবার আকাশে অগণ্য তারকা ফুটিয়া উঠিয়াছে! কি গম্ভীর, কি প্রশান্ত!! মহম্মদ যদি আরবের রজনী না পাইতেন, তবে তিনি মানুষ হইতে পারিতেন না। যদি আরবের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র না ফুটিত, তবে মহম্মদ দেবতা হইতে পারিতেন না। তবে ত নক্ষত্র, তুমি বাস্তবিকই স্বর্গের দূত! আমার হৃদয় বড়ই ধূলিময়; হে নক্ষত্র, তুমি আমার এ হৃদয়ে তোমার স্বর্গের ভাব প্রেরণ কর। আমি মানুষ হইয়া যাই!

কিন্তু হায় সকল রজনীতে সমান ভাবে নক্ষত্র দেখা যায় না; সকল কালেই ভাল ভাবে আকাশে নক্ষত্র দৃষ্ট হয় না! বর্ষাকালের মেঘ আকাশ ভরিয়া থাকে, দিন রাত্রি বোঝে না। দিনে থাকে থাকুক, কিন্তু রাত্রিতে কেন থাকে? কত দিন এই অবসন্ন জড় হৃদয়ে একটু স্বর্গীয় ভাব আনিব বলিয়া নিশীথে জানালা খুলিয়া আকাশ পানে চাহিয়াছি। কিন্তু দেখিয়াছি, আকাশ ভরা মেঘ, আর কেবল অন্ধকার। আঁধার হৃদয়ে আরও আঁধার লাগে; সে দৃশ্যে নিরাশা আরও দ্বিগুণিত হয়! বর্ষাকালে আকাশে নক্ষত্র ভাল ফোটে না; আকাশে তখন পৃথিবীর জল পূর্ণ থাকে; আকাশ তখন পৃথিবীর সঙ্গে আদান প্রদান লইয়া বড় ব্যস্ত থাকে, সেই জন্য অপার্থিব, পবিত্র, রহস্যময়, গম্ভীর নক্ষত্ররাজি সে আকাশে দেখা দেয় না, অথবা ক্বচিৎ দেখা দিয়া থাকে। হৃদয় রাজ্যেও এই আইন, এই ব্যবস্থা। কথাটা আর ভাঙ্গিয়া বলিব না। যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই কাঁদিয়াছেন। যাঁহার হৃদয়াকাশে মেঘ উঠে, তিনিই জানেন, কখন কিরূপ ভাবে তাঁহার হৃদয়ে নক্ষত্রালোক বিভাসিত হয়। আমার হৃদয়ে বড়ই আঁধার, এ প্রাণ ভরিয়া কেবল পৃথিবীর জলকণা মেঘ সাজাইয়া আছে। —এ হৃদয়ে, এ মেঘ ভরা হৃদয়ে, কখনও কি শরৎকাল আসিবে; কখনও কি ধ্রুব নক্ষত্রের স্নিগ্ধ, জীবনপ্রদ জ্যোতি আসিয়া এ হৃদয়ে পৌছিবে?

আণ্ডামান ও নিকোবরবাসী।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

শিক্ষা ও ধর্ম্ম।—সভ্যতার ইতিহাস-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা বাক্‌লস্ সাহেব বলেন, অভাব মনুষ্যজাতির শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির আদি জননী। পৃথিবীর সভ্য জাতি মাত্রেই অভাবের দারুণ কশাঘাতে পীড়িত হইয়া ক্রমে অভাব নিবারণোপায় শিক্ষা করিয়াছে এবং শিক্ষা প্রভাবে ক্রমশঃ সভ্যতা ও উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছে। তাঁহার মত সর্ব্বথা সুসঙ্গত। সমগ্র পৃথিবীর সভ্যজাতির সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ স্পষ্টতঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্ববিজয়ী বৃটিশ জাতি—আজি যাঁহারা সভ্যজগতে সুশিক্ষিত ও সুসভ্য জাতির প্রধানতম আদর্শ স্থল রূপে পরিগণিত হইবার জন্য গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছেন—যে জাতির কতিপয় সুসন্তান হতভাগ্য অধঃপতিত ও ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতভূমির বক্ষের উপর বাস-করিয়া কৃপার ভিখারী ভারতবাসীকে সুশিক্ষা ও সভ্যতার অমৃতাস্বাদ উপভোগ করাইতে একান্ত যত্নবান—কতিপয় শতাব্দী পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের কিরূপ অবস্থা ছিল? নরমাংস ও ফলমূলে যাহাদের জঠরানল নিবারিত হইত, পশু-চর্ম্ম ও বৃক্ষছালে যাহাদের তনু আবরিত হইত, বিচিত্র রাগে যাহাদের সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত হইত, আলস্য ও পাশব ক্রীড়ায় যাহাদের সময় অতিবাহিত হইত, এবং ভীষণ-স্বভাব ড্রুইড ভয়ে ভীত হইয়া যাহারা ভূগর্ভে বা বিবরে লুকাইয়া থাকিত, আজি সেই উপহসনীয় জাতির প্রতিভাশালী বংশধরগণের কোথা হইতে এত উন্নতি, এত বিক্রম এবং কোথা হইতেই বা এরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা? শতাব্দীর পর শতাব্দী গুরুতর অভাবের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিয়া ক্রমে ইহারা উন্নতি ও প্রভুতার মহা সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন আণ্ডামান বাসীগণের শিখিবার কি আছে? তাহারা অভাব অনুভব করিতে জানে না—জন্মিয়া অবধি তাহারা একই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে—নূতন কিছু শিক্ষা করিতে তাহাদের প্রয়োজন হয় না। বিশ্বজননী প্রকৃতি প্রতিদিন তাহাদিগকে যাহা স্বহস্তে দান করিতেছেন, তাহারা তাহাতেই পরিতৃপ্ত। বনজাত ফলমূলে তাহারা ক্ষুধা নিবারণ করে। এজন্য তাহাদিগকে আমাদের দেশীয় শ্রমজীবী কৃষকগণের ন্যায় কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা করিতে হয় না। বনের পশু ও জলের মৎস্য ধরিবার জন্য তাহাদের যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা তাহারা অতি শৈশবেই শিক্ষা করে, ধনুর্বিদ্যা ও সন্তরণ-কৌশলে তাহাদের সমকক্ষ কয়টি জাতি আছে? তাহারা অতি সুন্দর, সুদৃঢ় ধনুক, তীক্ষ্ণধার লৌহফলক-বিশিষ্ট তীর এবং মৎস্য ধরিবার উপযোগী এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করে, এবং অতি অল্প বয়সেই অবলীলা ক্রমে নৌকা সঞ্চালন ও তীর নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়। উহারা বায়, তিথি,

মাস প্রভৃতি কাহাকে বলে জানে না। সংখ্যাগণনা, কাল নির্ণয়, আপন আপন বয়স নিরূপণ এবং কে কোথা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাও উহারা অবগত নহে। ইহারা কিছু না জানিয়াই পরম সুখী—অজ্ঞান অবস্থাই ইহাদের সুখের কারণ। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি বোধহয় ইহাদের সমান কোন মনুষ্যজাতির সুখের অবস্থা কল্পনা করিয়াই লিখিয়া থাকিবেন,

"Where ignorance is bliss
'Tis folly to be wise."

সার্থকজন্মা বৃটন সন্তান! তুমি আজি ইহাদিগকে মনুষ্য জাতির অভাব অনুভব করাইবার জন্য প্রয়াসবান—নগ্নাবস্থা অতিশয় কুৎসিৎ, ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য তুমি সাধ্য মত চেষ্টা পাইতেছ—তুমি তাহাদিগকে ভক্ষ্যদ্রব্য অগ্নিতে পাক করিয়া খাইতে শিখাইতেছ—তুমি তাহাদিগকে অল্প পরিমাণে কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য বিবিধ উপায় অন্বেষণ করিতেছ, এবং তুমিই ইহাদের উন্নতির জন্য শত উপায় বিধান করিতে অগ্রসর হইতেছ; মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বর তোমার সহায়, তাঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার যত্ন ও উদ্যম একদিন নিশ্চয় সফল হইবে। কিন্তু আজি যাহারা অজ্ঞানতা-জনিত বিমল সুখে বিভোর হইয়া সর্ব্বদা নাচিয়া গাইয়া, হাসিয়া খেলিয়া দিন যাপন করিতেছে, সভ্যতার কঠোরদিনে আর তাহারা তেমন সুখ পাইবে না, তখন তাহারা ক্ষতিলাভ গণনায় তৎপর জগতের শত অত্যাচারে উৎপীড়িত ও শত অসুখে অসুখী হইয়া স্ব স্ব অভাব ও উচ্চাভিলাষের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে এবং তখন তাহারা মানুষ হইতে শিখিবে! কিন্তু এখনও সে দিন অতি দূরে।

ইহাদের কোন ধর্ম্ম নাই। ঈশ্বর কে, এবং ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি না, তাহা তাহারা জানে না এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে অপর কোন দেবতা বা কোন শক্তিমান পদার্থের উপাসনা করেনা। ইহারা প্রতি মাসান্তে প্রতিপদ তিথির রেখাকৃতি চন্দ্রোদয়ে বিশেষ আনন্দ উৎসবে মত্ত হয়। সেই রাত্রি ইহারা দলবদ্ধ হইয়া তালে তালে নাচিতে থাকে এবং গান গায়। ইহাদের এই অভ্যাস দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উহারা চন্দ্রকেই দেবতা জ্ঞানে মান্য করিয়া থাকে। এই অনুমান সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। ইহারা পরকাল বিশ্বাস করে না; ইহাদের মত এই, মানুষ মরিয়া আকাশে মিশিয়া যায়। বোধ হয়, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই ইহারা ইহাদের আত্মীয় বন্ধুর মৃত দেহ উচ্চবৃক্ষের স্কন্ধদেশে মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি শয়ান রাখে।

ভাষা। ইহাদের আকার ও বেশভূষার ন্যায় ইহাদের ভাষাও অতি অপরূপ। উহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং বাক্যকথন প্রণালী অতিশয় কর্কশ। যাঁহারা মহাত্মা ডারউইনের মন্ত্র-শিষ্য, জানিনা তাঁহারা কি ভাবে উহার ব্যাখ্যা করিবেন। উহাদের ভাষার কতিপয় শব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ভাষার প্রায় অধিকাংশ শব্দ 'ডা'—অন্ত। যথা—মাতা—মায়ডা; পিতা—আপপায়েলডা; ভাই—আডার্‌দোয়াডা; ইত্যাদি।

নৃত্যগীত। ইহারা প্রায়ই দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া নাচে। আমাদের দেশে চৈত্র সংক্রান্তীর চড়ক পূজায় চড়ক-সন্ন্যাসী-

গণ সচরাচর যে ছন্দে নৃত্য করে, আণ্ডামান পুরুষগণের নৃত্যের সহিত তাহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। সময়ে সময়ে অবিরাম লম্ফ ঝম্পে ইহাদের নৃত্যের অবসান হয়। এই নৃত্য সাতিশয় বিরক্তিপ্রদ, নৃত্যজনিত পদ সঞ্চালনে বোধ হয় যেন ভূপৃষ্ঠ কম্পিত হইতে থাকে। আণ্ডামান-রমণীর নৃত্য কিয়ৎপরিমাণে মধুর। এ দেশীয় অধিকাংশ নর্ত্তকী নৃত্যকালে যেমন বিকট অঙ্গ ভঙ্গী ও জঘন্য হাবভাব প্রকাশ করিয়া স্বরুচিসম্পন্ন দর্শকের অন্তরে ঘৃণার অনল জ্বালিয়া দেয়, ইহাদের নৃত্যে সে ভাব লক্ষিত হয় না। ইয়ুরোপীয় ললনাগণ যে তালে পল্কা (Polka) ও হঙ্গেরীয় নৃত্য প্রদর্শন করে, আণ্ডামান-রমণীর নৃত্য অনেক অংশে তাহার ধার দিয়া যায়। সময়ে সময়ে দুইটি আণ্ডামানকামিনী উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হইয়া এবং উভয়ের হাত ধরিয়া মৃদু পদ সঞ্চালনে এক প্রকার নৃত্য করে, উহাতে আমাদের দেশীয় প্রথার ঈষৎ ছায়া পরিলক্ষিত হয়। উহাদের গানের কোন বিশেষ অর্থ নাই। উহাদের যখন যাহা মনে হয় তাহাই বিচিত্র স্বর সংযোগে গান করে এবং এক সময়ে একই গান পুনঃ পুনঃ গাইতে থাকে। আজি তাহারা যে গানটি গায়, কালি তাহারা তাহা ভুলিয়া যায়। প্রতি দিন নূতন নূতন কথায় নূতন নূতন গান করে। উহাদের ভাষাভিজ্ঞ বলেন যে, উহাদের গানে কোন ভাবের ছন্দাংশও নাই। নিম্নে তাহাদের ভাষার দুইটী গান উল্লিখিত হইল।

(১) "আডি তারেবুলা কায়েলাডো
মাডি তারে ইতারে বুই,
আডে মা ইলে ডা।
ইলাজো, আডোমা, লোলোলো।

(২) নৃত্য করিতে করিতে দ্রুততালে গান
ও ডা চোরু বালুডা,
ও ডা চোরু বালুডা,
ও ডা চোরু বালু আরে ডা,
ইতারে ডা ইলাবুই।

আমরা তাহাদের ভাষা বুঝি না, সুতরাং জানি না উল্লিখিত গান দুইটিতে কি কবিত্ব ও কি মধুরতা আছে। যে জাতির হৃদয়ে কোন উচ্চ ভাব জাগিয়া উঠে না—যাহারা স্বভাবজাত সংস্কার ও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ জ্ঞান বলে পশুর ন্যায় সঙ্কীর্ণ সীমা মধ্যে পরিচালিত, তাহাদের গানে কোন কবিত্ব বা মাধুর্য্য থাকিতে পারে কি না, হৃদয়বান পাঠক তাহার বিচার করুন।

জাতোৎসব। প্রসূতির সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রতিবাসী আণ্ডামান-রমণীগণ দলে দলে নবজাত সন্তান দেখিতে একত্র সমবেত হয়। পুত্র সন্তান হইলে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না—তাহারা হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্যগীতে রত হয়। পক্ষান্তরে প্রসূতির কন্যাসন্তান জন্মিলে তাহাদের বিষম বিষাদ; সকলে বিনা আমোদে স্বস্বগৃহে প্রত্যাগমন করে। পুত্র বা কন্যার জন্ম দিনেই তাহাদের নামরক্ষিত হয় এবং তাহারা আজীবন এক নামে আহুত হইয়া থাকে। প্রসবকালে বা প্রসবান্তে প্রসূতি সূতিকা গৃহে থাকেনা বা কোন নিয়মের বাধ্য হইয়া চলেনা।

বিবাহ ও প্রণয়। ইহাদের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নাই। বিবাহের কোন বিশুদ্ধ প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও এই অজ্ঞান ও অসভ্যদিগের মধ্যে যে প্রণালী বিদ্যমান আছে তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। স্ত্রীর ইচ্ছার

উপর বিবাহ নির্ভর করে এবং তাহার ইচ্ছানুসারেই বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়। আণ্ডামান যুবতী প্রথমতঃ স্বামী মনোনীত করে এবং আপনার অভিপ্রায় ভাবী স্বামীকে জানায়। সে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তৎপরদিনেই বিবাহের দিন স্থির হয়। তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলে অভিমানিনী অপর স্বামী মনোনীত করিয়া তাহাকে বিবাহ করে। বিবাহের দিনে ইহারা প্রচুর পরিমাণে মৎস্য ধরে এবং অনেক বন্য পশু বধ করে। রাত্রিতে সকল বন্ধু ও প্রতিবাসী স্ত্রী পুরুষ এক স্থানে মিলিত হইয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে এবং সমস্ত রজনী সকলে সমস্বরে গান গায় ও মধ্যে মধ্যে এক এক বার একএক দল স্ত্রী পুরুষ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের চারি দিক বেড়িয়া নৃত্য করে। যখন নৃত্যগীতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন সকলে মিলিয়া দগ্ধ মৎস্য ও পশু মাংস প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করে। যখন আহার সমাপ্ত হয় তখন রজনীও প্রায় শেষ হইয়া আইসে; তখন পতিপত্নী উৎসব ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া গৃহে গমন করে। গৃহে উপস্থিত হইয়া উভয়ে এক পাত্রে আহার করে, আহারান্তে বিবাহোৎসব পরিসমাপ্ত হয়। স্ত্রী স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসে, সর্ব্বদা স্বামীর কাছে কাছে থাকে এবং বিশেষ যত্নের সহিত স্বামী-সেবায় রত থাকে। স্বামী পীড়িত হইলে স্ত্রী বিশেষ অসুখী হয়। স্বামীর শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইলে স্ত্রী যত্নের সহিত স্বহস্তে তাহার ঘর্ম্ম মুছাইয়া দেয়, এবং মনের সাধে স্বামীকে নানা বর্ণে ও নানা ভূষণে সজ্জিত করে। স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীশোকে অভিভূত হইয়া পড়ে, কিন্তু কিছু দিন পরে পুনরায় বিবাহ করিয়া সকল শোক ভুলিয়া যায়। স্বামীও স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া থাকে।

মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। কোন আত্মীয় বন্ধুর মৃত্যুকালে ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার সেবা করে। যখন তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, সে তাহাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া চলিল---আর সে তাহাদের কাছে আসিবে না, এই ভাবিয়া তাহারা গভীর আর্ত্তনাদে শোক প্রকাশ করিতে থাকে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন তাহারা নিতান্ত নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহারা ক্রমশঃ গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। অনন্তর তাহারা মৃতব্যক্তিকে জাতীয় বেশভূষা ও বিবিধ যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত করে এবং নিকটস্থ উচ্চ বৃক্ষের মস্তকোপরি দারুময় মঞ্চ নির্ম্মাণ ও তদুপরি পত্র-শর্য্যা রচনা করিয়া তাহাতে মৃত দেহ শয়ান রাখে; এবং গৃহে প্রত্যাগমন কালে আর একবার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে। ৫।৬ মাস পরে মৃতব্যক্তির অস্থিরাশি বৃক্ষ হইতে নামাইয়া সমুদ্রের জলে ধৌত করে এবং আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক এক খানি অস্থি লইয়া মালা গাঁথিয়া গলায় পরিধান করে। স্ত্রী মৃতস্বামীর কপালের অস্থি গ্রহণ করে, উহা অপর কাহারও পাইবার অধিকার নাই

ব্রাউন্‌সাহেব লিখিয়াছেন, আণ্ডামানীরা উহাদের মৃতদেহ সমাহিত করে। একথা সঙ্গত নহে, কারণ উহাদের মধ্যে সমাধিপ্রথা প্রচলিত নাই। মানুষ মরিয়া আকাশে মিশিয়া যায়, এই বিশ্বাস প্রণোদিত হইয়া ইহারা ইহাদের জাতীয় মৃত দেহ উচ্চ বৃক্ষের শীর্ষস্থানে স্থাপিত করে।

শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ দর্শন।

(তৃতীয় প্রস্তাব।)

অশোক অনুশাসন সকল গিরিগাত্রে, প্রস্তরময় স্মরণী স্তম্ভে এবং কয়েকটী বিহার ও উড়িশ্যা দেশে গুহা মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। প্রিয়দর্শী অশোকবর্দ্ধন তাঁহার রাজত্বের দশম ও দ্বাদশ বৎসরে অতি দূর দূরস্থিত পঞ্চ পর্ব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী অনুজ্ঞা লিপিবদ্ধ করেন। এই পাঁচটী পর্ব্বতের অবস্থান দৃষ্টি করিলে তাঁহার রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল বুঝিতে পারা যায়। (১) শাবাজ গাড়ি বা কপূর্দ গাড়ি পেশোরের ৪০ মাইল উত্তর পূর্ব্ব এবং আটক হইতে ২৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে যুসফজি প্রদেশে অবস্থিত (২) খলসি যমুনার পশ্চিম তটে দেহরাদূনের নিকট (৩) গির্ণার সোমনাথ হইতে বিংশ ক্রোশ উত্তরে, কাঠিবাড় প্রদেশে জুনাগড়ের নিকট (৪) ধবলী কটকের দশ ক্রোশ দক্ষিণে (৫) জৌগড় গঞ্জামের নয় ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে। শেষোক্ত পর্ব্বতদ্বয়ে দুই দুইটী অনুশাসন আছে। এতদ্ভিন্ন সহস্রারাম (সাসিরাম) রূপনাথ ও বিরাটে কয়েকটী গিরি শাসন আছে। এ পর্য্যন্ত সপ্তদশটী গুহা শাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে বরাবর, নাগার্জ্জুনী বুদ্ধগয়া, খণ্ডগিরি ও রামগড়ের শাসন গুলি প্রসিদ্ধ। অশোকবর্দ্ধন অনুজ্ঞা প্রচারের জন্য খোদিত বক্ষ কতগুলি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এখন জানিবার উপায় নাই। যবনদিগের কুঠারাঘাতে, অজ্ঞানান্ধদিগের মূর্খতায়, ঝড় বৃষ্টির নিষ্ঠুরতায় অধিকাংশ বিনাশ পাইয়াছে। যে গুলি অদ্যাপি জীবিত আছে, কাহারও দেহশূন্য মস্তক, কাহারও মস্তকশূন্য দেহ, কাহারও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথযথ রহিয়াছে, কিন্তু কোন প্রকার খোদিত লিপি সকল সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ রূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন ভাল অবস্থায় কেবল ১।২টী স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। যে দুইটী দিল্লীতে আছে ফিরোজশাহ তোগলক মিরট ও শৈবলিক পর্ব্বত হইতে তাহাদিগকে দিল্লীতে আনিয়াছিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন দিল্লীতে গিয়াছিলাম, ইহাদিগের আবার একটীকে নানা খণ্ডে ভগ্ন দেখিয়াছিলাম। অবশিষ্ট গুলি প্রয়াগ, কৌশাম্বী এবং দুইটী বেত্তিয়া জিলায় অবস্থিত। একটী পাটনার ১১ মাইল উত্তরে অররাজ মহাদেবের মন্দিরের নিকট, আর একটী গণ্ডকী তটে প্রাচীন নবন্দ গড়ে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

এই সকল অনুশাসন সম্বন্ধে প্রিন্সেপ, উইলসন, বর্ণুফ, কানিংহাম ও ফরাসী পণ্ডিত এমিলি সেনার্ট বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। প্রিন্সেপ ঐ অনুশাসন সকলের মধ্যে সংক্ষেপে এই রূপ বলিয়াছেন।

১। অহিংসা পরম ধর্ম্ম। ভোজনার্থে বা যজ্ঞ হেতু জীব হিংসা করিবে না।

২। রাজ্যের নানা স্থানে পীড়িত পশু, পক্ষী ও মনুষ্যের চিকিৎসা হেতু চিকিৎসালয় স্থাপন করিবে এবং বহু জনাবলম্বিত পথপার্শ্বে কূপ খনন করিবে এবং সারিগাছা রোপণ করিবে।

৩। পিতা মাতাকে সম্মান করিবে,

প্রতিবাসী স্বজন ও পুরোহিতদিগকে দয়া করিবে, পশু পক্ষীর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিবে না। দেহ কখন অমিতাচারে কলুষিত করিবে না, রসনা যেন কুকথা না বলে। (ইহা একটী বৌদ্ধ সূত্র)

৪। প্রিয়দর্শীর রাজত্ব কালে দেশের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কত উন্নত হইয়াছে, তুলনা ও ঘোষণা করা এই অনুজ্ঞার উদ্দেশ্য।

৫। দেশ বিদেশে বালবৃদ্ধ ধনী দরিদ্রের নিকট ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রচারকগণ প্রেরিত হইলেন।

৬। প্রজাগণের আচার ব্যবহার অনুসন্ধান হেতু "পতি বেদক" দণ্ড পুরস্কার হেতু "অন্ত যাথিক" গণ নিযুক্ত হইলেন।

৭। প্রিয়দর্শীর একান্ত কামনা ধর্ম্ম রুচি মর্য্যাদার বিভিন্নতা দূরীভূত হইয়া সকলের ভাব শুদ্ধি, শান্তি, পবিত্রতা, জ্ঞান ও বিশ্বাসের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

৮। বিলাস ও বিমলানন্দে কত প্রভেদ। পূর্ব্বতন বিহার যাত্রা, অধুনাতন ধর্ম্ম যাত্রায় কত অন্তর। সাধু দর্শন, ভিক্ষা দান ও গুরুভক্তি বিমলানন্দের এক মাত্র উৎস।

৯। বিবাহ, সন্তান পালন, বিদেশ ভ্রমণে সুখ নাই। অনুগত পালন, গুরুসেবা, অমিত কারুণ্যে ধর্ম্ম মঙ্গল লাভ হয়।

১০। যশ বা কীর্ত্তি অচিরস্থায়ী। প্রিয়দর্শী লোকাতীত পুরস্কার আশায় পরাক্রমের সহিত চেষ্টা করিতেছেন।

১১। সকল দান অপেক্ষা ধর্ম্ম দানের মূল্য অধিক। ধর্ম্ম বিতরণে ইহলোক ও পরলোক উভয়ে পুরস্কার ঘটে।

১২। এটী অসম্পূর্ণ, যাহা আছে তাহাও বুঝা যায় না। অবিশ্বাসীদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হইয়াছে এবং ধর্ম্ম মহামাত্য, স্থবির মহামাত্য ও কর্ম্মক নামে তিন শ্রেণীর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারী নিয়োগের ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৩। এটী পাওয়া যায় না।

১৪। ইহাতে পূর্ব্ব ত্রয়োদশটীর সংক্ষিপ্ত সার দেওয়া হইয়াছে।

এই অনুশাসন সকলের ভাষা সম্বন্ধে ডাক্তার কানিংহাম বলেন ;—

"As revealed in these engraved records, this spoken language was essentially the same throughout the wide and fertile regions lying between Himalaya and Vindhya, from the banks of the Indus to the mouths of the Ganges. There are, however, some marked points of difference, which show that there were at least three distinct varieties of Pali in the time of Asoka. These may be called according to their geographical distribution ; the Panjabi or north-western dialect, the Ujjini or middle dialect and the Magadhi or eastern dialect."

তিনি বলেন শাবাজ গাড়ী অনুশাসন পঞ্জাবী-পালি ভাষায় লিখিত। অন্য সকল অনুশাসন অপেক্ষা ইহার ভাষার সহিত সংস্কৃতের সৌসাদৃশ্য অনেক অধিক। বস্তুত সেই প্রাচীন সময়ে কাশ্মীরাঞ্চলে সংস্কৃতের চর্চ্চা যত অধিক ছিল, ভারতবর্ষের আর কোথাও সে রূপ ছিল না। সুতরাং এতদ্দেশীয় ভাষার রূপান্তরিত অবস্থায়ও অন্য সকল স্থানের ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃত শব্দ অধিক থাকিবার সম্ভাবনা। এবং ব, র, শ, ষ, স, প্রভৃতির উচ্চারণ অধিক ভাল হইবার সম্ভাবনা। গির্ণার, রূপনাথ প্রভৃতি অনুশাসনের ভাষাকে উজ্জয়িনী পালি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এ ভাষার র প্রায়ই লএর মত উচ্চারণ হইয়াছে ; কিন্তু কোথায় কোথায়ও র দেখিতে

পাওয়া যায়। তিনটী শ, ষ, স, ঘুচিয়া একটী শ হইয়াছে, কিন্তু দু এক স্থানে ষ ও দেখা যায়। মাগধী-পালি ভাষার 'র'য়ের উচ্চারণ একবারে লোপ হইয়াছে, সর্ব্বত্রই র, স্থানে ল ব্যবহৃত হয় এবং শ, ষ, স ঘুচিয়া কেবল একটী শ দেখিতে পাওয়া যায়।

আচার্য্য উইলসন বলেন

"The language itself is a kind of Pali. There are, however, many differences, some of which arise from a closer adherence to Sanskrit, others from possible local peculiarities, indicating a yet unsettled state of the language·· We may be content to consider the language as Pali, not yet perfected in its grammatical structure and deviating in no important respect from Sanskrit."

প্রিন্সেপ সাহেব বলেন

"The language differs from every existing written idiom, and is as it were intermediate between the Sanskrit and Pali. It is curious that the Shabazgarhi inscription departs less from the Sanskrit than the others... We may presume that the Girnar inscriptions represent the Pali (or vulgar) tongue as it was in the time of Asoka in the west of India. .The vernacular language of India at that period, then, varied in different provinces; it approached more to the Sanskrit in the northwest, diverged from it in Magadha and Kalinga, but it was in both places essentially what is now called Pali; a word supposed to be derived from *palli* a village···There is no trace of genuine Prakrit in either of the dialects, and we may therefore agree with Professor Lassen that the *patois* of the dramas was not used until three or four enturies later. The grammarians, who subsequently framed the rules of this corrupted idiom, cease to mention Pali at all, a proof that it had already been banished from the country."

জন মিউর বলেন

"From the age to which these inscriptions appear to belong, we might expect that their language, as it is not pure Sanskrit, would coincide in a great degree withthe Pali, which, as we have already seen, represents what we may suppose to have been the spoken language of some province of northern India about the same period. And such proves on comparison to be to a considerable degree the case."

আচার্য্য লাসেন বলেন

"These inscriptions are of the greatest value for the history of the Indian languages, because they exhibit to us in an authentic shape the most ancient forms assumed by the popular dialects and furnish us with a secure basis for the comparative grammar of the great Sanskritic family of languages, which became so variously developed··· In these inscriptions, we possess specimens of three vernacular dialects, one from the border country to the northwest, a second from western and a third from eastern Hindustan."

আচার্য্য লাসেন আরো বলেন যে, গিরিশাসন সকলের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও স্তম্ভ শাসন সকলের ভাষা সর্ব্বত্র একই। সে মাগধী ভাষা। মাগধী তৎকালে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত বিশ্বাস করা যায় না। বোধ হয় অশোক রাজধানীর ভাষা বলিয়া মাগধীতে স্তম্ভশাসন সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। গিরিশাসন সকলে যে সকল প্রদেশীয় ভাষার আভাস পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন আরো অনেক ভাষা তৎকালে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে সকলের এখন আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এখন জিজ্ঞাস্য, পালিভাষার সহিত অশোক শাসনের ভাষার সম্বন্ধ কি? সক-

লেই স্বীকার করিবেন যে, শাসনের ভাষা পালি ভাষা হইলেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে। এই প্রভেদ যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহার ও সন্দেহ নাই। তবে কি বুঝিতে হইবে (১) পালিভাষা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের চলিত ভাষা হইলেও স্থানগুণে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কিছু ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। অথবা (২) পালিভাষা অশোকের সময় শিক্ষিতগণের ভাষা থাকিলেও সাধারণ লোকের মধ্যে ক্রমে অপ্রচল হইয়া আসিতেছিল; সেই সাধারণ লোকের ব্যবহৃত এই সকল পালি-অপালি ভাষা। অথবা বলিতে হইবে যে (৩) প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা সাধারণের মধ্যে প্রথমে এই আকার ধারণ করিয়াছিল, শেষে এই সকল গ্রাম্যভাষা একত্র হইয়া একটী সাধারণ ব্যবহৃত পালি ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। সেই পালিভাষা আবার শেষাবস্থায় বররুচি উল্লিখিত মহারাষ্ট্রী শৌরসেনী প্রভৃতি ভাষায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল পাশ্চাত্য আচার্য্যগণের মত উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহারা কেহ স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তথাপি কথার ভাবে তাঁহাদিগকে এই তিন দলের অন্যদীয় দলভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। প্রথম পক্ষ শাসনভাষা পালিভাষার সমকালীন, দ্বিতীয় পক্ষ কিছু পরন্তন, তৃতীয় পক্ষ শাসনভাষা পালিভাষার পূর্ব্বতন বলিয়া অনুমান করেন। উইলসন ও প্রিন্সেপ্ তৃতীয় পক্ষীয়, কানিংহাম প্রথম পক্ষীয়, বোধহয় মিউর ও লাসেন দ্বিতীয় পক্ষীয়। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র বলেনঃ—

"The Sanskrit passed into the *gatha* six or seven hundred years before the Christian era; that three or four hundred years subsequently it changed into the Pali, and that thence in two hundred years more preceded the Prakrit and its sister dialects, the Sauraseni, the Dravidi and the Panchali, which in their turn formed the present vernacular dialects of India." সুতরাং বুঝিতে হইবে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল তৃতীয় পক্ষীয়।

Nepalese Budhist Literature নামক গ্রন্থে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল তাঁহার মত আরো স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন "The Pali of the edict was doubtless the language of record and the court language of Asoka; it was probably also with more or less local variations, the vernacular of the Indo-Arian races."

আমরা পূর্ব্বে কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছি যে সিংহলে একটী জনশ্রুতি প্রচার আছে যে, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র পালিভাষার রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ সকল সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। তৃতীয় পক্ষের মত সত্য হইলে, এই জনশ্রুতি অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আর যদি সে জনশ্রুতি সত্য হয়, তবে অশোকের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে যে পালিভাষা প্রচারিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং সিংহলে বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রচার সম্বন্ধে কে কি বলেন, একবার দেখা যাউক।

মহাবংশ সিংহলের একখানি প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাস। মহাবংশে লিখিত হইয়াছে যে, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সটীক পালি পিটকত্রয় লইয়া সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ আগমন করেন। তখনও বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, মুখে মুখে সকলে শিখিয়া রাখিত। সিংহলে তখনও পালি ভাষা প্রচারিত হয় নাই;

সুতরাং সাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে মহেন্দ্র টিকাগুলি (অর্থকথা) সিংহল ভাষায় অনুবাদিত করেন। সিংহলভাষায় অনুবাদিত এই টিকা ক্রমে সাধারণের এত আদরণীয় হইয়া উঠে যে, পালি অর্থ কথা কালবশাৎ লোপ পাইয়াছিল। পালি ত্রিপিটক ও সিংহলীয় অর্থ কথা খ্রীষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত লোকে মুখে মুখে শিখিত। তাহার পর অক্ষরবদ্ধ হয়। এই ঘটনার পাঁচ সাত বৎসর পরে অর্থাৎ খ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বুদ্ধঘোষ সিংহলীয় অর্থকথা পুনরায় পালিভাষায় অনুবাদিত করেন। ইহার পরে সিংহল হইতে পালি ত্রিপিটক ও অর্থকথা, শ্যাম. ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশীয় ভাষা সকলে অনুবাদিত হইয়াছিল। মহেন্দ্রের সিংহল গমন ও বুদ্ধঘোষের অর্থ-কথা পালিভাষায় পুনরানুবাদ কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিবিধ ঘটনার সময়সম্বন্ধে আমরা স্থানান্তরে আলোচনা করিব।

আচার্য্য চেবর এই জনশ্রুতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু সমগ্র ত্রিপিটক তখন রচিত হইয়াছিল কি না, এই বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। "It is extremely doubtful how much of the present Tipitaka may have actually been in existence then. For if we compare the Bhabra missive, addressed by king Piyadasi to the synod of Magadha, which was then engaged in the accommodation of schisms that had sprung up relative to the sacred texts as they then stood, a mighty difference becomes apparent."

আচার্য্য লাসেন এই জনশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছেন। মিউর সাহেবও এই জনশ্রুতি বিশ্বাস করেন। কিন্তু মহেন্দ্রের সময়ে পালিগ্রন্থ সকল অক্ষরবদ্ধ হয় নাই, ইহা তাঁহার মত নহে। তিনি বলেন, মহেন্দ্র পালিভাষায় লিখিতগ্রন্থ সকল সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র লালেরও এই মত, কিন্তু তাঁহার মতে মহেন্দ্র যে গ্রন্থ সকল লইয়া গিয়াছিলেন, উহা পালি ভাষায় লিখিত ছিলনা, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ছিল। মহেন্দ্র ও বুদ্ধঘোষ সংস্কৃত হইতে বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল পালিভাষায় অনুবাদিত করেন। তিনি বলেন "As the time of Mahendra, two if not three convocations of the Budhist clergy had already been held and their scriptures finally settled and the books carried must have been what were so settled at the convocations and these were certainly not written in Pali or Magadhi, for the Pali of the Pitakataya is not the Pali of Asoka's edicts"

মহাবংশ অনুবাদকার মাননীয় টর্ণুর সাহেব মহাবংশ লিখিত জনশ্রুতি বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার মতে গ্রন্থগুলি এত দিন মুখে মুখে ছিল না। পুরোহিতেরা শিষ্যদিগকে ঐ রূপ বুঝাইয়া দিলেও ভিতরে ভিতরে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। হজসন সাহেব ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের সহিত সম্পূর্ণ এক মত। আচার্য্য মোক্ষমুলর বলেন, মহেন্দ্র ও বুদ্ধঘোষ অনুবাদ করিবার সময় মূল কথায় অনেক সংযোগ বিয়োগ করিয়া থাকিবে। কোন্ ভাষায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ মহেন্দ্র সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। এবং অর্থ-কথায় সংযোগ বিয়োগ হইয়া থাকিলেও মূলগ্রন্থ কেন অবিশ্বাস করা হইবে, সে বিষয়েও কোন আলোচনা করেন নাই।

সিংহলদেশীয় কিম্বদন্তী সম্বন্ধে যাহার

যে মত, আমরা পাঠকগণের নিকটে নিবেদন করিলাম। এখন প্রত্যেকে আপন আপন অনুমান মত যাহা হয় স্থির করিবেন। মহেন্দ্র লিখিত বা মুখস্থ কতকগুলি গ্রন্থ সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন, এ কথা কেহই অস্বীকার করেন নাই। মহাবংশ স্পষ্টাক্ষরে সেগুলি পালিভাষায় রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এমন স্থলে ডাক্তার রাজেন্দ্র লালের অনুমান মত সে গুলি সংস্কৃত বলিয়া কেন আমরা বিশ্বাস করিব, বুঝিতে পারি না। রাজেন্দ্রলাল অশোক শাসন সকল এক প্রকার পালিভাষায় লিখিত অস্বীকার করিতে পারেন নাই ; তবে তিনি বলেন ত্রিপিটকত্রয়ের পালিভাষা অশোক শাসনের ভাষা হইতে পরিস্ফুট। সে কথা সত্য হইতে পারে। অশোক-শাসনের ভাষা একবার গিরি গাত্রে বা স্তম্ভ দেহে খোদিত হইলে আর কেহ তাহাকে পরিবর্ত্তিত বা সংস্কৃত করিতে পারে নাই ; হইতে পারে মহেন্দ্র যে সকল গ্রন্থ সিংহলে লইয়া গিয়াছিলেন, সে গুলিও ঐ রূপ অস্ফুট ভাষায় তখন রচিত হইয়াছিল, কালক্রমে বিভিন্ন আচার্য্যের হস্তে সে ভাষা পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়াছিল। মহেন্দ্র আনীত গ্রন্থগুলি সংস্কৃতে রচিত হইতে পারিত না, এ কথা আমি বলি না। তাহারা সংস্কৃত ভাষায় রচিত ছিল, এ কথার কেহ কোন প্রমাণ দেন নাই। প্রথম বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল কোন্ ভাষায় রচিত হইয়াছিল, অনতি বিলম্বে বিচার করা যাইবে। ক্রমশঃ

লোক সংখ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অসভ্য অবস্থায় এই সকল অন্তরায় যেমন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, সভ্য অবস্থায় তাদৃশ নহে। যুদ্ধ বিগ্রহ, বৃদ্ধ ও শিশু নাশ, অতিরিক্ত শ্রম, পীড়া, স্বাস্থ্যহানিকর দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি অসভ্যদিগের মধ্যে যে প্রকার লোক নাশকর, সভ্যদিগের মধ্যে তদ্রূপ নহে। অসভ্যাবস্থায় সামান্য কারণে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইয়া বিস্তর লোকের জীবন নষ্ট করে। অভাব হইলে লোকে বৃদ্ধ ও শিশু বধে কাতর নহে, জীবন ধারণের সহজ উপায় আবিষ্কারে অসমর্থ হেতু বিস্তর শ্রমকর ও অসমসাহসিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া বিস্তর লোকে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে হত হয়, আহারের অপ্রতুল বশতঃ সর্ব্বদা পীড়িত হইয়া অনেককে মানবলীলা সাঙ্গ করিতে হয়। উপযুক্ত আহারীয় দ্রব্য ও বাসস্থানের পারিপাট্য জ্ঞানের অভাবেও অনেকের নিপাত সাধিত হয় এবং সংক্রামক পীড়া ও দুর্ভিক্ষ সময়ে সময়ে অসংখ্য অসংখ্য লোকের জীবন নাশ করিয়া খাদ্য দ্রব্যের সহিত লোক সংখ্যার সামঞ্জস্য করিয়া দেয়।

সভ্য অবস্থায় এ সকল অনিষ্টের বিস্তর নিরাকরণ হইয়াছে। অত্যন্ত মহৎকারণ না হইলে আর প্রায় যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয়

না, বৃদ্ধ ও শিশুগণ বিনষ্ট না হইয়া যত্নে পালিত হয়, জ্ঞান বিজ্ঞান বলে সকল প্রকার শ্রমকর এবং অসম সাহসের কার্য্য সকল সহজ ও অনায়াস-সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, পীড়ার চিকিৎসার জন্য বিস্তর বিস্তর ঔষধি আবিষ্কৃত ও চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, বাসস্থানের পারিপাট্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিস্তর বিস্তর উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং বাণিজ্য ও গমনাগমনের সুবিধা বিধায়ক বিস্তর উপায়ও উদ্ভাবিত হইয়া দুর্ভিক্ষেরও বিস্তর দমন হইয়াছে, বলিতে হইবে। ফলতঃ সভ্য অবস্থায় লোক-নাশক প্রকৃতির সহিত সকল প্রকার বিবাদের পথ আবিষ্কৃত হইয়া মনুষ্য জীবন স্বচ্ছন্দ হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

কিন্তু সভ্যতা বৃদ্ধিতে কি বাস্তবিক লোকে সুখী ও স্বচ্ছন্দ হইয়াছে? সভ্য জগতের উপায় বৃদ্ধির সহিত কি প্রতিবন্ধকের উচ্ছেদ হইয়াছে? মনুষ্য সমাজের কি এক্ষণে বিনাশের সংখ্যা অল্প হইয়াছে? আমরা বলি কিছুই হয় নাই। লোকের দুঃখ ও কষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রতিবন্ধকের পথ পরিষ্কার হয় নাই; এবং বিনাশের সংখ্যাও অল্প হয় নাই। সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত বিস্তর উন্নতি হইয়াছে এবং যাহাতে জীবন সহজ হয়, তাহারও উপায় হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিনাশের কিছুই হ্রাস হয় নাই। অসভ্যাবস্থায় নিপাতের যে মূর্ত্তি ছিল, সভ্য অবস্থায় কেবল সেই মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। আকার ভেদে ফলের ভেদ হয় নাই, বরং তরবারির আঘাতে শীঘ্র জীবন নষ্ট না হইয়া সূচিকার দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বিলম্বে জীবন-নাশের যে ফল, তাহাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে। আমরা বলিয়াছি, আহার্য্যের প্রাচুর্য্য না হইলে লোক নাশের অন্তরায় সহজ নহে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত যেমন লোক নাশের উপায়ের শিরে কুঠারাঘাত করা হইতেছে, সেই প্রকার আহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে? যখন তাহা হয় নাই, তখন ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ যে, লোক বিনাশের কোন প্রকার উপায়েরই নিরাকরণ হওয়া সম্ভব নহে। তবে লোক বৃদ্ধির স্বাভাবিক অন্তরায়ের প্রতিবিধান হইয়াছে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সভ্যতা বৃদ্ধিতে স্বাভাবিক অন্তরায়ের প্রতিবিধানে কি সুফল ফলিয়াছে? লোক বৃদ্ধির অন্য প্রতিবন্ধক ব্যতিরেকে কেবল প্রাকৃতিক অন্তরায় উচ্ছেদের চেষ্টা করিলে সুফল ফলিবে না। ডারউইন সাক্ষ্য দিতেছেন যে, লোক নাশের স্বাভাবিক উপায়কে শ্লথ করিলেই এবং কোন প্রকারে বিনাশের প্রতিবন্ধকতা করিলেই লোক সংখ্যা নিশ্চয়ই অসংখ্য হইবে। ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তার হওয়াতে লর্ড ডার্বি যাহা বলিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা ভারতের শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপন করিয়াছি, স্থানীয় যুদ্ধ বিগ্রহ সাঙ্গ করিয়াছি, সংক্রামক পীড়ার আতিশয্য নিবারণ করিয়াছি এবং যথা সময়ে অভাব নিবারণ করিবার জন্য আমাদিগের যাহা সাধ্য তাহা করিয়া থাকি, এবং কখন বিফল হই না। ইহার ফল কি হইয়াছে? স্বভাবতঃ অবশ্যই লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে ভারতের যে প্রকার অবস্থা, যদি সেই প্রকারই থাকে, তাহা হইলে প্রতি পুরুষে অসংখ্য অসংখ্য প্রজা বৃদ্ধি হইবে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ এবং সময়ে সময়ে তথায় অনাবৃষ্টিও হইয়া থাকে,

স্মুতরাং সময়ে সময়ে তথায় অবশ্যই দুর্ভিক্ষ হইবে। আমাদিগের সাহায্যের উপর নির্ভর করা ব্যতিরেকে এই সকল লোকের অনাটনের সময়ে আর কোন উপায় নাই।" বাস্তবিক লোক নাশের স্বাভাবিক অন্তরায়ের বিনাশ এবং তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন প্রকার অন্তরায়ের অবর্ত্তমানে অবশ্যই মধ্যে মধ্যে মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যার ন্যায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে এবং অসংখ্য অসংখ্য লোক নাশ করিবে। অতএব আমরা বলি যে, অন্য অপ্রাকৃতিক অন্তরায় আবিষ্কৃত না হইলে সভ্যতার প্রাকৃতিক অন্তরায় নাশক উপায় সকল সুখকর নহে এবং ভারতে অদ্য যাহা ঘটিতেছে, ক্রমে সমস্ত সভ্যদেশেই তাহা ঘটিবে, তাহাতে সংশয় কি?

আয়র্লাণ্ডের অনুরূপ এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তথায় ২০ লক্ষ লোকছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকাতে এবং সভ্য রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত হওয়াতে দেড় শত বৎসরের মধ্যে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটী ৮০ লক্ষ লোকের বাসস্থান হইয়াছিল। লোক বৃদ্ধির কোন প্রকার অন্তরায় বিদ্যমান না থাকাতে আহারের অধিক লোক জন্মিল, কিন্তু ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশের প্রধান আহার্য্য দ্রব্য (আলু) বিনষ্ট হওয়াতে দেশে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া একেবারে লোক সংখ্যা প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

যাহা হউক, সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত অসভ্য অবস্থার অন্তরায় সকল বিস্তর পরিমাণে নিবারিত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার বিস্তর উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষ মহামারীতে যত লোক মরিত, এক্ষণে সে সংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। ১২৫৮ কেবল লণ্ডনে ১৫০০০ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে এই কারণে তিন অংশের এক অংশ লোক মরিয়াছে। রোমে ২৫০ হইতে ২৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সময়ে সময়ে মহামারীতে প্রত্যহ ৫০০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান নগরের অর্দ্ধেক লোক ১৫০৬ এবং ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দের মহামারীতে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অক্সফোর্ড একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল। ১৬০৩। ৪ খ্রীষ্টাব্দে মহামারীতে লণ্ডনে ৩০,৫৭৮ এবং ১৬৬৪।৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬৮, ৫৯৬ লোক বিনষ্ট হইয়াছে। নেপলস্ দেশে ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪ লক্ষ এবং মিসরে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ৮ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বঙ্গে, বেহারে, উড়িষ্যায়, মান্দ্রাজে সে দিনও অসংখ্য অসংখ্য লোক মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে এবং প্রতি বৎসর ওলাউঠা ও জ্বরে বিস্তর লোকের এখনও মৃত্যু হইতেছে। দুর্ভিক্ষ কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যহস্তাধীন বলিয়া তাহার হস্ত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্রাণ পাইবার উপায় হইয়াছে বটে, কিন্তু মহামারীর হস্ত অতিক্রম করিবার উপায় আজিও উদ্ভাবিত হয় নাই, বলিলেই হয়। ইহারা উভয়েই লোক সংখ্যা বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অপর্য্যাপ্ত শস্যের উৎপত্তি এবং বাসস্থানের পারিপাট্য ও প্রদেশীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি ব্যতিরেকে ইহাদিগের নিবারণের উপায় আজিও অজ্ঞাত। পরিজ্ঞাত উপায়েই যখন কার্য্য সাধিত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার, তখন নিশ্চয়ই অপরিজ্ঞাত উপায়ে ইহাদিগের নিরাকরণ হইবে না। কি কি উপায়ে ইহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া

মনুষ্য হস্তাধীন, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু এই অনিষ্ট নিবারণ করা যে একান্ত কর্ত্তব্য এবং লোকাধিক্য হেতু যে এই অনিষ্টের উৎপত্তি, তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে?

এক এক করিয়া লোক বৃদ্ধির অনিষ্ট সকলকে গণনা করিতে গেলে, দুর্ভিক্ষ প্রথম এবং মহামারী দ্বিতীয় স্থানীয়। কিন্তু ইহারা লোক নাশের প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ উপায় নহে, সুতরাং লোক বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল বা অনিষ্টও নহে। লোক বৃদ্ধি হইলেই যে সাক্ষাৎ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে এমন নহে—প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইলে লোক বৃদ্ধিতে ক্ষতি কি? যত লোক জন্মিবে যদি সকলেই যথেষ্ট আহার পায়, তাহা হইলে লোক বৃদ্ধিতে বিশেষ কোন ক্ষতি দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে অধিক লোক সেই থানেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, ইহার কারণ কি? দুর্ভিক্ষ শস্যের অনুৎপত্তি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে; কিন্তু যে সময়ে দুর্ভিক্ষ হয়, অনেক দিন যাবৎ সে দেশে লোক সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়া থাকে যে, দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে কিছু দিন সকল লোকে প্রচুর পরিমাণে আহার পায় না, অনুপযুক্ত ও অল্প মাত্র খাদ্যের উপর প্রাণ ধারণ করিয়া আইসে। যে বৎসর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সে বৎসর শস্যের অজন্মাবশতঃ বা অল্প উৎপত্তি হেতু যাহারা পূর্ব্বে প্রচুর আহার পাইতেছিল, তাহারা অল্প মাত্র আহার পায়, আর যাহারা অল্প মাত্র আহার পাইতেছিল, তাহারা একেবারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। অনাহারে যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের সংখ্যা বিস্তর; সুতরাং অবশ্য বলিতে হইবে যে, সেই বিস্তর লোকই অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি বশতঃ অনেক দিন হইতে অল্প আহার পাইয়া আসিতেছিল; এবং দুর্ভিক্ষ আসিয়া যদি তাহাদিগের সংখ্যা হ্রাস না করিত, তাহা হইলেও তাহাদিগের অনেকে শীঘ্র বা বিলম্বে কালগ্রাসে পতিত হইত।

মহামারী সম্বন্ধেও এই প্রকার বলা যাইতে পারে। মহামারীর স্পষ্ট কারণ আহারের অনুপযুক্ততা ও অপ্রতুলতা এবং বাসস্থান, গ্রাম বা নগরের অপরিষ্কার ও দূষিত অবস্থা। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি ভিন্ন আহারের অপ্রতুলতা ও অনুপযুক্ততা ঘটিবার কোন কারণ দেখা যায় না, কারণ অল্প সামগ্রী অধিক লোককে আহার করিতে হইলে অনেকের ভাগ্যে অল্প মাত্রই যুটিবে এবং অল্প মাত্র যুটিলে অনুপযুক্ত সামগ্রীর দ্বারা ক্ষুধা নাশ অবশ্যই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। বাসস্থানের স্বাস্থ্য ও অধিক লোকের দ্বারা যেমন দূষিত হয়, অল্প লোকের দ্বারা তেমন হয় না। যেখানে অধিক লোক বাস করে, মল মূত্র এবং অন্য জঞ্জাল সেখানে অবশ্যই অধিক একত্রিত হইবে। যদি ইহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরিত করিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহারা স্বাস্থ্যহানিকর হইয়া উঠিবে এবং কালে মহাপীড়া উৎপন্ন করিবে। ইহার উপর লোকাধিক্য দেশে অধিকাংশ লোকেরই দারিদ্র্য জন্য আবাস স্থান এবং গ্রাম বা নগরের অবস্থা অতি শোচনীয় ও স্বাস্থ্য হানিকর। সুতরাং, আহারের অপ্রতুলতা ও অনুপযুক্ততা এবং আবাস স্থানের অপরিস্কৃত ও দূসিত অবস্থার একত্রিত ফল মহামারী রূপে পরিণত হয়, ও অসংখ্য অসংখ্য লোকের জীবন নাশ করে। আবার মহামারীর সংক্রামকতা দোষ থাকাতে, যাহাদিগের আহার ও বাসস্থানের

অবস্থা উত্তম, তাহাদিগের মধ্যেও অনেকে কালগ্রাসে পতিত হয়। দুর্ভিক্ষের ন্যায় যাহারা মহামারীতে মানবলীলা সাঙ্গ করে, তাহারাও অনেক দিন যাবৎ অল্প ও অনুপযুক্ত আহারে শরীর পোষণ এবং অস্বাস্থ্যকর ও দূষিত স্থানে বাস করিয়া আসিতেছিল এবং মহামারী উপস্থিত না হইলেও শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, নিশ্চয়ই পীড়িত হইত ও প্রাণত্যাগ করিত।

মনুষ্যবুদ্ধি এই সকল অনিষ্ট নিবারণ করিবার বিস্তর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে ও করিতেছে, কিন্তু যত দিন লোক সংখ্যার বৃদ্ধি নিবারিত না হইতেছে, তত দিন ইহাদিগের মূলে কখনই কুঠারাঘাত করা যাইবে না। যদি কখন এই সকল ও অন্যান্য সকল প্রকার অনিষ্ট নিবারিত হয়, তাহা হইলে যাহাতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, সেই সকল উপায়ের দ্বারাই অবশ্য নিবারিত হইবে, অন্যথা অসম্ভব। মূলকে ছেদন করিতে না পারিলে শাখা প্রশাখাকে নষ্ট করিয়া বিশেষ ফললাভের আশা করা যাইতে পারে না।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ব্যতিরেকে সভ্য সমাজে খাদ্যের অপ্রতুলতা ও অনুপযুক্ততা নিবন্ধন যে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, পর অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

প্রেম কি উন্মত্ততা?

এ জীবন এক উৎসবময় নাট্যশালা নহে। সৌন্দর্য্যের চিন্তা ও কবিত্বের স্বপ্নই জীবনের উচ্চ কার্য্য নহে। এ জীবন বাসন্তসমীরণোচ্ছ্বসিত, সুধাংশু-কর-প্লাবিত, কোমল কুসুমময় উপবন হইবার জন্য মনুষ্যকে প্রদত্ত হয় নাই। এ কবিত্বের, এ শোভার মধ্যে স্থির, দৃঢ় কর্ত্তব্যের প্রতিমূর্ত্তি আছে। তাহার পূজা চাই। এ জগতে রুক্ষ, হাস্যহীন, হৃদয়হীন কর্ত্তব্যকে আরাধনা করিতে হইবে। কর্ত্তব্য উচ্চ, মহৎ; তাহার আদেশ অলঙ্ঘ্য। অনুরাগ কি কর্ত্তব্যের বাধা? সানুরাগ হৃদয়ে কি কর্ত্তব্যের পূজা হয় না? প্রেমী হইলে কি হৃদয় দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কার্য্যবিবশ হয়? বা কার্য্য করিতে ভুলিয়া যায়?—আমি বলিব, 'না'।

অনুরাগ কর্ত্তব্যের শত্রু নহে। বরং অনুরাগই কর্ত্তব্যের প্রাণ। এই শক্তি দ্বারা কর্ত্তব্য পরিচালিত হয়। অনুরাগহীন হৃদয় কর্ত্তব্যের আদর জানে না। তাহার নিকট কর্ত্তব্য শুষ্ক, কঠিন। প্রেমের মূলমন্ত্র আত্মোৎসর্গ;—প্রিয় জনের নিমিত্ত অচিন্তিত, সানন্দ আত্মোৎসর্গ। ইহা না থাকিলে প্রেম সত্য প্রেম নহে—তাহা মৌখিকতা ও অভিনয়। কাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলে তাহার নিমিত্ত স্বার্থত্যাগ তুচ্ছ জ্ঞান করা চাই। এ আত্মোৎসর্গ না থাকিলে বলিব 'যাও তুমি প্রবঞ্চক, তোমার ভালবাসা মুখের।' আর এই আত্মোৎসর্গই কর্ত্তব্যের পরিচালিকা শক্তি।

সত্য, অনেকে প্রেমমুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন। কিন্তু কেই প্রেমের স্বভাব

নিমিত্ত কার্য্যাক্ষম নহে। প্রেমের অভাবের নিমিত্ত সে কার্য্যবিবশ ও দুর্ব্বল। এক জনকে ভালবাসে বলিয়া সে দুর্ব্বল নহে; অনেককে ভালবাসে না বলিয়া সে অসমর্থ। কর্ত্তব্যে যেরূপ প্রিয়জনের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ চাই, সেই রূপ বহুর নিমিত্ত প্রিয়জনের উৎসর্গ চাই। এক জনকে ভালবাসিলে, অন্ততঃ তাহার প্রতি কর্ত্তব্য পালন সম্পূর্ণ হয়। তুমি কাহাকেও ভালবাস না; আমি অন্ততঃ এক জনকে ভালবাসি। তাহার নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারি। যদি এক জনকে ভালবাসিয়া অপরের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই, তাহা হইলে এ সঙ্কীর্ণ প্রেমকে অকুণ্ঠিত-চিত্তে কর্ত্তব্যের চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে। যখন এই প্রেম সেই কর্ত্তব্যের বাধা হইবে তখন তাহাকে প্রদমিত করিতে হইবে, নহিলে নয়। কর্ত্তব্যই আমাদিগের আরাধ্য প্রতিমা; অনুরাগ পূজার বিল্বকুসুম রাশি। কর্ত্তব্যই সাধনা; অনুরাগ সিদ্ধির মন্ত্র মাত্র।

ইহা নিতান্ত সত্য যে, এই প্রেমই অনেক সময়ে উচ্চ কর্ত্তব্যের বাধা হয়। ইহা নিতান্ত সত্য, এই সঙ্কীর্ণ প্রেম যাহা বিশ্ব প্রেমের নির্ঝরিণী,—তাহাই কখন কখন বিশ্বপ্রেমের প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। কিন্তু এই জগতের কিছুই অমিশ্রিত সুফল প্রসবী নহে। তাহার জন্য বহির্জ্জগতের বা অন্তর্জ্জগতের প্রতি পদার্থেরই উত্তম হইতে মন্দকে বিভিন্ন করিতে হইবে। কানন-রঞ্জ প্রফুল্ল গোলাপেরও সুরভি ও সৌন্দর্য্য হইতে কণ্টককে পৃথক করিতে হইবে। কণ্টকময় বলিয়া কুসুমকে দলিত করিতে হইবে না। তাই প্রেমেরও স্বর্গীয় উপকরণ হইতে এই নিতান্ত পার্থিব উপাদানকে পৃথক রাখিতে হইবে। প্রেমকে উৎপাটন করিতে হইবে না। যখন প্রেম কর্ত্তব্য বিরোধী হইবে, তখন সে প্রেমকে বিসর্জ্জন না করিয়া প্রেমের কর্ত্তব্যবিরোধিতাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই সুখ দুঃখময়ী, বহ্নি ধূমোপকরণা পৃথিবীতে অমিশ্রিত উত্তম আশা করা বিড়ম্বনা।

প্রেম পাপ নহে, উন্মত্ততা নহে। পার্থিব ধূলা জড়িত হইলেও প্রেম স্বর্গীয়রত্ন, প্রেম হৃদয়ের শিক্ষার প্রথম সোপান। প্রেম অনন্তনিঃসৃতা নির্ঝরিণী; ইহার গম্য স্থান দিগন্ত প্রসারিত বিশ্বপ্রেম—সিন্ধু বা ততোধিক অনন্ত ঈশ্বরপ্রেম। সেই উচ্চ প্রেমই কর্ত্তব্যের প্রাণ। উচ্চ কর্ত্তব্যের নিমিত্ত বিশ্বপ্রেম চাই। উচ্চ কর্ত্তব্যের নিমিত্ত সঙ্কীর্ণ প্রেমকে উৎসর্গ করাতে, কেবল বিশ্বপ্রেমের নিকট সঙ্কীর্ণ প্রেমকে বলি দেওয়া হয় মাত্র,—উচ্চ অনুরাগের নিকট সামান্য অনুরাগের উৎসর্গ হয় মাত্র। উচ্চতম প্রেমকে কখন উচ্চতম কর্ত্তব্যের চরণে উৎসর্গ করিতে হয় না। এই উচ্চ প্রেম মহতী শক্তি। ইহাই কর্ত্তব্যকে পরিচালিত করে। এ প্রেমের নিকট পার্থিব সকল শক্তি পরাস্ত হয়, কারণ এ প্রেম স্বর্গীয় শক্তি। এ প্রেম না থাকিলে পূর্ণ হৃদয়ে কর্ত্তব্যের পূজা হয় না। ভাল না বাসিলে কি প্রকারে নিজের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া সেই উচ্চ কার্য্যের আরাধনা করিবে? উচ্চ কার্য্যের স্বার্থত্যাগ চাই। ভাল না বাসিলে এ স্বার্থত্যাগ সম্ভবে না। তাই বলি অনন্ত অনুরাগ ভিন্ন উচ্চ কর্ত্তব্য সিদ্ধ হয় না। এই অনুরাগ কার্য্যের প্রস্রবণ।

জগতে ক্ষমতাভিলাষ কার্য্যের এক আকর্ষণী শক্তি। ক্ষমতা—অপরের উপর আধিপ-

নীয় প্রভুত্ব—ইহা অনেকেই বাসনা করে। লব্ধনামা নেপোলিয়ন এই কষাঘাতে সকল বাধা বিঘ্ন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া জগৎ আলোড়িত করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের—ইউরোপের অধীশ্বর হইব; ইংলণ্ড, রুষিয়া, জর্ম্মনি পদতলে বসিয়া সজল নয়নে ভিক্ষা চাহিবে, এই চিন্তায় নেপোলিয়নের হৃদয় বিস্ফারিত হইত, তাঁহার বিশ্ববিকম্পী কার্য্য অনুপ্রাণিত হইত। তাই বলি, এই ক্ষমতাভিলাষ এক প্রবল শক্তি।

যশোলিপ্সা আর এক মহতী শক্তি। ইহা জগতের বহুস্থলে বিচরণ করে। ইহা বহু উদ্যম ও কার্য্যের প্রাণ। ইহা অবসৃত হইলে অনেক কার্য্য ধূলায় পর্য্যবসিত হয়। এই যশোলালসায় প্রদীপ্তোদ্যম মনুষ্য বহু বিপদের সম্মুখীন হয়, বহু বিঘ্ন অতিক্রম করে। যশ প্রায় সকল মনুষ্যেরই অভিলাষ। এ শক্তি—মহীয়সী, বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিনী। পর্ব্বতসম বাধা ইহার নিকটে পরাজিত হয়; বহু বিভীষিকা ইহার কুহকদণ্ডের স্পর্শে পলায়ন করে।

কিন্তু ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা ও যশোলিপ্সার গতি অপ্রতিহত নহে। উহারা সর্ব্বক্ষম নহে। উহারা মৃত্যুর বিভীষিকার সহিত সমরে পরাজিত হয়। ক্ষমতা?—জীবনেই যাহার উদয় ও জীবনেই যাহার অবসান। সীজরের অতুল ক্ষমতা, রোমের সভাগৃহে ব্রুটস্ ও ক্যাসসের বিশ্বাসঘাতী ছুরিকাঘাতে চির অস্তমিত হইয়াছিল। সেকেন্দরের ক্ষমতা, বিক্রম, আসিয়াতেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর পর ক্ষমতা কোথায় থাকিবে? আর যশ?—মরণের পর যশের জন্য কয়জন লালায়িত? উল্‌ফ্ (Wolfe) প্রকৃত বীরের ন্যায়, সমরাঙ্গনে প্রাণত্যাগ করিলেন, জগতে তাঁহার নাম বিঘোষিত হইল। তিনি কি তাহা জানিলেন? শুনিলেন? অনুভব করিলেন? সে উচ্চ যশ-তুরী-ধ্বনি কি তাঁহার শ্রবণে আহত হইয়াছিল? না। তবে সে যশে তাঁহার কি সুখ? কি আনন্দ? তবে কয়জন যশের জন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর? যশোলিপ্সা সর্ব্বত্রগামী নহে, সর্ব্বশক্তি নহে।

কিন্তু অনুরাগের গতি অপ্রতিহত। ইহার শক্তি অদম্য, অনিবার্য্য। অনুরাগ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত নহে। কারণ অনুরাগ, ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা ও যশোলিপ্সার ন্যায় পরিণামদর্শী নহে। অনুরাগ ভবিষ্যতের গূঢ় অন্ধকার ভেদ করিতে ব্যাকুল নহে। এ শক্তি মহতী, অপ্রতিহত-গতি, বিশ্বব্যাপিনী।

কর্ত্তব্য উচ্চ, মহৎ। অনুরাগ—যথার্থ অনুরাগও উচ্চ, মহৎ। জগতে সকলেরই অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্য আছে। কিন্তু কয়জন সেই কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ? স্থির, দৃঢ় কর্ত্তব্যের আদর জগতে বিরল। তাহার কারণ কি? এই কর্ত্তব্যের সহিত অনুরাগ নাই। যে কর্ত্তব্য অনুরাগহীন তাহা রূঢ়, নিরানন্দ। ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার, বা সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্ত্তব্যে যদি স্নেহ ও অনুরাগ জড়িত না হয়, তাহা হইলে সে কর্ত্তব্য পালিত হইলেও শুষ্ক ও সৌন্দর্য্যহীন। অবিচলিত কর্ত্তব্য পরায়ণতাই ধর্ম্ম নহে। ন্যায়-পালন ও সত্য-পালনই মনুষ্যের আরাধ্য নহে। কর্ত্তব্য সানুরাগ হওয়া চাই। ঈশ্বর-প্রতিষিদ্ধ কার্য্য করা পাপ, অতএব তাহা করিব না;—ইহা শুষ্ক কর্ত্তব্য পরায়ণতা। কিন্তু ঈশ্বরকে ভালবাসি, অতএব তাঁহার অনভিপ্রেত কাজ করিব না; ইহা সানুরাগ কর্ত্তব্য পালন; ইহা উচ্চ, স্বর্গীয়

ধর্ম্ম। যাহা করিব, তাহা সাদেশ না ভাবিয়া যদি প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া করি, তাহাই প্রকৃত আদেশ পালন, তাহাই কর্ত্তব্যপরায়ণতা। অনুরাগহীন কর্ত্তব্য শুষ্ক হীনশোভ প্রস্তরময় মূর্ত্তির ন্যায় প্রাণহীন। কার্য্য করিতে হইলে কার্য্যকে, অতএব যাহার জন্য কার্য্য করি তাহাকে ভালবাসিতে হইবে; তবে সে কার্য্য পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। সানুরাগ কর্ত্তব্য দুই জনেরই অতি সুখময়, প্রিয়, আদরের পদার্থ—যে করে তাহার, ও যাহার জন্য কৃত হয়, তাহার। নিরনুরাগ কর্ত্তব্য অর্দ্ধপালিত; পুষ্প-হীন নিরানন্দ অরণ্য। সানুরাগ কর্ত্তব্য—পূর্ণজ্যোৎস্নাহসিত উচ্চ শ্যামল উপবন,—প্রশান্ত ও সুন্দর। কর্ত্তব্য পালনে আনন্দ আছে; কিন্তু সে কর্ত্তব্য সানুরাগ হইলে তাহাতে শত গুণ আনন্দ। এই আনন্দেই গৌতম ধনমান ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইতে পারিয়াছিলেন; এই আনন্দে রাম পিতার কঠোর বনবাস আজ্ঞা সন্তুষ্টচিত্তে বহন করিয়াছিলেন; এই আনন্দ-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া ঝান্সী রাণী ও দুর্গাবতী নির্ভীক হৃদয়ে রুধিরাপ্লুত সমর ক্ষেত্রে, চিরপ্রিয় স্বাধীনতার জন্য মৃত্যুকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছিলেন। এই আনন্দোন্মত্ত হইয়া ম্যাটসিনি বিপদের সহস্র ঝঞ্ঝা, বিষাদ ও নিরাশার কৃষ্ণ ছায়ারাশি তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিলেন। এই আনন্দেই ক্রানমার, ল্যাটিমার, জিরোম (Jerome) ও হস্ (Huss) এবং সহস্র সহস্র উন্মত্ত ধর্ম্মবীর প্রসন্নহৃদয়ে হাস্যমুখে অত্যাচারী রাজার হৃদয়হীন, নিষ্ঠুরতম সজীবদাহরূপ দণ্ড আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যে অলন্ত বিশ্বাস, ও জীবন্ত অনুরাগ দুই মহতী শক্তি। ইহাদের নিকট কঠোরতম যন্ত্রণা, অন্ধতম কারাগার, নিষ্ঠুরতম মৃত্যু পরাস্ত হয়। কর্ত্তব্যেও প্রাণত্যাগ করিতে সক্ষম; কিন্তু সানুরাগ কর্ত্তব্য শতগুণ আনন্দে, শতগুণ নির্ভয়ে প্রাণত্যাগ করে। তাই বলি কর্ত্তব্য ও অনুরাগ যেন বিচ্ছিন্ন না হয়; উহারা যেন পরস্পরের কর ধারণ করিয়া দুইটি মঙ্গলাভিলাষিনী দেবীর ন্যায় মনুষ্যের দুঃখময়, বিপদসঙ্কুল জীবনকে বেষ্টন করিয়া থাকে। অনুরাগহীন জীবনের আদর শীঘ্র যেন জগৎ হইতে চলিয়া যায়।

জীবন?—জীবন ত অনিশ্চিত, অস্থির নিঃশ্বাস; এখনই বহে, এখনই বহে না; প্রভাতের কুসুম মধ্যাহ্নেই শুকাইয়া যায়; চপলার ন্যায় কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া যায়, মানুষ বুঝিতে পারে না। এ দীপ প্রতি পবনোচ্ছ্বাসেই নিবিতে পারে। ইহারই এত আদর। বিষাদ-ছায়া ব্যাপ্ত, দুঃখ অবসন্ন জীবনের—অশ্রুসিক্ত, ভগ্নকণ্ঠ রোদন ধ্বনিত কর্ত্তব্যহীন জীবনের কি মূল্য আছে? আইস কর্ত্তব্য ও অনুরাগ দেব প্রেরিত স্বর্গীয় দূতদ্বয়, মনুষ্যকে অমরতা শিক্ষা দেও।

মূর্খ মনুষ্য! জগতের এ বহিরাবরণ উন্মোচন কর। নীচতাময়, ক্ষুদ্রতাময়—এ ময়লা, ছিন্ন পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেল; দেখ ভিতরে কি দেবমূর্ত্তি, কি সৌন্দর্য্য-প্রতিকৃতি! এ অন্ধকারের ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নাধৌত প্রেম সিন্ধু দেখ—সে অনন্ত আলোকিত লহরী; শুন সে গম্ভীর কল্লোল,—মধুর, মধুর। চিরকাল সংসারের গণনা ও তুলনা, পরিমাণ ও পরীক্ষা লইয়া থাকিও না। এ কোলাহলময় গোলক ভেদ করিয়া শুন কেন্দ্রে কি অবারিত, মধুর সুন্দর, অনন্ত সঙ্গীত। টাইমনের (Timon) প্রকৃতি

হইয়া বাস করিবার স্থান এ জগৎ নহে। ইহা জ্যোৎস্না-প্রতিভাত হৃদয়-জলধি, যাহাতে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ, সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস বহে। ভালবাসিতে শিখ, মনুষ্যকে,—জগৎকে,—কর্ত্তব্যকে। এই প্রেম এক সাধনা; স্বর্গীয় আনন্দ তাহার সিদ্ধি। ইহার জন্য তপ আরম্ভ কর। প্রেম উন্মত্ততা নহে। ইহা জীবনের দগ্ধ মরুতে শীতল সরসী। ভাবিও না প্রেম কার্য্যের প্রতিবন্ধক। প্রেমজড়িত হইলে কার্য্য সুন্দর হইবে; প্রদীপ্ত, উৎসাহময়, আনন্দ পূর্ণ হইবে। বৃক্ষের রুক্ষ শাখা পল্লবিত হইবে।

প্রেম উন্মত্ততা নহে। জানিও অনন্ত অনুরাগই বিশ্ববিপ্লাবী কার্য্যের প্রাণ। এই অনুরাগ না থাকিলে জগতে অনেক মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইত না; অনুরাগ—স্বদেশের প্রতি,বা তাহা হইতে উচ্চ,—বিশ্বপ্রেম। এই অনুরাগ না থাকিলে হয়ত ইটালী আজিও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিত; আমেরিকায় স্বাধীনতার লোহিত নিশান উড়িত না। এই অনুরাগ না থাকিলে ঈশার প্রেমময় উপদেশ জগতে প্রচারিত হইত না; বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্ঠুর জগতে আসিত না। অনুরাগ—অনন্ত, স্থির; অনুরাগ উচ্চ কার্য্যের চির সহচর। অনুরাগ চিরদিন কার্য্যের প্রাণ আছে ও থাকিবে। যদি জগৎ হইতে কার্য্যের পরিচালক সকল শক্তি অন্তর্হিত হয়, বিপ্লবের জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যায়, এ শক্তি বর্ত্তমান থাকিবে। এ শক্তি অনন্তকাল স্থায়ী। পৃথিবী ঘুরে, পূর্ব্বের নক্ষত্র পশ্চিমে যায়, পশ্চিমের নক্ষত্র অস্তমিত হয়; কিন্তু উত্তর আকাশে ওই ধ্রুবতারা সেই রূপই থাকে—নিশ্চল, উজ্জ্বল, প্রশান্ত। এই অনুরাগ সেই ধ্রুবতারা—স্থির, অনশ্বর স্নিগ্ধ দীপ্তি। যে দিন এ শক্তি যাইবে সে দিন কার্য্য বিলুপ্ত হইবে, মনুষ্য পশু হইবে, জগতে অরাজকতা আসিবে। তাই বলি অনুরাগ উন্মত্ততা নহে। অনুরাগ মহৎ, স্বর্গীয়, উচ্চ কার্য্যের মূল মন্ত্র।

আমরা সংসারে 'বিবেচনা' বলিয়া একটী কথা বড় অধিক শুনি। 'বিবেচনা' 'জ্ঞান' পরিণামদর্শীর প্রিয় শব্দ। তিনি বলিবেন, পরিণাম চিন্তা শুভা, সুফল প্রসবিনী। অপরিণামদর্শী অবিবেচক পদে পদে বিপন্ন হয়। যে ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করিতে পারে, শুনিতে পাই সে বড় বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। জ্ঞানী বলিবেন যে, অনুরাগ অপরিণামদর্শী, অবিবেচক, অতএব অহিতকর। প্রেম পরিণাম চিন্তা করে না, শুভাশুভ তুলনা করে না। প্রেমী প্রিয়পুত্তলীর জন্য বিচার করিয়া কার্য্য করে না। তাহার সামান্য আয়াস দূর করিবার জন্য সে প্রাণ দিতে পারে। তাহার গৌরবে ও যশে কলঙ্ক দেখার নিকটে জীবনবিসর্জ্জন তুচ্ছ জ্ঞান করে। বিজ্ঞ, জ্ঞানী, বিবেচক বলিবেন ইহা সঙ্গত নহে। এ মূল্যবান্, সংসারের বিপণিতে অক্রেয় প্রাণ এক মুহূর্ত্তের ইচ্ছায় বিসর্জ্জন করিতে যাওয়া 'মূঢ়তা,' 'অবিবেচনা,' 'উন্মত্ততা'। পরিণামদর্শী জ্ঞানি! জানিও এ রাজ্য তোমার গণনার, তুলনার, ন্যায় শাস্ত্রের রাজ্য নহে। 'বিবেচনা' উত্তম; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যেন অনুরাগের পবিত্র রাজ্যে আসিয়া বিদ্রোহ প্রজ্বলিত না করে।

উন্মত্ততা?—জানিতে চাহি না জ্ঞান ও বুদ্ধি, বিবেচনা ও পরিণামদর্শিতা। যখন ঘুমন্ত সুকুমার শিশু নিঃশঙ্কে প্রজ্বলিত কুটীরে শায়িত—এখনই নিদাঘ রবিকর সন্তপ্ত কুসুম কলিকার ন্যায় দগ্ধ হইবে, ইহা

দেখিয়া আলুলায়িত কেশা, রুদন্তী, পাগলিনী প্রায়া জননী যে প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া সেই দাহময় কুটীরে প্রবেশ করে, সে কি উন্মত্ততা? প্রাণের ক্ষুদ্র ভাইকে জলে মগ্নপ্রায় দেখিয়া সন্তরণাক্ষমা ভগিনী, রক্ষা করিতে পারিবে না জানিয়াও যদি তাহার জন্য জলে ঝম্প প্রদান করে ও প্রেমভরে তাহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সহিত আনন্দে প্রাণ ত্যাগ করে, সে কি অবিবেচনা? কঠোর রাজাজ্ঞায় কারাগারে অনাহার-মরণে দণ্ডিত স্থবির আসন্ন-প্রায় পিতাকে যদি যুবতী দুহিতা, নিজের পরিণাম না ভাবিয়া, প্রতি দিন স্বকীয় স্তন্য দুগ্ধ পান করাইয়া আসিত, সে কি অবিবেচনা ও উন্মত্ততা? জানি না উন্মত্ততা কাহাকে বলে; জানিতে চাহি না, বিবেচনা কাহাকে বলে।

ইহা যদি উন্মত্ততা হয়, তবে বলিব এ উন্মত্ততা অপার্থিব, এ উন্মত্ততা পবিত্র,স্বর্গীয়। এই উন্মত্ততায় ঈশা নির্ভীকহৃদয়ে, অভীতিকুঞ্চিত ললাটে, স্থির ও প্রশান্ত ভাবে কীলক বদ্ধ হইয়া লম্বিত হইতে পারিয়াছিলেন। এই উন্মত্ততায় বুদ্ধ অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য ধন রত্ন পরিজন পরিহার করিয়া অরণ্যে অরণ্যে, দেশে দেশে, নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। এই উন্মত্ততায় লিয়নিডস থার্ম্মপলির গিরি সঙ্কটে তাঁহার মুষ্টি পরিমেয় সৈন্য লইয়া পঙ্গপাল সদৃশী পারস্য সেনার সম্মুখে গৌরবময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছিলেন! এই উন্মত্ততায় রাজপুত কুলতিলক প্রতাপ তাঁহার সামান্য সেনা লইয়া মোগলের অতুল পরাক্রম তুচ্ছ করিয়াছিলেন। অনুরাগ;—ভাই ভগিনীর প্রতি, পিতা মাতার প্রতি, বন্ধু প্রণয়িনীর প্রতি; অনুরাগ,—স্বদেশের প্রতি, বিশ্ব মানবের প্রতি। অনুরাগ কি উন্মত্ততা ও অবিবেচনা? যাও গণনাময়ী বিবেচনা, পরিণামদর্শী জ্ঞান ও বুদ্ধি যাও, তোমাদিগের সঙ্কীর্ণ পার্থিব রাজত্বে যাও; এ অনন্ত তারা কুসুমিত, গগনোপবন তোমার বিচরণ ভূমি নহে; জানিও যে তোমার গণনাময় রাজত্ব হইতে আর এক উচ্চতর, পবিত্রতর, পূর্ণতর রাজত্ব আছে। সে রাজ্য চিরপ্রদীপ্ত, চিরশান্ত, চিরবাসন্ত-সমীর-প্লাবিত। সে রাজ্যে তোমার কলুষতা, পঙ্কিলতা, ক্ষুদ্রতা নাই। সে রাজ্য তোমার স্বপ্নেরও অগম্য স্থান; সে রাজ্যে তোমার প্রবেশের অধিকার কি?

বিবেচনা?—মূর্খ নর! এক শক্তি আছে যাহা সময়ের বিস্তৃত রাজ্যে দূরে অযত্নে পড়িয়া রহিয়াছে। সে শক্তি অনুরাগ;—গভীর; নিস্তব্ধ, জ্বলন্ত। আর সব বায়ুসন্তাড়িত ধূলা; অথবা ঘুমন্ত ছায়া; স্পর্শ কর, কিছুই নাই। এ জ্বালাময়ী, বজ্রময়ী শক্তি যখনই বহে তখনই প্রতিকূল শক্তিকে উড়াইয়া, দগ্ধ করিয়া যায়। এ অনন্ত কালব্যাপিনী শক্তি অনন্তক্ষমা। এ শক্তির উপাসক চিরজয়ী, অমর; এ শক্তির আরাধনা বিজয়ের বীজমন্ত্র। এ দৃশ্যমান জগৎ, জগতের বহিরাবরণ, প্রাণ হীন দেহ। এ শক্তিই তাহার প্রাণ। এ শক্তি নির্ব্বাণ হয় না; যদি হয় তবে জগতে ধূলা বই আর কিছুই রহিবে না। এই বাহিরের শরীরের মধ্যে এই অজ্ঞানিত বোধাতীত প্রাণ প্রধুমিত হইতেছে। যুগের পর যুগে এ শক্তি জ্বলে.—বিকট নিনাদে, অদম্য তেজে জ্বলে, বিশ্বাসঘাতী জ্বালামুখীর ন্যায় দ্রবীভূত অনল উদ্গার করে। আকাশের নিনাদময় বজ্রের ন্যায় এ শক্তি প্রজ্জ-

লিত ও নিনাদিত হয়; ও বাতাস বিশুদ্ধ করিয়া যায়। এ শক্তি অজানিত যুগযুগান্তরের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসে; অন্তর্জগতে বিপ্লব করিয়া দিয়া আবার যুগের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়।

⟨ সংসার যাহাকে অবতার বলে সে প্রেমী; মানবের প্রেমমুগ্ধ। তাহা না হইলে সে মানবের হিতার্থে প্রাণপণ করিতে পারিত না। বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য; ম্যাটসিনি, ওয়াসিংটন, গুরুগোবিন্দ; মিল্টাইডিস্, লিয়নিডস্, প্রতাপ। ইহারা সকলেই প্রেমী। তাঁহারা কেহই 'বিবেচনা' করিয়া, 'তুলনা' ও 'গণনা' করিয়া কাজ করেন নাই। তাহা করিলে তাঁহাদিগের মহাসাধনা সিদ্ধ হইত না, ব্রত উদ্যাপিত হইত না। তাঁহারা ভাল বাসিতেন,—মানুষকে বা স্বজাতিকে, ও তাহার প্রতি তাহাদিগের কর্ত্তব্যকে। প্রাণোৎসর্গ করিতে হইলে অনুরাগ চাই;—প্রদীপ্ত, স্থির। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করিলে কেহ সুখ স্বচ্ছন্দতা উৎসর্গ করিতে পারিতেন না। যাহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া তাহাই করিয়া গিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করেন নাই। ⟩

পরিণাম? ভবিষ্যৎ?—মূর্খ নর! পরিণাম ভাবিয়া কার্য্য করিতে চাও? অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করিতে চাও? দুর্ব্বল! নিজের ক্ষমতার পরিমাণ করিয়াছ কি? আইস, এ অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া কাজ নাই। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, জঙ্গল পূর্ণ, গহ্বর পূর্ণ অন্ধকার। সবই অনিশ্চিত; নিশ্চিত কেবল মৃত্যু, যাহা অদূরে বিলম্বী বাত্যার ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে আছে; কখন আসিয়া তোমাকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে;—কোথায়? কোথায়? মানুষ জানে না, জানিতে সাহসী হয় না। মনুষ্য! নিজের অবস্থা জানিও। এ জীবনের সঙ্কীর্ণ উপত্যকায়, অবোধ! বসিয়া আছ কোথায়? নিবিড় অন্ধকারের মিলন স্থানে,—দুইদিকের অনন্ততার সঙ্গমে। পশ্চাতে অজানিত, তিমিরময় অনন্ত অতীত; সম্মুখে ততোধিক অজানিত, তিমিরময় অনন্ত ভবিষ্যৎ! ক্ষুদ্র জীব! ফলাফল, শুভাশুভ পরিমাণ করিতে যাইও না। তোমার যাহা সাধ্য নহে তাহা করিতে প্রয়াসী হইওনা। ভালবাসিতে শিখ। কাহাকে? যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, ন্যায়, ও সত্য সঙ্গত বোধ হয়, তাহাকে ভালবাস। যাহা ভাল বুঝ করিয়া যাও। ফলাফল তোমার বিবেচ্য নহে।

ভাল বুঝিয়া, আরও ভাল বুঝিতে চেষ্টা কর; কিন্তু যাহা বুঝিবে তাহাই করিবে, তোমার কার্য্য অন্য মনুষ্যে যে প্রকার গ্রহণ করে সে চিন্তা তোমার নহে। প্রেম উন্মত্ততা নহে। প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিখিলে তবে বিশ্ববিপ্লাবী কার্য্য সম্ভবে। ভালবাসিয়া,—মনুষ্যকে ও কর্ত্তব্যকে ভালবাসিয়া নিজের কার্য্য করিয়া যাও। উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবে, সাধনা সিদ্ধ হইবে। এই কর্ত্তব্য ও এই অনুরাগই তোমার ভবিষ্যতের তিমিরে দীপ্ত মশাল —স্থির, স্থির। তাহা লইয়া নির্ভয়ে বিচরণ কর। শতবার পড়িয়া যাও, শতবার ক্লান্ত হইয়া যাও; ক্ষতি নাই। এ তুরী বাজাও, বাজাও বিজয় নিশান তোমার।

নারায়ণদেব।

(প্রথম প্রস্তাব)

এপর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে যত ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাতিত্বে পরিপূর্ণ। সুতরাং যাঁহারা কেবল সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তত্তৎ গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন প্রাচীন কালে কিংবা অধুনা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আর কেহ কোথাও নাই তাঁহারাও যে ভ্রান্ত এবং এক-দেশদর্শী হইবেন, সন্দেহ কি? মনে করিতে দুঃখ হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গে কত কত প্রাচীন লেখকের গ্রন্থ আজিও ঘরে ঘরে পূজা-পার্ব্বন উপলক্ষে পঠিত ও পূজিত হইতেছে, অথচ তাহা সাধারণের গোচরে আসিতেছেনা! পূর্ব্ববঙ্গবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় পণ্ডিত-বর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রণীত "বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক" প্রস্তাব এবং বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের "বঙ্গীয়-সাহিত্য" (Literature of Bengal) নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া করিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহারা যদি একবার আপনাদের ঘর খুঁজিয়া কীটদষ্ট তালপত্র ও তুলৎ কাগজে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া দেখিতেন, তবে দেখিয়া বিস্মিত হইতেন যে, "কবিকঙ্কণচণ্ডী" প্রভৃতির ন্যায় গ্রন্থ সকল তাঁহাদের দেশেও অনেক মহাপুরুষ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, এক-দেশদর্শী গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরাও এক দেশদর্শী ও আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতেছি।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গলাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব" যিনি অনুধাবন করিয়া পাঠ করিয়াছেন, তিনিই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন, তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই, প্রাচীন লেখকদিগের কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান প্রখ্যাতনামা লেখকদিগের নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করি, যে "বাঙ্গলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে" পশ্চিম বঙ্গের লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ লস্কর, পরমানন্দ অধিকারী, নরচন্দ, শ্রীধর ও দুর্গা চরণ ঘড়িয়াল প্রভৃতি স্থান পাইতে পারেন, তাহাতে কি পূর্ব্ববঙ্গের বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ এবং কবিবর বাবু নবীনচন্দ্র সেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতিও স্থান পাওয়ার যোগ্য নহেন? কথা প্রসঙ্গে আর একটী কথা মনে পড়িল। বাবু রাজনারায়ণ বসু বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে একজন সুপরিচিত লেখক এবং সদ্বক্তা। কতিপয় বৎসর হইল "হিন্দুস্কুলথিয়েটারে" তিনি বাঙ্গলা ভাষার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি পশ্চিমবঙ্গের যদু মধু কাহারও নামোল্লেখের ক্রটী করেন নাই; কিন্তু জানিনা কি মনে করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের একটী লেখকেরও নাম তখন তিনি করেন নাই। অবশেষে যখন বক্তৃতা শেষ করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন, তখন বোধ হয় তিনি ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয়বান লোক বলিয়া আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, বিবেকানুরোধে তাঁহাকে দাঁড়াইয়া বলিতে হইল যে "বঙ্গদেশে এক জন কবি আছেন, তাঁহার নামটা মনে হচ্ছে না। তাঁর পুস্তক খানার নামটা না কি? হাঁ,—

হয়েছে, "সম্ভাবশতক"। এখানিও একখানা ভাল কবিতা পুস্তক বটে।" এখন জিজ্ঞাস্য এই, ন্যায়রত্ন মহাশয় যখন বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস লেখেন, কি রাজ নারায়ণ বাবু যখন হিন্দুস্কুলে বক্তৃতা করেন, তখন কি কালী প্রসন্ন বাবুর "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব" হরিশ্চন্দ্র মিত্রের "নির্ব্বাসিতা-সীতা" "বিধবা বঙ্গাঙ্গনা" ও নবীন বাবুর "অবকাশ রঞ্জিনী" এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের "সম্ভাবশতক" প্রকাশিত হয় নাই? তবে কি তাঁহাদের গ্রন্থ উল্লেখ-যোগ্য নহে? কেবল বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন মহাশয় কিংবা রাজ-নারায়ণ বাবুই এই দোষে দোষী, তাহা নহে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে ত তাঁহার পরমো-পকারী বন্ধু বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ লেখক—বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি নব্যসম্প্রদায় রসাতলে গিয়াছেন! বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার অনভি-জ্ঞতা, একদেশদর্শিতা অথবা পক্ষপাতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। এখানে এত গুলি কথা কেন বলিলাম?—তাহার কারণ আছে। আমরা মনে করি, বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীন কিংবা আধুনিক ইতিহাস যিনি লিখিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, বিস্তৃত-দর্শন, অনুসন্ধানেচ্ছা ও গবেষণা থাকা প্রয়োজন এবং এতটুকু উদারতা থাকা উচিত যে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিম বঙ্গ, "ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর পশ্চিমতীর, রাঢ় দেশ বঙ্গদেশ" ইত্যাকার প্রভেদ-ভেদ থাকিবে না। যে দেশে যত স্থানে বাঙ্গলা ভাষা প্রচ-লিত, তাঁহাকে তত্তৎ স্থানের প্রাচীন ও আধু-নিক গদ্য পদ্য গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়া তদব-লম্বনে বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস লিখিতে হইবে। নতুবা যদি এক প্রদেশের লেখক-দিগের গ্রন্থাবলম্বনে কেহ ইতিহাস লেখেন, তাহা প্রাদেশিক ইতিহাস হইলে হইতে পারে; কিন্তু কখনই বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃত বা পূর্ণা-বয়ব ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

ন্যায়রত্ন মহাশয় কি রমেশ বাবুর বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হয়, "বটতলাই" যেন তাঁহাদের প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহের একমাত্র স্থান। তাঁহারা কলিকাতার বটতলা ছাড়িয়া যদি অন্যত্রও প্রাচীন গ্রন্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস আরও পূর্ণাবয়ব এবং নিরপেক্ষ হইত। যদি তাঁহারা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়া একটু পরিশ্রমস্বীকার করতঃ পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগের নিকট তৎপ্রদেশীয় প্রাচীন লেখকদিগের গ্রন্থ অনুসন্ধান করিতেন, তবে হয়ত আজ আমাদিগকে এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইত না। নারায়ণদেব, বিজয় গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস, বৈদ্য জগন্নাথ, ও পণ্ডিত জানকীনাথ প্রণীত বিবিধ "পদ্মা-পুরাণ," বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর প্রণীত "ত্রিপুরা-রাজমালা" অনন্তরাম প্রণীত "ক্রিয়াযোগ সার" ও অন্যান্য অপরিজ্ঞাতনামা লেখকদিগের রচিত "দুর্গাপুরাণ" "লক্ষ্মণ দিগ্‌বিজয়" প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্য এবং পূর্ব্ব বঙ্গে যখন সেনবংশীয় বঙ্গরাজাদিগের রাজধানী-ছিল, তখন বল্লালিক কৌলিন্য প্রথার প্রাদু-র্ভাব কালে—আদিম বাঙ্গলা ভাষার প্রারম্ভ সময়ে জয়দেবীয় সংস্কৃতছন্দে লিখিত যে সকল সংস্কৃত কুলজী, কুল পঞ্জিকা, কুলীনকারিকা প্রভৃতি গ্রন্থের নাম আমরা অবগত আছি এবং পাঠ করিয়াছি, তাহার এক খানাও বোধ হয় সামান্য প্রতিভাসম্ভূত নহে। অদ্য

আমরা তাঁহাদের মধ্যে কেবল এক মাত্র নারায়ণদেব এবং তৎপ্রণীত "পদ্মাপুরাণ" সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমরা এই প্রস্তাবে নারায়ণ দেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বংশাবলীর উল্লেখ করিব; এবং তৎপ্রণীত গ্রন্থ হইতে কবিতা সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, "বাঙ্গলা সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাবে" কিংবা 'বঙ্গীয় সাহিত্যে' যে সকল প্রাচীন কবির নামোল্লেখ ও রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে নারায়ণ দেবের রচনা তাঁহাদের অধিকাংশের রচনা হইতে নিকৃষ্ট শ্রেণীর নহে।

ময়মনসিংহ জিলা দুই ভাগে বিভক্ত— পূর্ব্ব ময়মনসিংহ ও পশ্চিম ময়মনসিংহ। সাধারণতঃ ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব তীরস্থ উপবিভাগাংশ পূর্ব্ব ময়মনসিংহ এবং পশ্চিম তীরস্থ উপবিভাগাংশ পশ্চিম ময়মনসিংহ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। নারায়ণ দেব এই পূর্ব্ব ময়মনসিংহস্থ নসীরুজিয়াল পরগণার অন্তর্গত নেত্রকোণা সব্ ডিভিসনের অধীন "বোরগ্রাম" নামক ক্ষুদ্রপল্লীতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার বংশাবলী দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়, তিনি বর্ত্তমান কালের ১৭ শ পুরুষ পূর্ব্বের লোক। আমরা তাঁহার বংশধরদিগের নিকট হইতে যে বংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে ঊর্দ্ধ দিকে তাঁহার প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া অধোদিকেই সপ্তদশ পুরুষের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ১৬ শ এবং ১৭ শ পুরুষ উভয়ই জীবিত। এই প্রবন্ধ লেখক তাঁহাদিগের সহিত বিশেষ পরিচিত এবং নারায়ণ দেবের জন্ম-ভূমি ও বাসস্থান লেখকের জন্মস্থানের অতি নিকটবর্ত্তী। সুতরাং নারায়ণদেব সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইবে, তাহা কাল্পনিক কিংবা অবিশ্বাস্য মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

নারায়ণ দেবের বংশধরদিগের অনেক শাখা প্রশাখা আছে, তন্মধ্যে আমরা কেবল একটী শাখা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বংশবল্লীর প্রকৃত নকল তাঁহার পুস্তক সহ প্রকাশ করিব। এই ক্ষণ কেবল একাদিক্রমে একটী শাখার নাম মাত্র উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। নামগুলি একাদিক্রমে পুত্রের নাম বুঝিতে হইবে। নারায়ণদেবের প্রপিতামহ উদয়রাম, পিতামহ উদ্ধবরাম, পিতা নরসিংহ; তৎপর নারায়ণদেব, চতুর্ভুজ, অভিমন্যু, চূড়ামণি, অনন্তরাম, ভগদেব, গৌরীপ্রসাদ, নিমাইচাঁদ, কৃষ্ণরাম, রূপরাম, মোহনগোপাল, নরোত্তম, কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, ও রামচন্দ্র এই পঞ্চদশ পুরুষ গত হইয়াছে। এইক্ষণ— এই শাখার জগচ্চন্দ্র ও গগনচন্দ্র ষোড়শ ও সপ্তদশ পুরুষ বর্ত্তমান আছেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সময় নির্ণয়ের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তদনুসারে তিন তিন পুরুষে এক এক শতাব্দী গণনা করিলে নারায়ণ দেব বর্ত্তমান সময়ের অন্যূন ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৫৫ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে। ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, মহাত্মা চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন; সুতরাং এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, নারায়ণদেব চৈতন্যদেবের জন্মের ১৫২ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, এরূপ কথিত আছে বলিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়, চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের জন্মের ১০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের জন্মের ২৫ বৎসর পূর্ব্বে জন্মিলেও তাঁহার গ্রন্থ পাঠের কোন ব্যাঘাত জন্মিত না, কারণ চৈতন্যদেব বাল্য কাল গতেই বিদ্যারম্ভ ও বিবিধ সংস্কৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যখন চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য সন্ন্যাসী হওয়ার পর। কারণ, সন্ন্যাসী হওয়ার পূর্ব্বে গৌরাঙ্গ পৈত্রিক বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ঘোর দুর্দ্দান্ত নৈয়ায়িক ছিলেন। ২৪ বৎসর বয়সে গয়াতীর্থে ঈশ্বর পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইতেই তাঁহার প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা মনে করিতে হইবে। সুতরাং ১০০ বৎসর পূর্ব্বে না বলিয়া ২৫ বৎসর পূর্ব্বে অনুমান করিলেও তৎকর্তৃক পাঠের ৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইয়া দাঁড়ায়। সে যাহা হউক ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কেবল মাত্র অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছে, আমরা বংশাবলী দৃষ্টে অবগত হইতেছি যে, নারায়ণদেব চণ্ডীদাসেরও পূর্ব্বকালবর্ত্তী। পরন্তু তিন তিন পুরুষে এক এক শতাব্দী গণনা না করিয়া যদি বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের প্রণালী অবলম্বনে চার চার পুরুষে এক এক শতাব্দী ধরা যায়, তাহা হইলেও নারায়ণদের বর্ত্তমান সময়ের ৪২৫ বৎসর ও চৈতন্যদেবের জন্মের ২১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৩৮০ শকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং আমরা ইহা দ্বারাও বলিতে পারি নারায়ণদেব চণ্ডীদাসের পূর্ব্বকালবর্ত্তী না হইলেও সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তিন তিন পুরুষেই এক এক শতাব্দী গণনা করিয়াছেন।

নারায়ণদেবের আপন পূর্ব্বপুরুষ এবং স্বীয় কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, আমরা এখানে তাহাই যথাযথ উদ্ধৃত করিতেছি। গ্রন্থ-সূচনার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ;——

"নারায়ণদেবে কহে জন্ম-মাগধ। (১)
বিপ্র পণ্ডিত নহি ভট্ট বিশারদ॥
শূদ্রকুলে জন্ম মোর সৎকায়স্থঘর।
মদ্‌গুল্য গোত্র মোর, গায়ন গুণাকর॥
পিতামহ উদ্ধব মোর নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর, রুক্মিণী মোর মাতা॥
পূর্ব্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধ মতি।
রাঢ় (২) ত্যাগিয়া বোরগ্রামেতে বসতি॥"

নারায়ণদেব আপন পরিচয়ে বলিয়াছেন যে, উদ্ধবদেবের পুত্র নরসিংহ দেবের ঔরষে প্রভাকরদুহিতা রুক্মিণী দেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম। তিনি মদ্‌গুল্য গোত্রীয় সৎকায়স্থ বংশজ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা রাঢ়ভূমি হইতে আসিয়া বোরগ্রামেতে বাস করিয়াছিলেন।

তৎপর তিনি তাঁহার গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন ;——

"চৌদ্দবৎসর কালে দেখিলোঁ (১) স্বপন।
মহাজন সঙ্গে মোর হৈল দরশন॥
শিশু রূপে গোপাল যে হাতে লৈয়া বাঁশী।
আলিঙ্গন দিল মোরে আড়মুখে হাসি॥
প্রণাম করিলোঁ (২) আমি ধরিয়া চরণ।
কবিত্বের আশা মোর সেই সে কারণ॥

---

(১) জন্মমাগধ—মাগধ, বন্দী, স্তুতিপাঠক, কবি; —জন্মকবি।

(২) ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতাখ্যায়ক এবং রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত লেখক হয়ত বলিয়া বসিবেন এই যে নারায়ণদেবকে তোমরা পূর্ব্ববঙ্গের—'ভাগীরথীর পূর্ব্বতীর বাসী' কবি বলিতেছ, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ত "বৃন্দাবন দাসের পূর্ব্বপুরুষের' ন্যায় রাঢ়বাসী ছিলেন! তবে আর "ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে' প্রতিভাশালী লোক জন্মিল কৈ?

(১) দেখিলোঁ—দেখিলাম। (২) করিলোঁ—করিলাম।

তার পাছে (৩) পদ্মাবতী স্বপ্ন কৈলা মোরে।
পদবন্ধে "পদ্মাপুরাণ" রচিবারে॥
কোন কালে আমি পুরাণ নাহি শুনি।
পাঠেতে নাহিক শক্তি অক্ষর নাহি চিনি॥"

নারায়ণদেব যে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর কবিকঙ্কণচণ্ডী হইতে ক্ষুদ্রায়তন হইবেনা। কবিকঙ্কণ-চণ্ডী চণ্ডীর পূজা প্রচারের জন্য শ্রীমন্তের উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত; নারায়ণদেবের "পদ্মাপুরাণ" মহাদেবের কন্যা পদ্মাবতীর—সাধারণ ভাষায় মনসাদেবীর—মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের নিমিত্ত চাঁদবেণের উপাখ্যান অবলম্বনে বিরচিত। চাঁদবেণে এবং শ্রীমন্ত কোন্ সময়ের লোক, তাঁহাদের বাসস্থান কোথায়, তাহা নির্দ্ধারণ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং তৎসম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব না। তবে কবিকঙ্কণ-চণ্ডী পাঠে যত দূর অবগত হওয়া যায়, তাহা প্রামাণ্য ধরিলে ধনপতি, শ্রীমন্ত এবং চাঁদসদাগর ও লক্ষীন্দর প্রভৃতি গ্রন্থোল্লিখিত নায়কদিগকে প্রায় সমসাময়িক বলিতে হয়। পদ্মার মাহাত্ম্য সংস্কৃত "পদ্মপুরাণে" বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু নারায়ণদেব বলিতেছেন, তিনি স্বয়ং পদ্মপুরাণ পাঠ করেন নাই কিংবা পাঠ করিতে শুনেন নাই। তাঁহার এই উক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি কীর্ত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের ন্যায় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া পদ্মাবতীর স্বপ্নাদেশে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্যে এই গীতিকাব্য লিখিয়াছেন। তৎপর বলিতেছেন, তিনি যে শুধু সংস্কৃত "পদ্মপুরাণ" পাঠ করেন নাই কিংবা শুনেন নাই এরূপ নহে, তিনি নিজে লিখিতে পড়িতে পর্য্যন্ত জানিতেন না। যদি পাঠক, ইহা বিনয়ের ভাষা বলিয়া মনে কর—যে ব্যক্তি এত বড় একখানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, অথচ একেবারে বর্ণজ্ঞান শূন্য ছিলেন একথা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হওয়া, তথাপি একথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক কিংবা অসঙ্গত হইবে না, তিনি লেখা পড়া জানিলেও এত সামান্য রকম জানিতেন যে, তাহা যৎসামান্য এবং উল্লেখ যোগ্য মনে করিতেন না। নতুবা বিনয় প্রদর্শন করিতে যাইয়া সত্যের অপলাপ করিবেন, তাহা অন্ততঃ আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। পরন্তু তিনি তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন যে, তিনি "জন্মমাগধ" অর্থাৎ "জন্ম কবি" ছিলেন, এবং অন্যত্র বলিয়াছেন চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কৃষ্ণ বালকের বেশে স্বপ্নেতে তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া কবিতা লিখিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপর মনসাদেবীর স্বপ্নাদেশে তিনি গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইহা দ্বারা এরূপ প্রতীতি জন্মে যে তিনি একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক হইলেও ভক্ত লোক ছিলেন। এক জন ভক্তের বিনয় প্রকাশ করিতে যাইয়া মিথ্যা বলা ততদূর সম্ভবপর নহে; আমাদের তাহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। বিনয় প্রদর্শন করিতে গিয়া যে মিথ্যা বলেন নাই, একথা বলিবার আমাদের আরো একটী যুক্তি আছে। তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রায় অধিকাংশ কবিতার ভণিতাতেই লিখিয়াছেন, "সুকবি নারায়ণদেবের সুরস পাঁচালি।" যে ব্যক্তি আপনাকে "জন্ম-মাগধ" "সুকবি" এবং আপনার লেখাকে "সুরস" বলিতে আপনাকে অবিনীত মনে করে না, সে বিনয় প্রদর্শন করিতে যাইয়া আমি "লেখা,

(৩) তারপাছে—তৎপরে।

পড়া কিছুই জানি না" একবারে একথা বলিয়া বসিবে, এরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। এখনও আমরা এমন অনেক লোককে দেখিতে পাই, তাহারা যৎসামান্য লেখা পড়া জানে—কেহ কেহ বা বর্ণজ্ঞান শূন্য, অথচ অতি সুন্দর সুন্দর গান রচনা করে, আসরে দাঁড়াইয়া নানাবিধ ছন্দে কবি ও পাঁচালি গায়। আমরা পশ্চিম বঙ্গের তাদৃশ অনক্ষর কবিওয়ালা কাহার নাম জানি না; কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গের ঢাকা জিলাস্থ পাগলাগ্রামের নিমচাঁদ ঠাকুর, ত্রিপুরা জিলার কানাই যোগী ও রক্ষাকর চক্রবর্ত্তীকে এবং ময়মনসিংহ জিলার রামামালী ও হরেকৃষ্ণ তাঁতি প্রভৃতিকে জানি। তাহাদের কেহ কেহ বা অতি সামান্য রকম লেখা পড়া জানে, কেহ কেহ কিছুই জানে না, অথচ অতি সুন্দর সুন্দর গান রচনা করে, পাঁচালি বলে, যাহা তান লয়ে গীত হইতে শুনিলে বিস্মিত ও মোহিত হইতে হয়। (ক)

যদি সাধারণ লোক সম্বন্ধেই এরূপ হয় তবে এক জন অসাধারণ প্রতিভাশালী ভক্ত ও জন্ম-কবির একেবারে কিংবা ভাল লেখা পড়া না জানিয়া গীতি কবিতায় এক-খানা মহাকাব্য রচনা করা কি অসম্ভাব্য এবং অবিশ্বাস্য? যিনি বাঙ্গলা ভাষার আদিম অবস্থায় এত বড় এক খানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, তিনি কি সামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি? দেখিতেছি প্রকৃতি দেবী সর্ব্বদেশে সমভাবে প্রসন্না। প্রতিভা-শালী লোক সকল দেশেই জন্মগ্রহণ করিতে পারে ও করে। কাহার বা প্রতিভা বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কাহার বা আজীবন প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। তাই কবিবর গ্রে বলিয়াছেন—

"Full many a gem of purest ray serene.
The dark unfathomed caves of ocean bear;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness in the desert air!"

নারায়ণ দেবের কোন কোন কবিতার ভণিতাতে আছে,—"নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়।" জন প্রবাদ এইরূপ যে, বল্লভ নামে তাঁহার এক জন আত্মীয়—কেহ কেহ বলেন তাঁহার ভগ্নীপতি ছিলেন।

(ক) অন্যান্যদের গান আমাদের এখন মনে পড়িতেছে না। এখানে কেবল রক্ষাকর চক্রবর্ত্তীর একটি কবি গান নমুনাস্বরূপ উঠাইয়া দেওয়া গেল;—

"লক্ষ্মণ রাবণের শক্তি শেলে পতন হইয়ে (চিতান) সকাতরে কয়, জীবন সংশয়; রাম দয়াময়, রক্ষা কর এ বিপদে॥

শ্রীপাদ পদ্ম দেও রাম! রাজীবলোচন, হৃদিপদ্মে করি ধারণ, আছে এ বাসনা মনেতে; এমন আসন্ন সময়েতে, আছে এ বাসনা মনেতে। তুমি জগৎপতি জগজ্জীবন, পূর্ণব্রহ্ম পতিতপাবন, কর দাসের বিপদ মোচন, দুঃখ পারি না আর সহিতে। বিনয় বাক্য শুনে, খেদে আকুল মনে, শ্রীরাম চন্দ্র সজল নয়নে, কেঁদে বলে।

উঠ উঠ ভাইরে লক্ষ্মণ, আয়রে একবার করি কোলে। (ধুয়া)।

এলেম কাননে, পিতৃসত্য কর্‌তে পালন, তাতে প্রতি-বাদী হইল, লঙ্কাপুরে রাজা রাবণ; ভাই রে এখন হারাইলে জীবন, শক্তি শেলে।

আশা ছিল কি, বিধি কল্যেন কি, কিসে কি ঘটালে। (মোহরা)

আমি রাজা হব ছিল মনে, তাতে এলাম গহনবনে, সকল রাজ-আভরণ ছাড়িয়ে; জটাবাকল অঙ্গে পরিয়ে, সকল রাজ-আভরণ ছাড়িয়ে; এসে হারালেম বনিতে সীতে, দেশে মরণ হইল পিতে, এখন ভাইরে তোর শোকেতে, প্রাণ ত্যজিব জলধির জলে; ফিরে যাব নারে, অযোধ্যানগরে; লক্ষ্মণ তোর মাকে কে ডাকিবে, মা মা বলে?

পাঠক শুনিলে চমৎকৃত হইবেন, এই রক্ষাকর চক্রবর্ত্তী স্বীয় নাম ও শুদ্ধরূপে লিখিতে জানেন না। কিন্তু গানের রচনা দেখিয়া কি তাহাতে বিশ্বাস হয়?

তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিতেন বল্লভ তাহা "হয়" অর্থাৎ "হাঁ" বলিয়া অনুমোদন করিলেই গৃহীত হইত। আজিও পূর্ব্ব ময়মনসিংহে, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট প্রদেশে "হাঁর" পরিবর্ত্তে "হয়" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি এই প্রবাদোক্তিতে বিশ্বাস করা যায়, তবে বল্লভকে নারায়ণ দেবের লেখক ধরিয়া নিলে, তিনি যে লেখা পড়া জানিতেন না, এতদ্দ্বারা বরং ইহাই সমর্থিত হয়। কিন্তু তিনি যে তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গলা লেখা পড়া পর্য্যন্ত জানিতেন না, একথা বলিতে আমরা প্রস্তুত নহি।

"কোন কালে আমি পুরাণ নাহি শুনি।
পাঠেতে নাহিক শক্তি অক্ষর নাহি চিনি॥"

এই দুই পংক্তির আমরা এই রূপ অর্থ করা অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত ও সম্ভবপর মনে করি,—"আমি কোন দিন পুরাণ শুনি নাই, এবং অক্ষর (পুরাণের অক্ষর) অর্থাৎ সংস্কৃত অক্ষর (দেবনাগর বর্ণমালা) চিনি না; সুতরাং তাহা পাঠ করিবার আমার শক্তি নাই।" যদি এই পংক্তিদ্বয়ের এরূপ অর্থ-সঙ্গতি হয় এবং "সুকবি-বল্লভ হয়" এই পদের অর্থ "নারায়ণ দেব যাহা বলেন, তাহা সুকবি জনের বল্লভ অর্থাৎ প্রিয় হয়" এরূপ মনে করা যায়, তাহা হইলে নারায়ণদেব লেখা পড়া জানিতেন কিনা এ সম্বন্ধে কোন গোলমাল থাকে না; কিংবা জনপ্রবাদের উপরও নির্ভর করিতে হয় না।

নারায়ণ দেবের বিদ্যাবত্তার আলোচনা করিতে যাইয়া আমাদের প্রস্তাবটী একটু দীর্ঘ হইয়া উঠিল, অথচ একথা গুলি না বলিলেও নয়; সুতরাং তাঁহার কবিতা সম্বন্ধে এ প্রস্তাবে অধিক কিছু বলিতে পারিব না। কবিতা উদ্ধৃত করিতে গেলেই একই বিষয়ে লিখিত অন্যান্য প্রাচীন কবিদিগের রচনার সহিত পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়া দেখান উচিত। কিন্তু এ প্রস্তাবে তাহার স্থান হইবে না। তবে "হর গৌরীর রূপ বর্ণনা" বিষয়ে নারায়ণদেব এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর দুইটী রচনা উদ্ধৃত করিয়া আজ উপসংহার করিব।

"ওরে প্রণমহ (১) শঙ্কর ভবানী।
পুরুষ প্রকৃতিময়, যোগভাবে অতিশয়,
সর্ব্ব লোক জগত জননী॥
অর্দ্ধেক শরীরে হর, গৌরী অর্দ্ধকলেবর,
কোন্ বিধি করেছে নির্ম্মাণ!
রজত কাঞ্চনে, কিবা চাঁদ অরুণে,
অলক্ষিত করেছে সন্ধান!!
বামভাগে শোভে গৌরী, দক্ষিণঅঙ্গে ত্রিপুরারি,
শিরে গঙ্গা বহে সুরেশ্বরী।
পিঙ্গল জটার মাঝে, বেড়িছে ভুজঙ্গরাজে,
বাম ভাগে শোভে সুকবরী॥
কস্তুরী কুম্‌কুম্‌রেণু, শোভিয়াছে অর্দ্ধতনু,
অর্দ্ধ অঙ্গে বিভূতি ভূষণ।
দক্ষিণে নন্দীকে রাখি, বামেতে বিজয়া সখী,
অপরূপ রূপ দরশন॥
অর্দ্ধেক বলদ সঙ্গে, কেশরী অর্দ্ধেক অঙ্গে,
দুইয়ে মিলি একই বাহন।
ডুম্ ডুমি ডম্বুর বাজে, দক্ষিণ ভুজেতে সাজে,
বাম ভুজে কেয়ূর কঙ্কণ॥
বাম ভাগে হেমহারে, ঢাকিয়াছে পয়োধরে,
দক্ষিণে দুলয়ে মুণ্ডমালা।
বিচিত্র ব্যাঘ্রেরছড়া, (২) দক্ষিণ কটিতে বেড়া,
বাম কটি সুরঙ্গ পাটলা॥ (৩)

(১) "প্রণমাম্যহং" স্থলে বোধহয় "প্রণমহ" করা হইয়াছে।

(২) ছড়া—ছাল, চামড়া, চর্ম্ম।

(৩) পাটলা—পট্টবস্ত্র।

জগতের মাতা পিতা, পরম কল্যাণ দাতা,
ভজ নর উমা-মহেশ্বর।
নারায়ণ দেবে বলে, অভয়ার পদতলে,
যুগে যুগে রাখিও কিঙ্কর॥" (ক)

শ্রীমন্ত যখন রাজা বিক্রম কেশরীর কন্যা জয়াবতীকে বিবাহ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতা ধনপতি সদাগর ধ্যানেতে শিব পূজা করিতেছিলেন। হর-পার্ব্বতী ধ্যানকালে একযোগে তাঁহার নয়নসমক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়া। মুকুন্দরাম এইরূপ বর্ণন করিতেছেন;—

"ধ্যানে ধনপতি পূজে মৃত্তিকা শঙ্কর।
পার্ব্বতী হইল তার অর্দ্ধ কলেবর॥
বাম ভাগে সিংহ রহে দক্ষিণেতে বৃষ।
বাম ভাগে চণ্ডী রহে দক্ষিণে মহেশ॥
অর্দ্ধ ফোঁটা হরিতাল অর্দ্ধ ফোঁটা সিন্দূর।
ডাহিনেতে অহী রহে বামে কর্ণপুর॥
বাম করে চুড়ি সব্যে ভুজঙ্গ বলয়।
কেবল ভাবিতে মাত্র ধ্যান নাহি রয়॥
অর্দ্ধ নারী শিবশিবা রহেন ধেয়ানে।
বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমানে॥
দুইজনে একতনু মহেশ পার্ব্বতী।
না জানিয়া এত দুঃখ হৈল মূঢ়মতি॥"

নারায়ণদেব মুকুন্দরামের বহুকাল পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও কবিত্বে বোধ হয় কোন অংশে হীনছিলেন না। শুধু এই দুইটী রচনা দ্বারা তুলনা করিলে নারায়ণ দেবকে বরং শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়।

(ক) ভারতীতে "শ্রী—ঘোষ" যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই রচনাটিকে দ্বিজ বংশীদাসের বলিয়াছেন। কিন্তু নারায়ণদেবের বংশধরদিগের বাড়ীর গ্রন্থে ইহাতে তাঁহার নিজের নামের উপরোক্তরূপ ভণিতা রহিয়াছে। পরন্তু এতৎ সম্বন্ধীয় দ্বিজ বংশীদাসের আর একটি স্বতন্ত্র রচনাও আছে।, "শ্রী—ঘোষ" যে গ্রন্থ হইতে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলন সময়ে বোধহয় একের নামের ভণিতা অপরের কবিতায় যুক্ত হইয়া থাকিবে। এত প্রাচীন কালের গ্রন্থ ক্রমশঃ বংশ পরম্পরা সঙ্কলিত হইয়া আসিতে আসিতে এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।

পাশ্চাত্য মায়াবাদ বা অভূতবাদ।

(Idealism.)

৫। "ইন্দ্রিয়াতীত জড়"

আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক প্রস্তাবে আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ সমূহ জ্ঞান-নিরপেক্ষ মন-বহির্ভূত বাহ্য বস্তু নহে, মানসোৎপন্ন ভাবপরম্পরা মাত্র। অতঃপর চতুর্থ সংখ্যক প্রস্তাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি কি রূপে কল্পনা, আশা ও ভাবযোগের নিয়মানুসারে এই সকল মানসোৎপন্ন ভাবপরম্পরা সমষ্টিবদ্ধ ও বাহ্যবস্তু রূপে প্রতিভাত হয়। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ সমূহকেই জড় বলেন, যাঁহাদের সহিত দর্শন শাস্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহাদের জন্য মায়াবাদের জড়তত্ত্ব বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলা অনাবশ্যক; তাঁহারা যদি আমাদের পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব কতিপয়ের যুক্তি গুলি সারগর্ভ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন,

তাহা হইলে বুঝিয়া থাকিবেন, তাঁহারা যে জড়বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, সে জড়বস্তু মানসোৎপন্ন ভাবপরম্পরা মাত্র, তাহা আত্মার সহিত অসম্পর্কিত কোন বস্তু নহে। কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যক প্রস্তাবে আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম যে, জড়ের লৌকিক সংজ্ঞা আর দার্শনিক সংজ্ঞাতে অনেক প্রভেদ। জড়ের দার্শনিক সংজ্ঞা "আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ সমূহের কারণরূপী ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞান পদার্থ" *; এই "ইন্দ্রিয়াতীত জড়ের" বিষয় আমরা এখন পর্য্যন্ত কিছুই বলি নাই, অদ্য ইহার বিষয় আলোচনা করিব।

আমাদের শেষ প্রস্তাবের উদাহরণ স্থল নানা গুণাক্রান্ত পুষ্পকেই দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করিয়া এই বিষয় আলোচনা করা যাক্। আমরা দেখাইয়াছি, পুষ্পটীর প্রত্যক্ষীভূত গুণাবলী—বর্ণ, ঘ্রাণ, শীতলতা ও কোমলতা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ মাত্র, সুতরাং এই সমুদায়ের বাহ্য অবস্থিতি অসম্ভব, এই সমুদায় মানসিক অবস্থা পরম্পরা মাত্র। আচ্ছা, এই সমুদায় ছাড়িয়া দিলে কি আর পুষ্প বলিয়া কোন বাহ্য বস্তু থাকে? মায়াবাদ বলেন "না"; প্রকৃত-বাদ বলেন "থাকে"। প্রকৃতবাদ বলেন,আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ বিষয়ীভূত যে বর্ণ তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধ মাত্র ইহা যথার্থ বটে, কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-বোধের কারণরূপী একটি বস্তুগুণ আছে, সেই গুণই প্রকৃত বর্ণ নামের যোগ্য এবং ইহার আধার যে বস্তু তাহাই প্রকৃত জড় পদার্থ। অন্যান্য ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধেও এই রূপ। বর্ণানুভবের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কারণ-রূপী একটী অদৃশ্য গুণের বিশ্বাস আমাদের মনে উদিত হয়; ঘ্রাণাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়-বোধ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এই মতের সহিত লৌকিক বিশ্বাসের কত দূর প্রভেদ তাহা পাঠক সহজেই দেখিতে পাইতেছেন। লোকে দৃষ্টিগোচর পদার্থকেই বর্ণ বলে, অদৃশ্য গুণকে বর্ণ বলে না। তেমনি যাহা ঘ্রাণগোচর, যাহা আঘ্রাত হয়, তাহাকেই ঘ্রাণ বলে, ঘ্রাণের অনাঘ্রাত কারণকে ঘ্রাণ বলে না। ফলতঃ এরূপ বলাও নিতান্ত অন্যায়। বর্ণের কারণ যাহা তাহার সহিত কি বর্ণের কোন সাদৃশ্য আছে? কি রূপে থাকিবে? দৃষ্ট ও দৃশ্য বস্তুর সহিত অদৃষ্ট ও অদৃশ্য বস্তুর সাদৃশ্য কল্পনা নিতান্ত অমূলক,—সাদৃশ্য থাকা নিতান্ত অসম্ভব; সুতরাং বর্ণের কারণ যাহা, বর্ণের সহিত যখন তাহা সম্পূর্ণ রূপেই বিসদৃশ, তখন উহা প্রকৃতার্থে বর্ণ নামে উচ্য হইতে পারে না। ঘ্রাণ, শীতলতা, কোমলতাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়বোধের কারণরূপী গুণসমূহের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে; যাহা ইন্দ্রিয়বোধের ইন্দ্রিয়াতীত কারণ মাত্র, তাহা ইন্দ্রিয়বোধের নামে অভিহিত হইতে পারে না। সুতরাং এই ইন্দ্রিয়াতীত পুষ্পে বর্ণ, ঘ্রাণ, কোমলতা ইত্যাদি আছে প্রকৃতার্থে এরূপ উক্তি অমূলক, এরূপ উক্তির এক মাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে, ইহাতে বর্ণ, ঘ্রাণ কোমলতাদি ইন্দ্রিয়বোধ উৎপাদনের কারণ বা গুণ বর্ত্তমান আছে। এই সমস্ত গুণের বিষয় আমরা কি জানি? 'গুণ' বলিলেই যেন কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু বুঝায়, কিন্তু পাঠকের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, প্রকৃতবাদ দর্শনের "গুণ ও "গুণযুক্ত বস্তু" সম্পূর্ণরূপে

* কোন প্রকৃতবাদী এই ভাবে জড়ের সংজ্ঞা দিয়াছেন আমরা তাহা বলিতেছি না; জড় সম্বন্ধে অধিকাংশ প্রকৃত বাদীর যে মত আমরা তাহাই নিজের ভাবায় প্রকাশ করিয়াছি।

অতীন্দ্রিয় পদার্থ। তবে এই সমুদায় গুণ ও গুণযুক্ত বস্তুর বিষয় আমরা কি জানি? প্রকৃতবাদীরা স্বয়ংই স্বীকার করেন যে, এই সমস্ত গুণের বিষয় আমরা এই মাত্র জানি যে, ইহারা একটী বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বোধোৎপাদিকা শক্তিনিচয় মাত্র। একটী পুষ্প বর্ণাদি গুণযুক্ত ইহার অর্থ এই যে, পুষ্পটী বর্ণাদি ইন্দ্রিয়বোধোৎপাদনে সক্ষম; এবং পুষ্পটীর বিষয় ও আমরা আর কিছু জানিনা, কেবল এই পর্য্যন্ত জানি যে, ইহা নানা ইন্দ্রিয়বোধ উৎপাদনে সক্ষম একটী অচেতন বস্তু। দার্শনিক প্রকৃতবাদের মতে পুষ্পটীর অর্থ কি পাঠক বোধ হয় এখন তাহা বুঝিতে পারিলেন। মায়াবাদের মতে বর্ণ কোমলত্বাদি ইন্দ্রিয়বোধের সমষ্টির নামই পুষ্প; লৌকিক প্রকৃতবাদের মত ও মূলে তাহাই; প্রভেদ এই মাত্র যে, লৌকিক প্রকৃতবাদ এই ইন্দ্রিয়বোধ সমষ্টিকেই মন বিচ্যুত হইয়া থাকিতে সক্ষম বলিয়া বিশ্বাস করে; দার্শনিক প্রকৃতবাদ বলেন প্রকৃত পুষ্প—প্রকৃত জড় এই ইন্দ্রিয় বোধ সমষ্টি নয়, এই ইন্দ্রিয়বোধ সমষ্টির কারণরূপী—এই ইন্দ্রিয়বোধ-সমষ্টির উৎপাদিকা শক্তি-সম্পন্ন যে একটী অচেতন পদার্থ আছে, তাহাই প্রকৃত পুষ্প, তাহাই প্রকৃত জড়। এই—"প্রকৃত জড়" লইয়াই মায়াবাদ ও প্রকৃতবাদের বিবাদ। মায়াবাদ এই অতীন্দ্রিয় "প্রকৃত জড়ের" অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। এই বিবাদ মীমাংসা করিতে হইলে অনেক গুলি প্রশ্নের আলোচনা আবশ্যক। প্রথমতঃ, এই অতীন্দ্রিয় জড় যে আছে তাঁহার প্রমাণ কি, যুক্তি কি? প্রকৃতবাদ বলেন ইহার যুক্তি আমাদের কারণত্বে (Causation এ) বিশ্বাস; কার্য্যমাত্রেরই কারণ আছে, সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ সমূহেরও একটী কারণ আছে। পুনশ্চ জিজ্ঞাস্য,—কার্য্য-মাত্রেরই কারণ আছে এই বিশ্বাস কোথা হইতে আসিল? আর কারণের অর্থই বা কি? কার্য্য-কারণ-বিশ্বাস কি আমাদিগকে অতীন্দ্রিয় প্রদেশে লইয়া যাইতে পারে? যদি না পারে তবে ইন্দ্রিয়বোধের কারণান্বেষণ করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়াতীত কারণ কল্পনা কর কেন? আর যদি কারণ অতীন্দ্রিয়ই হয়, তবে তাহাকে জড় বলে কেন? তাহা যে জ্ঞানবান নয় তাহা কে বলিল? জড়েতে কারণত্ব, কর্তৃত্ব, শক্তি—এই সমুদায় গুণ থাকা কি সম্ভব? আর, কার্য্যের পক্ষে কারণ যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক নয় কি? যদি তাহাই হয়, তবে যাতে যাহা নাই তাহাকে তাহার কারণ বলিয়া কল্পনা কর কি রূপে? জড় বোধশূন্য, জ্ঞান শূন্য, ভাবশূন্য; তাহা কি ইন্দ্রিয়বোধ জ্ঞান ও ভাবের কারণ হইতে পারে? আমরা আর অধিক দূর যাইব না, পাঠক দেখিতেছেন, এক কারণবাদ লইয়াই কত কথা উঠে; এই সকল কথার মীমাংসা না করিলে আমাদের মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে সন্তোষকর নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। জড়কে ইন্দ্রিয়বোধের কারণ বলিয়া চালাইয়া দেওয়া সহজ কথা নয়; নাস্তিক মায়াবাদ আস্তিক মায়াবাদ উভয়ই এই মতের বিপক্ষে অস্ত্রধারী। আমরা অগ্রে নাস্তিক মায়াবাদের কথা শুনিব, পরে উহার কারণবাদ সম্বন্ধীয় মীমাংসার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে এবং প্রকৃত কারণবাদ এবং তাহার ফল স্বরূপ ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে আস্তিক মায়াবাদ কি বলেন, তাহা ব্যাখা করিব।

বাল্মীকি ও বেদব্যাস

মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাস হইতে রামায়ণ-প্রণেতা বাল্মীকি প্রাচীন কি না? মহাভারত ও রামায়ণের রচয়িতা এক বেদ-ব্যাস ও এক বাল্মীকি কি না? এবং মহাভারত রামায়ণের পরে রচিত হইয়াছে কি না? অদ্য আমরা এই সকল আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের এই রূপ করিয়া প্রশ্ন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, জগতের প্রথম সময় হইতে এ পর্য্যন্ত অসংখ্য বাল্মীকি, বেদ-ব্যাস জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু যে বাল্মীকি রামায়ণ ও যে বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়াছেন, এ স্থানে তাঁহারাই আমাদের প্রয়োজনীয়। আর রামায়ণ মহাভারতের প্রণেতা একমাত্র বাল্মীকি, বেদব্যাস নাও হইতে পারেন, বহু বাল্মীকি বেদব্যাস কর্ত্তৃক ক্রমে বহু দিনে রামায়ণ মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অপিচ বাল্মীকি বেদব্যাসের জ্যেষ্ঠ, কিম্বা বেদব্যাস বাল্মীকির জ্যেষ্ঠ হইলেও, রামায়ণের পরে মহাভারত কি মহাভারতের পরে রামায়ণ, ইহা নিশ্চিত হয় না। যেহেতুক জ্যেষ্ঠের অগ্রেও কনিষ্ঠ পুস্তক লিখিতে পারেন।

মহাভারতে অধিক পরিমাণে আর্যপ্রয়োগ ও চ, বা, তু ইত্যাদি দোষ লক্ষিত হয়, কিন্তু রামায়ণে উক্ত দোষের সংখ্যা অল্প, এই কারণে মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যাইতে পারে না। যেহেতু, কালিদাসের কুমার-সম্ভব ও রঘুবংশের পরে এমন অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে, যাহাতে রচনা ও শব্দগত দোষ মহাভারত হইতে শত সহস্র গুণ অধিক লক্ষিত হয়। যে গ্রন্থে দোষের ভাগ যত অল্প তাহাই তত আধুনিক এবং যাহাতে দোষের পরিমাণ যত অধিক তাহাই তত প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে, কবিকঙ্কণ, চৈতন্যচরিতামৃত এবং বিদ্যাসুন্দরকেও আমরা রঘুবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারি। মহাভারতে বাল্মীকির নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রামায়ণে বেদব্যাসের নাম লক্ষিত হয় না; এই হেতুতে মহাভারতকে পরবর্ত্তী বলা সঙ্গত হয় না, কারণ, বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইতেছে, তাহার কোন এক খানিতে বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, বেদব্যাসের নাম না থাকিলেই কি ঐ গ্রন্থকে আমরা রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিব? কখনই না।

হিন্দু-সমাজে বহুবিধ কুৎসিত প্রথা প্রচলিত থাকার কথা মহাভারতে প্রকাশ আছে, কিন্তু রামায়ণে তাহা নাই; এই জন্য মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ব্বের বলিলে, বর্ত্তমান সময়ে ঘৃণিত আচার ব্যবহার লইয়া যে বাল্য বিবাহ বিষয়ক, বহু বিবাহ বিষয়ক কুল-কালিমা, কুলীন কুল সর্ব্বস্ব নাটক প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, ঐ গুলিকেও রামায়ণ রঘুবংশের পূর্ব্বের বলিতে হয়। অতএব এরূপ যুক্তি দ্বারা কোন বিষয়েরই পূর্ব্বাপর স্থিরীকৃত হইতে পারে না। যেহেতু, পৃথিবীর কোন বিষয়েরই ক্রমোন্নতি নাই। উন্নতির পর অবনতি, অবনতির পরে উন্নতি

হওয়াই সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম। এবং ইংলণ্ড, আমেরিকা, আরব, পারস্য প্রভৃতির ইতিহাস, ভারতীয় বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদিতে এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ বলেন, বিষ্ণু পুরাণ মতে ব্রহ্মা হইতে ছয়ষষ্টিপুরুষে রাম এবং চতুর্থ পুরুষে রাবণকে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা হইতে ছয়ষষ্টি পুরুষে যে রাম তিনি কখনই ব্রহ্মা হইতে চতুর্থ পুরুষে যে রাবণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন না। যে রাবণ রামের পূর্ব্ববর্ত্তী বেয়াল্লিশ পুরুষ অনরণ্যকে বধ করিয়াছিলেন, সেই রাবণ রামের সময়ে কোন মতেই জীবিত থাকিতে পারেন না। অতএব রামায়ণের ঘটনা সম্পূর্ণ কল্পিত। হউক কল্পিত, কল্পিত হইলেই যে তাহা আধুনিক গ্রন্থ হইবে, এমন কোন কথা নাই। আর এরূপ কল্পনা মহাভারতেও যথেষ্ট লক্ষিত হয়।

বিষ্ণু পুরাণ মতে ছয়ষষ্টি পুরুষে রাম আর একান্ন পুরুষে যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই যুধিষ্ঠিরের পরে রামের জন্ম হইয়াছে, এই কথা একান্ত অযৌক্তিক। যেহেতু, পরাশর বিষ্ণু পুরাণে বহু কালের কথা বলিতেছেন, এরূপাবস্থায় তিনি যে বংশাবলী কহিয়াছেন তৎসম্বন্ধে কি আর তাঁহার ভ্রম হইতে পারে না? তিনি সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি যে সমস্ত বংশাবলী করিয়াছেন, তাহাতে যে তাঁহাদের সকলেরই নাম বলিয়াছেন, তাহার যে একটী নামও বাদ পড়ে নাই, এমন নহে। উল্লিখিত বংশীয়দের মধ্যে যাহাদের নাম তাঁহার স্মরণছিল ও যাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন, পরাশর তাঁহাদেরই নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহাদের নাম তাঁহার স্মরণ ছিলনা তাহা বলেন নাই, এই জন্যই ব্রহ্মা হইতে ছয়ষষ্টি পুরুষে রাম, একান্ন পুরুষে যুধিষ্ঠির ও চতুর্থ পুরুষে আমরা রাবণকে দেখিতে পাই।

বিষ্ণু পুরাণীয় যুধিষ্ঠিরের ঐ বংশাবলী যে বিশুদ্ধ নহে, তাহা মহাভারতের আদিপর্ব্বে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতকার আদিপর্ব্বে চন্দ্রবংশীয় বহুতর রাজার নাম কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন যে, এতদ্ব্যতীত উক্তবংশে আরও অসংখ্য নৃপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১) অতএব জগতের আদি সময় হইতে চন্দ্র সূর্য্য বংশে কত রাজা জন্মিয়াছিলেন, উল্লিখিত বাক্য দ্বারা তাহারও বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিতে বেদ পুরাণ প্রভৃতিতে মনুষ্যের আয়ু যতই নির্দ্দিষ্ট থাকুক না কেন, আমরা তাহার সমালোচনা করিতে বাধ্য না, কারণ ঐ আলোচনা হইতে বাল্মীকি, বেদব্যাস, রামায়ণ এবং মহাভারত যে কোন সময়ের, তাহা নির্ণীত হইবে না। সত্য হইতে কলি পর্য্যন্ত বশিষ্ট, শক্তি, পরাশর, ব্যাস ও শুকদেব এই পাঁচ জনকে আমরা দেখিতে পাই। এই পাঁচ জনকেই আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম, যদি কলি যুগে পরাশর ব্যাসের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ না হইত। (২)

---

(১) মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের ৮৭ অধ্যায় ৬১।৬২ শ্লোক দেখ।

(২) "অথাতো হিম শৈলাগ্রে দেবদারু বনালয়ে।
ব্যাস মেকাগ্রমাসীনমপ্রচ্ছন্নৃষয়ঃ পুরা॥
মানুষানাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌযুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্ছবদ সত্যবতীসুত।
* * * * * * *
ব্যাস বাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ॥
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মস্থুলঞ্চ বিস্তরাৎ।
——পরাশর সংহিতা।

মহাভারতে রামলীলা সংক্ষেপে যে বর্ণিত আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া বাল্মীকি সাত কাণ্ড রামায়ণ রচনা করিতে পারেন। এরূপ করা অসম্ভব নয়। কালিদাসের শকুন্তলা এবং বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনীই এ বিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। আবার মহাভারতে যখন ভারতীয় সমস্ত বেদ স্মৃতি পুরাণ এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপর প্রভৃতির ইতিহাস, সামাজিক রীতি নীতি ইত্যাদি সকল বিষয়েরই প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এ রূপও হইতে পারে যে, ভারতবর্ষের সমুদায় গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়াই মহাভারত রচিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের স্মৃতি, চক্রদত্ত, নিদান প্রভৃতি সংগ্রহই একথার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব উল্লিখিত তর্ক বিতর্ক দ্বারা মহাভারত হইতে রামায়ণ হইয়াছে কিম্বা রামায়ণের ঘটনাই সংক্ষেপে মহাভারতে বিরচিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত হয় না।

"তপঃ স্বাধ্যায় নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাম্বরং।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকি মুনি পুঙ্গবঃ।"

তপোনিরত বেদবিৎ মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে বাল্মীকি জিজ্ঞাসা করিলেন।

কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ
বীর্য্যবান্? ইত্যাদি।

সম্প্রতি পৃথিবীতে কে বিলক্ষণ গুণবান্ ও বীর্য্যবান্?

"ইক্ষাকুবংশ প্রভবো রামোনাম জনৈঃশ্রুতঃ।"

ইক্ষাকু বংশসম্ভূত রামচন্দ্রই জন সমাজে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। ইত্যাদি।

"বৃত্তং কথয় রামস্য যথা তে নারদাৎ শ্রুতম্।
রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ।"

নারদের মুখে তুমি ধীমান রামের বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছ তাহাই বর্ণনা কর। ইত্যাদি।

"তচ্চাপ্যবিদিতং সর্ব্বংবিদিতংতে ভবিষ্যতি।"

রামের বৃত্তান্ত যাহা তুমি জান না তাহাও জানিতে পারিবে। ইত্যাদি।

"স যথা কথিতং পূর্ব্বং নারদেন মহাত্মনা।
রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্মুনিঃ।"

পূর্ব্বে মহাত্মা নারদ রঘুবংশের কথা যে রূপ বলিয়াছিলেন, মহর্ষি বাল্মীকিও সেই রূপ করিয়া রামায়ণ রচনা করিলেন।

"চিরনিবৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্।

অনেক দিনের কথাও এখন যেন প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে।

রামায়ণের উপরোক্ত বচন কয়েকটী অবলম্বন করিয়া অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামায়ণ-প্রণেতা বাল্মীকির জন্মপরিগ্রহের বহু পূর্ব্বে রামের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু রামায়ণ রচয়িতা যে রামের সমকালের লোক, তাহা উল্লিখিত বচনাবলীতেই বিলক্ষণ রূপে প্রকাশ রহিয়াছে। বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্প্রতি ভূতলে কে বিলক্ষণ গুণবান্ ও বীর্য্যবান্? নারদ কহিলেন, রামচন্দ্রই জনসমাজে বিশেষ বিখ্যাত। উক্ত সম্প্রতি শব্দের দ্বারা কি স্পষ্ট বোধ হয় না যে, বাল্মীকির সমকালে রাম জীবিত ছিলেন? এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, সম্প্রতি এই নগরে ধনবান্ কে? আমি বলিলাম, অমুক ব্যক্তিই প্রসিদ্ধ ধনী। ইহাতে কি প্রশ্নকর্ত্তা আর উক্ত ধনীর এক সময়ে বিদ্যমান থাকা স্পষ্ট বুঝা যায় না? যাহা হউক, রাম রাজা হইলে যে রামায়ণ রচিত হইয়াছে, তাহা তাহাতেই প্রকাশ আছে। (৩)

উপরোক্ত শ্রুত এই শব্দকে কেহ কেহ

(৩) প্রাপ্ত রাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্র পদ মর্থবৎ।
বালকাণ্ড চতুর্থ সর্গ, রামায়ণ।

ভূতকাল প্রকাশক আখ্যাতি ক্রিয়াতে পরিণত করিয়াছেন। শ্রুধাতু কর্তৃবাচ্যে ত প্রত্যয় হইয়া শ্রুত হইয়াছে। শ্রুত এ স্থলে রামের বিশেষণ। ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় হইয়া যে সমস্ত শব্দ সাধিত হয়, তাহারা বর্ত্তমান ভূত ও ভবিষ্যৎকাল প্রকাশক ক্রিয়াপদ নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রভৃতি কাল আখ্যাতিক ক্রিয়া দ্বারায় প্রকাশ পায়। "রামোনাম জনৈঃশ্রুতঃ" অর্থাৎ শ্রুতোঽস্তি। এস্থলে এই বর্ত্তমান জ্ঞাপক আখ্যাতিক ক্রিয়া বসিবে। এস্থলে ভূত কিম্বা ভবিষ্যৎ কাল খ্যাপক ক্রিয়াও বসিতে পারিত, কিন্তু বাল্মীকি যখন নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সম্প্রতি কে গুণবান? তখন তদুত্তর নারদ বচনে সহসাই অন্য কাল জ্ঞাপক ক্রিয়ার প্রয়োগ হইতে পারে না। আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক যুক্তি বাহির করিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু, নারদ রামায়ণের আদিকাণ্ডের প্রথমাধ্যায়ে সংক্ষেপে বাল্মীকিকে রাম চরিত কহিয়া তাহার উপসংহারে তৎকালে রামের বিদ্যমান থাকা স্পষ্টই প্রমাণ করিয়াছেন। (৪)

এ স্থলে আর একটী কথা না বলিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না। ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ যদি অতীত কাল খ্যাপক আখ্যাতিক ক্রিয়ার কার্য্য করে, তবে নিম্নলিখিত অজিত এই শব্দের আমরা কি অর্থ করিব?

'শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ।
অজিতঃ খড়্গ ধৃগ্বিষ্ণুঃ কৃষ্ণশ্চৈব বৃহদ্বলঃ।'

লঙ্কাকাণ্ড, রামায়ণ।

তুমি শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশ, পুরুষোত্তম, তুমি অজিত খড়্গধারী বিষ্ণু, তুমি মহাবল কৃষ্ণ।

পাঠক, উল্লিখিত অজিত শব্দ দেখিয়া তুমি শার্ঙ্গধন্বা হৃষীকেশ পুরুষোত্তম বিষ্ণু ও মহাবল কৃষ্ণ অজিত অর্থাৎ ছিলেন, এস্থলে আমরা এইরূপ অর্থ করিব নাকি? (৫) যাই হউক, খ্যাত, জাত, শ্রুত, স্থিত, গত, এ সকল কাল প্রকাশক ক্রিয়াপদ নহে। উহা দ্বারা কাল প্রকাশক ক্রিয়াপদ আছে তাহাই জানা যায়। স্থিতঃ এই পদ দেখিয়াই বুঝিতে হইবে যে, উহার অস্তিবভূব ইত্যাদি ক্রিয়া আছে।

অনন্তর রামায়ণের উল্লিখিত বচনে কৃষ্ণ শব্দ দেখিয়া কেহ এই প্রকার প্রশ্ন উপস্থিত করেন যে, বাল্মীকি কৃষ্ণাবতারের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি কখনই উপরোক্ত লঙ্কাকাণ্ড বচনে কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ করিতেন না। যেহেতু, দ্বাপর যুগের অবতার হইতেই কৃষ্ণ শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বাপর যুগে বসুদেবের ঔরষে যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনিও যে কৃষ্ণ নামে অভিহিত হন, তাহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ হইতেই কৃষ্ণ শব্দের সৃষ্টি হয় নাই। বাল্মীকি

[৪] নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘঃ।
রামঃসীতামনু প্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্॥ ৮৯
প্রহৃষ্ট মুদিতো লোকঃ তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্ম্মিকঃ।
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষ ভয় বর্জ্জিতঃ॥ ৯০
ন পুত্র মরণং কেচিৎ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষঃ কচিৎ।
নার্য্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতা॥ ৯১
রাজ বংশান্ শত গুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ।
চাতু র্ব্বর্ণ্যঞ্চ লোকেঽস্মিন্ স্বে স্বে ধর্ম্মেনিয়োক্ষ্যতি॥৯৬
দশ বর্ষ সহস্রাণি দশ বর্ষ শতানিচ।
রামোরাজ্য মুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রয়াস্যতি॥ ৯৭

(৫) কল্পদ্রুমের প্রধান লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহোদয়ও 'জনৈঃশ্রুতঃ' ভূতকাল প্রযুক্ত হইয়াছে, ইত্যাদি বলিয়াছেন। কল্পদ্রুমের ৩ ভাগের ৩ সংখ্যা দেখ।

যে উল্লিখিত বচনে রামের বিশেষণ স্থলে কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, এ কৃষ্ণ গোলকবাসী কৃষ্ণ। নন্দের নন্দন কৃষ্ণ বাল্মীকির পরে হউন, কিন্তু তাই বলিয়া গোলকের কৃষ্ণকে আমরা বাল্মীকির পরবর্ত্তী বলিতে পারি না। দেবকী-নন্দন কৃষ্ণের পূর্ব্বেও কৃষ্ণ শব্দ ছিল।

"কৃষ্ণং নিয়ানং হরয়ঃ সুপর্ণা
অপোবসানা দিব মুৎপতন্তি।" ইত্যাদি।
ঋগ্বেদ সংহিতা।

সুন্দর পতনশীল পক্ষী স্বরূপ সূর্য্যরশ্মি সমূহ কৃষ্ণ সমুদ্রে নামিয়া উদক সংগ্রহ পূর্ব্বক শূন্যে উড্ডীন হইতেছে। ইত্যাদি

যিনি রামায়ণে কৃষ্ণ শব্দ দেখিয়া তৎপ্রণেতা বাল্মীকিকে বসুদেব নন্দনের পরবর্ত্তী বলিয়াছেন, তিনি হয়ত উপরোক্ত বচনে কৃষ্ণ শব্দ দেখিয়া ঋগ্বেদকেও বসুদেব সুতের অনুজ বলিবেন। যাক্ তিনি যাই কেন বলেন না, আমরা এ সম্বন্ধে এই স্থানেই নীরব হইলাম।

"সজগাম বনংবীরং প্রতিজ্ঞা মনুপালয়ন্।"
তিনি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বনে গমন করিয়াছিলেন।

রামায়ণ আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গের উপরোক্ত বচনে "জগাম" এই ক্রিয়া দেখিয়া কেহ বলেন, রামের বহুপরে রামায়ণ রচিত হওয়াতেই এই বচনে উক্ত ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। "জগাম" এই ক্রীয়াটী পরোক্ষ অতীত। অধিকতর পূর্ব্ব গতকালকে পরোক্ষ অতীত কহে। কিন্তু এই ক্রীয়া রাম বিদ্যমানেও প্রযুক্ত হইতে পারে। মনে কর রাম বনে গমন করায় ১৪।১৫ বৎসর পরে নারদ বাল্মীকিকে বলিলেন যে, রাম প্রতিজ্ঞা পালন করিতে বনে গমন করিয়াছিলেন। যেমন,—আমি বাল্যকালে ব্যাকরণ পড়িয়াছিলাম। এই প্রকার রামচন্দ্র রাজা হইলে নারদ তাঁহার সুন্দর নীতি প্রকৃতি দেখিয়া বাল্মীকিকে বলিয়াছিলেন যে, রাম রাজ্যে সকলেই সুখী হইবে। পিতাকে পুত্রের মৃত্যু দেখিতে হইবে না। স্ত্রী সকল অকালে বিধবা কিম্বা অসতী হইবে না। সকলেই নিরোগী ও ধার্ম্মিক হইবে(৬)। অধিকতর পূর্ব্বগত বলিলেই সত্য যুগকে বুঝায় না। এবং হইবে বলিলেই যে তাহা ৫০০ শত বৎসর পরে হইবে তাহা নহে। কল্যও হইতে পারে।

অপর নারদের সহিত বাল্মীকির কথোপকথনের পরে ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, নারদের মুখে ধীমান রামের বৃত্তান্ত যাহা শুনিয়াছ তাহাই বর্ণনা কর। রামের বৃত্তান্ত যাহা তুমি জাননা, তাহাও জানিতে পারিবে। ব্রহ্মার এই কথা হইতে বাল্মীকির বহু পূর্ব্বে রামের জন্ম হওয়া কিপ্রকারে সপ্রমাণিত হয়? যখন বাল্মীকি আর নারদের কথায় রাম ও বাল্মীকির এক সময়ে বিদ্যমান থাকা স্পষ্ট প্রকাশ আছে, তখন উঁহার ২।৪।১০ দিন কি ২।৪।১০ মাস বা বৎসর পরে আসিয়া ব্রহ্মা বাল্মীকিকে এই কথা বলিয়াছিলেন ভিন্ন উঁহার দ্বারায় আর কি উপলব্ধি হইতে পারে? তবে এক কথা এই যে, ব্রহ্মা রামচরিত রচয়িতাকে বলিয়াছেন, তুমি রামচরিত যাহা জাননা তাহাও জানিতে পারিবে। এই কথায় রাম ত্রেতা যুগের ও বাল্মীকি কলির হন কি

(৬) প্রহৃষ্ট মুদিতো লোকঃ তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্ম্মিকঃ।
নিরাময়োহ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষ ভয় বর্জ্জিতঃ। ৯০
স্বপুত্র মরণং কেচিৎ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষঃ কচিৎ।
নার্য্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ। ৯১
বালকণ্ড প্রথমসর্গ, রামায়ণ।

প্রকারে? ঢাকার একজন মানুষের সকল কথা আমি নাও জানিতে পারি। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি ঢাকার অমুকের বৃত্তান্ত যাহা জান না তাহাও জানিতে পারিবে। এই কথার তাৎপর্য্য কি? না এই ব্যক্তি কোন এক প্রকারে আমাকে উঁহার বৃত্তান্ত জানাইবেন। যাহা তুমি জাননা তাহাও জানিতে পারিবে, এই বরটা ব্রহ্মা বাল্মীকিকে দিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার বরে কি না হইত? অতএব বাল্মীকিও ব্রহ্মার বর প্রভাবে রামের সকল কথাই জানিতে পারিয়াছিলেন। যাঁহারা বর প্রভাবে সমস্ত অবগত হওয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের ব্রহ্মার উল্লিখিত কথা দ্বারায় ইহাই সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, ব্রহ্মা কোন এক প্রকারে বাল্মীকিকে রামের সকল কথাই জানাইয়া ছিলেন। ব্রহ্মার উপরোক্ত কথাটী আশ্রয় করিয়া যাঁহারা রামের বহুকাল পরে রামায়ণ রচিত হওয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা অধিক কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, তবে তাঁহারা রামায়ণের আদিকাণ্ডের প্রথমাধ্যায়টীর আদি অন্ত ভাল করিয়া দেখিলে বোধহয় ঐ রূপ আরও অনেক নূতন কথা আমাদিগকে শুনাইতে পারিতেন।

মহর্ষিগণ লব ও কুশের মুখে রামায়ণ শুনিয়া কহিলেন, অনেক দিনের কথা ও এখন যেন প্রত্যক্ষবৎ বোধ হইতেছে। এই অনেক দিনের অর্থ যে সত্য যুগ নহে, তাহা প্রতিপন্ন করাইতে অনেক দূর যাইতে হয় না। যখন রামের পুত্র (বাল্মীকির শিষ্য) লব আর কুশই রামায়ণের গায়ক, তখন রাম ত্রেতা এবং বাল্মীকি কলিযুগের এই কথা বলিতে কোন মতেই আমাদের সাহস হয় না। আমাদের মতে রামের বয়ঃক্রম যৎকালে ৬০ বৎসর সেই সময়ে কুশ ও লবের মুখে রামের বাল্যলীলা শুনিয়া মহর্ষিগণ অনেক দিনের কথা ইত্যাদি বলিয়াছিলেন।

রামায়ণে বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎকাল খ্যাপক ক্রিয়া দেখিয়া অনেকেই রামায়ণ প্রণেতার বিস্তর নিন্দা করিয়াছেন (৬)। কিন্তু আমরা এসম্বন্ধে বাল্মীকির নিন্দার কোন কারণ দেখি না। গ্রন্থ লিখিতে হইলেই স্থল বিশেষে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রকাশক তিন প্রকার ক্রিয়াই প্রয়োগ করিতে হয়। এবং ইহাগ্রন্থ মাত্রেই লক্ষিত হয়। যাঁহারা এই গুলিকে কবির দোষ বলিয়া সাধারণ্যে প্রচার করেন, তাঁহাদের পক্ষে সকলই শোভা পায়।

ভৃগুকুলসম্ভূত ঋক্ষ অতঃপর যিনি বাল্মীকি নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনি চতুর্ব্বিংশতি দ্বাপরে বেদব্যাস হইয়াছিলেন।

"ঋক্ষোহভূদ্ভার্গবস্তস্মাৎ বাল্মীকি র্যোহভিধিয়তে।" ৩।৩।১৮

অষ্টাবিংশতি দ্বাপর যুগে পরাশর পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস হন।

"জাতুকর্ণোহভবন্মত্তঃ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নস্ততঃ। অষ্টাবিংশতি রিত্যেতে বেদব্যাসাঃ পুরাতনাঃ।"

তৃতীয়খণ্ড কল্পদ্রুমের দশম সংখ্যোদ্ধৃত বিষ্ণু পুরাণ বচন।

উল্লিখিত বিষ্ণু পুরাণের বচনগুলি প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই যখন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইতে বাল্মীকি পুরাতন ব্যক্তি হইতেছেন, তখন ঐ বচন সম্বন্ধে আমাদের

(৬) ৪র্থ ভাগ কল্পদ্রুমের তৃতীয় সংখ্যার ১৩৭পৃষ্ঠা দেখ।

বলিবার কোন কথা থাকিলেও আমরা বলিতে ক্ষান্ত হইলাম।

তবে বাল্মীকি যে চতুর্ব্বিংশতি দ্বাপর যুগে বেদব্যাস হইয়াছিলেন, তাহা প্রতিবাদী মহাশয়েরা বলিয়াছেন মাত্র। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহারা বিষ্ণু পুরাণের যে বচনাৰ্দ্ধকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বাল্মীকি যে উক্ত যুগে বেদব্যাস হইয়াছিলেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও দেখিতে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় আমরা বাল্মীকির দ্বাপর যুগে জন্ম হওয়া বিশ্বাস করিতে পারি না।

মহাভারতে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বেদব্যাস ও বাল্মীকিকে এক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় (৭) কিন্তু উক্ত বাল্মীকি যে রামায়ণের প্রণেতা তাহার প্রমাণ কি? এক বাল্মীকি রামায়ণ লিখিয়াছেন জন্য যেখানে বাল্মীকি নাম দেখিব তাহাকেই রামায়ণ রচয়িতা বলা সঙ্গত হয়না। এখন যেমন রাম, কৃষ্ণ, হরি, সুশীল, হেমন্ত ও বসন্ত প্রভৃতি নাম জনসমাজে বহুল প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়. সেইরূপ প্রাচীন সময়ে বিশ্বামিত্র, অত্রি,ভৃগু, বশিষ্ট, বাল্মীক, কশ্যপ, পরাশর, শঙ্কা ও গৌতম প্রভৃতি নামই মনুষ্যের (বিশেষ মুনিদের) মধ্যে সমধিক প্রচলিত ছিল জন্যই আমরা বেদ, পুরাণ ও স্মৃতিতে এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপর প্রভৃতি যেখানে সেখানেই বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র ও গৌতম, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ইত্যাদি নাম দেখিতে পাই। বেদের বশিষ্ট আর পুরাণের বশিষ্ট একজন নহে! এবং সভা বা গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্তেও সকল স্থলে বশিষ্ঠ প্রভৃতি নামের উল্লেখ হয় নাই। বেদের বশিষ্ঠ আর পুরাণের বশিষ্ঠ ইঁহাদের নাম মাত্র এক, কিন্তু ইঁহারা স্বতন্ত্র মানুষ।

"ইষ্টিংতেহং করিষ্যামি পুত্রিয়াং পুত্র কারণাৎ।
অথর্ব্বশিরসি প্রোক্তৈর্ম্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাংবিধানতঃ।"

পঞ্চদশ অধ্যায় বালকাণ্ডরামায়ণ।

আপনার পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত আমি অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারায় যজ্ঞ করিব।

রামায়ণের উপরোক্ত শ্লোকটী অবলম্বন করিয়া অনেকেই বলেন যে, বাল্মীকি যখন অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারায় দশরথের পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত যজ্ঞ করার কথা রামায়ণে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন, তখন তিনি যে অথর্ব্ববেদ হওয়ার পরে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। এবং তাহা হইলে তিনি যুধিষ্ঠিরের প্রায় সহস্র বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। যেহেতু, ৪৩৩০ বৎসর হইল রাজা যুধিষ্ঠিরেরা ভূতলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। (৮) এবং ৩৩৯৭ বৎসর গত হইল অথর্ব্ববেদ রচিত হইয়াছে (৯) অতএব উপরোক্ত যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম হওয়া বৎ-

[৭] "ঋষিমুখ্যাঃ সদাযত্র বাল্মীকি স্তথ কশ্যপঃ।
আত্রেয়ঃ কুণ্ড জঠরো বিশ্বামিত্রশ্চ গৌতমঃ। ইত্যাদি
ভরদ্বাজো বশিষ্টশ্চ মুনিরুদ্বালকস্তথা।
শৌনকঃ সহ পুত্রেন ব্যাসশ্চ তপসাম্বরঃ।"

বনপর্ব্ব ৮৫ অঃ

"ব্যাসঃ পুরাণ সূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং যথা।"
প্রকৃতি খণ্ড চতুর্থ অধ্যায়, ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণ।

(৮) "আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং—
যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড় দ্বিক্ পঞ্চদ্বিযুতঃ শকঃ কালস্তস্য রাজ্ঞস্য।"

ভাগবত ১২ স্কন্ধ ১ অধ্যায়।

(৯) অথর্ব্ব বেদের ১৯ কাণ্ডের ৪৪ সূক্ত দেখ।
"উপযুক্ত প্রতিকৃতির অসদ্ভাবে আমরা এখানে সমগ্র গণনাটি প্রকাশ করিতে অশক্ত হইলাম।" ইত্যাদি।
"এক্ষণে বিষুব রেখা প্রতি বৎসর ৫০ সঙ্করণ করিতেছে। হিন্দু গণনানুসারে ৫৪ সঙ্করণ করিয়া থাকে।" ইত্যাদি।
"ঐ প্রাধিমা নিশ্চিত করিবার উপায় এই;" ইত্যাদি
চতুর্থ ভাগ কল্পদ্রুমের ৮ সংখ্যার ৪৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।

সর হইতে অথর্ব্ববেদ রচিত হওয়ার বৎসর বিয়োগ করিলে, যুধিষ্ঠিরের ৯৩৩ বৎসর পরে অথর্ব্ববেদ রচিত হওয়া স্থির হয়।

পাঠক, ৩৩৯৭ বৎসর হইল অথর্ব্ববেদ-রচিত হওয়া সত্য হইলে কেবল রামায়ণ প্রণেতাই যুধিষ্ঠিরের সহস্র বৎসর পরবর্ত্তী হন না। দশরথ, ঋষ্যশৃঙ্গ, রাম প্রভৃতি সকলেরই ঐ দশা হয়। কারণ ঋষ্যশৃঙ্গ অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ করিলেন, দশরথ ও তাঁহার দ্বারায় যজ্ঞ করাইলেন, এবং রাম ও সেই যজ্ঞে জন্ম গ্রহণ করিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহারা সকলেই যে যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী হইলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, বাল্মীকি হঠাৎ ঋক্‌বেদের স্থলে অথর্ব্ববেদের নাম করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ বলা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। যেহেতু, প্রাচীন দশরথ প্রভৃতি সকলের নামই তাঁহার মনে ছিল, আর ঋক্‌বেদের কথা ছিল না, ঋক্ এই স্থলে ভ্রমবশতঃ অথর্ব্ব তাঁহার মুখে বাহির হইয়াছিল। তবে কি তিনি রামায়ণ লিখিয়া তাহার আদ্যোপান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক একবার দেখিয়াও ছিলেন না? একথাও কি তাঁহার মনে ছিল না যে, আমি কলির মানুষ হইয়া ত্রেতাযুগের রামের বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়াছি?

আমাদের মতে উপরোক্ত যুধিষ্ঠিরের জন্ম হওয়ার নির্দ্দিষ্ট কাল যেমন বিশুদ্ধ, অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত হওয়ার নিশ্চিত সময় তেমন বিশুদ্ধ নহে। প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে অথর্ব্ববেদের কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের ভ্রম হওয়ারই বিশেষ সম্ভব। কারণ কৃত্তিকার দ্রাঘিমাকে তাহার সংক্রমণ বিকলা দ্বারায় গুণ করিলে অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত হইয়াছে কত দিন হইল উপলব্ধ হওয়া কি প্রকারে সঙ্গত হয়? (১০)

যৎকালে অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত হয়, তৎকালে যেমন কৃত্তিকানক্ষত্র রাশিচক্রের প্রথমে এবং অশ্লেষার শেষে মঘার প্রথমে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, উক্ত ক্রান্তিপাত এখন রাশিচক্রের কোথায় কোন নক্ষত্রে হইযাছে এবং প্রতি বৎসর ঐ ক্রান্তিপাত কতবার হয় ও এ পর্য্যন্ত কতবার হইয়াছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট না হইলে কি রূপে ঐ গণনাকে আমরা বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি? "এক্ষণে বিষুব রেখা প্রতি বৎসর ৫০ সঞ্চরণ করিতেছে, এই রূপ নিশ্চিত হইয়াছে," ইত্যাদি বলিলেই চলিবে না। এক্ষণে প্রতি বৎসর ৫০ সঞ্চরণ করিতেছে এবং অথর্ব্ববেদের সময়ে এত সঞ্চরণ করিত ও সমুদায়ে এ পর্য্যন্ত এতবার সঞ্চরণ করিয়াছে, এই রূপ নির্দ্দিষ্ট থাকিলে বিগত বৎসর লাভ করা যাইতে পারে। উক্ত গণনা যে বিশুদ্ধ নহে, তাহা যুধিষ্ঠির আর পরীক্ষিতের গণনা দ্বারায়ই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়।(১১)

ক্রমশঃ।

(১০) এক্ষণে বিষুব রেখা প্রতি বৎসর ৫০ সঞ্চরণ করিতেছে এই রূপ নিশ্চিত হইয়াছে। হিন্দুগণনানুসারে উহা "৪৮ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি কৃত্তিকা নক্ষত্রের দ্রাঘিমা নিরূপিত করিয়া উক্ত সংক্রমণ বিকলা দ্বারায় গুণিত করিলে গুণফল বিগত বৎসর উপলব্ধি হইবে। ৪ ভাগ কল্পদ্রুমের ৮ সংখ্যার ৪৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।

(১১) আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড় দ্বিক পঞ্চ দ্বিক যুতঃ শকঃ কাল স্তস্য রাজ্যস্য।
আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু শতং পঞ্চ দশোত্তরং। ২১
সপ্তর্ষীনাঞ্চ পূর্ব্বৌ যৌ দৃশ্যতে উদিতৌ দিবি।
তয়োর্মধ্যেন্তু নক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমংনিশি।
তেনৈব ঋষয়ো যুক্তা স্তিষ্ঠন্ত্যব্দ শতং নৃণাং।
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুনা চাশ্রিতা মঘা। ২৭
ভাগবত ১২ স্কন্ধ ১ অধ্যায়।

দশম পরিচ্ছেদ।

সুখ-কণিকা।

এত ঘটনা ঘটিল, তবুও রজনী প্রভাত হইল না;—সুলোচনা এত বিপদের বোঝা মস্তকে বহন করিলেন, তবুও দুঃখের নিশি বিপদের চাকুরি পরিত্যাগ করিল না। ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া পৃথিবীর মনুষ্যকে ভুলান যায় সত্য, কিন্তু আজ প্রকৃতির প্রতিনিধি রজনী মায়ের চক্রান্তে ভুলিল কেন? কুলকামিনী ভাবিতেছেন,—"নিশি প্রভাত হয় না কেন? পাখী থাকিয়া থাকিয়া ডাকে,—ডাকে আবার নীরব হয়। কেন নীরব হয়? বোধ করি তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে—আজ আর নিশি পোহাইবে না! হায়, তবে সুলোচনাকে কি প্রকারে রাখিব? মা, আজ ঘুষ দিয়া নিশির সহিত বোধ করি কোন বন্দোবস্ত করেছে! অর্থের চক্রান্ত. কে জানে আজ কি হবে! পুলিস মায়ের বশ—উকীল মোক্তার সকলই মায়ের বশ! আমাদিগকে পাইবার জন্য পৃথিবী যেন ক্ষেপে উঠেছে। মানুষ কি পশু?" কমলমণি সুলোচনাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াই গৃহান্তরে গোলমাল শুনিয়া ব্যস্ততার সহিত তথায় গেলেন। সুলোচনা সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছেন,—হঠাৎ তাহার চক্ষে নিদ্রা বসিল। এই অবসরে কুলকামিনী এই প্রকার কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—"যত লোক আমাদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছে, সকলে যে নিঃস্বার্থ ভাবে খাটিতেছে, তা ত বোধ হয় না;—কারণ তাহারা আজ কোথায়? বিনোদ বাবু একমাত্র নিঃস্বার্থ ভাবে খাটিতেছেন;—সেই বিনোদ বাবুর বাড়ী হইতে আসিয়া ভাল করি নাই! ভাল করি নাই—তবে আবার ফিরিয়া যাই না কেন? রজনী প্রভাত হইলে আমরা একবার ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিব কি? চেষ্টা করিব কিন্তু ফল পাইব না—মায়ের হাত ছাড়াইতে পারিব না। পারিব না—চেষ্টাও করিব না। বিনোদবাবুদের ঘরে আবার আগুন জ্বালিবার জন্য ফিরিব? বিনোদ বাবুদের ঘরে আগুন জ্বালিতে সুলোচনা কখনই আর যাইবে না—সে মরিবে তবুও যাইবে না। তবে কি করিব! মায়ের হাত হইতে সুলোচনাকে কি প্রকারে রক্ষা করিব? সুলোচনা বলে, তাহার কাঁদিয়াই সুখ, কিন্তু আমি ত তার চক্ষে জল দেখিতে পারি না। সুলোচনার কষ্ট দেখিলে এ প্রাণ ছটফট্ করে। কি দারুণ জ্বালা! সুলোচনা প্রতারণার পথে হাটিবে না,—বিনোদ বাবুর উপদেশ যাহার কর্ণে একবার প্রবেশ করিয়াছে, সে প্রতারণা করিতে পারে না। আমি কলঙ্কিত পথে যাইব, তাহাও সুলোচনার সয় না, তবে কি করি? আর ত উপায় দেখি না! সুলোচনা নিদ্রায় অচেতন হয়েছে, হায়, বোন আজ সমস্ত রাত্রের মধ্যে আর ঘুমায় নাই; কি কষ্টেই আজ রাত্রি শেষ করিল! রাত্রি শেষ হয় নাই—হইবে যে, তাহাই বা কে জানে? সুলোচনার কি অপরূপ—ইচ্ছা হয় হৃদয়ের ভিতরে পুরে রাখি। এইরূপ দেখে

লোকগুলি যেন পাগল হয়েছে! হবে না কেন? আমিই ত পাগল হয়েছি। সুলোচনার জন্য কি করিতে না পারি?—পৃথিবীর সকল পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সুরোকে ছাড়িতে পারিনা! কি মোহ! আমি মজিয়াছি। বিধাতা আমাদিগকে মজাইয়াই মারিয়াছেন! বিচ্ছিন্ন হইতে পারি না, তাই আমরা রক্ষা পাইলাম না, নচেৎ দুইজনে দুই ভিন্ন পথে গেলে কেহই আমাদিগকে পাইত না। সুলোচনা আমাকে ছাড়িতে চায় না, আমিও ছাড়িতে পারি না। আর সব পারি, এই একটী কাজ পারি না—সুলোচনাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আমার এক মাত্র সুখ সুলোচনা। আমার প্রাণ উহার প্রাণের ভিতরে! কি অপরূপ!" কুলকামিনী এই বলিয়া সুলোচনার মুখচুম্বন করিলেন। সুলোচনা কুলকামিনীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কি সুখে নিদ্রা যাইতেছে! এমন আরাম স্থান আর নাই। কুলকামিনীই যেন সুলোচনার মাতা, পিতা, ভাই ভগ্নী সকলই। সেইমাতা পিতা, ভাইবোন আজ সুলোচনার সুধাবিনিন্দিত মুখচুম্বন করিল। সুলোচনা সে ক্ষণিক সুখ যেন অনুভব করিল—অজ্ঞানে স্বপ্নে দিদির রূপ দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি কুলকামিনী দেখিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত যে মুখে হাসি ফোটে নাই, কুলকামিনী সেই মুখে হাসি দেখিয়া প্রফুল্ল হইলেন, হাসিলেন,—কুলকামিনীর হৃদ্-দর্পণে ঐ প্রফুল্লানন প্রতিবিম্বিত হইল। কি সুখের চিত্র! সুখের চিত্র অধিকক্ষণ থাকে না,—অধিকক্ষণ রহিল না। রজনী প্রভাত হইয়া আসিল, পাখী কলরব করিয়া উঠিল, এবার আর থামিল না। এই সময়ে বাড়ীর ভিতরে মহা কলরব উঠিল। মার, মার, কাট এই শব্দ প্রাঙ্গণ ভেদ করিয়া আকাশে উঠিল। সুলোচনা শব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন, কুলকামিনীও অস্থির হইলেন। গৃহান্তরে প্রহারের শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। কমলমণির চিৎকার সুলোচনা ও কুলকামিনীর প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাহারা উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া সেই দিকে চলিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আলোক পথে।

সুলোচনা ও কুলকামিনী যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে সুলোচনা ও কুলকামিনী উভয়ের হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল। দেখিলেন—কমলমণিকে ধরিয়া কয়েকজন পাষণ্ড প্রহার করিতেছে। সুলোচনা ও কুলকামিনী জননীর ক্রন্দনে এত অধীর হইলেন যে, উভয়ে উভয়ের বর্ত্তমান বিপদের কথা ভুলিয়া গিয়া জননীর স্বরে স্বর মিলাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কেবল কাঁদিয়াই নিরস্ত হইলেন না, যাহারা কমলমণিকে প্রহার করিতেছিল, তাহাদিগের পা ধরিয়া সুলোচনা বলিতে লাগিলেন;—তোমাদের পায়ে পড়ি মাকে ছেড়ে দেও, আর মারিও না; মায়ের চক্ষে জল দেখ্‌লে আমার প্রাণ অস্থির হয়।

একজন বলিল,—তোদের জন্যই ত এই প্রহার। টাকা দিয়াছি তবুও মন পাই নাই, মন পাই নাই—তোদিগকে পাই নাই। আমাদের সকল আয়োজন নষ্ট হইবার উপক্রম হইল। তোদের মায়ের সকল চক্রান্ত বুঝিয়াছি।

এই বলিয়া আবার প্রহার করিতে লাগিল।

সুলোচনা কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে

পারিলেন না, বলিলেন, কাহাকে টাকা দিয়াছ?

লোক উত্তর করিল—তোর মাকে দিয়াছি।

সুলোচনা—কেন টাকা দিয়াছ?

লোক—তোকে পাইবার জন্য।

সুলোচনা এতক্ষণে সকল কথা উত্তম রূপে বুঝিলেন। বলিলেন,—তবে মাকে মারিতেছ কেন?

লোক,—সমস্ত রাত্রি গেল তবুও তো-দিগকে আমাদের হাতে দিল না।

সুলোচনা বুঝিলেন, আমাদের জন্যই মাতার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত। আবার বলি-লেন, মা ত আমাদিগকে সঁপে দিতে বিশেষ চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমরাই মাকে বাধা দিয়াছি; আমরাই দোষী, মাকে ছেড়ে দিয়া আমাদিগকে মার না কেন?

লোক,—মারিব। সে জন্য চিন্তা নাই, তো-কেও মারিব। একবার যখন তোকে হাতে পাইয়াছিলাম, তখনই মারিতাম, কিন্তু এই সর্ব্বনাশী মারিবার পূর্ব্বেই ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল, নচেৎ তখনই মারিতাম।

সুলোচনা—প্রথমেই আমাকে মারিতে কর নাই কেন?

লোক—প্রথম মনে ভেবেছিলাম, অনায়া-সেই তোর মন পাইব, কিন্তু তাহা হইল না।

সুলোচনা—যখন তা হইল না, তখন মারিলে না কেন?

লোক,—তখন বুঝিলাম তোর মন অটল, প্রহারে কিছুই হইবে না;—প্রলো-ভনে তোকে ভুলাইতে পারিব, আশা ছিল।

সুলোচনা,—প্রলোভনে কি লোক ভোলে?

লোক,—কেবল লোক কেন?—স্বর্গের দেবতারাও ভোলেন।

সুলোচনা,—তবে প্রলোভনের পথ ছাড়িয়া আবার মারিবে কেন?

লোক,—যদি তাতেও আশা পূর্ণ না হয়, এই পথই ধরিব। মারিব—তোদের মানব জন্মের সাধ একেবারে ঘুচাইয়া দিব।

সুলোচনার চিত্ত প্রফুল্ল হইল, বলিলেন, তবে মাকে ছাড়, আমাকে ধর, প্রলোভন দেখ'ও—তারপর মারিয়া ফেল। মরিয়া স্বর্গে যাই। মায়ের কান্না আমাকে আর যেন শুনিতে না হয়।

সুলোচনার মুখে এইকথা শুনিয়াই পাষণ্ডেরা কমলমণিকে ছাড়িয়া সুলোচনাকে ধরিল। সুলোচনার সরল কথা গুলি কুলকামিনীর প্রাণে বাজিতেছিল। কুলকামিনী বুঝিলেন, সুলোচনা মরিবার উৎকৃষ্টপথ পাইয়াছে। বুঝি-লেন,—সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মরিবে, থাকিবে না। বুঝিলেন, সুলোচনা প্রলোভনে ভুলিবে না। যখন ভুলিবেনা, তখনই প্রহার, সেই প্রহারেই মৃত্যু। কুলকামিনীর অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, নির্ভয়ে গম্ভীর স্বরে সুলোচনাকে বলিলেন, "সুলোচনা?"

সে স্বর শুনিয়া সুলোচনা শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—কি দিদি?

কুলকামিনী বলিলেন, এই কি পথ?

সুলোচনা—এই পথ! মায়ের কষ্টও দেখিব না, তোমার চক্ষের জলও দেখিব না।

কুলকামিনী—আমার মমতা ছিড়িবে?

সুলোচনা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিলেন, দুই চক্ষু দিয়া কয়েক বিন্দু জল মাটিতে পড়িল। তারপর বলিলেন, মমতা ছিড়িব, আবার ঐ স্বর্গে মিলিব! স্বপ্নে দেখেছি—মৃত্যুই আমার জীবন। মা আমাকে ডেকেছেন, আর থাকিব না।

কুলকামিনী আরো বিস্মিত হইলেন,

বলিলেন, কখন স্বপ্ন দেখেছ? স্বপ্নে কি দেখেছ?

সুলোচনা ধীরে ধীরে বলিলেন, যখন তোমার কোলে শুয়েছিলাম, তখনই স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম, আমি যেন অকূল সাগরে ভাসিতেছি—চতুর্দ্দিক আঁধার আঁধার—কূল নাই, কিনারা নাই। সেই সময়ে সেই স্থানে বিনোদ বাবু যেন এক খানি ভেলায় চড়িয়া আমার নিকটে আসিলেন। আসিয়া বলিলেন,—সুলোচনা, এই ভেলা ধর, রক্ষা পাইবে। স্বর শুনিলাম, অমনি চাহিয়া দেখিলাম। দিদি, কি বলিব, বলিতে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বিনোদবাবুর কথা শুনিয়া সেই ভেলা ধরিতে প্রস্তুত হইয়া হাত বাড়াইলাম। কিন্তু ভেলা পাইলাম না, বিনোদ বাবুকেও পাইলাম না। অদৃশ্য পথ হইতে আবার বিনোদ বাবুর স্বর শুনিলাম—"সুলোচনা, ভেলা ধর, ভেলা ধর, চাহিয়া দেখ" চাহিয়া দেখিলাম—এক আশ্চর্য্য দৃশ্য—চতুর্দ্দিক আলোকময়। সে আলোকের সীমা নাই—অনন্ত বিস্তৃত—মধুর-মধুর, কিন্তু বর্ণনা করিতে পারি না, কি রূপ দেখিলাম। দেখিলাম, সেই আলোকের মধ্যে হইতে এক দয়ার হস্ত প্রসারিত হইয়া আমাকে ধরিল। আমি ধরা পড়িলাম। বিনোদ বাবুর স্বর তখনও কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, আমিও সেই হস্তকে ধরিলাম। এই পর্য্যন্ত দেখিতে দেখিতেই কোলাহল কাণে গেল, আমি চকিত হইয়া উঠিলাম। দিদি, আমার আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই,—ঐ হাত ধরিয়া ঐ আলোকের ভিতর যাইতে বড়ই সাধ হয়েছে। তোমার সহিত কথা বলিতে বলিতে আবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই হাত যেন পুনঃ আমাকে ডাকিতেছে। ঐ আলোক দেখিয়া ঐ হস্তের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে চলিব, মায়া মোহ আর বুঝি না।

কুলকামিনী সকল শুনিয়া অবাক হইলেন। কমলমণিও অন্যান্য সকলেই অবাক হইল। ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া কুলকামিনী আবার বলিলেন "আমাকেও নিয়ে চল, আমিও যাইব।" তোমাকে ছেড়ে থাকৃব না।"

সুলোচনা বলিলেন—পূর্ব্বে যখন মরিবার কথা বলেছিলেম, তখন তুমি কত কথা বলেছিলে। এখন সত্যই কি মরিবে? পৃথিবীর সব সুখের আশা ছিড়িতে পারিবে?

কুলকামিনী একটু ভাবিয়া বলিলেন—সব ছিড়িতে পারিব।

সুলোচনা।—আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে?

কুলকামিনী।—তা পারিব না বলিয়াই মরিয়া তোমার সঙ্গে যাইব।

সুলোচনা।—সে ইচ্ছা করিও না, তাহা পূর্ণ হইবে না। সেই আলোকের মধ্যে আর কিছুই নাই, আর কিছুই দেখিলাম না। সেই হস্ত আর আমি একাকিনী। বুঝিলাম দয়ার সাগরে আমিও একাকিনী, তুমিও একাকিনী, সকলেই একাকী। কাহারও সহিত কাহারও দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। এক জনকে মাত্র পাইবে, আর কিছুই না। আমাকেও পাইবে না। তবে মরিবে কি?

কুলকামিনী বলিলেন, মরা বাঁচা বুঝি না, তোমাকে ছাড়িতে পারিব না।

সুলোচনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—দিদি, এত দিনে আমাকে তুমি হারাইলে। বাঁচ আর মর, আমাকে আর তোমরা পাইবে না। আমি আজ হইতে পৃথিবীতে একাকিনী, স্বর্গে একাকিনী। মায়ামোহতে

আর আমাকে পাইবে না। আমি সংসারে মরিব।

সুলোচনার কথা শেষ হইল। তখন রজনী প্রভাত হইয়াছে;—সূর্য্যের আলোকে পৃথিবী জাগিয়া উঠিয়াছে, বায়ু কাঁপিতে কাঁপিতে নাতিমন্দ গতিতে বহিতেছে, এমন সময়ে সেই অপরিচিত লোকেরা সুলোচনার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। কুলকামিনী ও কমল-মণি অবাক হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

রূপের কথা।

রূপ কি?—গুণের শরীর। বাহ্যরূপে অন্তরের গুণ ফুটিয়া থাকে। চেহারা দেখিয়া বুঝা যায়, লোকটা পাতলা কি চিন্তাশীল, সুরসিক কি শুষ্কং কাষ্ঠং, দয়ালু কি নিষ্ঠুর, ধার্ম্মিক কি পাপাচারী। তবে অনেক সময়ে যে মুখের চেহারায় সু বা কু অভিসন্ধি ধরা যায় না, তাহার অর্থ মনের গোপন করিবার ক্ষমতা। বুঝিতে না পারিতে পারি যে লোকটার কি অভিসন্ধি, কিন্তু সে কুপ্রকৃতিক হইলে, চেহারা দেখিয়া অন্ততঃ বুঝিতে পারি যে এ বড় ভালমানুষ নয়। এই লইয়াই Physiognomy। দুই এক স্থানে কথাটা মেলে না; অথবা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মিলাইতে পারি না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে চলিতে গেলে অমিল বিষয় গুলিকে মিলাইতে চেষ্টা করিতে হইবে, সত্যকে উড়াইয়া দেওয়া বড় অবৈজ্ঞানিক কার্য্য। ডানকান অন্ধ; তাই বলিয়াছিলেন-(There is no art to find the mind's construction in the face)সুধু ডানকান কেন,জগতে অন্ধের সংখ্যাই অধিক। সে কথায় এখন কাজ নাই। মানুষে মানুষে যোগ, গুণে হয়; রূপোন্মাদ কেহ নয়। সকল শিশুই সরল, সংসারিকতার ধুলা কোন শিশুরই প্রাণে লাগে নাই, সেই জন্যে সকল শিশুই সুন্দর। চারি চক্ষুর মিলন অমনি প্রণয় সঞ্চার, এ রূপোন্মত্ততা নহে। বাহ্যরূপে গুণ ফুটিয়া থাকে; তাই যে যেমন গুণের পক্ষপাতী দর্শন মাত্র সেই গুণের সহিত আত্মগুণ ভাব দ্বারা যোগ করে। কাব্যামোদী, একটু চঞ্চল, সুরসিক, বিরহ কাতর যক্ষের প্রাণ পুত্তলী "তন্বী শ্যামা শিখরী-দশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী; মধ্যেক্ষামা চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা; শ্রোণীভারাদলসগমনা।" আবার সাগর তুল্য গম্ভীর, শরদাকাশ তুল্য পবিত্র, রামের পার্শ্বে, নবোদিত তপনতুল্য প্রভাময়ী, শিশির ধৌত ফুল্লকুসুমতুল্য হাস্যময়ী সীতা। সরলতার কোলে সরলতা ঢলিয়া পড়ে, শ্বেত কৃষ্ণ বোঝে না; এই জন্যেই ওথেলো এবং দেস্‌দিমনা। আবার অন্য দিকে দেখ, অভিলাষবতী ক্লিওপেত্রার হৃদয়, লালসাময় এণ্টনির হৃদয়ে যুক্ত, ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র দুষ্মন্তের প্রাণ শকুন্তলার জন্যে তখনই অত্যন্ত লালায়িত হইল, যখন প্রিয়ম্বদা বলিল "এত্থ পয়োহর বিত্থার ইত্তয়ং অওণো জোব্বণং উবালহ," তখন শকুন্তলা সরস হাসি হাসিল; তাই অনুরাগের এত প্রাবল্য। সকলেই গুণোন্মাদ, রূপোন্মাদ আবার কি? যে যেমন সে সেই প্রকার গুণের পক্ষপাতী।

এণ্টনী ক্লিওপেত্রাও পরস্পরের "চক্ষুতে" এবং "ওষ্ঠাধরে" "eternity" দেখিত; রাধা শ্যামের পবিত্র প্রণয়েও শুনিয়াছি যে, "লাখ লাখ যুগ" বুকে বুক রাখিয়া পরিতৃপ্তি আসিল না। মানি যে, এক স্থলে অন্তর্দ্দাহকারী ভীষণ নরকাগ্নি প্রজ্জ্বলিত, আর এক স্থানে পবিত্র, শান্ত, উৎসাহময় বসন্তসমীরণ প্রবাহিত; কিন্তু সে ত স্বতন্ত্র কথা, আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, রূপোন্মত্ত কেহ নয়, সকলই অনুরূপ গুণের পক্ষপাতী, অনুরূপ গুণের ভিখারী। অননুরূপ গুণে গুণে যোগ হয় না, যদি কখনও ভ্রমে হয় ত আবার ধরাপড়ে; আবার যোগস্খলিত হয়। বিলাতে ডাইভোর্স আছে ভিতরে বাহিরে মিল রাখিবার চেষ্টা আছে; কিন্তু এদেশে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়, অথবা কোনও রূপে ঘসিয়া মাজিয়া লইতে হয়। পদ্ধতি কোনটা ভাল বলিব না। যাহা বলিতেছিলাম; বাহিরে যদি অননুরূপ গুণের শরীর বা রূপ দেখে তবে কেহ তাহার পার্শ্বেও যায় না। গম্ভীরলোক পার্শ্বে আসিলে বাচাল ভাবে কি আপদ! তাই দেখ শাস্ত্রে বলে যে সতীর মুখে চোখে এমন আগুণ আছে যে, দুষ্প্রবৃত্তি লইয়া কেহ গেলে সেখানে পুড়িয়া মরে। বুঝিতেছেন কথাটা কেন সত্য?

আবার আর একদিকে দেখ ভিতরে স্নেহ এবং বিনয় তাই কথা মিষ্ট? সহস্র দাঁত খিচাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়াও সে মিষ্টতার ভান চলে না। ভিতরে চরিত্র তাই বাহিরের কথা পবিত্র। চিন্তাশীল পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ভাব বা চরিত্রের সম্মুখবর্ত্তী কথা গুলিকে পারস্পেক্টিবের ছবি বলিয়া বর্ণনা করেন: ভাবটী বড় সুন্দর—ভাব না থাকিলে কথা গুলা সুধু হিজি বিজি দাগ; যতদূর চরিত্রের ছায়া, ততটুকু কথার স্ফুটভাব। সর্ব্বত্রই দেখিবে রূপ গুণের বহিপ্রকাশ মাত্র (manifestation)। সর্ব্বত্রই গুণ আমাদের চোকে ঠেকে। ভাষাবিজ্ঞানও ইহার সাক্ষী। বিশেষণ দেখিয়া বিশেষ্য। গুণ হইতে অর্থাৎ চলন, চরিত্র, রব, বর্ণ প্রভৃতি হইতে পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে।

এবার মানবজাতির দিকে তাকাই। অসভ্যেরা নির্গুণ তাই তাহারা কুৎসিৎ, যত গুণী তত সুন্দর। অনেক সুন্দর পুরুষ লাল কুমড়ো আছেন, তবুও বলিতে হইবে যে তাহার পিতৃপুরুষ ভাল ছিল বলিয়া সে কিছু সুন্দর রূপ পাইয়াছে, সব পায় নাই; কারণ সুধু সুগঠন ত রূপ নয়। যাক্ ঐ দেখ পশ্চিম বাঙ্গলার জলবায়ু ভাল, চেহারা ভাল, বুদ্ধিও ভাল; কথাটা পূর্ব্ব বাঙ্গলার তুলনায় হইল; কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন না। যাহাদের চেহারা ভাল তাহাদেরই গুণ ভাল, এই জন্যে Survival of the fittest মতে রূপের জয় হয়, আসল কথাটা গুণেরই জয়। সুন্দর আর্য্য কর্ত্তৃক কৃষ্ণ অসুর হিমালয়ে ও জঙ্গলে তাড়িত হইয়াছিল। এখন আবার আমরা কিছু কালো হইয়া পড়িয়াছি অর্থাৎ নির্গুণ হইয়া পড়িয়াছি; তাই শ্বেত মূর্ত্তি সকল জাহাজ ভরিয়া আসিতেছে। তবুও নাকি আমরা এখনও সুন্দর অর্থাৎ আর্য্য পিতৃগণের গুণাধিকারী; তাই ধ্বংশ পাই নাই। এখনও আমরা একটা জাতি। ভবিষ্যতে ভাল হইব আশাও আছে। আশা আছে যদি রূপ ভাল হয়। একথা শুনিয়া পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কি শাবান মাথার বন্দোবস্ত করিবেন ভাবিতেছেন? কিন্তু রাধাবাজারটা নিঃশেষ করিলেও কিছু হইবে না। আগেই

বলিয়াছি রূপ গুণের শরীর, গুণ ভাল কর ধর্ম্মচিন্তা কর, রূপভাল হইবে। কেহ কেহ হয়ত বলিতেছেন, ইঃ, কি পাদরীসাহেব! কিন্তু একথা ঠিক কথা। যাঁহারা রূপবান্ বা রূপবতী কওলাইতে গিয়া ঝামা হইতে পাউডার পর্য্যন্ত কিছুই অব্যবহৃত রাখেন না, সেই ভ্রান্ত জীবদিগের উদ্ধারের জন্য আমি বাঙ্গলায় নূতন অবতীর্ণ। হে জীবগণ, অনুশাসন গ্রহণ কর।

জাতীয়একতা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

একজাতীয় লোকের মধ্যে সাধারণতঃ যে যে লক্ষণ দেখা যায়, ভারতবর্ষে তাহা কত দূর আছে, এবারে আমরা তাহারাই আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ভারতবর্ষের অধিকাংশই এক রাজনৈতিক শাসনের অধীন। ভারতবাসী প্রায় সকল-জাতিই ইংরেজের রাজ্যে বাস করিতেছে। ইংলণ্ড আমাদের রাজা; ভারতের শাসন-কর্ত্তা সেই ইংলণ্ডের প্রতিনিধি স্বরূপ শাসন কার্য্য চালাইতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে ও প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন এক এক জন স্থানীয় শাসনকর্ত্তা আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সেই রাজ প্রতিনিধির সহকারী স্বরূপে ইংলণ্ডের হইয়াই দেশের শাসন কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সাধারণতঃ বিধি ব্যবস্থা, শাসন প্রথা সর্ব্বত্রই এক প্রকারের; বৃটিস শাসনভুক্ত সমস্ত ভারতবাসীর রাজনৈতিক অভাব এক রূপ; এক ট্যাক্সের জ্বালায় সকলেই জ্বালাতন; বৈদেশিক শাসনের অবশ্যম্ভাবী কষ্ট সকল প্রদেশেই এক প্রকার; বৃটিস ভারতের সকল অধিবাসীর রাজনৈতিক উন্নতির আশা এক রূপ। এই জন্য এই সকল লোকের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কোন কোন কূটরাজনীতিব্যবসায়ী কর্ম্মচারী যেরূপ মতলবে চলেন তাহাতে স্থলবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় লোকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ভাবের সঞ্চার হয় বটে, তথাপি মোটের উপর দেখিতে গেলে ভারতবাসী বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহানুভূতি ক্রমে ঘনিষ্টতর হইয়া আসিতেছে, এবং কালে যে আরও ঘনিষ্টতর হইবে এরূপ আশা করা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু করদ ও মিত্র রাজ্যের অধিবাসীদের সহিত এ রূপ সহানুভূতি হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তবে কালে সমস্ত বৃটিস ভারতের অধিবাসীগণ যদি এক জাতিতে পরিণত হয় তাহা হইলে সেই বিংশতি কোটি লোক অবশিষ্ট পাঁচ কোটি লোককে আপনাদের দলে টানিয়া লইতে পারিবে, এমত আশা করা যাইতে পারে।

সমস্ত ভারতবাসী এক জাতিতে পরিণত হইবার পক্ষে কেবল এই এক মাত্র

কারণ বর্ত্তমান আছে। অন্যান্য জাতীয় লক্ষণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কোন বিষয়েই ভারতবাসীর মধ্যে একতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রথমতঃ ভারতের সকল লোক এক বংশোদ্ভব নহে। এক মৌলিক জাতি হইতে সকলের জন্ম হয় নাই। ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু সেই হিন্দুগণও সকলে এক বংশোদ্ভব নহে। আর্য্যাবর্ত্ত, উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রের হিন্দুগণের জন্ম আর্য্য-শোণিতে; দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণের জন্ম অন্য জাতি হইতে। উভয়ের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক কোনও সংশ্রব নাই। কেবল এই উভয়ের মধ্যে কেন, কি আর্য্যাবর্ত্তে, কি দাক্ষিণাত্যে, একপ্রদেশের লোকের সহিত অন্য প্রদেশের লোকের কোনরূপ সামাজিক সম্বন্ধ নাই; একে অপরের অন্ন গ্রহণ পর্য্যন্ত করে না। তবে ধর্ম্মের একত্ব হেতু ইহাদের পরস্পরের সম্মিলন হইবার সম্ভাবনা আছে।

ভারতবর্ষে যে সকল মুসলমান আছেন তাঁহাদের কতক আর্য্যবংশ সমুদ্ভূত; তাঁহাদের কোনও পূর্ব্বপুরুষ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে তাঁহারা মুসলমান হইয়াছেন। আর কতক ভারতবিজয়ী পাঠান বা মোগলগণের বংশ হইতে উৎপন্ন। এতদুভয়ের মধ্যে একধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিশেষ সহানুভূতি আছে। কিন্তু হিন্দু সন্তানগণের সহিত ইহাদের সহানুভূতি অতি অল্পই। মুসলমানেরা এককালে হিন্দুদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহাদের আচার ব্যবহার হিন্দুদের চিরপোষিত সংস্কারের বিরোধী বলিয়াই হউক, হিন্দুগণ অনেক দিন হইতে মুসলমানদিগকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন। মুসলমানগণও বিজিতজাতি ও পৌত্তলিক বলিয়া হিন্দুদিগকে ঘৃণারচক্ষে দেখিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির সম্ভাবনা অতি অল্পই। যদি অধিকাংশ মুসলমান সম্রাট আকবরের ন্যায় উদারনীতির পক্ষপাতী হইতেন, তাহা হইলে ক্রমে এই ঘৃণার ভাবের অনেকটা হ্রাস হইত বটে, কিন্তু তাঁহার পর আর সেরূপ কোনও সম্রাট ভারতের সিংহাসন সুশোভিত করেন নাই। আকবর হিন্দুদিগের প্রতি যে সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আরঙ্গেব সুদ শুদ্ধ তাহার প্রতিশোধ লইলেন; সুতরাং হিন্দু মুসলমানে মিলন হইবার যে সম্ভাবনা ছিল তাহা একেবারে-তিরোহিত হইল। আজি সাত আট শতাব্দী ধরিয়া উভয় পক্ষে যে বিরাগ পোষিত হইয়া আসিতেছে, তাহা যে সহজে বিদূরিত হইবে এরূপ আশা করা যায় না; তাহার কোনও লক্ষণও দৃষ্টিগোচর হয় না। সুশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে অল্প অল্প সহানুভূতির সঞ্চার হইতেছে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে সে ভাব কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও বিষম অন্তরায়। মুসলমানগণ কখনও হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন না, করিলেও হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। কোনও হিন্দুও যে ভবিষ্যতে আর মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তাহার সম্ভাবনা দেখা যায় না। আবার সাধারণ মুসলমানদিগের একটী বিশ্বাস আছে যে, ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসিবে যখন মুসলমানদিগের ক্ষমতা পুনরায় জগতে বিস্তৃত হইবে। তাঁহাদের আশা আছে

আবার এক দিন তাঁহারা ভারতে রাজত্ব করিবেন; হিন্দুগণ তখন আবার তাঁহাদের পদানত হইবে। উভয় পক্ষের এইরূপ নানা-কুসংস্কার নিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে সম্মিলনের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির কাহারও বিরুদ্ধে কোনও কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে; বাস্তবিক ঘটনা যাহা, দেশের প্রকৃত অবস্থা যাহা তাহাই চিত্রিত করা আমার এক মাত্র উদ্দেশ্য। ভারতের প্রকৃত উন্নতির জন্য হিন্দু ও মুসলমানে সদ্ভাব হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। উভয় জাতিরই এখন একদশা, উভয়েই পরপদানত। এখন আর পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ভাল দেখায় না। এখন যাহাতে উভয় জাতিই এক ভারতের সন্তান বলিয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া দেশের উন্নতি করিতে পারেন, সর্ব্বতোবিধায়ে তাহার চেষ্টা করা উচিত। ভারতবর্ষ এখন হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই স্বদেশ; সুতরাং এই উভয় জাতিরই সমবেত চেষ্টা ভিন্ন কখনই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে না। কেবল তাহাই নহে, ভারতের প্রকৃত উন্নতির নিমিত্ত যে একটী ভারতীয় জাতির প্রয়োজন, তাহার জন্য হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে সম্পূর্ণ ভাবে মিশ্রিত ও এক হইয়া যাইতে হইবে। নতুবা ভারতে জাতীয় একতার আশা করা বৃথা।

ভারতের স্থানে স্থানে যে সকল অসভ্য-জাতি বাস করে, তাহারাও আর্য্যজাতীয় নহে। তাহাদের মধ্যে জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তারও কিছু মাত্র হয় নাই। তাহারা রাজনীতির কোনও ধার ধারে না। অল্প কয়েক বৎসর মাত্র হইল কেবল সাঁওতালদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও ইয়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক অল্প অল্প প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সমস্ত অসভ্যজাতির সহিত সাধারণ ভারতবাসীর মিলনের সম্ভাবনা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের মধ্যে শিক্ষার জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া তাহাদের মানসিক অন্ধকার বিদূরিত করত কতক পরিমাণে তাহাদিগকে আমাদের সমকক্ষ করিয়া লইতে পারিলে, তাহাদের সহিত আমাদের রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে সহানুভূতি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের সে ক্ষমতা কোথায়? সে উৎসাহ কোথায়? অনেকে হয় ত বলিবেন, "আমরা আপনাদের জ্বালায় আপনারা ব্যস্ত; আমাদিগকে দেখে কে তাহার ঠিকানা নাই, আমরা আবার কি না অসভ্যজাতিকে সুসভ্য করিতে যাইব! ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও খ্রীষ্টানপাদরিগণ যদি এ সম্বন্ধে কিছু করেন, তবেই যা হউক; নতুবা আমাদের দ্বারা কিছু হইবে না।" বাস্তবিক আমাদের যে অবস্থা তাহাতে আপাততঃ এ সম্বন্ধে আমাদের দ্বারা কিছু কার্য্য হইবার আশা করা বৃথা। কিন্তু সমস্ত ভারতে জাতীয় একতা স্থাপিত হইতে হইলে কালে যে, এই অসভ্য জাতিদিগকে উন্নত করিয়া দলে টানিয়া লইতে হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আর্য্যদিগের ভারত-বিজয় কালে এই অসভ্যদিগের প্রতি বিজিত জাতি বলিয়া তাঁহাদের যে ঘৃণার ভাবছিল, বর্ত্তমান আর্য্য সন্তানগণ সে ঘৃণার ভাব বিস্মৃত হইয়াছেন। তবে এক্ষণে অসভ্য বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে যে ঔদাসীন্য আছে, তাহারা উন্নত ও সভ্য হইলে তাহা দূর হইয়া যাওয়া নিতান্ত আশাতীত বলিয়া বোধ হয় না। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীগণের প্রতি প্রাচীন

আর্য্যগণের ব্যবহার স্মরণ করিলে এ সম্বন্ধে অনেকটা আশা হয়।

পূর্ব্বে যে সকল বিভিন্ন শ্রেণীর কথা বলা হইল, তদ্ব্যতীত ভারতে ফিরিঙ্গী নামে একটী নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইয়ুরোপীয়গণ যে দেশে পদার্পণ করেন, সেই খানেই এইরূপ একটী মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশেও তাহা হইয়াছে। এই ফিরিঙ্গীদের সহিত ভারতবাসীর সম্মিলনের আশা আপাততঃ অতি অল্প। ইঁহারা মনে মনে আপনাদিগকে বিজেতৃজাতীয় বলিয়া অভিমান করেন! ভারতকে স্বদেশ বলিয়া মনে করিতে ইঁহাদের লজ্জা হয়! ইংলণ্ড ইঁহাদের হোম্! এক দিকে বিশুদ্ধ ইংরাজগণ ইঁহাদিগকে স্বজাতীয় বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন; অপরদিকে ইঁহারা ঘৃণা করেন বলিয়া দেশীয়গণও ইঁহাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতে পারেন না। ভারতের রাজনৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে ইঁহারা যদি দেশীয়দের সহিত এক যোগে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে এক দিন তাঁহাদের সহিত ভারতবাসীর সহানুভূতির আশা করা যাইতে পারিত; কিন্তু সে বিষয়ে ফিরিঙ্গীগণ সম্পূর্ণ উদাসীন। বরং স্থলবিশেষে তাঁহারা দেশীয়দের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিলে ছাড়েন না। তাঁহারা দেশীয়দিগকে যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, বিশুদ্ধ ইংরেজগণও সেরূপ করেন না। তবে কেমন করিয়া তাঁহাদের সহিত ভারতবাসীর মিল হইবে? কিন্তু ভারতে যদি কখনও জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে সেই স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া না দিলে তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। সমুদ্রে পাদ্যর্ঘবৎ, নিশ্চয়ই এক দিন তাঁহাদিগকে ভারতবাসীর সহিত মিশিয়া ভারতীয় বলিয়া আত্ম পরিচয় দিতে হইবে। নতুবা এ দেশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইতে হইবে।

ভারতের জাতীয় একতার আর একটী প্রধান অন্তরায় ভাষার বিভিন্নতা। এ দেশে বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দ্দু, তামিল প্রভৃতি নানা ভাষা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক জাতির মধ্যে এক ভাষার যে নিতান্ত প্রয়োজন, পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাহা দেখাইবার কতক চেষ্টা করা গিয়াছে। যত দিন সমস্ত ভারতের মাতৃভাষা এক না হইবে, তত দিন আমরা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারিব না;—তত দিন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীগণ পরস্পরকে ততটা আপনার লোক বলিয়া অনুভব করিতে পারিবেন না। আপাততঃ ইংরেজী ভাষা অনেক পরিমাণে সাধারণ ভাষার কার্য্য করিতেছে, এবং ইংরেজী ভাষা যেরূপ উন্নত ও তেজস্বী তাহাতে উহা মাতৃ ভাষা হইলে আমাদের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই; কিন্তু সাধারণ লোকে যে ইংরেজীকে কোনও কালে মাতৃ ভাষা রূপে গ্রহণ করিবে এরূপ আশা করা বৃথা। আর প্রাচীন আর্য্যগণ যেরূপ উন্নত ও সুমিষ্ট ভাষার অধিকারীছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের সন্ততিগণ যে সহজে ভিন্ন দেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তাহা কোনও মতে সম্ভব বোধ হয় না। অপরদিকে সংস্কৃত ভাষা যে পুনরায় কখনও ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে, তাহাও আশা করা যায় না। কোন মৃত ভাষা কখনও পুনরুজ্জীবিত হয় নাই। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। তবে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এক মূলজাত বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা সকল যেমন কালে এক হইয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষেও সেই রূপ বাঙ্গালা, উড়িয়া, হিন্দী, গুজরাটী, মহারা-

ষ্ট্রীয় প্রভৃতি সংস্কৃতমূলজ বিভিন্ন ভাষা কালে মিশ্রিত হইয়া জাতীয় একটী নূতন ভাষার সৃষ্টি করিতে পারে; এবং উর্দ্দু, তামিল প্রভৃতি বিভিন্নমূলজাত ভাষা তাহার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া তাহার পরিপুষ্টি সাধনে সহায়তা করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আশা করেন, এই বাঙ্গালা ভাষাই কালে অন্যান্য ভাষার সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়া এই উন্নত আসন অধিকার করিবে। ধর্ম্ম ভাষা-বিস্তারের একটী প্রধান উপায় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, এবং একেশ্বরবাদ ভারতের জাতীয় ধর্ম্ম হইবে বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, বঙ্গদেশে একেশ্বরবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথমে প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহারা আশা করেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম বঙ্গভাষার বিস্তারের পক্ষে সহায়তা করিবে। আবার এ দেশের অধিকাংশ লোক হিন্দী বুঝিতে পারে এবং হিন্দীভাষীর সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া কাহারও কাহারও সংস্কার যে হিন্দীই কালে ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে। কাহারও কাহারও বিবেচনায় ভারতের সমস্ত বিভিন্ন ভাষা মিশ্রিত হইয়া একটী সাধারণ ভাষা সৃষ্ট হইবে। এরূপ একটী মিশ্র ভাষায় বাঙ্গলা, হিন্দী, অথবা অপর কোনও ভারতীয় ভাষার প্রাধান্য থাকিবে। কারণ, সংস্কৃত মূলজ সকল ভাষারই শব্দ শাস্ত্র এক; কেবল প্রত্যয়, ক্রিয়ার গঠন প্রভৃতিতেই বিশেষ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ স্থলে যে মিশ্র ভাষার কথা বলা হইল, তাহাতে সকল ভাষারই সমান প্রধান্য থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, সংস্কৃত-জাত ভাষা সকল কালে একীভূত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এবং সেই নূতন ভাষাতে বাঙ্গালা বা হিন্দীর প্রধান্য থাকাও সম্ভব। রেলওয়ে সকল স্থাপিত হওয়া অবধি ভারতবাসীদের পরস্পরের সহিত একত্রিত হইবার সুবিধা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সুতরাং রেলওয়ে দ্বারাও ভাষার একীকরণ সম্বন্ধে অনেকটা সাহায্য হইবার সম্ভাবনা।

রাজার সাহায্য ভাষার একীকরণ সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক; কিন্তু আমাদের দেশে তাহার সম্পূর্ণ অভাব। নানা কারণে রাজকীয় ভাষা অতি সহজে দেশের সকল স্থলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। রাজভাষা যদি সম্পূর্ণ বিদেশীয় হয়, তাহা হইলে তাহা স্থায়ী প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। বিদেশীয় রাজার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিলুপ্ত হয়; দেশীয় ভাষায় কেবল তাহার ছায়া মাত্র অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু যদি এমন কোন জাতি রাজসিংহাসন অধিকার করে, যাহার ভাষার সহিত অধীনস্থ জাতিদের ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য আছে, তাহা হইলে কালে সেই রাজকীয় ভাষা দেশের সমস্ত স্থানে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। রাজসভা, বিচারালয় প্রভৃতি স্থানে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, লোকে স্বার্থ সাধনোদ্দেশে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, অথবা কার্য্যের খাতিরে বাধ্য হইয়া সেই ভাষার চর্চ্চায় রত হয়। এরূপ স্থলে যদি বিভিন্ন প্রদেশের ভাষার সহিত সেই রাজকীয় ভাষার সাদৃশ্য থাকে, তাহা হইলে কালে তাহারই প্রাধান্য হইয়া উঠে। ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতি ভাষা অনেক পরিমাণে ইহার প্রমাণ স্থল। তৃতীয় উইলিয়ম, প্রথম জর্জ প্রভৃতি ইংলণ্ডীয় ভূপতিগণ বিদেশীয় বটে, কিন্তু ইংলণ্ডে যাঁহারা রাজা বলিয়া পরিচিত তাঁহারা রাজা নহেন; পার্লিয়ামেণ্টই ইংলণ্ডের

রাজা; সুতরাং পার্লিয়ামেন্ট যে ভাষাকে উৎসাহ দিয়াছেন, তাহাই ইংলণ্ডের জাতীয় ভাষা হইয়াছে। আমাদের দেশে এরূপ কোনও সুবিধা নাই। রাজকীয় ভাষা বলিয়া ইংরেজী যদিও আজি ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে, তথাপি ইহা কখনও ভারতের জন সাধারণের ভাষা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। অপর দিকে গবর্ণমেন্ট এতদ্দেশীয় কোনও একটী বিশেষ ভাষাকে উৎসাহ দিতেছেন না। বরং আসাম ও উড়িষ্যায় বঙ্গভাষার যে বিস্তার হইতেছিল, তাহার ব্যাঘাত করিয়াছেন। উড়িয়া ও আসামীর সহিত বাঙ্গালা ভাষার প্রভেদ যেরূপ অল্প, তাহাতে কালে এই উভয় প্রদেশে বঙ্গভাষা প্রাধান্য লাভ করিতে পারিত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট কোনও রাজনৈতিক অভিপ্রায়েই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক সে পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছেন। বিদেশীয় গবর্ণমেন্ট বিজিত দেশে ভাষার একতা সাধনের চেষ্টাই বা করিবেন কেন? তাঁহাদের ইহাতে বিশেষ সুবিধা বা স্বার্থ কি? কোন কোন রাজনীতিজ্ঞের মতে ইহাতে বরং বিজেতৃদিগের পক্ষে অনিষ্টেরই সম্ভাবনা অধিক। এতদ্ভিন্ন বিদেশীয় গবর্ণমেন্টের চক্ষে বিজিত দেশের সকল প্রাদেশিক ভাষাই সমান। সুতরাং তাঁহারা কোন একটীকে অযথা প্রাধান্য দিবেন কেন? ভাষার একতা সম্পাদনের পক্ষে চেষ্টা দ্বারা যদি কিছু সাধিত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা এতদ্দেশীয়দিগের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

প্রায় সকলজাতিরই কোন না কোন রূপ জাতীয় পরিচ্ছদ আছে, কিন্তু ভারতবাসীর কোনও প্রকারের জাতীয় পরিচ্ছদ নাই। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এক এক ভিন্ন প্রকারের সাধারণ পরিচ্ছদ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশে তাহাও নাই বলিলে চলে। বাঙ্গালীর একটী সভায় গেলে কত বিভিন্ন প্রকারেরই পরিচ্ছদ দেখিতে পাওয়া যায়, ইংরাজী পোষাক, চাপকান্ চোগা, ধুতি-চাদর কোট, বিভিন্ন প্রকারের টুপী ও পাগড়ী ও অনাবৃত মস্তক, এই সকলের একত্র সমাবেশ কেবল বঙ্গবাসীদের সভাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শীত গ্রীষ্মের প্রভাব ভিন্ন রূপ বলিয়া পরিচ্ছদের কতকটা বিভিন্নতা হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন কোন ধরণের পরিচ্ছদ প্রচলিত করা অসম্ভব নহে, যাহা সকল প্রদেশেই চলিতে পারে। বস্ত্রের স্থূলতার তারতম্য শীত গ্রীষ্মের অনুযায়ী করিয়া পরিচ্ছদের ধরণ একরূপ করা কঠিন নহে। কালে যদি কখনও ভারতবাসীগণ একজাতিতে পরিণত হয়েন, তখন সকলের মধ্যে একধরণের পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তিত করা অসম্ভব হইবে না।

আচার ব্যবহার ও চরিত্রগত যে বিভিন্নতা আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যদিও বড় সামান্য নহে, তথাপি জাতীয় একতার পক্ষে অন্যান্য যে সকল অন্তরায় আছে তাহা বিদূরিত হইলে, এবং সকল সম্প্রদায়ের ও সকল প্রদেশের লোকের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধ প্রবর্ত্তিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত বিভিন্নতা আপনা আপনিই অন্তর্হিত হইবে।

জাতিভেদ আমাদের জাতীয় একতার পথে একটী বিষম কণ্টক। সকল প্রকারের জাতিভেদ বিদূরিত হইয়া সকল লোকের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধ ও আহার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত না হইলে কখনই আমা-

দের জাতীয় উন্নতি ও একতা সাধিত হইবে না। এ প্রশ্নটী এত গুরুতর যে এতৎ সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে। স্থানাভাবে আমরা ইহার উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

ধর্ম্মের বিভিন্নতা আমাদের জাতীয় একতার আর একটী শত্রু। এক হিন্দু ধর্ম্মেরই কত সম্প্রদায়! তাহার পর জৈন, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি কত বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এদেশে বাস করিতেছেন। এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মের লোকের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে কোনও সংশ্রব নাই; যতদিন ধর্ম্মের বিভিন্নতা থাকিবে ততদিন এরূপ কোনও সংশ্রবের সম্ভাবনাও নাই। দেশমধ্যে একটী সাধারণ ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচলিত না হইলে এ অসুবিধা দূর হইবার কোনও উপায় নাই। হিন্দু ধর্ম্ম সে স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। কারণ, হিন্দু ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মের লোককে গ্রহণ করেন না। তাহার উপর জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকের বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা কমিয়া যাইতেছে। খ্রীষ্টীয়, মুসলমান ও জৈন ধর্ম্মও সে স্থান পাইবে না। কারণ ঐ সকল ধর্ম্মের মধ্যেও অনেক কুসংস্কার, অসত্য ও অনুদারতা আছে। ভারতে যদি কখনও একটী সাধারণ ধর্ম্ম প্রচলিত হয়, তবে সে ধর্ম্মের ভিত্তি সার্ব্বভৌমিক সহজ সত্য ও উদারতার উপর স্থাপিত করিতে হইবে। নতুবা তাহার দ্বারা ভারতের অভাব দূর হইবে না। নানা প্রকারের কূট ও অনুদার ধর্ম্মমত তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইলে, তাহা কখনই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মানবের ভ্রাতৃভাব এই দুইটী সাধারণ ও সহজ সত্যই সেই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, ও নৈতিক উন্নতিই তাহার সর্ব্বপ্রধান সাধন হইবে। ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মই বল, আর একেশ্বর বাদই বল, নামে কিছু আসে যায় না। কিন্তু যদি কখনও ভারতে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়, যদি কখনও আর্য্য অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান, বাঙ্গালী ফিরিঙ্গী, সকলে মিশ্রিত হইয়া একটী মহান্‌ভারতীয় জাতিতে পরিণত হয়, যদি কখনও জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ ও সর্ব্বপ্রকার অনুদারতা বিদূরিত হইয়া জাতীয় প্রীতি ও স্বদেশানুরাগ সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়কে একসূত্রে গ্রথিত করে, যদি কখনও পঞ্জাবী ও বাঙ্গালীতে, হিন্দুস্থানী ও দ্রাবিড়ীতে, হিন্দু ও মুসলমানে বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া এক হইয়া যায়, যদি কখনও সমস্ত ভারতে এক সাধারণ ভাষা প্রচলিত হয়, তবে এই উদার ও সর্ব্বভৌমিক একেশ্বরবাদ দ্বারাই সেই সুমহৎকার্য্য সাধিত হইবে। আর কিছুতেই এত বিভিন্নতা বিদূরিত করিতে পারিবে না।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **প্রবন্ধকুসুম**—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ।০। গ্রন্থকার এডুকেশন গেজেটে সময়ে সময়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাই একত্র করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ করিয়া বড় ভাল কার্য্য করেন নাই; কারণ কোন স্কুলেই এই পুস্তক চলিবে না। কতকগুলি প্রবন্ধে অনেক উপদেশের কথা আছে বটে,—কিন্তু

সে গুলি ভাবের সহিত মিশ্রিত হয় নাই ; হইলে বা এ কুসুম কোন কোন লোকের উপকারে আসিত। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ভাল, রুচি ভাল। স্থানে স্থানে ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

২। Gleams of the New light—by Sitanath Datta. মূল্য ।৴০। এ খানি বাঙ্গালীর পুস্তক, ইংরাজী ভাষায় লিখিত। সীতানাথ বাবু চিন্তাশীল ও ধর্ম্ম-পিপাসু লোক, ইংরাজি লিখিবার তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। কিন্তু একটী কথা এই—এ পুস্তক কোন্ শ্রেণীর পাঠকের জন্য রচিত হইয়াছে? যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ, তাঁহাদের হস্তে এ প্রকার অনেক পুস্তক পড়িতে পারে। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা কাল্পনিক পথে ভ্রমণ করিতে বড়ই সুখ পাইয়া থাকেন। সীতানাথ বাবুর এই পুস্তক দেখিয়া তাঁহাকেও সেই দলের লোক বলিয়া মনে হইল। বাঙ্গালী যখন পুস্তক লিখে, তখন ইংরাজিতে না লিখিয়া বাঙ্গালায় লিখে, আমাদের ইচ্ছা; কারণ ইংরাজি ভাষায় ভাল পুস্তকের অভাব নাই। আর একটী কথা—সীতানাথ বাবু কয়েকজন বড় লোকের মত পুস্তকের শেষে সন্নিবেশিত করিয়া আমাদের মতামত প্রকাশের পথ বন্ধ করিয়াছেন। কেন, সে কথা বলিব না। এই পথ অবলম্বন না করিলে বরং এ পুস্তকের আদর বাড়িত। এই পুস্তক খানি বাঙ্গালায় রচিত হইলে অনেকের উপকার হইত; এবং অতিরিক্ত প্রশংসা না থাকিলে অনেকের ভাল লাগিত। এই দুইটী কারণে সীতানাথ বাবু পুস্তক খানিকে মলিন করিয়াছেন, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সীতানাথ বাবুর লেখা ভাল, উদ্দেশ্য ভাল, ভাব ভাল, সে সম্বন্ধে আর আমাদের সন্দেহ নাই।

৩। বাল্য-সখা—প্রথমভাগ,—শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা বিরচিত, মূল্য ৵০। এখানি শিশু কবিতা। পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম। অনেকগুলি কবিতাই অতি সুন্দর হইয়াছে। ভাষা সরল অথচ ভাবপূর্ণ। বালকের হৃদয়ে ভাব ঢালিবার গ্রন্থকারের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। বাল্যসখা স্কুলের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব।

৪। Sankaracharja—A lecture by Babu Dvijadas Datta M. A. এ দেশে "অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবাদের প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার জন্য" দ্বিজদাস বাবু এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার করিতে যাঁহারা যত্ন করেন, তাঁহারাই মানব সমাজের বন্ধু। শঙ্করাচার্য্য এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান উদ্দীপনের জন্য দ্বিজদাস বাবু একান্ত মনে যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন। তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তবে "জড়বিজ্ঞান-গর্ব্বিত" উনবিংশ শতাব্দীর শেষাবস্থায় আবার অদ্বৈত বাদ "সয়তানবাদের" (?) উপর জয়লাভ করিতে পারিবে, আমাদের আশা নাই।

৫। পদ্য-ব্যাকরণ—শ্রীকাশীনাথ সেন গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৵০। আমরা এই প্রকার পুস্তকের অত্যন্ত বিরোধী। ইহাতে বালকদিগের মুখস্থ বিদ্যার সহায়তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু ভাব গ্রহণের একটুও সহায়তা হইবে, সম্ভাবনা নাই। যে সে বিষয়ে কবিতা লিখিয়া অনেকে কবিত্বের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিনাশ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সমূহ অপকার করিতেছেন।

অন্যান্য পুস্তক ক্রমে সমালোচিত হইবে।

আনন্দমঠ

(সমালোচনা।)

মানব চরিত্রের দুইটী ছবি,—একটী অনন্তের ছায়ায় চিত্রিত, অপরটী সীমার রেখায় অঙ্কিত। মানুষ ক্ষুদ্র। কত ক্ষুদ্র? যখন অনন্ত প্রসারিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের দিকে প্রাণের দুইটী চক্ষু উন্মেষিত করিয়া চাহিয়া থাকি, যখন এই ক্ষুদ্র, অদূরদৃষ্টি, চর্ম্ম-চক্ষু দুইটী খুলিয়া, অনন্তের বক্ষে,—অনন্ত নীলিমাপুঞ্জ ভেদ করিয়া, অনন্ত দূরে, অনন্ত শূন্যে জ্যোতির্ম্ময় ক্ষুদ্র যূথিকাটীর মত, অস্ফুটিত ক্ষুদ্র তারাটীর প্রতি অনিমেষে দেখিতে থাকি, যখন শরৎ কৃষ্ণা যামিনীর অনন্ত নিস্তব্ধতা চারি দিক্ ঘিরিয়া থাকে, তখন দেখিয়াছি, ভাবিতে, ভাবিতে, চিন্তা মিশাইয়া যায়; দেখিতে, দেখিতে, দৃষ্টি বিলুপ্ত হয়, আমাতে আর আমি থাকি না। আমাতে আমি থাকি না একথার অর্থ কি? আমার পরিমাণ-জ্ঞান আমি হারাই—ঐ অনন্তের সঙ্গে এ ক্ষুদ্রতার তুলনা অসম্ভবপর।

মানুষ এত ক্ষুদ্র তবুও ইহার প্রাণের, ইহার হৃদয়ের প্রতি অণু যেন অনন্তের দিকে া যাইতে চায়, অনন্তের সঙ্গে অনন্ত হইয়া, মিশিয়া থাকিতে চায়। আপনার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর—তুমি আশানামক বাঁশী বাজাইয়া, মধুরস্বরে নিশি দিন আমার কাণে কি ঢালিতেছ?" উত্তর শুনিবে "অনন্তের সঙ্গীত।" তুমি কত উন্নতির জন্য পিপাসু? উত্তর—"অনন্ত।" তুমি কত জ্ঞানের জন্য ভিখারী? "অনন্ত।" তুমি কত ভালবাসিতে চাও? "অনন্ত"। তোমার কত সুখ শান্তির প্রয়োজন? "অনন্ত।" তোমাকে একাকী নিরপেক্ষ ভাবে ছাড়িয়া দিলে কি করিবে? মনে কর, এই অনাদি অনন্ত নীলিমাময় আকাশের নীচে তুমি একা, আর কেহ নাই, আর কিছু নাই। এ অবস্থায় কি করিবে? এখানেও হৃদয়ের গম্ভীর উত্তরে শুনিতে পাইবে—"অনন্তের দিকে ধাইব—অনন্তে মিশিয়া যাইতেই আমার সাধ। পাখা দুইটী বাঁধা না থাকিলে এ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া, এপাখী কবে পালাইত, তাহা তুমি গণিয়া বলিতে পার না।" মানুষের ভাব অনন্ত কিন্তু মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। প্রাণ যাহা চায়, এ জগতে তাহা পায় না। যৎকিঞ্চিৎ পাইলেও সে সহজে নয়। অনেক চেষ্টা, অনেক সংগ্রাম, অনেক সাধনে মানুষের অভিষ্ট কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হয়। অনেক অধীনতা, অনেক বন্ধন সহ্য করিয়া মানুষ ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে মানুষ হয়। মানবপ্রাণবিহঙ্গের পাখা দুইটী এই শক্তির সীমা সূত্রে বাঁধা। এই ডোরই মনুষ্যকে সমাজে গ্রথিত করিয়া, সমাজিক জীব করিয়াছে। সামাজিক জীব কে? যে সমাজের সম্পত্তি, সমাজ যাহার সম্পত্তি। যাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ সমাজের স্বার্থের সহিত একাত্মিক, প্রকৃত সমাজিক তিনি। কিছুদিন হইল, বিলাতের টাইমস্ নামক পত্রিকায় মহাত্মা ব্রাইট সাহেবের

সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশংসার কথা লিখিত হয়। তন্মধ্যে একস্থানে ঠিক এই কয়েকটী কথা লিখিত ছিল—"Bright has blended himself so absolutely with national life, that it will always be impossible to write or read British history without taking notice of his personality." ব্রাইট্ একজন খ্যাতনামা সমাজ-প্রাণ ব্যক্তি।

সমাজ কিসের জন্য? পরিমিতশক্তি-মানবের অনন্ত উন্নতির—হৃদ্‌গত অনন্ত পিপাসার শান্তি বিধানের দ্বারোদ্‌ঘাটন জন্য। সমাজই মনুষ্যের স্বর্গের দ্বার, সমাজ মানুষের পরিত্রাণের সোপান। একটী মানুষ সমাজ মহাসমুদ্রের একটী বুদ্‌বুদ্। লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী বুদ্‌বুদের সম্মিলনে সমাজ সিন্ধুর সৃষ্টি। সামাজিক কি দেখিবেন? দেখিবেন—আপনার সহিত এই পরমহিতকামী সমাজান্তর্গত কোটী২ ব্যক্তির কোন রূপ সংঘর্ষণ উপস্থিত না হয়। এই মহামহিমান্বিত উদ্দেশ্য হৃদয়ের মূলমন্ত্র করিয়া, তিনি সর্ব্বদা আপনার উদ্দাম প্রবৃত্তিকে, অন্তরের উন্মত্ত পিপাসাকে জ্ঞান যোগে বিবেকের শাসনাধীন রাখিয়া সাম্যের পথে পরিচালিত করিবেন। এই সাম্যের পবিত্র মন্ত্রানুসারে তাঁহাকে অহংভাব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া, সেই মহতী প্রতিমার ধ্যান ও জ্ঞানে সমাহিত হইতে হইবে। এই সমাজ-শক্তি মানবের মাতৃস্থানীয়। কোটী কোটী গর্ভধারিণী কোটী কোটী সন্তান প্রসব করেন, এই মা সেই কোটী সন্তানকে এক স্নেহসূত্রে বাঁধিয়া, এক পবিত্র অঙ্কে বসাইয়া, এক স্তন্য পান করান এবং অন্তে এক এক করিয়া পরম মাতা বিশ্বজননীর হস্তে সমর্পণ করেন। এই মাতাই জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী এবং প্রাণভূতা। এই সমাজ না থাকিলে বসুমতীর মৃত্তিকাপুঞ্জকে কে আদর করিত? এই সমাজ-শক্তিদ্বারা জন্মভূমি অনুপ্রাণিত, এই পবিত্র সমাজ তাঁহার বক্ষের ভূষণ; তাই সেই "সুজলাসুফলা মলয়জশীতলা শস্য-শ্যামলা," আমাদের মাতা। মাতার প্রীতির জন্য, মাতার মঙ্গলের জন্য যে সন্তান আপনার প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে জানিল না, যে আপনার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া আপনার রুধিরে মায়ের পা ধোয়াইতে কুণ্ঠিত, সে কুসন্তান, তাহাকে শত শত ধিক্। মান অভিমান, জাতি এবং পদমর্য্যাদা পায়ে ঠেলিয়া, যে সন্তান মায়ের মলিন মুখ উজ্জ্বল করিতে সকল সুখ, সকল বাসনা ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহার মত অধম সন্তান কে? বাঙ্গালী এজগতে মায়ের অধমতম হইতে অধমতম সন্তান। এই মৃত কীটবৎ অধমতম বাঙ্গালীর ভস্মাবশেষ প্রাণে মাতৃভক্তি-সুধা আনিবার জন্যই পূজনীয় মহাকবি আনন্দমঠে, শক্তি-ধর্ম্মে দীক্ষিত সন্তানের পরম পবিত্র, পরম অদ্ভুত চরিত্র চিত্রিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিম, তুমি মাতার সুসন্তান; তুমি বঙ্গের নরকান্ধকারে শাপভ্রষ্ট দেবতা। কেন না, তুমি যে উদ্দেশ্য বুকে ধরিয়া, যে আগুণ লেখনীতে মাখিয়া আনন্দমঠ লিখিতে বসিয়াছিলে, তাহা সপ্তম স্বর্গের মহামৃত অপেক্ষাও পবিত্র এবং দুর্লভ। আজ বঙ্গের সপ্তকোটী হৃদয়-তন্ত্রীর তারস্বর তোমার স্বরে মিলিত, সপ্তকোটী প্রাণ তোমার জলন্ত প্রাণে অনুপ্রাণিত। আজ দ্বিসপ্তকোটী সজল চক্ষু স্বর্গের দিকে রাখিয়া,

দ্বিসপ্তকোটী হস্ততুলিয়া সমস্ত বঙ্গের নর-নারী তোমাকে নীরব গম্ভীরে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। তুমিই ধন্য এবং কৃতার্থ।

আনন্দমঠের মূল চিত্র, আনন্দমঠের প্রাণ, সত্যানন্দ এবং মহাপুরুষ। গ্রন্থের উপসংহারে, যখন সেই প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে মহাপ্রতিভা-পূর্ণ মহাপুরুষ, মহাপ্রতিভাপূর্ণ সত্যানন্দের হস্ত ধরিয়া নীরব গম্ভীরে দাঁড়াইয়া আছেন, তখন গ্রন্থকারের ভাবোদ্বেলিত হৃদয় জ্বলন্ত ভাষায় বলিতেছে, "কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে, ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে, বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে, কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা; মহাপুরুষ বিসর্জ্জন।

বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।"

আবার উপক্রমণিকাতে, সেই তিমিরাবৃত বিশাল অরণ্য গর্ভে, সেই অননুভবনীয় নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ হইল—তিনবার ধ্বনিত হইল—"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?" উত্তর হইল—"তোমার পণ কি?" "পণ আমার জীবন সর্ব্বস্ব।" আবার উত্তর হইল—"জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।" পুনরায় জিজ্ঞাসা হইল "আর কি আছে? আর কি দিব।" শেষ উত্তর বা আদেশ আসিল—"ভক্তি।" মূলগ্রন্থ হইতে কেবল সংক্ষেপে প্রশ্ন উত্তর কয়টী তুলিলাম। এখন জিজ্ঞাস্য,একথা বার্ত্তা কাহাদের মধ্যে হইল? আনন্দমঠের পাঠক মাত্রেই বুঝিয়াছেন, সত্যানন্দ আর মহাপুরুষের মধ্যে।

অতএব একথা বলিতে পারি—আনন্দমঠের পত্তন মহাপুরুষ আর সত্যানন্দকে লইয়া; শেষে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় দ্বারাই "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করা হইয়াছে। মহাপুরুষ রূপ মেরুদণ্ডের উপর আনন্দমঠ অবস্থিত, সত্যানন্দ মহাপুরুষের আদেশেই মাতৃ সেবায় প্রবৃত্ত এবং মহাপুরুষের উপদেশেই সে ক্ষেত্র হইতে অপসৃত। তবে কবি, মহাপুরুষকে কার্য্যক্ষেত্রে না আনিয়া শক্তির ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়াছেন। মহাপুরুষ জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিসর্জ্জন ও কল্যাণের অবতার। সত্যানন্দ, ভক্তি, কর্ম্ম, প্রতিষ্ঠা এবং শান্তির প্রতিমূর্ত্তি। সত্যানন্দ মাতৃ ভক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর—সকল কণ্টক উৎপাটন করিয়া, দেশে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, পূর্ণ শান্তি স্থাপনে প্রবৃত্ত। মহাপুরুষ পরিণামদর্শী জ্ঞানীর মত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া, দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া, ধর্ম্মোদ্ধার করিয়া, কল্যাণ সাধন জন্য বর্ত্তমানে সত্যানন্দের প্রাণগত আশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সরিয়া যাইতে উপদেশ দিতেছেন। সত্যানন্দের ধর্ম্ম শক্তির ধর্ম্ম। দীক্ষার পূর্ব্বে মহেন্দ্রকে উপদেশ দিবার ছলে, কবি সত্যানন্দের মুখে সে কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। সত্যানন্দের ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, অর্দ্ধ ধর্ম্ম, এ কথাও সেই স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। সত্যানন্দ শক্তির অবতার। কবি গ্রন্থমধ্যে মহাপুরুষ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার সার সংগ্রহ করিয়া বুঝিলাম—মহাপুরুষ, জ্ঞানের-অবতার। তাঁহার কথা বার্ত্তা হইতে স্পষ্টতঃ আর কিছু বুঝা যায় না। অতএব আনন্দমঠে কবি দেখাইতে চান—শক্তি ধর্ম্মের অর্দ্ধভাগ, আর জ্ঞান ধর্ম্মের অপরার্দ্ধ। মহাপুরুষ আর সত্যানন্দ মিলিয়া পূর্ণ-ধর্ম্ম।

মহেন্দ্রের প্রতি উপদেশ কালে চৈতন্যের প্রেমকে—প্রেমের ধর্ম্মকে তিনি অর্দ্ধ ধর্ম্ম (?) বলিয়াছেন, কিন্তু আনন্দমঠে এই অর্দ্ধ ধর্ম্মেরও পূর্ণ বিকাশ দেখিলাম না। কবি, নিজের-ভণিতাতে মহাপুরুষকে ধর্ম্মের অবতার এবং বিসর্জ্জন বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্দারা তাঁহাকে স্পষ্টতঃ প্রেমের অবতার বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। মহাপুরুষ এক স্থানে বলিয়াছেন "অনর্থক প্রাণিহত্যায় প্রয়োজন নাই।" আর এক স্থানে বলিয়াছেন—"তুমি থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্যা হইবে।" এই কথা গুলির মধ্যে প্রেমের কিঞ্চিৎ আভাস আছে। মহাপুরুষ অনর্থক নরহত্যায় বড় ইচ্ছুক নন্। "বড় ইচ্ছুক নন্" বলিলাম কেন? প্রথম কথা, স্বার্থের জন্য;—স্বার্থের জন্য? বড় স্বার্থের জন্য—দেশের স্বার্থের জন্য তিনি নরহত্যা করিতে প্রস্তুত। সন্তান বিদ্রোহের মূল প্রবর্ত্তক তিনি। দ্বিতীয় কথা —সন্তান যুদ্ধে নিরর্থক নরহত্যা, গৃহদাহ এবং নির্দ্দোষ প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি প্রচুর পরিমাণে অত্যাচার হইয়াছে। মহাপুরুষের মত জ্ঞানী পূর্ব্বে এ কথা বুঝিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার শেষ কথায় প্রকাশ পাইতেছে. তিনি আগাগোড়া বেশ করিয়া তৌলাইয়া সন্তান বিদ্রোহ প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন। আর এক কথা, যিনি তত ভবিষ্যতের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন. তাঁহার বুঝা উচিত ছিল,—রণজিতের মত বুঝা উচিত ছিল— "কাসে সব লাল হো যায়েগা"—ভারতবর্ষ ইংরেজের অধিকারে আসিবে। সন্তানগণ বীরভূমের ভূমি নররুধিরে কলঙ্কিত না করিলেও সে নিয়তি খণ্ডিত হইবে না। পাগলেও একথা বলিবে—"ভারতে ইংরেজ রাজ্য বিস্তারের কারণ যাহা, তাহার নিকট বীরভূমের মত একটী সামান্য জেলার বিদ্রোহিতা কিছুই না।" ত্রিকালজ্ঞের ন্যায় অভিজ্ঞ মহাপুরুষ কি একথা বোঝেন নাই? না বুঝিলেও এই নৃশংস-ব্যাপারে অন্ধ ভক্তি, অন্ধশক্তির সাধক সত্যানন্দ ও বলিতেছেন—"তবে আমাদিগকে এই নৃশংস যুদ্ধকার্য্যে কেন নিযুক্ত করিয়াছিলেন?"—তাই বলিতেছি,—এই রাক্ষসিক যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াও তিনি প্রেমের অবতার হইতে পারেন না। পরে প্রকৃত উদার প্রেম মানুষকে মানুষ ধ্বংস করিতে কোন অবস্থায়ই বলে কি না সন্দেহ। যাহা হউক, আনন্দমঠে কবি চৈতন্যের প্রেমকে হত্যা করিয়াছেন কিন্তু বাঁচান নাই। চৈতন্যের-প্রেম, খ্রীষ্টের-প্রেম একই পদার্থ— নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেম। যিনি জীবানন্দ এবং কল্যাণীকে বাঁচাইয়া গ্রন্থের-গৌরব খর্ব্ব করিতে ভীত নন, তিনি, প্রেমের প্রতি এত নির্দ্দয় কেন? আনন্দমঠ, জ্ঞান এবং শক্তির যোগকেই পূর্ণ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। সত্যানন্দকে "ভক্তি" বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে ভক্তির বিকাশ অন্ধ শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। এই ভক্ত্যাত্মক অন্ধ শক্তিতে যে জ্ঞান চক্ষু যোগ করা হইয়াছে, তাহার দৃষ্টি প্রেম শূন্য নীরস। এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে, শেষে বলিব।

আনন্দ মঠের আনন্দদিগের চরিত্র, যেরূপ এক ছাঁচে ঢালা, তাহাতে উপসংহারের কথা কয়টী দ্বারা আরও বুঝিতে পারা যায়, অবতারবাদীরা যেমন অন্যান্য সঙ্গিদিগকে প্রধান অবতারের অংশ মাত্র মনে করেন, আনন্দমঠে শান্তি, কল্যাণী, জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, প্রভৃতি সকল আনন্দও তেমনই সত্যানন্দ ও মহাপুরুষরূপ

আনন্দ মহাসমুদ্রের বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র। প্রয়োজন সাধনস্বরূপ তরঙ্গাভিঘাতে বুদ্‌বুদ্‌ সকল উঠিয়া আবার প্রয়োজনান্তে ধীর, গম্ভীর, প্রশান্ত সাগর বক্ষে বিলীন। কবি, আনন্দ গণের অন্তর্দ্ধানের পরেও আনন্দমঠের প্রদীপ না নিবাইয়া, দ্বিগুণ তেজে উদ্দীপ্ত করিয়া, মধুময় আশার বাক্যে বলিয়াছেন —"সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।" এ কথার পরেও আনন্দমঠের শেষ মীমাংসায় আপনাকে অসঙ্কুচিত বোধ করিতে পারিতেছি না। আর গ্রন্থকারের শেষ কথার গর্ভে আশার উষার জ্যোতি কি অমানিশার গাঢ় অন্ধকার-লুক্কায়িত, কে বলিবে? লেখক ভূমিকা বা বিজ্ঞাপনে যে তিনটী কথা বলিয়াছেন, এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিন্তু তাহার একটিও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। বাঙ্গালীর স্ত্রী যে অবস্থা বিশেষে বাঙ্গালীর সহায় নয়, এ কথা গ্রন্থোল্লিখিত কোন স্ত্রী চরিত্রে প্রদর্শিত হয় নাই। কবি কল্যাণী এবং শান্তিকেই স্ত্রীগণের মধ্যে প্রকাশ্যরূপে রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিয়াছেন। কল্যাণী স্বামীর কার্য্য-পথের কণ্ঠক উৎসারণ করিতে আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিতা নন। কল্যাণী দেবতার পূজায় আপনাকে আপনি বলিদান করিল, তাহার জলন্ত জীবন্ত ভাব এবং বাক্য মহেন্দ্রের প্রাণ-সমুদ্রকে আকুলিত ও বিলোড়িত করিয়া যে মহাতরঙ্গ তুলিল, তাহার মহাভিঘাতেই মহেন্দ্র রূপ ফুল্ল শতদল দেব পূজার জন্য সেই দুর্ল্লভ চরণ প্রান্তে নিপতিত হইল—মহেন্দ্র মায়ের কাজে আসিল। কল্যাণী বাঙ্গালীর স্ত্রী বাঙ্গালীর অসহায় নন্। শান্তি, সন্তান সম্প্রদায় রূপ প্রভাতিক গগনে বালারুণ প্রভা, সন্তানের প্রাণে সাহস ও উৎসাহের হেম কিরণ রূপিণী। শান্তি, ছেঁড়া নেকড়া পরিয়া, ভাঙ্গা কুটিরে বসিয়া, চর্‌কা কাটিতে পারে, বালিকা নিমাইর সঙ্গে এয়ার্‌কি আছে—অনেকক্ষণ বসিয়া এ কথা সে কথা বলিয়া গল্প করিতে পারে, চন্দ্রশেখরের মত পুথি পোড়াইতে পারে,—ধড়া পরিয়া চুল বিনাইয়া জটা করিয়া, চুলের আগায় দাড়ী গোঁপ সাজাইয়া সন্ন্যাসী হইতে জানে। যে আনন্দমঠ হইতে পথ চিনিয়া মহেন্দ্র বাহির হইতে পারিল না, অপরিচিত কেহই পারে না, শান্তি কখনও না দেখিয়া, না চিনিয়াও গভীর রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে, হিংস্রপূর্ণ নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া, দুর্গম আনন্দ মঠে, সত্যানন্দ যে গোপনীয় নিভৃত স্থানে বসিয়া থাকেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, বিষ্ণু মন্দিরে বসিয়া, "হরে মুরারে, হরে মুরারে" জপিতেও সন্তান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে। আবার শান্তির কটাক্ষ বড় অদ্ভুত। শান্তি চারি বৎসর সন্তানদিগের একজন অধিনায়ক হইয়া এক সঙ্গে কাজ করিল, কিন্তু কেহই ধরিতে পারিল না। কেবল দীক্ষা হইয়া গেলে, ভাল হাতে ঠকিয়া, এক প্রকার নাকমলা কানমলা খাইয়া, সত্যানন্দ প্রভু অনেক কষ্টে সে কটাক্ষ বুঝিয়া বাহাদুরি নিলেন—তবুও তিনি সন্তান সম্প্রদায়ের প্রধান অধিনেতা, তাই এত বাহাদুর। জীব গোঁসাঞীকে শান্তি এক রূপ ইচ্ছা করিয়াই ধরা দিয়াছিল, নতুবা সে ভ্যাড়ানন্দের চৌদ্দ পুরুষেরও সাধ্য ছিল না। আর দরকার মত, চারি বৎসর পরে আপনার অন্তঃপুরে কল্যাণীর শয়ন কক্ষায় পাইয়া,

সে কটাক্ষকে স্ত্রী কটাক্ষ বলিয়া, একবার মহেন্দ্র সন্দেহ করিতে পারিয়াছিল। শান্তির চুলের আগা গুলিও ধন্য। স্ত্রীলোকের কোমল কেশের অগ্রভাগ সহসা কর্কশ ভাব ধরিয়া, সহজে এরূপ দাড়ী গোঁপে পরিণত হইতে প্রায় কখনও দেখা যায় নাই, শোনা যায় নাই। কবি বলেন, কাটিবার কালে সে চুল গুলি বড় রুক্ষ ছিল। কিন্তু ঘণ্টা দুই তিন আগে. নিমাই তাহা বেশ করিয়া. বোতল খানিক তেলে ডুবাইয়া, তদ্দ্বারা তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোপাও বাঁধিয়া দিয়াছিল। আবার সে দাড়ী গোঁপ, অমর, অক্ষয় রক্তবীজের গোষ্ঠি। চারি বৎসর চলিয়া গেল, কত যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গেল, যুগান্তর মন্বন্তর শেষ হইল, উপর দিয়া কত টানা হ্যাচ্‌ড়া চলিয়া গেল, তবুও তাহা যে দাড়ী সেই দাড়ীই, যে গোঁপ সেই গোঁপই! একটুকুও টলিল না, একটুকুও খুলিল না! শান্তি বড় বড় কথায় সত্যানন্দকে বোকা বানাইতে পারে, ইস্পাতের ধনুকে লোহার তার বসাইতে পারে, বাচলাম ও বথামরও চূড়ান্ত করিতে পারে। ছোট খাট মিথ্যা কথা তাহার মুখে বড় ঠেকে না। কিন্তু উন্নত নীতিও ধর্ম্ম ভাবে সত্যানন্দাদিও তাহার কাছে মূর্খ। শান্তি ঘোড়ায় চড়িতে পারে, দুর্জ্জয় সাহসী ইংরেজ সেনানীর হাত থেকে বন্দুক কাড়িয়া নিয়া তাহাকে গাধা বানাইয়া. বদ রসিকতা করিতে পারে. ঘোর যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ঢুকিতে পারে, বৈষ্ণবী সাজিতে জানে, এবং সুচতুর গুপ্তচরের মত পরাক্রান্ত ইংরেজ শিবিরে প্রবেশ করিতে পারে। আবার প্রকাণ্ড আরবী ঘোড়ার উপর হইতে একজন গোরাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, ঘোড়া নিয়া পালাইতেও পারে। ইত্যাদি আরও কত কি করিতে পারে। শান্তি সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনের ঔষধ। গরু হারাইলে গরু পাওয়া হইতে বন্ধ্যাদোষ-খণ্ডন পর্য্যন্ত ইহার উপযোগিতা। শান্তি দেবী, দানবী, মানবী, পিশাচী, রাক্ষসী যাহা খুসী তাহা হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে নয়—একশ সওয়াশ বৎসর পূর্ব্বের বীরভুম অঞ্চলের বাঙ্গালীর কুলবধূ, অথবা আজ কাল্‌কার নবীনা বঙ্গবাসিনীও নয়। তবে শান্তির সাহায্যে কিম্বা তদভাবে বাঙ্গালীর কি? কল্যাণী যেমন স্বামীর অসহায় নয়, তেমনই সহায়ও নয়। কার্য্যক্ষেত্রে তাহার কোন কার্য্য নাই। "সমাজবিপ্লব, অনেক সময়েই আত্ম পীড়ন মাত্র।" জয়োৎফুল্ল সন্তানদিগের লুটপাটে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু "বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী" এ কথার-প্রকৃত অর্থযুক্ত কোন দৃষ্টান্ত গ্রন্থে নাই। "ইংরেজেরা বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" আনন্দমঠের কোন্ চিত্র এ কথার স্পষ্টতঃ প্রতিপোষক? তবে সপক্ষে কিছু বলিবার আছে। জীবানন্দ ও ভবানন্দের পতনে, কবি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—সেই পতনের মূল স্ত্রীলোক। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে এই পতন হয়ত হইত না। কিন্তু ভবানন্দ বিবাহিত কি অবিবাহিত তাহা জানিতে পারি নাই। পরে তিনি পরস্ত্রীতে আশক্ত। তাঁহার পতনের জন্য বাঙ্গালীর স্ত্রী কেন, জগতের সমস্ত রূপ যৌবন-বতী স্ত্রীলোকই দোষী হইতে পারেন। যদি ভবানন্দ অবিবাহিত হন, তবে হয়ত বিবাহ করিলে, এই দোষ ঘটিত না। অতএব ভাব পক্ষে বাঙ্গালীর স্ত্রী উপকারে আসেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়

চাঞ্চল্য হেতু পুরুষের বা স্বামীর পতন নাও হইতে পারে। সুতরাং অভাব পক্ষে স্ত্রীর সাহায্য বিনা তদ্রূপ পতন ঘটিতে পারে। এ কি রকম সাহায্য বা অসহায়তা তাহা বুঝা সহজ নয়। আর একটী কথা, স্ত্রী জাতির সাহায্যে পুরুষ জাতির চরিত্রের এবং আন্তরিক বল বৃদ্ধি করে—সিদ্ধি অনায়াসে হস্ত গত হইতে পারে, স্বীকার করি। এখন বঙ্গসমাজের যে অবস্থা, বিশেষতঃ শতবৎসর পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল, তাহাতে সন্তানের কার্য্যের মত গুরুতর কার্য্যোপলক্ষে এরূপ বাঙ্গালীর স্ত্রীর সহায়তা অসহায়তার কথা খাটে না, কবি কোনরূপই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং উপন্যাসচ্ছলে ঘটনা অঙ্কিত করিয়া, অন্ধ বাঙ্গালীর প্রাণে যে শিক্ষা জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা ভাল হয় নাই। তবে মনের ভাবটী বুঝিয়াও সুখী হওয়া গেল। শান্তির অবতারণা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক হইয়াছে। এই নিষ্ফলতার সঙ্গে সঙ্গে জীবানন্দ, ভবানন্দের পতন ও অর্থ শূন্য হইয়াছে বলিলেও দোষ হয় না। এ শিক্ষার অপেক্ষা, যে ম্যাট্‌সিনীর ইতিহাস আনন্দ মঠের প্রাণে প্রাণে জড়িত, সেই ম্যাট্‌সিনী প্রভৃতির মত, সন্তান সম্প্রদায়ের প্রধান অধিনেতা চারিটীকে, ততবড় মহৎ ব্রত সাধণের জন্য, কিছুকাল স্ত্রীপুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া, অক্ষুণ্ণ চরিত্র রাখিলে বরং মন্দ হইত না।

তৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার উপরে দাঁড়াইয়া, বর্ত্তমান সময়ের আলোচনা করিলে কতক পরিমাণে বলা যায়—ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সে জ্ঞান, আনন্দমঠের অপেক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িয়া ভাল রূপ উপলব্ধি করা যায়। আনন্দমঠ তদপেক্ষা স্পষ্ট উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কন করা দূরে থাকুক, যাহা আঁকিয়াছেন্ তাহা অস্পষ্ট অনুমানলব্ধ। ইতিহাসানভিজ্ঞ চিত্র দেখিয়া কিছুই বোঝে না। মহাপুরুষ সেই কালের অন্ধকারে দাঁড়াইয়া, অমানুষিক দৃষ্টিবলে অথবা অনুমান দ্বারা যে সকল ভবিষ্যৎ বাক্য বলিয়াছেন, তাহা মানুষের মনের উপর দিয়া পদ্মপত্রের জলের মত গড়াইয়া যাইবে। উপন্যাসে উপদেশ অপেক্ষা চিত্র উপকারী। উপদেশের জন্য অনেক বই আছে, জ্বলন্ত জীবন্ত ছবি দেখাইতে, উপন্যাস এবং নাটকের সৃষ্টি।

মহাপুরুষের উপদেশের পরেও সত্যানন্দ যখন যুদ্ধ চালাইতে ইচ্ছুক, তখন মহাপুরুষের ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস থাকিলে, বুঝা যায়, বিদ্রোহী সত্যানন্দ আত্মঘাতে প্রস্তুত। কিন্তু সত্যানন্দ তখন জয়শ্রীযুক্ত। ভবিষ্যতে যদি তিনি জয়ী হইতেন, বস্তুতঃই হিন্দুরাজ্য পুনঃসংস্থাপিত করিতে পারিতেন। তবে কিন্তু তিনি আত্মঘাতী নন। এ সমস্যা কে পূর্ণ করিবে? ভবানন্দ জীবানন্দের প্রাণ তিনি ছিলেন। তাঁহাদের অভাবে সত্যানন্দের চেষ্টার ফল কি হইত, কে বলিবে? আর দেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা ইংরেজের নিকট শিক্ষার জন্য পরাধীনতা যে শ্রেয়, এ কথা কেই বা স্বীকার করিবে? যাহা হউক, এ সকল তখন কল্পনার স্বপ্ন মাত্র ছিল। মূলকথা, বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী ইত্যাদি কথার কোন বিভীষিকাময় চিত্র, বিপুলজয়পরিণাম আনন্দমঠে দেখান হয় নাই। কবি, ভবিষ্যৎ গ্রন্থে এ সকল চিত্র যদি দেখাইতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে সে ভূমিকা এখানে কেন? বঙ্কিম বাবু কি

বুঝিয়াছিলেন—"আনন্দমঠ পড়িয়া পাঠক এ সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না, সুতরাং ভূমিকার দরকার। ভূমিকারূপ সূত্র ধরিয়া, যদি তিনি, কল্পনাবলে, কিছু উপকার লাভ করিতে পারেন করুন।" অথবা অন্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে? সে কথা থাকুক্।

আমরা দেখিতেছি, বঙ্কিম বাবু সময়ের স্রোতে ভাসমান। তিনি জাতির বর্ত্তমান প্রকৃতির দাস। জাতি সাগরকে মন্থন করিয়া সুধা উৎপন্ন করিতে পারেন না। জাতীয় ভাব নিয়া, আদর্শ চিত্র অঙ্কিত করিয়া, সমাজের চরিত্র উদ্ধার করিতে জানেন না। ইনি সমাজের বর্ত্তমানের রুচি ও চরিত্রের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে সুপটু। তাই ভ্রমরের চিত্র, রোহিনীর চিত্র, দেবেন্দ্রের চিত্র, নগেন্দ্রনাথের চিত্র আঁকিতে সুদক্ষ। এ গায়ক যুবক যুবতীর প্রেমের-গান গাইতে ভাল বাসেন। আনন্দমঠের উচ্চ লক্ষের উপযোগী মহাচিত্রে তিনি রঙ্গ ফলাইতে পারেন নাই। আনন্দমঠের চিত্র গুলির গভীরতর অস্ফুটতাই তাহার প্রমাণ।

অনেকের মতে মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলাতে কাব্য ও নাটকচ্ছলে সাঙ্খ্যদর্শনের পুরুষ প্রকৃতি সম্বন্ধীয় মতাদি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আনন্দমঠের উপসংহার পাঠ করিয়া বোধ হয় যেন, বঙ্কিমবাবুও এই উপন্যাসচ্ছলে কোন নিগূঢ় তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে প্রতিপাদ্য বোধ হয়—জ্ঞান সহকৃত ভক্তি, কর্ম্মময় ধর্ম্ম, অনাসক্তিময় সেবা, মঙ্গলময় শক্তি। কবি দেখাইতেছেন, যে অন্ধভক্তি ভারতে চির অন্ধকার আনিয়াছে, তাহাকে জ্ঞানালোকে প্রতিভাত কর, সে অন্ধকার দূর হইবে। যে উদাস-ময় ধর্ম্ম দেশকে, সমাজকে প্রাণহীন, তেজোবিহীন করিয়াছে, তাহার সহিত কর্ম্মের এবং অসার আড়ম্বরাত্মক কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের যোগ স্থাপন কর, দেখিবে, এই মৃত নিদ্রিত জাতি জীবনময় প্রভাতে জাগিয়া জয় জয় রবে দিগদিগন্ত কম্পিত করিবে। ইহার দুর্জ্জয়-বলের নিকট সকল বল দলিত ও বিধ্বস্ত হইবে। উচ্চমনা কবি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে চান, যে বাঙ্গালী আত্মসার হইয়া স্বার্থের মোহিনী সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ভোগ এবং বাসনার সাগরে ভাসিয়া যাইতেছে, ওয়ালেস্ ও ম্যাট্সিনীর মত অনাশক্তি এবং আত্ম বিসর্জ্জন শিখাও, জগতের সেবায়, মায়ের সেবায় প্রাণদান করিতে শিখাও, ভোগ বাসনাকে পায়ে ঠেলিতে শিখাও, ভয় নাই—বাঙ্গালী মানুষের-সন্তান, ইহারও দ্বারা জগতে সুমহৎ কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে। কবি মহাত্মার মত বলিতে ইচ্ছুক—আপনার শিব পায়ে দলিয়া শান্তির আশায়-ভারতের আঁধারে আলস্যের শয্যা রচনা করিও না। ঐ দেখ শান্তি কার্য্যে, শান্তি বীরত্বে, তেজ এবং মনুষ্যত্বে, শান্তি সাহসে, শান্তি উন্নত ধর্ম্ম ও নীতিতে, শান্তি প্রফুল্লতাতে, শান্তি আত্মত্যাগ, সংযম ও অনাশক্তিতে। কল্যাণী এই শান্তির সহবাসে কৃত কৃতার্থ, কল্যাণী শান্তির রঙ্গক্ষেত্র উজ্জ্বল করিতে বিষপানজনিত ঘোর যাতনাকেও ভয় করে না। এই কল্যাণী মঙ্গলের প্রতিমূর্ত্তি। স্ত্রী-পুরুষ একত্র মিলিয়া যাও, প্রেম ও শক্তি একত্র কর, পূর্ণ কল্যাণ, পূর্ণ ধর্ম্ম হইবে।

কবি মনে করেন, এই জাতি যে দিন এই গূঢ় মন্ত্রে এই পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, সেই দিন মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে।

কবির আশা,—যে মা এক দিন বন্যহস্তী ও হিংস্র পূর্ণ অরণ্যময় ভূমিতে আপনার আসন স্থাপিত করিয়া, সুন্দর তেজ এবং প্রভায় জগৎ আলো করিতেছিলেন, ধন, ধান্যের বা ক্ষমতার যাঁহার অভাব ছিল না, যিনি আজ হৃত সর্ব্বস্ব শ্মশানময় দেশে নগিকা, দুঃখ যন্ত্রনায় কালিমাময়ী, সেই মহা দিনে, এই জন্ম ভূমি—এই জাতিরূপিনী মাতা, উজ্জ্বলতাময়ী, সুখ সৌভাগ্যের অবতার, বিবিধ শক্তি সম্পন্না হইয়া, দশদিক্ চমকিত করিবেন। বিদ্যা, ধন, বল, কিছু-রই অভাব থাকিবে না। সকল কার্য্যেই সিদ্ধি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবে। বীর-গণ শত্রুকে বিধ্বস্ত করিয়া মায়ের পায়ে বিদলিত করিবে। তাই কবি সত্যানন্দ দ্বারা মহেন্দ্রকে, মায়ের ত্রিমূর্ত্তি প্রদর্শন এবং তাহা-দের ব্যাখ্যা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আনন্দ-মঠের অলঙ্কার শূন্য সংক্ষিপ্ত অর্থ এইরূপ হইতে পারে। গ্রন্থকার ভাবে অধীর হইয়া উপসংহার কালে গ্রন্থের এই অলঙ্কারাচ্ছাদিত নিগূঢ়তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ব্যক্ত করিয়া ঠকিয়াছেন—অনিষ্ট করিয়াছেন। কালিদাস বাঙ্গালী কবির মত ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যাইতে জানিতেন না—ভাব হইলে তাহা সম্বরণ করিতে পারিতেন, তাই তাঁহার অভিজ্ঞান শকুন্তল জগতে অপূর্ব্ব পদার্থ। কালিদাস, বঙ্কিম বাবুর মত গ্রন্থের গূঢ়মন্ত্র ভেদ করেন নাই, না করিয়া সকল দিক বজায় রাখিয়াছেন। "জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে" ইত্যাদি কথা না বলিয়া চিত্র আঁকিয়া দেখান ভাল ছিল।

আনন্দমঠের দীক্ষাতে কিছু শিখিবার আছে। বাঙ্গালীর যাহা নাই তাহা শিখিবার আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিতেছিলাম—মানুষ অনন্ত ও সীমার সন্ধিস্থল। মানুষের ভাবগুলি অনন্তের ছায়াময়, কিন্তু শক্তি এবং তাহার সাধন শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতি সীমা-ময়। আবার একটুকু সূক্ষ্মরূপে ভাবিলে অনায়াসেই বুঝা যায়, ভাবই বাস্তব মানুষ। যে মানুষের জীবন এবং উন্নতি অনন্ত—যে মানুষ আপনার অস্তিত্বের বিলয় ভাবিতে অক্ষম, অনন্ত আশা ও সুখ শান্তির দাস, অনন্ত ভালবাসা ও অনন্ত জ্ঞানের পিপাসু, চেতনা যাহার আশ্রয়ে চেতনা,—সে মানুষ ভাবের মানুষ। আর শক্তি? শক্তি সাধন। শরীরাদি সাধন যন্ত্র। সমাজ? সমাজ শক্তির রঙ্গক্ষেত্র। উহাও সাধন যন্ত্র। এই মহাযন্ত্রের কার্য্য মানুষকে মানুষ করা, অনন্ত মানুষ যাহাতে অনন্তের দিকে যাইতে পারে, অনন্ত বিকাশ পাইতে পারে, তৎসাধনই ইহার কার্য্য। এই জন্যই বলিয়াছি, সমাজ উন্নতির সোপান, পরিত্রাণের দ্বার। যে সমাজ মানুষের এই পূর্ণ বিকাশোন্মুখতার প্রতিকূল, সে সমাজ বিষধর সর্পের ন্যায় অপকারী। যে বিষ সমাজের বিশুদ্ধতা বিনাশ করে তাহা সামাজিক মাত্রের পরম শত্রু। এই দানবের বধার্থ সমাজ মাতার প্রতি সন্তানের পক্ষেই যুদ্ধ ঘোষণা পরম কর্ত্তব্য। এই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র প্রতিজ্ঞা এবং সংযম, মৈত্রী এবং সাম্য। সন্তানের দীক্ষায় এই চারিটীই আছে। দীক্ষার পূর্ব্বে সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রের আলাপে এবং মহেন্দ্র ও শান্তির দীক্ষা কার্য্যে এই সকলেরই প্রকাশ আছে। সন্তান ভগবানের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছে, মায়ের উদ্ধার পর্য্যন্ত প্রাণপণে খাটিব, সকল ভোগ, সকল বাসনা—যাহা কিছু মায়ের কাজের বিঘ্নকারী তৎসমুদয়ই পায়ে ঠেলিব, জাতি ভেদাদি সকল বৈষম্য ভুলিয়া সকলে

এক মায়ের সন্তান হইব। পূর্ব্বের দীক্ষা, পূর্ব্বের মন্ত্র, পূর্ব্বের উপাসনা ত্যাগ করিয়া সকল সন্তানকে একমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে এবং এক উপাস্যের উপাসনা করিতে হইবে। সন্তানে সন্তানে বিবাদ বিসম্বাদ নিষিদ্ধ। সন্তানের শেষ প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পানে প্রাণত্যাগ করিব, ইহাই সন্তানের প্রায়শ্চিত্ত। বাঙ্গালী তোমার কি আছে? ইহার কিছুই নাই। তুমি প্রতিজ্ঞায় হীনবল, ভোগ বাসনার স্রোতে ভাসমান, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, ও অসার কৌলীণ্যপ্রথাদির-বিষময় নিশ্বাসে তোমার প্রাণের সাম্য ও মৈত্রী ভস্মীভূত। তুমি শেখ—মাতার সুসন্তান হইতে চাও ত, মাতার অপার দুঃখের জ্বলন্ত কাহিনী অন্তরে গাঁথিয়া, আজ আনন্দমঠের সন্তানের দীক্ষায় যাহা শিখিবার আছে, শেখ। ম্যাটসিনী এ মহাশিক্ষা জগৎকে অনেক দিন পূর্ব্বে দিয়াছেন, বঙ্কিম বিশেষ কিছু নূতন দেখাইতে পারেন নাই।

গ্রন্থকার, মহেন্দ্রের নিকট সত্যানন্দের মুখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সন্তান শক্তির উপাসক, সন্তান ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, এ ধর্ম্মে চৈতন্যের প্রেম নাই। আনন্দমঠে সন্তানের উপাস্য যে বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহা শক্তির অবতার মাত্র। সে মূর্ত্তি, প্রকাণ্ড, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিত হৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণায়মান, মধুকৈটভরূপক বিদলিত বিধ্বস্ত শত্রুদ্বয় ছিন্নমস্ত, রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত—তাহারাও সম্মুখে। লক্ষ্মী সরস্বতী ভয়ে ত্রস্তা হইয়া উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন। এই শক্তিময় দেবতার সাহায্যে সন্তান জন্মভূমি উদ্ধার করিবেন। তাই গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-দেব-যক্ষ-রক্ষ-পূজিতা মাতা অপূর্ব্ব শ্রী ও সৌন্দর্য্যে লক্ষ্মী সরস্বতীকেও ম্লান করিয়া সর্ব্বোপরি সেই দেব মূর্ত্তির মস্তকস্থিত রত্নমণ্ডিত আসনে বিরাজিত। কবির হৃদ্গত ভাব, সন্তানকে শক্তির আশ্রয়ে বর্ত্তমান কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে। শক্তি বলে বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, শত্রুভয় বিতাড়িত হয়। শক্তিই সন্তানের বীজমন্ত্র। সন্তানধর্ম্ম রজোগুণাত্মক ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম অর্দ্ধ ধর্ম্ম। প্রেম, ধর্ম্মের অপরার্দ্ধ। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি—কবি এই দুই অর্দ্ধ মিলাইয়া পূর্ণ ধর্ম্মের পরিষ্কার চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। মহাপুরুষের চরিত্রের অস্ফুটতাই তাহার কারণ। মহাপুরুষের যাহা হওয়া উচিত ছিল, চিত্রকর তাহা ফুটাইতে পারেন নাই। অথবা যে মহাপুরুষের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্দারা এ যোগ সম্পন্ন হইতে পারে না। আমাদের মতে তিনি এক জন পাকা রাজমন্ত্রীর মত লোক। বুদ্ধি বিবেচনা, তত্ত্বানুসন্ধান বেশ আছে, কিন্তু তাহার ধর্ম্মভাব প্রগাঢ় নয়। তিনি একদিকে যেমন কলকাটীর মত নৃশংস সন্তান বিদ্রোহের প্রবর্ত্তক, অপরদিকে জীবানন্দের প্রায়শ্চিত্তবিধানের অন্তরায়। কবি, শান্তির মুখে যত কথা বলাইয়াছেন তাহাতে জীবানন্দের মত স্থূল বুদ্ধি ভুলিতে পারে, কিন্তু অন্য লোক ভুলিবে না। জীবানন্দের প্রতিজ্ঞানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয় নাই। জীবানন্দের চরিত্রে কলঙ্ক ও পাপস্পর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মহাপুরুষ এই পাপের—এই অধর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা। তিনিই জীবানন্দকে বাঁচাইয়াছেন। মহাপুরুষ বেশ বুদ্ধিমানের মত কাজ গুছাইতে পারেন, কিন্তু পাকা প্রেমিক ভক্ত ধার্ম্মিক নন্।

মূলে আর একটী ভুল আছে। প্রেম অর্দ্ধধর্ম্ম নয়, শক্তি অর্দ্ধধর্ম্ম নয়। প্রেম পূর্ণ ধর্ম্ম; শক্তি কিছু না। ঈশ্বর প্রেমের অবতার। প্রাচীন ঋষিরা বলিয়াছেন ঈশ্বর "আনন্দম্" তিনি আনন্দ স্বরূপ। আনন্দই তিনি। আনন্দ হইতে এই ভূত সকল সঞ্জাত হইয়া আনন্দে অবস্থিতি করিতেছে। এই আনন্দ কি? বিশুদ্ধ প্রেম—ঘনীভূত প্রেম। প্রেমেই অনন্ত শক্তি এবং জ্ঞান নিহিত। একজন মানুষের প্রাণে এই প্রেম ঢালিয়া দেও, দেখিবে তাঁহার শক্তি দুর্জ্জয়, জ্ঞান অসীম হইবে। ঈশার কত শক্তি, কতজ্ঞান, বর্ত্তমান ইয়ুরোপ, জগতের শীর্ষস্থানে বসিয়া পরিমাণ করিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমান সভ্য জগতের সমস্ত অদ্ভূত শক্তি সেই শক্তি-সাগরের বুদ্‌বুদ্ মাত্র, সমস্ত উচ্চ-জ্ঞান সেই জ্ঞানের কণিকামাত্র। ঈশাতে এত জ্ঞান, এত শক্তি কে আনিয়া দিল? প্রেম। স্বধু একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেম হইতে সেই জ্ঞানরাশি, সেই শক্তিপুঞ্জ সমুদ্ভূত। এ কথা-গুলি চাক্ষুষ ব্যাপারের মত। প্রমাণের প্রয়োজন নাই। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে, স্পষ্ট বুঝা যাইবে, বিজ্ঞান দর্শনের প্রতিপাদ্য এই প্রেম। প্রেমের জন্যই সমাজ, পরিবার, শিক্ষা। প্রেমই মুক্তি, প্রেমই ভক্তি, মানুষের প্রাণ স্বধু এই প্রেমের জন্য পাগল। প্রেম ছাড়া শক্তি কি? কিছুই না। পাশব ক্রিয়াকে মানুষ ভ্রমক্রমে শক্তি বলিয়া থাকে। ইহা শক্তি নয়। উহা মানুষের জন্য নয়, সিংহ, ব্যাঘ্র ভল্লুকের জন্য। কোন অবস্থাতেই উহা মানুষের কাজে আসিতে পারে না। মানুষের নিকট উহা অধর্ম্ম। এইজন্য শক্তিকে অর্দ্ধ, প্রেমকে অর্দ্ধ করিয়া, পরে—উভয় অর্দ্ধের সংযোজনা করিতে না পারিয়া, তৃতীয় অসম্পূর্ণ ধর্ম্মের সৃষ্টিদ্বারা, কবি ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন্।

আনন্দমঠে মানবচরিত্রের ক্রমবিকাশের কোন চিত্র নাই। এ বাগানের মালী, আস্ত, আস্ত, বড় বড় ফুটন্ত ফুলগুলি দিয়া স্বপ্নের রাজ্যে বসিয়া মালা গাঁথিতেই সুপটু। কিন্তু একটীও অস্ফুট কলিকা ফুটাইয়া পাঠকের প্রাণে তাহার বৈচিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। কবি জীবানন্দ ও ভবানন্দের চরিত্র কিছু বিচিত্র করিতে চাহিয়াছেন। জীবানন্দকে আঁকিবার সময় তুলি আঁকা বাঁকা হইয়া চিত্রকরের হাতের কাঁচাম প্রকাশ করিয়াছে। নিমাইএর ঘরেই প্রথমে এই ছবির গলদ ধরা পড়িয়াছে। একজন সুমহৎ ব্রতধারী সত্যানন্দের দক্ষিণহস্তস্বরূপ প্রধান সন্তানাধিনায়ক, হটাৎই ঐরূপ বাচ্‌লাম বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে পারে না। তৎপরে আনন্দমঠে শান্তির সঙ্গে কলহ কালে এই কালিমা ঘনতম হইয়াছে। আমি জানি, স্কুল-কলেজের ছেলেরা এর চেয়ে ভদ্র। কেবল কলিকাতার রাস্তার ন্যাকামুটেদের মধ্যে কাহরও কাহারও ঐরূপ স্বভাব থাকিলে থাকিতেও পারে। ভবানন্দের চরিত্র; এর অপেক্ষা স্বাভাবিক বোধ হইল।

শান্তি এক অদ্ভুত রসের পুত্তলিকা। ইহাতে স্বাভাবিকত্ব কিছুই নাই। কোন কোন সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক, রাজস্থানীয় বীরনারীদের সঙ্গে শান্তির তুলনা করিতে চাহেন। সেরূপ তুলনাতে কোন কার্য্য হইলেও লাভ হইত না। কিন্তু তাঁহার চক্ষে যে রসাঞ্জন টুকু আছে, বিধাতা তাহাতে আমাদের এ পোড়া চক্ষুকে বঞ্চিত

করিয়াছেন। সুধু সুধু তোষামুদিতে ফল কি? শান্তির মত রমণী-কুলতিলক কাহারও পার্থিব চক্ষুতে কখনও পড়িয়াছে কি না জানি না। তবে মেয়েটী কিছু মিষ্টি মিষ্টি। মাঝে মাঝে বীণা বাজাইয়া, গান গাইয়া মোহময় মধুর মধুর স্বপ্ন ছড়াইতে সুপটু। কিন্তু স্বর্গের সুধার মত কেহ কখনও সে মেয়ে দেখে নাই। মিষ্টি বোধটী কেবল কল্পনা-প্রসূত। আর এ সুধা সুধাই বটে কিন্তু দোরসা—গন্ধ হইয়াছে। তোমার "উপপত্নী হব" যাহার প্রাণে সাধুতার প্রতি, সতীত্বের প্রতি রুচি আছে, যে অসাধুতা অসতীত্বকে পুরীষবৎ দুর্গন্ধময় নরকের জিনিষ মনে করে, সে স্ত্রী কোন অবস্থাতেই এ প্রতিজ্ঞা করিতে পারে না। তাহার মুখে ও কথা সরে না।

তবে শান্তির অবতারণার মধ্যে কিছু অর্থ আছে। রমণী সমাজের সমার্দ্ধ। রমণী কার্য্যক্ষেত্রে উৎসাহরূপিণী, বাহুতে শক্তি-রূপিণী, হৃদয়ে অমৃতস্রোতস্বিনী। পৃথিবী রমণীকে ছাড়িয়া অর্দ্ধবলহীন বিষম ক্ষতি-গ্রস্ত। বামাকুল সমাজের নীতি ও ধর্ম্মের রক্ষাবন্ধনী। শান্তির আবির্ভাব, জগতে এই কথা প্রচার করিতে। শান্তি পৃথিবীর সন্তান হইলে, অধীর বাঙ্গালী কবি, শান্তির মুখ দিয়া সুধু সুধু এক আধটা বেফাস কথা বাহির না করিলে, সোণায় সোহাগা হইত।

সত্যানন্দের চরিত্র কিছু স্বপ্নময়, কিছু ঐন্দ্রজালিকতাপূর্ণ, কিন্তু আসক্তি বর্জ্জিত এবং কার্য্যময়। তাঁহার হৃদয়ে মাতৃভক্তি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং তেজ একত্র সমাবিষ্ট। জটিলতাভেদী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সরলতা-ময় অন্তর তাঁহার উচ্চ ভূষণ। কিন্তু কাঞ্চন শৃঙ্গের শীর্ষস্থ মণি যেমন কেবল দেবচক্ষুরই বিনোদনকারী, মনুষ্যের হস্তের অতীত, সত্যানন্দও সাধারণ জীবনের পক্ষে তাই। অদ্ভুত চরিত্রে জনসমাজের উপকার অল্পই হয়। আনন্দমঠের চরিত্র গুলির প্রায়ই পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। সত্যানন্দের চরিত্রও কবি ভাল করিয়া ফুটাইতে পারেন নাই। ইহা প্রভাতের ছবির মত অতি অস্ফুট।

জীবানন্দের প্রায়শ্চিত্তের খেলা খেলিয়া বাঙ্গালীর কুসুম কোমল প্রাণের দুর্ব্বলতা না দেখালেই ভাল হইত। জীবানন্দের মৃত-দেহ বাঁচাইয়া চারিকুল রাখিতে গিয়া, সকল কুলের ধ্বংস হইয়াছে। এ প্রতিজ্ঞা নয়, এ প্রায়শ্চিত্ত নয়, সুধু ফাঁকি। এর চেয়ে সেই অজয়তীরে শ্মশান সাজাইয়া, জীবানন্দের মৃতদেহ নিয়া, সেই মাঘিপূর্ণি-মার নৈশ নিস্তব্ধতা পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত, অনন্ত বিস্তৃত নীলাম্বর তলে তারা চন্দ্র সাক্ষী করিয়া, গগনস্পর্শী জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরা শান্তির পক্ষে সহস্র-গুণে ভাল হইত, জগতের উপকার হইত, জীবানন্দের স্বর্গলাভ হইত, প্রতিজ্ঞার আদর, প্রায়শ্চিত্তের অর্থ থাকিত। পৃথিবী শান্তির সকল দোষ ভুলিয়া যাইত। কল্যাণীর স্বপ্নটা কিছু পরামর্শ করিয়া হইয়াছে। কল্যাণীর জীবনদান আর একটী অসাধারণ ঘটনা।

আনন্দমঠের-যুদ্ধ কাণ্ডে ও স্বাভাবিকতা কম। যায়গায়, যায়গায়, যুদ্ধের সজ্জা এবং যুদ্ধকালে অধিনায়কদিগের গল্প ও রসিকতা বড় স্বাভাবিক হয় নাই। কোন স্থলে অসংখ্য সেনা মারা গিয়াছে তথাপি শান্তির দাড়ীর চুল টলে নাই, খোলে নাই, কমে নাই, যা তাই রহিয়াছে। যাহাই হউক, কচিমেয়ে, কচিছেলের পীরিতের কুসুমশয্যা রচনা করিয়া ঘুমিয়া ঘুমিয়া স্বপ্নে ক্ষুদে

ক্ষুদে পরীর সঙ্গে যুঁইফুলেরমালা গাঁথিতে গাঁথিতে বাঁশীতে ভালবাসার গান শোনার অপেক্ষা, যুদ্ধক্ষেত্রের ভীতি-প্রকট গম্ভীর দৃশ্য, বিশ্ব-বিকম্পন তূর্য্যনিনাদ ভাল লাগিল। অজাত শ্মশ্রু যুবক, পড়া শুনা এবং সকল উন্নতির কপালে জলাঞ্জলি দিয়া, বিরহের আগুণে জ্বলিয়া, পুড়িয়া, ছট্ ফট্ করিয়া, একবার জলে পড়ে, আবার ডেঙ্গায় ওঠে, এদৃশ্য দেখার অপেক্ষা, জাতীয় বীরগণ, ন্যায় এবং মানবজাতির পরিত্রাণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, সেই বিশ্ব-বিজয়ী নামে হুঙ্কার করিতে করিতে সাহস ভরে, বীর দর্পে, সমরক্ষেত্রে ধাইতেছে, দুষ্ট দমন করিতেছে এবং আপনার রুধিরে মায়ের পাদপ্রক্ষালন করিয়া, হাসিতে হাসিতে স্বর্গে যাইতেছে, এইরূপ কল্পনার তরঙ্গে ঝাঁপ দেওয়াতেও প্রাণের পবিত্র সুখ আছে। একবার আঁধারে বিদ্যুৎ চমকিল, আর তের বৎসরের অবোধ মেয়ে, ঘরে গিয়া, প্রেমের দায়ে অধীর হইয়া, খাটের গায়ে হিজি, বিজি, বাসবদত্তা লেখে, এ গল্প শোনার অপেক্ষা, যুবতী রণোন্মাদিনী হইয়া, মায়ের উদ্ধারের জন্য—দেশের জন্য—বীর পত্নীর ন্যায় বীর পতির সাহায্যার্থ সমরক্ষেত্রে নির্ভয়ে বেড়াইতেছে, এইরূপ অস্বাভাবিক কাল্পনিক গল্পও শুনিতে ভাল বোধ হয়।

"কলয়সি করবালং" এ যুদ্ধের হুঙ্কার, না নূতন বরের মাথায় বাঙ্গালীর এয়োরা ফুল ছড়াইতেছেন? ছি—ভাই বাঙ্গালী! তুমি যুদ্ধের বীরত্বে ও ফুলের কোমলতাময় স্পর্শ সুখ ভুলিতে পার না?

আনন্দমঠের একটী অনুমান খণ্ড আছে। তাহাতে অনুমান করিতে হইবে, কল্যাণীর নিকট প্রথম দেখা দিবার পূর্ব্ব থেকেই, সত্যানন্দ তাহার বিপন্ন অবস্থা টের পাইয়াছিলেন। কল্যাণীর স্বপ্নের কারণ তিনিই। নগরের কারাগৃহে যে, সত্যানন্দ দ্বারে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া মহেন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি এখনই খালাস হইবে", অনুমান করিতে হইবে, কোন সূত্রে তিনি জানিতেন বা বুঝিয়াছিলেন যে, এখনই লোক আসিবে। নতুবা এ সকল নিতান্ত অমানুষিক ব্যাপার হইয়া পড়ে। আর ঐতিহাসিক ঘটনা দ্বারা অনুমান করিতে হইবে—নগরের মুসলমান রাজা যেরূপ অকর্ম্মণ্য এবং তাঁহার রাজত্ব কালে রাজ্যে যেরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, তৎপরেই যখন তাঁহার হস্ত হইতে ইংরেজেরা রাজ্য ভার নিয়া সুশাসন করিতেছেন, তখন বলিতে পার—"ইংরেজেরা বাঙ্গলা দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" ইত্যাদি আরও এক আধটা অনুমান না করিলে চলে না, এবং আনন্দমঠের অনেক গল্প সুধু মায়ার ব্যাপার হইয়া পড়ে। এ সকল সত্বেও বর্ত্তমান সময়ে আনন্দমঠের মত গ্রন্থের প্রয়োজন এ দেশে যথেষ্ট।

"বন্দে মাতরং" ইত্যাদি এই গাথাটী জ্বলন্ত মাতৃ ভক্তির প্রবাহস্বরূপ। বঙ্গের প্রতি সন্তান, যে দিন প্রাণ খুলিয়া, নীল আকাশ বক্ষ কম্পিত করিয়া, এই সঙ্গীত গাইবে, সে দিন আর মায়ের মুখ কেহ মলিন দেখিতে পাইবে না। মাতৃ-ভূমিকে কেমন করিয়া প্রাণে গাঁথিতে হয়, কেমন করিয়া তন্ময় হইতে হয়, কিরূপে আসক্তি এবং বাসনা ত্যাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তাঁহার পূজায় প্রাণ, মন, জীবন দান করিতে হয়, সন্তা-

নের চিত্র, অসম্পূর্ণ হইলেও, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। আমরা বিশ্বাস করি, বঙ্গের মহা-গায়ক আজ আনন্দমঠে যে সঙ্গীত গাইয়া, হৃদয়ের যে জলন্ত ভাবস্রোতে এই মৃত জাতিকে ভাসাইলেন, বঙ্গের সন্তানগণ, এ উপকার অনন্ত কালেও ভুলিবেন না।

দুঃখের বিষয়, আনন্দমঠের ভাষাও ঠিক বঙ্কিম বাবুর লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই। আমরা বঙ্কিমবাবুকে সম্মান এবং ভক্তি করি। তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ, কবিত্ব হৃদয়-উন্মত্তকারী এবং সমুচ্চভাবব্যঞ্জক। তাঁহার শিষ্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেও আমরা কুণ্ঠিত নই। অতএব "দ্বিষত্তিমন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং" কালিদাসের এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া, আনন্দমঠের সমালোচনা করিলাম না। আনন্দমঠের শিক্ষা, বঙ্গ সমাজ সাদরে গ্রহণ করিবে। এই শিক্ষার ভালমন্দ বিচারে আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান, আমাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছে। আমাদের মতে আনন্দমঠ লিখিতে গিয়া, বঙ্কিম বাবু বিশেষ কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। আনন্দমঠ প্রায় আগাগোড়া ম্যাট্‌সিনীর জলন্ত জীবন্ত ইতিহাসের ছায়ায় অঙ্কিত। কিন্তু সন্তান, অন্ধশক্তির উপাসক। সে শক্তি পাশব। এই শক্তির গর্ব্বেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের লোমহর্ষণ ব্যাপার নিহিত ছিল। নীহিলিষ্ট এবং সোসিয়ালিষ্টগণ এই পৈশাচিক শক্তির উপাসক। ভাবী ইয়ুরোপ বক্ষে যে খাণ্ডবাগ্নি ধূমায়মান অনুমিত হইতেছে, যদি জলিয়া উঠে, বলির—সে মহা দাহও এই বিষময় শক্তির গরলময় ফল। আনন্দমঠে সন্তানগণও এই শক্তির সেবক। ইহা নীতি এবং ধর্ম্ম জ্ঞান বর্জ্জিত। ছোট ছোট সন্তান, লুট পাট করে, নির্দ্দোষী প্রজের বাড়ী গিয়া "গোপিনী" তল্লাস করে, ঘরের টাকা কড়ি কাড়িয়া নেয়, দোকানের দ্রব্য কাড়িয়া খায়, আর ঘরে আগুন দেয়। বড় বড় সন্তান হাওয়ালদারের চাউল লুটিয়া বৈষ্ণব সেবায় লাগায়, কোম্পানীর টাকা লুটিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করে। এ দুর্নীতিকে পাপ মনে করে না। ভবানন্দ তাহার যুক্তি জানেন, মহেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিয়া ছিলেন, ও কাজে দোষ নাই। ভবানন্দ পরস্ত্রীর প্রতি, মহেন্দ্রের মত বন্ধুর স্ত্রীর প্রতি, পাপ আশা পোষণ করেন। শান্তি পরপুরুষের নিকট উপস্থিত অঙ্গীকার করিয়া বাজি রাখিতে পারে, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অন্ধ শক্তির উপাসক, নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য সন্তানের সহিত, পবিত্রাত্মা ম্যাট্‌সিনীর নাম করিতেও লজ্জা এবং দুঃখ বোধ হয়। নিমাইয়ের বাড়ীতে শান্তি ও জীবানন্দের আলাপ সুন্দর বোধ হইল। ভবানন্দের সহিত কল্যাণীর আলাপের মধ্যে কিছু গভীর অর্থ আছে। কল্যাণীর শেষ কথা, তাঁহার মনের বল এবং তেজের পরিচায়ক। ধীরানন্দ গোসাঞী, ভবানন্দের কাছে, কতকটা মিথ্যা চালাকি করিয়াছেন। সত্যানন্দ তাহার প্ররোচক। সন্তানগণের নীতি জ্ঞান অতি দূষিত। মহাপুরুষ হইতে সত্যানন্দাদি সকলেই এই দোষাশ্রিত।

গ্রন্থকার স্থানে স্থানে চমৎকারিত্ব বা অদ্ভুত রসের অবতারণা করিতে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। উপক্রমণিকাতে, সেই সূচি-ভেদ্য তমসাচ্ছন্ন, নৈশ নিস্তব্ধতাময় গহন অরণ্য ভেদ করিয়া যে গম্ভীর প্রশ্ন ও উত্তর উঠিতেছিল, তাহা পাঠ করিতে করিতে মনে বেশ অদ্ভুত রসের

সঞ্চার হয়। অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা, অর্দ্ধ নিদ্রিতার ন্যায় স্বপ্নময় চেতনা কল্যাণীর নিকট সেই জ্যোৎস্নাসিক্ত অরণ্যে সত্যানন্দ প্রভু শুভ্র বেশ, শুভ্র শ্মশ্রু ধারণ করিয়া "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" গাইতে গাইতে দর্শন দিলেন। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, মহেন্দ্রের কোলে মাথা রাখিয়া বীণা-নিন্দিত স্বরে কল্যাণী গাইতে লাগিল "হরে মুরারে মধুকৈটভারে।" শোকার্ত্ত মহেন্দ্র প্রাণ ভরিয়া, হৃদয় ভাসাইয়া, উন্মত্তের ন্যায় সেই সঙ্গে গাইতে লাগিল "হরে মুরারে মধুকৈটভারে।" অমনি আনন্দ কানন হইতে গম্ভীর ঝঙ্কার উঠিল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে!" তিন স্বর একত্র হইয়া সুধার সাগরে বন্যা বহাইল, কানন ডুবিয়া গেল, প্রান্তর ভাসিল, নদীর কলরব, পাতার মর্ম্মর ধ্বনি, পক্ষীর মধুরস্বর, গাইতে লাগিল "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" জগৎ সেই গীতিময় হইল। শান্তি গৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই রাত্রিতে একটী গান গাইয়া গ্রামবাসীদিগকে চমকিত করিল। আবার সেই শীকারী ইংরেজ সেনাপতি সাহেবকে বোকা বনাইয়া, শান্তি গাইল—"এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে? ইত্যাদি।" সারঙ্গের স্বরে মিশিয়া দূর অরণ্যে স্বর তরঙ্গ উঠিল—"এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে? ইত্যাদি।" অবশেষে শান্তি গাইতে গাইতে ছুটিল, সেই সারঙ্গের স্বরে মিশিয়া সেই স্বর ও গাইতে লাগিল। পরিশেষে সেই লতা-কুটীরে শান্তি আর জীবানন্দের সাক্ষাৎ হইল। আর এক দিন শান্তির সঙ্গে সত্যানন্দের গানের মহলা চলিল। আবার একদিন ব্যাকুল চিত্ত ভবানন্দের প্রার্থনার উত্তর নৈশকানন ভাসাইয়া আকাশে একবার মাত্র উঠিয়াই নীরব হইল। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল স্থানেই কবি পাঠকের প্রাণে স্বপ্নের আবিল, ঐন্দ্রজালিক ভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পাঠ করিতে করিতে সময় সময় ভায়া কমলাকান্তকে মনে পড়িতে লাগিল। যে দিন মাত্রা কিছু বেশি হইত, সেই দিন, তাঁহার মুখে এই রকম অনেক কথা শুনা গিয়াছে। রসিকতা গুলি স্থানে স্থানে যত্ন নষ্ট করিয়াছে বটে, কিন্তু মিষ্ট বোধ হইল।

কবি নিজ কলমে আনন্দমঠকে উপন্যাস বলিয়া কোথাও কিছু বলেন নাই। সাধারণের বিশ্বাসানুসারে আমরা এই গ্রন্থকে উপন্যাস মনে করিয়াছি। উহাকে রূপকময় আখ্যায়িকা বলিলেও বলা যায়, কিন্তু তাহাতে আনন্দমঠের গৌরব কিছুই থাকে না।

উপদেশ কিম্বা যুক্তিতর্ক অনেক সময় মানুষের মনের উপর দিয়া পদ্মপত্রের জলের মত গড়াইয়া যায়। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে উপযুক্ত বর্ণে কোন চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিলে, মনুষ্যের প্রাণে তাহা পাষাণাঙ্কনের ন্যায় চিরদিন চিত্রিত থাকে। নাটক এবং উপন্যাস, এই চিত্রের চিত্র পট। কবি নাটকে, অন্ততঃ কোন জাতির সাধারণ চরিত্র সংগ্রহ করিয়া, সেই বর্ণে আদর্শ স্ত্রী পুরুষের ছবি অঙ্কিত করেন। নাটকের এই চিত্র শুধু অন্তর্জ্জগৎ নিয়া। নাটকের নায়ক নায়িকা, মানবজাতির সাধারণ নিয়মানুসারে আপনাদের কার্য্য করিয়া যান। রঙ্গ ক্ষেত্রে সেই কার্য্য অভিনীত হয়। উপন্যাসের এই চিত্র শুধু অন্তর্জ্জগৎ নিয়া নয়, অন্তর এবং বহির্জ্জগৎ নিয়া। উপন্যাসে কবি, একবারে. নায়ক নায়িকার কর্ম্ম বহির্জ্জগতের সহিত তুলনা করিয়া বর্ণনাপূর্ব্বক পাঠককে বুঝাইয়া দেন। অভি-

নেতার সাহায্য বিনা পাঠক নিজেই সেই ছবি প্রাণে গাথিয়া রাখিতে সমর্থ হন। নাটক বা উপন্যাসের এই চিত্র যত অধিক সংখ্যক মানবের আদর্শ হইবে, গ্রন্থ তত উন্নত হইবে। এই গুণে কালিদাস বা সেক্‌স্‌পীয়র জগৎ বিখ্যাত কবি—মহাকবি। অভিজ্ঞান শকুন্তল এবং সেক্‌সপীয়রের নাটকাবলী সাধারণ মানব জাতির আদর্শ স্থানীয়। আনন্দমঠের কবি, আনন্দমঠের চিত্রগুলি, স্বধু বাঙ্গালীর আদর্শও করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দুঃখ হয়, বঙ্গের প্রধান উপন্যাস লেখক বা কবির হাতের এই চিত্র। আনন্দমঠের শেষ শিক্ষা, পূর্ণধর্ম্ম, পূর্ণ শিক্ষা চাই। সন্তানের অর্দ্ধধর্ম্ম, অর্দ্ধ শিক্ষায় দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। কবি সত্যানন্দ আর মহাপুরুষের যোগে সেই পূর্ণধর্ম্ম, পূর্ণশিক্ষা, দেখাইতে চাহিয়াছেন। এ যোগ অস্ফুট হইয়াছে। ভাল হয় নাই। ঈশ্বর আমাদের আশার অন্ধকার গগনে উজ্জ্বল সুখ-তারার স্বরূপ বঙ্কিম বাবুর মূল্যবান জীবন সুদীর্ঘ করুন। ভবিষ্যতে হয় ত আশা পূর্ণ হইবে।

বাল্মীকি ও বেদব্যাস। নং ২

যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। তাহার ২৫। ২৬ বৎসর পরে 'শক' কাল আরম্ভ হয়। এক্ষণে ১৮০৪ শক, গতিকেই উভয় অঙ্ককে যোগ দিয়া ৪৩৩০ বৎসর হইল যে যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা পরিশুদ্ধ রূপে আমরা স্থির করিতে পারিলাম। পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দরাজের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত ১১১৫ বৎসর অতীত হইয়াছিল। অতএব নন্দরাজ কত দিন হইল রাজা হইয়াছিলেন তাহাই জানিতে পারিলে, পরীক্ষিতের জন্মকালও আমরা নির্ব্বিঘ্নে স্থির করিতে পারি। পরীক্ষিতের রাজত্ব সময়ে সপ্তর্ষি মঘা নক্ষত্রে ছিলেন এবং এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষি মণ্ডল শত বৎসর অবস্থিতি করেন। এইক্ষণ নন্দরাজ কতদিন হইল রাজা হইয়াছিলেন, তাহাই লাভ করিতে পারিলে বর্ত্তমান সময়ে সপ্তর্ষি যে কোন্ নক্ষত্রে আছেন, তাহাও আমরা বলিতে পারি।

অনন্তর ৩৩৯৭ বৎসর হইল অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত হওয়া সত্য হইলেও তদ্দ্বারায় রামায়ণ রচয়িতার নবীনত্ব প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। যেহেতু সঙ্কলিত শব্দের অর্থ রচিত নহে। সংগৃহীত অর্থাৎ পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করা বুঝায়। প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে এস্থানে সঙ্কলিত শব্দের অর্থ রচিত হওয়া বলিয়াছেন, উহা তাঁহাদের ভ্রম (১২)। ৩৩৯৭ বৎসর হইল অথর্ব্ববেদ

(১২) এই চতুর্থ বেদখানি কোন সময়ে বিরচিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত হইলে আমরা বাল্মীকির নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িব। পাঠক! এই সাধনটী অসাধ্য নহে, অথর্ব্ব বেদের ১৯ কাণ্ডের ৪৪সূক্তে দৃষ্ট হয় যে, উহার সঙ্কলন কালে কৃত্তিকানক্ষত্র রাশি চক্রের প্রথমে এবং অশ্লেষার শেষে অর্থাৎ মঘার প্রথমে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল। এস্থলে ত্রিকোণমিতি এবং জ্যোতিষ সূত্রানুসারে গণনা করিলে নিশ্চত হয় যে, ৩৩৯৭ বৎসর (১৪) অতীত হইল অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত হইয়াছে।

রচিত হইয়া থাকিলে মহাভারতকেও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হয়। অপর, ৪৩৩০ বৎসর হইল যুধিষ্ঠিরেরা রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু অথর্ব্ববেদ ৩৩৯৭ বৎসর হইল রচিত হইয়াছে. এই যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের ৯৩৩ বৎসর পরে অথর্ব্ব বেদ হওয়া নিশ্চিত হয়। যুধিষ্ঠিরের ৯৩৩ বৎসর পরে যে অথর্ব্ববেদ রচিত হইল, সেই অথর্ব্ববেদী অঙ্গিরসের উপাখ্যান এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস কখনই মহাভারতে লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না (১৩)। যাহাই হউক, মহাভারতের পূর্ব্বেই যে অথর্ব্ব বেদ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে স্পষ্টই প্রকাশ আছে। (১৩)।

বেদ যে হিন্দুদিগের আদি ধর্ম্ম শাস্ত্র, এবং বেদ বলিতেই যে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই চারি বেদকেই বুঝায়, তাহা আর প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে হয় না। কারণ, এ একটী প্রধান প্রসিদ্ধ কথা। যাহা হউক, তথাপি অথর্ব্ব বেদ যে কত দূর প্রাচীন গ্রন্থ, তাহা প্রমাণ দ্বারাও প্রদর্শিত হইতেছে।

"যদা মৎস্যাবতারেণহরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ।
তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদংসাঙ্গমবাপ্তবান্॥
অথর্ব্বান্তর্গতং সম্যগায়ুর্ব্বেদঞ্চ লব্ধবান্।
একদা স মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ॥

চানক গ্রাম নিবাসী নারায়ণ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত, আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ। ১৪

যে কালে মৎস্যাবতার হরি কর্ত্তৃক বেদ উদ্ধৃত হয়, সেই সময়ে অনন্ত সাঙ্গবেদ ও অথর্ব্ব বেদান্তর্গত সম্যগায়ুর্ব্বেদ লাভ করত একদা তিনি পৃথিবীর অবস্থা দৃষ্টি করিতে চরের ন্যায় আগত হইলেন।

"বিধাতাথর্ব্বসর্ব্বস্ব মায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ন্।
স্বনাম্না সংহিতাঞ্চক্রে লক্ষশ্লোকময়ীমৃজুং।"

ব্রহ্মা অথর্ব্ব বেদের সার ভাগ আয়ুর্ব্বেদকে প্রকাশ করিয়া তাহার পরে সরল ভাষায় লক্ষ শ্লোক বিশিষ্ট ব্রহ্মসংহিতা রচনা করেন।

"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ব—
বেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্র-
মধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূ।"

সুশ্রুত সংহিতা।

ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বেই অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ এই আয়ুর্ব্বেদ এক লক্ষ শ্লোক এবং সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো
হথর্ব্ব বেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং
চ্ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথপরা যয়া
তদক্ষর মধিগম্যতে।" মুণ্ডকোপনিষৎ।

ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সকল অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং যে বিদ্যা দ্বারা অবিনাশী পরব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

৪র্থ ভাগ কল্পদ্রুমের ৮ সংখ্যার ৪০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

১৩ মহাভারতীয় উদ্যোগ পর্ব্ব দেখ।

১৩ ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ। ইতিহাস পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে। ২১ তত্র বেদা-দ্রুমৈর্ধৈ-র্ধার্য্যান্তে পুরুষৈর্যথা। এবঞ্চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ। ২৫ স্ত্রীশূদ্রদ্বিজ বন্ধূনাং এয়ীন শ্রুতি গোচরাঃ। কর্ম্ম শ্রেয়সী মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। ২৬ ইতি ভারত নাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং। ইত্যাদি।

অনুক্রমণিকাধ্যায়।

১৪ ইহাতে চরক, সুশ্রুত, হারীত প্রভৃতির বচনাবলি সংগৃহীত হইয়াছে।

পাঠক! ব্রহ্মার মানস পুত্র যে অঙ্গিরস (১৫) তিনিই অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ। (১৬)। অতএব অথর্ব্ববেদ যে কত প্রাচীন, তাহা অথর্ব্বাঙ্গিরস এই কথা হইতেই বিশেষ রূপে জানিতে পারা যায়।

পৃথিবীতে সর্ব্বসহিত যখন অষ্টাবিংশতি বেদব্যাসের জন্ম হওয়া পুরাণাদিতে প্রকাশ আছে, তখন মহাভারতকর্ত্তা বেদব্যাসের শিষ্য হইতেই যে যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করি না। এ সম্বন্ধে প্রতি পক্ষ মহাশয়েরা যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও ব্যাস শিষ্য, এই মাত্র জানিতে পারা যায়। (১৭) আমাদের বোধ হয় যে, বৈশম্পায়ন ইহতে যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি প্রথম ব্যাসের শিষ্য হইবেন।

"রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, (১৫) "তৈত্তিরীয় শাখাবিৎ আচার্য্য কৌশল্যাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আইসেন।"

"(১৫) কৌশল্যাংচয আশীর্ভির্ভক্ত
পর্য্যপতিষ্ঠতি।
আচার্য্যতৈত্তিরীয়ানা মভিরূপশ্চ বেদবিৎ।
১৫৩

৪ ভাগ কল্পদ্রুমের ৮ সংখ্যার ৪৫৮ পৃষ্ঠা।

আমরা কল্পদ্রুমোধৃত উল্লিখিত রামায়ণ বচনটি বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের কোথাও দেখিতে পাইলাম না। পরিশেষে সমস্ত আদিকাণ্ডে অনুসন্ধান করিলাম, তাহাতেও উক্তবচন দেখিতে পাইলাম না। প্রতিবাদী মহাশয়েরা ঐ বচনটী যে কোন্ রামায়ণ হইতে বাহির করিয়াছেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। যাহা হউক্ বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল; পাঠকমহাশয়েরা দৃষ্টি করিবেন।

তাঃ সর্ব্বাগুণসম্পন্নাঃ রূপযৌবন সংযুতাঃ।
দৃষ্টা সর্ব্বাত্মকো বায়ুরিদং বচনমব্রবীৎ। ১৫

অতএব রামায়ণে তৈত্তিরীয় শাখার উল্লেখ থাকা সপ্রমাণ করিয়া যে প্রতিবাদী মহাশয়েরা রামায়ণ প্রণেতাকে মহাভারতের পরবর্ত্তী বলিয়াছেন, তাহা সত্য হইতেছে না।

রামায়ণের একটী শ্লোকের সহিত মনুসংহিতার একটী শ্লোকের ঐক্য দেখিয়া (১৮) প্রতিবাদী মহাশয়েরা এই কথা বলেন যে, বর্ত্তমান মনুসংহিতার রচনা প্রণালী যখন অতীব প্রাঞ্জল, তখন উহা আধুনিক কোন ব্যক্তির রচিত। যেহেতু, সত্য-

১৫ ভৃগুংপুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গরসন্তথা।
মরীচিং দক্ষ মত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসান্। ৫
নব ব্রাহ্মণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ। ৬
ইত্যাদি।
৭ অধ্যায় ১অংশ, বিষ্ণু পুরাণ।

মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের ৬২ অধ্যায়ের ১০ ও ৬৩ অধ্যায়ের ১। ৪ শ্লোক দেখ।

১৬ মহাভারতীয় উদ্যোগ পর্ব্ব দেখ।

১৭ যজুর্ব্বেদতরোঃ শাখা সপ্তবিংশন্মহা মতিঃ। বৈশম্পায়ননামাসৌ ব্যাস শিষ্যশ্চকার বৈ। ১
৫অধ্যায়। তৃতীয়াংশ, বিষ্ণুপুরাণ।

১৮ রাজভির্ধৃত দণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলা স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃসুকৃতিনো যথা। ৩১
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বাস্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজাত্বশাসনপাপস্য তদা প্নোতি কিল্বিষং।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ১৮ সর্গ।

রাজনির্ধৃত দণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্ম্মলাঃ স্বর্গ মায়ান্তি সন্তঃসুকৃতিনো যথা। ৩১৮
শাসনাদ্বাপিমোক্ষাদ্বা স্তেনঃ স্তেয়াদ্বিমুচ্যতে।
অশাসিত্বাতু তংরাজা স্তেনস্যাপ্নোতি কিল্বিষং। ৩১৬
মনুসংহিতা।

যুগের গ্রন্থ ঐ রূপ প্রাঞ্জল কোন মতেই হইতে পারে না। অতএব বাল্মীকি যখন বর্ত্তমান আধুনিক মনুসংহিতার বচন রামায়ণে সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণের অনেক পরবর্ত্তী।

উল্লিখিত আপত্তিটী খণ্ডন করিতে গিয়া আমরা প্রথমত এই কথা বলি যে, যে সময়ে বঙ্গদেশ ঘোরান্ধকারে আবৃত হইয়াছিল, ধর্ম্মের ভাণ করিয়া যৎকালে বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রত্যেক দিনে সহস্র সহস্র রমণীর প্রাণ সংহার করিতেন, যে সময়ে আপন সদ্যোজাত শিশুকে মাতা অনায়াসে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিতেন, এবং পুত্র মাতাকে, ভ্রাতা ভগিনীকে ও পিতা কন্যাকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতেন, সেই সময়েই যদি বঙ্গদেশে রামমোহন রায়ের জন্ম হইয়াছিল, তবে সত্যযুগেও সুলেখক থাকা অধিকতর আশ্চার্য্যের বিষয় কি?

পাঠক! প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে বলিয়াছেন, বর্ত্তমান মনুসংহিতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পরে রচিত হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিলাম, কিন্তু মনুসংহিতা যখন সত্যযুগের ধর্ম্ম শাস্ত্র (১৯) তখন পুরাতন একখানি মনু যে ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না। অতএব বাল্মীকি বর্ত্তমান মনুসংহিতার বচন রামায়ণে সংগ্রহ করেন নাই। তিনি প্রাচীন মনুর অর্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক রামায়ণে যে শ্লোক দুইটী রচনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান মনুকারই স্বীয় গ্রন্থকে প্রাচীন বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মাইবার মানসে সেই বচন দুইটী আপনার গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তর্ক স্থলে এই কথাটী বলিলাম, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ভিন্ন দেশের দুই ব্যক্তির মুখ হইতেও যে অবিকল একটী শ্লোক বাহির হইতে পারে, তাহা বহুদর্শী পাঠক বোধ হয় কোন মতেই অস্বীকার করিবেন না।

কেহ কেহ নিম্নলিখিত হেতু দেখাইয়া রামায়ণ প্রণেতা বাল্মীকির রাম জন্মিবার পরে ভূতলে প্রাদুর্ভূত হওয়া প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন, বাল্মীকি ভৃগু কুলোৎপন্ন। (২০) এবং পরশু রাম ও ভৃগুবংশীয়। রাম আর ভৃগু রাম যে (২১) এক সময়ে জীবিত ছিলেন, রামায়ণে তাহা স্পষ্টই প্রকাশ আছে। ভৃগু হইতে ষষ্ঠ পুরুষে আমরা পরশু রামকে দেখিতে পাই, (২২) কিন্তু বাল্মীকিকে দেখিতে পাই না।

১৯ "কৃতেতু মানবো ধর্ম্ম স্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ। দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতঃ কলৌপারাশরঃ স্মৃতঃ।"

প্রথমাধ্যায়, পরাশর সংহিতা।

২০ "ঋক্ষোহভূদ্ভার্গবস্তস্মাৎ বাল্মীকির্যোভিধীয়তে।

বিষ্ণুপুরাণ।

"রাবণান্তকরো রাজা রঘূণাং বংশ বর্দ্ধনঃ। বাল্মীকির্যস্য চরিতং চক্রে ভার্গব সপ্তমঃ।"

মৎস্য পুরাণ।

২১ "রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যঃ প্রপূজিতঃ। ততঃপ্রদক্ষিণং কৃত্য জগামাত্মগতিং প্রভুঃ।" ২৪

৭৬ সর্গ রামায়ণ।

২২। "অন্যা মুৎপাদয়ামাস পুত্রং ভৃগুরনিন্দিতং। চ্যবনং দীপ্ত তপসং ধর্ম্মাত্মানং যশস্বিনং। ৪৪
আরুষীতু মনোঃ কন্যা তস্য পত্নী মনীষিণঃ। ঔর্ব্বস্তু সমভবদূরুং ভিত্বা মহাযশাঃ। ৪৬
ঋচিকস্তস্য পুত্রস্তু জমদগ্নি স্ততোহ ভবৎ। ৪৭

৪৮ শ্লোক দেখ। ৬৩ অধ্যায় মহাভারত।

"ঋচিকস্তু মহা তেজাঃ পুত্রস্য প্রতিকর্ম্মণঃ। পিতুর্যমদদৌদিব্যং জমদগ্নের্মহাত্মনঃ।"

৭৫ সর্গ, রামায়ণ।

অতএব বাল্মীকি রাম ও ভৃগুরামের অনেক পরে ভূতলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পরন্তু ব্রহ্মা হইতে পঞ্চম পুরুষেই আমরা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসকে দেখিতে পাই (২৩) অথচ এদিকে ব্রহ্মা হইতে সপ্তম পুরুষের নিম্নেও বাল্মীকিকে দেখিতে পাওয়া যায় না। (২৪) এবং বশিষ্ঠের জন্মের অনেক পরে বরুণের যজ্ঞে ব্রহ্মার (২৫) শুৎপদ্ম হইতে যখন ভৃগু মুনির জন্ম হয়, তখন বাল্মীকি হইতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যে অনেক প্রাচীন, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

আমাদিগের নিকট উল্লিখিত মত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভৃগু বংশ অনেক। (২৬) ভৃগুবংশীয় ঔর্ব্বনন্দন ঋচীকের এক শত পুত্রের সন্তান পরম্পরায় যে অবনীমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের ৬৩ অধ্যায়ের ৪৮ ও ৪৯ শ্লোকে বিলক্ষণ প্রকাশ আছে। ভৃগু বংশ যখন অনেক, তখন তাঁহার এক মাত্র পুত্র চ্যবনের ধারাতে পরশু রামের পূর্ব্বে বাল্মীকিকে পাওয়া গেল না বলিয়াই যে, তিনি ভৃগু রামের অনেক পরবর্ত্তী তাহা কোন মতেই আমরা স্বীকার করিতে পারি না। ভৃগু পুত্র চ্যবনের ধারাতে যেমন আমরা ভৃগু হইতে ষষ্ঠ পুরুষে পরশু রামকে দেখিতে পাই, তেমনি বাল্মীকিকে ভৃগুর অন্য কোন পুত্রের ধারাতে পাওয়া যায় কি না, সেই অনুসন্ধান করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। যদি কেহ বলেন, আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু বাল্মীকিকে ভৃগুর অমুক পুত্রের সন্তান বলিয়া কোন স্থানেই স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তাহা না থাকুক, কিন্তু মৎস্যপুরাণে যখন স্পষ্টাক্ষরে বাল্মীকিকে সপ্তম ভার্গব বলিতেছেন (২৭) তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বাল্মীকি ভৃগুর অন্য পুত্র শুক্র, না হয় চ্যবনের অন্য পুত্র প্রমতির ধারা সম্ভূত। কিম্বা ঋচীকের (জমদগ্নি ব্যতীত) অন্য এক শত পুত্রের মধ্যে কাহার সন্তান হইবেন। তাহা না হইলে মৎস্য পুরাণ কোন মতেই তাঁহাকে সপ্তম ভার্গব বলিতেন না। অপর বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস ও শুকদেব এই পাঁচ জন ব্যতীত উক্ত বংশে যে আর ও অনেকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি। অতএব এ স্থলে ঐ সম্বন্ধে পুনরান্দোলন নিষ্প্রয়োজন।

মহাভারতের মতে পরশুরাম ষষ্ঠ ও মৎস্য পুরাণানুসারে বাল্মীকি সপ্তম ভার্গব।

২৩। ব্রহ্মা তৎপুত্র বশিষ্ঠ, তৎপুত্র শক্তি, তৎপুত্র পরাশর, তৎপুত্র ব্যাস।

ব্রহ্মা, তৎপুত্র ভৃগু, তৎপুত্র চ্যবন, তৎপুত্র ঔর্ব্ব, তৎপুত্র ঋচীক, তৎপুত্র জমদগ্নি, তৎপুত্র পরশুরাম।

২৫। মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের ৫ অধ্যায়ের ৭ ও ৬৩ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোক দেখ।

২৬। "অন্যমুৎপাদয়ামাস পুত্রং ভৃগুরনিন্দিতং।
চ্যবনং দীপ্ততপসং ধর্ম্মাত্মানং যশস্বিনং।" ৪৪।
"আরুষীতুমনোঃ কন্যা তস্য পত্নী মনীষিণঃ।
ঔর্ব্বঃ সতু সমভবদূরুং ভিত্বা মহাযশাঃ। ৪৬
"ঋচীকস্তস্য পুত্রস্তু জমদগ্নি স্ততোহ ভবৎ।" ৪৭
এতদ্ব্যতীত ৪২। ৪৮। ৪৯ শ্লোক দেখ। ৬৩অধ্যায় আদিপর্ব্ব।
"চ্যবনস্যতু দায়াদঃ প্রমতির্ণাম ধার্ম্মিকঃ।
প্রমতে রূপাভূৎ পুত্রো ঘৃতাচ্যাং রুরুচ্যতে।" ৯
৫ অধ্যায়, আদিপর্ব্ব।

২৭। "রাবণান্ত করো রাজ্ঞাং রঘূণাং বংশ বর্দ্ধনঃ।
বাল্মীকির্বস্য চরিতং চক্রে ভার্গব সপ্তমঃ।"
মৎস্যপুরাণ।

অতএব পরশু রাম আর বাল্মীকিতে খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধ হইল। খুল্লতাত ও ভ্রাতুষ্পুত্র যে এক সময়ে জীবিত থাকিতে পারেন, তাহা বোধ করি কাহাকেও প্রমাণ দ্বারায় দেখাইতে হইবে না। অপিচ বাল্মীকি পরশু রামের ভ্রাতুষ্পুত্র হইলেন জন্যই যে তিনি ভৃগুরাম হইতে বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেন, তাহা নহে, যেহেতু ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার খুল্লতাতের পিতার তুল্য বয়ঃক্রম বিশিষ্টও হইতে পারেন। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন বংশে এমন ২। ১ টী ভ্রাতুষ্পুত্র আমরা দেখিতে পাই। এমতাবস্থায় যিনি যাহাই বলুন, বাল্মীকি, পরশুরাম ও রামচন্দ্র, ইহারা যে এক সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা আমাদের নিকট একান্ত সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

পাঠক! এক বাল্মীকি যে রাম ও ভৃগু রামের সমকালে জীবিত ছিলেন, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে ইহাই দেখা আবশ্যক যে, সে কোন্ যুগের কথা? ত্রেতা দ্বাপরের সন্ধি সময়ে ভৃগুবংশে পরশুরাম (২৮) এবং ঐ সময়েই রামচন্দ্রও ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। (২৯) রাম ও ভৃগুরাম ত্রেতা দ্বাপরের সন্ধি সময়ের হইলে তাঁহাদের সমকালের বাল্মীকিও যে উক্ত সময়ের হইলেন, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অতএব রামায়ণ ও অধ্যাত্ম রামায়ণে যে, রামের সমকালে রামায়ণকার বাল্মীকির বিদ্যমান থাকা প্রকাশ আছে (৩০) তাহা কোন মতেই মিথ্যা হইতেছে না।

অনন্তর সমগ্র রামায়ণ এক জনের রচিত ও বাল্মীকি আদি কবি কি না? তাহা আমরা পরে বলিব। যেহেতু, প্রতিবাদী মহাশয়েরা মহাভারতকে রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া আমাদের চিত্তকে নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছেন। অতএব সর্ব্বাগ্রে চিত্তকে সুস্থির করাই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া এই স্থান হইতেই আমরা মহাভারতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাভারতোক্ত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস বেদব্যাসের রচিত না, এই কথা সাধারণের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য প্রতিবাদী মহাশয়েরা ভারতীয় আদিপর্ব্ব হইতে যে কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, অগ্রে তাহারই সমালোচনা করা যাইতেছে।

ব্যাস প্রথমত বেদ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সঙ্কলন পূর্ব্বক এক খানি মহাভারত রচনা করেন। তাহাতে উপাখ্যান ভাগ ছিল না।

২৮। ত্রেতা দ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ রামঃ শাস্ত্রভৃতাংবরঃ।
অসকৃৎ প্রার্থিবং ক্ষত্রং যঘানামর্ষ চোদিতঃ।"
দ্বিতীয় অধ্যায়, আদিপর্ব্ব।

২৯। সন্ধৌতু সময়ে প্রাপ্তে ত্রেতায়া দ্বাপরস্যচ।
রামো দাশরথির্ভূত্বা কৌশল্যানন্দি বর্দ্ধনঃ।"
বিষ্ণু পুরাণ।

"ত্রেতাযুগে দাশরথি র্ভূত্বা নারায়ণোঽ ব্যয়ঃ।
রাবণস্য বধার্থায় দণ্ডকা মাগমিষ্যতি।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, অধ্যাত্ম রামায়ণ।

৩০। "প্রাপ্ত রাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্র পদমর্থবৎ।" ১
বালকাণ্ড ৪র্থ সর্গ, রামায়ণ।

"বাল্মীকি রপি তৌ প্রাহ সীতাপুত্রৌ মহাধিয়ৌ।
যত্র তত্রচ গায়ন্তৌপুরে বীথিষু সর্ব্বতঃ।
রামস্যাগ্রে প্রগায়েতাং শুশ্রূষু র্যদি রাঘবঃ।
নগ্রাহ্যং বৈ যুবাভ্যাং তদ্যদি কিঞ্চিৎ সদাসাতি।
ইতিতে নোদিতৌ তত্রগায়মানৌ বিচেরতুঃ
যথোক্ত মৃষিণা পূর্ব্বং তত্র তত্রোস্য গায়তাং।
"তদা মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনি পুঙ্গবঃ।
সীতা সহায়ো বাল্মীকিরিতি প্রাহচ রাঘবং।"
উত্তরকাণ্ডের সপ্তমসর্গ, অধ্যাত্ম রামায়ণ।

উপাখ্যানৈর্ব্বিনা তাবৎ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ। আদিপর্ব্ব। ১০৫

তৎপরে চব্বিশ হাজার শ্লোক সম্বলিত আর একখানি মহাভারত রচনা করেন, তাহাতে কিছু কিছু উপাখ্যান ভাগ ছিল।

উপাখ্যানৈঃ সহজ্ঞেয়মাদ্যং ভারতমুত্তমং।
চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাং।
আদিপর্ব্ব। ১০৫

তৎপরে আবার ষাট লক্ষ শ্লোক সম্বলিত আর একখানি মহাভারত রচনা করেন।

ষষ্টিশত সহস্রাণি চকারান্যাং স সংহিতাং।

তৃতীয় খণ্ড কল্পদ্রুমধৃত, মহাভারত বচন। আদিপর্ব্ব। ১০৭

এই বচন কয়েকটী যিনি প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনি উহার পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়াই বলিয়াছেন যে, ব্যাস প্রথমে একখানি মহাভারত সঙ্কলন করেন তাহাতে উপাখ্যান ভাগ ছিল না। কিন্তু "উপাখ্যানৈর্ব্বিনা তাবৎ ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ" এই শ্লোকার্দ্ধে কেবল এই মাত্র প্রকাশ পায় যে, ব্যাস উপাখ্যান ভাগ রহিত যে পুস্তক রচনা করেন, পণ্ডিতেরা তাহাকেই ভারত বলিয়া থাকেন। ব্যাস যে প্রথমেই উপাখ্যান ভাগ ত্যাগ করিয়া মহাভারত লিখিয়াছিলেন, তাহা এই বচনার্দ্ধের কোন্ স্থানে আছে? বরং ব্যাস যে প্রথমেই উপাখ্যান ভাগ সংযুক্ত মহাভারত রচনা করেন, উপরোক্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের ১০৩ শ্লোকে তাহাই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তর মহাভারতীয় পাণ্ডব বৃত্তান্ত যে ব্যাসের রচিত না, উল্লিখিত কোন শ্লোকে তাহাও লক্ষিত হয় না। মহাভারত যত খানিই হউক না কেন, তাহা যে একমাত্র বেদব্যাসেরই রচিত, উল্লিখিত বচনত্রয়ে তাহাও স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে। পাঠক দেখিবেন, প্রতিবাদী মহাশয়ও তাহা একরূপ স্বীকার করিয়াছেন, তবে এক ব্যক্তি ক্রমে তিনবারে এক মহাভারত রচনা করিয়াছেন জন্যই বোধহয় উহা এক জনের কৃত বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। এরূপ বিশ্বাশ না করা তাঁহার অন্যায়। আমি প্রথমে ব্যাকরণ সার এই নাম দিয়া একখানি ব্যাকরণের সৃষ্টি করিলাম, কিন্তু তাহাতে কেবল সন্ধি আর শব্দ মাত্র রচিত হইল। এবং তাহার এক বৎসর পরে তাহাতে আখ্যাত, কৃত ও আর ছয় মাস পরে কারক, সমাস রচনা করিয়া সন্নিবেশিত করিলাম। এক্ষণে তিনি কি উহাকে একা আমার কৃত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না?

মহাভারতীয় পাণ্ডব বৃত্তান্ত যে ব্যাসের কৃত, তাহা উক্ত গ্রন্থের আদিপর্ব্বের অনুক্রমণিকা ও অন্যান্য অধ্যায়ে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে (৩১)। মহাভারত যুড়িয়াই আমরা যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। আমাদের মতে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি যেমন রামায়ণের অস্থি তেমনি পাণ্ডবেরাই মহাভারতের অস্থি স্বরূপ। যাহাই হউক, বর্ত্তমান মহাভারত হইতে পাণ্ডব বৃত্তান্ত ত্যাগ করিয়া ব্যাসকৃত মহাভারতখানি আমাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া প্রতিবাদী মহাশয়দের একান্ত উচিত।

"আচাখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংপ্রত্যাক্ষতে পরে।
অখ্যো স্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাস মিমং ভুবি।"
আদিপর্ব্ব। ২৬। ক্রমশঃ

৩১। অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৫০। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯৪। ৯৬। ৯৯। ১০০। দ্বিতীয় অধ্যায় সমগ্র। ৫৬ অধ্যায়ের ৬। ৫৭ অধ্যায়ের ৬। ৭। ১৮ শ্লোক দেখ।

ভক্ত কেশবচন্দ্র।

পৃথিবীতে এই নিদারুণ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে—মহাত্মা ভক্ত কেশবচন্দ্র আর ইহ-সংসারে নাই। এই সংবাদে সমস্ত ভারতবর্ষ হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে—আজ কোটী কোটী নর নারীর হৃদয়ের গভীর দুঃখোচ্ছাস একতানে মিলিয়া অনন্ত প্রেমের রাজ্যে সেই অমরাত্মার উদ্দেশে ছুটিয়াছে। এ দৃশ্য যে দেখিল সেও ধন্য হইল, এ চিত্র সহানুভূতির তুলিকা দ্বারা যে হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিল, সেও পবিত্র হইল। ধন্য কেশব, ধন্য তোমার জীবন ;—তোমার ন্যায় স্বর্গীয় জীবন এই প্রেমভক্তিহীন বঙ্গে আর কে পাইয়াছে ?

সাময়িক ইতিহাস লিখিয়াছে-কেশব মরিয়াছে ; অনন্ত প্রেমভক্তির ইতিহাস লিখিতেছে—কেশব এই মাত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। মনুষ্যের অনন্তজীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন জরায়ু গর্ভে স্থিতিমাত্র,—মৃত্যু সংসারীর চক্ষে মৃত্যু,—বিশ্বাসীর চক্ষে মৃত্যু প্রকৃত জীবন লাভ। বিশ্বাস বলে আজ ভক্তজগৎ কেশবকে অন্তরচক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছে,—নচেৎ তাঁহাদের হাহাকারে আজ গগন বিদীর্ণ হইত,—চতুর্দ্দিক আঁধার আঁধার বোধ হইত,—লোকসমাজ আজ শ্মশান বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইত ;—এ বিচ্ছেদ আজ আর সহ্য হইত না। কেশব মানবের যে চক্ষুর নিকট ফুটিলেন, এ চক্ষুর জ্যোতি আর কখনও নিস্তেজ হইবে না,—অনন্তকাল মানবের এ চক্ষু তাঁহাকে দেখিবে —তাঁহার ছায়া ধরিবে—তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবে। পৃথিবীর যে চক্ষু দুদিন পরে অন্ধ হয়—সে চক্ষুর রাজ্য কেশব অতিক্রম করিয়াছেন। পৃথিবীর জল বায়ু সে শরীরের উপর আর ক্ষমতা বিস্তার করে না বলিয়া যাঁহারা কেশবকে মৃত বলিতেছেন, তাঁহারা আজও সংসার-ধূলিখেলায় মত্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা আজ পৃথিবীর সকলি দেখিতেছেন,—সেই পূর্ব্বের জাগতিক শোভা—বৃক্ষের ফুটন্ত ফুল—সেই সৌরভ, সেই সুশীতল বায়ু, সেই সুস্নিগ্ধ চন্দ্রমার রশ্মি, সেই নীলিমাময় আকাশের নক্ষত্র—সেই পক্ষীর কলকণ্ঠের মধুর মধুর ধ্বনি—সেই আমোদ—সেই উৎসাহ—সেই গীতি—সেই সকলি তাঁহাদের সম্মুখে রহিয়াছে ; কিন্তু একজন আজ তাঁহাদের নিকটে নাই। নাই—শিক্ষার আদর্শ, প্রকৃত ভক্ত কেশবচন্দ্র। এ কষ্ট আজ তাঁহাদের নিকট অসহ্য—এ বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় তাঁহারা আজ মৃতবৎ। কিন্তু যোগীগণ—প্রকৃত বিশ্বাসীগণ আজ কেশবের নূতন জীবনের নব ছায়া দেখিয়া গভীর শোকরাশির ভিতরে গভীরতম আনন্দ অনুভব করিতেছেন। স্বীয় স্বীয় অভাব স্মরণে তাঁহারা কাঁদিলেন ; হাহাকার করিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত ভক্তির যোগবলে ভক্তের নবজীবনের নবভাবে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ ক্রন্দনের সময়ে আবার হাসিলেন, আবার উল্লসিত হইলেন। এ দৃশ্য দেখিল পৃথিবী কাহার মৃত্যুতে ?—ইতিহাস অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিল—কেশবের মৃত্যুতে কেশব পৃথিবীতে মরিলেন, নূতন শিক্ষা দিতে—নবজীবন লাভ করিতে। একথা যাঁহারা স্বীকার করিল, বিশ্বাস করিল—তাঁহারা

আজ সংসারে থাকিয়াও যোগবলে সংসারের অতীত স্থানের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া হাসিল—শান্তি পাইল ;—কেশবের হাসিতে তাঁহাদের হাসি অলক্ষিতে মিশিল। কিন্তু এ প্রকার-যোগীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আমরা মৃত্তিকার জীব কাঁদিয়া আজ অস্থির হইতেছি। কেশব সংসার মৃত্যুর ভস্মরাশির ভিতর হইতে পুনঃ জন্মলাভ করিয়া অনন্ত জীবনের অনন্ত পথে অনন্ত দেবতার উদ্দেশে ছুটিলেন। পৃথিবী এ ভাব না বুঝিয়া কোটী কোটী বৎসর ক্রন্দন করিলেও আর সেই মহাত্মা ফিরিবেন না—এই শোক-সন্তপ্ত, প্রলোভন-প্রপীড়িত—পাপবিভীষিকা-ময় পৃথিবীতে চর্ম্ম চক্ষের দৃষ্টির অধীন হইবেন না। সেই প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি—সেই ভক্তি বিশ্বাসের জলন্ত জীবন্ত প্রত্যক্ষ ছবি—সুন্দর হইতে সুন্দরতম বিস্ফারিত লোচন, সেই প্রস্ফুটিত অমৃতবর্ষী সুকোমল বদন আর পৃথিবীর চক্ষু দেখিবে না—পৃথিবীর বায়ু স্পর্শ করিবে না, পৃথিবীর সুখ সম্পদ আকর্ষণ করিতে পারিবে না। তবে যাও, কেশব, অনন্তধামে, —যেখানে ন্যায়ে স্বার্থ নাই—পুণ্যে মলিনতা নাই—বিচারে কলঙ্ক নাই। এই পাপবিষাক্ত বঙ্গে এমন কি পদার্থ আছে যে তোমা হেন রত্নকে ক্রোড়ে রাখিয়া জীবনকে সার্থক করিতে সমর্থ হইবে?—এই মলিন বঙ্গে তোমার উপযুক্ত স্থান নাই!—অনন্ত উন্নতির পিপাসা বিধাতা তোমার অন্তরে ঢালিয়া দিয়া তোমাকে কেন এমন সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র সংসার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, —যেখানে তোমার মন ক্রীড়ার বস্তু পায় না, হৃদয় অবলম্বন পায় না—যেখানে সমদুঃখী, সমসুখী সহায় মিলে না—ধর্ম্মপথের প্রকৃত ভক্ত বিশ্বাসী বন্ধু পাওয়া যায় না? তুমি থাকিতে চাও নাই, তাই বিধাতা তোমাকে রাখিলেন না, তাই মৃত্যুর ভিতর দিয়া অনন্ত উন্নতির জীবন পথে তোমাকে লইলেন! তুমি ধন্য হইলে! ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইল! আর হতভাগ্য ভারতবর্ষ? —আর হতভাগ্য পৃথিবী? তোমাকে হারাইয়া কাঁদিল, অধীর হইল। পৃথিবী কাঁদিবে না কেন?—তোমার স্বার্গ স্মরণে আমাদের স্বর্গ চিন্তা আরো প্রজ্জ্বলিত হয়, তোমার উন্নতিতে আমাদের উন্নতির আশা আরো জাগিয়া উঠে। তুমি স্বার্গের পথে উন্নতির পথে চলিলে, তাহাতে আমাদের স্বার্গে যে কণ্ঠক পড়িল তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই? এই অভক্ত, অবিশ্বাসী এই অপ্রেমিক বঙ্গ তোমার নিকট বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম শিখিতে চাহিয়াছিল,—আমরা তোমার মুখের দিকে চাহিয়া অবিশ্বাস ও নাস্তিকতাকে অলক্ষিত ভাবে পরাজয় করিতেছিলাম, বঙ্গ কৃতার্থ হইতেছিল, ভারতবর্ষ প্রকৃত জীবন পাইয়া মাতিয়া উঠিতেছিল। তুমি বঙ্গের একমাত্র আশা ভরসা ছিলে। ভারতের সুসন্তান! তোমার দিকে চাহিয়া সহস্র সহস্র নর-নারী ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতেছিল। তোমার কথায়, তোমার ভাবে, তোমার জীবন্ত দৃষ্টান্তে সকলের প্রাণের ভিতরে কি এক আশ্চর্য্য ভাবতরঙ্গ খেলিতেছিল। তুমি কত জনের হৃদয় মন অধিকার করিয়াছিলে, তাহার গণনা কে করিতে পারে? বঙ্গের সুসন্তান, তুমি বঙ্গকে কাঁদাইয়া,—ভারতকে মলিন করিয়া আপনার পথে মায়ের আদেশে চলিলে, ভক্ত সন্তানের পরিচয় দিলে;—আমরা হতভাগ্য, অভক্ত, অবিশ্বাসী, তোমার জন্য আজ হাহাকার করি, শূন্য হৃদয় লইয়া

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরি! তুমি যাও অনন্ত ধামে, সেখানে মায়ের ক্রোড়ে সুখে থাক, —শান্তির অধিকারী হও।

কেশবচন্দ্র কে, কেশবচন্দ্র কি ছিলেন, এই বিষয় লইয়া আজ কাল খুব আন্দোলন চলিয়াছে। কেহ বলিতেছেন—তিনি অমুক উচ্চ বংশে অমুকের ঔরসে জন্মিয়াছিলেন—সৎ বংশের সৎ সন্তান। কেহ বলিতেছেন, তিনি জ্ঞানী, প্রতিভাশালী ছিলেন। কেহ বলিতেছেন, তিনি তর্ক শাস্ত্র জানিতেন না—বিজ্ঞান জানিতেন না। কেহ বলিতেছেন, কেশব অহঙ্কারী ছিলেন, ধার্ম্মিক ছিলেন না। কেহ বা মৃত্যুর পূর্ব্বের জ্বালা যন্ত্রণার চিত্র দেখাইয়া জগৎকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন। কেহ বলিতেছেন, কেশবের ন্যায় ভাল বক্তা আর নাই, কেহ বলিতেছেন—এমন বুদ্ধিমান আর হইবে না। কেহ বা তাঁহার সৎসাহসের পরিচয় দিতেছেন, কেহ বা সংস্কারক বলিতেছেন। তিনি যত কার্য্যের অনুষ্ঠাতা ছিলেন, তাহার তালিকা দিয়া কেহ বা কেশবকে বড় লোক বলিতেছেন। এই দেশে এরূপ হওয়াই সম্ভব। কেশব কে, তিনি কি ছিলেন, তাহা বুঝিতে পৃথিবীর এখনও শত শত বৎসর বাকী আছে। যে কার্য্যের উপাসক, সে কার্য্যের ভিতর দিয়াই কেশবকে চিনিয়াছে, কেশবের অন্য গুণ জানা তাহার পক্ষে অসম্ভব। যে জ্ঞানের উপাসক, সে জ্ঞানের রাজ্যে কেবল কেশবকে দেখিয়াছে, অন্য কোন গুণ জানা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এই প্রকার মানব সমাজের কত লোক আজ কত নূতন নূতন চক্ষে কেশবকে দেখিতেছেন! পবিত্রাত্মারা কেশবকে এক দিকে পবিত্র বলিতেছে, পাপীরা অপর দিকে কেশবের দোষের উল্লেখ করিয়া চরিত্রের দোষ ঘোষণা করিতেছে। ইহাই সম্ভব। কেশব প্রকৃত পক্ষে কি ছিলেন, তাহা জানিতে পৃথিবীর এখনও অনেক দিন লাগিবে। আমরা যদি কেশবচন্দ্রের কোন গুণ বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হই, তবে তাহাও এই কারণে একদেশদর্শী হইবে, সমুচিত হইবে না। যে যেমন লোক, সে অন্যকে তাহার অতিরিক্ত কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারে না। আমাদের এমন শক্তি নাই যে, সেই পরলোকগত মহাত্মার গুণ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ভাবে জগতের নিকট উপস্থিত করিতে পারি। আমরা এবম্প্রকার চেষ্টার অধিকারী কি না, এক মাত্র বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন। আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই আমাদের সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য পালনে বিরত থাকিলাম না। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

কেশবচন্দ্র কেবল যদি সংসারের লোক হইতেন, তবে আজ আমরা তাঁহার কথা লইয়া এত সময় বৃথা ব্যয় করিতাম না। কেশবচন্দ্র সংসারের অতীত জীব ছিলেন—প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন। এই জন্যই তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, বঙ্গের গৌরব মনে করি। পৃথিবীতে জ্ঞানী অনেক আছেন, বক্তা অনেক আছেন, দার্শনিক অনেক আছেন, প্রকৃত ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। জ্ঞানে ভারত একদিন পৃথিবীর শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এ কথাতে হয় ত কাহারও সন্দেহ থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু ভক্তি বিশ্বাসে ভারত শ্রেষ্ঠ, ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই। কেশবচন্দ্র ভক্ত প্রধান ভারতের ভক্ত সন্তান। ভক্তি বিশ্বাস বাদ দিলে পৃথিবীতে কেশবের

সমতুল্য লোক আজ অনেক দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন ভক্ত বিশ্বাসী আর কয়টী আছে, আমরা জানি না। ভারতের একমাত্র সম্পত্তি ভক্তিতে কেশবের আর সমস্ত গুণ মিশ্রিত থাকায় কেশবকে আজ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে কেহই কুণ্ঠিত নহেন। কেশব যোগী, কেশব ভক্ত, এই জন্য আমরা কেশবের এত আদর করি—বুঝি না, বুঝিতে পারি না, তবুও প্রাণের ভিতরে কেশবকে পুরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। কেশবের ভক্তি বিশ্বাস প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝিতে পৃথিবীর আরো অনেক সময় লাগিবে। কথায় বুঝা আর প্রত্যক্ষ করা এক কথা নহে। কেশব যে পথের পথিক ছিলেন, আমরা যে পরিমাণে সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিব, সেই পরিমাণে তাঁহাকে বুঝিতে পারিব। কত দিন আসিবে, কত দিন যাইবে, তবে কেশবকে মানবজাতি প্রকৃতভাবে চিনিতে পারিবে। অভক্ত অবিশ্বাসী সংসার কেশবের যে চিত্র অঙ্কিত করিতেছে, ঐ চিত্র কেশবের প্রকৃত চিত্র নহে, উহা ধূলির জিনিষ, মৃত্তিকায় মিশিবার উপযুক্ত,—উহা কেশবের নশ্বর শরীরের সহিত চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে। কেশবের জীবন যাহা, প্রাণ যাহা, তাহা ঐ চিতার ভস্ম হইতে সংস্কৃত হইয়া বাহির হইয়া আসিবে। কেশবের ভক্তি, জলন্ত বিশ্বাস অবিনশ্বর অক্ষরে পৃথিবীর ইতিহাসে, মানবের হৃদয়ে লিখিত থাকিবে। কেশব পৃথিবীর ভক্ত সাধক শ্রেণীর মধ্যে আসন পাইয়াছেন। কেশবকে যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, ঐ ভক্তির ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। কেশবের কথায় ভক্তি, দৃষ্টিতে ভক্তি, হৃদয়ে ভক্তি—জীবন ভক্তিময়। ভক্তিতে আরম্ভ, ভক্তিতে কেশবের শেষ—ষোড়শবৎসরের শিশু কঠোর নীতির কষাঘাতে হৃদয় মনকে মাজিয়া যে ভক্তির জলন্ত কথা লিখিয়া রাখিয়াছিল, সেই ভক্তি জীবনের শেষ কথায় স্ফুরিত,—"মা, আমার দ্বারা এই পর্য্যন্ত হইল"। কেশব পৃথিবীতে এমন অতি অল্প কথা বলিয়াছেন, যাহাতে ভক্তির লেশ মাত্র নাই। ভক্তের জীবন পাঠ, ভক্ত সহবাস লাভ, ভক্তি চিন্তা, ভক্তি ব্রত, ভক্তি ধ্যান, ভক্তিই কেশবের একমাত্র সম্পত্তি ছিল। ভক্তবৎসল হরির নাম কেশবের একমাত্র সম্বল ছিল। ধ্যানে হরি, চিন্তায় হরি, কথায় হরি, সুখে হরি, সম্পদে হরি;— হরিকে লইয়া কেশব। হরি বাদে কেশব অসার মৃত্তিকার জীব, অকিঞ্চিৎকর—অনাদরের। হরিকে ভুলিয়া কেশব পৃথিবীতে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা লইয়া কত বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে, তাহা মাটীর জিনিষ মাটীতে মিশিয়া গিয়াছে,—লোকে সে কথাকে তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়াছে। হরিকে ভুলিয়া কেশব জগতে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব বায়ুতে বিলীন হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীর ঘৃণার জিনিষ হইয়াছে। মানুষ দেবতা, মানুষ পশু। ঈশ্বর ভক্তিতে মানুষ দেবতা, ঈশ্বর অবিশ্বাসে মানুষ পশু। হরিকে সম্মুখে রাখিয়া, অন্তরে রাখিয়া, প্রাণে উপলব্ধি করিয়া কেশব যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল মানবের পূজা পাইবে, চিরকাল মানবের কল্যানসাধন করিবে। হরিকে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া কেশব যখন যে কথা বলিয়াছেন, তখন সে কথা চকিত হইয়া উর্দ্ধকর্ণে পৃথিবী শুনিয়াছে,—সে স্বর, সে মধুর কথা মানব রাজ্যের চিরসম্পত্তি হইয়া রহিয়াছে, লোকসমাজ কখনও তাহা ভুলিতে

পারিবে না,—ভুলিবে না। হরি ভিন্ন কেশব আঁধার, ভক্তি ভিন্ন কেশব মৃত্তিকার জীব—অসার। কেশবের জীবনে হরি, মৃত্যুতে হরি। হরির কথা প্রচারের জন্য কেশবের জন্ম, হরির কথা রক্ষার জন্য কেশবের মৃত্যু। তাঁহারই ইঙ্গিতে কেশবের জন্ম, তাঁহারই ইচ্ছায় কেশবের অপসরণ। তিনিই সব, তাঁহারই রাজ্য। তাঁহারই ভক্ত কেশব, তাই কেশব আদরের; তাঁহারই এই সংসার, তাই সংসার আদরের। হরিকে বাদ দিয়া যে জন কেশবের দিকে চাহিবে, সে প্রতারিত হইবে, প্রকৃত কেশবচরিত্র সে দেখিতে পাইবে না। হরির ভিতর দিয়া না চাহিয়া অন্য দিক দিয়া যাঁহারা কেশবের সহিত পরিচিত হইবেন, তাঁহারা হয় কেশবকে হরি জ্ঞানে পূজা করিবে, না হয় পশুর ন্যায় অবহেলার চক্ষে দেখিবে। হরির ভিতর দিয়া যাঁহারা দেখিবেন, তাঁহারাই হরিভক্ত কেশবকে উপযুক্তরূপে চিনিতে পারিবেন; তাঁহারা তাঁহার নিকট শিখিবার অনেক জিনিষ পাইবেন বটে, কিন্তু কখনও ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিবেন না। দীনবন্ধু দয়ালহরি, এই করুণ, আমরা তাঁহার ভিতর দিয়া তাঁহার ভক্ত সন্তানের প্রকৃত জীবন-সৌন্দর্য্য দেখিয়া কৃতার্থ হই। কেশব নাই, ইহা স্মরণে জগৎ নূতন শিক্ষা লাভ করুক।

কেশবচন্দ্র

Away ! we know that tears are vain,
That death nor heeds nor hears distress :
Will this unteach us to complain ?
Or make one mourner weep the less ?
And thou, who tell'st me to forget,
Thy looks are wan, thine eyes are wet
Byron.

——————He died.
Who was the sire of an immortal Strain
* * * * when his country's pride
The priest, the slave, and the liberticide,
Trampled and mocked with many a loathed rite
Of lust and blood. He went unterrified
Into the gulf of death ; but his clear sprite.
Yet reigns over earth, the third-
among the souns of light
——Shelly.

In honoured poverty thy voice did weave
Songs consecrate to truth and liberty
——ibid.

জগতের কোলাহল, প্রকৃতিগো থামাইয়া
দেও একবার,
অনন্ত স্তব্ধতাময় তোমার বুকের মাঝে
ডুবুক্ সংসার।
কঠোর নিয়তি-নীতি, বুঝিবার তরে আজি
ব্যাকুল পরাণ;
পবিত্রমাধুরীময় সোণার সংসারে কেন
ফোটেরে শ্মশান ?
তরুণ সুখের বুকে, কেনবা নিরাশা আসি
উগরে গরল ?
আশার কল্পনা-কলি ফুটুফুটু হোলে কেন
ঝরে তার দল ?
গভীর সমস্যা কত, এইরূপ শত শত
উঠিতেছে মনে।

প্রকৃতিগো কৃপাকরি,আজি এ নিশীথে মোরে
বসাও বিজনে ;
আজি এ সন্ধ্যায় অহো, দেখিয়া আসিনু যাহা
পারি কি ভুলিতে ?
এই কি নিয়তি প্রভো ? এই ইচ্ছা ইচ্ছাময় ?
নারিনু বুঝিতে।
হতভাগ্য বঙ্গদেশে, কেন দিয়াছিলে প্রভো
কেশবরতন,
স্বর্গের অমৃতপূর্ণ সুস্বরে ভরিল কেন
ভারত গগন ?
যদি এ করুণা তব, জগতের পাপতাপে
করিতে মোচন ;
নিমেষে নিবিল কেন, দ্বিতীয়ার চন্দ্র যথা
আঁধারি ভুবন ?
আজিও অবলাবালা পুরুষের অত্যাচারে
জ্ঞানধর্ম্মহীনা
আজিও অভক্ত বঙ্গ মগ্ন শত ব্যভিচারে
হরিনাম বিনা।
আজিও উদার প্রেম শেখেনি জগতবাসী
মঙ্গলনিদান,
পতিত জগত ত্যাগি, কেন মা কেশব তবে
করিল প্রয়ান ?
এ গূঢ় রহস্য তব, কে বুঝিবে দয়াময়
সুধু এই জানি,
আশার উজ্জ্বল আলো আঁধারে মিশায়ে গেলে
কাঁদে এপরাণি।
কাঁদরে হৃদয় তবে, বরষি রুধির ধারা
ফোঁটা ফোঁটা করি,
কাঁদরে জগতবাসী, নয়ন আসারে অজি
ধরাসিক্ত করি।
নিভিবেনা চিতানল, অশ্রুজলে জানি জানি
তবু কাঁদি আয় ;
ফিরিবে না মহাযোগী, হরিপাদপদ্ম ছাড়ি
তবু ডাকি তায়।
বর্ত্তমান কাঁদ কাঁদ, অজি এ দুঃখের দিনে
কেশবের তরে,—
নতুবা তোমার পুত্র, সুকৃতজ্ঞ ভবিষ্যৎ
নিন্দিবে তোমারে।

শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অশোক শাসনের ভাষা এক প্রকার পালি ভাষা, এ কথা সকল পণ্ডিতের ন্যায় আমিও বিশ্বাস করি। ত্রিপিটকের পালি উৎকৃষ্ট-তর, উন্নততর ভাষা, অশোকশাসনের ভাষা পরিবর্ত্তনশীল সময়ের ভাষা। কিন্তু সে ভাষা পালিভাষার কবরসঞ্জাত কি জন্মসূচক, নিশ্চয় বলিতে পারি না। এ প্রশ্নের মীমাংসা হইলে সিংহলীয় জনশ্রুতি সত্য কি মিথ্যা মীমাংসা হইত, অথবা সিংহলীয় জন-শ্রুতি সত্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারিলে এ প্রশ্নের একরূপ মীমাংসা হইত। এখন এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় দুই ভাষার সম্যক আলোচনা, তুলনা করিয়া মতামত স্থির করা। আমার নিজের সে সাধ্য নাই। অগত্যা ঐ দুই ভাষা সম্বন্ধে বিচারকদিগের পাণ্ডিত্য বিচার-প্রণালী ইত্যাদি দেখিয়া আমার বোধ হয়, অশোকের সময় পালিভাষা পতিত অবস্থায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত, সেই পতিত-পালি শাসনের ভাষা। এই পতিত পালি বিভিন্ন-

স্থানে যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা হইতে কালক্রমে শৌরসেনী মাগধী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হয়। অশোকের সময় পণ্ডিতসমাজে শুদ্ধ পালি ব্যাহৃত হইত, অশোকের পূর্ব্বে পালিভাষার চরম উন্নতি হইয়াছিল। অশোকের পূর্ব্বে এবং অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রধান গ্রন্থ সকল সংস্কৃত এবং পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল, অক্ষরে আবদ্ধ হইয়াছিল কি না বিচার করিবার আবশ্যক নাই। লিখন প্রথা তাহার পূর্ব্বে, শাক্য সিংহের পূর্ব্বে, পানিনীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, আমার স্থির বিশ্বাস ধর্ম্মানুরাগীগণ যেরূপ যত্ন সহকারে শাস্ত্র সকল মুখস্থ করিয়া রাখেন তাহাতে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ না হইলে কোন ক্ষতি হয় না, এবং লিপিবদ্ধ হইলে পরিবর্ত্তিত করা যায় না, এ কথার কোন অর্থ নাই। মহানাম যখন স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে পালি বৌদ্ধগ্রন্থ সকল লিপিবদ্ধ হয় নাই, তখন সে কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সকল যে তাহার পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হয় নাই, মহানাম সে কথা বলেন না, খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতে সংস্কৃত বুদ্ধচরিত চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

এখন কথা হইতে পারে পালিভাষার উৎপত্তি কোথায়। সংস্কৃত ও পালি ভাষার প্রভেদ এত অধিক যে, সংস্কৃতের অব্যবহিত পরে পালিভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল বোধ হয় না। মধ্যে আর কোন ভাষার ব্যবধান ছিল। সে ভাষা কি? গাথাভাষা। হজসন সাহেব গাথা ভাষার আবিষ্কার করেন। গাথা যে পালিভাষার রূপান্তর নহে, পালিভাষার পূর্ব্বতন ডাক্তার, রাজেন্দ্রলাল ইহা বিশেষ প্রমাণ সহকারে ঘোষিত করেন। এখনও দুই একজনে এই মতে সায় না দিলেও ইয়ুরোপীয় প্রায় সকল প্রধান আচার্য্যগণ রাজেন্দ্রলালের মতাবলম্বী হইয়াছেন।

গাথা ভাষা সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছেন দেখা যাউক।

"Are we to look on this as the use of a popular style which may have developed itself subsequent to the preaching of Sakya and which would be thus intermediate between the regular Sanskrit and the Pali? or should we rather regard it as the crude composition of writers to whom the sanskrit was no longer familiar and who endeavoured to write in the learned language, which they ill understood? To my mind the second appears to be the more probable one."

M. Burnouf.

"The more resonable conjecture appears to be that the Gatha is the production of bards who were contemporaries or immediate successors of Sakya, who recounted to the devout congregation of the prophet of Magadha the sayings and doings of their great teacher."

Dr. Rajendra Lal Mitra.

"The problem seems to have been solved at last by a native scholar Babu Rajendra Lal...Babu Rajendra Lal is right and we look upon the dialect of the gathas as a specimen of the Sanskrit spoken by the followers of Buddha about the time of Asoka and later"

Professor Max Muller.

বোধহয় মোক্ষমুলর গাথা ভাষা সম্বন্ধে অদ্যাপি কিছু স্থির নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। সুখাবতী নামক বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্করণ করিবার উপলক্ষে তিনি সম্প্রতি গাথাভাষা প্রচারকালসম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ব মতের সহিত তাহা বিসম্বাদী

না হইলেও অনেকে সে মত অনুমোদন করিবেন না।

"On all these points I can speak with great hesitation only....But the more I see of this peculiar Sanskrit the more I feel convinced that we have in it something really historical, a language not bent and fashioned according to the rules of grammatical schools, but a language such as it was really spoken in different parts of India before the Renaissance of Sanskrit literature about 400 A. D. I look upon the gatha portions, though far less grammatical as decidedly older than the prose portions, and I think, we can even distinguish between at least two varieties of gatha language, that of the story itself, generally introduced by তদ্বেদ মুচ্যতে and that of poetical portions interspersed in the prose story. There is also a marked difference between the gatha dialect of the মহাবস্ত (অবদান) and that of the সুখাবতি ব্যূহ and we shall probably not go far wrong if we ascribe these dialectic varieties to the different localities in which certain Budhistic schools took their origin. In that case the dialect which we commonly call pali would likewise have to be considered as an ancient local dialect, phonetically far more correct than the gatha dialects but grammatically far more perfect, owing chiefly I believe, to the scientific grammatical treatment which it received in India itself from a very early time"

জার্মান আচার্য্য বেবর মোক্ষমূলরের মত রাজেন্দ্রলালের মতাবলম্বী হইয়াছেন। আচার্য্য লাসেন বর্ণফের মতে মত দিয়াছেন। ডাক্তার মিউর স্পষ্ট কিছুই বলেন নাই। তথাপি বোধহয় তিনি রাজেন্দ্রলালের পক্ষে। তিনি বলেন:—

"The peculiarities of the Gatha dialect are so anomalous that it is very difficult to explain them. In any case, it is clear, that if not a spoken language, it was at least a written language in a remote age; and it therefore exemplifies to us some portion of the process by which the Sanskrit was broken down, and corrupted into the derivative dialects which sprung out of it."

আচার্য্য বেনফে রাজেন্দ্রলালের মত গাথা ভাষা পালিভাষার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করেন। তিনি বলেন:—

"On the other hand, Babu Rajendra Lal's views on the origin of the Gathas have very much to recommend them: thy require only a slight modification, the substitution of inspired believers—such as most of the older Budhists were sprung from the lower classes of the people in the place of professional bards."

ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের সহিত একবাক্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, শাক্যসিংহের সময়ে সাধারণ লোকে গাথা ভাষায় কথা বার্ত্তা কহিত। কেবল অশোক শাসনের ভাষা পালির পূর্ব্বতন বা পরতন, এই সম্বন্ধে যে কিছু মতভেদ আছে। বিষয়টীও এত কঠিন, বিশেষ অনুসন্ধান না করিলে সাহসপূর্ব্বক কোন কথা বলা যায় না। ডাক্তার মিউর বলিয়াছিলেন:———

"It is not neccessary that I should be able to point out the exact relative antiquity of the Pali, of the language of the inscriptions and of the language of the Gathas. We have seen that the Pali has some grammatical forms which are older than those of the inscriptions and vice-versa. It is sufficient to say that all these three different dialects exhibit a form of Indian speech which is of greater antiquity than the Prakrits of the dramatic poems; and that they illustrate to us some of the earliest stages of the process by which the original spoken language

of India *i, e*, the early Sanskrit was disintegrated and corrupted."

পাঠকগণের বিচারার্থ অশোক শাসন, পালি ও গাথাভাষার রচিত কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে: ———

গাথা।

অথ বিমলহরো হ্যনন্ততেজাঃ
স্বয়মিহ প্রব্রজিয়ান বোধিসত্বঃ।
শান্তমমুদান্ত ঈর্য্যবন্তো বিহরতি
পাণ্ডব শৈলরাজ পার্শ্বে॥
রজনি বিনির্গতু জ্ঞাত্বোধিসত্বঃ
পরম সুদর্শনীয়ং নিবাসয়িত্বা।
পাত্র প্রতিগ্রহীয় স্থিরমানসেন
প্রবিশতি রাজগৃহং সপিণ্ডপাত্রং॥
কনমকমিব সুধাতু জাতরূপং
কবচিতু লক্ষণ ত্রিংশতাদ্বিতিশ্চ।
নরগণ তথ নারি প্রেক্ষমাণেী
নচ ভবত ক্বচিত্তৃপ্ত দর্শনেন॥
বীথি রচিতং রত্নবস্ত্র ধার্য্যেঃ
অবশিরিয়া অনু যাতি পৃষ্টতোহস্য।
কোনু অয়ু অদৃষ্টপূর্ব্বসত্বো যস্যপ্রভা
পুরং বিভাতি সর্ব্বং॥
উপরিস্থিহিয় নারীণাং সহস্রাঃ
তথ মিদ্ধারি তথৈব বাতযানে।
রম্য ভরিত সেহং শূন কৃত্বা
নরবরুপ্রেক্ষিষুতে অনন্য কামা॥
ললিত বিস্তার ষোড়শাধ্যয় ২৯৮।

পালি।

সুজাতস্স অপরেন স্বয়ম্ভু লোক নায়কো
দুরাশদো অশমশমো পিয়দর্শী মহাযশো
শোপি বুদ্ধো অমিতযশো আদিচ্চো বা
বিরচতি
নিহন্তবান তমম সব্বং ধর্ম্ম চক্রং পরতয়ী
তস্যাপি অতুল তেজস্স অহেসুমং অভিসময়
তয়ো
কোটী শতসহস্সানাং পঠমাভি সময়োঅহু
শুদস্সনো দেবরাজা মিচ্ছা দিথিং ভরোচয়ী
অস্সদিচ্চীং বিনোদন্তো সন্মধর্ম্মং আদেশয়ী
বুদ্ধবংশ

অশোক শাসন।

দেবানাম্ পিয় পিয়দপি লাজা হেবম আহা যে অতিকান্তং অন্তলং লাজানে হশা হেবম ইচ্ছিশু। কথম জনে ধম্মবদ্ধিয়া বদ্ধেয়া নচুজনে অনুলুপায়া ধম্মবদ্ধিয়া বদ্ধিযা এতম্। দেবানামপিয় পিয়দশি লাজা হেবম অহো। এশমে হুথা অতাকন্তমচ অন্তলম হেবম ইচ্ছিশু লাজানে কথম্ জনে অনু-লুপায়া ধম্মবদ্ধিয়া বদ্ধেয়াতি নোচজনে অনু-লুপায়া ধম্মবদ্ধিয়া বদ্ধিথা।

Corpus inscriptionum Indicarum114.

এখন বৌদ্ধগ্রন্থ নানাভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। চীন ও তিব্বতভাষায় কত বৌদ্ধগ্রন্থ অন্যভাষা হইতে অনুবাদিত বা রচিত হইয়াছিল নির্ণয় করিতে পারা যায়না; বিলসাহেব তাঁহার Catena of Buddhist scriptures নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "The Budhist canon in China as it was arranged between the years 67 and 1285 A. D. includes 1440 distinct works, comprising 5586 books. But these form only a fractional part of the entire Budhist literature which is spread throughout the empire.

তাঞ্জুর ও কাঞ্জুর নামক দুই প্রকার বৌদ্ধ গ্রন্থাবলি তিব্বত দেশে প্রচলিত আছে, ইতি-পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। তিব্বতবাসী বৌদ্ধেরা বলে তাহাদের দেশে পূর্ব্বে চুরাশী সহস্র বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। শঙ্করাচার্য্য তাহার

অধিকাংশ ধ্বংশ করেন। খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হয়। এখন তিব্বতদেশ প্রচলিত সকল বৌদ্ধগ্রন্থই তাঞ্জুর বা কাঞ্জুর শ্রেণীভুক্ত। কাঞ্জুর নামধেয় ১০৮৩ খানি গ্রন্থ এখন তিব্বতে প্রচলিত আছে, এই সকল গ্রন্থকে ১০৮ খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাঞ্জুরের ২২৫ খণ্ড প্রচলিত আছে. কিন্তু ইহাতে এক এক খণ্ডে কত গ্রন্থ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

এখন বৌদ্ধধর্ম্ম নেপাল, তিব্বত বা ভোট, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, চীন, জাপান, আনাম. কাম্বোডিয়া, শ্যাম, ফানদেশ, ব্রহ্ম, আরাকান ও সিংহলে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষ চীন ও সিংহল দেশ হইতে ঐ সকল দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। উহাদিগের প্রত্যেক দেশে কত কত বৌদ্ধগ্রন্থ প্রচলিত আছে, অবগত হইতে পারা যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, বুদ্ধঘোষ সিংহল হইতে ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া ব্রহ্মদেশে প্রথম বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মবাসী বৌদ্ধেরা বলে, তাহার পুর্ব্বে তৃতীয় মহাসঙ্ঘ সমাহূত হইবার অব্যবহিত পরেই মগধ হইতে প্রচারকেরা আসিয়া ব্রহ্মবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল।

চীনদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সকল ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে এবং সিংহলদেশীয় পালি-গ্রন্থ হইতে চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। অনুবাদিত গ্রন্থ ভিন্ন সকল দেশেই পণ্ডিতেরা সময়ে সময়ে মূলগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে প্রত্নবিতেরা অনুমান করিতেন, চীন-দেশীয় সকল বৌদ্ধগ্রন্থই সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের অনুবাদ, এ ভ্রম এখন দূর হইয়াছে। ফাহিয়ান, হুয়েন্থসাং প্রভৃতি চৈনিক পরি-ব্রাজকগণ ভারতবর্ষ হইতে যেমন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সিংহল হই-তেও সেইরূপ বিবিধ পালি গ্রন্থ স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত এক খানি বুদ্ধচরিত খ্রীষ্ট জন্মের ৭০ বৎসর পরে চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে, কতকগুলি গ্রন্থ সংস্কৃত ও পালি উভয়ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। আবার অনেকানেক গ্রন্থ কেবল সংস্কৃত বা পালিভাষায় রচিত, একভাষায় যাহা পাওয়া যায়, অপরটীতে সে গুলি লক্ষিত হয় না। একথাও বলা আবশ্যক যে, জাপান দেশে যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থ পাওয়া যায়, সে সকল চীন দেশীয় গ্রন্থমালা হইতে অনুবাদিত হইয়াছিল।

গ্রন্থের নাম।	অনুবাদকের নাম।
মহাপ্রজ্ঞা পারমিতাসূত্র	হুয়েন্‌সাং
মহাপ্রজ্ঞা পারমিতা	কুমারজীব
প্রজ্ঞা পারিমিতা সূত্র	ধর্ম্মরক্ষ
রত্নকূট সূত্র	বুদ্ধিরুচি
অমিতাভ সূত্র	চি-হিয়েন
মহায়স দশ ধর্ম্মকসূত্র	——
মহা বৈপুল্য মহা সন্নিপাত সূত্র	ধর্ম্মরক্ষ
মহা বৈপুল্য ভূমিগর্ভ দশ চক্র সূত্র,	হুয়েন্‌সাং
চন্দ্রগর্ভ মহায়ণ সূত্র	নালন্দর্যশ
সূর্য্যগর্ভ মহায়ণ সূত্র	ঐ
দশচক্র ক্ষীতি গর্ভ	——
আর্য্যচক্র নির্দ্দেশ নাম মহায়ণ সূত্র,	ধর্ম্মরক্ষ
মহা সন্নিপাত অবদান রাজ সূত্র,	জ্ঞানকূট
মহা বৈপুল্য বুদ্ধানুস্মৃতি সমাধি সূত্র,	ধর্ম্মজিৎ
আকাশগর্ভ বোদ্ধিসত্ব ধারণী সূত্র,	ধর্ম্মমিত্র
বুদ্ধাবতংসক বৈপুল্য সূত্র	বুদ্ধভদ্র
তথা গত গর্ভ	ঐ
রত্ন জাল সূত্র	ধর্ম্মরক্ষ
মহা পরিনির্ব্বাণ সূত্র	ধর্ম্মরক্ষ

এই গ্রন্থখানি এখন আর সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না। চীনেরা সংস্কৃত ও পালি উভয় ভাষা হইতেই অনুবাদ করিয়াছিল।

সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরিক সূত্র	——
রত্নমেঘসূত্র	ধর্ম্মরুচি
ললিতবিস্তর	——
সর্ব্বধর্ম্ম প্রবৃত্তি নির্দ্দেশ সূত্র	জ্ঞানকূট
লঙ্কাবতার সূত্র	বুদ্ধিরুচি
আর্য্য মহামেঘ মণ্ডল বর্ষ বর্দ্ধন সূত্র	জ্ঞানকূট, জ্ঞানযশ
হস্তীকচ্ছ সূত্র	ধর্ম্মমীত
সুখাবতী বূ্যহ	হুয়েন্‌সাং
গয়াশীষ সূত্র	বুদ্ধিরুচি
দশভূমি সূত্র	কুমার জীব
মহা বৈপুল্য সূত্ররাজ	বুদ্ধতর
পদ্ম পানীয় সূত্র	——
বজ্রসমাধি সূত্র	——
বুদ্ধ সমাধি	—
গণ বূ্যহ সূত্র	দেবকর
কপিল সাংখ্য দর্শন	—

এই গ্রন্থগুলি সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত, এতদ্ভিন্ন নিদান, ধারণী প্রভৃতি বিষয়ক বহুগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

শার্দ্দূল কর্ণ সূত্র	চুকাহু
প্রাতিমোক্ষ	—
ধর্ম্মপদ	—

এই গ্রন্থ দুই খানি পালি ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় পাওয়া যায়। উভয়ের সাদৃশ্য এত অধিক এবং উভয়ের সহিত চীন অনুবাদের এত সাদৃশ্য যে, কোন্ ভাষা হইতে চীনেরা আপনাদের গ্রন্থ খানি অনুবাদ করিয়াছিল, নির্ণয় করা যায় না।

পরিনির্ব্বাণ সূত্র	ফাস্থু

এই সকল গ্রন্থ পালি ভাষা হইতে অনুবাদিত। বস্তুত অনুবাদকগণ অনুবাদকালে কেহই অনুবাদিত গ্রন্থ মধ্যে কোথায়ও উল্লেখ করেন নাই যে, কোন ভাষার গ্রন্থ হইতে তিনি অনুবাদ করিয়াছেন। একখানি পালি বা এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত চৈনিক অনুবাদের তুলনা করিয়া কোন্‌খানি কোন-ভাষা হইতে অনুবাদিত অনুমান করা হইয়াছে মাত্র। যেখানে মূল গ্রন্থের লোপ হইয়াছে বা বিভিন্ন ভাষার বহুপূর্ব্বে অনুবাদিত একই গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেখানে গ্রন্থ বিশেষ কোন্ ভাষা হইতে অনুবাদিত, নির্ণয় করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে। চৈনিক ত্রিপিটকে কত কত গ্রন্থ রহিয়াছে, তাহারা কোন্ ভাষা হইতে অনুবাদিত, এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই।

ত্রিপিটক তিনখানি গ্রন্থ নহে। যেমন চতুর্ব্বেদের প্রত্যেকের মধ্যে বা প্রত্যেক জাতীয় শত শত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, ষড়্‌দর্শনের মধ্যে এক এক দর্শন শ্রেণীর শত শত পুস্তক লিখিত হইয়াছে, ত্রিপিটকও সেই রূপ সমুদয় বৌদ্ধ গ্রন্থ সূত্র বিনয় ও অভিধর্ম্ম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তিনটী শ্রেণীর একটী সাধারণ ত্রিপিটক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এক এক শ্রেণীর সহস্র সহস্র গ্রন্থ আছে। বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত আর কোন ধর্ম্ম এত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় নাই। আবার প্রত্যেক দেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায় আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আপন পাণ্ডিত্য ও অভিরুচি অনুসারে বুদ্ধ বচনের ভাষ্য ও টীকা করিয়া স্বতন্ত্র অভিধর্ম্ম স্বতন্ত্র সূত্র স্বতন্ত্র বিনয় রচনা করিয়াছেন। বসু মিত্রের অভিধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মত্রাতের অভিধর্ম্মের, ঘোষা-

চার্য্য বিনয়ের সহিত, মহাস্রাবন্তীবাদ বা মহিশাসিক বিনয়ের বিস্তর প্রভেদ, অথচ সকলেই আপন আপন গ্রন্থ বিনয় অভিধর্ম্ম বা সূত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন, সকলেই হিন্দুদিগের ব্যবহার মত বুদ্ধকে আপন গ্রন্থের অধিনায়ক করিয়া, বুদ্ধ এই বলেন, বুদ্ধ সেই বলেন, বা বুদ্ধ এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ইত্যাদি রূপে ঘোষণা করিয়াছেন। এই সকল ভাষ্য এত বিভিন্ন মতাবলম্বী যে, তদ্দর্শনে শাক্যসিংহের প্রকৃত মত কি নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া উঠে, অথচ সকলেই বুদ্ধ বাক্যের উপর গঠিত।

আবার সূত্র বিনয় ও অভিধর্ম্ম ভিন্ন নিদান, অবদান প্রভৃতি নানা গ্রন্থ হিন্দুদিগের পুরাণ স্মৃতি বা কল্প সূত্রের মত কালক্রমে বৌদ্ধদিগের আপ্ত গ্রন্থ মধ্যে অধিকার লাভ করিয়াছে। সে সকলকে লইয়া শ্রেণী বিভাগ করিতে হইলে আবার নূতন নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করিতে হয়। নেপাল দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, অদ্ভুত ধর্ম্ম, আদান ও উপদেশ এই দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত। চীন দেশীয়েরা এই দ্বাদশ শ্রেণী স্বীকার করে। বোধ হয় পালি বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল ও এক সময়ে এই সকল শ্রেণীতে বিভক্ত হইত। বৌদ্ধদিগের মতে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকার ভিন্নতা এই রূপঃ—

১। সূত্র।—ব্রাহ্মণদিগের বেদ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মাননীয়, বৌদ্ধদিগের সূত্র তেমনি মূল গ্রন্থ। শাক্যসিংহের বচন সকল লইয়া সূত্র রচিত। কিন্তু কালক্রমে লোক আপন আপন অভিরুচি মত শাক্য বাক্যের অর্থ করিয়া তাহাকেই সূত্র নামে আখ্যাত করিয়াছে। প্রজ্ঞা পারমিতা এইরূপ এক খানি সূত্র গ্রন্থ নেপাল দেশে ইহার বহু সম্মান, অথচ সিংহলীয় বৌদ্ধগণ এ গ্রন্থ খানিকে এক খানি আপ্ত গ্রন্থ রূপে আদৌ স্বীকার করে না।

২। গেয়, এ গুলি স্তোত্র।

৩। ব্যাকরণ। এ গুলি ইতিহাস গ্রন্থ। শাক্যসিংহ নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পূর্ব্বে জন্ম জন্মান্তরে যাহা করিয়াছিলেন, তাহারই বিবরণ এই সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়। অন্যান্য বৌদ্ধ মহাপুরুষদিগের জীবন চরিতকে ব্যাকরণ বলে। প্রজ্ঞা পরিমিতার মত দর্শন উপদেশ বা তন্ত্র সকলকে ব্যাকরণ বলা যায় না। সিংহল দেশে ধর্ম্মোপদেশকে ব্যাকরণ বলে।

৪। গাথা, ইহা এক প্রকার রচিত ব্যাকরণ। ইহাতে সুনীতি পূর্ণ অনেক আখ্যায়িকা ও অনেক ধর্ম্ম কথা আছে। ললিতবিস্তর এক খানি গাথা ব্যাকরণ।

৫। উদান। বুদ্ধের গুণাবলি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গুরু শিষ্যের কথোপকথন।

৬। নিদান। যে সকল গ্রন্থে কার্য্যের কারণ আলোচিত হয়, তাহাকে নিদান বলে। শাক্য কিরূপে বুদ্ধ হইলেন, জীব জন্ম কেন হয়, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা নিদান গ্রন্থে দেখা যায়।

৭। ইত্যুক্ত। ইহা এক প্রকার ব্যাখ্যা পুস্তক। গ্রন্থ বিশেষে শাক্য বা কেহ কিছু বলিয়াছেন দেখা যায়। কেন তাঁহারা এরূপ বলিয়াছেন, অথবা তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে কি নিগূঢ় অর্থ আছে, ইত্যাদি বিষয় এই সকল গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

৮। জাতক। হরিণরূপে, পক্ষীরূপে, ব্রাহ্মণরূপে, ক্ষত্রিয়রূপে, শাক্যসিংহ পাঁচ শত

পঞ্চাশ বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেন তাঁহার বিবিধ জন্ম হইয়াছিল, কেন জীবের জন্মান্তর লাভ হয়, যোনী ভ্রমণ ঘটে, ইত্যাদি বিষয় জাতক গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

৯। বৈপুল্য। ইহলোকে অর্থ পরলোক ধর্ম্ম কিরূপে সঞ্চয় করা যায়, বৈপুল্য সকলে তাহারই আলোচনা হইয়াছে।

১০। অদ্ভুত ধর্ম্ম। অমানুষী ক্রিয়া কাণ্ড কিরূপে ঘটে, কিরূপে ঘটান যায়, তাহারই আলোচনা এই সকল গ্রন্থে দেখা যায়।

১১। অবদান। কি কার্য্যের কি ফল জীব জন্মে মনুষ্য ভোগ করে, তাহাই এই সকল গ্রন্থে সমালোচিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে হিন্দুদিগের পুরাণের মত অতিরঞ্জিত এক প্রকার ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়।

১২। উপদেশ। ইহারা হিন্দুদিগের তন্ত্রের মত।

সাধারণের অপ্রকাশ্য অনেক গূহ্য কথা, কি ভাবে কাহার উপাসনা করিতে হয় বিবিধ মুদ্রা, ভূতসিদ্ধি প্রেতসিদ্ধি ইত্যাদি নানা কথা এই সকল গ্রন্থে আছে। হিন্দুদিগের তন্ত্র ও বৌদ্ধদিগের উপদেশ কোথায় কোথায়ও একই গ্রন্থ। অনেক ঘৃণিত লজ্জাস্কর কথা ইহাদিগের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। আবার ইহাদিগের মধ্যেই ঈশ্বরের সত্তা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত নেপালীয় বৌদ্ধ গ্রন্থের তালিকা হইতে কতক গুলি পুস্তকের নাম লইয়া আমরা এই দ্বাদশ শ্রেণীর কয়েক শ্রেণীতে সাজাইলাম।

১ সূত্র। প্রজ্ঞা পরিমিতা, বিনয় সূত্র।

২ গেয়। লোকেশ্বর শতক, শরক ধারা, গীত পুস্তক, স্তোত্র সংগ্রহ, কল্যাণ পঞ্চ বিংশতিকা, পরমার্থ নাম সঙ্গীতি।

৩ ব্যাকরণ। গণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক, সুবর্ণ প্রভাস, কারণ্ড ব্যূহ।

৪ গাথা। ললিতবিস্তর, সয়ম্ভু পুরাণ, গুণ কারণ্ড ব্যূহ।

৫ উদান।

৬ নিদান।

৭ ইত্যুক্ত।

৮ জাতক। জাতক মালা, কুশ জাতক,

৯ বৈপুল্য। লঙ্কাবতার,

১০ অদ্ভুত ধর্ম্ম।

১১ অবদান। মহাবস্তু, অশোক, ভদ্র কল্প, মণিচূড়, বোধিচর্য্যাবতার, করুনা পুণ্ডরীক, সুগত, সুখাবতী ব্যূহ, চৈত্য পুঙব, দিব্যাবদান, বোধিসত্ত্ব, শার্দ্দূল কর্ণ।

১২ উপদেশ। অপরিমিতায়ুধারণী, পঞ্চ রক্ষা, প্রত্যঙ্গিরা ধারণী, তারা শত নাম, ক্রিয়া সংগ্রহ, ধ্বজাগ্র কেয়ূরী, গৃহ মাতৃকা, মহাকাল তন্ত্র, অভিধানোত্তর, গণপতি হৃদয়, পূজা পদ্ধতি।

পূর্ব্বে যে সকল চৈনিক বৌদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, বিশেষ বিবরণ না দিলেও পাঠক স্বয়ং তাহাদিগকে এই তালিকার বিভিন্ন শ্রেণীত বিভক্ত করিয়া লইতে পারিবেন।

তির্ব্বত দেশীয় কাজুর (১) তুলবৃবা বিনয় (২) সেরচ্চিন বা প্রজ্ঞা পারমিতা (৫) দেশদে বা সূত্রান্ত (৭) গিয়ুর্দ বা তন্ত্র (৬) মেয়াঙ্গদান বা নির্ব্বাণ (৪) কোন সেগ বা রত্ন কূট (৩) এবং ফালচেন বা বুদ্ধ বংশ এই সাত ভাগে বিভক্ত। তাঞ্জুরে কেবল সূত্র ও তন্ত্র এই দুই ভাগ দেখিতে

পাওয়া যায়। কিন্তু অলঙ্কার দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় ইহাদিগের অন্তর্গত। চীন-দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল (১) মহায়ণ ও হীনায়ণ সূত্র (২) মহায়ণ ও হীনায়ণ বিনয় (৩) মহায়ণ ও হীনায়ণ অভি-ধর্ম্ম এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া আবার (১) প্রজ্ঞাপারমিতাদি সূত্র (২) রত্ন কূট (৩) বৈপুল্য (৪) অবতংশক (৫) নির্ব্বাণ (৬) আগম (৭) ব্যাকরণ (৮) অবদান (৯) নিদান (১০) উদান ইত্যাদি নানা ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

সিংহল দেশীয় পালি বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম সেই তিন প্রাচীন বিভাগে অদ্যাপি বিভক্ত। সূত্র পিটক দীঘ নিকায়, মঝ্ঝিম নিকায়, সংযুক্তক নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, এবং খুদ্যক নিকায়, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। বিনয় পিটক সুত্তবিভাঙ্গ, খন্দক, এবং পরিবার পাঠ, এই তিন ভাগে বিভক্ত। পারাজিকা ও পাচীত্তীয়কে সূত্র বিভাঙ্গ এবং মহাবগ্‌গ ও কূলবগ্‌গকে খন্দক বলে। ধর্ম্মসঙ্গনী, বিভাঙ্গম, কথা বা ক্ষু, পুগ্‌গল, পানত্তি, ধাতু-কথা, জমকম্ এবং পাঠনম অভিধর্ম্ম পিটকের অন্তর্গত। নিকায় সকলের প্রত্যেকের মধ্যে আবার অনেক গুলি গ্রন্থ আছে। যথা দীঘ্‌ঘ নিকায়ের অন্তর্গত ও অম্বও কূটদন্ত, মহা নিদান, মহাপধান, সোনদন্ত, মহালি, সঙ্গীত পর্য্যায়। মঝ্‌ঝিমনিকায়ের অন্তর্গতঃ—রথপাল, শক্তি, ফস্সুকারী, দ্বেধা বিতক্ক, সূল সকুলুদায়ী, মহাতুখ্‌খখন্ধ, অলগ্‌গা নাপ্‌পয়। সম্মাদিল্‌ী, অঙ্গলিমাল, সংসার উপ্পত্তি, সূলমালুক্য, অলগদ্দূপমা, পিণ্ডপাত পরিশুদ্ধি, অনুমান, ইন্দ্রিয় ভাবনা, উপক্কি-লেমিয়। সূল সুঞ্‌ত্তা, মহাতন্‌হাসখম্য, গোপক মোগ্‌গলান, আচারীয় বহুত, সুল-ক্কও, মহাপুণ্য মায়া, পঞ্চত্তয়, রথবিনিও। সংযুক্তক নিকায়ের অন্তর্গত—টীকা নিপাত, পঞ্চক নিপাত, সওক নিপাত। ক্ষুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গতঃ—ক্ষুদ্দকপাঠ, ধর্ম্মপদ, উদান, ইতিবুত্ত, সুত্তনিপাত, বিমান বাথ্‌থু, পেট বাথ্‌থু, যের গাথা, জাতক, নিদ্দেশ, পতি সমবিদ্দ মাগ্‌গ, আপদান, বুদ্ধবংশ সারিয় পিটক ইত্যাদি ইত্যাদি। বিনয় পিট-কের অন্তর্গত পারাজিকা ও পাকিত্তিয়কে সুত্ত বিভাঙ্গ এবং মহাবগ্‌গ, কূলবগ্‌গ ও পরিবার পাঠকে খন্ধক বলে। ক্রমশঃ

নবলীলা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বীভৎস শক্তিসাধন।

কোথায় লইয়া চলিল, কেন লইয়া চলিল, তাহা কমলমণি জানিতেন, পূর্ব্বেই সকল ঠিক ছিল। কুলকামিনী বা সুলোচনা কিছুই জানেন না। সুলোচনার মায়ায় কুলকামিনী অপরিচিত পথে চলিতে লাগি-লেন। সুলোচনার চক্ষুতে এখনও সেই আলোক জলিতেছে, এখনও সেই স্বর কাণে বাজিতেছে, সংসার যেন নাই নাই বোধ হই-তেছে; তিনি অবিচলিত ভাবে চলিতেছেন। লোকেরা যে কারণে কমলমণিকে প্রহার

করিতেছিল, তাহা মিলিয়াছে, তাহাদের আহ্লাদের সীমা নাই, তাহারা মনে ভাবিতেছে, আজ সুলোচনা ফাঁদে পড়িয়াছে—আর ভয় নাই। একে একে দুই একটী গ্রাম অতিক্রান্ত হইল। গ্রামের লোকেরা উৎসুখ চিত্তে ইহাদিগকে চাহিয়া দেখিল, কেহ বা হাসিয়া উড়াইল, কেহ বা ভ্রূকুঞ্চিত করিল। কমলমণি লোকদিগের একজনকে বলিলেন,—"গোরাচাঁদ, এ পথে না যেয়ে, চল ঐ দক্ষিণ পাড়া বা হাতে রেখে যাই, ওদিকে লোকজন নেই।

গোরাচাঁদ বলিল, তাই চল।

দক্ষিণপাড়া বাহাতে রাখিয়াই লোকেরা চলিল। কুলকামিনী এতক্ষণ মনে ভাবিতেছিলেন, লোকেরা কোথায় যাইতেছে, মা তাহা জানেন না; তবে টাকা দিয়েছেন বলিয়া এবং সুলোচনার মমতা ছাড়িতে পারিতেছেন না বলিয়া যাইতেছেন। এক্ষণ সে ভ্রম দূর হইল, বুঝিলেন মা সকলি জানেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, মা আমাদিগকে লইয়া কোথায় যাইতেছ?

কমলমণি—কোথায় যাইতেছি?—তা সকলি জানিবে। আজ শক্তির পূজা হইবে।

কুলকামিনী,—শক্তি কি মা?

কমলমণি,—সকলি বুঝিতে পারিবে।

লোকেরা পূর্ব্বে যে পথে যাইতেছিল, সে পথে তবুও লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ হইতেছিল, কুলকামিনীর আশা ছিল, বিনোদবাবুর সহিত যদি সাক্ষাৎ হয়, তবেই আশা পূর্ণ হইবে, উদ্ধারের উপায় হইবে। কিন্তু মাতার আদেশে গোরাচাঁদ এমন পথে লইয়া চলিল, যে পথে লোকজনের নামগন্ধও নাই। ক্রমেই পথ দুর্গম হইয়া আসিল, সে পথে লোকের যাতায়ত প্রায় নাই। ক্রমে সে পথ অরণ্যের দিকে চলিল। কুলকামিনীর মনে থাকিয়া থাকিয়া কত কি ভাবনা, আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছিল। এক একবার ইচ্ছা হয় সুলোচনাকে সকল বিপদের কথা খুলিয়া বলেন, আবার মনে হয়, সুলোচনা ত বিপদই চায়। বিষম সমস্যা, কি করিবেন, কিছুই ঠিক পাইতেছেন না;—মা কথা শুনিবে না, কারণ মায়ের স্বার্থ আছে, সুলোচনা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সে মরিবে তবুও ফিরিবে না, কাহাকে কি বলিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। লোকেরা ক্রমেই ঘনীভূত অরণ্যের মধ্যে চলিল—গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে ঘেসা ঘেসিতে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ লাভ করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে পারিতেছে না, ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে কেবল স্থানে স্থানে একটু একটু আলোক দেখা যাইতেছে,—পত্রের মধ্য দিয়া একটু একটু আলোক আসিতেছে। কুলকামিনী জঙ্গলের পরিসর কত জানেন না, মনে হইতেছে—এইবার অরণ্য শেষ হইবে। আশার সহিত চলিতে লাগিলেন,—কিন্তু অরণ্য আর শেষ হয় না। আবার পুনঃ আশা হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়—আবার নবোৎসাহে চলেন, কিন্তু তবুও শেষ হয় না। তবে বুঝি অরণ্য শেষ হইবে না; একবার একবার এই প্রকার মনে হয়, কিন্তু আশার উত্তেজনায় এ চিন্তা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না; আবার কুলকামিনী মনে করেন, এইবারই জঙ্গল শেষ হইবে,—নিশ্চয় হইবে; ঐ যে আলো দেখা যাইতেছে। কুলকামিনীর আশা পূর্ণ হইল, আলোকময় স্থান নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু সে স্থানের চতুর্দ্দিকেই তিমিরাবৃত অরণ্য। সেই স্থান দেখিয়া কুলকামিনী একটু যেন শান্তি পাই-

লেন—সেখানে আরো কয়েকজন লোকছিল, চতুর্দ্দিক অরণ্য, মধ্যে একটী কালীরমন্দির, সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা বহু দিনের দামাবৃত, দুই একস্থান ভিন্ন জল দৃষ্টি-গোচর হয় না। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, নীলাম্বরে একাকী সূর্য্য তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিতেছেন, অরণ্যের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ঐ স্থানে তখন ক্রোধাবতার হইয়া কটাক্ষ করিতেছেন। কয়েকজন মাত্র লোক নীরবে বসিয়া রহিয়াছে—যেন কি ভাবিতেছে, যেন কি নিরাশার কালিমা হৃদয়কে ঘেরিয়াছে। দূর হইতে কুলকামিনী দেখিলেন—তাহাদিগকে দেখিয়া ঐ লোকেরা প্রফুল্ল হইল—মলিন বসন, মলিন ভূষণ হৃদয় হইতে খুলিয়া রাখিল, প্রস্ফুটিত ফুল্ল কমলবৎ আনন্দোচ্ছাস হৃদয়ে তুলিয়া দিল। তাঁহারা মলিন ছিল, প্রফুল্ল হইল। তাহারা বসিয়াছিল, দাঁড়াইল—পরে অভ্যর্থনার জন্য আসিল। অভ্যর্থনা করিল। গোরাচাঁদের দলে সেই দল মিশিল। মিশিয়া কত হাসিল,—হাসিল মাতিল—নাচিল—গাইল। গাইতে গাইতে কালীর মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী হইল। গোরাচাঁদ বিকটস্বরে—মন্দিরের সন্মুখে যাইয়া—মা মা মা, বলিয়া তিনবার ডাকিল। সেই ডাকে করালবদনী যেন প্রসন্ন হইলেন—পুরোহিত মন্দির হইতে বিল্বপত্র এবং সুরার পাত্র হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন—গোরাচাঁদ মা প্রসন্ন হইয়াছেন, এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। গোরাচাঁদ হাত পাতিয়া সানন্দে বিল্বপত্র এবং পাত্র গ্রহণ করিলেন।

পুরোহিত বলিলেন,—গোরাচাঁদ, কলিতে তোমার ন্যায় ভক্ত দেখি নাই। সংসারের নিন্দা ঘৃণাকে তুচ্ছ করিয়া তোমার মত আজ পর্য্যন্ত কেহই মায়ের চরণ পূজা করিতে পারে নাই। তুমিই ধন্য কারণ তুমি শিক্ষিত হইয়াও মায়ের সম্মান, দেশের গৌরব রক্ষা করিতেছ। কলিকালে ইংরাজি শিক্ষায় দেশের প্রেমভক্তি সকল গেল। আর দেশে ধর্ম্ম থাকে না। ওদিকে চাহিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। শিক্ষা পাইয়া লোকেরা আর কিছুই মানিতে চায় না, মাতার সম্বন্ধ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। মা কঙ্কালবদনী কি অপরূপ সাজে আজ সাজিয়াছেন, গোরাচাঁদ, উনবিংশ শতাব্দীর প্রকৃত ভক্ত, একবার চাহিয়া দেখ। রণরঙ্গিনী মাতার বেশ একবার দেখ। দেশের নাস্তিকতা ডুবাও, জীবন্ত ধর্ম্ম সাধনায় প্রবৃত্ত হও, চক্রে উপবিষ্ট হও।

গোরাচাঁদ বিকট স্বরে সজল নয়নে আবার "ডাকিলেন—মা—মা—মা, প্রসন্নময়ী অভয় দান কর, সংসারের যশ, মান, নিন্দাকে ডুবাইয়া আজ একবার তোমার সম্মুখে মাতিব। বিবসনা নিশম্ভুঘাতিনী মা—আজ সদয় হও।" এই বলিয়া গোরাচাঁদ মন্ত্রপূত সুরার পাত্র আপনি উদরসাৎ করিলেন, এবং আর আর অন্যান্য সকলকে এক এক পাত্র দিলেন। কুলকামিনী দেখিয়া বিস্মিত, চমকিত হইলেন। সুলোচনা ঊর্দ্ধনয়না হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, এ সকল তাঁহার চিন্তার বিষয় নহে। কুলকামিনী দেখিলেন, ক্রমে কমলমণি সুরার পাত্র হাতে করিলেন। কুলকামিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বলিলেন, মা, করিস্ কি? কমলমণি কথা বলিলেন না, পাত্রস্থ সুরা উদরসাৎ করিলেন। কমলমণির পরে সকলেই এক এক পাত্র উদরসাৎ করিলেন। এক পাত্রের পরে ক্রমে দুই তিন পাত্র উঠিল। কমলমণি তখন উন্মত্ত হইয়াছেন। কুলকা-

মিনীকেও মন্ত্রপূত সুরার পাত্র দিলেন। কুলকামিনী পাত্র হাতে লইয়াই মৃত্তিকায় ফেলিয়া দিয়া পদমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, সর্ব্বনাশি, তোর সাধ কখনই পূর্ণ হবে না, আজ দেখিব—মা হারে কি কন্যা হারে। কুলকামিনীর কথা শেষ হইতে না হইতে চতুর্দ্দিকের সকলে মাতিয়া উঠিল। কি মন্ত্রপূত সুরার অবমাননা? শক্তি পূজায় বাধা? এই বলিয়া পুরোহিত রক্তিম চক্ষে গোরাচাঁদের প্রতি চাহিয়া আদেশ করিলেন—সকলে উলঙ্গ হও—বলপূর্ব্বক ইহাদিগকে দীক্ষিত কর!

পুরোহিতের আদেশ শুনিবামাত্র গোরাচাঁদ সকলকে মাতিতে আদেশ করিলেন, এবং আপনি নিজ হাতে পাত্র লইয়া সুলোচনার সম্মুখীন হইলেন। গোরাচাঁদ কিছু না বলিয়া সুলোচনার হাত ধরিলেন এবং মুখের নিকটে পাত্র ধরিয়া বলিলেন,—পান করে জন্ম সার্থক কর্!

স্নেহের অবতার সুলোচনা সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

গোরাচাঁদ পুনঃ বলিলেন, মায়ের প্রসাদ গ্রহণ কর।

সুলোচনা। কই মা? কাহার প্রসাদ?

গোরাচাঁদ মন্দিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, ঐ দেখ মা জীবন্ত অবতার দণ্ডায়মান। প্রসাদ ধর।

সুলোচনা। ও ত মা নহে, মায়ের ছায়া মাত্র। আমি পাত্র ধরিব না। আকাশ হইতে মা পাত্র ধরিতে নিষেধ করিতেছেন। গোরাচাঁদ এই কথা শুনিয়া বলপূর্ব্বক সুলোচনার মুখে সেই মন্ত্রপূত সুরা ঢালিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহা সুলোচনার গলাধঃকরণ হইল না। মা আমার ধর ধর বলিতে বলিতে ভয়ে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কুলকামিনী ভগ্নীর মূচ্ছার অবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলিলেন, পাষণ্ড কি করিলি, আমার সম্মুখে সুলোচনাকে মারিলি? এই বলিয়া সুলোচনার হাত হইতে অস্ত্র লইয়া গোরাচাঁদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সে অস্ত্র গোরাচাঁদের শরীরে লাগিল না। গোরাচাঁদ এবং অন্যান্য সকলে বলপূর্ব্বক কুলকামিনীকে ধরিল। কুলকামিনী ছাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন। কমলমণি এই অবস্থায় কুলকামিনীর মুখে মন্ত্রপূত সুরা ঢালিলেন। কুলকামিনী সুরায় দীক্ষিত হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে কমলমণির ন্যায় উন্মত্ত হইলেন। সুলোচনাকে চেতন করিতে পাষণ্ডেরা অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই চেতনা হইল না। শক্তি পূজা হইল—সকলে মাতিল—নাচিল, গাইল, পরে সকলেই অচেতন হইয়া পড়িল। ক্রমে সকল নীরব হইল।

মূর্চ্ছার অবস্থায় সুলোচনা আবার স্বপ্ন দেখিলেন—"বিনোদ বাবু বলিতেছেন,—ভয় কি সুলোচনা, চাহিয়া দেখ আনন্দময়ী, প্রেমরূপিনী বিশ্বেশ্বরী স্বয়ং তোমাকে উদ্ধার করিতেছেন, ভীত হইও না। মরিবে, মনে ভাবিয়াছ? তা হবে না; ধীরে ধীরে মাতার ইঙ্গিত মত ঐ পথে চল।—দস্যুর ভয়ে কাতর হইয়াছ?—বিপদে মলিন হইয়াছ? প্রেমময়ীর প্রসন্ন মুখের পানে তাকাও।" এই কথা শেষ হইতে না হইতে বিনোদ বাবু অদৃশ্য হইলেন, সকলেই অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। জননীকে দেখিয়া সুলোচনা বিস্মিত হইল না, কিন্তু দিদিকে ওরূপ

বেশে ধরায় পতিত দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। আকাশের পানে চাহিয়া বলিলেন, মা, তুমি এ কি চিত্র দেখাইলে? দিদি-কেও বিচ্ছিন্ন করিলে—পাপে ডুবাইলে? সুলোচনার নয়ন মুদিত হইয়া আসিল; সহসা অন্তরের নিগূঢ়তম স্থান হইতে কে যেন আদেশ করিল—"এখনও ভাবিতেছ? ঐ পথে চল, মা ডাকিতেছেন।" সুলোচনা আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না ধীরে ধীরে সেই আদেশ ধরিয়া সুলোচনা নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, নীরবে সুলোচনা চলিলেন। বিনোদবাবুর স্বর তখনও কাণে বাজিতেছিল, সুলোচনা নির্ভয়ে আবার গভীর অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ

জীবন বিজ্ঞান।

আমবা চারিদিকে লতা, বৃক্ষ, গো, মনুষ্য ইত্যাদি যে সমুদয় পদার্থ দেখিতে পাই, তাহাদিগকে জীবিত পদার্থ বলি। আর কাষ্ঠ, প্রস্তর, চুণ, ইষ্টক প্রভৃতি পদার্থকে সাধারণ ভাষায় আমরা জীবিত পদার্থ সংজ্ঞার বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করি। কোন্ বস্তু জীবিত আর কোন্ বস্তু জীবিত নহে, তাহা দেখিয়া বলা আমাদিগের পক্ষে বিশেষ কঠিন নহে; কিন্তু যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি, জীবিত পদার্থ কাহাকে বলে, তাহা হইলে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তত সহজ নহে। কেহ হয়ত বলিবেন যে, যাহার জন্ম বৃদ্ধি মৃত্যু আছে, তাহাকে জীবিত পদার্থ বলে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু বুঝিয়া দেখিতে গেলে, আবির্ভাব, বৃদ্ধি, ও তিরোভাব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তবে কি আমরা যে বস্তুকেই আবির্ভূত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও তিরোভূত হইতে দেখি, তাহাকেই জীবিত বলিব। আমরা জানি যে, কোন স্থানে সমুদ্রের জল রৌদ্রে ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া যাইলে, সে স্থানে লবণ হইতে থাকে, যতই জল অধিক শুকাইয়া যায়, ততই অধিক লবণ হয়. অবশেষে যখন সমুদয় জল শুকাইয়া যায়, যেমন বৃহৎ এক লবণের রাশি দেখা যায়। পরে আবার ঐ স্থানের উপর দিয়া জল চলিতে আরম্ভ হইলে ঐ লবণ রাশি ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া অদৃশ্য হইতে পারে। এখানে আমরা এই লবণরাশি প্রথমে আবির্ভূত, পরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, আর শেষে তিরোর্ভূত হইতেছে, জানি। কোন স্থানে বৃষ্টির জল জড় হইয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার শেষে এই জল রৌদ্রে শুকাইয়া অদৃশ্য হয়, এখানেও আমরা জলরাশির আবির্ভাব, বৃদ্ধি, ও তিরোভাব দেখিতে পাইতেছি। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই লবণরাশি আর এই জলরাশিকে আমরা জীবিত পদার্থ বলিতে পারি কি না? বৃক্ষ ও মনুষ্য সাধারণ ভাষায় অর্থে জীবিত পদার্থ, উহারাও সেই অর্থে জীবিত পদার্থ কি না? সকলেই বোধ হয় এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, ঐ লবণ রাশি ও ঐ জল রাশিকে আমরা ঐ অর্থে

জীবিত পদার্থ বলিতে পারি না। এখন দেখা যাউক, জীবিত পদার্থ কাহাকে বলে? আমরা পূর্ব্বে যে আবির্ভাব, বৃদ্ধি, ও তিরোভাবের কথা বলিয়াছি, উহার মধ্যেই জীবনের সংজ্ঞা পাওয়া যাইবে। এই তিনটী শব্দের মধ্যে বৃদ্ধি শব্দটীর অর্থ আলোচনা করিয়া দেখিলে, জীবিত পদার্থ কাহাকে বলে, বুঝিতে পারা যাইবে। লবণরাশির বৃদ্ধি লবণে লবণের যোগ, জলরাশির বৃদ্ধি জলে জলের যোগ। এই রূপ যাহাদিগকে আমরা সাধারণ ভাষায় জীবিত পদার্থ সংজ্ঞার বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করি, তাহাদিগের কোন একটীর বৃদ্ধি তাহাদিগের সেই একটীর কতক অংশে অপর কতক অংশের যোগ। আবার বৃক্ষ কি মনুষ্যের বৃদ্ধি কাহাকে বলে দেখা যাউক। বৃক্ষ বাহিরে বায়ু হইতে কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ নামক এক প্রকার গ্যাস ও জলীয় গ্যাস, আর মৃত্তিকা হইতে জল ও তাহার সহিত খনিজ পদার্থ নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, তার পর তাহা নিজের শরীরের দ্রব্যে পরিণত করে। এই রূপে বাহির হইতে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; বৃক্ষের বৃদ্ধির প্রকৃতি এই যে, বৃক্ষ তাহার শরীরের অসদৃশ দ্রব্য গ্রহণ করিয়া শরীরের দ্রব্যে পরিণত করে। মনুষ্যের বৃদ্ধিও ঐ প্রকার। মনুষ্য যে সব খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে, তাহা হয় তাহার শরীরের অসদৃশ (যেমন চাউল কি শাক) আর না হয় তাহার শরীরের সদৃশ (যেমন মাংস) কিন্তু এই খাদ্য দ্রব্য, শরীরের সদৃশই হউক আর অসদৃশই হউক, শরীরের মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে অণুতে অণুতে বিভক্ত হইয়া যায়, তার পর উহা আবার শরীরের দ্রব্যে পরিণত হয়। এই রূপে যে সমুদয় পদার্থ বাহির হইতে দ্রব্য গ্রহণ করিয়া নিজের শরীরের দ্রব্যে পরিণত করিতে পারে, তাহাদিগকে জীবিত পদার্থ বলে। জীবিত পদার্থ ও জীবনবিহীন পদার্থ এই দুয়ে আর এক বিশেষ প্রভেদ এই দেখা যায়,—জীবনবিহীন পদার্থের (যেমন প্রস্তর খণ্ডের) অণুগুলি, সেই জীবনবিহীন পদার্থ যত দিন বর্ত্তমান থাকে, তত দিন একই রহিয়া যায়, অর্থাৎ প্রথমে যে অণু গুলি ছিল, পরেও সেই অণুগুলি সমুদয় কি তাহার কতক গুলি থাকে। জীবিত পদার্থে এরূপ নহে। জীবিত পদার্থে কোন কোন অংশে ক্রমাগত পুরাতন অণু গুলি ক্ষয় হইতেছে, অর্থাৎ তাহাদিগের পরমাণুতে পরিণত হইতেছে, আর সেই সকল পুরাতন অণুর পরিবর্ত্তে নূতন অণু গঠিত হইতেছে। আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, যে সকল পদার্থ বাহিরের দ্রব্য নিজের শরীরের অন্তর্ভূত করে ও পরে তাহা নিজের শরীরের দ্রব্যে পরিণত করে, তাহাদিগকে জীবিত পদার্থ বলা যায়, আর যে সকল পদার্থ তাহা করিতে পারে না, তাহাদিগকে জীবনবিহীন পদার্থ বলা যায়। জীবিত পদার্থের যে যে ঘটনা আবির্ভূত হয়, সেই সকল ঘটনার সমষ্টিকে তাহার জীবন বলে। কি কি নিয়ম অনুসারে সকল ঘটনা আবির্ভূত হয়, তাহা যে বিজ্ঞানে আলোচিত হয়, তাহার নাম জীবনবিজ্ঞান। এই প্রবন্ধে জীবন বিজ্ঞানের কয়টী বিভাগ আছে, আর ঐ কয়টী বিভাগে কি কি বিষয় কি কি পদ্ধতিতে আলোচিত হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে। কোন জীবিত পদার্থ দেখিলে তাহাতে প্রথমতঃ দুইটী

বিষয় লক্ষ্য করা যায়। উহার দেহ আর উহার দেহের মধ্যে যে সকল কার্য্য সাধিত হয়। জীবন বিজ্ঞানের যে ভাগে দেহের বিষয় আলোচিত হয়, তাহাকে জীবদেহ বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে; আর যে ভাগে দেহের কার্য্য সকলের প্রক্রিয়া গুলি আলোচিত হয়, তাহাকে জীব-প্রক্রিয়া-বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

জীবদেহ বিজ্ঞানে জীবদিগের দেহে কি কি অংশ আছে, এই সকল অংশের পরস্পর কি সম্বন্ধ তাহা আলোচিত হয়। জন্তুর দেহে অস্থি, মাংসপেশী, রক্তপেশী, মগজ, স্নায়ু, ইত্যাদি অনেক অংশ আছে; আবার বৃক্ষে শিকড়, গুঁড়ি, শাখা, পাতা ইত্যাদি অংশ আছে। জন্তুদিগের দেহে কোথায় কোন্ অংশ, প্রত্যেক অংশের সহিত তাহার নিকটস্থ প্রত্যেক অপরাংশের কি সম্বন্ধ ইত্যাদি নির্ণয় করিবার নিমিত্ত মৃত অবস্থায় উহাদিগের ছেদ করিয়া দেখা হইয়া থাকে; বৃক্ষদিগের দেহে কোথায় কোন্ অংশ আর ঐ সকল অংশের পরস্পর কি সম্বন্ধ, তাহা বৃক্ষদিগের দেহের উপর হইতেই অনেকটা দেখা যায়, তবে বৃক্ষের ফুল, ফল প্রভৃতি ছেদ করিয়াও দেখা হইয়া থাকে। জীবদিগের দেহের প্রত্যেক অংশের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গুলি দেখার নিমিত্ত অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হইয়া থাকে; জীবদিগের দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গুলি অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে এক একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ন্যায় দেখায়, এই নিমিত্ত জীবদেহ বিজ্ঞানের যে ভাগে দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের আলোচনা হয়, সে ভাগের নাম আমাদিগের ভাষায় জীব প্রকোষ্ট বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। জীবদেহ বিজ্ঞান দুই প্রকারে অনুশীলন করা যাইতে পারে; এক কোন জন্তু বা কোন উদ্ভিদের দেহের গঠন আলোচনা করা, আর এক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্তু বা উদ্ভিদদিগের দেহের গঠন তুলনা করিয়া ঐ সকল শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে কতদূর সাদৃশ্য আছে তাহা আলোচনা করা; জীবদেহ বিজ্ঞান যখন দ্বিতীয় প্রকারে অনুশীলন করা হয়, তখন তাহাকে তুলনাশীল জীবদেহবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। জীব প্রক্রিয়া বিজ্ঞানে আমরা দেহের মধ্যে কোন্‌কার্য্য কিরূপে সাধিত হয়, তাহা আলোচনা করি। কিরূপে শরীরের মধ্যে রক্তস্রোত চলে, কিরূপে খাদ্য দ্রব্য ভক্ষিত ও জীর্ণ হয়, কিরূপে আমাদিগের শ্বাস ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, কিরূপে আমাদিগের স্নায়ুর মধ্য দিয়া মগজে ইঙ্গিত যায়, আর তাহার পর কিরূপে মগজ হইতে স্নায়ুর মধ্য দিয়া ইঙ্গিত আসিয়া আমাদিগের মাংসপেশী গুলিকে কার্য্য করায়, ইত্যাদি সমুদয় বিষয় জন্তুদিগের জীবপ্রক্রিয়া-বিজ্ঞানে আলোচিত হইয়া থাকে। আবার বৃক্ষদিগের জীবপ্রক্রিয়া বিজ্ঞানে বৃক্ষদিগের শিকড় হইতে রস উঠিয়া কিরূপে উহা গুঁড়ির মধ্য দিয়া শাখা প্রশাখায় ও শেষে পাতায় পাতায় চালিত হয়, আবার কিরূপে পাতার মধ্যে বায়ু হইতে বৃক্ষেরা যে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে, তাহা সেখানে রূপান্তরিত হইয়া পরে বৃক্ষের নানা অংশে প্রেরিত হয়, কিরূপে লতা সকল বক্র হইয়া অন্য পদার্থ বেড়িয়া ফেলে, ইত্যাদি সকল বিষয় আলোচনা করা হয়।

জীববিজ্ঞানের এক ভাগে জীবজন্তু কিরূপে জরায়ু অবস্থা হইতে পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহা আলোচিত হয়, এই ভাগের নাম জরায়ু বিজ্ঞান রাখা যাইতে পারে।

কোন জীবের জরায়ু অবস্থা হইতে পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা আবির্ভূত হয়, তাহাদিগের সমষ্টিকে ঐ জীবের পরিবর্দ্ধন বলা যাইতে পারে। জরায়ু বিজ্ঞানে আমরা কোন বিশেষ শ্রেণীর জরায়ুর পরিবর্দ্ধন আলোচনা করিতে পারি; অথবা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জরায়ুর পরিবর্দ্ধন তুলনা করিয়া দেখিয়া উহাদিগের মধ্যে পরস্পর কি সাদৃশ্য আছে, তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। যখন জরায়ু বিজ্ঞান দ্বিতীয় প্রকারে অনুশীলন করা হয়, তখন উহাকে তুলনাশীল জরায়ু বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

আমরা এক্ষণে জীববিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়াছি। জীববিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধ আপাততঃ শেষ করিব। বিজ্ঞানে আমরা দুই প্রকারে প্রকৃতির আলোচনা করিতে পারি; এক এই যে, প্রকৃতিতে পদার্থ গুলি যেমন থাকে সেই রকম রাখিয়া দেখিয়া যাওয়া, ইহার নাম পরিদর্শন রাখা যাইতে পারে। আর এক এই যে, আলোচ্য পদার্থগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ কোন অবস্থায় রাখিয়া দেখা, এমন কোন অবস্থায় রাখা যাহার সম্বন্ধে আমরা আমাদিগের পক্ষে সমুদায় অবগত আছি, এইরূপ করিয়া দেখার নাম পরীক্ষণ রাখা যাইতে পারে। আমরা আকাশে নক্ষত্রদিগের গতি পরিদর্শন করি, অর্থাৎ তাহারা যেমন থাকে সেইরকম দেখিয়া যাই, তাহাদিগের গতিতে আমরা কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারি না, আবার আমরা একটী বর্ত্তুলের গতি পরীক্ষণ করিতে পারি, অর্থাৎ বর্ত্তুলকে আমরা আমাদিগের ইচ্ছা অনুসারে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় রাখিতে পারি, আর পরে উহার গতি দেখিতে পারি। পালিশ করা লম্বা টেবিলের উপর একটী বর্ত্তুল রাখিয়া তাহা একটু জোরে ছাড়িয়া দিলে উহা অনেক দূর চলিয়া যায়, কিন্তু ঘাসের উপর ততটুক জোরে ছাড়িয়া দিলে উহা ততদূর যায় না। আমরা ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করি যে, প্রতিবন্ধক না পাইলে কোন পদার্থ একবার চলিতে আরম্ভ করিলে বরাবর চলিবে। পরিদর্শন ও পরীক্ষণ উভয় পদ্ধতিই বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কোন ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রতিই অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে। জীববিজ্ঞানের দেহবিজ্ঞানে পরিদর্শন পদ্ধতির অধিক ব্যবহার, তবে দেহবিজ্ঞানের যে ভাগকে প্রকোষ্ঠ বিজ্ঞান বলা হইয়াছে, তাহাতে পরীক্ষণেরও ব্যবহার হয়। যেমন শরীরের কোন অংশ কিরূপে গঠিত হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সেই অংশের এক ভাগ অল্প কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে; পরে সেই কাটা ভাগ কেমন করিয়া আবার মিলিয়া যায়, তাহা অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখা যাইতে পারে; আবার বৃক্ষের বৃদ্ধির সহিত আলোকের কি সম্পর্ক, তাহা দেখিবার নিমিত্ত কোন বৃক্ষের চারা অন্ধকারে রাখা যাইতে পারে, ও উহার ক্ষুদ্র অংশগুলি পরীক্ষা করা যাইতে পারে (এরূপ অবস্থা দেখা যায় যে, বৃক্ষের চারা দেখিতে শাদা হয়, সবুজ হয় না।) জীব প্রক্রিয়া বিজ্ঞানে পরিদর্শন ও পরীক্ষণ উভয়েরই ব্যবহার হয়, কিন্তু দ্বিতীয়টীর ব্যবহার অধিক। জীবপ্রক্রিয়া বিজ্ঞানে পরীক্ষণের নিমিত্ত অনেক প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার হয়। জীববিজ্ঞানে পরীক্ষণের একটী বিশেষ প্রকৃতি এই যে,

কোন জীবের দেহে জীবিত অবস্থায় এক অংশের সহিত অন্য সমুদায় অংশের সম্বন্ধ আছে,—সুতরাং এক অংশে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহা কেবল সেই অংশের অবস্থার উপর নির্ভর করিতেছে, কি অন্য কোন অংশে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার উপর ঐ পরিবর্ত্তন নির্ভর করিতেছে, ইহা বলা কোন কোন সময় কঠিন হইতে পারে। এই নিমিত্ত জীবনবিজ্ঞানে পরীক্ষণ করিয়াও কোন কোন সময় কারণ নির্ণয় করা (পদার্থবিজ্ঞান কি রাসায়নিক বিজ্ঞানে পরীক্ষণ দ্বারা কারণ নির্ণয় করা যত সহজ তত) সহজ নহে। আমরা এখানে জীবনবিজ্ঞানের সাধারণ আভাস দিতে চেষ্টা করিয়াছি; সময় হইলে আমরা কোন একটী জন্তুর বিশেষ বর্ণনা করিয়া জীবনবিজ্ঞানের কতকগুলি নিয়মের দৃষ্টান্ত দিব।

লোক সংখ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সৃষ্টির বাল্যকালে এবং সমাজের প্রথম অবস্থায় পৃথিবীতে অতি অল্প মাত্র লোক ছিল। বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সমস্তই পড়িয়াছিল, কদাচিৎ কোন কোন স্থানে লোক বাস করিত। প্রথমে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই, সুতরাং পর্ব্বত গহ্বরে, তরুতলে বা ভূপৃষ্ঠেই পড়িয়া থাকিত এবং বাসগৃহাদির দ্বারা এক্ষণে যে স্থান অধিকৃত হইয়াছে, তাহাও পড়িয়াছিল। এ অবস্থায় নর নারীতে সাক্ষাৎ হইলে ইতর প্রাণীর ন্যায় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য পরস্পর সহবাস করিত এবং এই সহবাসে যে সন্তান উৎপন্ন হইত, তাহারা আহার সংগ্রহ করিবার বয়স প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মাতার নিজ সম্পত্তি ছিল ও মাতাকেই তাহাদিগের আহার সংগ্রহ করিতে হইত। গর্ভের শেষ অবস্থায় এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছু দিন পর পর্য্যন্ত মাতার পক্ষে আহার সংগ্রহ কিছু কষ্টসাধ্য হইত। এই কষ্ট নিবারণ করিবার ভার নারীগণ ক্রমে পুরুষের স্কন্ধে ফেলিল এবং যে পুরুষ তাহাতে অসম্মত হইত, নারীরা তাহাদিগের সহবাস করিত না। এইরূপে স্ত্রীগণ ক্রমে পুরুষের সম্পত্তি হইল এবং যে পুরুষ যত অধিক আহার সংগ্রহ করিতে পারিত, সে তত অধিক স্ত্রীর প্রভু হইত। তৎকালে পৃথিবী বিস্তীর্ণ, আহারেরও অপ্রতুল ছিল না, সুতরাং এক এক পুরুষ অসংখ্য অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে লাগিল। ক্রমে যখন মনুষ্য সঞ্চয় করিতে শিখিল, আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল এবং শস্যোৎপাদন করিতে জানিল, তখন ক্ষেত্র আবাসস্থান ও পশুশালার দ্বারা পৃথিবীর পতিত স্থানের হ্রাস হইতে লাগিল। পতিত স্থানের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে অপর দিকে লোক সংখ্যারও বৃদ্ধি হইতে চলিল। ক্রমে এক একটী বৃহৎ পরিবার গঠিত হইল এবং পূর্ব্ব আবাস স্থলে, ক্ষেত্রে ও

পশ্বালয়ে সকলের কুলান হওয়া ভার হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া নূতন নূতন স্থান অধিকার করিয়া কিছু কাল সুখে অতিবাহিত করিত এবং আহার অকুলান হইলে আবার স্থানান্তরে উঠিয়া যাইত। এই জন্য এবং সমাজের এই অবস্থাতেই বোধ হয় আর্য্যভূমি ত্যাগ করিয়া আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বাস করেন। তৎকালে ভারতে বিস্তর স্থান পড়িয়াছিল, সুতরাং আহারের অপ্রতুল ছিল না। যে পরিমাণে আহার ছিল তাহার বিস্তর পরিমাণে লোকের অল্পতা ছিল, এই জন্য বহুপত্নী গ্রহণে আপত্তি ছিল না। আহার অল্প কিন্তু লোক অধিক হইলে বহু পত্নী গ্রহণ করা যায় না, বরং এক নারীর বহু পতি হওয়াই সম্ভব। প্রত্যুত এই কারণে এখনও কোন কোন জাতির মধ্যে এক স্ত্রীর একাধিক স্বামী দেখা যায়। আর্য্যগণ সংখ্যায় অল্প কিন্তু আহার অধিক ছিল, সুতরাং বহুপত্নী গ্রহণ, এমন কি অনেক দিন যাবৎ যথেচ্ছ বিহারও করিতে লাগিলেন। তাহাতেও অতি শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত স্থান অধিকৃত ও আপন দল যথেষ্ট পুষ্ট হইল না, সুতরাং তাঁহারা শাস্ত্রে লিখিলেন যে, অপত্যোৎপাদন না করা মহাপাপ, এবং পুত্রোৎপাদন না করিতে পারিলে পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ নাই। একটী পুত্রের দ্বারা যত সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে, একটী কন্যার দ্বারা তত সম্ভব নহে, সুতরাং কন্যা অপেক্ষা পুত্রের আদর বাড়িল এবং একটী মাত্র পুত্র অপেক্ষা বহু পুত্র প্রার্থনীয় হইল।

আমরা এই নিয়মে ও এই সকল শাস্ত্রের বচন অনুসারে কার্য্য করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি। বহু পত্নী গ্রহণ যে অনিষ্টকর, তাহা বিস্তর পরিমাণে অবগত হইতে পারিলেও, প্রথাটী একেবারে উঠিয়া যায় নাই এবং সন্তানোৎপাদন করিতে কেহই পরাঙ্মুখ নহে। কিন্তু এক্ষণে আর্য্যাদের যে প্রকার অল্পতা হইয়াছে, তাহাতে আর পূর্ব্ব শাস্ত্র মতে কাজ করিলে চলিবে না। এখন নারদ, ব্যাস, বাল্মীকি, বৃহস্পতি, মনু, পরাশর প্রভৃতি মুনিগণের শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া মিল, ম্যালথাস্, ডারউইন, ফসেট, ব্রাড্‌লো, নল্টন প্রভৃতি মনীষীদিগের শাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। তখন স্থান ছিল, আহার ছিল, সুতরাং বংশ বৃদ্ধিতে পুণ্য ছিল, কিন্তু এখন স্থান নাই, আহার নাই, সুতরাং বৃদ্ধি পাপাবহ না হইবে কেন? সকল শাস্ত্রই দেশ কাল ও পাত্র সাপেক্ষ, তখন যে প্রকার দেশ কাল পাত্র ছিল, এখন তাহা নাই, কিন্তু সে শাস্ত্র আছে কেন? এক্ষণে যে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, যদি তাহার সহিত পূর্ব্বের সুবিধার তুলনা করিয়া দেখিতে কাহারও বাসনা হয়, তিনি বুঝিবেন যে আর বংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে না, এবং যে নিয়মে বংশ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, সে নিয়মের পরিবর্ত্তন না হইলে মহাকষ্ট ও বিপদ উপস্থিত এবং ভবিষ্যতে যে কি হইবে, তাহা চিন্তা করিতে মস্তিষ্ক ব্যথিত ও পীড়িত হইয়া উঠে। উপস্থিত লোকাধিক্য বশতঃ কয়েকটী অনিষ্ট আমরা দেখাইবার প্রথমে চেষ্টা করিব এবং তৎপরে কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহারও দুই একটী উল্লেখ করিব।

জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহা প্রথমে সকল-

কেই নিজে নিজে সমস্তই সংগ্রহ করিতে হইত। তাহাতে লোকের অবসরও থাকিত না এবং এক জনের সকল দ্রব্যই পাইবার সুবিধাও হইত না। এই জন্য লোকে দ্রব্য বিনিময় করিতে শিখিল। যাহার শস্য আছে তাহার মৎস্য নাই এবং যাহার মৎস্য আছে তাহার শস্য নাই, সুতরাং প্রথম অবস্থায় যাহার যাহা আছে সে তাহারই উপর নির্ভর করিতে বাধ্য ছিল। তাহাতে এক প্রকারে জীবন ধারণ চলিত, কিন্তু যাহার বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তাহার জীবন ধারণ মহাকষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল। এই জন্য যাহার শস্য আছে সে শস্যের বিনিময়ে বস্ত্র লইয়া বস্ত্রপ্রস্তুতকারীর জীবন ধারণের উপায় করিয়া দিল; যাহার মৎস্য আছে সে মৎস্য দিয়া শস্য লইল; এবং এক জনের এক এক বস্তু অধিক পরিমাণে থাকাতে সে তাহার বিনিময়ে অন্যান্য সকল প্রকার আবশ্যকীয় সামগ্রীই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাইতে লাগিল। মুদ্রা আবিষ্কারের প্রয়োজন এই যে, ইহার দ্বারা এক দ্রব্য কত পরিমাণে দিলে অন্য দ্রব্য কত পরিমাণে পাওয়া যাইবে, তাহা স্থির করা সহজ এবং এক জনের যাহা আছে তাহা অন্যের না থাকাতে তৃতীয় এক ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া সম্ভব। আমার মৎস্য নাই কিন্তু শস্য আছে, তোমার বস্ত্র আছে কিন্তু উভয়ের কাহারও মৎস্য নাই, এমন স্থলে তোমার বস্ত্র লইয়া শস্য দিলে তোমার অভাব দূর হইল না, আমার ও অভাব দূর হইল না। আবার যাহার মৎস্য আছে তাহার বস্ত্র বা শস্য কিছুরই প্রয়োজন নাই, তাহার তৈলের প্রয়োজন। সুতরাং এই সকল স্থলে বিনিময় সাধ্যাতীত হওয়াতে এমন এক সামগ্রীর (অর্থাৎ মুদ্রার) আবিষ্কার হইল যে, যাহার যাহা আছে সে তাহার বিনিময়ে উহা পাইলে তাহার যাহা নাই তাহা অন্যের নিকট হইতে লইতে পারে। মুদ্রা বা অর্থ দুই উপায়ে মিলিয়া থাকে; এক দ্রব্য, অপর পরিশ্রম। তোমার ক্ষেত্র আছে কিন্তু লোক নাই যে শস্য উৎপন্ন করে; এমন স্থলে তুমি অর্থ দিলে আমি তোমার শস্য উৎপাদন করিয়া দিব। আমারও শস্য থাকাতে তোমার ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যের বিনিময়ে পরিশ্রম না দিলে অবশ্যই আমাকে এমন সামগ্রী দিতে হইবে যাহা আমার নাই। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে, আমার যাহা নাই তোমারও তাহা নাই, তাহা হইলে আমাকে এমন এক দ্রব্য দিতে হইবে যে, যদ্দ্বারা আমার যাহা নাই তাহা পাওয়া যাইতে পারে। এই দ্রব্য অর্থ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, সুতরাং অর্থের আবিষ্কার ও সর্ব্বত্র প্রচলন হইল এবং পরিশ্রমেরও মূল্য হইল। প্রয়োজন ও যোগান অনুসারে দ্রব্যের ও পরিশ্রমের মূল্য ধার্য্য হইল; অর্থাৎ কত দ্রব্য দিলে বা কত পরিশ্রম করিলে কত মূল্য পাওয়া যাইবে, তাহা পরিশ্রম ও দ্রব্যের প্রয়োজন এবং কত দ্রব্য ও পরিশ্রম মিলিতে পারে, তাহারই পরিমাণের উপর ধার্য্য হইল। চাউলের প্রয়োজন পাঁচ শত মন, কিন্তু চারি শত মনের অধিক চাউল নাই, সুতরাং সকলেই পাইবার জন্য ব্যগ্র হইবে এবং অধিক মূল্য দিয়াও লইবে, কেন না পাছে তাহার অভাব হয়। যে অধিক মূল্য দিতে পারিবে না, কাজে কাজেই সে চাউল পাইবে না। ইহার বিপরীত দ্রব্য অধিক কিন্তু প্রয়োজন অল্প হইলে মূল্য

হ্রাস করিয়াও লোকে চাউল বিক্রয় করিবে। এই প্রকার শ্রমজীবী লোকের অল্পতা বা আধিক্য হইলে তাহাদিগের মূল্যেরও অল্পতা আধিক্য হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে দ্রব্য ও শ্রম কি পরিমাণে পাওয়া যায় এবং তাহাদিগের মূল্যই বা কি প্রকার হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে যে পরিমাণে আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহা প্রায় পাওয়া যাইতেছে। যত দিন না কৃষি বিদ্যা বলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির আধিক্য জন্মিতেছে, তত দিন উৎপন্ন শস্যের বড় অধিক বৃদ্ধি হইতেছে না। এমন কি, এই উৎপন্ন শস্যকে স্থিতিশীল বলিলেও বলা যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে শস্যের যে তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তাহাতে যে সামান্য বৃদ্ধি বা হ্রাসের কথা সময়ে সময়ে লিখিত থাকে, তদ্দর্শনে কোন বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষিত হয় না। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, লোক সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। এক দিকে শস্যের স্থিতিশীলতা, অপর দিকে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি স্পষ্টই দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, দ্রব্য অপেক্ষা প্রয়োজন অধিক হইয়াছে। সুতরাং দ্রব্যের মূল্যও দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে এবং যে কারণে মূল্য বৃদ্ধি হয়, তাহা নিবারিত না হইলে আর মূল্যের হ্রাস হইতে পারে না, অর্থাৎ দ্রব্যের প্রাচুর্য্য ব্যতিরেকে মূল্য কমে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য আবশ্যকীয় পণ্য দ্রব্যেরও বিশেষ বৃদ্ধি দেখা যায় না এবং যাহারা কেবল মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনই অতি কষ্টে সংগ্রহ করে, তাহাদিগের অন্যান্য সামগ্রীর প্রয়োজন ও ক্রয় করিবার উপায় অল্প।

অন্য পক্ষে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে পরিশ্রমের আধিক্য জন্মিতেছে, সুতরাং তাহার মূল্যও হ্রাস হইতেছে। পদশীতা অনুসারে পরিশ্রমের মূল্য হয়। এক জন কুলি অপেক্ষা এক জন কেরানীর মূল্য অধিক এবং এক জন কেরানী অপেক্ষা এক জন বিচারক বা কিচিৎসকের মূল্য অধিক। কিন্তু সকলেরই প্রাচুর্য্য হইলে অবশ্যই সকলেরই মূল্য কমিবে। পূর্ব্বে এক জন কেরানী যাহা উপার্জ্জন করিত এখন এক জন তেমন পারে না, তাহার কারণ এই যে, একটী লোকের প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বে বহু অন্বেষণ করিতে হইত এক্ষণে বহু অন্বেষণে সহস্র লোকের মধ্যে একজন কর্ম্ম পায়। অতএব পরিশ্রম সচ্ছল হওয়াতে লোকের উপার্জ্জন কমিয়া গেল, আবার লোকাধিক্য হেতু আহার্য্যাদি দ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য হওয়াতে তাহাদিগের মূল্য বৃদ্ধি হইল। সুতরাং অধিকাংশ লোকই যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে পাইল না, অতএব আবশ্যক মত আহার্য্যাদি দ্রব্য ও সংগ্রহ করিতে পারিল না। অপরদিকে ভূমির কর বৃদ্ধি হইল, কেন না অনেকেই কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিল। যাহারা অর্থাভাবে অধিক কর দিতে পারিল না এবং কৃষি উপযোগী সরঞ্জাম ক্রয় করিতে অক্ষম হইল, তাহারা শ্রমজীবী হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার জন্য ধাবিত হইল। কিন্তু তথায়ও উপযুক্ত উপার্জ্জন হইল না, সুতরাং অতি কষ্টে প্রাণধারণ করিতে লাগিল। একে আপন জীবনই কষ্টে চলিতে লাগিল তাহার উপর স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য আরও বিব্রত হইয়া উঠিল। এমন স্থলে, অর্থাৎ সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই বিব্রত হইলে

অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রী, যেমন উত্তম গৃহ ও উপযুক্ত বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিবার সংস্থান কোথায়? এই রূপে লোকে অর্থাভাবে অসদুপায় অবলম্বন করিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? উদরের জন্য লোকে সকলই করিতে পারে।

লোকবৃদ্ধি নিবন্ধন অন্নাভাব হইতে কি কি অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, এবার তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। আগামী বারে অবশিষ্ট কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইবে।

১ম। দারিদ্র্য। দারিদ্র্য লোক বৃদ্ধির ও আহারের অপ্রাচুর্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই দারিদ্র্য হইতে সকল প্রকার অনিষ্টই উৎপন্ন হইতে পারে। বলশালীগণ বল প্রয়োগ দ্বারা অন্যের সঞ্চিত আহারাদি বলপূর্ব্বক লইয়া থাকে। রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার ভয়ে দস্যুগণ, যাহার ধন অপহরণ করে, তাহাকে ও দস্যুবৃত্তির প্রত্যেক সাক্ষীকেই বধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা কম সাহসী এবং নরহত্যা করিতে ভীত, তাহারা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে। জাল, ছলনা, শঠতা, কৌশল, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি মার্জ্জিত চৌর্য্যবৃত্তি, আর ও ভীরু লোকের ব্যবসায়। যে কোন প্রকারে হউক উদরপূর্ণ করিতেই হইবে, সুতরাং দরিদ্র লোকে সহজেই এই সকল কার্য্যে আশক্ত হয়। দাসত্ব, সন্তান বিক্রয়, বৃদ্ধ ও শিশুবধ, সতীত্ব নষ্ট, প্রাণী-বিনাশ প্রভৃতি দারিদ্র্য হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাভাব হইলে লোকে কি অনিষ্টই না করিতে পারে! সকলেই অনুভব করিতে সক্ষম যে, অর্থ ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভব নহে, এবং অর্থ সাহার্য্যে কিছুই অসম্ভব নহে।

২য়। অন্নাভাব হইলে জ্ঞানোপার্জ্জন ও আত্মোন্নতি করা যায় না। মন স্বচ্ছন্দ এবং উদ্বেগ ও চিন্তাশূন্য না হইলে লোকে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় না। যদি সর্ব্বদাই উদর জ্বলিতে লাগিল এবং অন্নচিন্তা প্রবল হইল, তাহা হইলে লোকের জ্ঞানোপার্জ্জনের পথ কোথায়? উদরের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিবে না, সাংখ্যদর্শনের সূত্র পাঠ করিতে বসিবে? উদর পূর্ণ না থাকিলে অধ্যয়ন করিতে মনস্থির হইবে কেন?

৩য়। অন্নাভাবে লোকের ধর্ম্মোন্নতি বা ধর্ম্মের প্রতি আস্থা থাকে না। অন্নের চেষ্টায় সকল সময় অতিবাহিত হইলে লোকের ধর্ম্মচিন্তা আইসে না, এবং আরাধনা ও অর্চ্চনাদিরও সময় থাকে না। ইহা ভিন্ন অন্নাভাব হইলে লোকের ন্যায়পরায়ণ থাকা অতি দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। ইহা হইতে, ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাঁহার দয়াতে সন্দেহ ও তাঁহাতে অবিশ্বাস জন্মিতে আরম্ভ হয়।

৪র্থ। অন্নাভাবে সমাজের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না। যে সকল লোক লইয়া সমাজ, তাহাদিগের সময় জঠরের জন্যই অতিবাহিত হইয়া থাকে। সমাজের নিয়মভঙ্গ করিলে যদি অর্থোপার্জ্জন হয়, লোকে সহজেই তাহা করিতে ধাবিত হয়। তাহার উপর মিথ্যা, চৌর্য্য প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়াতে সমাজ বিস্তর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। ক্ষুৎপিপাসাতুর ব্যক্তি তন্নিবারণ জন্য কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেই পরাঙ্মুখ নহে।

ক্রমশঃ

সভ্যতা।

সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, দেশ সভ্য হইতেছে। "সভ্য" এই কথাটীর অর্থ কি? না সভার উপযুক্ত। তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্যসমূহের নাম সভ্যতা। তবে কি আমরা সভ্য হইবার জন্য কেবল উত্তম বস্ত্র নির্ম্মল বস্ত্র, তাহার পরিধান পরিপাটী, চিকুর সন্নিবেশ, পাদুকা ধারণ, পুস্তকাধ্যয়ন, চিকুর বিন্যাস, সভা, বক্তৃতা, মিষ্ট মিষ্ট কথা প্রভৃতির আয়ত্ত করিব? না আর কিছু কর্ত্তব্য আছে?

সত্যবটে, বহুতর বিদ্বান্ ব্যক্তির একত্র সমাবেশের নাম সভা। সত্য বটে, সভায় বসিবার যোগ্য ব্যক্তির নাম সভ্য। সত্য বটে, তাদৃশ জনগণের আচরিত ও অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপের নাম সভ্যতা। পরন্তু ইহাও সত্য বটে, মনুষ্য কেবল উত্তম বেশ ভূষা ও পরিচ্ছদ ধারণ করিলে প্রকৃত সভ্য হইতে পারেন না। তিনি অতুল ধনশালী, অতএব তিনি সভ্য, ইহা কখনই সত্য হইতে পারে না। অমুক অনেক পড়িয়াছেন, অতএব তিনি সভ্য, ইহাও সত্য না হইতেও পারে। অমুক উত্তম বক্তৃতা করেন, ধর্ম্ম প্রচার করেন, মনুষ্যকে জ্ঞানের কথা বলেন, অতএব তিনি সভ্য—একথাও সর্ব্বত্র সত্য বলিয়া স্বীকার্য্য হইতে পারে না। ধনী হউন, মানী হউন, বক্তা হউন, ধর্ম্মোপদেষ্টা হউন, তিনি সচ্চরিত্র না হন—অন্তরে অন্তরে তাহার যদি কুটিলতা, অভিসন্ধি ও অভিমানাদি নীচ ভাব সকল প্রোথিত থাকে—তাহা হইলে তাঁহাকে সভ্য বলিয়া শ্রদ্ধা করা অন্যায়। শত শত, সহস্র সহস্র পুস্তক পাঠ করিয়া যিনি কেবল মাত্র বাক্যের পটুতা ও মনের অভিমান বৃদ্ধি করিয়াছেন—তাদৃশ দৃশ্যসভ্য পণ্ডিতের দ্বারা কদাপি সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না। বিদ্যাভিমান আপনার ও অন্যের একটী ভীষণ শত্রু। কেন না অভিমানী বিদ্বান্‌দিগের দ্বারা সময়ে সময়ে এমন সকল লোকহিতকর কার্য্যের বাধা উপস্থিত হয় যে, সে বাধা সমাজকে প্রায় উন্মূলিত করিয়া তুলে। সেই সময়ে তাঁহারও উন্মূলন ঘটনা হয়। ইহার নিদর্শন এক্ষণে চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, অত্যল্প চক্ষু প্রসারণ করিলেই দেখিতে পাইবেন।

দেশ সুসভ্য হইবার প্রধান কারণ বিদ্যা, আবার দেশে কুনীতি বৃদ্ধি হইবার কারণও বিদ্যা। যাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করিয়া বিনীত হন, তাঁহাদের দ্বারাই দেশের হিত হয়, এবং যাঁহারা ঘোর অভিমানী, অহঙ্কারী ও দাম্ভিক হন, তাঁহাদের দ্বারা দেশের অশেষ বিশেষ অনিষ্ট হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পূর্ব্বকালের পণ্ডিতেরা রচনা করিয়াছিলেন; যথা——

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ংবিনয়াৎ যাতিপাত্রতাম্।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মস্ততঃসুখম্।"

"বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
কুজ্ঞানিনাং তৎ সর্ব্ব জন্মম্॥"

উত্তম পরিচ্ছদ যেমন সহজ সুন্দরাঙ্গ ব্যক্তির শোভা উদ্দীপন করে, শাণে ঘর্ষণ যেমন স্বতঃস্বচ্ছ বৈদূর্য্যমণির আগন্তুক মালিন্য নিরাকৃত করে, বিদ্যাও সেই প্রকার সহজ সুশীল পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করে। অতএব বিদ্যাভ্যাস

করিয়াছেন বলিয়া সকল ব্যক্তিই সভ্য ভব্য হইয়াছেন, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। ভুজঙ্গম কুলের দুগ্ধ পানের ন্যায় ক্রূরমতি পুরুষের বিদ্যাভ্যাস অতি ভয়ঙ্কর। দুষ্টপ্রকৃতি [illegible] তাহার অভিমান ও [illegible]েরই কারণ। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যাঁহারা বাল্যকাল হইতেই চরিত্র শিক্ষা করিয়া থাকেন, যৌবনে তাঁহারাই বিদ্যাবলে কৃতকৃত্যও সুসভ্য হইয়া আপনার ও পরের উপকারী হন। এরূপ অনেক লোক দেখা গিয়াছে যে, বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাদের সেই বিদ্যাফল ও সভ্যতা কেবল পরনিন্দায়, পরের অজ্ঞতা দর্শনে ও পর মানিত ধর্ম্মের নিন্দায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে কেবল তিনিই এক মাত্র জ্ঞানী, গুণী, মানী আর সকলেই অজ্ঞ, মূর্খ ও অসভ্য। আবার এরূপ লোকও দেখা গিয়াছে যে, যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজি অক্ষর পাঠ করিয়া বিদ্যাভিমানে ধরাকে শরার তুল্য জ্ঞান করিতেছেন এবং আপনাদের মান্যগণ্য কুল পুরুষগণকেও অসভ্য বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন না। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা অভিমানের কুহকে পড়িয়া আত্মোন্নতির ও দেশোন্নতির পথ হারাইয়া কেবল মাত্র ইংরাজ-প্রদর্শিত পথেই বিচরণ করিতেছেন। স্বদেশের গন্তব্য পথের প্রতি একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। হিন্দুর নাম শুনিলেই তাঁহারা কর্ণ আচ্ছাদিত করেন, কিন্তু ইংরাজেরা উত্তুঙ্গ বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া অপানবায়ু মোচন করিলে তাহাও তাঁহারা 'আহা! কি সুমধুর ধ্বনি' বলিয়া অজ্ঞান হন। এই ত গেল অবিবেকী দুঃস্বভাব ও দুর্জ্জন পুরুষের বিদ্যাভ্যাসের ফল বা সভ্যতা। দুরহঙ্কারী ও দুঃস্বভাব পুরুষের ধনের ফল আবার এতদধিক দুঃখপ্রদ। দুর্জ্জনের ধন যে বহু অনর্থের কারণ, তাহা বোধ হয় অনেকেই বিদিত আছেন। দুর্জ্জন বা দুশ্চরিত্র পুরুষের ধন হইলে তাহার চিত্ত এককালে উন্মত্ত হইয়া উঠে। তাহার আশা নদী দিন দিন বাড়িতে থাকে। তদ্দ্বারা তাহার সুশীলতা ও সাধুতা প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণই এককালে ধৌত হইয়া যায়। পরের উপর প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব করিতে গিয়া তাহারা লোককে অশেষ প্রকার যাতনা ভাগী করে। পরনির্যাতন তখন তাহাদের ক্ষমতার পরিচয় স্থান ও আত্মপরিতৃপ্তির কারণ হয়। কোন অকার্য্যই তাহাদের হেয় বলিয়া বোধ হয় না। লঘু গুরু জ্ঞান তাহাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করে। সুতরাং তিনি একজন দুর্ব্বল সাধু পুরুষের নিকট দ্বিপদ ব্যাঘ্র।

যদিও ধনগর্ব্বিত ব্যক্তির সমক্ষে অনেকেই প্রণয়োক্তি প্রকাশ করে, পরন্তু তাহা অনিচ্ছা বশতঃই করে। কি করে? ভয়ে জড়সড় হইয়া তাহারা অগত্যা সমক্ষবাদে সমর্থ হয় না। পরন্তু পরোক্ষে তাঁহারা কোন মতেই তাদৃশ পুরুষকে সভ্য বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছুক হন না। অতএব কি বিদ্যামদ মত্ত, কি ধর্ম্মমদ মত্ত, কি ধনমদ মত্ত, কেহই প্রকৃত সভ্য বলিয়া গৌরব করিতে পারে না। যে মনুষ্যের বিবেক শক্তি আছে, যিনি বিনয়ী, সদাচার নিষ্ঠ, বহুজ্ঞ, অদাম্ভিক, অপ্রমত্ত, দয়া ও উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত, তিনিই যথার্থ সভ্য, তিনি আমাদের পূজনীয় ও গুরুতুল্য শ্রদ্ধার পাত্র। যাঁহার নির্ম্মল ব্যবহারে আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তিই সুখী হয়, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য এবং তিনিই প্রকৃত সুসভ্য। মনুষ্যোচিত

বিবেচনা, সদাচার, ধর্ম্মনিষ্ঠতা, দয়া, উপচিকীর্ষা নম্রতা ও বহুদর্শিতা প্রভৃতি নির্ম্মল ও লোকহিতাবহ গুণ সকল সভ্যতার চিহ্ন। যে মনুষ্য দেশভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিভেদে ও কার্য্যভেদে, ব্যবহার্য্য বস্তুর সাধুতা অসাধুতা পরিজ্ঞাত হইয়াও ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া চলিতে পারেন, তিনিই সর্ব্ব সাধারণের নিকট মনোজ্ঞ ও শ্রদ্ধাভাজন হন। বহুজনের বিদ্বিষ্ট কার্য্য পরিত্যাগ করা তাঁহাদের অতীব কর্ত্তব্য। অন্যের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ না করিয়া যিনি আপনার প্রিয়ধর্ম্মের প্রতিপালন করেন, তিনিই সকল সম্প্রদায়ের নিকট আদরণীয় হন। ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত মর্ম্ম কি? প্রকৃতিবিক্ষোভ হইতে ধৃত অর্থাৎ আত্মাকে রক্ষা করা। কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহা পশু সাধারণে বিরাজ করিতেছে, পশুর ন্যায় সে গুলির বাধ্য না হইয়া আত্মোন্নতি-সাধক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা। ধর্ম্মপথে অবতরণ করিলে যদি অন্ধতা না জন্মে, তবেই তদ্দ্বারা ক্রমে ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করা যায়। নচেৎ ধর্ম্মান্ধতা প্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রকৃত পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অবশেষে নিরয়গামী হইতে হয়। মনুষ্য যেমন বাহ্য পরিচ্ছদাদির দ্বারা আপনাদিগকে পশু হইতে পৃথক্ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচয় দান করেন, তেমনি আন্তরিক সৌজন্যের দ্বারাও আপনাদিগের অন্তঃকরণকে পাশবান্তঃকরণের সহিত অতুল্যতা প্রদর্শন করিতে হইবে। তাহা না করিলে অবশ্যই তাঁহার মনুষ্য নামের মহত্ত্ব বিলোপ হইবে। এই সকল বিবেচনার দ্বারা স্থির হয় যে, আন্তরিক সৌজন্যেই মানবীয় সভ্যতার ভিত্তি। অন্নোপার্জ্জন, পরিচ্ছদ ধারণ, রাশি রাশি পুস্তকাধ্যয়ন, সভা ও বক্তৃতা প্রভৃতি বাহ্যাড়ম্বর সকল সমস্তই বৃথা হয়, যদি তাহাতে আন্তরিক সৌজন্যের অভাব থাকে।

বাহির বা ভিতর ?

সকল প্রকার ধর্ম্মসাধকদিগের মধ্যে প্রায়ই দুই শ্রেণীর লোক পরিদৃষ্ট হয়;—এক শ্রেণীর লোক বলেন, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকলকে যাঁহারা দমন করিতে পারেন, তাঁহারাই চরিত্রবান লোক। ব্যভিচারী হইয়া পরস্ত্রীর প্রতি কুটিল নয়নে তাকাইব না, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া পৃথিবীর কোন প্রকার অপকার করিব না, অন্যের অনিষ্ট করিব না, অন্যের উন্নতিতে কাতর হইব না, পরনিন্দা করিব না, মিথ্যা কথা বলিব না, পরের অনিষ্ট করিব না, এবম্প্রকার নীতিবাক্য এই শ্রেণীর লোকদিগের চরিত্রভূষণ। এই শ্রেণীর সাধকগণ কঠোর ধর্ম্মনীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া সময়ে সময়ে এমন কদর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন যে, সে সকল বিষয় ভাবিতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। এই শ্রেণীর লোক রিপু দমন করিতে অসমর্থ হইলে কখনও বা লিঙ্গোৎপাটন করেন, কখনও বা চক্ষু উৎপাটন করেন, কখনও হস্ত পদকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন—কখনও বা সংসারকে, সমাজকে

সাধনার ঘোরতর বিরোধী কল্পনা করিয়া চিরদিনের তরে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ সংসার-বিরাগী। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন—তাঁহারা কেবল ইহা করিব না, উহা করিব না, বলিয়া নিরস্ত থাকেন না, বলেন,-ব্যভিচারী হইব না, পৃথিবীর অপকার করিব না,মিথ্যা কথা বলিব না ইত্যাদি প্রকার না-সংযুক্ত কথা লইয়া থাকা মৃত ধর্ম্মোপাসকের কর্ম্ম—ঐ সকল নীতি নীতিই নহে। ইঁহারা বলেন, কুটিল নয়নে তাকাইবার পরিবর্ত্তে ভালবাসার চক্ষে দেখিব, ক্রোধের পরিবর্ত্তে ক্ষমা করিব—কোল পাতিয়া দিব, অন্যের অনিষ্টের পরিবর্ত্তে উপকার করিব, পর-নিন্দার বদলে পরমহত্ব স্মরণ করিব, মিথ্যার পরিবর্ত্তে সত্য কথা বলিব। এই শ্রেণীর লোক সংসারকে সাধনার বিরোধী মনে করেন না, বরং তৎপরিবর্ত্তে ইহাই বলেন, সংসারে যাহা আছে বা সংসার পরিত্যাগ করা মহাপাপ। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণী প্রকৃত পক্ষে চরিত্রবান, তাহার আলো-চনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, চরিত্র কি, ইহা বিচার করা যাউক। চরিত্র কি প্রকৃত পক্ষে কতকগুলি 'না'র সমষ্টি, না আর কিছু? যাহাতে দোষ নাই, সেই চরিত্রবান, না যাহাতে গুণ আছে, সেই চরিত্রবান? আমাদের মত এই, দুই থাকা চাই। চরিত্রের অর্থ আমরা সংক্ষেপেএই বুঝি,যাহা মানুষের হওয়া উচিত, বা করা উচিত—আদর্শ। মনুষ্যের আদর্শ নির্ণয় করা যায় কি প্রকারে? বিবেকের দ্বারা। বিবেক কি,—ভালমন্দ বিচার করি-বার শক্তি,—বিশ্বাসীর মতে ঈশ্বরের আদেশ বা বাণী। এই বিবেক যাহা মনুষ্যকে করিতে নিষেধ করে, তাহা না করা, এবং বিবেক যাহা করিতে বলে, তাহা করাই মানবের কর্ত্তব্য বা মানবের আদর্শ। বিবেকই রাজা, বিবে-কই চরিত্রের মূল শক্তি। কিন্তু এই বিবে-কের উপরেও মনুষ্যের ইচ্ছা-প্রতিষ্ঠিত রাজা আছে, সে বিবেচনা শক্তি। বিবেচনা শক্তিকে রাজত্ব দিলে বিবেক মলিন হইয়া যায়, সুতরাং বিবেকও কুপথে মানুষকে চালাইতে পারে। এইরূপ অবস্থা হইলেই মানুষ বিষকে সুধা বলিয়া গ্রহণ করে, যাহা পশুত্ব তাহাকেই মনুষ্যত্ব বলিয়া আদর করে, যাহা অকর্ত্তব্য তাহাকেই কর্ত্তব্য জ্ঞানে পূজা করে। এই জন্যই দেখা যায়, মানব সমাজের অনেকেই বিবেকের অধিকারী হইয়াও নানা প্রকার বিপরীত পথে চলিতেছে,—এক জনের কর্ত্তব্য অপরের ঘৃণার জিনিষ হই-তেছে, কার্য্যের-উপাসক মানবমণ্ডলী পর-স্পরের প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়া বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত করিয়া পৃথিবীকে কলঙ্কিত করিতেছে। এই জন্য চিরকাল পৃথিবীর লোক ভাই ভাই কাটাকাটী করিয়া মরিয়াছে।

বিবেকের রাজা ঈশ্বর, স্বাধীন ঈশ্বর-বায়ু সেবন ভিন্ন বিবেকের পরিপুষ্টি অসম্ভব। ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানব কখনও ঈশ্বরের চরণ-শৃঙ্খল হইতে বিবেককে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপন মস্তিষ্কে উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন না;—আপন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত বিবে-চনা-শক্তির অধীনত্বে বিবেককে অনায়ন করেন না। তাঁহারা মনে করেন, সকল জ্ঞান, সকল পৃথিবী চূর্ণ হইয়া গেলেও বিবেককে কোন বৃত্তির অধীনে আনিব না। এই প্রকার লোকের নিকট বিবেক কখনও ভুল কথা বলে না। আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রভুত্ব ডুবাইয়া যাঁহারা ঈশ্বরদাস বিবেকের আদে-

শাস্ত্রানুসারে চলেন, তাঁহারা কখনও কুচরিত্রে উপনীত হইতে পারেন না। আলোর নিকট আঁধার থাকা যেরূপ অসম্ভব, বিবেকের নিকট কুচরিত্র থাকাও তেমনি অসম্ভব। মলিনতা, ও পাপ তাপ পূর্ণ নরকের পথ যে বিবেক দেখাইয়া দেয়, সে বিবেক মৃত বিবেক,—মনুষ্যের স্বার্থ ও স্বেচ্ছাধীন বিবেক, মানুষের গোলাম। কি পরিতাপের বিষয়, পৃথিবীর কত কোটী কোটী নরনারী এই পবিত্র জ্যোতির্ম্ময়ী বিবেককে আপন বিবেচনার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া, অধীনতা স্বীকার করাইয়া, আপনাদের পরিণাম ঘোরান্ধকারে ডুবাইয়া দিতেছেন। বিবেক—আলো, জ্যোতি, পবিত্রতা, পুণ্য, শান্তি, সদানন্দ, অমৃত—স্বর্গ। ইহাতে আঁধার নাই, পাপ নাই, নিরানন্দ নাই, কলঙ্ক নাই, অশান্তি নাই, বিষ নাই—নরক নাই। এই বিবেক মানুষকে যে পথে চালায়, সেই পথে চলাই চরিত্র। চরিত্র আলো—পবিত্রতা, পুণ্য, শান্তি, অমৃত—স্বর্গ। চরিত্রে সৎসাহস, সদানন্দ, অধ্যবসায়, বীরত্ব, সকল সারবস্তু নিহিত। চরিত্রে মানুষ দেবতা, চরিত্রহীনতায় মানুষ পশু। চরিত্র আছে, অথচ জ্যোতি নাই, পবিত্রতা নাই, সৎসাহস নাই, অধ্যবসায় নাই, শান্তি নাই, পুণ্য নাই; ইহা অসম্ভব কথা। সেই পরিমানে মানুষ চরিত্রবান, যে পরিমাণে মানুষে আঁধারের পরিবর্ত্তে আলো আছে, নরকের পরিবর্ত্তে স্বর্গ আছে। নরক কি?—স্বর্গের অভাব। আঁধার কি? জ্যোতির অভাব। স্বর্গ না থাকিলেই নরক তাহার পরিণাম, জ্যোতি না থাকিলেই অন্ধকার পরিণাম। কিন্তু নরক বা অন্ধকারের পরিণাম স্বর্গ বা জ্যোতি নহে। নরক না থাকিলেই যে স্বর্গ থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। অন্ধকার না থাকিলেই আলো আসিবে, এমনও কোন শাস্ত্র নাই। পুণ্য ও পবিত্রতা একজনের মধ্যে না থাকিলে সে লোকের মধ্যে পাপ কলঙ্ক আসিবে, কিন্তু পাপ কলঙ্ক একজনের মধ্যে না থাকিলেই সে লোক পুণ্যবান পবিত্রাত্মা হইবে, এমন কোন কথা নাই। এইজন্য যাঁহারা পাপ হইতে বিরত, তাঁহারাই পুণ্যবান নহেন। যাঁহারা পুণ্যবান নহেন, তাঁহারা চরিত্রবান নহেন, এ সহজ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তানুসারে প্রথমশ্রেণীর সাধক শ্রেণীকে প্রকৃত চরিত্রবান মনুষ্য বলিয়া গণ্য করা যায় না। তাঁহাদিগের মধ্যে দোষ না থাকিলে থাকিতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। দোষ না থাকিলে তাহারা পশুত্ব হইতে উঠিয়াছেন এই পর্য্যন্ত, কিন্তু তাহাতে দেবত্বে উন্নীত হন নাই। পশুত্ব নাশই দেবত্ব নহে। দেবত্ব কিছু যোগ ভিন্ন হয় না। মানবচরিত্রে প্রেমের যোগ, পুণ্যের যোগ, সৎবস্তুর যোগ, ইত্যাদি হইলেই দেবত্ব হয়। নিষ্কলঙ্ক প্রেমচন্দ্রমার সংস্পর্শ ভিন্ন মানব এ রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারে না। বিবেকের দ্বারায় মানবে এবং ঈশ্বরে সংস্পর্শ হয়। বিবেককে যাঁহারা মলিন করেন, তাঁহাদের জীবনে এ প্রকার সংস্পর্শ কখনও ঘটে না; সুতরাং তাঁহারা নরকের কীট না হইলে হইতে পারেন, কিন্তু স্বর্গের দেবতা তাঁহারা নহেন। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা যেহেতু সুতরাং এবং জ্ঞান বিজ্ঞান লইয়া, ভাল মন্দ বিচার করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হন, তাঁহারা ক্রমেই নরকের দিকে গমন করেন—আপনারা মরেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে কলঙ্কের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। মানবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সীমাবদ্ধ, কিবা জানে, কিবা ধারণা করিতে

পারে। অদ্যকার পরিণাম যে গণনা করিয়া ঠিক বলিতে পারে না, সে আবার কিসের অহঙ্কার করিবে? মানুষের বুদ্ধি ও বিবেচনা বিবেকের দ্বারা চালিত না হইলে কিছুই নহে, উহা ভুল, উহা মহা ভ্রান্তি। এই জন্য যাঁহারা ইহা করিব, কারণ ইহাতে সমাজের এই অনিষ্ট, ইহা রাখিব না, কারণ ইহাতে আমার এই উন্নতির ব্যাঘাত, এই প্রকার হেতুবাদের গোণ্ডগোল লইয়া ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা ধর্ম্ম জগৎ হইতে অনেক দূরে পড়িয়া আছেন; প্রকৃত চরিত্র তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে। এই চক্ষু ঈশ্বর দিয়াছেন কি মঙ্গল অভিপ্রায়ের জন্য, আমি কি জানি, এই রিপু ও ইন্দ্রিয় সকলকে দিয়াছেন ঈশ্বর তাহার কি মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য, আমি কি জানি? তিনিই জানেন। এই সংসার, এই সমাজ, তাঁহারই মঙ্গলাভিপ্রায় সংসাধনের জন্য। ইহার কিছুই পরিত্যাগ, বর্জ্জন বা রক্ষা করিবার আমার শক্তি নাই, অধিকার নাই। তিনি রাখিয়াছেন, তাই রহিয়াছি; যখন রাখিবেন না, তখন এক মুহূর্ত্তকালের জন্যও থাকিতে পারিব না। ভাল মন্দ বিচার আমি করিব? ক্ষুদ্র মানব—অহঙ্কারী, মূর্খ, বামন হইয়া স্বর্গের চন্দ্রমা স্পর্শের সাধ তোমার কখনই পূর্ণ হইবে না। অরণ্য তাঁহার, সমাজ তাঁহার, সংসার তাঁহার, আমি তাঁহার, জ্ঞান বুদ্ধি সকলই তাঁহার, তিনি যাহা করেন তাহাই হয়, আমি কে যে, আমি ভাল মন্দ বিচার করিব? এই করিয়াই ডুবিয়াছি। হায়, বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া বিবেচনা শক্তির পূজা করিয়াছি—কত ভ্রাতা ভগ্নীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিয়াছি—আমি মরিয়াছি—জোর করিয়া চরিত্রকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া মরিয়াছি। কোথায় চরিত্র—স্বর্গের ধন, আর কোথায় আমি, নরকের কীট। সংসার ছাড়িব, সংসার রাখিব, এই অহঙ্কারে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। বিবেকের আদেশ—স্পর্শমণিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষের সাগরে অমৃত বলিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছি। হায়, আমার দুর্দ্দশার শেষ কোথায়! লোকে আমার নিন্দা বা চরিত্রের দোষ ঘোষণা করিলে আমি ক্রোধে অধীর হই, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য কত চেষ্টা করি—আইনের ভয় দেখাই—কত কি করি; আর আমি যে প্রকৃত পক্ষেই ভিতরে মরিয়া পচিয়া পড়িয়া রহিয়াছি, তাহা একবারও ভাবি না। কোথায় জ্যোতি, আর কোথায় আমি; কোথায় পুণ্য, প্রেম, শান্তি, আর কোথায় আমি! পাপ করি না, তাতে আমার কি, পুণ্য কোথায়? হায়, কোথায় চন্দ্রমা, আর কোথায় আঁধারে আমি? কে ধরিবে, কে তুলিবে, কে রাখিবে? সংসারে এমন কে আছে?—সাধ্য কার? সব অক্ষম—সব অক্ষম, সব অক্ষম। কে পথ চালাইবে? সব অন্ধ, সব অন্ধ, সব অন্ধ। ডুবিয়াছি যে সর্ব্বনেশে বিবেচনা ও বিচার শক্তির আজ্ঞায়, সে আজ কোথায়? অজ্ঞান মানব, ভিতরে হলাহল, বাহিরে সুধা মাখিয়া কি হইবে? নামাবলী গায়ে দিয়ে, গেরুয়া বসন পরিলে, চক্ষের জলে ভাসিলে, মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিলে, বা আইনের সাহায্যে চরিত্রকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলে কি হইবে, ভিতরে কি হইয়া রহিয়াছ, একবার ভাবিয়া দেখ। তুমি গেরুয়া বসনই পরিধান কর, আর নামাবলীই গায়ে দেও, বা একতারার তানে খোল করতাল বাজাইয়া হরিনামই গাও, যতদিন

তোমার ভিতরের সৌন্দর্য্য জগৎকে, আমাকে আলোকিত না করিবে, তাবৎ তোমার ঐ সকলকে আমি ভণ্ডামি বলিয়া বুঝিব। ধর্ম্ম-জগতে চালাকি খাটে না—এখানে প্রতারণা চলে না।তুমি বুঝিতে পার বা নাই পার, তোমার ভিতরে কি আছে, জগৎ তাহা দেখিয়া ফেলিতেছে। বসন ভূষণের দিকে কেন তাকাইয়া আছ, একবার ভিতরে ডোব, ভাব রাজ্যে যাও—ক্ষণস্থায়ী ক্রন্দনে বা উচ্ছ্বাসে তোমার জীবন পরিবর্ত্তিত হইবে না। ঐ সকল বাহির লইয়া কেন মজিতেছ, আর সেই সঙ্গে সংসারকে বাহিরের অসার পদার্থে কেন আসক্ত করিবার পথ খুলিতেছ?—স্থির হও, ভিতরে জিনিষ আছে কি না,পরিত্রাণের পথে যাইতেছ কি না, এই সকল স্থির মনে বসিয়া একবার ভাব। ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে কি হইবে,ভাই যদি ভিতরে মরিয়া থাক। উচ্ছ্বাসের পর অবসাদ, ক্রন্দনের পরই সুখ। পুত্র শোকে অধীর হইয়া যে মাতা কাঁদিল, তাঁহার শোক ক্ষণস্থায়ী; যে গভীর শোকে ডুবিল, তাঁহার চক্ষে জল আসিবে না,—তাঁহার হৃদয়ে তুষের আগুণের ন্যায় যে শোক জ্বলিতেছে, তাহা ক্রন্দনের অতীত—ক্রন্দনে তাহা উপশম হয় না; তাহাতে লোককে উন্মত্ত করে। পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী মলিন মানব, ভিতরে তাকাইয়া তোমার পাপপূর্ণ হৃদয়ে যদি সেই ভাব না দেখিতে পাও, তবে নিশ্চয় তুমি প্রতারিত হইয়াছ। গভীরতম হৃদয়ের অঙ্কে প্রবেশ কর, আর অন্তরাত্মার প্রতি তাকাও, তারপর ভিতরে হুতাশন জ্বলিয়া উঠুক। আমি তোমার ঐ বাহিরের বেশে ভুলিব না। সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর ভুলিবেন না। ভিতরে মরিয়া বাহির রাখিবার জন্য কেন চেষ্টা—কেন অহঙ্কার? সংসার কি চরম লক্ষ্য?—যাইতে কি হইবে না,—এই শরীর, এই সবই কি লক্ষ্য? ভুল কথা। বাহির অসার, ভিতর চাই। ভিতর থাকিলে বাহির না থাকিলেই বা কি?—থাকিলেই বা কি? চক্ষু ভিতরে যাক্, বাহিরের বস্তু থাকুক আর না থাকুক, তাতে কি? ভিতরের দিকে মনশ্চক্ষু যাক্, বাহিরের সংসার থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি? আমি এই চাই—সকল সাধন ভিতরকে লইয়া হউক। মনটাকে সংস্কৃত করাই কাজ। এ করিব না, ও করিব না, এতে আমার চরিত্র হইবে না। ভিতরে কিছু যোগ করা চাই। সংসার তখনই আমার বিরোধী, যখন আমাকে আমি সংসারে ফেলিয়া রাখি; আর যখন আমাকে টানিয়া ভিতরে লই, তখন সংসার বিরোধী হইয়া আমার কি করিবে? সক্রেটীস্ মারলেন, যিশুখ্রীষ্ট মরিলেন,তাতে তাঁহাদের কি অনিষ্ট হইল? সংসার পরিত্যাগের বাসনা ততক্ষণ, নিশ্চয় জানিবে,যতক্ষণ আমি সংসারের জীব। বসন ভূষণ পরিত্যাগের বা পরিবর্ত্তনের বাসনা ততক্ষণ, যতক্ষণ আমি বসন ভূষণের দাস। পরিত্যাগ কি, রাখাই বা কি? আমি কিছুই জানি না;—আমি কেবল ভিতর চাই—ভিতরে পুণ্য নাই, প্রেম চাই, ভক্তি চাই, সাহস চাই, অধ্যবসায় চাই, শান্তি নাই, পারত্রতা চাই, আমার মাকে চাই—পরিত্রাণও জীবনের আশা ভরসাকে চাই। যাহা পাইলে বিবেক পাইব, তাহাই চাই; যাহা পাইলে চরিত্র পাইব, তাহাই চাই। যাহা পাইলে আলো পাইব, তাহাই চাই। বাহির চাই না— আর বাহির না। কেবল বাহির লইয়া থাকিলে—সংসার; বাহির ছাড়িলে তবে স্বর্গ। আমি কেবল সংসার চাই

না, আমি পরিত্রাণ চাই, স্বর্গ চাই; বাহিরে নরক, আমি তাহা লইয়া কি করিব? সংসার জোট বাঁধিয়া—আজ হইতে আমার নিন্দা রটনায় প্রবৃত্ত হও, আমার অহঙ্কারকে ডুবাইয়া দেও, তোমাদের পায়ে পড়ি, ডুবাইয়া দেও। আমার বড় সাধ, আমি একবার গৃহে প্রবেশ করিব, আমি আর বাহিরের আন্দোলন, আড়ম্বর লইয়া থাকিব না। গৃহে যাইব—বেলা গেল, আর সময় নাই—আর বাকী নাই। আমার বিবেচনা, দূর হও, জ্ঞান দূর হও, বুদ্ধি দূর হও, আজ গৃহে যাইয়া মায়ের কাছে, এই ভিক্ষা মাগিব, বিবেক যেন আমার রাজা হন। না হইলে আমি আর বাঁচি না—আমার আর বাঁচিবার উপায় নাই। সকলের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া একজনকে দাসখৎ লিখিয়া দিব—তিনিই প্রভু, তিনিই সব, তাঁহারই উপর নির্ভর করিব। তিনি রাখিতে চান, থাকিব, তিনি মারিতে চান, মরিব। তাঁহার বাক্য পালনেই পুণ্য, প্রেম, শান্তি, পবিত্রতা—চরিত্র। সেই বাক্যই বিবেক। তাহারই ভিখারী আমি। মাগো, এদীনকে দাস কর।

লক্ষ্যপথে

বিজ্ঞান দর্শনের কত উন্নতি হইয়াছে, ও হইতেছে, কিন্তু হৃদয়ের নিগূঢ়তম স্থানে যে একটী অমীমাংসিত জটিল প্রশ্ন ছিল, কেন এই পৃথিবীতে আসিয়াছি, আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার পরিষ্কার উত্তর দিতে পারিল না। মাতৃঅঙ্কে ছিলাম, ভূমিষ্ট হইলাম; বিষম তিমিরাবৃত স্থান হইতে আসিয়া আলোকের মুখ সন্দর্শন করিলাম। ঐ আলোকের ভিতর হইতে কত ফুল, কত পল্লবে সুশোভিত হইয়া কত বৃক্ষ, কত সৌন্দর্য্য ভূষিত হইয়া কত পক্ষী, আকাশ নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য, বালক বালিকা, যুবা বৃদ্ধ, নর নারী, জ্ঞান বিজ্ঞান আসিয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহারা যেন এক জোট বাঁধিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—আমাকে সমাদরে সযত্নে সংসারে রাখিয়া শিখাইবে। সেই অস্পষ্ট, অব্যক্ত, অলক্ষিত, গুপ্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইতে লাগিল, ইচ্ছা অনিচ্ছা না থাকা সত্বেও আমি থাকিলাম, বড় হইলাম, শিখিলাম। জ্ঞান ছিল না, জ্ঞান আসিল, বুদ্ধি ছিল না, বুদ্ধি পাইলাম,—আঁধারে আলো ফুটিয়া উঠিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে বাহিরের সৌন্দর্য্য বিকাশের সহিত মন ফুটিয়া উঠিল। পূর্ব্বে পৃথিবী জোট বাঁধিয়া অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল, কত ভালবাসার পরিচয় দিয়াছিল, ক্রমে আমিও পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিলাম, ভাল বাসিলাম। মাতার চখের কোণে যে ভালবাসার স্ফুলিঙ্গ খেলিতেছিল, তাহার বিন্দু আমার চক্ষে পড়িল। মা আমাকে দেখেন, আমি মাকে দেখি। কেন দেখি, জানিনা, তবুও দেখি। মাতার ক্রোড়ে কি এক অপূর্ব্ব প্রেমের কুসুমশয্যা ছিল, জানিনা, তাহাতে শুইতে না শুইতে, বসিতে না বসিতে, আমার সর্ব্বাঙ্গে যেন তাহারই ছায়া পড়িল;—মা আমাকে সাপটিয়া ধরেন, আমিও মাকে ক্ষুদ্র বাহু দিয়া সাপটিয়া ধরি—ইচ্ছা হয় বুকের ভিতরে পূরিয়া রাখি।

মাতার মুখে কি এক অপূর্ব্ব সুধার খনি ছিল, যাই আমাকে ডাকেন, অমনি আমি গলিয়া যাই—আর আমিও মাকে ডাকি। কি

অপূর্ব্ব বিনিময় হইয়া গেল। শুষ্ক মৃত্তিকায় সরসী সৃজিত হইল, পৃথিবী জানিল না, বুঝিল না, কাহার ইঙ্গিতে। শিশু প্রেম-বিভূতি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া মাতার ক্রোড় হইতে মৃত্তিকায় নামিয়া হামাগুড়ি দিল—মৃত্তিকাকে চুম্বন করিল, ফুলকে চুম্বন করিল,—আপন পর জ্ঞান নাই, ভালমন্দ বিচার নাই, যাহাকে পায়, তাহাকেই কোল দেয়, যাহা পায় তাহাই ধরিয়া মুখে দেয়। মূর্খ পৃথিবী মনে করিল, বালক আহারে ব্যস্ত। বালক যে প্রেমের খেলা খেলিল, তাহা পৃথিবী বুঝিল না। পৃথিবী বলে এটা ধরো না, ওটা ছুঁয়ো না, এটা মাটী, ওটা বিষ, এটা আপন, ওটা পর। বালক অস্পষ্ট ভাষায় বলে, মাটী বুঝি না, বিষ বুঝি না, আপন পর জানি না, সকলই আমার, সকলকেই ধরিব, তারপর চুম্বন করিব —মুখের অমৃত দিয়া আমি প্রেমলীলা খেলিব। নিষেধ মানিল না, বালক যাহা পাইল, তাহাই মুখে দিতে লাগিল। বালক হাসে, খেলে, পৃথিবী বিপদ গণনা করে, বলে বালক বিষ খাইয়া মরিল। পৃথিবী বুঝিল না যে, মায়ের কোলের ছেলে মরে না। মানুষ যখন হাত ধরিতে বালকের কাছে রহিল না, তখন বালক কত বিষ, কত মাটী, কত কি মুখে করিল, কিন্তু মৃত্যু হইল না, মৃত্যু আসিল না। বালক কি মৃত্যুর ভয় করে? তোমরা কি কখনও শুনিয়াছ, শিশু আগুনে হাত দিতে বা বিষ ধরিয়া মুখে দিতে কখনও কুণ্ঠিত হইয়াছে? সংসারের বালক কুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার তালিকা আছে, জানি, কিন্তু পাপের অস্পৃশ্য বালক-জগতে যাও, দেখিবে সেখানে তাহাদের মনে ভয় নাই। বালক যেন জানে, সে আর মরিবে না, সে অমর। আশ্চর্য্য লীলাখেলা হইল। দর্শন বিজ্ঞান পরে প্রমাণ করিল, বালক কিছুই বুঝে না, সুতরাং সে সুখী নহে; কিন্তু আমি বুঝিলাম, আমি তখনই সুখী ছিলাম, যখন মায়ের কোলে ছিলাম। মায়ের কোলে অবোধ সন্তান দোলে, নাচে, হাসে, গায়; সেই সুখই আমার সুখ, তাহাই আমার প্রিয়। এখন বড় হইয়াছি, স্বার্থপর পৃথিবী ঘেরিয়া ধরিয়াছে, এখন ঐ দোলনি, ঐ হাসি ভুলিয়া গিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ সুখের আকর্ষণ ভুলিতে পারি নাই। শিশু বালক হইল, বালক যুবা হইল, যুবক বৃদ্ধ হইতে চলিল। বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি, এখন বুঝিয়াছি,—এ শরীরের শেষ আছে—এ হাত চিরদিন কলম ধরিয়া লিখিবে না, এ চক্ষু চিরদিন পৃথিবীর শোভা দেখিবে না, এ কিছুই থাকিবে না। এ পৃথিবী আমার নিকট আঁধার হইয়া যাইবে। গৃহ মাটীতে পড়িয়া পচিবে, টাকাকড়ি, ধনজন, মান সম্ভ্রম, প্রশংসা নিন্দা, সকলি পড়িয়া থাকিবে। পৃথিবী পৃথিবীই থাকিবে, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা না থাকার ন্যায় হইবে। আমার পক্ষে একদিন সকলই ফাঁকি, সকলই অসার প্রতিপন্ন হইবে। এ অসারে ক্রীড়া করিতে কেন আসিয়াছিলাম? পৃথিবী কি মীমাংসা করিল, আজও বুঝি নাই, কিন্তু আমি এই বৃদ্ধবয়সে পদার্পণ করিয়া বুঝিতেছি—আসিয়াছিলাম, মায়ের কোলে ঢুলিতে। মা আর আমি, আমি আর মা। মার মুখ আমি দেখিব, আর মা আমার মুখ দেখিবেন। প্রাণে প্রাণ, প্রেমে প্রেম, জ্ঞানে জ্ঞান। বুঝিয়াছি,—মার প্রেম লইয়া আসিয়াছিলাম,—সংসারকে প্রেম বিলাইয়া আবার মার কোলে যাইব, হাসিব, গাইব বলিয়া। পৃথিবী মায়ের ছবি, সেই ছবিতে ঢুলিব, নাচিব, গাইব, আর মাকে দেখিব। কিন্তু

যখন বড় হইলাম, তখন মাকে ভুলিলাম, মাকে দূর করিয়া দিলাম। পৃথিবী আমার সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িল। অমৃত সেঁচিয়া বিষ বাহির করিলাম। বিষপানে রত হইলাম। মাতার আসক্তি সংসারকে দিলাম। বিশ্বমাতার প্রত্যক্ষ ছবি—ক্ষুদ্র মাতা অমনি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মায়ের মুখ আঁধার হইল—মাকে আর দেখিলাম না। পথ ভুলিয়া গেলাম, আর মাতার কাছে যাইতে পারিলাম না। মাতা অন্তর্হিত হইলেন। পৃথিবীর ইতিহাস ইহার সাক্ষী আছেন। আর সাক্ষী আছেন যে,—আমি মাকে ভুলিয়া সংসার আসক্তিতে ডুবিয়াছি,—ইন্দ্রিয় সুখে বিভোর, টাকা কড়ি, যশমান, সুখ ঐশ্বর্য্যে মত্ত, প্রশংসা ও স্তুতিবাদে আত্মবিস্মৃত। আমি জীবিত কি মৃত? বিজ্ঞান বলে, জীবিত। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের চক্ষে আমি আজ দেখিতেছি, আমি মরিয়া রহিয়াছি। মৃত কে?—যাহার চৈতন্য থাকে না। যাহার চৈতন্য থাকে, সে সার অসার বুঝিতে পারে। আমি তাহা পারিতেছি না,—এই অট্টালিকা, এই টাকা, এই যশ,—এই সংসার দুদিনের, তবু ইহার মমতা ভুলিতে পারিতেছি না। যাইতে হইবে, তাহা ভুলিয়া রহিয়াছি। আর মৃত কে? যে আপনি ইচ্ছামত চলিতে ফিরিতে পারে না। আমি তাহা পারি না—আমার আমিত্ব নাই—তুমি আমায় চালাও, ঐ টাকা চালায়, ঐ যশ চালায়, ঐ সংসার চালায়। কেবল দাসত্ব, কেবল দাসত্ব, কেবল দাসত্ব। তুমি চোক রাঙ্গাইয়া ভয় দেখাও, আমি অমনি বসিয়া পড়ি। তুমি যাই বল, এই কাজ কর, নচেৎ তোর নিন্দা রটাইব, অমনি আমি উঠিয়া সেই কার্য্য করি। লোকে বলে রাজার দাস প্রজা, আমি দেখি, দাসের দাস আমি। টাকা কড়ি, বাড়ীঘর, যশ মান, সুখ ঐশ্বর্য্য, অহঙ্কার কাম ক্রোধ, এই সংসারের সকলের দাস আমি;—আজ আমি মৃত। কেন আমার এ দশা হইয়াছে? মাকে ভুলিয়াছি বলিয়া। মাতার স্বাধীন সন্তান, আজ আমি অধীন গোলাম, মৃত। এদিন থাকিবে না, আবার দিন আসিতেছে। আবার স্বাধীন হইব, সে দিন আসিতেছে। আবার লক্ষ্যপথে ধাবিত হইব, সে দিন আসিতেছে। আবার সংসারকে ভুলিব, সে দিন আসিতেছে। আবার সব ভুলিয়া মায়ের কোলে দুলিব, সে দিন আসিতেছে। আসিতেছে সংসারের মৃত্যু—মাতার সন্তানের নবজন্মতিথি। বৃদ্ধ হইতেছি, আর বুঝিতেছি,—এ সকল উপলক্ষ আর আমার নহে। সংসার তুমি ভ্রুকুটী দেখাইয়া কি ভয় দেখাইতেছ, আমি আর তোমার থাকিব না। বন্ধুবান্ধব ছলনা করিয়া, ভালবাসার জাল বিস্তার করিয়া, আমাকে পথ ভুলাইয়া রাখিয়াছিলে, ঐ দেখ, আর রাখিতে পারিবে না,—দিন আসিতেছে। তোমরা যাহাই মনে কর না কেন, মা আমাকে ভোলেন নাই—ঐ দেখ আবার আসিতেছেন। কেশ পাকিতেছে—দন্ত নড়িতেছে—অঙ্গ শিথিল হইতেছে—ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হইতেছে। আবার আঁধার আসিতেছে। সংসার আসক্তি—সকল ভালবাসাকে আঁধার করিবার দিন আসিতেছে। মূর্খ মানুষ—দূর হও, তোমাকে দেখিয়া আর ভুলিব না। আয়ু ক্ষীণ, দিন যায়—রাত্রি যায়—আবার দিন আসিতেছে। কেশব বড় চতুর বালক ছিল—কিন্তু পারিল না—ঐ আঁধার তাঁহাকে ধরিয়াছে। আসক্তি—অহঙ্কার আজ তাঁহার সকলই আঁধার। কমলকুটীর আঁধার—ব্রহ্মমন্দির

আঁধার—বঙ্গদেশ আঁধার। মায়ের সহিত চালাকি খাটিবে না। সব ভুলিয়া কেশব আজ আবার মায়ের ক্রোড়ে দুলিতেছে। কেশব লক্ষ্য ভুলিয়া অসার ধূলিতে মজিতেছিল, আজ আবার মায়ের কোল পাইয়াছে। বিজ্ঞানগর্ব্বিত নাস্তিক জগৎ—কই কেশবকে আজ ধরিলে না? কেশব কোথায় গেল?—খোজিলে না? ভালবাসার ফাঁদ পাতিলে না?—নিন্দা করিলে না? মূর্খ জগৎ, আর কেন, অহঙ্কার চূর্ণ কর। মাতার বিশ্বব্যাপিনী রূপ দেখ। তিনি দিলেন, তিনিই নিলেন। সোণার মানুষ ধূলি খেলা লইয়া থাকিবে, প্রেম ভক্তি ভুলিয়া থাকিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য। কেশব গিয়াছেন—আমিও যাইব, ভাইরে, তুমিও যাইবে। লক্ষ্য ভুলিয়া থাকিবার যো নাই। লক্ষ্য ভুলিয়া থাকিব না। প্রাণের ভিতর এই বাসনার আগুণ জ্বলিয়া উঠিতেছে, নির্ভীক বালক হইয়া মায়ের কোলে দুলিব। অনন্ত প্রেমজলধির কোলে বসিয়া প্রেমদুগ্ধ পান করিব, আর হাসিব, গাইব, খেলিব। আমি অজ্ঞান, ঐ অনন্তের নিকট ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কিছুই জানি না, বুঝি না, ইচ্ছা হয় বালকের ন্যায় সকল জ্ঞান বিজ্ঞান দূরে রাখিয়া মায়ের কোলে দুলি। দুলিব যে দিন, সে দিন আসিতেছে। আমিও দুলিব, তুমিও দুলিবে —সব একাকার হইবে। মৃত্যু আসিতেছে —তোমাকে আমাকে সকলকে বালকত্বে পরিণত করিতে—অহঙ্কারকে ডুবাইতে। লক্ষ্য এক ভিন্ন দুই নাই। যে স্বীকার করে না, তারও যে লক্ষ্য, যে স্বীকার করে, তারও সেই লক্ষ্য—ঐ বিশ্বমাতার বিশ্ববিস্তৃত কোল। লক্ষ্য কেবল—অনন্ত প্রেম পুণ্যের প্রস্রবণের নিম্নে বালক হইয়া তৃষিত নয়নে তাকাইয়া থাকা। অনন্তের সহিত ক্ষুদ্রত্ব মিশাইয়া দেওয়া। বড় হইয়াছি, —জ্ঞানী হইয়াছি, বিদ্বান হইয়াছি—আমি "হেন তেন," এ চালকি আর খাটিবে না। অনন্ত—অনন্ত—অনন্ত। অনন্ত পক্ষপুটে ক্ষুদ্রত্বকে লুকাইতেই হইবে—মাথা নত করিতেই হইবে। যত বড় হও, চিরকাল বালক, যত পাও ততই বালকত্ব বৃদ্ধি। সাধ পূরিবে না—অনন্ত পিপাসা। বালক হইতেই হইবে—অহঙ্কারকে চূর্ণ করিতেই হইবে। লীলা খেলা সাঙ্গ হইয়া আসিল—গণনা করিয়া দেখ, কিছুই হইল না—কিছুই হয় নাই। জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটে নাই, শান্তির তৃষ্ণা মিটে নাই, প্রেমের তৃষ্ণা মিটে নাই—যে বালক সেই বালক। পরম মাতা সংসার লীলা খেলা করাইলেন মানুষকে এই শিক্ষা দিতে, মানুষ বালক হইবে। আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে—আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে। মাগো, তবে আর কেন?—সেই দিন আন, শিশু হইয়া তব ক্রোড়ে বসিয়া পড়ি। অনিমেষ নয়নে তোমাকে দেখি, আর তুমি আমাকে দেখ। তোমার চক্ষু হইতে অনন্ত প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়া আসিয়া আমাকে প্লাবিত করুক, আর সেই প্রেমে রঞ্জিত হইয়া তোমাকে এই ক্ষুদ্র বাহু দ্বারা আমি ক্ষুদ্র বুকে পূরিয়া রাখিয়া কৃতার্থ হই। তোমার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত পুণ্য, অনন্ত শান্তির প্রস্রবণে ডুবাও, আমি অবোধ, অজ্ঞান, নির্ভীক বালকের ন্যায় মোহিত হইয়া, অহঙ্কারকে পরাজয় করিয়া তোমাতে মগ্ন হইয়া থাকি। তোমার কোলে হাসিব, দুলিব, নাচিব, বিশ্বজননী, দাসের এই সাধ পূর্ণ কর। 'স্বাধীনতা' চাই না, অধীন কর। পৃথিবী তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছে, মাগো, পৃথিবীকে এক

বার বালক করিয়া কোলে তুলিয়া নিয়া দো- । লাও,নাচাও,হাসাও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কর

জীবনগতি নির্ণয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সামাজিক বিশ্লেষণ।

"The class-bias, like the bias of patriotism is a reflex of egoism and like it has its uses and abuses. * * * * * * *
The egoism of individuals leads to an egoism of the class they form; and besides the separate efforts, generates a joint effort to get an undue share of the aggregate proceeds of social activity. The agressive tendency of each class, thus produced, has to be balanced by like aggressive tendencies of other classes."

Herbert Spencer.

এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী দুই অধ্যায়ে বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশ (Evolution) সম্বন্ধীয় যে কয়েকটী নিয়ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিশ্লেষণ (Segregation) সম্বন্ধীয় কোন নিয়ম উল্লিখিত হয় নাই। বিশ্লেষণ বিবর্ত্তন-নিবন্ধন-বিকাশের অনিবার্য্য ফল। সংযোগোৎপন্ন পদার্থের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট যে সকল পরমাণু থাকে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সংঘর্ষণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হইয়া পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট হয়; এবং তন্নিবন্ধন সংযোগোৎপন্ন পদার্থ বিবিধ অংশে বিভক্ত হইতে থাকে। সংযোগোৎপন্ন পদার্থের অংশ বিশেষের ঈদৃশ বিচ্ছিন্ন অবস্থা প্রাপ্তিকেই বিশ্লেষণ বলা যায়। বালুকণা মিশ্রিত নদীর জল কিছুকাল একটী পাত্রে রাখিলে, বালু-কণা গুলি পাত্রের নিম্নদেশে, একত্রিত হয় এবং জল রাশি তজ্জন্য বালু-কণিকা হইতে পৃথক হইয়া ক্রমে পরিষ্কৃত হইতে থাকে। এই স্থানে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, বালু-কণিকা মিশ্রিত নদীর জল একটী সংযোগোৎপন্ন পদার্থ। এই সংযোগোৎপন্ন পদার্থের মধ্যস্থিত বালুকণা গুলি এক প্রকার প্রকৃতি-বিশিষ্ট পরমাণু-সমষ্টি এবং জলরাশি অন্য প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট পরমাণুর সমষ্টি। সুতরাং ভিন্ন জাতীয় পরমাণু সমষ্টি বলিয়া বালু-কণিকা জল হইতে সহজেই বিশ্লিষ্ট হইয়া পাত্রের নিম্নদেশে একত্রিত হইল, এবং সংযোগোৎপন্ন পদার্থের মধ্যস্থিত দুটী ভিন্ন জাতীয় পরমাণু সমষ্টি দুই অংশে বিভক্ত হইল।

মনুষ্যসমাজেও এই বিশ্লেষণ কার্য্য নিয়তই পরিলক্ষিত হইতেছে। এক একটী মনুষ্য সমাজের এক একটী পরমাণু স্বরূপ। সুতরাং মনুষ্য সমাজেও এক প্রকৃতি-বিশিষ্ট মনুষ্যগণ ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবমণ্ডলী হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে এবং তন্নিবন্ধন বৃহৎ মনুষ্যসমাজ নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকে। যে সকল মনুষ্য শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহারা সমাজের সুশিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া শ্রমোপজীবী শ্রেণী বলিয়া অভিহিত হয়। আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দ্বারা এক একটী

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে। ঈদৃশ সামাজিক বিশ্লেষণের মধ্যে তিনটী সাধারণ নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, যথা—প্রথমতঃ, সংযোগোৎপন্ন বস্তু বা বিষয়ের পরমাণু কিম্বা অংশ সমুদায় এক প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে এবং এক প্রকার শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহাদিগের প্রত্যেকের গতিপথ ও গতিফল সর্ব্বপ্রকারে সমান থাকে।* সুতরাং এবম্বিধ পরমাণু ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট পরমাণু সমষ্টি হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, সংযোগোৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের পরমাণু বা অংশ সমূহ এক প্রকৃতি বিশিষ্ট হইলে ও তাহারা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইলে, তাহাদিগের প্রত্যেকের গতিপথ ও গতিফল মধ্যে অবশ্যই বিভিন্নতা উপস্থিত হইবে। † এবং তন্নিবন্ধন তাহারা পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, সংযোগোৎপন্ন বস্তু বা বিষয়ের পরমাণু বা অংশ সমূহ ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে, তাহারা প্রত্যেকে এক প্রকার শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়াও বিভিন্ন গতিপথ ও গতিফল প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ‡

এতৎপূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহের সম্মিলন দ্বারা কোন সংযোগোৎপন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয় সৃষ্ট হইলে প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধ (mutual interdependence) ও অবস্থানের বিভিন্নতা নিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা উপস্থিত হয়। অর্থাৎ এক জাতীয় পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহ সংযুক্ত হইয়া সংযোগোৎপন্ন পদার্থ রূপে পরিণত হইবা মাত্র প্রত্যেক পরমাণু সমজাতীয় ভাব (homogeneous condition) বিবর্জ্জিত হইয়া বিষমাবস্থা (heterogeneous condition) প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে যে কারণে সংযোগোৎপন্ন পদার্থের মধ্যে এক একটী অংশ কিম্বা পরমাণুর মধ্যে বৈষম্য ভাব উপস্থিত হয়, তাহা উদাহরণ দ্বারা ইতিপূর্ব্বে একবার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়টী পরিষ্কাররূপে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য পুনরায় বর্ত্তমান অধ্যায়ে আর কয়েকটী উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে।

কোন একটী বস্তু সূর্য্যোত্তাপে রাখিয়া দিলে, তাহার উপরিস্থ পরমাণু গুলি সূর্য্যের উত্তাপ পাইয়া যে পরিমাণে রূপান্তরিত হয়, বস্তুর গর্ভস্থ পরমাণু সমূহ ঠিক সেই পরিমাণে রূপান্তরিত হয় না। কারণ সূর্য্যোত্তাপ উপরিস্থ পরমাণুর উপর যেরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ, গর্ভস্থ পরমাণুর উপর সেইরূপ কার্য্য করিতে পারে না। সংগ্রাম ক্ষেত্রে সম্মুখস্থ সৈন্যগণ বিপক্ষের অস্ত্রে যেরূপ আহত

---

* "First, that like units subject to a uniform force capable of producing motion in them, will be moved to like degrees in the same direction."

† "Second, that like units if exposed to unlike forces capable of producing motion in them, will be differently moved—moved either in different directions or to different degrees in the same direction."

‡ "Third, that unlike units if acted on by a uniform force capable of producing motion in them, will be differently moved—moved either in different direction or to different degrees in the same direction."

Herbert Spencer.

হয়, পশ্চাতে যাহারা তাহাদিগের তদ্রূপ আহত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রকারে সংযোগোৎপন্ন পদার্থের পরমাণু সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ (mutual dependence) প্রযুক্ত তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ক্রমে বৈষম্য ভাব উপস্থিত হইতে থাকে। এবং শক্তির বিলয়শূন্য অবস্থিতি নিবন্ধন (owing to persistence of force) এই বৈষম্যাবস্থা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংযোগোৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের পরমাণু সমূহকে বৈষম্যাবস্থা হইতে সমধিক বৈষম্যাবস্থায় পরিণত করে। অবশেষে সংযোগোৎপন্ন বস্তুর এক এক অংশের বা এক এক প্রদেশের পরমাণু সমষ্টি অপরাপর অংশের পরমাণু সমষ্টি হইতে এতাদৃশ বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহারা কোন একটী নূতন শক্তির প্রভাবে অপর বিভাগের পরমাণু সমষ্টি হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়।

এক খানি কাষ্টের অর্দ্ধাংশ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে,. সেই দগ্ধীভূত অর্দ্ধাংশের পরমাণুসমষ্টি অপরার্দ্ধাংশ হইতে এতাদৃশ বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, অত্যাল্প আঘাত প্রাপ্ত হইলেই দগ্ধীভূত অংশ অপরাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

এই স্থানে দেখা যাইতেছে যে, সমুদায় কাষ্ঠ খানি একটী সংযোগোৎপন্ন পদার্থ (অর্থাৎ কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি মাত্র।) কিন্তু কাষ্ঠ খানি যে ভাবে অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে কেবল ইহার একাংশের পরমাণু অগ্নির সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইল। সুতরাং যে অংশ অগ্নিসংযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অংশের পরমাণু অপরাংশের পরমাণু হইতে এতাদৃশ বৈষম্য প্রাপ্ত হইল যে, উহা অত্যল্প আঘাতে অপরাংশ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল। মানবগণের সামাজিক জীবনে ঈদৃশ বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় নিয়ম যে প্রযুজ্য, তাহা অসভ্য জাতির ক্রমোন্নতির উদাহরণ দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে।

অসভ্যদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি অপর কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না। তাহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান, এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন যাপন করে। কিন্তু কালক্রমে সেই আদিম অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ সমুন্নত হইলে তাহারা নিকটস্থ কোন জাতিকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে,অথবা আপনাদিগকে অন্য কোন জাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে থাকে। এই প্রকার সামাজিক সম্মিলন দ্বারা তাহারা প্রথমতঃ পরস্পরের কার্য্যের ফলাফল সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, দ্বিতীয়তঃ, ঈদৃশ সম্মিলন দ্বারা তাহাদের পূর্ব্বগত সমাবস্থা বিলুপ্ত হইয়া, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বৈষম্যাবস্থা সমুপস্থিত হয়; কারণ,—সম্মিলিত হইলে পর কোন এক ব্যক্তি তাহাদিগের মধ্যে সেনাপতির পদপ্রাপ্ত হয়, এবং অপরাপর সকলেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে পদপ্রভুত্ব লাভ করে। কিন্তু কালক্রমে যদি আবার দুই তিন ব্যক্তিই সেনাপতির পদ লাভ করিতে সচেষ্ট হয়, অর্থাৎ সেনাপতিপদলাভাকাঙ্ক্ষা একটি শক্তি স্বরূপ হইয়া অপর দুই তিন জনের মধ্যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে, তবে তাহাদিগের মধ্যে তৎক্ষণাৎ ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়, এবং এক দল হইতে অপর দল সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

এখন এই অসভ্যজাতীয় লোকদিগের জীবনের এই উদাহরণটী দ্বারা বিবর্ত্তন নিবন্ধন বিকাশের সংজ্ঞা (Definition of evo-

lution) এবং সামাজিক বিশ্লেষণ প্রণালী (Theory of social segregation) সহজে বুঝান যায়। এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশের নিম্ন লিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহ স্বীয় স্বীয় পারমাণব-গতি কিম্বা আভ্যন্তরিক গতির বিলোপান্তর প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্নাবস্থা হইতে রূপান্তরিত হইয়া সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি নিবন্ধন যদি প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ, যে সকল অন্যান্য পরমাণু কিম্বা অংশের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাদিগের প্রকৃতি ও গুণ লাভ করে, এবং তন্নিবন্ধন সংযোগোৎপন্ন পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ পূর্ব্বস্থিত অসংযুক্ত অবস্থা সম্ভূত স্বকীয় একবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার না হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে বিবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার হয়, এবং প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে আবার প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশ বিভিন্নতা লাভ করে, তাহা হইলে, তাহারা প্রত্যেকেই বিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকারে বিকাশিত হইল, এই প্রকার বলা যাইতে পারে।

এই সংজ্ঞাটীকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ দ্বারা অনায়াসে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহ স্বীয় স্বীয় পারমাণব গতি অথবা অভ্যন্তরিক গতি কতক পরিমাণে বিসর্জ্জন না করিলে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে উল্লিখিত অসভ্যগণ স্বীয়২ জীবনের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন গতি কতক পরিমাণে বিসর্জ্জন না করিলে কখনই পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে সমর্থ হইত না। অতএব পারমাণব গতি বিসর্জ্জনই সম্মিলনের মূল কারণ।

দ্বিতীয়তঃ, পরমাণু কিম্বা অংশ সকল পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রকৃতিই পরস্পরের সংঘর্ষণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, এবং প্রত্যেকেই অপরাপর সকলের প্রকৃতি ও কার্য্যের ফলাফল লাভ করিয়া থাকে। অসভ্যদিগের উদাহরণ দ্বারা বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশের এই দ্বিতীয় অংশটীও বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ অসভ্যগণ সম্মিলিত হইল বলিয়াই তাহারা প্রত্যেকের সমবেত চেষ্টার ফল ভোগ করিতে সমর্থ হইল, এবং প্রত্যেকের জীবনগতিই তন্নিবন্ধন রূপান্তরিত হইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ, সংযোগ প্রাপ্তি নিবন্ধন সমজাতীয় ও সমাবস্থাপন্ন প্রত্যেক পরমাণু সমজাতীয়ভাব (homogeneous condition) পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিষমাবস্থা (heterogeneous condition) লাভ করিতে থাকে। প্রাগুক্ত অসভ্যদিগের ক্রমোন্নতির উদাহরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অসভ্যগণ দলবদ্ধ হইবামাত্র তাহাদিগের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি সেনাপতি হয় এবং অপরাপর সকলেই আপনাপন শারীরিক ও মানসিক শক্তির ন্যূনাতিশয্য প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন পদ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সম্মিলন দ্বারা তাহারা সমজাতীয় ভাব ও সমাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেকেই বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শক্তির কার্য্য নিঃশেষিত হয় না; এবং শক্তির বিলয় নাই। সুতরাং শক্তির বিলয়শূন্য অবস্থিতি (persistence of force) নিবন্ধন সংযোগোৎপন্ন পদার্থের পরমাণু বৈষম্যাবস্থা হইতে ক্রমে সমধিক বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে বস্তুর একাংশের পরমাণু অপরাংশের পরমাণু হইতে এমন বিভিন্ন হইয়া পড়ে

যে, কোন নূতন শক্তির সংযোগে একাংশ যেমন রূপান্তরিত হয়, অপরাংশ তদ্রূপ হয় না। ঈদৃশ অবস্থা নিবন্ধন, নূতন শক্তি সংযোগে যে অংশ রূপান্তরিত হয়, তাহা অপরাংশ হইতে ক্রমে বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে। অতএব এক্ষণে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে যে, বিশ্লেষণ কার্য্য বিবর্ত্তন-নিবন্ধন বিকাশের অবশ্যম্ভবী ফল। কারণ সংযোগ নিবন্ধন পরমাণু বিবর্ত্তিত হইয়া বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া অবশেষে বৈষম্যাবস্থাপন্ন পরমাণু সমষ্টি কোন একটী নূতন শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে যে, বিশ্লেষণের মধ্যে তিনটী সাধারণ নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, অতএব সেই তিন প্রকার অবস্থায় যে সামাজিক বিশ্লেষণ সমুপস্থিত হয়, তাহাই এক্ষণে উল্লেখ করিব।

বৃহৎ মনুষ্য সমাজ অসংখ্য অসংখ্য মনুষ্যেয় সম্মিলন দ্বারা গঠিত হইয়াছে। সুতরাং মনুষ্য সমাজ একটী সংযোগোৎপন্ন বিষয়, এবং এক একটী মনুষ্য ইহার এক একটী পরমাণু-স্বরূপ। এই সকল পরমাণু সম্মিলন নিবন্ধন সমজাতীয় ভাব বিবর্জ্জিত হ বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সমাজের এক অংশের পরমাণু সমষ্টি অপরাংশের পরমাণু সমষ্টি হইতে অবস্থানের ভিন্নতা অনুসারে (owing to difference of position) ন্যূনাতিরিক্ত বিভিন্নতা লাভ করে। তৎপরে একটী নূতন শক্তির সংঘর্ষণে এক অংশের পরমাণু যদ্রূপ রূপান্তরিত হয়, অপরাংশের পরমাণু সেইরূপ হয় না। কারণ সংযোগোৎপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহ, ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে তাহারা এক প্রকার শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্ন গতিপথ ও গতিফল প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে কোন বস্তু কিম্বা বিষয়ের এক অংশের পরমাণু-সমষ্টি এক প্রকার গতিপথ ও অপরাংশের পরমাণু-সমষ্টি অন্য প্রকার গতিপথ প্রাপ্ত হইলে, অংশদ্বয় যে পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট হইবে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

বৈষম্যাবস্থাপন্ন সামাজিক পরমাণু (Social units) যে কোন না কোন একটী নূতন শক্তির সংঘর্ষণে ভিন্ন ভিন্ন গতিপথ ও গতিফল প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা বর্ত্তমান ইলবার্ট বিল সম্বন্ধীয় রাজনৈতিক আন্দোলন সুস্পষ্টরূপে সপ্রমাণ করিতেছে। সামাজিক বিশ্লেষণ প্রণালী (Theory of social segregation) পাঠকগণ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে আমরা ইলবার্ট বিল সম্বন্ধীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলাফল উল্লেখ করিয়া এই বিশ্লেষণ প্রণালী ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্ত্তমান ভারত-সমাজ হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, ইংরাজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকদ্বারা গঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও পার্শিদিগের রাজনৈতিক অধিকার এক প্রকার এবং ইংরাজদিগের রাজনৈতিক অধিকার অন্য প্রকার। সুতরাং রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে হিন্দু, মুসলমান ও পার্শি এক প্রকার সামাজিক পরমাণু (like social units) এবং ইংরাজগণ অন্য এক প্রকার সামাজিক পরমাণু। কিন্তু পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সংযোগোৎপন্ন বস্তু বা বিষয়ের পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহ ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে, তাহারা এক প্রকার শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত

হইয়াও বিভিন্ন গতিপথ ও গতিফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং কোন একটী রাজনৈতিক ব্যাপার এই দ্বিবিধ পরমাণু সমষ্টি মধ্যে অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গতি উৎপাদন করিবে।

বিগত বৎসর ইলবার্টবিল স্বরূপ একটি নূতন শক্তি এই দ্বিবিধ পরমাণুর উপর কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়া এক জাতীয় পরমাণু সমষ্টির গতিপথ ও গতিফল অপর জাতীয় পরমাণু সমষ্টির গতিপথ ও গতিফল হইতে এমন বিভিন্ন করিয়া তুলিল যে, তন্নিবন্ধন ভারত সমাজের একাংশ অপরাংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া সমাজকে দুই অংশে বিভক্ত করিল। আবার হিন্দু, মুসলমান, ও পার্শি প্রত্যেকে বৈষম্যাবস্থাপন্ন পরমাণু হইলেও রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সমপ্রকৃতি বিশিষ্ট বলিয়া ইলবার্টবিল তাহাদিগের জীবনে এক প্রকার গতিপথ ও গতিফল প্রদান করিল। সুতরাং ইলবার্টবিল সম্বন্ধে তাহারা এক প্রকার উপায় অবলম্বন করিল।

বস্তুতঃ মানব সমাজের কার্য্যকলাপ যে প্রাগুক্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিচালিত ও পরিশাসিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। মানবগণ সামাজিক সম্মিলন নিবন্ধন বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে সমুন্নতাকারে বিকশিত হইতেছে। যখন বিবর্ত্তনের পর বিবর্ত্তন মানব সমাজকে উন্নতি হইতে উন্নতির সোপানে সমুত্থিত করিতেছে, যখন সামাজিক অবস্থা কখন চিরকাল স্থায়ীভাব অবলম্বন করিতে পারে না, তখন নিশ্চয়ই এই সকল বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সময় সময় সমাজের এক একটী অংশ অপরাপর অংশ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। কিন্তু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ এই প্রকারে বিশ্লিষ্ট হইলে, এক একটী অংশের অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার অপরাংশের কার্য্য কলাপ হইতে প্রতিঘাত পাইয়া, হ্রাস প্রাপ্ত না হইলে, সমাজের সাম্যভাব সংরক্ষিত হইতে পারে না। যে সমাজের একাংশ অপরাংশ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে একাধিপত্য স্থাপন করিতে থাকে, সেই সমাজ ক্রমেই অবনতি হইতে সমধিক অবনতি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে একেবারে বিনষ্ট হয়। রোম সাম্রাজ্যের বিনাশের পূর্ব্বে রোমের ধনবান শ্রেণী দরিদ্র সম্প্রদায় হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া অপ্রতিহত শক্তি সহকারে সেই দরিদ্রদিগের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। দরিদ্র সম্প্রদায়, যদি ধনীদিগের অত্যাচারের অবরোধ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে রোমান সমাজের সাম্য ভাব সংরক্ষিত হইত এবং রোম বিনষ্ট না হইয়া ক্রমে উন্নতি হইতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইত। কিন্তু রোমান সমাজের সেই বিশ্লিষ্টাংশের অন্যায়াচরণের অবরোধ করিয়া সামাজিক সাম্যভাব রক্ষণে সমর্থ কোন শক্তি বিদ্যমান ছিল না বলিয়াই রোমরাজ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইল। আবার জ্ঞান ও ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুগত ব্যবহারের আতিশয্য প্রযুক্ত যদি কোন এক শ্রেণীর লোক সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তবে তাহাদিগের দ্বারা সমাজের অপরাংশ উন্নতির দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। ঈদৃশ সামাজিক বিশ্লেষণের মধ্যে পক্ষাপক্ষের অন্যায়াচরণ সম্ভূত বিবাদ পরিলক্ষিত হয় না। তিমিরাচ্ছন্নকালে (during the dark ages) মঙ্ক (monk) দিগের কার্য্যকলাপই এই প্রকার সামাজিক বিশ্লেষণের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

রোম সাম্রাজ্যের অব্যবহিত পরে অরাজকতা নিবন্ধন সমাজস্থ অধিকাংশ জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোক সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে লাগিল। সুতরাং এতন্নিবন্ধন জ্ঞান ও ধর্ম্ম সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িল। কিন্তু পরে এই বিশ্লিষ্ট অংশ তাৎকালিক ইয়ুরোপীয় সমাজকে উন্নতির দিকে আকর্ষণ করিয়াছিল।*

সামাজিক বিশ্লেষণের দ্বারা কখন সমাজের উপকার হয় এবং কখন কখন সমাজের ঘোর অমঙ্গল সংঘটিত হয়। জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম, ভক্তি ও ন্যায়ানুগত ব্যবহারের আতিশয্যপ্রযুক্ত কতকগুলি লোক সাধারণ সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িলে, ক্রমে তাহারা দেশ সংস্কারক কিম্বা সমাজ সংস্কারকের পদে অভিষিক্ত হয়েন। কিন্তু পক্ষাপক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থ সামাজিক বিশ্লেষণ উপস্থিত হইলে, ক্রমে সমাজ মধ্যে ঘোর বিবাদ বিসম্বাদের উৎপত্তি হইয়া, সমাজের নৈতিক বায়ু দূষিত করিয়া তোলে। অবশেষে ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় বিধান অনুসারে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় সামাজিক বিপ্লব সমুপস্থিত হইয়া সেই নৈতিক বায়ু পরিশুদ্ধ করে।

* Vide the inflences of the monks in the progress of Eueopean society during the Dark ages.

বাল্মীকি ও বেদব্যাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পৃথিবীতে কোন কোন কবি এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন। এখনও কোন কোন কবি কীর্ত্তন করিতেছেন, ও ভবিষ্যতেও কবিগণ এই ইতিহাস কীর্ত্তন করিবেন।

এস্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ইতিহাস কোন্ ইতিহাস? যদি বল "দ্বৈপায়নেন যৎপ্রোক্তং" অর্থাৎ যাহা দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। বিলক্ষণ কথা। যখন ব্যাসকৃত মহাভারত কহিতেই মহর্ষিগণ সৌতিকে বলিতেছেন এবং সৌতিও তাহাই আদ্যোপান্ত কহিব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (৩২) তখন "ইমং ইতিহাসং" বলিতেই দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক বিরচিত না বুঝিয়া আর উপায় নাই। যদি উপায়ই না থাকিল, তবে "ইমং ইতিহাসং আচখ্যুঃ" এই আচখ্যুঃ ক্রিয়ারও রচনার্থ হওয়ার কোন উপায় নাই। যাহা ব্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাই কোন কোন কবি রচনা করিয়াছেন, এখনও কোন কোন কবি করিতেছেন ও ভবিষ্যতেও করিবেন, তবে কি পৃথিবীর সকলেই ব্যাস রচিত

৩২ 'দ্বৈপায়নেন' যৎপ্রোক্তং পুরাণং পরমর্ষিণা।
সুরৈ ব্রহ্মর্ষিভিশ্চৈব শ্রুত্বাযদভি পূজিতং। ১৭
তস্যাখ্যান বরিষ্ঠস্য বিচিত্র পদপর্ব্বণঃ।
সূক্ষ্মার্থ ন্যায় যুক্তস্য বেদার্থৈ র্ভূষিতস্যচ।" ১৮
ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থ সংযুতাং। ১৯
বেদৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তাং ব্যাসস্যাদ্ভুত কর্ম্মণঃ।
সংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছামঃ পুণ্যাং পাপভয়াপহাং। ২১
মহর্ষেঃ পুজিতস্যেহ সর্ব্বলোক মহাত্মনঃ।
প্রবক্ষ্যামি মতং কৃৎশং ব্যাসস্যাদ্ভুত কর্ম্মণঃ। ২৫

অনুক্রমণিকাধ্যায় মহাভারত।

মহাভারতই রচনা করিয়াছেন? ইহা করিলেন কি প্রকারে? মহাভারতের যে শ্লোক গুলি ব্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাই আমি এক স্থানে লিখিলাম কি বলিলাম, কৈ রচনা ত হইল না, এ যে ব্যাসের শ্লোক নকল করা হইল?

আচখ্যুঃ এই ক্রিয়ার প্রকৃতার্থ কহা, রচনা নহে। সৌতি যখন ব্যাসকৃত মহাভারত কহিতে আরম্ভ করিয়া তাহাই কেহ কেহ বর্ণনা করিয়াছেন এই অর্থে আচখ্যু ক্রিয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন আচখ্যুঃ কোন মতেই তাহার প্রকৃতার্থ ত্যাগ করিতে পারে না। কবি শব্দে যে কেবল গ্রন্থকারদিগকেই বুঝায়, তাহা নহে। কবি শব্দে কাব্যকার, পণ্ডিত, শুক্রাচার্য্য প্রভৃতিকে বুঝায় (৩৩)। অতএব কোন কোন পণ্ডিত এই ইতিহাস কহিয়াছেন, এখনও কহিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও কহিবেন, সম্প্রতি আমিও কহিতে আরম্ভ করিয়াছি, এস্থলে সৌতির উল্লিখিত বাক্য দ্বারায় ইহাই ব্যক্ত হয়। উপরোক্ত আচখ্যুঃ যে রচনা নহে তাহা ভারতীয় প্রথমাধ্যায়ের ১০৩ হইতে ১০৮ শ্লোকে বিলক্ষণরূপে প্রকাশ আছে।

ধাতু তাহার প্রকৃতার্থ ত্যাগ করে কোথায়? না যেখানে তাহার প্রকৃতার্থ সঙ্গত হয় না (৩৪)। যেমন "দ্বৈপায়নেন যৎ প্রোক্তং" দ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক যাহা বিরচিত হইয়াছে। এস্থলে বচ ধাতুর প্রকৃতার্থ হইল না কারণ, তাহার প্রকৃতার্থ বলা, রচনা নহে। যদি বল এস্থলে বচ ধাতুর প্রকৃতার্থই হয় না কেন? উত্তর তাহা হইলে ভারতীয় বচনের সহিতই ভারতীয় বচনের বিরোধ উপস্থিত হয়। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যে মহাভারত বলেন নাই, রচনা করিয়াছেন, তাহা চক্রে, চকার প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারায় মহাভারতের অনেক স্থানেই প্রকাশ আছে (৩৫)।

মহাভারতে "কৃষ্ণ দ্বৈপায়নায় নমঃ" দেখিয়া অনেকেই বলেন যে, মহাভারত সমস্ত দ্বৈপায়নের কৃত হইলে তিনি কখনই আপনি আপনাকে নমস্কার করিতেন না। এই আপত্তি সম্বন্ধে প্রথমতঃ আমরা এই কথা বলি যে, স্থল বিশেষে যে অর্থ সঙ্গত হয় তাহাই করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কোন স্থানে লিখিত আছে হরি মানুষ খায়। হরি মানুষ খায়, এই কথায় আমাদের পরমেশ্বর হরি মানুষ খান ইহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। সিংহ মানুষ খায়, ইহাই সিদ্ধান্ত করা আমাদের উচিত। "কৃষ্ণ

৩৩ 'শুক্রো দৈত্যগুরুঃ কাব্য উশনা ভার্গবঃ কবিঃ।'
স্বর্গ বর্গ, অমরকোষ।

'বিদ্বান বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সনস্থধীঃ কোবিদোবুধঃ।
ধীরো মনীষীজ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান পণ্ডিতঃ কবিঃ।'
ব্রহ্মবর্গ, অমরকোষ।

৩৪ 'তদহং কথয়িষ্যামি শ্রুতিবোধমবিস্তরং।'
শ্রুতবোধ।

'সংক্ষিপ্তসার মাচষ্টে পণ্ডিতঃ ক্রমদীশ্বরঃ।'
সংক্ষিপ্ত সার ব্যাকরণ।

"শ্রীপুরুষোত্তমশর্ম্মা লৌকিকপদ মুক্তাবলীয়ং তনুতে।"
রত্নমালা ব্যাকরণ।

৩৫ 'তপসাব্রহ্মচর্য্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনং।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতী সুত। ৫৪
'পরাশরাত্মজোবিদ্বান ব্রহ্মর্ষি সংশিতব্রতঃ।' ৫৫
'চতুর্ব্বিংশতি সাহস্রীং চক্রে ভারত সংহিতাং।' ১০১
'ষষ্টিশত সহস্রাণি চকারান্যাং সসংহিতাং।' ১০৪
প্রথমাধ্যায় আদিপর্ব্ব মহাভারত।

এতদ্ব্যতীত আদিপর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ের ১৭।২০।৫৬।৬২ ৭৪।৮০।৮৩।২৫৬।২৭৩।২ অধ্যায়ের ৩০০।৩৮৫।৫৬ অধ্যায়ের ৩.৬ ৭।৮। ও ১৩১ অধ্যায়ের ১২।১৩।১৪।১৮ ইত্যাদি শ্লোক দেখ।

দ্বৈপায়নায় নমঃ” ব্যাসের লিখা না, যে সকল কবি অর্থাৎ পণ্ডিত মহাভারত পাঠ বা নকল করিয়াছেন, ও কীর্ত্তি তাঁহাদেরই। ব্যাস ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া মহাভারত আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার পরে যাঁহারা মহাভারত পাঠ বা নকল করিয়াছেন তাঁহারা আবার ব্যাসকে ঈশ্বরাবতার জানিয়া ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়া ত্বদীয় মহাভারত পাঠ অথবা নকল করিয়াছেন।

মন্বাদি ভারতং কেচদাস্তিকাদি তথাপরে।
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃসম্যগধীয়তে।
আদিপর্ব্ব। ৫২

কাহার মতে দিবের পুত্র মহা নামক মনু হইতে, কাহার মতে আস্তিক, উপাখ্যান ও কাহার মতে উপরিচরের উপাখ্যান এবং কাহার কাহার মতে স্বস্তিবাচন হইতে মহাভারতের আরম্ভ হইয়াছে।

ভারত রচয়িতা এই বচন দ্বারায় তাঁহার যে উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন, তাহা আমরা পরে বলিব। কিন্তু এই বচনটীতে এমন কোন কথাই লক্ষিত হয় না, যাহা দ্বারায় আমরা মহাভারতকে বহুজন বিরচিত বলিতে পারি। পরন্তু ঐ একমাত্র শ্লোককে অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতকে বহুজন বিরচিত বলিতে পারিতাম, যদি ভারতীয় অনুক্রমণিকাধ্যায়ের বহুতর শ্লোকে মহাভারত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়া প্রকাশ না থাকিত। উক্ত অধ্যায়ের একটী বচনের উপর বিশ্বাস করিয়া আমরা কখনই উহার দশটীকে মিথ্যা বলিতে পারি না। অনন্তর ভারতের আরম্ভ সম্বন্ধে যে বহুমত তাহাই খণ্ডন করা যাইতেছে। মহাভারতের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত তাহার কথা গুলি যেরূপ ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া সহসা বোধ হয় যে, বর্ত্তমান মহাভারতে এক ব্যাস কেন? অষ্টাবিংশতি ব্যাসেরও একটী বচন আছে কি না সন্দেহ স্থল। পাঠক বিবেচনা করুন, সুতবংশ সম্ভূত উগ্রশ্রবা বর্ত্তমান মহাভারত খানির বক্তা এবং উহা যে দ্বৈপায়ন (বেদব্যাস) কৃত তাহাও প্রতি ক্ষণেই তিনি শ্রোতৃগণকে জানাইতেছেন। আবার এদিকে উহার কথা গুলিও তিনিই বলিতেছেন। উগ্রশ্রবা যে ভাবে ভারত কহিতেছেন, তাহাতে তিনি যে ব্যাসের কৃত ভারত গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই উপলব্ধি হয় না। যদি কেহ বলেন, সৌতি অভ্যাস বলে বিনা পুস্তকেই ঋষিদের নিকট ব্যাসকৃত ভারত কহিয়াছেন। বিলক্ষণ কথা, তাহা আমরা স্বীকার করিলাম। কিন্তু তাহা বলিলেও শ্রোতৃগণের প্রশ্ন আর তাঁহার উত্তরগুলি যে ব্যাসের রচিত না, তাহা মহাভারতের প্রতি পত্রেই প্রকাশ আছে।

অনন্তর উপরিচরের আখ্যান হইতে বৈশম্পায়ন নামক আর এক বক্তাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যাই হউক, মূলবক্তা সৌতিকেই বলিতে হইবে। আবার অন্য পক্ষে আমরা দেখিতে পাই যে, সৌতি ব্যাস কৃত ভারত কহিতেছেন এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ তাহা শুনিতেছেন, কিন্তু উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিল কে? যদি কেহ বলেন, তৃতীয় আর এক ব্যক্তি। উত্তর কৈ তাঁহার নাম গন্ধও যে আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই না? কেহ বলিবেন, তিনি গ্রন্থে নাম দেন নাই, বিলক্ষণ কথা, গ্রন্থকার গ্রন্থে নাম প্রকাশ নাও করিতে পারেন। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে এই বিশ্বাস অধিকক্ষণ আমাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না।

পাঠক! ভারতীয় পুরাণ, স্মৃ প্রভৃতি সমু-

দায় পুস্তকেই উল্লিখিত বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায় এবং অনেক তর্ক বিতর্কের পরে তৃতীয় আর এক ব্যক্তিকে ঐ সকলের সংগ্রহ-কর্ত্তা কল্পনা না করিলে মন কিছুতেই সুস্থতা লাভ করে না। আবার প্রত্যেক পুস্তকেই সংগ্রহকর্ত্তার নাম না থাকাতে মনের ঐ সুস্থতাও ক্ষণিকমাত্র হইয়া পড়ে। যাঁহারা পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা নিন্দার কার্য্য করেন নাই যে, গালাগালির ভয়ে কোন পুরাণে কোন স্মৃতিতেই কোন সংগ্রহকারই তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। সকল সংগ্রহকারের এই রূপ এক প্রবৃত্তি হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষ যে কালের পুস্তকে তাহার প্রথমাধ্যায়ের প্রায় প্রতি পত্রেই পুস্তক রচয়িতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কালের সংগ্রহকারেরা যে এতদূর উদাসীন ছিলেন যে আপন আপন সংগৃহীত গ্রন্থে কেহই আত্মনাম প্রকাশ করেন নাই, একথা বিশ্বাসের যোগ্য নহে।

বেদের সময়ে লিখন প্রথার সৃষ্টি হইয়া ছিল না, বেদ ঋষিদের মুখে মুখেই থাকিত। তাহারপরে যৎকালে বেদ মুখ পরম্পরা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার, পূর্ব্বেই লিখন প্রথারও সৃষ্টি হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। যাহা মুখ পরম্পরা হইতে আহরণ করিয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাকেই সংগৃহীত কহে। এবং প্রথমতঃ ঐ রূপ স্থলেই সংগ্রহ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছিল। এক পুস্তক হইতে অপর পুস্তকে যাহা যাহা উদ্ধৃত করা যায়, তাহাকে সংগৃহীত বলিবার রীতি পরে হইয়াছে। অমুক ঋষি বেদ সংগ্রহ করিয়াছেন, এই কথায় যদি আমরা পুস্তকাকারে নিবদ্ধকরা না বুঝি, অর্থাৎ এক জনের মুখে বেদ শুনিয়া অপর শিক্ষা করিয়াছেন, এই অর্থ করি, তাহা হইলে বেদব্যাসের সংখ্যা কেবল অষ্টাবিংশতি না হইয়া অসংখ্য হইয়া পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, যাহারা বেদকে শৃঙ্খলা পূর্ব্বক পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই ব্যাস কহে।

পুরাণ সৃষ্টির পূর্ব্বেই যে, বেদসঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। যে সময়ে পুরাণের জন্ম হয় তৎকালে লিখনপ্রথা সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছিল। সে সময়টী যে উন্নতির সময়, তাহা পুরাণ স্মৃতির ভাষার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

অতএব এখন যেমন কবিরা কাগজকলম লইয়া পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন, পুরাণ স্মৃতি রচয়িতা মহর্ষিরাও তাহাই করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন কোন কোন নাটক-প্রণেতা নাটকের প্রথমে সূত্রধর প্রভৃতির কল্পনা করিয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং নাটক খানি যে নিজের প্রণীত; স্বয়ং যে একজন সুলেখক ও বড় লোক, তাহা সর্ব্ব সাধারণকে জানাইয়া থাকেন। আমাদিগের পুরাণ স্মৃতিকার মহর্ষিগণও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পুরাণ প্রভৃতি লিখিতে বসিয়াই প্রথমতঃ কোন যজ্ঞ কি তীর্থ স্থানকে কল্পনা করিয়া লইতেন। তাহার পরে তৎকালে যাঁহারা বিদ্যা প্রভৃতি নানা গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে প্রশ্ন কর্ত্তা, কাহাকে বক্তা ও কাহাকে বা শ্রোতা ইত্যাদি কল্পনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেন। এবং সেই সেই কালে যাহারা ঈশ্বর বা ঈশ্বরজানিত বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের সহিত কোন একরূপ

সম্বন্ধ না রাখিয়াও তাঁহারা গ্রন্থারম্ভ করিতেন না। তাঁহারা যে বিনা কারণে ঐ রূপ করিয়াছেন, তাহা নহে, ইহার বিশিষ্ট কারণ আছে। তাঁহাদের প্রথম কারণ, প্রাচীন সময়ের পশুতুল্য মনুষ্যদিগকে ধর্ম্ম পথে আনা। দ্বিতীয় স্ব প্রণীত গ্রন্থ জনসমাজে বহুদিন বহুল প্রচলিত থাকা। তৃতীয় স্বয়ং যে অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক, তাহাও প্রকাশ থাকা। তাঁহারা কি জন্য গ্রন্থমধ্যে সমুদায় অনৈসর্গিক হাস্য রৌদ্র প্রভৃতি রস যুক্ত প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছেন? না তৎকালের পশুতুল্য মনুষ্যগণ তাহা দ্বারায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাবলীতে যে ধর্ম্ম রূপ অমৃত আছে, তাহাই পান করিবে, এই জন্য। কি জন্য আপনাকে বড়লোক বলিয়া স্বরচিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন? কি জন্য বড় বড় লোকের সহিত স্ব স্ব গ্রন্থের সম্বন্ধে রাখিয়াছেন? না বড় লোকের সকলতাই লোকে অনায়াসে স্বগ্ন পুস্তক গ্রহণ করিয়া থাকে। এই গ্রন্থ যিনি পাঠ করিবেন, যিনি ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিবেন, তাহার চতুঃবর্গ লাভ হইবে। একবার রামনাম লইলে সত সহস্র অশ্বমেধের ফল হইবে, একথা কেন তাঁহাদের গ্রন্থে লক্ষিত হয়? না অল্প বুদ্ধিদের প্রবৃত্তি জন্য। অল্প বুদ্ধিদের জন্যই তাঁহারা গ্রন্থে ঈশ্বরের রূপকল্পনা ও সুন্দর সুন্দর নায়ক নায়িকার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। লোকের প্রবৃত্তির জন্য যে কেবল স্মৃতি, পুরাণকারেরাই উল্লিখিত পথাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, লোকের প্রবৃত্তি জন্য চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থকারেরাও গ্রন্থারম্ভে ঐ পথের পথিক হইয়াছেন।

পাটক! স্বয়ং ব্যাসই ঐ রূপ করিয়া মহাভারত আরম্ভ করিয়াছিলেন। এবং লোকের প্রবৃত্তি জন্য তিনিই সব করিয়া গিয়াছেন। এমন বড় পণ্ডিত বেদব্যাস লিখিতে জানিতেন না, গণেশ তাহার লেখক হইলেন, একথা কোন কাজের না। ব্যাস যে ভারতের সূচনা সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন সে কেবল তাঁহার কল্পিত সৌতির প্রতি লোকের যথার্থ জ্ঞান জন্য। স্বয়ং আপনার ও স্ব প্রণীত গ্রন্থের প্রশংসা করিতেছেন একথা কেহ বুঝিতে না পারে, মহাভারতে তিনি এরূপ অনেক শ্লোকের সৃষ্টি করিয়াছেন। মহাভারতের আরম্ভ সম্বন্ধে অন্যান্য লোকের মতভেদ হইতে পারে, কিন্তু স্বয়ং ব্যাসের তাহা কিরূপে হইবে? অতএব সৌতিই যেন সত্য সত্যই ব্যাসকৃত মহাভারত ও আর সমস্ত গুণের কথা কহিতেছেন, ইহাই সাধারণে প্রতিপন্ন করা 'মন্বাধি ভারত' মিত্যাদি বচনের প্রধান উদ্দেশ্য। (ক্রমশঃ)

লোকসংখ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

লোকবৃদ্ধি নিবন্ধন অন্নাভাব হইতে কি কি অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, গতবারে তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করিয়াছি, এবারে অবশিষ্ট কয়টীর উল্লেখ করিতেছি।

৫ম। যে দেশে লোকে ক্ষুধার জ্বালায় পাগল হইয়া বেড়ায়, তথায় রাজশাসন উত্তম রূপে চলিতে পারে না। লোকের সত্বাদি বজায় রাখিবার জন্য রাজা যে সকল আইন করিবেন, দরিদ্র লোকে উদরান্নের জন্য তাহা লঙ্ঘন করিবে, সুতরাং শাসন কার্য্যের পদে পদেই বিশৃঙ্খল ঘটবার সম্ভাবনা। অপরাধ সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, লোকে দণ্ডাধীন থাকিবে না, রাজকোষ অপরাধীর পালনে অক্ষম হইবে এবং বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া মহাগোলযোগ বাধাইয়া দিবে, তাহাতে সন্দেহ কি?

৬ষ্ঠ। অধীনতা। লোকাধিক্য হইলে যুদ্ধাদির সুবিধা হয় সত্য, কিন্তু যাহাদিগের উদরে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই তাহারা, কিসের বলে যুদ্ধ করিবে? অন্ন উপার্জ্জনে সময় অতিবাহিত হইলে যুদ্ধ কৌশল শিখিবার অবসর অতি অল্প থাকে এবং দুর্ব্বল ও পীড়িত লোক সহজেই পরাজিত হইয়া যায়। আবার যদি আক্রমণকারীগণ তাহাদিগকে প্রচুর আহারের প্রলোভন দেখাইতে পারে, তাহা হইলে ইচ্ছাপূর্ব্বকই লোকে তাহাদিগের নিকট স্বাধীনতা বিক্রয় করিবে। দেশের স্বাধীনতা ভিন্ন সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও দরিদ্র ও দুর্ব্বল লোকে বজায় রাখিতে সমর্থ নহে।

৭ম। অল্পাহার বা উপবাস। দেখান গিয়াছে যে, লোকাধিক্য হেতু দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং পরিশ্রমের মূল্য অল্প হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে দরিদ্র লোকে কৃষিজীবী হইতে পারে না, তাহাও দেখান গিয়াছে। স্বয়ং পৃথিবী হইতে শস্য উৎপাদন করিতে না পারিলে পরিশ্রম করিয়া অতি অল্প মাত্র অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজ পরিবারবর্গের উদর পূর্ণ করিতে হইলে, কাজে কাজেই কুলান হয় না, সুতরাং সকলকেই অতি অল্প মাত্রায় আহার করিতে হয় এবং কোন কোন দিন বা দিবসের কোন কোন বেলা উপবাস করিয়াও থাকিতে হয়।

৮ম। অনুপযুক্ত আহার। মনুষ্যের পোষণোপযোগী সামগ্রী কোন দ্রব্যে অধিক কোন দ্রব্যে অল্প আছে। যাহা অধিক পুষ্টি-দায়ক ও উপকারী তাহার মূল্য অধিক, কেন না তাহা অল্প হইলেই চলিবে এবং তাহা অধিক অসার সামগ্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহা-দিগের উপার্জ্জন অল্প, তাহাদিগকে অল্প আহার করিতে হইবে। অল্পাহার সারবান হইলেও তাহাতে উদর জ্বালা নিবারিত হয় না, সুতরাং যাহার একটী মাত্র পয়সা আছে, সে মুড়ী না খাইয়া আধখানি সন্দেশ খাইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু মুড়ী শরীর পোষণের অনুপযুক্ত। এই রূপে উপার্জ্জন অল্প হইলে, অর্থাৎ লোকাধিক্য জন্মিলে, কাজে কাজেই লোকে অযথা সামগ্রী আহার ও ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়।

৯ম। ব্যবহার্য্য দ্রব্যের অপকৃষ্টতা।

বলা গিয়াছে যে, যোগান অল্প কিন্তু প্রয়োজন অধিক হইলেই দ্রব্য মহর্ঘা হয়। দ্রব্য মহার্ঘা হইলে দ্রব্য সকল কৃত্রিম করিবার অর্থাৎ উৎকৃষ্ট দ্রব্যে অপকৃষ্ট দ্রব্য মিশ্রিত করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, কেন না তাহা হইলে বিক্রেতা অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে। এইরূপ প্রায় সকল দ্রব্যেই খাদ ও ভেল চলিয়া থাকে, এবং অপকৃষ্ট দ্রব্য সকল ব্যবহার করিয়া লোকের অযথা অর্থনাশ হইয়া যায় এবং তাহার শরীরের পক্ষে ও বিস্তর অপকার ঘটে।

১০ম। মদ্য প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন। কেহ কেহ বলেন যে, লোকে প্রচুর আহার পাইলে মাদক দ্রব্যাদি সেবন করে না। উদর জ্বলিতে থাকিলে লোকে মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে। ইচ্ছা না থাকিলেও লোকে অন্নাভাবে ইহা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পর স্বভাব রূপে পরিণত হয়। মদ্যাদি পান হইতে যে কি অনিষ্ট জন্মে, তাহা সকলেই অবগত আছেন, সুতরাং লোকাধিক্যকেই সেই সকল শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক ব্যভিচারের মূল বলিতে হইবে।

১১শ। অযথা স্থানে বাস। লোক অধিক হইলে সকলেই উপযুক্ত স্থান কোথায় পাইবে? বিস্তর লোক দূষিত, মল সংযুক্ত ও অপরিষ্কার স্থান ভিন্ন উত্তম স্থান পাইবে না; কেন না উত্তম স্থান সকলেই চাহে এবং তথায় বাস করা ব্যয়সাধ্য। দরিদ্র পল্লী অর্থ ব্যয় করিয়া বাসস্থান, পথ, ঘাট ও লোকাধিক্যবশতঃ মলমূত্র জঞ্জাল প্রভৃতি পরিষ্কৃত করিতে সক্ষম হয় না। সকল দেশেই দরিদ্র পল্লী অতি কদাকার এবং বাসের অনুপযুক্ত। তাহার উপর রাজপুরুষদিগের সে দিকে দৃষ্টি অল্প, তাঁহারা তৈলাক্ত মস্তক নহিলে তৈল প্রদান করেন না। পরন্তু দরিদ্র পল্লী হইতে রাজকরও অতি সামান্য মাত্র আদায় হয়।

১২শ। বাস গৃহের অনুপযুক্ততা। লোকাধিক্য হইতে অর্থাভাব জন্মে। অতি সামান্য উপার্জ্জন হইলে বাস গৃহের প্রতি লোকে মনোযোগী হইতে পারে না এবং স্বাস্থ্যজনক আবাস গৃহের ব্যয় ও কুলান করিতে পারে না, সুতরাং গৃহ শুষ্ক, বায়ু সঞ্চালক দ্বার জানালা বিশিষ্ট, পরিমাণ অনুযায়ী উচ্চ ইত্যাদি প্রয়োজন সংসাধনোপযোগী হয় না।

১৩শ। বস্ত্রাদি অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রীর অভাব অনুপযুক্ততা। যৎসামান্য আহার করিয়া কিছু উদ্বৃত্ত না হইলে আর ইহাদিগের অভাব দূর হয় না। কিন্তু দরিদ্র লোকের আহারই চলা ভার, সুতরাং উপযুক্ত বস্ত্রাদি অন্যান্য শীত বর্ষা নিবারক দ্রব্য তাহাদিগের অনেকেই চক্ষে দেখিতে পায় না, কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ জন্য একটু গলিত পরিত্যক্ত বস্ত্র সংগ্রহ করে। যাহারা যৎসামান্য আহার করিয়া কিছু সঞ্চয় করিতে পারে, তাহারা যে সকল বস্ত্র ও শয্যা প্রভৃতি দ্রব্য সকল সংগ্রহ করে, তাহা অতি অনুপযুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর।

১৪শ। জনতা বা একত্র বহু লোকের বাস। এক স্থানে বহুলোক একত্র হইলে শীঘ্রই সে স্থান দূষিত হইয়া উঠে। দূষিত বায়ু ও বহুজন পরিত্যক্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করা আবশ্যক, কিন্তু দরিদ্র কুটীরে তাহা ঘটিয়া উঠে না। এক একটী ক্ষুদ্র বাটীতে ও গৃহে একত্রে বহুলোকে বাস করিয়া থাকে। যে গৃহে দুই জন মাত্র থাকিতে

পারে তথায় আট দশ জন জনে একত্রে বাস করে।

১৫ শ। যথেচ্ছ কর্ম্ম গ্রহণ। লোকাধিক্য হইলে পরিশ্রমের আধিক্য হয়, সুতরাং সকলে কর্ম্ম পায় না। অতএব অল্পবেতনেও লোকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। যে কর্ম্ম যাহার উপযোগী নহে (সকল কর্ম্মই কিছু প্রত্যেক লোকের উপযোগী নহে) তাহাকে উদরের জন্য তাহাও করিতে হয়; কেন না তাহার উপযোগী কর্ম্ম সকল সময়ে কিম্বা আদৌ মিলে না এবং অনুপযুক্ত ও অস্বাস্থ্যকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে অন্ন মিলে না।

১৬ শ। অতিরিক্ত পরিশ্রম। পরিশ্রম সচ্ছল ও অল্পমূল্য হইলে কাজেই উপার্জ্জন অল্প হইবে। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য লোককে অতিরিক্ত, অর্থাৎ যে পরিশ্রম শরীর ও মনের ক্ষতিকারক নহে, তাহার অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম না করিলে সকল বিষয়ের অকুলান হইবে এবং আহারও পর্য্যন্ত মিলিবে না। ইহার উপর আবার অসময়েও অনুপযুক্ত আহার করিতে হইবে।

১৭ শ। অযথা সময়ে অযথা কর্ম্ম গ্রহণ। একেত লোককে শ্রমবাহুল্য প্রযুক্ত অনুপযুক্ত কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহার উপর আবার অযথা সময়েও লোককে কর্ম্ম করিতে হয়। যে সময়ে লোকে পীড়িত ও অসক্ত হয়, সে সময়েও তাহাকে কর্ম্ম করিতে যাইতে হয়। অতি শিশু ও অতি বৃদ্ধ হইলেও পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য তাহাদিগকে অসময়েও কর্ম্ম করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হয়।

১৮ শ। অযথা ও অসময় শিক্ষা। যে শিক্ষা যাহার উপযোগী নহে, তাহাকে অন্নের জন্য তাহা শিক্ষা করিতে হইতেছে। অর্থোপার্জ্জনের জন্য অতি অল্প বয়স্ক বালককে নানাবিধ বিষয় শিক্ষা করিয়া কর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহাতে শরীর ও মনের নিপাত সাধিত হইয়া থাকে। সিভিলিয়ানদলের মস্তিষ্কের পীড়া ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত; অন্যান্য ক্ষুদ্রলোকের কথা বলিলাম না।

১৯ শ। শিশু ত্যাগ ও বধ। যদিও ভারতের মাতাগণ এখনও ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের ন্যায় শিশুবধ করে না, তথাপি বিস্তর শুনা গিয়াছে যে, অন্নাভাবে অনেক দরিদ্র লোক ঔষধাদির দ্বারা গর্ভের অনুৎপাদন সম্পাদন করিয়া থাকে এবং শিশু সকলকে এমন অবস্থায় পরিত্যাগ করে যে, দয়াবান্ ও স্নেহপরতন্ত্র লোকের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদিগের জীবন সংশয় হইয়া থাকে। সভ্য দেশে শিশুবধের সংখ্যা বিস্তর এবং পরিত্যক্ত সন্তানও এত অধিক যে, তাহাদিগকে পালন করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে অসভ্যেরা অক্ষম বৃদ্ধদিগকে বধ করিত! অনেক সময়ে বিস্তর লোকে কর্ম্ম দোষে মৃত শিশু প্রসব করে, স্থানের অনুপযুক্ততা হেতু শিশুগণ জন্মিয়া শীঘ্রই মরিয়া যায়। বিস্তর জননীও এই সময়ে প্রাণত্যাগ করে।

২০ শ। ঘন ঘন সন্তান প্রসব করিয়া স্ত্রীলোকের পীড়া ও বলক্ষয় হইয়া থাকে, এবং বিস্তর সময়ে তাহারা উপার্জ্জনে ও গৃহ কর্ম্মে অক্ষম হয়। এই সময়ের জন্য যাহাদিগের সঙ্গতি আছে, তাহারা বেতন দিয়া কর্ম্ম কাজ করিবার জন্য অন্য লোক রাখে, কিন্তু তথাপি অতিরিক্ত সন্তান প্রসব করিতে ও অতিরিক্ত স্তনদুগ্ধ বাহির হইয়া

যাওয়াতে শরীরের যে ক্ষতি হয় না, তাহা নহে। অক্ষম লোকে পূর্ণ গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের অনতিবিলম্বেই কার্য্য করিতে নিযুক্ত হওয়াতে নানাবিধ পীড়াগ্রস্ত হয় ও সন্তানদিগেরও পীড়া উৎপন্ন করিয়া দেয়।

বাহুল্যভয়ে আর অধিক প্রকার অনিষ্টের উল্লেখ করিলাম না। বোধ হয় ইহাতে লোকাধিক্যের দোষ সকল এক প্রকার বুঝাইতে সক্ষম হইয়া থাকিব। একটী বৃক্ষ হইতে অসংখ্য বীজ পতিত হইয়া অসংখ্য বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে যেমন পরস্পর সংঘর্ষণে পীড়িত ও রুগ্ন হয় এবং আলোক, মৃত্তিকা ও রসাভাবে মরিয়া যায়, তদ্রূপ নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক কারণে মনুস্যদিগেরও নিপাত সাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত সকলপ্রকার অনিষ্টই শরীর নাশক। ইহার উপর অর্থাভাব জনিত নৈরাশ্য, দুঃখ, সন্তাপ, আত্মগ্লানি প্রভৃতি মানসিক বিকার ও শরীরের উপর তাহাদিগের অত্যাচারের বিষয় যোগ করিলে লোকাধিক্য আরও ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই।

সকল প্রকার অনিষ্ট হইতেই প্রত্যহ বিস্তর বিস্তর লোক পীড়িত, দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। সভ্যতা বৃদ্ধি হওয়াতে যদিও তাহারা একেবারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে না, এবং দুর্ভিক্ষও মহামারীতে একেবারে সমগ্র দেশ মরু ভূমিতে পরিণত হইতেছে না, তথাপি প্রত্যহ যে সকল মৃত্যু ঘটিতেছে, তাহা যে লোকাধিক্যের অনিষ্ট জন্য, তাহা কে অস্বীকার করিবে? জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা যে অধিক, এই সকলই তাহার কারণ। কিন্তু এ প্রকারে মরিবার জন্য এবং যত দিন জীবিত থাকিবে ততদিন শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ভোগ করিবার জন্য যাহারা জন্মিবে, তাহাদিগের জন্মিয়া ফল কি? তাহাদিগের জন্ম নিজের অহিত ও অন্যের অনর্থের জন্য—এই জন্য আমরা বলি যে, এই সকল লোকের জন্মিবারই কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে এ প্রকারে আজীবন যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য যে লোকাধিক্য, তাহা জ্ঞান ও বিজ্ঞান সাহায্যে নিবারিত হইতে পারে কি না দেখা যাউক। অবশ্যই ইহার প্রতিকার আবশ্যক, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন্ প্রকার প্রতিকার সঙ্গত, তাহা বিবেচনা করা যাউক।

লোকাধিক্যের প্রতিকার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ—, যে সকল লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের আধিক্যবশতঃ অনিষ্ট নিবারণ, এবং দ্বিতীয়তঃ—যাহাতে অধিক লোক জন্মিতে না পারে, তাহার উপায় অবলম্বন। প্রথমটী লোকাধিক্যনিবারণের গৌণ এবং দ্বিতীয়টী প্রত্যক্ষ উপায়।

গৌণ উপায়। যাহারাজন্মগ্রহণ করিয়াছে, অপ্রাচুর্য্য হেতু যাহাতে তাহারা দারিদ্র্যের হস্তে পতিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করাই ইহার উদ্দেশ্য। যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন যাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অনিষ্টপাত না হয়, এবং তজ্জনিত পীড়াদিগ্রস্ত হইয়া যাহাতে অকালে নিধনপ্রাপ্ত না হয়, লোকের নিজহস্তের মধ্যে এমন সকল উপায় আছে কি না প্রথমে দেখা যাউক। লোক বৃদ্ধি যখন নৈসর্গিক অনৈসর্গিক উভয়বিধ নিয়মেরই অধীন, তখন লোকহ্রাসও ঐ নিয়মের বিস্তর পরিমাণে অধীন বলিতে হইবে। যাহা হউক, মনুষ্য সংখ্যা হ্রাস না করিয়া উপস্থিত সংখ্যায় কি উপায়ে সুখসৌকর্য্য সাধন

করা যাইতে পারে? নিম্নে কয়েক প্রকার কথা উল্লিখিত হইল।

১ম। কৃষিকার্য্যের উন্নতি। দেখা গিয়াছে, কৃষিকার্য্যের উন্নতি দ্বারা পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া জগতে বিখ্যাত, কিন্তু কৃষিকার্য্যের কিছুমাত্র উন্নতি নাই। মন্নুর সময়ে যে সকল যন্ত্রদ্বারা, যত সময়ে, যে প্রণালীতে শস্য উৎপন্ন হইত এখনও সেই যন্ত্র দ্বারা, তত সময়ে, সেই প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি ভূমিতে সার দিয়া, উত্তম উত্তম যন্ত্র দ্বারা, উত্তম শস্য রোপণ করিয়া, অল্প সময়ে অতি উৎকৃষ্ট শস্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদি কৃষক সম্প্রদায় কিঞ্চিৎ মূলধন সংগ্রহ করিয়া ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিতে যত্নবান হয়, এবং উন্নত প্রণালীতে উৎকৃষ্ট জাতীয় বীজ রোপণ করে, তাহা হইলে শস্য বৃদ্ধি হইলে মূল্য হ্রাস হইবে। কৃষক অধিক শস্য বিক্রয় করিয়া অধিক অর্থলাভ করিয়া দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হইতে পারিবে এবং সাধারণের পক্ষেও শস্যের মূল্য হ্রাস হইলে সকলেই অল্প ব্যয়ে অধিক শস্য পাইয়া উপার্জ্জিত অর্থের কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে বা সেই মূল্যে অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রী সকল ক্রয় করিয়া কিয়ৎপরিমাণে অভাব মোচন করিতে পারিবে। দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ধনী সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য যে, কৃষকদিগকে কৃষিবিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা দেন, জমিদারগণ আপন আপন প্রজাদিগের কিছু দিনের খাজনা মাপ করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিজনক যন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া দেন এবং যাহাতে তাহারা জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে ও উত্তম উত্তম শস্য রোপণ করে, সে বিষয়ে যত্নবান থাকেন। এ সকল বিষয়ে আর শাসন কর্ত্তাদিগের উপর নির্ভর করিবার সময় নাই। ইহাতে লাভ নাই বরং আপাততঃ কিঞ্চিৎ স্বার্থত্যাগ ও ক্ষতি আছে।

২য়। পতিত জমি ও আরণ্য ভূমি হইতে শস্য উৎপন্ন করিবার উপায়। যদিও বিস্তর পতিত জমি অধিকৃত হইয়াছে, এবং তাহাতে চাষ আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি অনেক পতিত জমি আছে যাহাতে চাষ করিলে বিস্তর শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। অনেক জমিদারদিগের নিকট হইতে অবগত হওয়া যায় এবং সময়ে সময়ে দেখিতেও পাওয়া যায় যে, সমস্ত জমিতেই কৃষিকার্য্য চলিতেছে না। ইহা ভিন্ন বিস্তর স্থান অরণ্যে পরিণত হইয়া আছে এবং অনেক স্থান জলা ও বিল হইয়া পড়িয়া আছে। এই সকল ভূমিতে প্রথমে আবাদ করা কিছু ব্যয়সাধ্য বটে, কিন্তু পরে যে তাহা আয়জনক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাদিগের কর অতি সামান্য হইলেও, আমরা বলি জমিদারগণ বিনা করে কিছু কাল প্রজাবিলি করিয়া জমি হইতে আয় হইলে অল্প অল্প করিয়া কর লইলে মঙ্গল হয়। চিরকাল পতিত থাকা অপেক্ষা কিছু দিনের জন্য কর ছাড়িয়া দেওয়া এবং প্রজাদিগকে অর্থ সাহায্য করা আমাদিগের বিবেচনায় ক্ষতিকর বলিয়া বোধ হয় না। আর এক কথা এই যে, সকল ভূমিতেই ধান্য বা গম রোপণ করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই—যে জমি হইতে যাহা উত্তম উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাতে তাহাই রোপণ করা কর্ত্তব্য।

৩য়। বহির্বাণিজ্য বন্ধ করা। যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহা সমস্ত দেশে থাকা কর্ত্তব্য। বাণিজ্য সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধিজনক হইলেও আমাদিগের দেশে যাহা উদ্বৃত্ত হয় না, তাহা

বাহির হইয়া যাওয়া উচিত নহে। ভূমির কর দিবার জন্য এবং মহার্ঘ্য হেতু কৃষকেরা লোভে পড়িয়া আপনাদিগের আহার সঞ্চয় না করিয়াও শস্য বিক্রয় করিয়া থাকে। ভবিষ্যৎ বিপদের জন্য তাহারা কিছুই সঞ্চয় করে না, প্রায় সমস্তই মহাজনদিগকে বিক্রয় করে। প্রত্যহ যে লক্ষ লক্ষ মন শস্য বিদেশে যাইতেছে, তাহা যদি দেশে থাকে, তাহা হইলে কি এত শীঘ্র শীঘ্র দুর্ভিক্ষ হয়, না লোকে চিরদিন অনাহারে হাহাকার করে? ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধানদেশ, যদি অনাবৃষ্টি বশতঃ এক বৎসর শস্য না জন্মে, তাহা হইলেই সঞ্চিত শস্যের অভাবে মরিতে হইবে। রাজপুরুষগণ স্থলপথে ও জলপথে গমনাগমন ও ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সমস্ত শস্য দেশের বাহির হইয়া গেলে কি লইয়া ব্যবসায় চলিবে, বিপদের সময় এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যে শস্য আনিবার জন্য রেলওয়ে প্রভৃতি হইতেছে, সে শস্য কোথায়? রাজপুরুষদিগের এক্ষণে কর্ত্তব্য যে, বহির্বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেন এবং যাহাতে অন্তর্বাণিজ্য উত্তমরূপ চলে, তাহার উপায় করিয়া দেশকে রক্ষা করেন। বাণিজ্য সভ্যতার অঙ্গ হইলেও আমরা এক্ষণে শস্য ছাড়িয়া দিতে পারি না—যাহা সঞ্চিত হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়, তাহা ছাড়িব কিন্তু না খাইয়া সভ্যতা চাহি না। যদি এক প্রকার খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অন্য খাদ্য দ্রব্য পাই, তাহা হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমার চাউল লইয়া তুমি কাচের, কাষ্ঠের, চামড়ার বা কাগজের খেলনা দিবে, ইহাতে পেট ভরে কৈ?

৪র্থ। পণ্য দ্রব্যের উন্নতি করা আবশ্যক। কৃতবিদ্য ও ধনী সম্প্রদায় যেমন কৃষিকর্ম্মে অমনোযোগী, ব্যবসায়েও তদ্রূপ। এখন আর কেবল দাসত্ব করিবার জন্য লালায়িত হইলে চলিবে না, তাহাতে আয়শূন্য উদর পূরিবে না; কৃষিবাণিজ্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। প্রায় সমস্ত ব্যবহার্য্য দ্রব্যই বিলাতী—দেশী দ্রব্য আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশীয় মধ্যে কেবল আমরা নিজে দেশী বলিয়া ঘৃণিত ও পদদলিত! দেশীয় দ্রব্যের হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি দেখা যায় না, দেশীয় দ্রব্যে কাহারও যত্ন নাই, সুতরাং পণ্য দ্রব্য হইতে আর অধিক আয় হয় না। কিন্তু ইহা যে কত দূর অনিষ্টের মূল, তাহা চিন্তাশীল এবং শূন্য হৃদয় উভয়েই অনুভব করিতে সক্ষম। এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতির প্রয়োজন এবং শাসন কর্ত্তাদিগেরও প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা দেশীয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে না লইয়া নামে মাত্র কিঞ্চিৎ দেশীয় দ্রব্য লইতেছেন। যাহা হউক, সাধারণের প্রশ্রয় লাভ হইলেও যথেষ্ট হয়। দেশীয় দ্রব্য কম মূল্যে হইলে সকলেই তাহা ব্যবহার করিবে, তাহার পর উদ্বৃত্ত হইলে দেশান্তরে বিক্রয় করিলেও চলিবে, তাহাতে অলাভ হইবার আশঙ্কা নাই। এক্ষণে যাহার যেমন সাধ্য, সেই অনুসারে পণ্য দ্রব্যের উন্নতি সাধন করা এবং দেশী দ্রব্য ব্যবহার করা যে নিতান্ত কর্ত্তব্য, বোধ হয় তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ইহাতে আয় অধিক ও ব্যয় অল্প হইবার সম্ভাবনা আছে, এবং বিস্তর শ্রমজীবী লোকও প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইতে পারিবে। কৃতবিদ্য ও ধনী সম্প্রদায় এ বিষয়ে মনোযোগ করিবেন কি? তাঁহারা ও অপর সাধারণে মনোযোগ না করিলে আর দারিদ্র্য ঘুচে না—এবং দেশও রক্ষা পায় না।

৫ম। অল্পজনাকীর্ণ স্থানে বাস। পুরাতন বিধি অনুসারে পৈতৃক বাস ত্যাগ করা দোষের বিষয় হইতে পারে, কেন না তখন দেশে লোকাধিক্যের প্রয়োজন ছিল। আদিম নিবাসীদিগের সহিত এক্ষণে আর যুদ্ধাদির প্রয়োজন নাই এবং লোকেরও অপ্রতুল নাই। একত্রে যেমন অধিক বৃক্ষ জন্মিতে ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না, তদ্রূপ বহুলোক একত্র বাস করিলে ক্ষয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যথায় স্থান প্রচুর এবং ক্ষেত্রে ও তাহার কর মহার্ঘ্য নহে, তথায় গিয়া বাস করা কর্ত্তব্য হইয়াছে। তথায় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থাকাতে বহুপরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইতে পারিবে এবং নূতন স্থানে অন্যান্য বিক্রেয় সামগ্রীর প্রয়োজন বশতঃ তদুপায় অবলম্বন করিলেও চলিবে। এতদ্ভিন্ন লোকের অল্পতা নিবন্ধন শ্রমও নিতান্ত সচ্ছল ও অল্প মূল্য হইবে না। ভারতবর্ষের বাহিরে গিয়া যাহারা বাস করিতে সমর্থ, অর্থাৎ এক্ষণে কিঞ্চিৎ ধন সম্পত্তি আছে, পথের ব্যয় কুলানের অভাব নাই এবং নূতন স্থানে গিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে সক্ষম, তাহারা শ্রীবৃদ্ধি আশয়ে তথায় গমন করিলে দেশে লোকের সংখ্যা হ্রাস হইবে এবং দরিদ্রগণ অন্তরাল-দূরিত ক্ষুধা বৃক্ষের ন্যায় ক্রমে বর্দ্ধিত ও শ্রীসম্পন্ন হইতে সক্ষম হইবে। দরিদ্রদিগের পক্ষেও কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া স্থানান্তরে গমন করা শ্রেয়, কেন না দেশে মৃত্যু, কষ্ট ও অন্নাভাব যেমন নিশ্চয়, জনহীন বা অল্পজনাকীর্ণ স্থানে তদ্রূপ নহে। উপনিবেশ সংস্থাপন করিলে তাহারা যে পর হইয়া যাইবে, সে আশঙ্কা করা বৃথা। উপনিবেশ দ্বারা আমেরিকা বিস্তর উন্নত হইয়াছে এবং নিতান্ত পীড়াপীড়ি না করিলে আজি ইংলণ্ডের যে কতদূর বল ও জ্ঞান বৃদ্ধি হইত, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে সক্ষম। প্রচলিত কুলী-চালানের আমরা নিন্দা করি না, তবে তাহাদিগের পক্ষে যে সকল নিয়ম চালান হইয়া থাকে, তাহার কঠোরত্ব লাঘব হওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে পশুর ন্যায় ব্যবহার না করিয়া মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং তাহাদিগের পরিশ্রমের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কিঞ্চিৎ মূল ধন দিয়া কৃষি বা অন্য প্রকার কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিলে সকল প্রকারে মঙ্গল হয়।

৬ষ্ঠ। বিলাস ও তদুপযোগী দ্রব্য পরিত্যাগ। পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের আয় যে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আয় বৃদ্ধির সঙ্গে কষ্ট, হাহাকার ও অন্নাভাবের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। ইহার এক কারণ, শ্রম সচ্ছলতা ও দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং অপর কারণ, অনিষ্টকারী পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ বিলাসেচ্ছার বৃদ্ধি। পূর্ব্বে অনেকে অতি অল্প আয়ে ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, আজ তদপেক্ষা অধিক আয় সত্বেও লোকের উদর পূর্ণ হয় না। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্বেকার লোকেরা বিলাসপ্রিয় ছিলেন না। তাঁহারা মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া দান ধ্যান ক্রিয়া কাণ্ড করিতেন; এখনকার মত অসার বাবু সাজিতে বা গৃহিণীগণকে বিবি সাজাইতে জানিতেন না। কি ছোট, কি বড়, সকলেরই এক্ষণে চাল চলন বৃদ্ধি হইয়াছে, অতি সামান্য উপার্জ্জন করে এমন কৃষকও ভাল ধুতি, জুতা, জামা, ছাতা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু পেটে ভাল করিয়া

খাইতে পায় না। যাহাদিগের আয় অল্প, তাহারা যেমন মদ্যপায়ী, যাহাদিগের আয় অধিক তাহারা তেমন নহে। এক্ষণে পুরুষের বিলাসের জন্য বৎসরে এক শত টাকা টাকা লাগে এক জনকে বলাতে, তিনি সেই পুরুষকে কুলীর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, গড়ে প্রতি সভ্যপুরুষের বিলাস দ্রব্যে বৎসরে একশত টাকার কম লাগে না। স্ত্রীলোকের বিলাসের কথা বলিতে চাহি না, অনেকে আমাদিগের উপর বিরক্ত হইতে পারেন। তথাপি দেশের মঙ্গলের জন্য একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না—সেটী তাঁহাদিগের অলঙ্কার, বেশবিন্যাস, গন্ধ দ্রব্য ও পশমের কথা। ভরসা করি, আমাদিগের উপর কেহ বিরক্ত না হইয়া বিলাসের উপকারিতা ও তন্নিবন্ধন দেশের দুর্গতির বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিবেন। মহিলাগণ! আজ আপনাদিগের বিলাসের দিন নহে—কি প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বামীর দুর্গতি, পরিবারের কষ্ট ও সন্তানবর্গের অভাব মোচন করিতে পারেন, তাহাই দেখিবার দিন। ●

৭ম। স্ত্রীলোকের অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা। এ রীতি আমাদিগের দেশে ছিল না এবং এক্ষণেও, কয়েক জন ইতর জাতির মধ্যে ব্যতীত, নাই বলিলেই হয়। কিন্তু রীতি প্রবর্ত্তিত না হইলে আর চলে কৈ? একা পুরুষ সমস্ত পরিবার প্রতিপালন করিতে সক্ষম কোথায়? স্ত্রী জাতির অন্তঃপুর বাস, এ পক্ষে বিষম অন্তরায়। যাহাতে এ অন্তরায় আর না থাকে, ক্রমে ক্রমে সমাজসংস্কারকদিগের দেখা কর্ত্তব্য। কিঞ্চিৎ বল, সাহস ও ন্যায়পরতার বৃদ্ধি হইলে কালে স্ত্রীলোকের অর্থোপার্জ্জন আশ্চর্য্য কথা থাকিবে না। যাহা হউক, আমরা অন্তঃপুর বাস-প্রথা এক দিক তুলিয়া দিয়া স্ত্রীলোকদিগকে কর্ম্ম স্থানে যাইতে বলিতেছি না। আমরা বলি, অন্তঃপুরের প্রথা একেবারে অতিক্রম না করিয়া যে সকল শিক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা-জনক সেই সকল শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহাতে অল্পে অল্পে তাহাদিগের উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার হইতে পারে, তাহারও উপায় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ঢাকা, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানের স্ত্রীলোকেরা গৃহে বসিয়া বস্ত্রে সূচীকার কার্য্য করিয়া থাকে—আমরা ইহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। অনেক স্ত্রীলোক জরির ও কাঠের মালা প্রস্তুত করে, কেহ হার বুনিয়া থাকে, কেহ সূতা প্রস্তুত করে, কেহ জামা সেলাই করিয়া সংসারের উপকার করে—যে প্রকারেই হউক, উপার্জ্জন ও ব্যয় সংক্ষেপ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু এই সকল সামান্য কার্য্যে অধিক উপার্জ্জন হইবে না। আমরা বলি, স্ত্রী চিকিৎসিকা হইলে উপার্জ্জন হইবে। সূচীকার কার্য্যের দোকানে স্ত্রীলোকের অন্ন হইতে পারে, তাঁহারা স্ত্রী বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হইতে পারেন এবং তাঁহাদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান হইলে অনেক কর্ম্ম স্থানে তাঁহারা পদ গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবেন। প্রার্থনা করি, সমাজ সংস্কারক মহাশয়েরা স্ত্রীলোকের উপার্জ্জনের পথ করিয়া দিবেন এবং মহিলাগণও পুরুষদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উপার্জ্জন করিতে শিক্ষা করিবেন।

৮ম। সঙ্গতিহীন লোকের অবিবাহিত জীবন। সংসার প্রতিপালন করা স্ত্রী পুরুষ

উভয়ের কার্য্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য—পুরুষ অধিক শ্রমক্ষম ও তাহার উপায় বাহুল্য প্রযুক্ত অধিক ভার বহন করিবে, স্ত্রীলোক না হয় অল্প ভার বহন করিবে, কিন্তু উভয়েরই মিলিত হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। যত দিন না উভয়েই উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে, এবং কিঞ্চিৎ অর্থ সংগৃহীত না হইবে, তত দিন কাহারও বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। বিবাহ করিয়া গলগ্রহ করা এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি করা বোধ হয় কাহারও অনুমোদিত নহে। যদি নিজে উপার্জ্জন করিতে না পারি, তাহা-হইলে স্বামীর গলগ্রহ হইবার জন্য বিবাহ করিতে আমরা স্ত্রীজাতিকে নিষেধ করি এবং যে পুরুষ স্ত্রীকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম নহে, তাহাকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দিই না। এরূপ অবস্থায় বিবাহ করা কর্ত্তব্য যে, একে অন্যের উপর কোন প্রকারেই নির্ভর করিবে না এবং স্ত্রী উপার্জ্জনাক্ষম না হইলেও পুরুষ তাহাকে প্রতিপালন করিতে কোন প্রকার কষ্টে পড়িবে না। কেবল পরিবারের ভরণপোষণ কিসে হইবে, এই ভাবনায় অনেকে অসহ্য যন্ত্রণা সহিয়া, সাহস, ধর্ম্ম ও ন্যায়পরতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিস্তর অকার্য্য করিতে বাধ্য ও কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। অনেক সভ্যজাতি সঙ্গতি না করিয়া বিবাহ করে না, এবং তাহাদিগের বিবাহে একে অন্যের গলগ্রহ হইয়াও জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে না। আমাদিগের দেশেও এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য, এমন কি, সামান্য লোকের বিবাহ কিছুকাল বন্ধ থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই—একটু চরিত্রদোষ বৃদ্ধি হইবে মাত্র। কিন্তু লোকাধিক্যের অনিষ্টপাতের সহিত তাহার তুলনায় প্রধান কোন্‌টী? সমাজ-বন্ধন দৃঢ় হইলে বোধ হয় চরিত্রদোষ অধিক ক্ষতি করিতে সমর্থ হইবে না। আর যদি ক্ষতিকারক বলিয়াই তখন বিবেচিত হয়, তাহারও কি উপায়ান্তর নাই?

৯ ম। আহার বৃদ্ধি। যাহাতে শস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, সে বিষয় পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, পৃথিবীর শস্যের উপর নির্ভর না করিয়া কেবল অন্যান্য দ্রব্য আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে অভ্যাস করাও কর্ত্তব্য। অন্ন আহার না করিয়া এক্ষণে কেহ পরি-তৃপ্ত না। কেবল মাত্র দুগ্ধপান করিয়া কে দিন কাটাইতে সক্ষম? ফল মূল আহার করিয়া কয়জন এক্ষণে পরিতৃপ্ত বিবেচনা করিয়া থাকেন? পশ্চিম প্রদেশীয় কোন কোন লোক যাহা তাহা আহার করিয়া দিন কাটাইতে সক্ষম দেখা যায়, কিন্তু তাহাদি-গের সংখ্যা অধিক নহে। যাহাতে কোন এক প্রকার বা দুই প্রকার সমগ্রী আহার করিয়া দিন কাটান যাইতে পারে, এমন অভ্যাস করা কর্ত্তব্য এবং তাহাতে অভ্যস্ত হইবার জন্য তাহাদিগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। ঔষধি ও বৃক্ষ লতা হইতে উৎপন্ন খাদ্য অর্থাৎ নিরামিস দ্রব্য ব্যতীত আমিস দ্রব্যের বৃদ্ধি ও তাহাতে উদর পূরণ করিতে অভ্যাস করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাদিগের এত বৃদ্ধি ও তদলম্বনে এমন অভ্যস্ত হওয়া চাই যে, এক বৎসর শস্যাদি উৎপন্ন না হইলে তাহাতে চলিয়া যাইতে পারে। মৎস্য, ছাগ, মেষ, পক্ষী ইত্যাদি বিস্তর আমিস দ্রব্য আছে, ইহাতে কি লোকের জীবন ধারণ হয় না? ইহাদিগের যাহাতে বংশ বৃদ্ধি হয়, তাহার উপায় করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হই-য়াছে। অনেক আমিস দ্রব্য আছে যাহা

আমরা অকারণে ঘৃণা করিয়া খাদ্যের জন্য ব্যবহার করি না, কিন্তু অন্য দেশে তাহা আদরের সামগ্রী। আর অনাদর ও ঘৃণা করিলে চলিবে না—যদি তাহারা শরীরের পক্ষে অপকারী না হয়, তাহা হইলে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি ও তদবলম্বনে জীবন ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিস্তর বন্য পক্ষী ও পশু আছে, যাহা আমরা আহার করিতে পারি, কিন্তু পালন করি না, তাহাদিগকে পালন করা ব্যয়সাধ্য নহে, সামান্য তৃণ শস্পে তাহারা প্রাণ ধারণ করিয়া অতি শীঘ্র শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি করিয়া প্রচুর আহার দিতে পারে।

আর অধিক উল্লেখ করিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই। যাহাতে যাহাতে লোকে প্রচুর আহার সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা তাহা আয়ত্বাধীন করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, বোধ হয়, সকলেই বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। যিনি যে প্রকারে সুবিধা বিবেচনা করিয়া বিস্তর পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় ও আহার সংগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহার তাহাই করিয়া আত্ম রক্ষা ও দেহরক্ষা করা বিধেয়, কেননা আপনার জীবনকে কষ্ট দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়।

যাহারা জীবিত আছে তাহাদিগের সুবিধার কথা, অর্থাৎ লোকাধিক্য নিবারণের গৌণ উপায়ের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা হইল। আগামীবারে যাহাতে অধিক লোক না জন্মে অর্থাৎ লোকাধিক্য নিবারণের মুখ্য উপায়ের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

নবলীলা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়হীনা।

পৃথিবীতে সুলোচনার দুই আশ্রয় ছিল, বিনোদবাবু ও কুলকামিনী; একে একে দুই আশ্রয়ই ছিন্ন হইল। বিধাতার লীলা বিধাতা খেলিলেন। মানুষ ভাবিতে জানে, ভাবিল, কাঁদিল, কিন্তু তাহাতে কোন উপায় হইল না—বিনোদবাবু কিছু করিতে পারিলেন না—কুলকামিনীও পারিলেন না, অবশেষে আশ্রয়হীনা হইয়া সুলোচনা ভাসিয়া চলিলেন। এমন সমুদ্রে ভাসিয়া চলিলেন, যাহার কূল নাই—কিনারা নাই, অথচ যাহাতে বিভীষিকাময় তরঙ্গ আছে। অকূল জীবন সমুদ্রে ক্ষুদ্র যৌবনতরী ভাসিয়া চলিল। তরী ভাসিল—কেহ দেখিল না, কেহ ধরিতে পারিল না। বিপদ-তরঙ্গ ভ্রূকুটী দেখাইতেছে—কি খেলা খেলিতেছে—এ তরী তাহা দেখিয়া দেখিল না, দেখিয়াও উপেক্ষা করিল। স্বর্গ হইতে দেবতারা সুলোচনার সৎসাহসের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিলেন—সুলোচনা কোমর বাঁধিয়া সাগরে ভাসিলেন।

কষ্ট যন্ত্রণার লজ্জা পাইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা পাইল না। সুলোচনাও কোমর বাঁধিল, বিপদও যেন কোমর বাঁধিয়া আসরে

নামিল। সুলোচনার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, কষ্ট যন্ত্রণাকে মানিয়া চলিব না—যদি কাহাকে মানিতে হয় ত উপরওয়ালাকে মানিব। কষ্ট যন্ত্রণারও যেন প্রতিজ্ঞা,সংসারকেই মানাইব,—বিশ্বাস ও কল্পনার ভুল দেখাইয়া মোহতেই ডুবাইব। দুই যেন সমান। উপর সত্য, কি নিম্ন সত্য? উপর সত্য হইলে বিপদের পরাজয়, সংসার হারিবে। নিম্ন সত্য হইলে বিপদ রাজ্য পাইবে, জড়জগৎই পূজা পাইবে। দুই সত্য, কি একই সত্য, ভবিষ্যৎ উত্তর করিবে।

সুলোচনা সমস্ত দিন বৃক্ষের তলায় তলায়, জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন কিছুই আহার করেন নাই, তাহাতেও কষ্ট বোধ হইতেছে না, প্রাণের ভিতরে দুর্দম্য সাহস। মুখে মলিনতা নাই, প্রাণে মলিনতা নাই। বৃক্ষের ফুল আজ কত মধুর বোধ হইতেছে, বৃক্ষের পাতা আজ কত মনোহর বোধ হইতেছে। পাতা ও ফুল থাকিয়া থাকিয়া যেন সুলোচনার সহিত কত মিষ্ট আলাপ করিতেছে—যেন বলিতেছে—আমরা বারমাস জঙ্গলে থাকি, জঙ্গলেই সুখ, জঙ্গলেই শান্তি। এখানে কেহ আমাদিগকে ধরে না, কেহ দেখে না। মায়ের ধন মায়ের কোল আলো করিয়া থাকি।' সুলোচনার প্রাণে অপার আনন্দ, ফুল ধরেন, ফল ধরেন, আর চুম্বন করেন, বলেন, তোমাদের সনে আমিও থাকিব। স্থান দিবে ত? ফুলেরা যেন বলে—স্থান দিব; যে আমাদিগকে চায়, তার জন্যই আমরা আছি। আমায় দেখ, আমায় দেখ, এই প্রকারে কত বৃক্ষের কত ফুল সুলোচনাকে অভ্যর্থনা করিল। সমস্ত দিন অভ্যর্থনা করিল, কিন্তু শেষ হইল না, দিবস শেষ হইয়া আসিল, ঘনীভূত জঙ্গলকে ঘনীভূত আঁধার বেষ্টন করিল। পাখী কলরব করিতে করিতে আপনাপন শাবকাদি অন্বেষণ করিতে লাগিল;—তারপর মিলিয়া কুলায়াভিমুখে চলিল। দূর দূরান্তর হইতে ক্রমে ক্রমে গাঢ় অন্ধকার কোল প্রসারণ করিয়া সুলোচনার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, দূরের পাতা, দূরের ফুল, দূরের বৃক্ষ আঁধারে ঢাকা পড়িল, সুলোচনার চক্ষুর অদৃশ্য হইল। ক্রমে ক্রমে নিকটস্থ বৃক্ষগুলিও ঢাকা পড়িল, আঁধার আসিয়া সকল সমান করিয়া দিল। বৃক্ষ, ফুল, ফল, পাতা, সব একাকার হইয়া গেল—কেবল ঘনীভূত আঁধার—কেবল আঁধার। সেই আঁধারে সুলোচনা একাকিনী, পৃথিবীর সকল যেন আজ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেই গাঢ়তর আঁধারে দাঁড়াইয়া সুলোচনা বন কাঁপাইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া ডাকিলেন—"মা—মা—মা, আজ দেখা দেও, আজ দেখা দেও। ধ্রুবকে যে প্রকার দেখা দিয়া শান্তি দিয়াছিলে, আমাকে দেখা দিয়া আজ সেই প্রকার শান্তি দেও।"

সুলোচনার গভীর স্বর জঙ্গলে প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে দূর দূরান্তরে চলিল। সুলোচনার দুনয়ন হইতে অবিরল ধারায় চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। স্পন্দন রহিত হইয়া সুলোচনা সেই স্থানে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অবসাদান্তে।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সকলের নেশা ছুটিল। গোরাচাঁদ একে একে দলের লোকদিগকে গণনা করিল। দেখিল সকলেই আছে, কেবল সুলোচনা নাই। গোরাচাঁদের মন অস্থির

হইল। মন অস্থির হইল, কিন্তু পা আর চলে না। মন বলে অনুসন্ধানে চল, পা বলে আর কাজ নাই, যা আছে তাই নিয়েই থাক। নেশা ছুটিয়াছে, একটু জ্ঞান আসিয়াছে বটে কিন্তু বল আইসে নাই—স্নায়ুতে ও মাংসপেশীতে একতা হয় নাই। স্নায়ুর কথা মাংসপেশী শুনিতে চাহে নাই। গোরাচাঁদ বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন।

সুলোচনাকে পাওয়া যাইতেছে না, এ কথায় কুলকামিনীর মনে দারুণ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। কুলকামিনী মনে করিল—সুলোচনা আত্মহত্যা করিয়াছে। পাপের ফল হাতে হাতে। একদিকে লজ্জা অপরদিকে অনুতাপ কুলকামিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। সুলোচনাকে আর পাইব না, আর দেখিব না, ইহা স্মরণে কুলকামিনীর দুই চক্ষু হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে লাগিল। কুলকামিনী আর ঠিক থাকিতে পারিলেন না। কমলমণিও একটু চিন্তিত হইলেন,—সে চিন্তা স্বার্থের জন্য, ভালবাসার জন্য নহে। কমলমণির হৃদয় পাষাণ। কমলমণি একটু ভাবিয়া পরে কুলকামিনীকে বলিলেন—সেটা মরেছে, বেশ হয়েছে, অমন জাতনাশিনী মেয়ে থাকার চেয়ে না থাকা ভাল। সর্ব্বনাশিনীকে লয়ে শেসে কত ভোগই ভুগ্‌তে হতো। তুই আমার লক্ষ্মী, তুই আমার সোণা।

কুলকামিনী বলিলেন,—মা, তোর হৃদয়ে কি একটুও দয়া মায়া নেই, মায়ের কুলে যে তুই কালী দিলি। মা নাম কত মধুর, কিন্তু তোর আচার ব্যবহার যে দেখিল, সে আর কখনও মা নাম মুখে আন্‌বে না। তুই কি হলি? কমলমণি ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, তো'র আর বক্তিতে করতে হবে না; অনেক দেখেছি, দুদিন পরে তোর দশাও দেখিব, এখন ক্ষান্ত হ।

কুলকামিনী লজ্জায় মুখ নত করিলেন। পাপ করিলে দলের লোকেও ঘৃণা করে, এধারণা পূর্ব্বে ছিল না, মায়ের কথায় কুলকামিনী লজ্জায় মুখ নত করিলেন।

এদিকে গোরাচাঁদ আর অপেক্ষা করিতে পারিল না, কয়েকজন লোককে সঙ্গে করিয়া মশাল জ্বালিয়া, সুল্‌কি, লাঠী, ও রামদাও প্রভৃতি লইয়া সুলোচনার অন্বেষণে বাহির হইল। অরণ্যের কালী বাড়ী দস্যুদিগের আড্ডা বিশেষ, অস্ত্রাদি সকলি সেখানে ছিল। গোরাচাঁদ পুরোহিত ঠাকুরকে বলিয়া গেলেন, কুলকামিনী ও কমলমণিকে দেখিবেন, আমরা সত্বরই আসিতেছি। গোরাচাঁদের বিশ্বাস হইয়াছিল, কুলকামিনী হাত ছাড়া হইবে না।

গোরাচাঁদের দল প্রস্থান করিল, এ দিকে কুলকামিনীর হৃদয়ে অত্যন্ত বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হইল। সুলোচনা যদি জীবিত থাকে, তবে আজ আর রক্ষা নাই—আজ আর সে বাঁচিবে না। হায়, আমি পাপে ডুবিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলাম না? সুলোচনা যা বলেছিল, তাই সত্য হলো?—পাপে ডুবিলে কুল কিনারা পাওয়া যায় না, এই কি শাস্ত্র? পাপে ডুবিলে আর পথ পাওয়া যায় না, এ কি ব্যাপার? কুলকামিনীর হৃদয়ে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল,—মনে মনে বলিলেন, যা হয়েছে তা হয়েছে, আমি অবশ্য রক্ষা পাইব—ঐ শাস্ত্রকে মিথ্যা প্রমাণ করিব। ইহা ভাবিয়া কুলকামিনী আবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। মাকে বলিলেন, তুই কিছু কাল অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি। এই বলিয়া কুলকামিনীও যাত্রা করিলেন। পুরোহিত

তখনও কতক পরিমাণে সংজ্ঞাহীন ছিল, সে কোন রকম বাধা দিল না।

এক দিকে গোরাচাঁদ দলবল লইয়া সেই নিবিড় অরণ্যের ভিতরে সুলোচনার অনুসন্ধানে বাহির হইল, এদিকে কুলকামিনী ভগ্নীকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে বহির্গত হইলেন। গোরাচাঁদের দল চতুর্দ্দিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল—তাহাদিগের যেন প্রতিজ্ঞা যে, সেই রাত্রের ভিতরে সুলোচনাকে ধরিয়া আনিবে,—যেন যমকেও ভয় করিবে না—যেন মরা মানুষকে জীবিত করিয়া আনিবে। অরণ্য ছাইয়া প্রজ্বলিত মশাল হস্তে করিয়া যখন গোরাচাঁদের দল চতুর্দ্দিকে চলিল, তখন অরণ্যের পশুপক্ষীও যেন ভয়ে কলরব করিতে লাগিল, এ স্থান হইতে ওস্থানে, ওস্থান হইতে অন্য স্থানে লুকাইতে লাগিল। পক্ষীর পক্ষপুটের তাড়নায়, পশুদিগের দ্রুত গমনে অরণ্যের বৃক্ষাদির পল্লব ও শাখাপ্রশাখা কম্পিত হইতে লাগিল;—অরণ্য যেন ভয়ে বিহ্বল হইয়া চকিত হইয়া উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চিন্তা-পীড়নে।

সুলোচনা সেই আঁধারে, সেই নিস্তব্ধতায় দাঁড়াইয়া কি করিতেছেন? পল যায়, ক্ষণ যায়, মুহূর্ত্ত যায়—কাল কালে মিশাইয়া যাইতেছে। প্রভাতের অরুণ মধ্যাহ্নে উন্নীত হয়,—মধ্যাহ্নের তেজ সায়াহ্নে নিস্তেজ হইয়া ডুবিয়া যায়। প্রভাতের সুধামাখা—জগন্মোহন রূপ—সুস্নিগ্ধ—যেন আঁধারে আলো, কঠোরতায় কোমলতা, শুষ্কতায় সরসতা, উষ্ণতায় শীতলতা, দুঃখে সুখ, মৃত্যুতে জীবন, বার্দ্ধক্যে নবীনত্ব, নিরাশায় আশা, বিষে সুধা এক্ষণ কোথায়? যাহা হইবার তাহা হইয়াছে—জগৎলোচন আঁখি মুদিয়াছেন—সুলোচনার জন্য কেবলই আঁধার রাখিয়া ডুবিয়াছেন। ঐ সূর্য্য আবার উঠিবে, কিন্তু আজ আর না। সুলোচনা আঁধারে; বাহিরের এ আঁধার সময়ে ঘুচিবে, কিন্তু আজ আর না। সুলোচনা সেই আঁধারে দাঁড়াইয়া আজ কি ভাবিতেছেন? গত কয়েক দিবস সুলোচনা যে প্রকার যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে চিন্তা বা ভাবিবার সময় মিলে নাই, বলিতে কি, শ্বাসপ্রশ্বাস যদি বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইত, তবে সুলোচনার তাহাও হইত না। এমনই অবসরাভাব, এমনই ব্যস্ততা। সে ব্যস্ততা, সে অনবসরকে আজ আঁধারে ঘেরিয়াছে। আজ সুলোচনা একটু ভাবিবার সময় পাইয়াছেন। সূর্য্য ডুবিয়াছেন, ভালই হইয়াছে; আঁধার আসিয়াছে, ভালই হইয়াছে। সুলোচনা ইহাই ভাবিতেছেন। ঐ নিষ্ঠুর সংসারকে আর দেখিব না। কেন দেখিব, কার মায়ায় দেখিব? কি সুখের আশায় ওদিকে চাহিব? তবে এই আঁধারেই কি চিরকাল থাকিব! এই আঁধারে আবার যখন আলো ফুটিবে তখন কি কেবল বৃক্ষ লতা, ফুল ফল লইয়াই থাকিব?—যদি থাকিতে পারি, তবে ক্ষতি কি? যদি এই সকল আমাকে স্থান দিয়া রাখে, থাকিতে ক্ষতি কি? মায়ের আঁচলে আমার সুখ বিধাতা বাঁধেন নাই। ঐ সর্ব্বনাশীই আমার,—ছি, এমন কথা মুখে আনিব না। তিনি আমার মা। মায়ের প্রতি আমি চটিব কেন?—তিনি মাতা, পূজনীয়া—আমার আরাধ্যা। তিনি যাই হউন, আমি চিরকাল তাঁর চরণ পূজা করিব। পূজা করিতে কি তবে আবার ফিরিব?—না, তা ফিরিব না।

এ হৃদয়ে মায়ের রূপ আঁকির, সেই রূপের পূজা করিব। সংসার তাহা জানিবে না, সংসার তাহা বুঝিবে না। মা অঞ্চল বাড়িয়াছেন, আমি মাকে কোলে পূরিব। আমার দিদিকে কি ভুলিব?—তিনি আমার মাতা, তিনিই পিতা, তিনিই আশ্রয়, তিনিই সুখ। হায়, দিদি আমার জন্য কত কষ্টই সয়েছেন। দিদির শরীর মন ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। আমার জন্য দিদি এতদিন সকল সুখকে তৃণের মত উপেক্ষা করেছেন। বাল্যকালে যখন পড়িতাম, —বিনোদ বাবু পড়াইতেন, আর দিদি তাহার সকল আয়োজন করিয়া দিতেন। আজ বই নাই, আজ কালী নাই, আজ কলম নাই; তখন দিদি আমার ছিলেন, কোন অভাব ছিল না। মা বাধা দিতেন, দিদি আঁচলের তলে আমাকে ঢাকিয়া রাখিতেন, সকল দোষ আপন মাথা পাতিয়া লইতেন। দিদির কথা কি ভাবিব?—দিদি আমার পক্ষে প্রত্যক্ষ দেবতা। দিদি মানুষ নয়, সত্যই দিদি দেবতা। এখন বড় হইয়ছি—কত শিক্ষা পাইয়াছি, কত বিষয় ভাবিতে পারিতেছি, ইহার মূল দিদি। দিদিকে যখন ভুলিয়াছি, তখনই আমার বিপদ আসিয়াছে। আর যখন দিদির মুখ চক্ষের উপর রাখিয়া দেখিয়াছি, তখন সকল বিপদ, সকল কষ্ট উড়িয়া গিয়াছে। আজ দিদি কোথায়, আর আমি কোথায়? দিদি পাপে ডুবিতেছেন, আর আমি এখানে আছি?—ধিক আমার জীবনকে! আমার বিপদের সময় দিদি কোল পাতিয়া আমার বিপদকে আদরে গ্রহণ করিতেন, আর আমি আজ তাহার পতনের সময় দূরে আসিয়াছি? আমি পশু। ঐ আকাশের কথা শুনিয়াই মরিয়াছি। দিদি কোথায়? আমি দিদিকে ছাড়িয়া এ আঁধারে থাকিব না। দিদিকে বাঁচাইতে যদি না পারি, তবে মরিব। দিদির গলা ধরিয়া দিদিকে তুলিব। বিপদের ভয়ে পলাইব? এ দিদি-শূন্য আঁধারে আমার থাকা হইবে না। তবে আমি যাই,—ফুল ফল, তোমরা থাক, আমার এখানে আর থাকা হলো না। দিদিকে ছাড়িয়া আমি তোমাদিগকে লইয়া থাকিব না। সুলোচনা দুই এক পা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চিন্তা মনকে পরিত্যাগ করিল না; আবার ভাবিতে লাগিলেন;—আগুনে পড়িয়া মরিতে যাইব?—আবার পাপের পথে হাটিতে যাইব? বিনোদ বাবু যে পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক কথায় আপন জীবনকে বিপদসাগরে ভাসাইয়াছেন, সেই পথে আবার যাইব? আজ দিদি একদিকে, বিনোদ বাবু ভিন্ন দিকে। যখন দুই জন একদিকে ছিল, তখন কোন ভাবনা ছিল না, আজ আমি কি করি?—কে বলিবে, কি করি? মন বলে যেও না, হৃদয় বলে যাও। হৃদয়ের কথা শুনিলে আজ আমি পাপে ডুবিব—নিশ্চয় ডুবিব। দিদিকে লইয়া কি চিরকাল পাপে ডুবিয়া থাকিতে পারিব?—না—তাত পারিব না। পাপের জ্বালা সইতে পারিব না, আর সব পারি, ও কথাটী রাখিব না। বিনোদ বাবুর পথেই কি তবে যাইব? বিনোদ বাবুর পথই কি এই আঁধার? সংসার নাই—পাপ নাই, তাপ নাই, কেবল আঁধার! এই আঁধরে কি সুখ? এই আঁধারেই কি চিরদিন ঘুরিব? এই ফুল ফল লইয়া চিরকাল থাকিব?—বিনোদ বাবুকেও পাইব না, দিদিকেও পাইব না?—একজন পাপে, আর একজন পুণ্যে, দুই জন দুই সীমায়! ইহারা

কি মিলিবেন না? চিরকাল একাকী থাকিব? ভাবিতে২ সুলোচনার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি সেই স্থানে, সেই অরণ্যের বৃক্ষের কোলে অবসন্ন শরীরকে রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন।

শঙ্করাচার্য্য

শঙ্কর-শিষ্যগণের জন্ম।

(২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

উভয়ভারতী ও বিশ্বরূপ দুইজনেই পরস্পরের গুণের কথা শুনিতে ছিলেন। শুনিয়া দুজনেরই পরস্পর দর্শনের ইচ্ছা হইল। ক্রমে উভয়েরই মন সে জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিল। অবশেষে প্রণয়ী যুবক-যুবতীর যাহা হয়, তাহাদেরও তাহাই হইল। পরস্পরের শুভ দর্শন চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা হইত, এবং স্বপ্নে পরস্পর দর্শন ও আলাপ হইত। নিদ্রাভঙ্গ হইলে আবার সেই শুভনিদ্রার আহ্বান করিতেন। জাগিয়া থাকিলে মন সর্ব্বদা চঞ্চল ও কাতর হইত। দর্শনের ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু লজ্জায় কাহাকেও বলিতে পারেন না। কি করেন! মনাগুনে সর্ব্বদা দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অবশেষে উভয়ের আহার বিহারে বিরাগ হইল। শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। কতকালই বা আর জলন্ত বহ্নি গোপভাবে থাকিবে! বিশ্বরূপের প্রতি তাঁহার পিতার দৃষ্টি পড়িল। পিতা একদা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমার শরীর ক্ষীণ হইতেছে, মনেরও আর সেই তেজ নাই, কিন্তু কোন রোগ অথবা ইহার অন্য কোনরূপ কারণ দেখিতেছি না। ইষ্টবিয়োগ অথবা অনিষ্টযোগে লোকের দুঃখ হয়, কিন্তু অনেক ভাবিয়াও তোমার সম্বন্ধে সেরূপ কিছু দেখিতেছি না, অথচ বিনা কারণে কার্য্য হয় না। বিবাহের সময়ও তোমার অতীত হয় নাই, কেহ তোমাকে অবমাননা করিতেছে, এমনও নয়; দরিদ্রতার কষ্টও তোমার হইতে পারেনা, দুর্ব্বহ কুটুম্বভারও আমারই বহন করিতে হয়, বৎস, কৌমারবয়সে তোমার এরূপ কষ্টের কি কারণ হইতে পারে? মূর্খ বলিয়া যে দুঃখ, তাহাও তোমার নাই, কোন বিচারেও পরাজিত হও নাই। আজন্ম সৎকর্ম্মই করিয়াছ, স্বপ্নেও দুষ্কর্ম্ম কর নাই, অতএব পরলোকে নরক ভয়ও তোমার নাই, তবে কেন তোমার মুখচ্ছবি দিন দিন ম্লান হইতেছে? এদিকে বিষ্ণুমিত্রও দিন দিন কন্যার মুখকান্তি গ্রীষ্মকালের সরোবরের ন্যায় শুকাইতে দেখিয়া, বার বার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বহু অনুরোধের পর পিতা মাতার কষ্টে দয়ার্দ্র হইয়া উভয়েই স্ব স্ব মনের কথা প্রকাশ করিলেন। বিশ্বরূপ বলিতে লাগিলেন, মনের কথা তোমাদিগকে বলা যাইতে পারে কি না, ইহা ভাবিলেও লজ্জা হয়। শোননদীর তীরে একজন ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহার একটী কন্যা আছে, অভ্যাগত ব্রাহ্মণদিগের মুখে সেই কন্যার গুণের কথা অনেক শুনিয়াছি। তাঁহার রূপ ও বিদ্যার কথা

শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি, আমার তাহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ হইয়াছে।" পুত্রের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, হিমমিত্র অবিলম্বে সেই কন্যার উদ্দেশে দুইজন সুচতুর ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন। তাহারা অনেক দেশ অতিক্রম করিয়া অবশেষে বিষ্ণুমিত্রের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে উভয়-ভারতীও স্বীয় পিতার নিকটে মনোগত ভাব প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "রাজস্থানে বিশ্বরূপ নামে একজন ব্রাহ্মণ কুমার আছেন, তিনি মহাপণ্ডিত, তাঁহার পদসেবা করিবার জন্য আমার মনে সর্ব্বদা অভিলাষ হইতেছে, হে তাত! পার যদি, তুমি আমার এইকার্য্যে সাহায্য কর।" হিম-মিত্রের প্রেরিত ব্রাহ্মণদ্বয় তথায় পহুঁছিলে পর বিষ্ণুমিত্র তাহা দিগকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, "বিশ্বরূপের পিতা তাহার পুত্রের সহিত তোমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য আমাদিগকে পাঠাই-য়াছেন। বিদ্যা, বয়স, চরিত্র, এবং কুল বিষয়ে তোমার কন্যা তাহার পুত্রের তুল্য জানিয়া, তিনি তোমার কন্যা যাচঞা করিতে-ছেন। এই রত্নদ্বয় মিলিত হইয়া পরস্পরের শোভা বর্দ্ধিত করুক।" হে বিপ্রগণ তোমা-দের এইপ্রস্তাবে আমার সম্মতি আছে, কিন্তু একবার গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, কন্যা-প্রদানাদি বধূদিগের সম্মতিতেই হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা পশ্চাতে কন্যার কষ্ট হইলে তাহারা বড় যন্ত্রণা দেন।' অনন্তর বিষ্ণুমিত্র ভার্য্যার নিকটে যাইয়া বলিতে লাগিলেন "ভদ্রে, কি করিব বল, তোমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া রাজস্থান হইতে দুই জন ব্রাহ্মণ আসি-য়াছেন। ভাবিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় বল, আর যেন কথা ফিরাইতে না হয়।" "দূর দেশ, বিদ্যা, বয়স, কুল, বা বিত্ত বিষয়ে কিছুই জানি না, অথবা এ বিষয়ে আমি আর কি বলিব, বিদ্বান, সচ্চরিত্র, এবং সদ্বংশজ দেখিয়া কন্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য।' "হে অনঘে, যিনি দুর্জ্জয় বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজয় করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, বিশ্বরূপ সেই ভট্টপাদেরই শিষ্য। পাত্রের গুণ আর অধিক কি বলিব? ব্রাহ্মণের বিদ্যাই ধন, অপর ধন আবার কি আছে? তাহাই ধন যাহা সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে, তাহাই ধন যাহার যশ দিগন্ত প্রসারিত হয়, তাহাই ধন যাহা রাজা, চৌর, অথবা বণিতা হরণ করিতে পারে না। হে সুভগে, দিবারাত্র যে ধনের রক্ষার জন্য ভাবিতে হয়, যাহা ব্যয় করিলে আর থাকে না, তাহা কেবল কষ্টেরই কারণ। সর্ব্বত্র ধনবানের ভয়। পরন্তু বয়স্থা কন্যা গৃহে রাখিতে নাই। অথবা আমাদের মধ্যে এ বিষয় লইয়া আন্দোলন না করিয়া চল কন্যাকেই জিজ্ঞাসা করি, তাহার বর কে হইবে।" এই রূপ স্থির করিয়া উভয়ে কন্যা সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার নিকটে মনোগত কথা ব্যক্ত করি-লেন। "হে সুতনু, বিশ্বরূপের বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধান জন্য তাহার পিতা দুই জন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছেন, এখন আমাদের কি করিতে হইবে বল।" এই কথা শুনিবা মাত্র আনন্দে তাহার শরীর পুলকিত হইল; তাহাই তাহার পিতা মাতার প্রশ্নের উত্তর হইল। বিষ্ণুমিত্র ব্রাহ্মণদিগকে প্রস্তাবে আপন সম্মতি জানা-ইলেন; গণিত শাস্ত্রজ্ঞ উভয়ভারতী অন্তঃপুর হইতে লিখিয়া পাঠাইলেন, আজ হইতে চতু-র্দ্দশ দিবসে শুভ যামিত্র লগ্ন হইবে। ব্রাহ্মণদ্বয় কন্যা পক্ষ হইতে অপর একজন ব্রাহ্মণকে

সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা হিমমিত্রের আলয়ে পঁহুছিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে, কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। কন্যা-পক্ষের ব্রাহ্মণ স্বীয় হস্তস্থিত পত্র প্রদান করিলে পর হিমমিত্র তাহা পাঠ করিয়া সুখ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে বহুমূল্য বস্ত্রাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্বরূপকেও শুভ সম্বাদ দিবার জন্য পিতা একজন ব্রাহ্মণকে শিখা-ইয়া দিলেন। শুনিয়া বিশ্বরূপের আর আন-ন্দের সীমা রহিল না। বিবাহের পূর্ব্বকার্য্য সকল আরম্ভ হইল।

অনন্তর শুভ মুহূর্ত্তে যাত্রা করিয়া বিশ্ব-রূপ শোন্ নদীতীরে পঁহুছিলেন। বিষ্ণুমিত্র তাহা শুনিতে পাইয়া স্বয়ং আসিয়া বহুবাদ্য সহকারে জামাতাকে গৃহে লইয়া গেলেন। অভ্যাগত সকলকে আসন ও পাদুকা প্রদান করিলেন। বরকে অর্ঘ্য প্রদান ও বহু-মূল্য পাত্রে মধুপর্ক প্রদান করিয়া কোমল-বাক্যে সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "আমি, আমার এই কন্যা, সকলই তোমার, গো, ধন সমস্তই তোমার। অদ্য আমাদের কুল পবিত্র হইল. বিবাহ উদ্দেশে তোমার দর্শন লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, নতুবা কোথায় তুমি পণ্ডিতদিগের অগ্রগণ্য, আর কোথায় আমি। পরে বর-পিতাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "হে ভগ-বন্, এই গৃহে যাহা কিছু তোমার ভাল লাগে সমস্তই তোমার হইল।" হিমমিত্র উত্তর করিলেন, যাহা কিছু তোমার সকলই আমার. এইরূপে তাহারা পরস্পরের মধুরালাপে পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। আত্মীয় পরিজন সকলেই আহ্লাদ সাগরে ভাসিতে লাগি-লেন। এ দিকে বর কন্যা পরস্পরের দর্শ-নের জন্য ব্যাকুল হইলেন। তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ রূপলাবণ্যে আর অলঙ্কারের প্রয়োজন রহিল না, তথাপি যেন করিতে হয় বলিয়াই বেশভূষা করিতে লাগিলেন। গণকেরা জানিয়াও লগ্নের কথা উভয়ভারতীকেই জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার উপ-দেশে বিবাহের মুহূর্ত্ত স্থির করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বাদ্যের রোলে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইল। কন্যা ও বরের পিতা উপহার দ্বারা পরিজনদিগকে তোষণ করিতে লাগিলেন। বর বিধিপূর্ব্বক অগ্নি স্থাপিত করিয়া তাহাতে হোম করিলেন, এবং বধূ লাজাহুতি প্রদান করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলেন। পরি-শেষে বর অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। হোম শেষ হইলে সমাগত বন্ধু বান্ধবেরা চলিয়া গেলেন এবং বিশ্বরূপ দীক্ষাধারণ পূর্ব্বক বধূসহ অগ্নি গৃহে চারি দিন বাস করিলেন। বরের ফিরিয়া যাইবার সময় হইল। কন্যার মাতা পিতা তাহাকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া বলিতে লাগিল, "মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর, এই কন্যা নিতান্ত শিশু কিছুই জানে না, এখনও বালকদের সঙ্গে পুতুল লইয়া খেলা করে, ক্ষুধায় কাতর হইলে গৃহে ফিরিয়া আইসে। এই আমাদের এক মাত্র কন্যা, গৃহকর্ম্মে নিয়োগ করা হয় নাই। নিজের কন্যার ন্যায় তাহাকে সর্ব্বদা যত্নের সহিত রক্ষা করিবে। দেখিও, ইহার প্রতি মৃদুবাক্য ব্যবহার করিও। কটু কথায় কোন কার্য্যে নিয়োগ করিবে না, এ কন্যা রাগ হইলে কিছুই করে না। স্বভাবতই কেহ কেহ মৃদু বাক্যের বশ, কেহ বা কটুবাক্যের বশ, নিজের প্রকৃতি কেহই এড়াইতে পারে না। এই কন্যা আমাদের বড় আদরের পাত্র। এক দিন এক জন বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ আসিয়া,

কন্যার লক্ষণ সকল দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ইনি যদিও মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইনি দেবতা, তোমরা কদাপি ইহার প্রতি কোন কটূক্তি প্রয়োগ করিও না, ইহাতে সর্ব্বজ্ঞত্বের সম্পূর্ণ লক্ষণ সকল রহিয়াছে, ইনি এক দিন বিচারে প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিত দ্বয়ের মধ্যস্থ হইবেন।" আমাদিগকে এরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। কন্যার শ্বশুরিকে আমাদের হইয়া এই কথা বলিবে "এই কন্যা এখন তোমার হাতে সমর্পিত হইল। অল্পে অল্পে গৃহ কর্ম্মে নিয়োগ করিবে। তরলমতি শিশু কতই না অপরাধ করে, গৃহিণীর পক্ষে তাহা গ্রাহ্য করা উচিত হয় না। আমরা সকলেই প্রথম বুদ্ধি পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছি পরে অল্পে অল্পে গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।" আমাদের সাধ্যনাই যে, সাক্ষাতে যাইয়া তোমার মাকে সব বলিয়া আসি, নিজের সংসার কার্য্য ফেলিয়া যাইতে পারি না। তথাপি আত্মীয়ের দ্বারাও বরমাতাকে এমন করিয়া বলা যায় যাহাতে সাক্ষাৎ বলার ফল হয়।"

অনন্তর কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে, লাগিলেন "বৎসে! আজ হইতে এক নূতন অবস্থায় প্রবেশ করিলে, যাহাতে গৌরবের সহিত তাহা রক্ষা করিতে পার, তজ্জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিবে। বালকের ন্যায় আর ব্যবহার করিবে না, তাহা হইলে লোকে হাসিবে। তোমার বাল্য ব্যবহার আমরা যেমন ভাল বাসিয়াছি, অপরে আর সেরূপ করিবে না। বিবাহের পূর্ব্বে পিতামাতাই কন্যার কর্ত্তা বিবাহের পর পতি কর্ত্তা, একমাত্র তাহাকেই আশ্রয় করিবে, তাহা হইলে ইহপরলোকে ধন্যা হইবে। পতির আহার না হইলে আহার করিবে না, পতি বিদেশে গমন করিলে বেশভূষা করিবে না। স্বামীর স্নানের পূর্ব্বে স্নান করিবে কিন্তু আহারের পূর্ব্বে আহার করিবে না, এই বিষয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে অনুসরণ করিবে। স্বামীর রাগ হইলে তুমি রাগ করিয়া কোন কথা বলিবে না, সমস্ত ক্ষমা করিবে, তাহা হইলে আপনা হইতেই তাহার রাগের নির্ব্বাণ হইবে। হে বৎসে! ক্ষমাতে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। স্বামীর সাক্ষাতে, এমন কি, তাহার মুখ পানে চাহিয়াও অপর পুরুষের সহিত আলাপ করিবে না। গোপনে করিবে না, সে কথা আর কি বলিব। সন্দেহই স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা নষ্ট করে। বৎসে, স্বামী যখন স্থানান্তর হইতে বাড়ী আসিবেন, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জল দ্বারা তাঁহার পা ধোয়াইবে এবং ইচ্ছামত সেবা করিবে। তাঁহার কার্য্যে জীবন পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিবে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে যদি গৃহে কোন সাধুর আগমন হয়, তাঁহার যথাসাধ্য অভ্যর্থনা করিবে। নতুবা তিনি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলে তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। পিতার ন্যায় শ্বশুরের আদেশ পালন করিবে, সহোদরের ন্যায় দেবরেরও কথা শুনিবে, তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে, যত কেন তোমাদের মধ্যে স্নেহ না থাকুক, পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইবে।" এই সকল উপদেশ হৃদয় ধারণ করিয়া এবং বন্ধুবর্গ হইতে নানা প্রকারে সমাদর পাইয়া বর কন্যা রাজ স্থানে আসিয়া পঁহুছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাগে বিভক্ত সহস্র সহস্র পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণও সময়ে সময়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শাক্যসিংহ প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন কোথায় পাওয়া যাইবে? এই গ্রন্থ-বনে পথিক পথ ভুলে, তাই বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরস্পর বিসম্বাদী শত শত মত প্রচারিত হইয়াছে। হিন্দু বেদকে আপনাদিগের মূল ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া প্রচার করেন; অথচ বর্ত্তমান হিন্দুমত পর্য্যালোচনা করিয়া বেদের মত অনুমান করিতে যাইলে নিশ্চয়ই ভ্রম হইবে। শাক্যসিংহের ধর্ম্মমত কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যাইবে, বিচার করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় আর্য্য ভাষার ক্রমবিকাশ অনুসরণ করা গিয়াছে; এবং বিভিন্নদেশে যে সকল গ্রন্থ প্রামান্য বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাদের এক একটী ক্ষুদ্র তালিকা সংগ্রহ করা হইল। এই সকল গ্রন্থ মত তুলনা করিলে এবং তাহাদিগের ভাষা পরীক্ষা করিলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাচীনতম গ্রন্থ কাহারও নির্ণয় করা দুষ্কর হইবে না, আশা করা যায়।

চীন দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সম্বন্ধে বিল সাহেব বলেন,—"যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থ চীন দেশে অধুনা প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হয়, প্রাচীন বৌদ্ধমত সম্বন্ধে তাহারা বিশ্বাস্য নহে। স্বেচ্ছাচারী চীন সম্রাটগণের অব্যবস্থিত চিত্ততা হেতু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে দেশমধ্যে আনীত হইয়াছিল। কালক্রমে পরস্পর বিসম্বাদীসকল গ্রন্থই প্রামাণ্যরূপে দেশমধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে সকল গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই চীনদেশীয় বৌদ্ধবেদ।"

নেপাল দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থসকল সংস্কৃত ভাষায় রচিত। হিমাচলপাদশায়ী মালক্ষেত্র হইতে এ সকল নেপালে আনীত হইয়াছিল; কাহারও মতে তাহাদের অধিকাংশ পার্ব্বতীয় প্রদেশেরই রচনা। হজসন সাহেব প্রথম পক্ষের অন্যতর। তিনি বলেন "রাশি রাশি যে সকল বৌদ্ধগ্রন্থ নেপাল দেশে সংগ্রহ করিয়াছি, সে সকল আদৌ মগধ, রাজগৃহ ও বৈশালীদেশে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণের রচনা। বৌদ্ধ প্রচারকেরা ঐ সকল গ্রন্থ নেপাল দেশে আনিয়াছিলেন।"

তিব্বত বা ভোট দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থাবলি সম্বন্ধে হজসন্ সাহেব বলেন—"ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধপ্রচারকগণ বা তদ্দেশ নির্ব্বাসিত বৌদ্ধগণ তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচার বা আশ্রয় লাভ মানসে আসিবার সময়ে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল তিব্বতে আনিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কালক্রমে সংস্কৃত ভাষার অনধিক চর্চ্চা বশতঃ বা তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধ সংখ্যার বৃদ্ধি হেতু ঐ সকল গ্রন্থ ভোট ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।"

এখন দেখা গেল, অন্যান্য দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সকল প্রধানতঃ ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত বা পালি গ্রন্থ সকলের অনুবাদ মাত্র। অধুনা ভারতবর্ষ ও সিংহলে সংস্কৃত ও পালি উভয়-

বিধ গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ইহাদিগের মধ্যে অধিক প্রামাণ্য কাহারা? এখনও লোকে ইচ্ছা করিলে সংস্কৃত বা পালি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে পারে। সুতরাং ভাষা বিশেষে রচিত গ্রন্থ দেখিলেই যে তাহার রচনাকাল নির্ণয় করা যাইতে পারে, এমন নহে। সৌভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থ সকল সম্বন্ধে সে আপত্তি খাটে না, কারণ অতি প্রাচীন কালেই ইহারা বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। পরন্তু চসার যেমন বর্ত্তমান ইংরাজি ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে পারিতেন না, পালি বা বর্ত্তমান সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তির পূর্ব্বে যাঁহারা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের পালি বা নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমরা পালি ও নূতন সংস্কৃতের উৎপত্তির কাল এক প্রকার অবধারিত করিয়াছি। সুতরাং এক দিকে এই সকল ভাষার উৎপত্তি কাল, অপরদিকে চীন বা ভোটীয়া ভাষার অনুবাদ কাল, এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী সময় এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, শাক্যসিংহ সাধারণ লোকের সহিত গাথা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। সম্পূর্ণ গাথা ভাষায় রচিত কোন বৌদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। যাইলে সে গুলি সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতাম। পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে গাথা ভাষায় রচিত যে পদাবলী পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ সে গুলি শাক্যসিংহের সমকালবর্ত্তী, পরন্তুন সময়ে রচিত হইয়াও থাকিতে পারে। শাক্যসিংহের রচিত বলিয়া কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, সম্ভবতঃ তিনি কোন ভাষায় কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। সকল গ্রন্থই তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদিগের রচিত বা সংগৃহীত।

প্রামাণ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রত্নবিৎগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। হজসন, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সংস্কৃতবিৎ আচার্য্যগণ অনুমান করেন, মূল বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল, অন্ততঃ পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারার্থ যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বা পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার কালে শাক্যসিংহ যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাহা যে সংস্কৃত প্রাকৃত নহে সে বিষয় সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে ডেভিস্, ও লডেনবার্গ প্রভৃতি পালি পণ্ডিতগণের মতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল আধুনিক, প্রামাণ্য বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় রচিত ; এইক্ষণ উভয় শ্রেণীর আচার্য্যগণের মতামত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সংক্ষেপে হজসন সাহেবের মত এই যে—

১। সাধারণ লোককে সুনীতি শিখাইবার জন্য বৌদ্ধপ্রচারকেরা পালি ভাষা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারের জন্য এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের কূটার্থ দার্শনিক মত সকল বিবৃত করিবার জন্য গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

২। পালি অপেক্ষা সংস্কৃত গ্রন্থ সকলে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন অধিকতর পাণ্ডিত্যের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মীমাংসিত হইয়াছে। পালিগ্রন্থ সকলে সাধারণের বোধগম্য অসার গল্প, টীকা, ইতিবৃত্ত বা সহজ সহজ মত সকল দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং পালি অপেক্ষা সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধিক প্রামাণ্য।

৩। কূটার্থ দার্শনিক মত সকল অস্ফুট পালিভাষায় বিবৃত করা সহজ হইত না।

ওদিকে সংস্কৃত পরিস্ফুট, পণ্ডিতগণের আদৃত আর্য্যজাতির সাধারণ ভাষা বিদ্যমান থাকিতে পালির পরিবর্ত্তে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।

৪। সিংহলীয় বৌদ্ধগণ আপনারাই স্বীকার করে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের তিনশত বৎসর পর পর্য্যন্ত তাহাদের দেশে কোন গ্রন্থের ব্যবহার হয় নাই। এবং পালিগ্রন্থ সকলের প্রকৃতি পরীক্ষা করিলেও বুঝা যায় যে, মগধ হইতে সংস্কৃত গ্রন্থ আনাইয়া তাহাই অনুবাদ করিয়া বা তাহার ছায়া লইয়া পালিগ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন,—চৈতন্য আপন মত সাধারণ লোকের নিকট প্রচার করিবার সময় বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা, উড়িষ্যা দেশে উড়িয়া এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দি ব্যবহার করিতেন, কিন্তু গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও সংস্কৃতের প্রভাব এত অধিক ছিল।

খ্রীষ্ট জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে সে ভাষার গৌরব ও ক্ষমতা কত অধিক ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে। সে সময়ে দর্শনশাস্ত্র রচনা করিতে আর্য্য-সন্তান সংস্কৃত ভাষার উপেক্ষা করিবে, বিশ্বাস করা সহজ নহে।

সংক্ষেপে ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের মত এই যে,—

১। খ্রীষ্টজন্মের ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষার গৌরব অত্যন্ত অধিক ছিল, সে সময়ে দর্শনশাস্ত্র লিখিতেও বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ভাষা অগ্রাহ্য করিবে, বোধ হয় না।

২। শাক্য যখন যে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইতেন, তখন সেখানকার ভাষা ব্যবহার করিতেন, সুতরাং তিনি কেবল পালিভাষা ব্যবহার করিতেন, বিশ্বাস হয় না, বিশেষতঃ তখন গাথা ভাষা ব্যবহার হইত, পালি ভাষার জন্ম হয় নাই।

৩। অশোকের রাজত্বকালে যে মহাসভা সমাহূত হয়, সেই সময় ও তাহার পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের আপ্তগ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছিল, তখনও পালি ভাষার উৎপত্তি হয় নাই। সুতরাং পালি বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রামাণ্য নহে।

৪। চীন দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল পালি বা ভোট ভাষা হইতে অনুবাদিত নহে, সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত; ইহাদিগের কেহ কেহ খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতে অনুবাদিত হইয়াছিল, সুতরাং খ্রীষ্ট জন্মের বহুদিন পূর্ব্ব হইতে সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রচারিত ছিল। তখনও সিংহলের বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় অনুবাদিত হয় নাই।

৫। যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, তাহাদিগের যে নাম, আমাদিগের বর্ত্তমান সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থগুলির সেই নাম। সুতরাং ইহারাই প্রচীন আপ্ত বৌদ্ধ গ্রন্থ।

৬। চীন বুদ্ধ চরিত পালি বুদ্ধ চরিতের অনুবাদ নহে। সংস্কৃত ললিতবিস্তর হইতে উহার অনুবাদ হইয়াছিল। অনুবাদ খ্রীষ্টের ৭০ অব্দে হয়। সুতরাং তাহার বহু পূর্ব্বে ললিতবিস্তর লেখা হইয়াছিল। ললিতবিস্তরের উপক্রমণিকাতে প্রমাণ করা হইয়াছে, কালাশোকের সময় ললিতবিস্তর লেখা হয়, বুদ্ধের নির্ব্বাণের ১০০ বা ১৪০ বৎসর পরে কালাশোক রাজত্ব করিতেন।

৭। যে ভাষায় ললিতবিস্তর লেখা, সেই ভাষায় মহাবস্তু প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থও লেখা, সুতরাং তাহারাও ললিতবিস্তরের সম-সময়ে লিখিত হইয়াছিল।

৮। সত্য বটে, ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থ আখ্যায়িকা, অত্যুক্তি প্রভৃতি দোষে কলঙ্কিত। পালিগ্রন্থ সকলেও সেই সব দোষ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ললিতবিস্তরের উপক্রমণিকাতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন যে, দুই খানি পুস্তক একত্র করিয়া বর্ত্তমান ললিতবিস্তর লিখিত হইয়াছে। একখানি প্রাচীনতর গাথা ভাষার কবিতায় লিখিত, আর একখানি গদ্যে লিখিত। গদ্য গ্রন্থকার আপনার মতের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য পূর্ব্বতন গাথা স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল আরও বলেন, কনিষ্ক সমাহূত বৌদ্ধ সংঘে ললিতবিস্তর রচিত হইয়াছিল, বোধ হয় না। সে সমিতিও চীন অনুবাদের ব্যবধান ষষ্টি বৎসর মাত্র। অন্য ভাষায় অনুবাদিত হইবার উপযুক্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে অনেক অধিক সময় লাগে। সুতরাং অশোক সংঘের সময় ললিতবিস্তর রচনা হওয়া সম্ভব। কিন্তু শাক্যের মৃত্যুর এত দিন পর পর্য্যন্ত শাক্যের জীবনচরিত লিখিত হয় নাই, বিশ্বাস হয় না। অধিকন্তু তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই শাক্যের জীবনবৃত্ত প্রাসাদ মন্দিরে অঙ্কিত ও খোদিত হইত। বোধ হয় কালাশোকের সমাহূত বৌদ্ধ সংঘে ললিতবিস্তর (বর্ত্তমান গ্রন্থ) প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে গৃহীত হইয়া থাকিবে। এবং গাথা ভাষায় রচিত যে বুদ্ধচরিত লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, শাক্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যে সমিতি হইয়াছিল, তাহাতেই উহা রচিত হইয়া থাকিবে। এক্ষণে এই দুই জন আচার্য্যের মত একটু বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক।

হজসন সাহেবের চতুর্থ যুক্তি তাদৃশ সবল বলিয়া বোধ হয় না। সিংহলীয় বৌদ্ধগণের কথামত তদ্দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সকল অনেক দিন পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়া না থাকিলে তাহাদিগের প্রাচীনতার অপহ্নব হয় না। তাহারা বলে, বহু দিন পর্য্যন্ত তদ্দেশীয় গ্রন্থ সকল লোকেরা মুখে মুখে শিখিয়া আসিতেছে। একথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই, এবং লিপিবদ্ধ না করিয়া মুখে মুখে শিখিয়া রাখিলে যে গ্রন্থের গ্রন্থত্ব নষ্ট হয়, তাহাও নহে। এইরূপে শত শত বৎসর বৈদিক গ্রন্থাবলী আর্য্য সমাজের প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। লিপিবদ্ধ হয় নাই বলিয়া কেহ তাহাদের প্রাচীনতা অস্বীকার করে না। কোন্ কোন্ পালি বৌদ্ধগ্রন্থের ভাষা ও প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া তিনি পালি গ্রন্থ সকল সংস্কৃতের পরন্তন স্থির করিয়াছিলেন, তিনি বলেন নাই। এরূপ অবস্থায় আমরা কিছু বলিতে চাহি না। পালি গ্রন্থ মাত্রই যে সংস্কৃত গ্রন্থ মাত্রের পূর্ব্বতন, একথা কেহ বলেন না। পালি আপ্ত গ্রন্থেরও যে কোন কোন খানি একবার পালি হইতে সিংহলীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া আবার পালিভাষায় পুনরনুবাদিত হইয়াছে, ইহা অনেকেই স্বীকার করেন। সে সকল কথা কিছু পরে সবিস্তার বলা যাইবে।

যে সময়ে বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল পালিভাষায় রচিত হইয়াছিল বলিয়া পালিবাদী পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, সে কোন্ সময় নির্ণীত না হইবার পূর্ব্বে সে সময়ে পালি স্ফুট বা অস্ফুট ভাষা ছিল, বলা যাইতে পারে না। আর প্রাকৃত ভাষা বলিয়া কোন সময়ে পালি ভাষার দার্শনিকের কূটমত বিবৃত করা যাইতে পারিত না, ইহা কেহই বলিতে পারেন না। আমাদের

বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা বহুদিন আরম্ভ হয় নাই, তথাপি বাঙ্গালা ভাষায় দর্শন শাস্ত্র রচনা বা অনুবাদ করা কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ প্রাকৃত ভাষার সহিত সংস্কৃতের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, যত দিন সংস্কৃত ভাষায় দার্শনিক পারিপাষিক শব্দ সকল জীবিত রহিবে, ততদিন ভারতবর্ষীয় আর্য্য জাতি-ব্যবহৃত কোন প্রাকৃত ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করা দুষ্কর হইবে না।

শাক্যসিংহ ইতর সাধারণ সকলের নিকট আপন মত প্রচার করিতেন। ধর্ম্মের ভিত্তি দর্শন শাস্ত্রের উপর স্থাপিত করিতে হইলেও সাধারণ লোকের নিকট ভিত্তির দার্শনিকতা দেখাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে হয় না। সাধারণ লোকে সে সব চাহে না, সাধারণকে ভাবে চালিত করিতে হয়। সকল দেশীয় সকল সময়ের সংস্কারকেরা এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া আপন আপন মত প্রচার করিয়াছেন। শাক্যসিংহ যে উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ডাক্তার ডেভিডস্ বলেন, "প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মে দার্শনিক মত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।" সাধারণ লোকের নিকট দার্শনিক যুক্তি দেখাইতে হইলেও অতি সহজ সাধারণ বোধগম্য যুক্তি ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপ যুক্তি পালিভাষায় প্রকাশ ক্ষমতা হজসন্ বা রাজেন্দ্রলাল কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। পণ্ডিতদিগের একটু কূটতর্কের আবশ্যকতা স্বীকার করি। কিন্তু তাহা হইলেও পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের সমসাময়িকতা মাত্র প্রমাণ করা হয়। পালি গ্রন্থ যে সংস্কৃতের পরবর্ত্তন, তাহার কোন প্রমাণ হয় না। দার্শনিকের মতের সহজতা বা কূটতা অনুসারে গ্রন্থ রচনাকাল নিরূপণ করিতে হইলে, সহজ মতই কূট মতের পূর্ব্বতন বলিয়া স্বতঃই অনুমান করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু সূক্ষ্মমত বিচার করিলে একই সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের নিকট সহজ ও কূট উভয় মতেরই প্রচার সম্ভব হয়। এই সকল যুক্তির মূলে একটী গুরুতর স্বীকার্য্য নিহিত রহিয়াছে, যেন শাক্যসিংহ কোন নূতন দর্শন শাস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং আপন দার্শনিকমত প্রতিপন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহাকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে শাক্য নূতন কিছুই উদ্ভাবন করেন নাই, প্রাচীন সময়পালিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অনুমোদিত মত সকল নূতন ভাবে নূতন বেশে সাজাইয়া তাহা হইতে তিনি কিছু নূতন একটী ধর্ম্মমত বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন দার্শনিক ও ধর্ম্মমতের সহিত তাঁহার মতের সাদৃশ্য বা পার্থক্য কত ছিল, সময়ান্তরে আলোচনা করা যাইবে। শাক্য কি করিয়াছিলেন, কি বলিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত হিন্দুসমাজের কি সম্বন্ধ ছিল, এ বিষয়ে নানা প্রকার ভ্রান্তমত অদ্যাপি প্রচলিত আছে। (ক্রমশঃ)

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। ভিক্ষা—শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵৹। চন্দ্রনাথ বাবু সহৃদয় লোক, অন্যের দুঃখে ইঁহার প্রাণ অস্থির হয়। কিন্তু এতদিন পরে 'সুরেন্দ্রকাহিনী না প্রচার করিলেও চলিত। "শুন হে সুরেন্দ্র ভারতের চন্দ্র"—সুরেন্দ্র ভারতের চন্দ্র, ইহা আমরা স্বীকার করি না। এই প্রকার অতিরিক্ত প্রশংসায় এ দেশের অনেকের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবু এ প্রকার বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ভাল বিষয় লিখিতে চেষ্টা করিলে, এপথে তাঁহার ক্রমে কৃতকার্য্যতা লাভের সম্ভবনা আছে।

২। মানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার ফল—রবিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশ। ছাত্র সমাজ উপদেশ গুলিকে স্থায়ী করিয়া দেশের পরম উপকার করিতেছেন। শিবনাথ বাবুর যত গুলি উপদেশ আমরা দেখিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে এইটী অতি উপাদেয় ও সারগর্ভ হইয়াছে। দৈনিক জীবনে এই প্রকার উপদেশে অনেক উপকার হইয়া থাকে। ঈশ্বর শিবনাথ বাবুর কার্য্য করিবার শক্তিকে আরো বৃদ্ধি করুন।

৩। কৌরব-কলঙ্ক কাব্য—প্রথম খণ্ড, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যান্ত বিরচিত। মূল্য আট আনা। ১২৮৯ সালে মুদ্রিত। গ্রন্থের প্রারম্ভেই উৎসর্গ—উৎসর্গের মধ্যে এই কথা গুলি—"কিন্তু দুঃখের বিষয় নব্য শিক্ষিতা মহিলাগণের আচরণে সময়ে সময়ে বড় আঘাৎ পাইয়া থাকি, এক্ষণে আমাদের দেশের যে সকল মহিলাগণ শিক্ষা পাইতেছেন, তাঁহারা সংসারের পূতিগন্ধময় অহঙ্কারের নিকট আত্ম বিক্রয় করিয়া উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন, কিন্তু যখন আর্য্যে, আপনার বিনয়াবনত ও শান্ত মূর্ত্তি এবং অহমিকাশূন্য স্নিগ্ধভাব মনে পড়ে, তখন এ দেশকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করি। এই বঙ্গীয় রমণীগণের মধ্যে আপনি বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। জগৎ আপনাকে জানুক বা জানুক, আপনার অস্তিত্বে এ দেশের গৌরব অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই বলিতে পারি, আমি আপনার হৃদয়কে ভালবাসি,—আপনার প্রতিভাকে পূজা করি—আপনার প্রখর বুদ্ধি ও সুতীক্ষ্ণ বিবেচনা শক্তিকে সম্মান করি,—আর আপনার পবিত্র আত্মাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। কিন্তু এ সমস্ত প্রকাশ করিবার উপায় নাই নাই;—আমি দীন, মূর্খ—অজ্ঞান,—বুদ্ধিহীন।" এই সমস্ত পদগুলি ১২৮৬ সালে প্রকাশিত শরচ্চন্দ্র প্রণেতার "সোপান" প্রথমস্তরের উৎসর্গ হইতে অনুমতি না লইয়া ও উদ্ধৃতের চিহ্ন " " না দিয়া তোলা হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে কেবল দুই একটী শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাতেই যিনি এই বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় অবিবেচকের পুস্তক না লিখিলেই কি চলে না? শরচ্চন্দ্র-প্রণেতা হয়ত এ জন্য কিছুই করিবেন না। কিন্তু বঙ্গীয় সমাজে এরূপ লোকের আদর হওয়া উচিত নহে। গ্রন্থকার-শ্রেণীতে

এরূপ ঘৃণিত লোক আছেন, ইহা ভাবিতেও আমরা লজ্জিত হই। এরূপ পুস্তক সমালোচনা করিতে হইলে দেশের সমস্ত গ্রন্থকারদিগকে সমালোচনা করিতে হয়; কারণ এই পুস্তকে লেখকের নিজের কিছু আছে কি না, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। নিজের যাহা আছে তাহা অপাঠ্য। এখানি কৌরব-কলঙ্ক নহে, ("বঙ্গ কলঙ্ক ?")

৪। ভাষা শিক্ষা—মূল্য ।/০, পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই। পুস্তক খানি ইংরাজি ধরণে লিখিত। পুস্তক খানিতে গ্রন্থকর্ত্তা অনেক বিষয়ের প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কিন্তু সকল প্রশ্নের উত্তর পাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন নাই। কোন্ ভাষা হইতে নিম্নলিখিত পদগুলি গৃহীত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং পরে শব্দের তালিকা দিয়াছেন, কিন্তু বালকেরা কি উপায়ে তাহা জানিবে, তাহা বলিয়া দেন নাই। এক স্থানে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, যেমন মাতা পিতা, ফল মূল, পিতা পুত্র,একত্রে ব্যবহৃত হয়, এই রূপ নিম্নলিখিত শব্দের পর কোন্ কোন্ শব্দ ব্যবহৃত হয়,—কালী, সত্য, ঝড়, দধি, ইত্যাদি। বালকেরা তাহা জানিয়া কি করিবে ?—আমরা বুঝিলাম না। ঐরূপ বৃথা কতকগুলি অর্থ-শূন্য কথা দ্বারা কি ভাষার পারিপাঠ্য বৃদ্ধি হয় ? 'বর্ণ বিন্যাসে' লিখিয়াছেন—ণত্ব ও ষত্ব প্রকরণের নিয়ম সমূহ ভালরূপ জানা না থাকাতে অনেকে ন, ণ, শ, ষ,—ও স প্রভৃতি বর্ণযুক্ত শব্দ লিখিতে ভুল করিয়া থাকে। এ ঠিক কথা। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, ৩টী শ ও ২টী ন না থাকিলে কি বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার পক্ষে কোন ব্যাঘাত ঘটে ? ধাত্বর্থ বোধের জন্য যাঁহারা ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগকে আমরা বলি, বিদেশী ভাষা হইতে নূতন শব্দ না আসিলে কখনই ভাষার উন্নতি হইবে না, এবং সকল উন্নত ভাষাই নানা ভাষার মিশ্রণে সৃষ্ট। বাঙ্গালা ভাষাতেও তাহাই হইতেছে, এবং হইবে। এখনই এরূপ কত শব্দ আসিয়াছে, যাহাতে প্রাচীন ধাত্বর্থ পাওয়া যায় না। বাঙ্গলা ভাষার অনেক শব্দও কালে এমন হইবে যে, প্রাচীন ধাত্বর্থের সহিত তাহাদের অর্থের মিল থাকিবে না। এরূপ এখনই হইয়াছে, কালে আরো হইবে। কোন ভাষার ব্যকরণ যাঁহারা লেখেন, তাঁহাদিগকে এগুলি বিশেষ রূপ চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। বাপ্দাদার আমলে যাহা ছিল, তাহাই যে চিরকাল চলিবে, এমন কোন কথা নাই। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষাপেক্ষাও কালে উন্নতি হইবে, আমাদের বিশ্বাস। যে ভাষা কালেএমন হইবে, সে ভাষাকে ঐরূপ ণত্ব ষত্বর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা সঙ্গত বোধ হয় না। অন্যান্য দিকে বাঙ্গালা ভাষার যেমন উন্নতি হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে কথায় কথায় বিসর্গ ব্যবহার, ণ ও শ লইয়া গোলযোগ একবারে তুলিয়া দিলে ক্ষতি কি ? ইহা করা কিছুই কঠিন নহে। ৯ রাখারও কোন আবশ্যকতা নাই, দুটা 'ব' রাখারও প্রয়োজন নাই। এ সকল লইয়া সময় নষ্ট না করিয়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিলে ভাষাসম্বন্ধে অনেক উপকার হইতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, কেবল সংস্কৃত যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আর ইহার ব্যাকরণ লিখিতে অধিকারী নহেন। আমরা ভাষাশিক্ষা পড়িয়া সুখী হইলাম, এ গ্রন্থকার ইংরাজি ভাষায় বিশেষ কৃতী। তিনি 'বিরাম, মিশ্রবাক্য, জটিলবাক্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, কোন বাঙ্গলা ব্যাকরণে তাহা নাই। গ্রন্থকার ভাষা শিক্ষা

লিখিতে অনেক পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট পরিচয় আমরা পাইলাম; কিন্তু তাঁহাকে আরো পরিশ্রম করিতে হইবে। বাঙ্গলাভাষায় রচিত সকল পুস্তক তাঁহাকে পড়িতে হইবে, এবং পরে ভাষা-শিক্ষার উন্নতি করিতে হইবে। ভাষা-শিক্ষা মোটের উপর ভাল হইয়াছে; কিন্তু ইহাকে আরো ভাল করা চাই। গ্রন্থকার যদি এই বিভাগে সমস্ত চিন্তা ও অধ্যবসায়কে নিয়োগ করেন, তবে কালে তাঁহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক উপকার হইবে।

৫। কবিতা-কুসুম মালা।—শ্রীমুন্সী আবদুল আলা কর্ত্তৃক প্রণীত। বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্য একজন মুসলমান চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। গ্রন্থকার নূতন লেখক বটে, কিন্তু তিনি একেবারে ক্ষমতাহীন নহেন। গ্রন্থকার নিজের উপর নির্ভর করিয়া এতদূর উন্নতি করিয়াছেন, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। আমরা আশা করি, কালে তাঁহার লেখনী হইতে অপেক্ষাকৃত আরো ভাল পুস্তক বিনিসৃত হইবে।

৬। A Discourse on Education by C. C. Sen:—আমরা এই পুস্তক খানিকে পাঠ করিয়া সুখী হইলাম; বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইলে আরো সুখী হইতাম। মস্তিষ্কের চালনার সহিত শরীরের চালনা না হওয়ায় এবং প্রেম প্রভৃতি বৃত্তির উপযুক্ত পরিচালনা না হওয়ায় আমাদিগের দেশের ছাত্রজীবন যে ক্রমেই দূষিত এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে, এ বিষয়ে আমাদিগের একটুও সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের এই বক্তৃতাটীতে অনেক ছাত্রের উপকার হইয়াছে, এবং হইবে। আমাদের দেশের প্রত্যেক ছাত্রের এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি একবার পড়িয়া দেখা উচিত।

৭। মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ডং শ্রীযুক্ত হবীবর বেদান্তবাগীশেন অনুবাদিতং। এখানি রামায়ণ বটে, কিন্তু ইহার নায়ক সেই প্রাচীন সময়ের রাম নহেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে রামরাবণে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহারই কাহিনী ইহাতে লিপি-বদ্ধ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, পুস্তকখানি ব্যঙ্গোক্তি পূর্ণ। তৈলিকনন্দন প্রভৃতির চিত্র গুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে। রাম যে কোন ব্যক্তির নাম, তাহা নহে। দেশের এক শ্রেণীকে রাম বলা হইয়াছে। ইহাতে পুস্তকের কিছু সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। এই পুস্তকখানির ভাষা কিছু প্রাচীন ধরণের হইয়াছে, এই জন্য সকলের নিকট ভাল লাগিবে না। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষাকে যাঁহারা আদর সহকারে পাঠ করেন, সে কালের বাঙ্গালা তাঁহাদিগের নিকট হাসির জিনিষ। পণ্ডিতী বাঙ্গালার আদর আর থাকিতে পারে না। সহজ বাঙ্গালায় এ পুস্তকখানি লিখিত হইলে, অনেকের উপকারে আসিত। কারণ, ইহা উপযুক্ত সময়ের উপযুক্ত জিনিষ। বর্ত্তমান সময়ের রাজনীতির অনেক কূটতত্ত্ব ইহাতে সমালোচিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে আড়ম্বরপ্রিয় বঙ্গ সমাজের বিলক্ষণ উপকার হইবে। গদ্য-ব্যঙ্গোক্তিতে রাজনীতি সমালোচনা বাঙ্গলা ভাষাতে আর হয় নাই; এ সম্বন্ধে এখানি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছে। আমরা আশা করি, সকলেই পুস্তকখানিকে পাঠ করিবেন।

অন্যান্য পুস্তক এবং পত্রিকা ক্রমে সমালোচিত হইবে।

একতা।

"দেখ তুচ্ছ তৃণগুচ্ছ হইয়া মিলন,
বাঁধিয়া রাখিতে পারে, দুর্ব্বার বারণ!"

একতা সমাজতত্ত্বের ও ধর্ম্মনীতির একটী অতি প্রয়োজনীয় কথা। অনেকে ইহার সারবত্তা বুঝিয়া সমাজে বিবিধ প্রকারে ইহার গুণ বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখন আর তদ্রূপ কোন চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। একতার মহত্ত্ব এখন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মিলনের তাৎপর্য্য অজ্ঞেরাও বুঝিতে পারিয়াছে। সেই জন্যই "দশে মিলে করি কাজ; হারি জিতি নাই লাজ" "দশচক্রে ভগবান ভূত" ইত্যাকার নানা প্রকারের কথার সৃষ্টি হইয়াছে। ফলতঃ কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে তাহাতে দশজন লোকের যে মিলন আবশ্যক, এ তথ্য এখন সকলেই বুঝিয়াছে। কিন্তু তথাপি আমাদের একতা নাই, আমরা একতার মহত্ত্ব বুঝিয়াও অদ্যাপি একতা সাধন করিতে পারি নাই। একতার অভাবে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব, জাতীয় বল ক্রমে লোপ হইয়া আসিতেছে—সমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতেছে। ফলতঃ যদি এখন নিরপেক্ষভাবে সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে, একতার পরিবর্ত্তে সমাজ যে এখন কেবলই সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা উচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। যদি একতা আবশ্যক, তবে এত সাম্প্রদায়িকতা বাড়িতেছে কেন?

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্যাপার অসংখ্য ভাবে আমাদের জ্ঞানগোচর ও অসংখ্যরূপে বর্ত্তমান হইলেও মূলে যে এক, তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। এক এক প্রকার বৈজ্ঞিক পদার্থ হইতে সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জগতের সৃষ্টি হইয়া স্থিতি, সংহার পর্য্যায়ক্রমে সাধিত হইতেছে। ভৌতিক বিপ্লব ও উপপ্লবে জড়জগৎ অসংখ্য আকারে বিদ্যমান হইতেছে। ইহারই মধ্যে আবার সুন্দর একত্বের শৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। একত্ব হইতেই দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, প্রভৃতি অসংখ্যত্বের উৎপত্তি হইতেছে, আবার অসংখ্যত্ব হইতে সকলই পর্য্যায়ক্রমে একত্বে আসিয়া মিলিতেছে। ইহাই প্রকৃতিরূপী ব্রহ্মসনাতনের ভবলীলা। এই লীলার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আমরা আবার আমাদের পৃথক্ প্রাণীলীলা দেখাইতেছি।

আমাদের প্রাণীলীলা হইতেই সমাজ ও জাতির উৎপত্তি। ভবলীলা, যাহাকে আমরা নিরাপত্তিতে প্রাকৃতিক আবর্ত্তন বলিতে পারি, তাহার প্রসাদাৎ আমাদের এই মানবলীলা কয়েকটী সাধারণ নিয়মাবলীতে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই নিয়মাবলীর ফলে, সমগ্র মানবজাতি এক হইলেও, ইংরাজ এক জাতি, ফরাসি এক জাতি, ইটালিয়ান এক জাতি, হিন্দু এক জাতি, এবং হিন্দুর মধ্যে বাঙ্গালী আর এক জাতি; এই প্রকারে অসংখ্য জাতিভেদ সংঘটিত হইয়াছে। এই জাতিভেদ অস্বীকার করিলে জাতিত্ব বোধ থাকে না, তখন কেবল মনুষ্যত্বই আমাদের বিচারাধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু কোন্ সভ্য ব্যক্তি তাঁহার জাতিত্ব ছাড়িতে সম্মত? প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিত্বই এখন এক গৌরবের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। এই জাতিত্ব হইতেই

একত্বের বল অনুভূত হইয়াছে, এবং তাহাই মানবীয় স্বাধীনতা বোধের মূল। স্বাধীনতা না থাকিলে যে কোন সমাজেরই উন্নতি নাই, তাহা এক্ষণ অনেকেরই আলোচ্য হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেই আলোচনার ফলে সমাজতত্ত্ব ও ধর্ম্মনীতি ক্রমেই নূতন আকার ধারণ করিতেছে। সেই একই আলোচনার ফলে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দেশের এক জন লোক দেশের রাজা নহেন, এবং এক ব্যক্তির স্বাধীনতা, স্বাধীনতা নহে। সাধারণের যোগ ব্যতীত যেমন সমাজ উৎপন্ন হয় না, সাধারণের যোগ ব্যতীত সেইরূপ রাজত্বও প্রকৃত রাজত্ব নহে; প্রত্যুত কেবল স্বেচ্ছাচার মাত্র। এই প্রকারে রাজকীয় একাধিপত্য জন সমাজে ক্রমেই হেয় হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে সামাজিকতা ও জাতিত্ব বোধ দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাধীন প্রবৃত্তিও সংযমিত হইয়া আসিতেছে।

নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা মনুষ্য জাতি আদৌ নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। সাগর, পর্ব্বত, নিবিড়ারণ্য প্রভৃতি নৈসর্গিক বাধা দ্বারা জাতি সকল পরস্পর বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার বিভিন্নতাই ভাষা ভেদ ও ধর্ম্মভেদের প্রধান কারণ। তৎপরে আবার আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির প্রভেদ—কাজেই মনুষ্য সমাজ অসংখ্যভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নৈসর্গিক প্রভেদ বশতঃই দেখা যায় যে, একজন পার্ব্বত্য প্রদেশীয় লোক, শারীরিক ক্ষমতায় ও সাহসে যেমন সমতল প্রদেশীয় লোকাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির সূক্ষ্মতায় ও মানসিক অপরাপর উন্নতিতে তদ্রূপ নহে। কাজেই দুই জনার স্বভাব কখনই এক হইতে পারে না। এই রূপে পৃথক্ জাতিত্ব ও সমাজ উৎপন্ন হইয়াছে। আচার ব্যবহার ও ভাষার পার্থক্য হেতু জাতিত্বও আবার ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া প্রাদেশিক সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালী হিন্দুজাতি হইলেও হিন্দুস্থানী হইতে স্বতন্ত্র সমাজভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য পক্ষে দেখ, যখন পৃথিবীতে নৈসর্গিক প্রয়োজন বশতঃ মনুষ্য জাতি সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার আবশ্যকতা বুঝিয়াছিল, তখন প্রথমেই সমাজের কেন্দ্রস্বরূপ এক একটী পরিবারের আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রথমতঃ পারিবারিক শাসন দ্বারা গৃহস্থের আচার ব্যবহার নিয়মিত হয়। আদিম পারিবারিক শাসন হইতেই ধর্ম্মের এবং গৃহকর্ম্মের একতা সিদ্ধ হইয়াছিল। এক এক স্থানের অধিবাসী বহু পরিবার এই প্রকারে এক এক শাসন নীতির অধীন হইয়া আপনাদের আহার, পরিচ্ছদ, আমোদ প্রমোদের বিষয় এবং জীবন সুখকর করনার্থ আর আর যে যে বিষয়ের প্রয়োজন, তৎসমস্ত বিষয়েরই সাদৃশ্য ও একতা রক্ষা করিয়াছিল। ইহাই পল্লী সমাজ উৎপত্তির কারণ। এই সামাজিক একতা সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বিস্তৃত হইয়া এক দেশের বহুতর পল্লীকে একত্রিত করত এক নিয়মাধীন করিয়াছিল। এই রূপে জাতীয় সমাজের উৎপত্তি। একতার বিস্তৃতির চক্র কোন নির্দিষ্ট সীমাদ্বারা আবদ্ধ নহে। ধর্ম্ম বিস্তার দ্বারাই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই নশ্বর জগতে মানব হৃদয়ের ন্যায় গৌরবান্বিত পদার্থ আর কিছুই নাই। পৃথিবীতে ধর্ম্মভাব বিকাশের মূলই মানবহৃদয়। মানবীই মানবকে প্রথমে এই হৃদয় প্রাপ্ত করাইয়া সর্ব্বাগ্রে পারিবারিক ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিল। মনুষ্যের ভক্তি,

প্রীতি ও স্নেহ প্রথমে স্ত্রীদিগের দ্বারাই চালিত হইয়াছিল। স্ত্রীর আনুগত্যে, সেবা শুশ্রূষায়, প্রণয় ভাবে বিগলিত হইয়াই মনুষ্য পশুবৎ আচরণে ক্ষান্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপালনে ও রক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। এই নিমিত্তই আপনার নিমিত্ত যাহা প্রয়োজন, তদপেক্ষা অধিক দ্রব্যের আহরণার্থ মনুষ্য উত্তেজিত হইয়া ক্রমে কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদির বিস্তার দ্বারা সভ্যতা বৃদ্ধি করিয়া উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে। কল্পনা দ্বারা জড়োপাসনার আদি সূচনা হইয়া থাকিলেও প্রকৃত ঈশ্বরভক্তি হৃদয় হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রকারে যে যে দেশে আদিম কালে সর্ব্বপ্রথমে সভ্যতার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই সেই প্রদেশেই অগ্রে পৌত্তলিকতার উৎপত্তি। আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম বিশুদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও কোন সমাজ পৌত্তলিকতার সোপান আরোহণ না করিয়া তাহা এক কালীন প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। পৃথিবীর পশ্চিমাংশে এই রূপে পৌত্তলিকতার পরে খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং নৈসর্গিক সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, ও ভাষা ভেদ,জাতিভেদ ইত্যাদি না মানিয়া ঐ ধর্ম্ম ক্রমে প্রায় সমস্ত ইয়ুরোপেই বিস্তৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষে যাহা হইয়াছে, তাহাতেও ঐ একই নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। আর্য্যেরা জড়োপাসনা তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশে আনিয়াছিলেন, ক্রমে প্রকৃতির কৃপায় সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া ঘোর পৌত্তলিক হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব অনেক কাল পরে প্রাদুর্ভূত হইয়া এই পৌত্তলিকতা ধ্বংস পৃথক বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ঐ ধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মের ন্যায় কোন বাধা ও ভিন্নতা না মানিয়া প্রায় সমস্ত আসিয়া খণ্ডেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলতঃ যে নিয়মদ্বারা পৃথিবীতে অখণ্ড একতা সিদ্ধ হইতে পারে, ধর্ম্মই তাহার একমাত্র উপায়। বিশ্বপ্রেমই যে ধর্ম্মের মূল মন্ত্র, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি কখনও পৃথিবীর নানা অনৈক্য দূর হইয়া লোকসমাজে একতা সিদ্ধ হয়, তবে তাহা সেই ধর্ম্ম দ্বারাই হইবে।

খ্রীষ্টধর্ম্ম পৃথিবীতে বহুকাল প্রচারিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম তাহারও পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। তবে কেন অদ্যাপি ঐক্য সিদ্ধ হয় নাই? পাঠক একতাসিদ্ধ না হওয়ার কারণ অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তদুত্তরে যাহা বলা যাইতে পারে, আমরা ক্রমে বলিয়া যাইতেছি।

সমগ্র মানব সমাজকে একটী গোলকের আবরণস্বরূপ বিবেচনা করিলে, প্রত্যেক গৃহস্থই তাহার কেন্দ্র স্বরূপ। সমস্ত মানব ধর্ম্মই এই কেন্দ্র হইতে বৃত্তাকারে চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে। ছুটিতে ছুটিতে ক্রমে আবার কাল সাগরে অলক্ষ্যে মিশাইয়া যাইতেছে। কোন এক জলাশয়ের জলে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে, যে পরিমাণ বলের দ্বারা ঐ লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হয়, সেই পরিমাণ ঐ লোষ্ট্র পতিত হওয়ার স্থান হইতে জলের উপরিভাগে তরঙ্গচক্র উত্থিত হইয়া থাকে, ক্রমে জলাশয়ের আয়তনানুসারে ও বীচিচক্রের তারতম্যানুসারে, পরিধি সকল হয় জলের উপরিভাগে অলক্ষ্যে মিশাইয়া যায়, না হয়, তটে লাগিয়া প্রতিহত হইয়া থাকে। মানব সমাজ অসীম নহে, এবং মানবীয় ধর্ম্মভাবও কোন এক জন মহাপুরুষের অসীম বলের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। যিনি যতই দেবভাব

প্রাপ্ত হইয়া মানবের ধর্ম্মশিক্ষা জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হউন না কেন, কাহারই শক্তি অসীম নহে। সুতরাং কাহারও উদ্ভাবিত ধর্ম্ম সমস্ত মানব হৃদয়কে আলোড়িত করিতে পারে নাই। মানবহৃদয়ও স্বচ্ছ জলাশয়ের ন্যায় সমতল নহে, ইহার অনেক উচ্চতা ও নীচতা আছে, সুতরাং ঘাত প্রতিঘাতে বুদ্ধ ও যিশু-খ্রীষ্টের প্রচারিত বিশ্বপ্রেম নানা আকার ধারণ করিয়া ক্রমে কালের অনন্ত বক্ষে মিলাইয়া গিয়াছে। কেবল স্মৃতি হইতেই আবার নূতন নূতন চক্র সমুত্থিত হইয়া সমাজ আন্দোলিত করিতেছে মাত্র। ইহাতেই খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেও আবার সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি, আমাদের বঙ্গদেশে সম্প্রতি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতেও সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়াছে। বস্তুতঃ মানবজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দূর হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। অন্ধতা ও অজ্ঞতা ব্যতীত বিশ্বপ্রেম সর্ব্বজনীন হওয়ার আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান তরুর ফল কে আস্বাদন না করিয়া থাকিতে পারে? জ্ঞানামৃত পান করিয়া এক দিকে আমরা বুদ্ধদেবের দেশে থাকিয়াও বুদ্ধদেবকে চিনিতে পারিলাম না, বৈরাগ্য ভাবিয়া সকলই ঔদাস্য সহকারে উড়াইয়া দিলাম—নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রকৃত অর্থ কি তাহা পর্য্যালোচনা করিয়াও বিষয়াশক্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত যথোপযুক্ত রূপে মিলন স্থাপন করিতে না পারিয়া কর্ম্মজগতে অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিলাম, পক্ষান্তরে খ্রীষ্টধর্ম্মকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করিয়াও ইয়ুরোপ জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া তাহার বৈরাগ্যনীতির মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না, সুতরাং স্বার্থান্ধ হইয়া অনেক স্থলেই ঘোর অনর্থ উপস্থিত করিল।

এইরূপে ধর্ম্ম মানব সমাজে একতা সাধনের অত্যুৎকৃষ্ট উপায় হইলেও তদ্দ্বারা একতা সিদ্ধ হইল না। জ্ঞান ও বিশ্বাসের তারতম্যানুসারে এক একটী ধর্ম্ম আবার অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। মনুষ্য সমাজে জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রবল থাকিলে এরূপ বিভাগ নিবারণ অসাধ্য। মনুষ্যের জ্ঞান রাজ্য অসীম নহে; ইন্দ্রিয়াদির সীমাবদ্ধতা হেতু সময়ে সময়ে স্পষ্টতঃই আমাদের জ্ঞানের সীমা দেখিতে পাইয়া থাকি। ঈশ্বর ও ঈশ্বরের নিয়ম জানিবার জন্য মনুষ্যের জ্ঞান কত অসংখ্য দিকেই না ধাবিত হইয়াছে! কিন্তু প্রত্যেক দিকেই ইহা পরাস্ত হইয়া আসিয়া শেষে "তিনি জ্ঞানের অতীত" বলিয়া প্রবোধ পাইয়াছে। কিন্তু অন্য দিকে দেখ, হৃদয় রাজ্য অসীম বলিয়া অনায়াসেই প্রতিপন্ন হইতে পারিবে। জ্ঞান ও বুদ্ধিবল মিলিত হইয়া সময়ে সময়ে মনুষ্যকে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহার মুখ দ্বারা সকল প্রকার মিথ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মিথ্যা "ঈশ্বর নাই" এই কথা বাহির করাইয়াছে। ইহাতে যে মনুষ্যের কি প্রকার অশান্তি জন্মিতে পারে, যিনি নাস্তিকদের জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। এরূপ অশান্তি নিবারণের প্রধান ঔষধ হৃদয়। মনুষ্য হৃদয়ই মনুষ্য জগতে ঈশ্বরের রাজসিংহাসন। তিনি এইখান হইতেই তাঁহার অস্তিত্ব ও বিজয় ঘোষণা করিয়া থাকেন। জ্ঞানীর জ্ঞান তখন অজ্ঞানান্ধকারে অদৃশ্য হইয়া প্রস্থান করে। বুদ্ধিমানের বুদ্ধিবল এখানে দুর্ব্বলতার শেষ হইয়া কোথায় মিলা-

ইয়া যায়, কেহই বুঝিতে পারে না। বস্তুতঃ মনুষ্য জগতে হৃদয়ের ক্ষমতা অসীম, একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

পাঠক, মনুষ্যের দুর্দ্দান্ত জ্ঞান ও বুদ্ধির সূক্ষ্মতা দ্বারা মনুষ্যের কি প্রকার অহিত সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা বুঝিবার জন্য একবার ইংলণ্ডের প্রধান চিন্তাশীল মহাপুরুষ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের স্বরচিত জীবন বৃত্তান্ত স্মরণ করুন। তাঁহার উন্মত্ততা প্রাপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ জ্ঞান রাজ্যের সীমা প্রাপ্তি। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, জ্ঞান দ্বারা মনুষ্যের উন্নতি যত দূর হইতে পারে, তাহা এক সময়ে অবশ্যই সিদ্ধ হইবে; কিন্তু তাহার পর মানব জীবনের আর কি বাকী রহিল? তখন জীবনভার বহন করা যে প্রকৃত প্রস্তাবেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে? তখন এই ভাবনাতেই তিনি অধীর হইয়া নরকবৎ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। কেহই তাঁহার তদবস্থায় ব্যথার ব্যথী ছিল না। এ দুঃখ তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় রাজ্যের কপাট তখন সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ ছিল। তিনি চিত্তের শান্তি বিধান জন্য একবার কাব্য, একবার সঙ্গীত এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে এক একটী উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার জীবন যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, যখন এরূপ ভাব হইয়া উঠিল, তখন হঠাৎ করুণাময়ের করুণা কণা বিতরিত হইল—তাঁহার হৃদয়ের দ্বার অতি সামান্য কৌশলে উন্মুক্ত হইয়া গেল। তিনি দুঃসহ নরক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

ফলতঃ মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব প্রদান করিতে হৃদয়ই এক মাত্র পদার্থ; জ্ঞান হৃদয়ের সহিত সংযুক্ত, অথবা অধিকতর বিশুদ্ধভাবে বলিতে হইলে—হৃদয়ের শাসনাধীন না হইলে মনুষ্যকে কেবল নরক যন্ত্রণার দিকেই টানিতে থাকে। হায়, কতদিনে মনুষ্য জ্ঞানগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া হৃদয় মাহাত্ম্যে যোগ দিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব সাধন করিবে! মনুষ্যত্ব না দেবত্ব? বুদ্ধ, চৈতন্য, যিশুখ্রীষ্ট—ইঁহারা মানব জাতিকে কি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন? ইঁহারা মনুষ্যকে কি দেখাইয়া ঈশ্বরের প্রেমে এমন মাতাইয়া গিয়াছেন? অবশ্যই বলিতে হইবে জ্ঞান নহে, বুদ্ধি নহে, ক্ষমতা নহে, বল নহে—কেবল হৃদয়, সীমা-শূন্য অনন্তের দিকে প্রধাবিত মানব হৃদয়। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, এই হৃদয়রূপ সিংহাসনেই মহেশ্বর শিব উপবিষ্ট আছেন। তোমরা হৃদয় ভুলিয়া কাহার উপাসনা করিতে ছুটিতেছ? কাহার অনুসন্ধান করিতেছ? ঈশ্বর? এই বিশ্ব ব্যাপারের অধিপতি? তিনি স্ত্রী না পুরুষ? তিনি আমাদের মা না বাবা? কি বলিয়া তাঁহাকে ডাকিব? কি বলিয়া তাঁহাকে প্রাণের কথা বুঝাইব? যদি ইহার উত্তর চাও, তবে ভাই পাঠক, একবার হৃদয়ের কাছে কর্ণ রাখ। তোমাকে কি এ জন্মে কেহই ভাল বাসে নাই? যদি কখনও ঘুণাক্ষরেও কাহারও ভালবাসা (ভক্তি, প্রীতি বা স্নেহ) পাইয়া থাক, তবে তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, সহজ উত্তর সহজ ভাবায় প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

আমরা জ্ঞানবুদ্ধি সহকারে ক্রমে পারিবারিক প্রয়োজন হইতে সামাজিক প্রয়োজনে, সামাজিক প্রয়োজন হইতে জাতীয় প্রয়োজনে, এবং জাতীয় প্রয়োজন হইতে অবশেষে মানবীয় প্রয়োজনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি যে, প্রথমে আমরা মানবীয় প্রয়োজন হইতেই পারিবা-

রিক প্রয়োজন লাভ করিয়াছিলাম। একা না থাকিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলিয়াছিলাম, উভয়ের স্বার্থ এক করিয়াছিলাম, সন্তান পালন করিয়াছিলাম। এক স্বার্থে পাঁচ জনে পাঁচ রকম কার্য্যে লিপ্ত হইয়া গৃহস্থাশ্রম সৃজন করিয়াছিলাম। ইহাই আমাদের মৌখিক স্বার্থ ত্যাগ অথবা স্বার্থের সম্মিলন। প্রত্যেক মনুষ্যেরই পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থ আছে। এইরূপ পাঁচ জনের পৃথক্ স্বার্থ হৃদয় দ্বারা একীভূত হইয়া গৃহস্থাশ্রমের অবতারণা হইল। আমি একা যে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা একা না খাইয়া পাঁচ জনে মিলিয়া খাইতেছি; আবার প্রয়োজন হইলে যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, অথবা সাধারণরূপে অধিক প্রিয়তম, তাহাকে সমস্ত দিয়া আপনি অনাহারে থাকিতেছি। দুর্ভিক্ষ সময়ে আজিও সুসভ্য লোকের মধ্যে দরিদ্র ব্যক্তি সস্ত্রীক অনাহারে থাকিয়া সন্তানদিগকে আহার করাইয়া থাকেন, ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। জ্ঞানবান মানব! তুমি জিজ্ঞাসা করিবে, জীবন যুদ্ধে কে পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে? আমি বলিতে পারি, তোমার যদি হৃদয় থাকিত তাহা হইলে তুমি কখনই একথা জিজ্ঞাসা করিতে না। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার জন্য মরিতে কাতর হয় না। প্রকৃত ভালবাসার পাত্রকে পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে পারিলেই অনেকে চরিতার্থ হন। পিতা যদি পুত্রকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে পারেন, তবে তদপেক্ষা তৃপ্তির বিষয় আর কিছুই নাই। পক্ষান্তরে পুত্রশোকগ্রস্ত পিতার অবস্থা ভাবিয়া দেখ। এই রূপে স্নেহের, ভক্তির, ও প্রেমের আধার স্বরূপ ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, ও সন্তানের সাক্ষাতে মরিতে কাহার না প্রবৃত্তি হয়? কেনা বলিবে যে, যদি মরাই আবশ্যক, তবে যেন এই রূপেই মরিতে পাই? বস্তুতঃ হৃদয় মনুষ্যের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই প্রকার জাগ্রত থাকে।

স্বার্থের সম্মিলন ব্যতীত মানব সমাজের নিরবচ্ছিন্ন হিত আর কিছুর দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে না। মনুষ্যের জ্ঞান এক্ষণ মনুষ্যকে এ পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছে। এই জ্ঞানের নিমিত্তই, মিল, বেন্থাম, স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকগণের এত আদর হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান শক্তি নহে, হৃদয়েই আমাদের যথার্থ শক্তির স্থান। জ্ঞান যাহা শিক্ষা দিয়াছে, হৃদয় তাহা অনুমোদন না করিলে কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। মনুষ্যের প্রবৃত্তি জাগ্রত না হইলে করণেচ্ছা জন্মে না। করণেচ্ছা ব্যতিরেকেও কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। প্রবৃত্তির বাসস্থান হৃদয়ে:—ভালবাসা, অর্থাৎ ভক্তি, স্নেহ ও প্রীতিতে। যদি স্বার্থের মিলন চাও, তবে ভালবাসা লইয়াই অগ্রসর হও। ভাল না বাসিলে কখনই তোমার স্বার্থত্যাগ প্রবৃত্তি জন্মিবে না। স্বার্থত্যাগ প্রবৃত্তির অভাবে, স্বার্থের সম্মিলন অর্থাৎ একতা অসম্ভব।

আমরা আজ পাঠকগণকে একতার মাহাত্ম্য, গৌরব, ও উদ্দেশ্য বুঝাইতে অগ্রসর হই নাই। এ সম্বন্ধে অনেক লেখকই অনেক লিখিয়াছেন। সে সকল লেখার সমবেত ফলে অবশ্যই ঐ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। একতার বলে যে তুচ্ছ তৃণগুচ্ছও দুর্ব্বার বারণকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, তাহা আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরাও জানিতেন। ফলতঃ একতা সাধন কি প্রকারে হয়, তাহাই দেখা বর্ত্তমান প্রস্তাব লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় পাঠক অবশ্যই বুঝিতে

পারিয়াছেন যে, ধর্ম্মই একতা সাধনের উৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু উৎকৃষ্ট উপায় হইলেও মানবজাতি তদবলম্বনে সিদ্ধ কাম হইতে পারে নাই। জ্ঞান ও ভেদবুদ্ধি তাহাতে বাধা দিয়াছে। বিশুখ্রীষ্ট ও বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম বিশুদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও তাঁহাদের শিষ্যেরা ভেদবুদ্ধি দ্বারা উহার অনেক ব্যতিক্রম ঘটাইয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃত খ্রীষ্ট অথবা বৌদ্ধনীতি আজি কালি সামাজিক আচার ব্যবহারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া খ্রীষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে কি তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। যে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে যে মনুষ্য মাত্রই এক ঈশ্বরের সন্তান, তোমরা বাটীতে যেমন আপন সহোদর ও সহোদরাকে ভাল বাসিয়া থাক, সমগ্র মানব ও মানবীকেই সেই প্রকারে ভাল বাসিও, অন্যে তোমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিলে সুখী হও, অন্যের প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিও, সেই খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষার ফলে হইল কি? না খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান পবিত্র দেশ লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কত অসংখ্য নর নারী অকারণে ধর্ম্ম যুদ্ধে রণশায়ী হইয়া প্রকৃত অধর্ম্মেরই বিজয় ঘোষণা করিতে লাগিল। হায়, মনুষ্য জাতির দুষ্প্রবৃত্তি দমন কি দুঃসাধ্য ব্যাপার! যেখানে মনুষ্যজাতির পরিত্রাণ জন্য যিশু বিপক্ষ হস্তে আপন দেহ সমর্পণ করিতে কাতর হন নাই, সেখানে তাঁহার এই বিশ্বপ্রীতি পূর্ণ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অগণ্য প্রাণী হিংসায় উন্মত্ত হইয়া কত বীভৎস কাণ্ডই না করিল! এ উন্মত্ততা বুঝিতে হইলে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? বুদ্ধদেব কি শিক্ষা দিয়াছে, একবার তাহা অন্বেষণ কর। ফলতঃ সাম্প্রদায়িকতা যে প্রবৃত্তির ফল, সেই প্রবৃত্তি ধ্বংস করাই ঐ দুই মহাপুরুষের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তি কিছুতেই সেরূপ হইল না। যাহারা সর্ব্বদা ঐ দুই মহাত্মার নিকটে থাকিত, তাহারাও তাঁহাদিগকে জীবিত কাল মধ্যে কেহ চিনিতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের মৃত্যুর পরেই তাঁহাদের গৌরব স্রোত অসংখ্য খাতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের শিষ্যেরা তাঁহাদের মতদ্রোহী ব্যক্তিদিগকে ভাল বাসিতে না পারিয়া ক্রমে সাম্প্রদায়িক হইয়া উঠিল। এই প্রকারে ধর্ম্মের উচ্চ উদ্দেশ্য অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ফলতঃ ধর্ম্মের দ্বারা মূলে যে একতা সাধনের সূচনা হইয়াছিল, গোঁড়ামী দ্বারা তাহা এক কালীন্ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। গোঁড়ামীর নিমিত্তই একজন খ্রীষ্টান একজন হিন্দুর বিদ্বেষী। আবার একজন হিন্দু আর একজন ব্রাহ্মের বিদ্বেষী। একজন ব্রাহ্মও আবার একজন হিন্দুকে পৌত্তলিক মনে করিয়া মুসলমানের ন্যায় গোঁড়ামী প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিদ্বেষ বুদ্ধি দ্বারাই এখন সকল প্রকার ধর্ম্ম সাধন চলিতেছে; সুতরাং ধর্ম্মের সাহায্যে আর একতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? কোথায় বা ভালবাসার উচ্চ নীতি, আর কোথায় বিদ্বেষ বুদ্ধির অধমতা! এই অধমতাই যখন ধর্ম্মের পরিচালক হইয়া উঠিল, তখন ধর্ম্মের নামে মনুষ্য দ্বারা কত অধর্ম্মই না কৃত হইয়াছে! সমুদায় ইয়ুরোপের ধর্ম্ম ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। আমরা বিশেষ বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া প্রস্তাব বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। ফলতঃ যে কেহ গোঁড়ামীর আদর করেন, তিনি তাহা নিজেই

পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। তাঁহারা দেখিবেন, তাঁহাদের মূল প্রশস্ত ধর্ম্ম ভালবাসা গোঁড়ামী দ্বারা কত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং সমাজে কত অনিষ্টোৎপত্তি করিতেছে।

যাহা অশিব, অশুভ ও অধর্ম্ম, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা না করিলেও প্রকৃতি আমাদিগের নেত্রে অঙ্গুলী প্রদান পূর্ব্বক দেখাইয়া বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। গোঁড়ামী হইতেই ইয়ুরোপে ধর্ম্মযুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। যুদ্ধে যুদ্ধে প্রতিনিয়ত ক্ষত বিক্ষত ও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ক্রমে ইয়ুরোপীয় জাতি সকলের সাম্য বোধ জন্মিয়াছে। এই বোধ দ্বারা চালিত হইয়াও মনুষ্য জাতিকে কম নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় নাই। এই সাম্য বোধই ফরাসী বিপ্লবের প্রধান হেতু; আর এই সাম্য বোধ হইতেই ইয়ুরোপের রাজকীয় অত্যাচার এবং ধর্ম্ম সমাজের স্বেচ্ছাচার নিয়মতন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণ ইয়ুরোপের জাতিত্ব ও সমাজ এই সাম্য নীতি দ্বারাই চালিত হইতেছে। ধর্ম্মের বিকৃত ভাব হইতে গোঁড়ামীর উৎপত্তি; তাহার ফলে ইয়ুরোপে ঘোর অত্যাচার ও নৃশংসতা সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণ গোঁড়ামীর বিষময় ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া লোকে উদারতার আদর করিতে শিখিয়াছে। সাম্য ও উদারতার ফলেই আফ্রিকার এক নিরীহ জাতি দাসত্বের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। তথাপি এখনও নিগারদিগের প্রতি ইয়ুরোপীয় জাতির ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রশমিত হয় নাই। নিগার নামই তাহাদিগের মধ্যে ঘৃণাব্যঞ্জক হইয়া রহিয়াছে।

আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর প্রকৃতির স্বামী, আর প্রকৃতি আমাদের জননী। ঈশ্বর আমাদের সকলকেই সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সকলের পালন কর্ত্তাই তিনি। কিন্তু ঈশ্বরাপেক্ষাও প্রকৃতির সহিত আমাদের আরও নিকট সম্বন্ধ; প্রকৃতিই আমাদিগকে প্রকৃত প্রস্তাবে অশন বসনাদি জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু বিতরণ করিতেছেন। এই বিতরণ পক্ষপাত দূষিত বলিয়া অনেকের নিকট আপাততঃ প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই জানা যায় যে, পক্ষপাতিত্ব প্রকৃতির নহে, সে কেবল আমাদের নিজের গণ্ডগোল মাত্র। প্রকৃতি আমাদিগকে সকলই দিয়াছেন, কেননা কেবল যাহা চাহি তাহা নহে, যাহা না চাহি তাহাও দিয়াছেন। আমরা শিক্ষা করিব, ভাল করিয়া বুঝিব, এবং ভোগ করিব। ইচ্ছা ও স্বাধীনতা পর্য্যন্ত তিনি আমাদিগকে দান করিয়া এক্ষণ আমাদের কর্ত্তব্যস্পৃহা ও ক্ষমতা বুঝিতেছেন। আমরা কেমন শিক্ষা করি, কেমন মনোনীত করি, এবং কেমন ভোগ করি, প্রকৃতি কেবল তাহাই দেখিতেছেন ও আবশ্যকমত আমাদের শাস্তিবিধান করিতেছেন। প্রকৃতির ভাণ্ডার অনন্ত, আমাদের কামনা ও স্বাধীনতাও অনন্ত। অনন্ত আসিয়া অনন্তে মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে, কেবল গণ্ডগোলের ফলে আমাদের জীবন দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়া সময়ে সময়ে এমন সাধের ভাণ্ডারেও দুঃখ কষ্টের অস্তিত্ব আমাদের অনুভব করাইয়া দিতেছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, গণ্ডগোল কি? আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব, তোমার আমার স্বার্থের বিরোধেই সেই গণ্ডগোল। ইংরাজেরা ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসী হইলেও তাহাদের রাজ্যে আজ সূর্য্য অস্তমিত হয় না, তাহাদের জাতিত্ব অতি ক্ষুদ্র জাতি হইতে সমুদ্ভূত হইলেও

তাহারা আজ প্রাচীন মহান্ হিন্দু জাতিকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেছে, এবং সহস্র প্রকারে ভূমণ্ডলস্থ মানবজাতির সমক্ষে আপনাদের গুণগরিমা ও ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমরা প্রকৃতির রাজভাণ্ডার সদৃশ এই অপূর্ব্ব শোভাস্থলী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াও আজ অন্ন বস্ত্রের জন্য সেই ক্ষুদ্র দ্বীপবাসীদিগের শরণাগত হইতেছি। কেহ বলিতে পারেন, ইহা কি প্রকৃতির দোষ নহে? বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ শস্যশালিনী বলিয়াই কি তাহার এই দুর্দ্দশা নহে? আমরা বলি, ইংরাজরাও বলিতে পারেন, "আমরা ক্ষুদ্র দ্বীপে অবরুদ্ধ থাকিয়া না খাইয়া মরিব কি? ভারতবর্ষ এমন সোণার দেশ, তোমরা চক্ষু মুদিয়া চিরকাল কেন সুখ ভোগ করিবে? তোমাদের সুখের কাল গিয়াছে, এক্ষণ আমরা কিছুকাল সুখভোগ করি।" ইংরাজের স্বার্থ, বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর স্বার্থের সহিত এইরূপ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হওয়াতেই আজ বাঙ্গালী এবং ভারতবাসীর এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আজ ভারতবাসী প্রকৃতির কুবেরের ভাণ্ডারের মধ্যে থাকিয়া নির্ধন ও নিঃসম্বল এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরে থাকিয়াও অন্নের জন্য কাঙ্গাল।

আমরা বলিতেছি, আইস ভাই ইংরাজ, তোমাদের সহিত স্বার্থের সম্মিলন করি, তোমরা ও আমরা এক হই। অমনি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতীয় স্বাধীন ইংরাজ রোষ কষায়িত লোচনে আমাদের দিকে স্বাধীন দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এবং গৌরব-স্ফীত হইয়া মনে মনে বলিতেছেন, "এ হতভাগ্য জাতিকে শিক্ষাদান করা ভাল হয় নাই। ইহারা ইংলণ্ডীয় স্বাধীনতা ও স্বার্থমিলনের গন্ধ পাইয়াছে, এবং ক্রমে এত দূর স্পর্দ্ধান্বিত হইয়াছে যে, আমাদের সমকক্ষ হইতে চাহে। কি বিপদ!"

ভাই ভারতবাসী! আর দেখিতে হইবে না। আর বুঝিতে হইবে না। আমাদের দোষে আমরা যথার্থই এখন ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিয়াছি। এইরূপ ঘৃণাস্পদ হওয়া যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহা করিতে যত্ন করা এখন আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের জননী স্বরূপা প্রকৃতিরূপা জন্মভূমি আমাদিগের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, আমরা কি করি, তাহাই দেখিতেছেন; কিন্তু অন্যায়াচরণ করিলে তিনিও আর আমাদিগকে সন্তান বলিয়া গণ্য করিবেন না। মাতার নিকটেও আর আমরা ভিক্ষা পাইব না। এখন পরের মুখাপেক্ষা ত্যাগ কর। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মনীতির ফলে যতদূর হইতে পারে তাহা হইয়াছে। দেশীয় খ্রীষ্টান! তুমিও খ্রীষ্টান হইয়া দেখিয়াছ, রীতিমত খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াও ইংরাজের ভ্রাতৃবৎ আচরণ পাও নাই। ইংরাজের স্বার্থ যেখানে নাই, সেখানে বরং ভ্রাতৃ বলিয়াও পরিচয় দিতে পার, কিন্তু যেখানে স্বার্থ আছে, সেখানে কোন মতেই অগ্রসর হইতে সাহসী হইও না। তাহা হইলে তোমার খ্রীষ্টধর্ম্মের ভ্রাতৃত্ব কোথায় উড়িয়া যাইবে, কেহই জানিতে পারিবে না।

ফলতঃ শুদ্ধ অধীনতা-নিপীড়িত এই ভারতভূমি বলিয়া নহে, সকল স্থানেই স্বার্থপরতার ঐ একই গতি। যেখানে স্বার্থের বিরোধ, সেখানেই গণ্ডগোল। ইংলণ্ডের অভ্যন্তরেও স্বার্থের গণ্ডগোল হেতু কত যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া গিয়াছে। ফ্রান্সদেশে কতবার রাষ্ট্র বিপ্লব হইল, তথাপি বিরোধ ঘুচিল না। যাহা ধর্ম্মে পারিল না, ধর্ম্মনীতিতেও পারিল তাহা আর কিসে পারিবে, আমরা

বুঝিতে পারি না! ফলতঃ একতাই বল, আর সাম্যই বল, অথবা, অধিক বিস্তৃত রূপে, স্বার্থের সম্মিলনই যা বল, সকলই এক বিশ্বপ্রেম নিঃসৃত ধর্ম্ম নিয়ম। এ নিয়ম পালনে লোকের সহজে প্রবৃত্তি জন্মে না, কিন্তু প্রকৃতি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া ক্রমে এই দিকে লওয়াইবেন, তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মবল পৃথিবীতে কখনই হীনবল নহে। ধর্ম্মই আবার এক সময়ে পৃথিবীতে একতা সাধনের, সাম্য বিধানের এবং স্বার্থের সম্মিলন সংঘটনের একমাত্র উপায় হইয়া উঠিবে। ভট্ট মক্ষমূলর যে প্রণালীতে ভাষা সমূহ ও ধর্ম্ম সমূহের পর্য্যালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অনেক আশা হয়।*

সার্ব্বভৌম একতা সাধনের যে উপায় তাহাই উপরে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ সার্ব্বভৌম একতাই সম্পূর্ণ নীতি নহে। মানব সমাজে একতা বহু সূত্রে গ্রথিত হইয়াই শৃঙ্খলা রক্ষা করে। আমরা মৌলিক সার্ব্বভৌম একতা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের কেন্দ্র স্বরূপ গৃহস্থাশ্রমে পঁহুছিতে ক্রমান্বয়ে জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক একতার প্রয়োজন দেখিতে পাই। ইংরাজ আমাদের দেশ হইতে জাতীয় একতাসম্ভূত ব্যবসায় ও বাণিজ্যের বলে সমুদায় ধন শোষণ করিয়া লইয়া গেলে আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া এই ক্ষতি নিবারণের উপায় নাই। এখানে আমাদের আত্মরক্ষা আবশ্যক। তজ্জন্য আমাদেরও জাতীয় একতা চাই। ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়গণ ভারতীয় তন্তুবায়গণের অন্ন মারিয়াছে, শুদ্ধ ভারতীয় তন্তুবায়গণের নহে, তাহারা ভারতীয় সকল সম্প্রদায়েরই সমান অন্ন মারার পথ আবিষ্কার করিয়াছে। আমাদের তন্তুবায়গণের মধ্যে কেহ কেহ এখন বি এ, এম এ পাস করিয়া জাতি ব্যবসায় ছাড়িয়া চাকরী ধরিয়াছেন। ভারতে এখন এমন কয়েক শ্রেণীর লোক হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের চাকরী ভিন্ন উপায় নাই। ভারতের ব্রাহ্মণজাতি ইহার এক উদাহরণ স্থল। যখন ভারতে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন তাহার একটী মহৎ উদ্দেশ্য ছিল, শ্রম বিভাগই সেই উদ্দেশ্য। ইহার আর একটী শুভ ফলেরও আমরা উল্লেখ করিতে পারি। ইহা পুরুষানুক্রমে একব্যবসায়াবলম্বনে বংশগত প্রতিভার উৎপত্তি। যে যে ব্যবসায় করে, তাহার পুত্রের সেই ব্যবসায় শিক্ষা অতি সহজে হইতে পারে। এই নিমিত্তই বোধ হয় প্রাচীন ঋষিগণ জাতিভেদের এরূপ নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার শুভ ফলও ফলিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণ ইংরাজেরা অধিকতর উন্নতি দেখাইয়া আমাদের তাঁতিদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন, তাহাই বলিয়া কি তাঁতিদিগের পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করা উচিত? ব্রাহ্মণদিগের যাহা পৈতৃক ব্যবসায় ছিল, এক্ষণ ক্রমেই তাহার প্রয়োজন রহিত হইয়া আসিয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের নির্জ্জন চিন্তা ও পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্র উৎপাদন জন্য এখন আর কেহই কপর্দ্দক ব্যয় করিতে সম্মত নহে। বরং পূর্ব্বে ধনী ব্যক্তিরা যাহা কিছু বৃত্তি ব্রহ্মত্র দান করিয়া গিয়াছিলেন, এখন নানা গতিকে ব্রাহ্মণগণ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অনেক স্থলে ব্রাহ্মণদিগের চাকরী না করিলে এখন

* তৎপ্রণীত Chips from German workshop ও Science of Language দেখ।

আর জীবনোপায়ের অন্য কোন পন্থা নাই। শূদ্রগণের ত কথাই নাই; তাঁহাদের কাজই দাসত্ব, প্রাচীন সমাজে তাহাই নিয়ম হইয়াছিল। এখন তাহাদের চাকরীতে কাহারই কোন আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তন্তুবায় কেন স্বীয় ব্যবসায়ের উন্নতি চিন্তা না করিয়া চাকরীর চেষ্টা করিবে?

আমরা হিন্দু, আমাদের সমাজ হিন্দু সমাজ, আমাদের ধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্ম। কিন্তু আমরা এখন এ হিন্দুত্বেরও একত্ব রাখিতেছি না। বস্তুতঃ ব্রাহ্মগণ হিন্দুত্ব ছাড়িয়া পৃথক্ সমাজভুক্ত হইলেন কেন? আমরা বলি এ জাতীয় গণ্ডগোলের সময় এরূপ একতাভেদ কখনই শুভদায়ক নহে? হিন্দু সমাজ এইরূপ অসংখ্যভাগে বিভক্ত হওয়াতেই আমরা একতার বল হারাইয়াছি। আমাদের সামাজিক শক্তি নাই। সমাজে নিয়ম শৃঙ্খলা নাই, শাসন নাই, সংযম নাই, আত্মরক্ষাও নাই। যে যে দিক্ হইতে পারে, সে সেই দিক্ হইতেই আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে, আমরা অবাক হইয়া সকল অত্যাচার সহ্য করিতেছি। কেহই অন্যায় আক্রমনের সম্মুখীন হইতে সাহসী নহে। এক জন একটী অতি ন্যায়সঙ্গত অনুষ্ঠান করিলেও আর কেহই তাহার সহিত যোগ দিবে না। কেহই সমাজের নিকট দায়ী নহে, সামাজিক অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান নাই। কন্যা বিক্রয় প্রথা রহিত হওয়া উচিত, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত হইলেও তাহা রহিত হইবেক না। বস্তুতঃ ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার অসংযত ভাবে বেগবান হইয়া সামাজিক বহুতর বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু ইহাতে ব্যক্তিগত ক্ষতিবোধ হইলেও সামাজিক ক্ষতিবোধ জন্মিতেছে না। সমাজ যে এখন কি হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের এখন সামাজিক কর্ত্তৃত্ব কিছু মাত্রই নাই। কাহার সমাজে বাস করিতেছি, ইহা চিন্তা করিলে মনে এক অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার হয়। ফলতঃ একতা না থাকিলে কি প্রকারে বল উৎপন্ন হইবে? আমি এক জন ধনবান ও ক্ষমতাশালী লোক, আমার গ্রামের এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ এই প্রকার কন্যা বিক্রয়ের ব্যবসার দ্বারা ধনসংগ্রহ করিতেছে দেখিতে পাইলাম, আমার ঐ প্রথা ভাল লাগিল না। গ্রামের কাহারই ভাল লাগে নাই, অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম। কিন্তু অন্যান্য স্থানেও এখন ব্রাহ্মণে ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে, একা এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপর অজাতক্রোধ হই কেন, ভাবিয়া আমি নিরস্ত হইলাম। কিন্তু যদি আমাদের একতা থাকিত ও সামাজিকতা বোধ থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই কোন প্রকার সামাজিক দণ্ড দ্বারা এরূপ ব্যবসায় বন্ধ করা যাইতে পারিত। ঐ ব্যবসায়াবলম্বী সকল ব্রাহ্মণকেই ব্রাহ্মণশ্রেণী হইতে পতিত করিলেই অনায়াসে সামাজিক কর্ত্তৃত্ব খাটিতে পারিত এবং কুপ্রথাও অনায়াসেই নিবারিত হইয়া যাইত। কিন্তু করে কে? আমি এক-জন কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি, সুতরাং হিন্দুর অখাদ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান ইত্যাদি অনুষ্ঠান দ্বারা পিতা মাতা ভ্রাতা প্রভৃতির সংশ্রব হইবে আমাকে পৃথক হইতে হইয়াছে, সুতরাং আমার সহিত এখন কোন হিন্দু ভ্রাতারই সহানুভূতি নাই। আমি সামাজিক কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেও কেহই আমার সাহায্য করিবে না।

ফলতঃ নানা কারণে এখন আমাদের সামাজিক শৃঙ্খলা একবারেই বিনষ্ট হইয়াছে। শুদ্ধ সামাজিক নহে, পারিবারিক শৃঙ্খলাও

আর নাই। এক পরিবারের মধ্যে দুই জন ব্রাহ্ম, একজন নাস্তিক, আর ৫ জন হিন্দু। ইহাতে কি প্রকারে শৃঙ্খলা থাকিতে পারে? একতাই বা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? একতা না থাকিলেই বা বল কোথা হইতে আইসে? হায়, হায়, কি দুর্দ্দশাই আমাদিগকে] একেবারে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ইহার উপর আবার আইনের অত্যাচার। বিচার সহজ হইয়াছে বলিয়া মোকদ্দমার অভাব নাই। প্রত্যেক পল্লী হইতেই অসংখ্য মোকদ্দমা বৎসরে বৎসরে ন্যায় বিচারালয়ে উপস্থিত হইতেছে। ইহাতে গৃহভেদ যে কত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। কত গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও মোকদ্দমা করিতে ছাড়িতেছে না। সকল প্রকার দুর্নীতিই এই উপলক্ষে আমাদিগকে আশ্রয় করিয়া বসিয়াছে। মিথ্যা সাক্ষ্য, জাল ও বঞ্চনা অপরাধ অলক্ষ্যে মহানর্থ ঘটাইতেছে। ইংরাজ রাজপুরুষ চুরি ডাকাইতি দস্যুতা ইত্যাদির নিবারণে ও দণ্ড বিধানে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু এই সকল দুর্লক্ষ্য অপরাধের কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ যে তাহার সংবাদ রাখে, এমন বোধও হয় না। হিন্দু সমাজ, অন্যান্য দোষে দুষিত হইলেও, পূর্ব্বে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তির বিলক্ষণ দণ্ড বিধান করিত। সমাজের ভয়ে প্রায়ই কেহ সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইত না। এক্ষণ অর্থ দ্বারাই সকল সাক্ষী বশীভূত হয়।

এ বিশৃঙ্খলা ও গোলমালের সময়ে আমাদের একটা প্রণালী উদ্ভাবন করা আবশ্যক। প্রণালী ব্যতীত শৃঙ্খলা উৎপন্ন হইবে না। শৃঙ্খলা নহিলে একতার বল পাওয়া যাইবে না। একতার নিমিত্ত আমাদের সমস্ত বঙ্গবাসী এবং বঙ্গের যোগে সমস্ত ভারতবাসীর একটী সাধারণ উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক। রাজনৈতিক আন্দোলনে যে সাধারণ উদ্দেশ্য হইতে পারে, ইহা সেরূপ উদ্দেশ্য নহে। আমাদের এ পতিত জাতির রাজনৈতিক শক্তি জন্মিতে এখনও বহু বিলম্ব। যাহাদের ঘরে ঘরে এখন অজস্র গৃহ বিবাদ চলিতেছে, তাহাদের রাজকীয় ক্ষমতা প্রাপ্তির আশা এক্ষণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। নগরবাসীগণ এখন সে কল্পনায় কিছুকাল স্বপ্ন দেখুন। আমাদের পল্লী সমাজ প্রকৃত জাতীয় সমাজ, আমাদের সেই সমাজ উদ্ধারের উপায় কি, এখন আমাদিগকে তাহাই ভাবিয়া স্থির করিতে হইবে।

একতার সাধারণ উদ্দেশ্য ধর্ম্ম হইলে চলিবে না, কেননা এখন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা যে সত্বর আবার একতাকারে পরিণত হইবে, তাহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এখন মুসলমানের সংখ্যাও বড় কম নহে। তাহাদিগের সঙ্গেও আমাদিগের সময়ে সময়ে স্বার্থের মিলন করিতে হইবে। আমরা হিন্দুত্বও ছাড়িতে পারিব না, কেননা হিন্দুই এখনও ভারতের প্রধান ও বহুসংখ্যক অধিবাসী। একতার বল উৎপাদন করিতে হইলে সংখ্যার বলও উপেক্ষিত হইবার বিষয় নহে। অধিকন্তু হিন্দু আমাদের প্রাচীন নাম, অভ্যাস বশতঃই অধিকাংশ লোকে এই নামই ভালবাসে। অতএব হিন্দুত্বের যাহা কিছু সার আছে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া সমাজ দৃঢ়ীভূত করাই আমাদের সাধারণ লক্ষ্য হউক। এই লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া সমাজ সংস্কারে যত্নবান হইলে দেখা যাইবে অচিরেই আমাদের একতার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে।

সামাজিক এক একটী বিষয় লইয়া সকলেই আন্দোলন করুন, অবশ্যই আন্দোলনের ফল আছে সন্দেহ নাই। হিন্দুত্ব বজায় হইতেছে, ইহার লক্ষণ দেখিলেই হিন্দু সমাজ আবার স্থির হইয়া উঠিবে, তবে হিন্দুত্বের যে গুলি দোষ আছে, তাহা একে একে দূর করার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এককালীন সকল দোষ কখনই দূর হইতে পারে না। কিন্তু দোষের আধিক্য দেখিয়াও ঘৃণা করিলে চলিবে না।

ভাই ব্রাহ্ম, আর পৌত্তলিক হিন্দু ভ্রাতার প্রতি ঘৃণা করিয়া সমাজ বিশৃঙ্খলা ঘটাইও না। কুসংস্কার অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্নীকে পরিত্যাগ করিয়া আর ভেদ-বুদ্ধি উৎপন্ন করিও না, আর সাম্প্রদায়িকতায় কাজ নাই। ব্রাহ্ম মত হিন্দুধর্ম্মের সার মত, হিন্দু থাকিয়াই একথা সাধারণ লোক সমাজে বিঘোষিত কর, লোকে জানিতে পারিবে। হিন্দুজাতি ঘৃণার্হ জাতি নহে। আবার তোমার পৌত্তলিক ভ্রাতারাও তোমার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া ক্রমে পৌত্তলিকতা ও দূষিত আচার ব্যবহার সকল পরিত্যাগ করিতে শিখিবে। বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলাতে তাহারও অনেক সুবিধা হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্ম হইয়া তোমরা যে সদাচার শিক্ষা করিয়াছ, তোমাদের জীবন যাপন প্রণালী দ্বারা সে দৃষ্টান্তও পল্লীসমাজের লোকদিগকে দেখাইতে হইবে। তবে ত তাহারা তোমাকে ভালবাসিতে শিখিবে, তোমার কথা শুনিবে। ঘৃণা করিলে কি কাহারও সমবেদনা উদ্দীপ্ত হয়? ভালবাসা নহিলে কি একতার পথ পাওয়া যায়?

বাল্মীকি ও বেদব্যাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"পুরাকিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়াধৃতং।
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যোহ্যধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেহস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে॥"

মহাভারত।

পূর্ব্বকালে সুরগণ মিলিত হইয়া তুলাদণ্ডের একদিকে বেদচতুষ্টয় ও অপরদিকে মহাভারত স্থাপন করাতে উক্ত গ্রন্থ বেদ চতুষ্টয় হইতে অধিক ভার হওয়ায় উহার নাম মহাভারত হইয়াছে।

"চত্বারো একতো বেদা মহাভারত মেকতঃ।
মহর্ষিভিঃ সমাগম্য তুলামারোপিতং পুরা।
মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।"

মহাভারত।

পূর্ব্বকালে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক তুলা দণ্ডের এক দিকে বেদ চতুষ্টয় ও অন্য দিকে মহাভারত সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু মহত্ত্ব ও ভারত্ব বিষয়ে মহাভারত অধিক হওয়াতে উহাকে মহাভারত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"ভরতানাং মহজ্জন্ম মহাভারত মুচ্যতে।"

মহাভারত ৩৯। ৬২ অধ্যায়

ভরতবংশের বৃত্তান্ত যাহাতে বর্ণিত আছে, তাহাকেই মহাভারত বলে।

উপরোক্ত তিনটী বচন দ্বারায় মহাভারতের অর্থ দুই প্রকার হইতেছে। এক বেদ চতুষ্টয় হইতে যাহা অধিক ভার, দ্বিতীয় যাহাতে ভরত বংশের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে,

তাহাই মহাভারত। মহাভারত এই সংজ্ঞার যত প্রকার অর্থই হউক না কেন, উহার দ্বারায় ভারত যে বহুজন রচিত তাহা কোন মতেই সিদ্ধ হয় না। প্রসিদ্ধ রোগ বিনিশ্চয় গ্রন্থ নিদানের টিকাকার বৈদ্য বিজয় রক্ষিত নিদান সংজ্ঞার তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন (৩৬)। কিন্তু উহার সৃষ্টিকর্ত্তা যে একমাত্র বৈদ্য মাধবকর, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। মহাভারতের উল্লিখিত দুই প্রকার অর্থের মধ্যে "ভরতানাং মহজ্জন্ম মহাভারত মুচ্যতে"। এই অর্থই আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভরত শব্দের উত্তর অন্ প্রত্যয় করিয়া যেমন সহজেই ভারত হয়, বেদ হইতে অধিক ভার এই অর্থে তত সহজে ভারত হয় না। "মহত্বাৎ "ভার-বত্বাচ্চ মহাভারত মুচ্যতে"। এই বাক্য হইতে কোন মতেই ভারত হয় না। ভাবার্থে ত্ব প্রত্যয় করিলেও ভারত্ব হয় এবং জোর করিয়া বৎ লোপ না করিলে ভারত হয় না।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন (বেদব্যাস) যে সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত ছিলেন, তাহা মহাভার (৩৭) শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ-রূপে প্রকাশ আছে। তাহার মত পণ্ডিত এবং লেখক যে ভারত ভূমিতে অবতীর্ণ হন নাই, একথা বোধ হয় বিজ্ঞ ব্যক্তি অবশ্যই স্বীকার করিবেন। তিনি যে এক জন অসা-মান্য বেদজ্ঞ ছিলেন, বেদব্যাস নাম হইতে তাহাও সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার কৃত পুস্তকে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার নিদর্শন রাখিবার জন্য যে তাহার বিশেষ চেষ্টা ছিল, সুলেখক গণেশের সহিত প্রতিযোগিতাই তাহার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থল। এবং কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সেই অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতা হইতেই তাহার কৃত গ্রন্থ নিচয়ে (বিশেষ মহাভারতে) সকল কালের সকল শাস্ত্রের কথা ও সামাজিক রীতি, নীতি এবং ইতিহাস, বৈদিক ভাষা, কূটার্থ বচন প্রভৃতি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কে (বেদব্যাস) অন্যে নিন্দা করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের মতে তিনি কোন মতেই নিন্দার যোগ্য পাত্র নহেন। যাঁহার এক এক খানি গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের চক্ষু স্থির হয়, যাঁহার সমুদায় গ্রন্থই গভীর জ্ঞানোদ্দীপক অমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ, তাঁহার রচনাতে কোন সামান্য দোষ থাকিলেও উহা তাঁহার

৩৬ — "নির্দ্দিশ্যতে ব্যাধিরণেনেতি নিদানমিতি —নিদানাদি পঞ্চক সামান্যলক্ষণং নিদান শ-ব্দোহয়ং নিদানং বিশেষে হেতৌ চ বর্ত্ততে—নি-দানীত ইতি ব্যাস প্রয়োগ মুপন্যাস্য নিবন্ধার্থে নিদানশব্দো ব্যাখ্যাতঃ। নিদীয়তে নিবধ্যতে হেত্বাদি সম্বন্ধো রণেনেতি কৃত্বা তন্নিদান স্থান রূপ গ্রন্থাভিপ্রায়েন নহি হেত্বাদয়ো"—ইত্যাদি ব্যাখ্যা মধুকোষ।

৩৭ "শ্রুত্বাতুসর্পসত্রায় দীক্ষিতং জনমেজয়ং।
অভ্যাগচ্ছদৃষির্বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্তদা। ১
জনয়ামাস যংকালীশক্তেঃ পুত্রাৎ পরাশরাৎ।
কন্যৈব যমুনা দ্বীপে পাণ্ডবানাং পিতামহং। ২
জাতমাত্রস্য যঃ সদ্য ইষ্ট্যা দেহমবীবৃধৎ।
বেদাংশ্চাধি জগেসাঙ্গানিতিহাসাম্মহাযশাঃ। ৩
যন্নেতি তপসা কশ্চিন্ন বেদাধ্যয়নেনচ।
নব্রতৈর্নোপবাসৈশ্চ ন প্রসূত্যা ন মন্যুনা। ৪
বিব্যাসৈকং চতুর্দ্ধা যো বেদং বেদবিদাংবরঃ।
পরাবরজ্ঞো ব্রহ্মর্ষি কবিঃ সত্য শুচিব্রতঃ। ৫
আদিপর্ব্ব, ৫৭ অধ্যায়।

ভারতীয় আদি পর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ে—১৯।৪৮।৫৯ ৫০।৫২।৬৩।৬৪।৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৭৯।৭০।৭১।৭২ শ্লোকে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যে সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা প্রকাশ আছে।

গুণসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে (৩৮) মহাভারতে আর্য্য পদ থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় না। যাহাকে পঞ্চম বেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাতে বৈদিক ভাষা না থাকাই অসম্ভব (৩৯) ভারতভূমিতে অনেক বেদব্যাসের জন্ম হইয়া থাকিলেও মহাভারতের প্রণেতা যে একমাত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, অতঃপর তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বের প্রথমাধ্যায়ের প্রতি পত্রেই মহাভারত যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের রচিত, তাহা তিনিই বলিয়াছেন (৪০) এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুক্রমণিকাধ্যায়েও এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় (৪১) স্কন্দপুরাণ ও মুক্তকণ্ঠে তাহাই কহিতেছেন (৪২) অধিক কি, মহাভারত গ্রন্থ খানি যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ৩ বৎসরে রচনা করিয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত তিনি মহাভারতে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। (৪৩) এমতাবস্থায় আমরা কি রূপে বলিব যে, সমগ্র মহাভারত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রচিত না? এতবড় ২। ৩ খানি গ্রন্থে যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নাম জাল করা হইয়াছে, কিম্বা ভারতীয় অমুক পর্ব্ব যে অমুকের কৃত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কি?

মহাভারত সমগ্রই যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন (বেদব্যাস) প্রণীত, তাহা সপ্রমাণিত হইল। এক্ষণে দেখা যাক্, পরাশরনন্দন কোন্ সময়ে ভারত ভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মহাভারতে কথিত হইয়াছে, পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের জন্ম হয়। (৪৪)। সত্যবতী মহাবীর ভীষ্মদেবের পিতা শান্তনু রাজার শেষ, বিবাহিতা স্ত্রী। সত্যবতীর অবিবাহিতাবস্থায় তাঁহার গর্ভে দ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জনমেজয়ের

৩৮ "অনন্তরত্ন প্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্য-
বিলোপিজাতম্।
একোহি দোষোগুণসন্নিপাতে নিমজ্জ-
তীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্কঃ।" কুমারসম্ভব।

৩৯ "বিব্যাসবেদান যস্মাৎ স তস্মাদ্ব্যাস ইতিস্মৃতঃ।
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত পঞ্চমান্।
সুমন্তুং জৈমিনং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজং।
৮৭। ৬০ অধ্যায়।

অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ১৮।২১।৫০।৫৪।৬২।৬৩।৬৪।৬৫। ৬৬।৬৭,৬৮।২৫৫।২৭৩। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪০। ও উনষাট অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোক দেখ। আদিপর্ব্ব, মহাভারত।

৪০ "তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনং।
ইতিহাসমিমংচক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতং। ৫৪
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং আদিপর্ব্ব।

অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ১০।১১।১৭।২১।২৫।৫৫।৫৬।৬২। ৭৪।৮০।৮৭।১০১।১০৪।২২৬।২৬৩। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৭৫ ।৩৮৫। ৫৬ অধ্যায়ের ৩।৬।৭।৮। ৫৯ অধ্যায়ের ১২।১৩। ১৮।৪০।৪১।৫০। ৬১ অধ্যায়ের ১২।১৩।১৪।১৮।২১ ইত্যাদি শ্লোক দেখ। আদিপর্ব্ব।

৪১—"ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নার্থয়শ্চ দর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদি স্ত্রীশূদ্রাদিরপ্যুত।"
"ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনাকৃতং।"
প্রথমস্কন্ধ, শ্রীমদ্ভাগবত।

৪২—"নিশাময় মহাভাগত্বং মৈত্রাবরুণেমুনে।
পারাশর্য্যো মুনিবরো যথা মোহমুপৈষ্যতি।
ব্যস্য বেদান্মহাবুদ্ধির্নানা শাখা-প্রভেদতঃ।
অষ্টাদশপুরাণানি সূত্তাদীন্ পরিপাঠ্য চ।
শ্রুতিস্মৃতি পুরাণানাং রহস্যং যস্তচীকরোৎ।
মহাভারত সংজ্ঞঞ্চ সর্ব্বলোক মনোহরং।"
স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ড।

৪৩—"ত্রিভির্বর্ষৈঃসদোত্থায়াং কৃষ্ণদ্বৈপায়নোমুনিঃ।
মহাভারতমাখ্যানং কৃতবানিদমদ্ভুতং।"৫০।
৫৯ অধ্যায়, আদিপর্ব্ব।

৪৪ "জনয়ামাস যং কানী (সত্যবতী) শক্তেঃ পুত্রাৎ
পরাশরাৎ।
কন্যৈব যমুনাদ্বীপে পাণ্ডবানাং পিতামহং।" ২
৬৩ অধ্যায় আদিপর্ব্ব।

সর্প সত্র যজ্ঞেও আমরা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে দেখিতে পাই (৪৫)। এবং দ্বাপর যুগের অন্তে শান্তনুর সমকালে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন (বেদব্যাস) প্রাদুর্ভূত হইয়া যে বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে (৪৬)। আবার পরাশর সংহিতাতে আমরা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাসকে কলিযুগে জীবিত দেখিতে পাই (৪৭)।

এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন, শান্তনুর সমকালে যিনি জন্মগ্রহণ করিলেন, তিনি কিরূপে জনমেজয়ের যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতে পারেন? শান্তনু হইতে সপ্তম পুরুষে জনমে-জয়কে দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ যিনি দ্বাপরের অন্তে বেদ বিভাগ করিলেন, তিনি পাণ্ডবদিগের সময়েই বা জীবিত থাকিতে পারেন কি প্রকারে? কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে যখন পাণ্ডবেরা ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, (৪৮) তখন এত দীর্ঘকাল এক ব্যক্তির জীবিত থাকা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের জন্ম সম্বন্ধীয় উল্লিখিত সমস্ত প্রমাণই মিথ্যা।

মহাভারতে ভীষ্ম আর দ্বৈপায়নের জন্ম বৃত্তান্ত যেরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদনুসারে ভীষ্মদেবকেই কৃষ্ণ দ্বৈপায়নাপেক্ষায় বয়ো-জ্যেষ্ঠ বলিয়া প্রতীতি হয়। ভীষ্ম অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু অর্থাৎ শান্তনু হইতে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। মহর্ষি দ্বৈপা-য়ন যে ভীষ্ম হইতেও দীর্ঘ জীবন লাভ করি-য়াছিলেন, তাহা তাঁহার অমরত্ব প্রবাদ ও তৎকৃত বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থাবলী দ্বারাই বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতে পারে। বিশেষ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত বাঁচিতে কত সময়ের আবশ্যক? ১৫০ শত বৎসর বাঁচিলেই সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের ১৫০ শত বৎসর আয়ু লাভ করা আমরা অধিক-

"ইতি সত্যবতীহৃষ্টালব্ধাবরমনুত্তমং।
পরাশরেন সংযুক্তা সদ্যোগর্ভংসুধাবসা। ২"
৬৩ অধ্যায়, ঐ।

৪৫—"মহাভারতমাখ্যানং পাণ্ডবানাং যশস্করং।
জনমেজয়েন যৎপৃষ্টঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা।
শ্রাবয়ামাসবিধিবত্তদা কর্ম্মান্তরেষু সঃ।"
৫৬ অধ্যায় আদিপর্ব্ব।

"শ্রুত্বাতুসর্পসত্রায় দীক্ষিতং জনমেজয়ং।
অভ্যাগচ্ছদৃষির্বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা। ১"
৬০ অধ্যায় ঐ।

৪৬ তেপরম্পরয়া প্রাপ্তাস্তত্তচ্ছিষ্যৈর্ধৃতব্রতৈঃ।
চতুর্যুগেষথব্যস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ।" ৪২
টীকা এবং চতুর্যুগেষু প্রাপ্তাঃ দ্বাপরাদৌ দ্বাপরমাদি-র্যস্য তদংশ লক্ষণস্য তস্মিন্ দ্বাপরান্তে বেদবিভাগ প্রসিদ্ধেঃ শান্তনু সমকালে ব্যাসাবতার প্রসিদ্ধেশ্চ।
দ্বাদশস্কন্দ, ৬ অধ্যায়।

অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মণ ভগবান্ লোকভাবনঃ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈর্লোকপালৈর্যাচিতো ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
পরাশরাৎ সত্যবত্যামংশাংশ কলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণমহাভাগ বেদকক্রে চতুর্ব্বিধং।
টীকা অস্মিন্নপ্যন্তরে ইত্যনেন পূর্ব্বোক্ত দ্বাপরকালঃ পরামৃশ্যতে।

৪৭। "অথাতোহিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্ ঋষয়ঃ পুরা।
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌযুগে।
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত। ইত্যাদি
ব্যাসবাক্যাবসানেতু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ।"

৪৮। "শতেষুষটসু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।"
রাজতরঙ্গিণী।

বরাহসংহিতা এবং জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক গ্রন্থেও ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

তর আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না (৪৯)। বাল্য বিবাহ প্রভৃতি দোষ কর্ত্তৃক আজ কাল্ এদেশীয়েরা যে এত অল্পজীবী হইয়াছেন, তথাপি ২। ১ ব্যক্তিকে আজও ৪। ৫ পুরুষ পর্য্যন্ত জীবিত দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্তর স্বয়ং কৃষ্ণ দ্বৈপায়নই যখন মহাভারতে জনমেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞে তাঁহার উপস্থিত থাকা লিখিয়াছেন, এবং পরাশর সংহিতাতেও যখন তাঁহার কলিযুগে বর্ত্তমান থাকা স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে, তখন শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "দ্বাপরাদৌ" এই কথা দ্বারায় দ্বাপরের পরে যে কলিযুগ তাহাকেই বুঝাইবে। তাহার অর্থ কলিযুগে না করিলে এক ব্যাসকৃত মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে বিরোধ উপস্থিত হয়। আমাদের বোধ হয়, শ্রীধরস্বামীও এই জন্যই "চতুর্যুগেষু দ্বাপরাদৌ" এই বাক্যে দ্বাপরান্তে শান্তনু সমকালে অর্থাৎ কলিতে ব্যাসাবতার হওয়া লিখিয়াছেন, মহাভারতের কথার প্রতি শ্রীধর স্বামীর বিশেষ লক্ষ্য ছিল, তাহা "শান্তনু সমকালে ব্যাসাবতার প্রসিদ্ধেশ্চ" এই বাক্য হইতেই প্রকাশ পায়। আর পাণ্ডবেরা কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহাদের প্রপিতামহ শান্তনু ও পিতামহ ভীষ্ম এবং ব্যাসদেবও কলিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতেছে না।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা আরও বলিতে পারেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতে যে রামাবতারের পূর্ব্বেই ব্যাসাবতারের কথা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন লিখিয়াছেন, (৫০) তিনি ত আর কোন ব্যাস না, তিনি তিনিই, যেহেতুক, তাহারই পিতা মাতার নাম উক্ত বচনেও দেখিতে পাই। অতএব তাঁহার কি মহাভারতের কথা মনে ছিল না যে, তিনি ত্রেতা দ্বাপরের সন্ধি সময়ে যে রামাবতার হইয়াছিল, তাহারই পূর্ব্বে আবার ভাগবতে আত্ম জন্ম হওয়া লিখিলেন? আর এমতাবস্থায় শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার যে কলিযুগে ব্যাসাবতার হওয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই বা সত্য হয় কি প্রকারে?

ব্যাস যে শ্রীমদ্ভাগবতে অবতারের তালিকা দিয়াছেন, তাহা যে যথাক্রমেই দিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। উহা যে যথাক্রমে দেওয়া হয় নাই, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ১৫ শ্লোকে স্পষ্টই প্রকাশ আছে (৫১) পূর্ব্বোক্ত অবতারে তালিকাকে (শ্রী-

---

৪৯। রাজাবলি নামক ইতিহাসে আছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির সমুদায়ে ১২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। যৎকালে যুধিষ্ঠির রাজসিংহাসনে প্রথম অধিষ্ঠিত হন, তখন, অবশ্যই ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম তাঁহার হইয়াছিল, অনুমান করিতে হইবে। অতএব যুধিষ্ঠিরই যে ১৫০ শত বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে।

"প্রসিদ্ধ পার সাহেব ১২০ বৎসর বয়ঃক্রম কালেও নবকুমারের মুখ দেখিয়াছিলেন, এবং ১৫২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে ও পূর্ণবুদ্ধিশক্তি সহকারে রাজসভায় উপনীত হন।"

"রিচার্ড লইড্ ১৩০ বৎসর বয়সেও সম্পূর্ণ সবল ও সুস্থ ছিলেন, কিন্তু মদ্য মাংস ব্যবহার আরম্ভ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে লোকান্তরিত হন।"

৫০। "ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রেবেদতরোঃ শাখাদৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ।
নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃপরঃ।" ২১
প্রথমস্কন্ধ, শ্রীমদ্ভাগবত।

৫১। "দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয় যুগপর্য্যয়ে।

মদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ২২। ২৩ শ্লোককে) যদি আমরা যথাক্রমে অনুমান করি, তাহা হইলে উক্ত অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, কারণ, রামাবতার ত্রেতা যুগে হইয়াছিল, ব্যাসাবতার তাহার পূর্ব্বে হইলে তাহাও ত্রেতা যুগে হওয়াই নিশ্চিত হয়; কিন্তু উল্লিখিত ১৫ শ্লোকে যখন স্পষ্টই দ্বাপরের শেষে ব্যাসাবতার হওয়া প্রকাশ আছে, তখন ঐ অবতারের তালিকা যে কোন মতেই যথাক্রমে দেওয়া হয় নাই, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়।

তালিকার দ্বারায় জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ নির্ণয় করা যায় না। কেহ লিখিলেন, পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই। ১নং যুধিষ্ঠির, ২নং অর্জ্জুন, ৩নং ভীম ইত্যাদি। এই তালিকা দ্বারা আমরা অর্জ্জুনকে ভীমের জ্যেষ্ঠ বলিতে পারি না, এবিষয়ের অন্য প্রমাণ দিতে হইবে। যাহা হউক, স্বয়ং ব্যাসই যখন ভীষ্মের বিমাতা সত্যবতীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হওয়া ও জনমেজয়ের সমকালে তাঁহার জীবিত থাকা মহাভারতের শত সহস্র স্থানে লিখিয়াছেন, তখন শ্রীমদ্ভাগবতে যে অবতারের কথা লিখা হইয়াছে, উহা কেবল তালিকা দ্বারায় মনুষ্যদিগকে অবতারের সংখ্যা দেখান হইয়াছে মাত্র। সমাপ্ত।

শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ বচনানুসারে আমরা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কলিযুগে জন্ম হওয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি। কিন্তু এবচনে আবার দ্বাপর শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আমাদের বোধ হয় যে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতিরা দ্বাপর এবং কলির সন্ধি সময়ে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অন্য কোন স্থানে দ্বাপর, কোথায় কলিশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, যুগ সন্ধিকে পূর্ব্বাপর উভয় যুগই বলিবার রীতি আছে। যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে অনেকেই দ্বাপর ও কলি যুগের মধ্যেই গণনা করিয়াছেন, অস্মদ্দেশীয় পঞ্জিকাই তাহার বিলক্ষণ প্রমাণস্থল। বিষ্ণুপুরাণ ত্রেতা, দ্বাপরের সন্ধি সময়ের রাম অবতার হওয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণ ও অন্যান্য স্থলে স্পষ্ট ত্রেতা যুগ বলিয়াও উল্লেখ আছে। ভারতীয় আদিপর্ব্বের ১ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে দ্বাপর ও কলির সন্ধি সময়ে কুরু পাণ্ডবের জন্ম হওয়া লিখা আছে, কিন্তু রাজতরঙ্গিণীতে কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে লিখা আছে।

লোক সংখ্যা

শেষ প্রস্তাব।

লোকাধিক্য নিবারণের মুখ্য উপায়। যাহাতে অধিক সংখ্যক লোকে জন্ম গ্রহণ না করে, সেই সকল উপায় নির্দ্ধারিত করাই মুখ্য উপায়ের উদ্দেশ্য। লোক সংখ্যা অধিক হইলেই আহারের প্রাচুর্য্য থাকে না, কেন না, পূর্ব্বে প্রমাণ করা গিয়াছে যে, আহারোৎপাদিকা শক্তি অপেক্ষা জীবোৎপাদিকা শক্তি অধিক। সুতরাং যাহাতে এই উভয় শক্তির সাম্য থাকে তাহা করাই একান্ত বিধেয়। এই প্রকার কার্য্যে প্রকৃতির সহিত বিবাদ করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিবাদ বাঞ্ছনীয় হইয়াছে; কেন না সভ্যতা মনুষ্যের সুখ সৌকর্য্যের সোপান এবং প্রকৃতির সহিত বিবাদই সভ্যতার অপর

নাম। কোন প্রকারে বিবাদে জয় লাভ করিয়া প্রকৃতির জীবোৎপাদিকা শক্তির তেজ খর্ব্ব না করিলে প্রকৃতি স্বয়ংই অতিরিক্ত জীবকে বিনাশ করিবে এবং সকলকেই নিতান্ত ব্যথিত ও পীড়িত করিয়া তুলিবে। ইহাতে মনুষ্যের কষ্টের সীমা নাই। যাহাতে প্রকৃতি অধিক জীবোৎপাদন করিতে না পারে, সুতরাং সকলকে পীড়িত ও অনেককে বিনাশ করিতেও সক্ষম না হয়, পূর্ব্বেই তাহার বিধান করা আবশ্যক। কি উপায়ে মনুষ্য জন্মের হ্রাস হইতে পারে, নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম। সঙ্গতিহীন লোকের বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে, অর্থাৎ ক্ষেত্র ও বীজ হইতে সন্তানের জন্ম। এই সন্তান জন্মিলে তাহার আহারের প্রয়োজন হয়; কিন্তু আহার অর্থ সাপেক্ষ। যাহার অর্থ নাই, তাহার সন্তান প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা কোথায়? নীরস ভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হইলে পোষণোপযোগী সামগ্রীর অভাবে যেমন অচিরেই শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনই আহারাভাবে মনুষ্যও অচিরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সঙ্গতিহীন লোক আহার যোগাইতে না পারিলে তাহার সন্তান অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। এই বিনাশ বাঞ্ছনীয় নহে; এই জন্য সন্তান জন্মিয়া যাহাতে বিনষ্ট না হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে যাহাতে আদৌ জন্মিতে না পারে, তাহাই কর্ত্তব্য। সুতরাং যাহারা সন্তানের আহার ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের সংস্থান করিতে সক্ষম নহে, আমরা বলি, তাহাদিগের বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। ইন্দ্রিয় দমন করিতে প্রকৃতির সহিত যে দ্বন্দ্ব আবশ্যক, সঙ্গতিহীন লোককে সেই দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অনেকে এই বিবাদে সক্ষম না হইয়া ইন্দ্রিয়দাসী ও ইন্দ্রিয়দাসের সাক্ষাৎ লাভ করিতে বাসনা করিবে। সেই বাসনা বিস্তর অনর্থের মূল, সুতরাং ব্যভিচার (স্ত্রী ও পুরুষ) নিবারণ করিবার জন্য সমাজের কিছু কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করা আবশ্যক। সমাজ দুরতিক্রম্য এবং ব্যভিচার সমাজের অনিষ্টকারী, সুতরাং তাহাতে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবে না। সঙ্গতিহীন লোকের বিবাহ করা আমরা অত্যন্ত অবিবেচনার কার্য্য মনে করি। যাহারা আপন অংশ হইতে সন্তানকে অংশ দিয়া জীবিত রাখিবে মনে করে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। আপন অংশ হইতে অংশ দিয়া পিতা মাতা ও সন্তান উভয়েই নিধন পাইবে, শীঘ্র না হয় বিলম্বে, তাহার সন্দেহ নাই। অল্প আহার পাইলে লোকের মঙ্গল নাই, অভাবনীয় দ্রব্যের কুলান না হইলে সুখ স্বচ্ছন্দ নাই। অসার ভূমিতে বৃক্ষ যেমন নিস্তেজ হয় ও রুগ্ন হইয়া মুড়াইয়া যায়, অভাব হইলে মনুষ্য সন্তানের পক্ষেও অনুরূপ সেই অবস্থা ঘটিবে। মিল, ডারউইন, ম্যালথাস প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অর্থহীন লোকের বিবাহের অযৌক্তিকতা নির্দ্দেশ ও সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, এবং যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে।

২য়। কিঞ্চিৎ সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের দুই একটী সন্তান উৎপন্ন হইলে আর স্ত্রী সহবাস করা বিধেয় নহে। যে আহার দ্বারা যে সংখ্যক জীব বাঁচিতে পারে, তাহার অতিরিক্ত জীব উৎপন্ন হইলে যেমন অনিষ্টের হেতু হইয়া উঠে, সেইরূপ যে কয়েকটী সন্তানের ভরণ পোষণ ও অভাব মোচনের আমি সক্ষম, তাহার অতিরিক্ত সন্তান উৎপাদন করিলে কয়েক জনের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের

উপর সকলকে নির্ভর করিতে হইবে। একের আহার দুই জনে গ্রহণ করিলে উভয়েই নিস্তেজ হইবে ও অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। একত্রে বহুবৃক্ষ জন্মিলে অনেকগুলি মরিয়া যায় এবং যাহারা জীবিত থাকে তাহারাও রুগ্ন ও নিস্তেজ হয়। কিন্তু সেই সকল বৃক্ষকে যদি স্থানান্তরিত করা হয়, অর্থাৎ তাহারা প্রচুর রস, ভূমি ও আলোক পায়, তাহা হইলে সকলেই বাঁচিতে পারে। ইহাতে বুঝা যায় যে, একের স্থানে অধিক লোক হইলে তাহারা ধ্বংশ হয়, বা নিস্তেজ হইয়া কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই প্রকার যিনি যে কয়েকটী সন্তান প্রতিপালন করিতে অর্থাৎ তাহাদিগের সকল প্রকার আহার ও অভাব যোগাইতে সক্ষম, সেই কয়েকটী সন্তান উৎপন্ন হইলে তাঁহার আর স্ত্রী সহবাস করা বিধেয় নহে। যদি বয়স বিবেচনা করিয়া বিবাহ করা হয়, তাহা হইলে এই সন্তান সংখ্যা উৎপন্ন হওয়ার পর হয়ত ইন্দ্রিয় প্রাবল্য তিরোহিত হইতে পারে, সুতরাং ব্যভিচারের তত আশঙ্কা থাকে না। সন্তানোৎপাদনের পরে বড় একটা চরিত্র দোষ জন্মে না, ইহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু যদি একটু অধিক বয়সে বিবাহ হয়, তাহা হইলে যে কিছু আশঙ্কা থাকে, তাহার হস্তও অতিক্রম করা যাইতে পারে। সভ্য দেশে, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে, যাহাদিগের অবস্থা বড় ভাল নহে, তাহারা দুইটী, কেহ বা তিনটী সন্তান উৎপন্ন হইলে আর স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস করে না। আমরা জানি কোন একটী বি বাঙ্গালীর অনেকগুলি কন্যা হইয়াছিল। যখন, যে সম্পত্তি ছিল তাহা সেই গুলির বিবাহে শেষ হইয়া গেল, কিন্তু তথাপি কন্যা জন্মিতে লাগিল, তখন তিনি বহির্ব্বাটীতে শয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং একটী কন্যার বিবাহের যথোচিত অর্থ যত দিন না সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তত দিন বাটীর ভিতর শয়ন করিতে যাইতেন না। পাঁচ শত টাকা জমিলেই তিনি কিছু দিনের জন্য বহির্ব্বাটী ত্যাগ করিতেন।

৩য়। ইন্দ্রিয় পরিচালনের অল্পতা, মিল ইহাকে (conjugal prudence) দাম্পত্য-সংযম আখ্যা দিয়াছেন। নর নারীতে মিলিত বা বিবাহিত হইলেই যে সন্তানোৎপাদন করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কেবল 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' এ প্রকার ব্যবহারকে আমরা প্রায় পশুবৃত্তি বলিতেও প্রস্তুত আছি, তথাপি যথেচ্ছ সহবাসের পক্ষপাতী নহি। বাস্তবিক ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা অল্পমাত্র সবল সন্তান জন্মিতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে পিতা মাতার বিশেষতঃ মাতার স্বাস্থ্যের অবনতি না হইয়া বরং উন্নতি হইয়া থাকে ; কেন না স্ত্রীলোক যত অল্প সন্তান প্রসব করে, তাহার স্বাস্থ্য ততই অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং পুরুষও নানা প্রকার দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি পীড়ার হস্ত অতিক্রম করে। অল্পমাত্র সন্তান হইলে কোন প্রকার সাংসারিক অসুবিধা ঘটে না, ব্যয় অধিক হয় না এবং সকল প্রকারেই সুবিধা হইয়া থাকে। পাঁচ সাতটী অল্পাহারী রুগ্ন সন্তান অপেক্ষা একটী পূর্ণাহারী সবল সন্তান যে অনেক অংশে বা সর্ব্বাংশে ভাল, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? অধিকাংশ অর্থশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই বলেন যে, লোকাধিক্য নিবন্ধন দারিদ্র্য কেবল দাম্পত্য সংযমের অপব্যবহার হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্রব্যাদি অল্পমূল্য হইলে যে পরিমাণে জগতের উন্নতি না হইবে, ইন্দ্রিয় সংযম

করিয়া অল্পমাত্র সন্তানোৎপাদন করিলে তাহার অধিক উন্নতি ও ফললাভের সম্ভাবনা, এ কথা মিথ্যা নহে। যাহা হউক, সংযম আবশ্যক তাহা নিশ্চয় হইল। এক্ষণে এই সংযমের বিশেষ সময় নিরূপণ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। দেখা যায় যে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সহিত মিলিত হইলেই গর্ভবতী হয় না। বীজকোষে (ovary) যে বীজ পরিপক্ক হয়, তাহা হইতে ঋতুকালে এবং অব্যবহিত পরে, কখন বা অব্যবহিত পূর্ব্বে, সন্তান জন্মিবার যেমন সম্ভাবনা, এমন আর কোন সময়েই নহে. সুতরাং কুকসন্ প্রভৃতি লোকতত্ত্ববিদের মতে এই সময়ে স্ত্রী ও পুরুষের মিলন হইতেই সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি এই সময়ে সংযমের প্রতি মনোযোগী হওয়া যায়,তাহা হইলে অতি শীঘ্র শীঘ্র সন্তান উৎপাদনকারিতার হস্ত বিস্তর পরিমাণে অতিক্রম করা যাইতে পারে। এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে সময়ে ঋতু রক্ষা না করা পাপ বলিয়া গণ্য হইত, তখন লোক সংখ্যা অধিক ছিল না। যদি কেহ এমন তর্ক করেন যে, স্বভাবের গতিকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা অবশ্যই পাপাবহ, তবে তাঁহাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, রোগীকে রোগ হস্ত হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা ও ব্যবস্থা পাপজনক নহে কেন? অপর এক কথা এই, সভ্য সমাজের কোন্ কার্য্যে স্বভাবের সহিত বিবাদ নাই? মনুষ্যের উপকারের জন্য স্বভাবের সহিত বৈরিতাই সভ্যতা—কি মানসিক, কি সমাজিক, কি নৈতিক। কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত গর্ভের প্রথমাবস্থায় গর্ভস্রাব করিতে পরামর্শ দেন এবং তাহাতে পাপ আছে,একথা স্বীকার করেন না। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, আমরা তত উন্নত নহি এবং জরায়ু মধ্যে সন্তান প্রবিষ্ট হইলেই আমরা তাহাকে জীব বলিব, তাহাকেই মনুষ্য বলিব। লোক বধ করিয়া লোকাধিক্য নিবারণ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, বরং যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগের সুখ অন্বেষণ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। সুতরাং যতক্ষণ জরায়ুতে সন্তানের জন্ম হয়নাই, ততক্ষণই সুবিধাজনক, নিবারণ বাঞ্ছনীয় হইতে পারে, তাহার পরে আর নহে।

৪র্থ। বীজের পথ রোধের পরামর্শ। অর্থশাস্ত্রের অনুরোধে বিস্তর অশ্লীল কথা বলিতে চাহি না,এইজন্য চতুর্থ প্রকার নিবারণের উপায় আমরা সবিস্তার বলিব না। কেবল এই মাত্র বলিব যে, কৃত্রিম উপায় দ্বারা জরায়ুর মুখ (neck of the uterus which ends with the os-uteri) বদ্ধ করিলে অনেকের মতে সন্তান উৎপন্ন করিবার জন্য গর্ভ হয় না। অনেকে পিচকারী দ্বারা বীজ ধৌত করিয়া ফেলিতেও পরামর্শ দিয়া থাকেন। বিস্তর ইংরাজী গ্রন্থে এ বিষয়ের আলোচনা দৃষ্ট হইবে, সুতরাং এবিষয়ে আর নহে

৫ম। অধিক বয়সে বিবাহ। যে সকল কথা হইতেছে, সকলই আমাদিগের পুরাতন নিয়মের বিপরীত। তাহার কারণ আমরা বলিয়াছি যে, যে সময়ের শাস্ত্র সে সময়ে আর্য্য বংশ বৃদ্ধি করাই সকলের উদ্দেশ্য ছিল, এবং যাহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয় ছিল। বাল্য বিবাহে যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই বংশ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, সুতরাং লোকেরও আধিক্য হয়। বাল্যবিবাহের দুর্ব্বল সন্তানরূপ ফল স্বীকার না করিলেও এক্ষণে ইহা ত্যজ্য হইয়াছে। কিন্তু অধিক

বয়সে বিবাহ হইলে যদি সন্তান শরীর ও মনে বলবান হয় এবং সকল প্রকার দাম্পত্য সুবিধা থাকে, তাহা হইলে বাল্য বিবাহ রহিত করায় প্রথমেই সেই ফল লাভ করা গেল। যৌবনকালেই রিপু সকল প্রবল থাকে, এবং ইন্দ্রিয় পরিচালনায় অধিক প্রবৃত্তি জন্মে। যদি অধিকাংশই অবিবাহিত থাকিয়া সেই সময় কাটাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয় পরিচালনার প্রবৃত্তির পরিমাণ এবং সন্তান জন্মিবার প্রধান ও অধিকাংশ সময় হ্রাস হইয়া গেল, সুতরাং অধিক সন্তান জন্মিবার আর সুবিধা রহিল কৈ? আর এক কথা এই যে, অধিক বয়সে বিবাহ করিলে স্ত্রী ও স্বামী মনোনীত করিয়া লইবার কিছু সুবিধা হয়, এবং তাহাদিগের প্রণয়ও গাঢ় হইয়া বিস্তর সাংসারিক সুখ প্রদান করিতে সমর্থ। এতদ্ভিন্ন যত অধিক কাল একাকী গত হইবে, তত অধিক কাল ধন উপার্জ্জন করিতে পারা যাইবে এবং একা থাকার ব্যয় অল্প বলিয়া অধিক সময় পাইয়া অধিক বয়স পর্য্যন্ত অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতেও পারা যাইবে। মিল ফসেট্ প্রভৃতি অর্থনীতি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা দাম্পত্য সংযমের অভাব ও বিবাহের অসাবধানতাকেই লোকবৃদ্ধি ও তজ্জনিত দারিদ্র্যের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লোকতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ম্যালথাসের ও বিবাহ বিষয়ে এই প্রকার মত কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই সকলেই ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিবেন। নিজ মত বজায় রাখিবার জন্য অন্যায় তর্কের নিকট আমরা পরাস্ত।

৬ষ্ঠ। বহু পতিত্ব। যদিও আমরা ইহাতে অনুমোদন করি না, তথাপি ইহা লোকাধিক্য নিবারণের উপায় বলিয়া এস্থলে ইহার উল্লেখ করিলাম। এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাতে অনেক সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে; এমন কি সেই স্ত্রী সকল প্রত্যেক এক এক পুরুষের স্ত্রী হইলে যত সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা, তাহারা সকলে এক পুরুষের স্ত্রী হইলেও ততই সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। বহু সন্তান উৎপন্ন করিবার জন্য বহু পত্নী গ্রহণ করিবার প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল—অদ্যাপি কিয়ৎ পরিমাণে আছে, একথাও বলা যাইতে পারে। বহুপত্নী সন্তান বৃদ্ধির যেমন উপায়, এক স্ত্রীর বহু পতি তেমনই অন্তরায়। উত্তরাধিকার প্রভৃতি কয়েকটী বিষয়ের অসুবিধা না ঘটিলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইহার অনুমোদন করিতে পারিতাম, কিন্তু একটা উৎপাত নিবারণ করিবার জন্য অন্য উৎপাত আনয়ন করা সঙ্গত নহে—সময়ে ইহা প্রচলিত হইতে পারে হইবে, আমাদিগের আপত্তি নাই। ভারতে পূর্ব্বে ইহা প্রচলিত ছিল, এবং এখনও কোন কোন জাতিতে কয়েক ভ্রাতার বা পরিবারের পুরুষবর্গের মধ্যে একটী মাত্র স্ত্রী গ্রহণ করিবার প্রথা আছে। অন্যান্য দেশের অসভ্য সমাজে এ প্রথা আজিও নিন্দনীয় নহে। ইহতে প্রত্যক্ষই অনেক পুরুষের স্ত্রী গ্রহণ ও সন্তান উৎপাদন করা রহিত হয়, সুতরাং লোকসংখ্যা শীঘ্র বৃদ্ধি হইতে পায় না। এ বিষয়ে অন্য এক কথা আছে। তাহা এই, প্রত্যহ যত লোক জন্মিতেছে ও মরিতেছে, তাহাদিগের সকলকে ছাড়িয়া দিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী অপেক্ষা দেশে পুরুষের সংখ্যা অধিক। যদি সকল লোকের এক দিনে বিবাহ দেওয়া যায়, তাহা হইলে একে এক স্ত্রী বা স্বামী লাভ করিলেও কতকগুলি পুরুষ অবিবাহিত থাকে এবং যদি বিবাহ সকলের পক্ষেই আবশ্যক বলা যায়, তাহা

হইলে কয়েকটী পুরুষ মিলিত হইয়া এক স্ত্রী গ্রহণ না করিলে আর সকলকে বিবাহিত দেখা যাইতে পারে না। সুতরাং একস্ত্রীর বহুপতী একেবারে অসঙ্গত বলা যায় কৈ? শ্রাদ্ধ এবং উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় কয়েকটী বিষয়ের মীমাংসা হইলে এ প্রথা যে চলিতে পারে, তাহাতে আমরা সন্দেহ করি না।

৭ম। স্ত্রীবিহীন পুরুষের পুনর্বিবাহ রহিত করা আবশ্যক। ৬ষ্ট উপায়ের শেষ অংশে জানা গেল যে, এক দিনে সকল লোকের বিবাহ দিতে হইলে প্রত্যেকে এক স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ করিলেও অনেক পুরুষ অবিবাহিত থাকে। যদি তাহাদিগের কোন স্বামীর স্ত্রীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই স্বামীর বিবাহের জন্য আর স্ত্রী কোথায় পাইব? যদি কোন স্ত্রীর স্বামী বিয়োগ হয়, তাহা হইলে সেই স্ত্রীর সহিত মৃতস্ত্রী-পুরুষের বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কেহ বিধবা না হইলে আর স্ত্রী কোথায়? এতদ্ভিন্ন যে সকল পুরুষকে অবিবাহিত থাকিতে হইবে, তাহাদিগের বিবাহ অগ্রে, না যিনি কিছুকাল স্ত্রী সহবাস করিয়াছেন তাঁহার আবার বিবাহ অগ্রে? আমরা বলি যিনি এক বার বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু ভাগ্য দোষে স্ত্রী-বিহীন হইয়াছেন, তাঁহার আর বিবাহে কাজ নাই।

৮ম। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। যদিও পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের অপেক্ষা অধিক, তথাপি বিধবা বিবাহে আমরা লোকাধিক্য ও দারিদ্র্য নিবারণের জন্য (সামাজিক কথা ছাড়িয়া দিয়া) মত দিতে পারি না। যাহারা সন্তান থাকিতে পুনরায় বিবাহ করিতে চাহিবে, তাহাদিগের বিবাহ ত কোন মতেই উচিত নহে; যাহাদিগের সন্তান জন্মে নাই, তাহাদিগের বিবাহও লোকাধিক্য নিবারণের জন্য কর্ত্তব্য নহে। সন্তান থাকিলে বিস্তর অসুবিধা উপস্থিত হয়, কেন না প্রথমেই লোকাধিক্য নিবারিত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইবে এবং তৎপরে সেই সন্তানকে প্রতিপালন করিবার ও উত্তরাধিকার দিবার পক্ষে বিস্তর বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া মহা অনিষ্ট উৎপন্ন করিবে। স্ত্রীকে আমাদিগের দেশে সম্পূর্ণরূপেই পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়। স্ত্রী উপার্জ্জন করিতে শিখিলেও অনেক সময়ে স্বামীকে তাহার প্রতিপালনে বাধ্য হইতে হইবে। এমন অবস্থায় অক্ষম পুরুষের সংখ্যা এত বাহির হইবে যে, তাহারা স্ত্রীগ্রহণে সম্মত হইবে না, সুতরাং তাহাদিগের সংখ্যা বাদ দিলে দেখা যাইবে যে, বিবাহ করিতে বাঞ্ছিত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অধিক হইলেই আর তাহার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে না, এবং পুরুষের পক্ষে যে জন্য স্ত্রী সহবাসজ্ঞ ব্যক্তির বিবাহ বিধেয় নহে, সেই জন্য স্বামী সহবাসজ্ঞ স্ত্রীরও বিবাহ অবিধেয়।

এইখানে আমরা প্রস্তাব শেষ করিলাম। যে সকল উপায় উল্লিখিত হইল তাহাই সমস্ত নহে, বিশেষ বিশেষ কতকগুলির বিষয় সামান্যতঃ বলা হইল। এই সকল উপায়ে সকলই অনুমোদন করিবেন না, তাহা আমরা জানি, কিন্তু সকলকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন প্রকারে প্রকৃতির সহিত বিবাদে জয়লাভ করিয়া যাহাতে রোগ, শোক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দারিদ্র্য প্রভৃতির দ্বারা লোক নাশ না ঘটে, তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য। দারিদ্র্য জন্মিলে জাতীয় পতন সুদূরস্থিত নহে, সুতরাং দারিদ্র্য নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অর্থ ব্যবহারের অন্যান্য সাধারণ নীতির দ্বারা যতদূর অভাব

মোচন হইতে পারে, তাহাত প্রথমেই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাতে লোকাধিক্য-জনিত দারিদ্র্যের কোন কালে অপনয়নের সম্ভাবনা নাই। এই জন্য লোক সংখ্যা হ্রাস করা বড় বড় পণ্ডিতদিগের মতে কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যদি এই নিবারণের উপায়ের বিষয় বলিতে আমাদিগের প্রতিপদেই ভ্রম হইয়া থাকে, তথাপি ভরসা করি সাধারণের নিন্দাভাজন হইব না, কেন না যত্ন করিয়া যদি সফল না হই, তাহাতে আমাদিগের অপরাধ কি? সমাপ্ত।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

মনুষ্য জীবনের সকল প্রকার কার্য্যই পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক ও ঐশিক শাসনের অধীন। এই সকল শাসনকে অতিক্রম করিয়া কেহই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ নহে। নিজের উপার্জ্জিত অর্থের অপব্যবহার করিলে পরিবারবর্গ শাসন করে, ব্যভিচারী হইলে সমাজ তোমাকে শাসন করিবে, অন্যের প্রতি অত্যাচার করিলে রাজা শাসন করিবেন এবং নীতি ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিলে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া কুপথগামী হইতে দিবে না। চারিদিক হইতে এই চারি প্রকার শাসন আসিয়া মনুষ্যের জীবনগতিকে কখন বিচলিত হইতে দেয় না। কিন্তু মনুষ্যের পশুভাব এমনই প্রবল যে, তাহা সকল বন্ধনকেই ছিন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা সুযোগ ও সুবিধা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, এবং সময় পাইলেই সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া কুপথগামী হইয়া পড়ে। তথাপি সামাজিক শাসনের ক্ষমতা এতই প্রবল যে, সে শাসন সহজে অতিক্রম করা সকলের পক্ষেই দুষ্কর। সমাজ ব্যতিরেকে মনুষ্য এক দিন বাঁচিতে পারে না—সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করণের ন্যায় কঠোর দণ্ড আর কিছুই নাই। সামাজিক শাসনের তেজ এত প্রবল না হইলে কোন প্রকার দুষ্ক্রিয়াই মনুষ্যের অকার্য্য থাকিত না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক কোমৎ বলেন যে, সমাজের অধিক ঈশ্বর নাই।

কিন্তু এই সমাজ আপন অধিকারকে এতই বিস্তৃত করিয়াছে যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। মনুষ্য সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করে বলিয়া তাহার উপর আধিপত্য আছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহার অধিকারের সীমা নাই? নাই, বলিতে গেলে মনুষ্যকে সমাজের দাস বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক মনুষ্য সমাজের দাস নহে—সমাজ ও মনুষ্য প্রত্যেকেরই অধিকারের সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করিলেই অত্যাচারে আসিয়া পড়ে। মনুষ্য যে পরিমাণে সমাজের নিকট দায়ী, সমাজের তাহার অধিক লওয়া উচিত নহে। যাহাতে যাহার উপকার, সে সেই পর্য্যন্ত করিলেই সামাজিক শাসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, একে অন্যের হানি না করিয়া, সুশৃঙ্খলরূপে আপন আপন কার্য্য করিতে পারে। যাহাতে সমাজের

সম্পত্তি এবং যাহাতে ব্যক্তিগত উপকার, তাহা সেই ব্যক্তির নিজের সম্পত্তি হওয়াই উচিত।

যে কেহ সমাজে বাস করে ও সমাজের নিকট হইতে উপকার পাইবার প্রত্যাশা করে, সেই ঐ উপকারের প্রত্যুপকার করিতে বাধ্য; নতুবা সমাজ তাহার উপকারে যত্নবান হইবে না। বাস্তবিক সমাজে বাস করিলেই প্রত্যেকে অন্য ব্যক্তির জন্য কিছু করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। এই কার্য্য দ্বিবিধঃ—(ক) যাহা রাজ অনুমোদনে বা সাধারণের সম্মতিতে একের সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করা, এবং (খ) প্রত্যেকের সত্ব বজায় রাখিবার জন্য যাহার যে প্রকার যত্ন করা আবশ্যক, তাহাতে কোন মতে পরাঙ্মুখ না হওয়া। কেবল হে অন্যের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিলাম না, তাহাতে চলিবে না, যদি কেহ তোমার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে তোমাকে নিজ সত্ব বজায় রাখিতে সাহায্য করাও আমার কর্ত্তব্য। তোমার সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিলে ত রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইব, কিন্তু কেহ তোমার সত্ব বলপূর্ব্বক অধিকার করিতে আসিলে যদি আমি নিরপেক্ষ থাকি, তাহা হইলে সমাজ কর্ত্তৃক নিন্দনীয় হইব, তাহাতে সন্দেহ কি? অন্যের অপকার করিলেই সমাজ দেখিবে যে, তাহাতে সাধারণের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি না, এবং যদি থাকে, তাহা হইলে সমাজ তোমাকে তাহা হইতে নিরস্ত রাখিবে। কিন্তু যে কার্য্যে অন্যের সুখের কোন ব্যাঘাত নাই, অর্থাৎ কেবল নিজের লাভালাভের জন্য লোকে যাহা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে সমাজের হাত কি? আমাদিগের বিবেচনায় এমন সকল কার্য্যে কর্ত্তার সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপেই থাকা উচিত এবং আপন কার্য্যের জন্য কেবল তাহাকেই লাভালাভের ফল ভোগ করিতে দেওয়া প্রাজ্ঞসম্মত।

এ প্রকার কার্য্যে সমাজের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, কেন না তাহাতে সে নিজে যেমন লাভালাভ বুঝিবে, অন্যে তেমন বুঝিতে পারিবে না। অন্যে তাহাকে যে মন্ত্রণা দিবে তাহা অনেক সময়েই ভ্রমপূর্ণ হইবে, কেন না আপন কার্য্যে আপনি যেমন লাভালাভ বুঝিবে, অন্যের তেমন বুঝিবার ক্ষমতা নাই। অন্যে যে স্থলে একের নিকট কোন সামগ্রী পাইতে ইচ্ছা করে, সেই স্থলেই কেবল অন্যের শাসন চলিতে পারে, অন্যত্র নহে। যদি সেই কর্ম্মের দ্বারা ব্যক্তিগত অপকার হইবে এই আশঙ্কায় উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য বোধে তাহাকে কেহ উপদেশ দিতে চাহে, তাহা হইলেও আমারা বলিব যে, তাহার নিজের সত্বে অন্যে অন্যায় রূপে হস্তার্পণ করে। ব্যক্তিগত মঙ্গলে প্রবৃত্তি ও অমঙ্গলে নিবৃত্তি উত্তেজনা মঙ্গলপ্রদ বটে, কিন্তু এস্থলে ভিন্ন কি সৎপরামর্শ দিবার সুযোগ নাই? প্রাপ্তবয়স্ক কোন ব্যক্তি, যে নিজে আপন লাভালাভের বিষয় চিন্তা করিতে সক্ষম, সে যে অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিবে, তাহা সঙ্গত বলিয়াও বোধ হয় না। ব্যক্তিগত কার্য্য হইতে তাহার নিজের যে অপকার সম্ভব, তাহাতে অন্যায় রূপে সমাজের হস্তক্ষেপ করা তাহা অপেক্ষা অধিক অপকারী, কেন না তদ্দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা হয়। যে পর্য্যন্ত অন্যের কোন অপকার না হয়, সে পর্য্যন্ত কাহার ও চিন্তার বা কার্য্যের স্বাধীনতার পথ রোধ করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

যে সকল গুণ থাকাতে লোকে নিজের উপকারী কর্ম্ম সকল সম্পাদনক্ষম হয়, সেই সকল গুণে উৎকর্ষ লাভ করিলে লোকে সাধারণের সুখ্যাতির পাত্র হয় এবং সেই সকল গুণ না থাকিলে নিন্দাভাজন হইয়া থাকে। যদিও আপন কার্য্যদ্বারা সমাজের কোন উপকার বা অপকার সাধন করে না, তথাপি আমরা তাহার সৎকর্ম্মের জন্য সুখ্যাতি ও অসৎ কর্ম্মের জন্য নিন্দা করিয়া থাকি। সুতরাং তাহার নিজের কার্য্যের উপরে কোন সাক্ষাৎ শাসন না থাকিলেও অসাক্ষাতে এক প্রকার শাসন থাকিবে। লোকে যে প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে চাহিবে, এই শাসনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে তাহার নিবৃত্ত হওয়া উচিত। যদি কেহ এই শাসন না মানিয়া অন্যের ক্ষতি না করিয়াও কুপথগামী হয়, তাহা হইতে তাহার সহিত একত্র বাস করা না করা আমাদিগের অধিকার। তাহার ক্ষতি করিবার জন্য আমারা যে তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিব এমত নহে, আমাদিগের নিজের মঙ্গলের জন্য তাহার নিকট হইতে অন্তরে থাকা উচিত, কেন না তাহার দ্বারা আমাদিগেরও প্রবৃত্তি দূষিত হওয়া সম্ভব। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কোন অন্য সৎপথাবলম্বী ব্যক্তিকে আমরা অধিক পছন্দ করিতে পারি, কেন না তদ্দ্বারা কুপথগামীর নিজের কোন কার্য্যে প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধকতা করা হয় না, এবং সে যদি সাধারণের শ্রদ্ধা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে নিন্দাকে ভয় করিয়া অবশ্যই তাহার চলা উচিত। যদি সে তাহা না করে, অবশ্য তাহার ফলভোগ করিবে। এইফল অনেক সময়ে তাহার পক্ষে অনিষ্টকারী হইতে পারে, কিন্তু এই অনিষ্টের হেতু সে স্বয়ং ভিন্ন অন্য কেহই নহে এবং এই অনিষ্ঠ ও তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য প্রযুক্ত হয় না, সে আপন কর্ম্মদোষে আপনিই ডাকিয়া আনে। কোন অভিমানী, অহঙ্কারী, অপব্যয়ী বা লম্পট অবশ্যই সাধারণের নিন্দনীয় হইবে। এবং নিন্দনীয় যাহাতে না হয়, এমন কোন অধিকারও সে প্রার্থনা করিতে পারে না। পক্ষান্তরে কোন অমায়িক, বিনয়ী, মিতব্যয়ী বা সচ্চরিত্র, সুখ্যাতি প্রার্থিত না হইলেও সাধারণে তাহার সুখ্যাতি করিয়া থাকে। অতএব অন্যের অনিষ্ট না হইলেও যে সকল কার্য্যের দ্বারা লোকে নিন্দার পাত্র না হয়, নিজের জন্য অবশ্যই তাহার তাহা করা উচিত।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার কার্য্যের জন্য সমাজ যে কাহার সুখ্যাতি বা অখ্যাতি করিবে না, আমরা তাহা বলি না, কেন না, যে সকল কার্য্যে অন্যের কোন প্রকার সংশ্রব আছে তাহার কিছুরই অমর্য্যাদা করা যাইতে পারে না। অন্যের সহিত একেবারে সম্বন্ধরহিত যে সকল কার্য্য, কেবল তাহাতেই সমাজের নিরপেক্ষ থাকা উচিত। এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহার উৎকর্ষাপকর্ষে কেবল যে আমার নিজের লাভালাভ হয় এমন নহে, অর্থাৎ আমার দোষের জন্য সমস্ত সমাজের উপরও দোষ আসিয়া পড়ে—এ সকল কার্য্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা মঙ্গলদায়ক নহে, সুতরাং তাহাদিগকে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যও বলা যাইতে পারে না। যদি কেহ আপন কার্য্যের দ্বারা আমাদিগের সন্তোষ বর্দ্ধন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহার জীবনকে যে অসুখী করিব তাহা নহে বরং যাহাতে তাহার সুখবর্দ্ধন করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিব। তাহার কুপথ অবলম্বন করার জন্য তাহাকে

দণ্ড না দিয়া তাহার প্রতি দয়া করিয়া তাহাকে রক্ষা করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। যদিও আমরা তাহার উপকার না করি, এই পর্য্যন্ত আমরা করিতে পারি যে, তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিব কিন্তু তাহাকে কখনই শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিয়া দণ্ড দিব না। কিন্তু কথা এই যে, কি প্রকারে উদাসীন থাকিব?

কেহই একেবারে স্বাধীন নহে। আপনার কর্ম্ম দ্বারা লোকে অগ্রে আপনাকে, তৎপরে পরিবারকে এবং তৎপরে সমাজকে আপনার সহিত সংযুক্ত করে। তাহার ব্যক্তিগত কর্ম্মের অপকৃষ্টতার জন্য সমাজকে হস্তক্ষেপ করিতে হইবার অগ্রে তাহার পরিবারবর্গ হস্তক্ষেপ করিবে। কোন অপব্যয়ী ব্যক্তি যদি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ সতর্ক হইতে না পারে, তাহা হইলে সমাজের হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তাহার পরিবারবর্গ, অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তি; যাহাদিগকে উহার অপব্যয়ের ফলভোগ করিতে হইবে, তাহারা তাহাকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং এমন সকল স্থলে সমাজের হস্তক্ষেপ করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না, কেননা তাহার কার্য্যের ফল যাহাদিগকে ভোগ করিতে হয়, তাহাদিগের অনুরোধেই তাহাকে অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে নিজের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলন ও পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য ভঙ্গ করিতে না হয়, এবম্প্রকার কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইবে এবং বাধ্য না হইলে তাহার সংসার মধ্যে বাস করাও চলে না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অন্যের সহিত সংস্রব বিরহিত এমন ব্যক্তি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

যদি আত্মবিষয়িণী জ্ঞান দ্বারা কেহ আপনাকে সংশোধন করিতে না পারে এবং তাহার চরিত্র, নিজ পরিবারবর্গেরও সংশোধনের অসাধ্য হয়, তাহা হইলে সমাজ তাহার কার্য্যে প্রত্যক্ষ রূপে হস্তক্ষেপ না করিলেও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সংক্রামকতা দোষের ভয়ে তাহার নিকট হইতে দূরে থাকে, অর্থাৎ তাহাকে এক প্রকার ত্যাগ করে বলিলেই হয়। সমাজত্যক্ত হইয়া লোকের বাস করা কঠিন. সুতরাং তাহাকে আপন চরিত্র সংশোধন করিতে হয়, অথবা একেবারে অপকর্ষতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে নিরাশ্রয় হইতে হয়। কিন্তু, নিজ বুদ্ধির দোষে যদি কোন ব্যক্তি সমাজের কাহারও অপকার না করিয়া এবং সামাজিক নিয়ম সকলের অন্যথা না করিয়া অসামান্য স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া অধঃপথে পতিত হয়, তাহা হইলে কি তাহাকে ত্যাগ করা সমাজের কর্ত্তব্য? যদি অজ্ঞান অল্প বয়স্ক নাবালকদিগের ভার সমাজ লইতে পারে, তাহা হইলে কি প্রাপ্ত বয়স্ক অজ্ঞান আত্ম-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া সমাজের কর্ত্তব্য নহে? যদি কেহ আপন আলস্য, পানদোষ, অপরিমিত ব্যয় বা চরিত্রদোষ বশতঃ তদানুসঙ্গিক অনিষ্ট আনয়ন করে, তাহা হইলে তাহার জন্য তাহার উপর যাহারা নির্ভর করে, তাহাদিগের মহা অনর্থ উপস্থিত হয়, এবং তাহার দ্বারা সমাজও কলুষিত হইতে পারে; সুতরাং যত দূর সম্ভব রাজশাসনাধীনেই তাহাকে আনা যাইতে পারে। কিন্তু রাজশাসন যদি তাহাতে হস্তক্ষেপ না করে, তাহা হইলে সমাজে তাহাকে দুইটা নিন্দা করিয়াও কি সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে পারে না? কোন ব্যক্তির নিজ স্বাধীনতার প্রতিকূলে কোন কথা বলি না, কিন্তু ইহাতে কাহারও বোধ হয় সন্দেহ নাই যে, সাধারণতঃ জীবন যাত্রা

নির্ব্বাহ করিবার জন্য বিশেষ এমন কোন স্বাধীনতার আবশ্যক হয় না, যাহা সমাজের বাল্যকাল হইতে নিষিদ্ধ নিয়ম সকল অবহেলন করিতে প্রবৃত্ত করে। সাধারণ জীবন গতি পরিচালনা করিবার জন্য পুরুষানুক্রমে কতকগুলি সদুপদেশ চলিয়া আসিয়াছে। নিজের স্বাধীনতার জন্য ইহাদিগের অন্যথা করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, বরং অবহেলনে ক্ষতিই দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অনেক সময়েই লোকে এবম্প্রকার স্বাধীনতা লইয়া থাকে, যাহাতে সমাজের হস্ত না থাকিলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সমাজের এবং বিস্তর পরিমাণে তাহার আত্মীয়বন্ধুর ক্ষতি হইয়া থাকে। এমন সকল স্থলে তাহার কার্য্যের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে শাসনাধীনে আনয়ন করা হয়। কিন্তু তাহাকে আমরা শাসনাধীনে আনয়ন করি কেন? সে স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া অন্যের অনিষ্ট করে বলিয়া, স্বাধীনতা লইয়াছে বলিয়া নহে। যদি কোন অমিতব্যয়ী অপব্যয় দ্বারা আত্মীয় পরিবারের ভরণ পোষণে অক্ষম হইয়া তাহাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের সাধন করিতে না পারে, বা মহাজনের ঋণ শোধ করিতে না পারিয়া তাহার প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটী করে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে যে দণ্ড দিয়া থাকি, তাহা তাহার অমিতচারিতার জন্য নহে—অন্যের প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলন ও ত্রুটির জন্য। সেই অর্থে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া যদি সে দান করিত বা অন্য কোন মহৎ কার্য্যে ব্যয় করিত,তাহা হইলেও সমানরূপে দণ্ডনীয় হইত। বেশ্যাকে অর্থ দিবার জন্য আত্মীয়ের প্রাণ বধ করাতে যে দণ্ড, জাতীয় ধন ভাণ্ডারের জন্য প্রাণবধেও সেই দণ্ড। নিজের কার্য্য দোষযুক্ত হইলে অন্যের প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটীর জন্য যে দণ্ড, কার্য্য দোষ শূন্য হইয়াও সেই কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইলে, সে ব্যক্তি দণ্ডনীয় হয়। কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইলেই দণ্ডনীয় হইবে, স্বাধীনতার অযথা ব্যবহারের জন্য নহে। মদ্য পান করিলেই সে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই, কিন্তু মদ্যপান করিয়া যদি শরীরের অসুস্থতা বা অর্থের অপব্যয় নিবন্ধন কেহ অন্যের এবং নিজের প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলন করে, তাহা হইলে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইবে। ফল কথা এই যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লইয়া লোকে যতক্ষণ কাহারও অনিষ্ট না করে, বা করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহাকে ততক্ষণ নির্ব্বিঘ্নে ঐ স্বাধীনতা অধিকার করিতে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু, এই প্রকার স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া যখনই আপনার, আত্মীয় বন্ধুর, বা সাধারণের ক্ষতিকারক হইবে, বা ক্ষতি করিবার সম্ভাবনা দেখা যাইবে, তখনই তাহার স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাকে সামাজিক,নৈতিক বা রাজশাসনে আনিতে পারিবে।

শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র বলেন, চীন দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ। চীন বৌদ্ধ গ্রন্থ ও মত সম্বন্ধে সামুয়েল বিল সাহেব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনু-

সন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেনঃ—"অনেক বার শুনিয়াছি যে,চীন দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সকল নেপাল দেশ প্রচলিত গ্রন্থাবলীর অনুবাদ। একথাটী সত্য নহে, যাঁহারা এসম্বন্ধে কোন সন্ধান রাখেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। সুতরাং এবিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই।"

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল অনুমান করেন, পালিভাষা অশোক বর্দ্ধনের পরস্তন। অশোকের পূর্ব্বে যে বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডাক্তার রাজেন্দ্র লালের অনুমান সত্য হইলে, পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ সকলের পূর্ব্বে যে অন্য ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, সন্দেহ নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পালি ভাষা অশোকের পূর্ব্বতন। কিন্তু নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে পারিয়াছি, বোধ হয় না। যাহা হউক, পালি ভাষা অশোকের পূর্ব্বতন হইলে ডাক্তার বাহাদুরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্তির সার্থকতা থাকে না। কিন্তু পালি ভাষা বিদ্যমান থাকিলেই যে সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষায় গ্রন্থ না লিখিয়া সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ গুলি পালি ভাষাতেই লেখা হইয়াছিল, এ কথাও আমরা এখনও বলিতে পারিতেছি না।

হজসন সাহেবের আবিষ্কৃত নেপালী সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সকল প্রাচীনতম ও আদি গ্রন্থ বলিয়া সাহেব ঘোষণা করিলেও এবং আরো দুই একজন পণ্ডিত তাঁহার পোষকতা করিলেও দু এক খানি গ্রন্থের প্রকৃতি নির্ণীত হইবামাত্র সাধারণে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠে। তখনও সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থ পরীক্ষিত হয় নাই, আজিও হয় নাই। অথচ পণ্ডিত সমাজ দু একখানি সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ ও দুএক খানি পালি গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া একেবারে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদল পালি গ্রন্থ সকলকে সংস্কৃতের পূর্ব্বতন ও আর এক দল উভয় ভাষার গ্রন্থাবলী সমসাময়িক বলিয়া স্থির করেন।

হজসনের পরে অনেক গুলি প্রত্নবিৎ দুই প্রকার গ্রন্থই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। লাসেনের মতে, বুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে সংস্কৃত ও অপবর্গদিগকে পালি ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি সেই জন্য অনুমান করেন, প্রথম হইতেই সংস্কৃত ও পালি উভয় ভাষায় প্রামাণ্য গ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছিল। গাথাকে লাসেন অপসংস্কৃত বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ কনিষ্কের সমকালে গাথা ভাষায় রচিত গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছিলেন।

বর্ণুফ বলেন, সংস্কৃত ও পালি উভয় প্রকার গ্রন্থই প্রামাণ্য. বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে পালি গ্রন্থ সকল সংস্কৃতের পরস্তন।

আলুইস সাহেব বলেন, পালি বৌদ্ধদিগের দেব ভাষা। প্রাচীনতর গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল, যে সময় হইতে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়া বৌদ্ধগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন, বিলাসপ্রিয় মহাসাংঘিকগণ বুদ্ধের কঠোর নিয়ম সুবিধা মত কোমলতর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে এই ধর্ম্মচ্যুত সম্প্রদায় সকল সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দীপবংশ ও অন্যান্য পালি গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আচার্য্য চাইলডার্স পালিকে বৌদ্ধদিগের দেব ভাষা বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং বুঝিতে

পারেন না, কিরূপে লোকে পালি গ্রন্থ সকল সংস্কৃতের অনুবাদ বলিয়া অনুমান করে। তাঁহার মতে সংস্কৃত গ্রন্থ সকল প্রাচীনতর পালি গ্রন্থের উপর রচিত এবং কতকগুলি যথাযথ অনুবাদ মাত্র।

দুই শ্রেণীর লোকের জন্য দুই প্রকার গ্রন্থ, কেহ কাহারও অনুবাদ নহে, উভয়েই সমান আপ্ত ও প্রামাণ্য, যুগপৎ দুই ভাষায় লিখিত হইবে, অসম্ভব না হইলেও যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, সে সময়ের পক্ষে অবিশ্বাস্য। বস্তুতঃ কোন দেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার উপযোগী কোন প্রমাণ না পাওয়াতে, বিভিন্ন পণ্ডিতেরা আপন আপন রুচি ও জ্ঞান এবং বিশ্বাস অনুসারে একটীকে অপরটীর মূল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। অবশিষ্টেরা দুই পক্ষের প্রমাণ সমান দেখিয়া দুই প্রকার গ্রন্থই প্রামাণ্য ও সমসাময়িক বলিয়া নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু যে সময়ে বৌদ্ধগ্রন্থ সকল রচিত হয়, সে সময়ে দুইটী বা দশটী, কতটী ভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কেহ বলিতে পারে না।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালিবাদিদিগের মত খণ্ডন করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যের মত শাক্যসিংহ যখন যে দেশে গিয়াছিলেন, তখন সেই দেশীয় ভাষায় আপন মত প্রচার করিতেন। সুতরাং বিভিন্নদেশে বিভিন্ন ভাষায় একই সময়ে বিভিন্ন আপ্ত গ্রন্থ রচিত হইবার সম্ভাবনা। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল এটীকে একটী সরল যুক্তি বলিয়া নিজেই স্বীকার করেন না, কথার কথা একটী বলিয়াছেন মাত্র। তাঁহার মতে সর্ব্বজন সম্মানিত পণ্ডিতগণের সাধারণ বোধগম্য সংস্কৃত ভাষা বিদ্যমান থাকিতে প্রদেশীয় ভাষায় আপ্ত গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু অন্যেরা একথার অসারত্ব বুঝিতে পারেন নাই। দুই প্রকার আপ্ত গ্রন্থ হইতে কয়েকজন আচার্য্য যুগপৎ বহু প্রকার আপ্ত গ্রন্থের বিদ্যমানতা কল্পনা করিয়াছেন।

বিখ্যাত রুস আচার্য্য মিনায়েফ বলেন, "একইশাস্ত্র যুগপৎ দুইটী বিভিন্ন ভাষায় রচিত হইয়াছিল বিশ্বাস করা সহজ নহে। বোধ হয় প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র বহুকাল মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া কালক্রমে বিভিন্ন অনেকগুলি ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সামুয়েল বিল সাহেবেরও মত এইরূপ। তিনি বলেন—"মিনায়েফ বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, শাসনভাষা পালিভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন অবস্থায় কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ সকল কেবল পালি ভাষা হইতে অনুবাদিত? আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষে লিখন প্রথা প্রচারিত হইবার পরে বৌদ্ধগ্রন্থ সকল নানা ভাষায় বিদ্যমান ছিল। আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ সকল নেপাল দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নানা ভাষা হইতে অনুবাদিত হইয়াছিল"।

অশোক শাসনের ভাষা পালি ভাষার পূর্ব্বতন, এই অনুমান করিয়া এই দুইজন আচার্য্য প্রদেশীয় বিভিন্ন ভাষায় বৌদ্ধ-প্রাচীন আপ্ত পুস্তক সকল রচনা হইয়াছিল, বিবেচনা করেন। প্রদেশীয় ভাষায় রচিত কোন বৌদ্ধ গ্রন্থ এখন বর্ত্তমান নাই। বিশেষতঃ নবধর্ম্ম প্রচারের প্রারম্ভে আপ্ত পুস্তক যুগপৎ বিভিন্ন প্রদেশীয় ভাষায় রচিত হই বার দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দেশীয়েরা কালক্রমে আপ্ত পুস্তক সকল আপন আপন ভাষায় অনুবাদ করিয়া

নয়। আস্ত গ্রন্থ আদৌ একই ভাষায় রচিত হইয়া থাকে। বিল সাহেব আরো বলেনঃ—

"নব প্রকাশিত অনেকগুলি পুস্তক পাঠে সকলেরই প্রতীতি হইয়াছে যে, প্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তক সকল কেবল সংস্কৃত ও পালিভাষায় রচিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় গ্রন্থকার আপন আপন বিভিন্ন মাতৃভাষায় উহাদিগকে রচনা করিয়াছিল।"

রাজেন্দ্রলাল ললিতবিস্তরকে যাদৃশ প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ললিতবিস্তর তাদৃশ প্রাচীন গ্রন্থ নহে। ললিতবিস্তরের প্রাচীনতা সম্বন্ধে ডাক্তার বাহাদুর নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রমাণ দেখিয়াছেন। ডাক্তার স্বয়ং বলিয়াছেন, ললিতবিস্তরের সহিত মহাবস্ত প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষা ও মতগত সাদৃশ্য এত যে, তাহাদিগকে ললিতবিস্তরের সমকাল রচিত বলিয়া সহজেই বুঝা যাইতে পারে। আমরাও সেই জন্য ললিতবিস্তরকে আধুনিক প্রমাণ করিতে পারিলে ঐ সকল গ্রন্থকেও আধুনিক বলিয়া ধরিয়া লইব।

১। চীন বুদ্ধ চরিত সংস্কৃত ললিতবিস্তর হইতে খ্রীষ্টের ৭০ অব্দে অনুবাদিত হয়। প্রামাণ্য গ্রন্থ ভিন্ন অন্য ভাষায় অনুবাদিত হয় না। সুতরাং সেই প্রামাণ্যতা লাভ করিতে ললিতবিস্তরের অনেক সময় লাগিয়া থাকিবে।

২। কনিষ্কের মহাসমিতি ও চীন অনুবাদের মধ্যে ব্যবধান অধিক নহে। সুতরাং কনিষ্কের পূর্ব্বে ললিতবিস্তর লিখিত হইয়াছিল।

৩। অশোক সমিতির পক্ষে এই আপত্তি ঘটে না। কিন্তু এতদিন বুদ্ধচরিত লেখা হয় নাই, অথচ তাহার পূর্ব্বে বুদ্ধের জীবন কালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে সকল মন্দিরে ও গুহায় চিত্রিত হইয়াছিল, বোধ হয় না।

৪। কালাশোকের সমিতির পক্ষে কোন আপত্তি খাটে না। সুতরাং কালাশোকের সময় ললিতবিস্তর লিখিত হইয়া থাকিবে।

৫। ললিতবিস্তর দুই খানি বিভিন্ন গ্রন্থ একত্র করিয়া রচিত হইয়াছে। আধুনিক গ্রন্থ খানি কালাশোকের সময় রচিত হইয়াছিল। যে প্রাচীন ললিতবিস্তরের গাথা সকল এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, বোধ হয় প্রথম বৌদ্ধসমিতিতে উহা রচিত হইয়া থাকিবে।

যে গ্রন্থ হইতে চীন ভাষায় বুদ্ধচরিত অনুবাদিত হইয়াছিল, সে গ্রন্থখানি বিদ্যমান নাই। সেখানি কোন্ ভাষায় রচিত ছিল, এখন বলা যায় না। ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের উল্লিখিত গাথা বুদ্ধচরিত হইতে চীন বুদ্ধচরিত অনুবাদিত হইয়া থাকিতে পারে। চীন ভাষায় তিনখানি বুদ্ধচরিত দেখিতে পাওয়া যায়। বিগণ্ডেট সাহেব ব্রহ্মদেশীয় একখানি বুদ্ধচরিত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। এখানি পালি মালালঙ্কার বত্থু নামক বুদ্ধচরিতের অনুবাদ। মালালঙ্কার বত্থু খুব প্রাচীন গ্রন্থ নহে। বিল সাহেব এক খানি চীন বুদ্ধচরিত ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এখানি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সংস্কৃত অভিনিষ্ক্রমণসূত্র হইতে জ্ঞানকূট কর্ত্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। চৈনিক অভিনিষ্ক্রমণ সূত্রের শেষ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ধর্ম্মগুপ্তের শিষ্যেরা এই গ্রন্থকে কো পেন-হিং-কিং বলে, প্রাক্সী-

বাদেরা ললিতবিস্তর বলে এবং মহামাজ্ঝি-কেরা মহাবস্তু বলে। কো-পেন-হিং-কিং খ্রীষ্টের ৬৯ বা ৭০ অব্দে চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল এই খানিকে ললিতবিস্তর বলিয়াছেন। ললিত-বিস্তর ও মহাবস্তু দুই খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, সুতরাং কো-পেন হিং কিং যে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক, সন্দেহ নাই। এই সকল গ্রন্থের আখ্যায়িকা প্রায় একরূপ, তথাপি গ্রন্থগুলি যে স্বতন্ত্র, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। ষষ্ঠ শতাব্দীর চৈনিক অভিনিষ্ক্রমণ সূত্রে ললিতবিস্তরের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। এই ষষ্ঠ শতাব্দী-তেই ললিতবিস্তর ভুটিয়া ভাষায় যথাযথ অনুবাদিত হইয়াছিল, সুতরাং ষষ্ঠ শতাব্দী বা তাহার কিছু পূর্ব্বে যে বর্ত্তমান ললিত-বিস্তর বিদ্যমান ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফরাসী পণ্ডিত ফুকো সাহেব ভুটিয়া ললিতবিস্তর ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বর্ত্তমান ললিতবিস্তর কনিষ্কের মহাশব্দে রচিত হইয়াছিল।

কো-পেন-হিং-কিং অদ্যাপি অনুবাদিত হয় নাই। হইলে ললিতবিস্তরের সহিত মিলাইয়া আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিতাম, সেখানি ললিতবিস্তরের অনুবাদ কি না। এখন কেবল অনুমান হয় যে, ললিতবিস্তর এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ। এই অনুমানের একটী কারণ এই মাত্র উল্লেখ করা গিয়াছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কো-পেন-হিং-কিং ও ললিতবিস্তরে অধ্যায়গত বিভিন্নতা আছে। বিল সাহেব বলেন, কো-পেন-হিং-কিং নামে অনেকগুলি গ্রন্থ চীনভাষায় পাওয়া যায়; ইহাদের এক খানি এক অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, দুই খানি পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, আর এক খানি সাত অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। যেখানি খ্রীষ্টের ৬৯। ৭০ অব্দে অনুবাদিত হইয়াছিল, সেই খানি পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। পঞ্চাধ্যায়ী দ্বিতীয় গ্রন্থ খানি খ্রীষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে অশ্বঘোষ রচনা করেন, খ্রীষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে ধর্ম্মলতাশীন উহা চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই চারি খানি গ্রন্থ স্বতন্ত্র, অপর তিন খানি ছাড়িয়া কেবল এক খানিকে ললিতবিস্তর বলিয়া অনুমান করিবার কোন কারণ ডাক্তার বাহাদুর নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যে খানিকে ললিত বিস্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে খানি পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। কিন্তু ললিতবিস্তরে (২৩) অধ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। চৈনিক অনুবাদ, সাঁচি, অমরাবতী। ভারত প্রভৃতি স্থানের গুহা মন্দিরে চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি দেখিয়া আমরা ডাক্তার বাহাদুরের সহিত একবাক্যে বলিতে পারি, কালাশোকের পূর্ব্বে এক খানি বুদ্ধ চরিত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই খানি যে, বর্ত্তমান ললিতবিস্তর তাহার কোন প্রমাণ নাই। জাতকথবন্নন নামক গ্রন্থের অনুবাদে ডাক্তার রিসডেভিস বলিয়াছেনঃ—

"The ancient bas-reliefs (at Sanchi, Amarabati, Bharat &c) afford indisputable evidence that the birth stories were already at the end of the third century B. C. considered so sacred that they were chosen as the subjects to be represented round the most sacred Budhist buildings."

নামের সাদৃশ্য দেখিয়া দুই খানি গ্রন্থ এক বলিয়া অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। চৈনিক গ্রন্থের নামের সহিত বর্ত্তমান সংস্কৃত বা পালি গ্রন্থের নাম সাদৃশ্য দেখিয়া প্রত্নবিদেরা বারম্বার প্রতারিত হইয়াছেন। ভক্তি ভাজন ডাক্তার মরিস সাহেব অঙ্গুত্তর নিকায়ের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেনঃ—

"The chinese are said to have a work answering Anguthara Nikaya, which professor Beal calls the Add-one Agama. We have, however, no means of verifying this statement as we have no published specimens of a Chinese Anguthra to compare with the Pali version...The Chinese may have had a Anguthra but it probably bore no closer likeness to the Pali work so called than the Dhammapada translated by Professor Beal resembles the text edited by Professor Fansboll"

Sacred Books of the East vol. XI নামক গ্রন্থে ডাক্তার রিস ডেভিডস লিখিয়াছেন:—"No Sanskrit work has yet been discovered giving an account of the last days of Gotamo; but there are several Chinese works which seem to be related to ours of one especially, named the Fo-Panni-pan-king, Mr. Beal says "This appears to be the same as the Sutra known in the South...whether the book referred to is really the same work as the Book of the Great Decease seems to me to be very doubtful. At P. 160 of his Catena of Baddhist scriptures from the Chinese, says—that another Chinese work known as the Maha Parinirvan sutra is evidently the Same as the Maha Pari-nirbhan Sutta of Ceylon. But it is quite evident from the extracts which he gives that it is an entirely different and much later work. At p 12—13 of the samecatalogue we find no less than seven other works and an eighth on b 77 not indeed identified with the Book of the great Decease, but bearing titles which Mr. Beal represents in Sanskrit as Maha Parinirvan Sutra. In the Indian Antequary for 1875, Mr. Beal gives an account of another undated work bearing a, different title from any of the above but which he also translate as Maha Parinirvansutra. There is perhaps another Chinese work on the death of Budha, of the existence of which I have been informed by Mr. Kasawara. But it contains a good deal of matter not found in the Maha Parinirvan suttra and it omits many of the sections found in the Pali. There is no evidence to show that any of the above works are translations of our sutta or in any sense of the same work No. *reliance infact can be placed upon the mere similarity of title in order to show that a Chinese work and an Indian one are really the same; and I regret that attempts should have been made to fix the date of Indian works by the fact that Chinese translations bearing semilar titles are said to have been made in a certain period.*

চৈনিক অভি নিষ্ক্রমণ সূত্র, ব্রহ্মদেশীয় মালালঙ্কার বত্থু, সংস্কৃত মহাবস্তু ও ললিত-বিস্তর তুলনা করিলে দেখা যাইবে, এই কয়েক খানি গ্রন্থের আখ্যায়িকা ভাগ সাধারণতঃ একরূপ, তথাপি বর্ণনা পর্য্যায়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে এত প্রভেদ আছে যে, এগুলিকে একখানি গ্রন্থ বলিয়া কিছুতেই অনুমান করা যাইতে পারে না। বোধ হয়, আদৌ এক খানি বুদ্ধচরিত গাথা ভাষায় রচিত হইয়াছিল, কালক্রমে সেই মূল আখ্যায়িকার উপর পরবর্ত্তন বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ নূতন নূতন আখ্যায়িকা সংযোগ করিয়া এবং মূল গ্রন্থে আপন আপন সাম্প্রদায়িক মত আরোপ করিয়া নূতন নূতন বুদ্ধ চরিত রচনা করিয়াছিলেন। সেই মূল গাথা চরিত অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয়নাই, কিন্তু উহার গাথা সকল বিভিন্ন গ্রন্থে কিয়ৎ পরিমাণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

ললিত বিস্তর।

প্রথম অধ্যায়—শ্রাবস্তী নগরে ভগবান বুদ্ধদেব বুদ্ধালঙ্কার ব্যূহ নামে সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে শুদ্ধাবাস দেবপুত্রগণ তাঁহাকে ললিত বিস্তর বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়—গ্রন্থ সূচনা বুদ্ধের গুণ-কীর্ত্তন।

তৃতীয় অধ্যায়—চক্রবর্ত্তী রাজার লক্ষণ কি, এবং বুদ্ধ শাক্যবংশে কেন জন্ম গ্রহণ করিলেন। বিদেহ, কৌশল, বংশরাজ, বৈশালী, প্রদ্যোত, কংশ পাণ্ডু এবং সুমিত্রা বংশ হইতে শাক্য বংশ কি গুণে শ্রেষ্ঠ? যাঁহার গর্ভে বোধিসত্বের জন্ম হয়, তাহার দ্বাত্রিংশ লক্ষণ কি কি?

চতুর্থ অধ্যায়—ধর্ম্মালোক হইতে ধার্ম্মিকগণের কিরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, তাহার নিদান।

পঞ্চম অধ্যায়—বোধিসত্ব তুষিতবাসী দেবপুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি জম্বুদ্বীপে যাইতেছেন। দেবপুত্রগণ রোদন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের জন্য তুষিত ভবনে মৈত্রেয় বোধিসত্বকে অভিষেক করিয়া কিরূপ গর্ভবাস করিবেন, তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনন্তর জন্মকাল সমাগত দেখিয়া বোধিসত্ব শুদ্ধোদনের গৃহে আটটী পূর্ব্বলিখিত প্রকাশ করিলেন। মায়াদেবীর রূপগুণ কীর্ত্তন। বোধিসত্ব তুষিত লোক পরিত্যাগ করিলেন। মায়া দেবীর শীলাব্রত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—মায়া দেবীর স্বপ্নদর্শন, ব্রাহ্মণগণের স্বপ্নার্থ নির্ণয়। বোধিসত্বের গর্ভাবাস। দেবগণকর্ত্তৃক গর্ভাবস্থবোধিসত্বের পরিচর্য্যা।

সপ্তম অধ্যায়—বোধিসত্বের জন্ম সময়ে শুদ্ধোদনের গৃহোদ্যানে দ্বাত্রিংশত পূর্ব্ব লিখিত ঘটনা। প্রসব কাল সমাগত বুঝিয়া মায়াদেবী লুম্বিন বনে একটী প্লক্ষ শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, শত সহস্র কর্ম্মচারী দেবতাগণ তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছেন, এমন সময়ে বোধিসত্বের জন্ম হইল। বোধিসত্বের বাল্য লীলায় আয়োজন। সর্ব্বার্থসিদ্ধ নাম করণ, সপ্তম দিবসে মায়াদেবীর মৃত্যু। লুম্বিনী বন হইতে বোধিসত্বের কপিলবস্তু প্রবেশ, হিমবৎবাসী মহর্ষি অমিতের আগমন। অমিত শুদ্ধোদন সংবাদ। বোধিসত্বের কোষ্ঠি নির্ণয়। অমিতের নিকট বোধিসত্বের ব্যাকরণ শুনিয়া শুদ্ধোদন পুত্রের চরণে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন।

বন্দিতস্ত্বং সুরৈঃ সেন্দ্রৈঃ ঋষিভিশ্চাপি
পূজিতঃ বৈদ্য সর্ব্বস্য লোকস্য বন্দেহমপি
ত্বাং বিভো।

অষ্টম অধ্যায়।—অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতিকে রাজ পথ হইতে দূরীভূত করিয়া কুমারকে কূপে আনয়ন। শত সহস্র দেবতা বোধিসত্বের রথ বহন করিয়া চলিলেন।

নবম অধ্যায়।—বোধিসত্বের আভরণ ধারণ।

দশম অধ্যায়।— বোধিসত্বের পাঠশালায় গমন। পাঠশালায় যাইয়া বোধিসত্ব আচার্য্য বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, অঙ্গরঙ্গ মগধ, দ্রাবীড় কিনারি, চীনহূণ ইত্যাদি কোন লিপি শিখাইবেন, আচার্য্য শুনিয়া অবাক।

যেষামহং নামধেয়ং লিপিনাং ন প্রজানামি
তত্রৈব শিক্ষিতঃ সত্বো লিপীশালামুপাগতঃ।
বক্ত্রং চাস্য নপশ্যামি মূর্দ্ধানং তস্য নৈবচ
শিক্ষয়িষ্যে কথং হ্যেনং লিপিপ্রজ্ঞাপারগতঃ॥

একাদশ অধ্যায়।—সহচরদিগের সহিত কুমারের কৃষি গ্রাম দর্শনে গমন। সেখানে জম্বুবৃক্ষ মূলে বসিয়া কুমারের ধ্যান স্থখলাভ।

যস্য বৃক্ষস্য ছায়ায়াং নিষণ্ণো বরলক্ষণঃ।
নৈনং ন জহতে ধ্যায়ন্তং পুরুষোত্তমং॥

দ্বাদশ অধ্যায়।—সিদ্ধার্থের বিবাহ দিবার

জন্য মহল্লক মহল্লিকা প্রমুখ শাক্যগণের উপদেশ। শুদ্ধোদন পুরোহিতকে ডাকিয়া কতকগুলি গুণের উল্লেখ করিয়া বলিলেন।

ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শুদ্রীংতথৈবচ
যস্যাএতেগুণাঃসন্তি তাং মে কন্যাং
নকুলেন ন গোত্রেন কুমারো মম বিস্মিতঃ
গুণে সত্যেচ ধর্ম্মেচ তত্রাস্য রমতে মনঃ ॥

পুরোহিতের শাক্য পাণি দুহিতা দর্শন। রাজাকর্ত্তৃক দারিকাগণের নিমন্ত্রণ। বোধিসত্ত্বের আলাপ। পাত্রে কন্যা দান করিব না, দণ্ডপাণির এই প্রতিজ্ঞা। অস্ত্রবিদ্যা, অঙ্কবিদ্যা প্রভৃতি পরীক্ষায় বোধিসত্ত্বের জয়লাভ। সর্ব্বার্থসিদ্ধের বিবাহ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।—সর্ব্বার্থসিদ্ধের বিলাস ভোগ। অভিনিষ্ক্রমণ পরামর্শ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।—সর্ব্বার্থ গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন, শুদ্ধোদনের এইরূপ স্বপ্নদর্শন। প্রস্থান নিবারণার্থে বিশেষ উপদেশ। বোধিসত্ত্বের নগর ভ্রমণ। আতুর বৃদ্ধের সহিত ব্যাধিস্পৃষ্টি ও শব দর্শন।

ধিক্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্য ধিক্ বিবিধব্যাধি পরাহতেন।
ধিক্‌জীবিতেন পুরুষো নচিরস্থতেন।
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতি প্রসঙ্গৈঃ
যদিজর নভবেয়া নৈবব্যাধি র্নমৃত্যু
স্তথাপিচ মহাদুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিংপুন জরব্যাধি নিত্যানুবন্ধাঃ
সাধু প্রতি নিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোক্ষং।

সাধুদর্শন। শুদ্ধোদনের অধিকতর সতর্কতা।

পঞ্চদশ অধ্যায়।—ছন্দককে সঙ্গে লইয়া পলায়ন।

ওদিকে রাজ প্রাসাদে কুমারের অদর্শনে সকলের হাহাকার। কুমারের অন্বেষণ।

ষোড়শ অধ্যায়।—নানা আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিয়া সিদ্ধার্থের বৈশালী প্রবেশ, অরাড় কালামের সহিত সাক্ষাৎ। তথা হইতে মগধ রাজধানী রাজগৃহ নগরে প্রবেশ। পুরজন কর্ত্তৃক রাজা বিম্বসারের নিকট বোধিসত্ত্বের অপূর্ব্ব রূপ কীর্ত্তন। সিদ্ধার্থ বিম্বসার সংবাদ।

সপ্তদশ অধ্যায়।—আচার্য্য রুদ্রকের শিষ্যত্ব গ্রহণ। রুদ্রক অনুসৃত মার্গে বোধিসত্ত্বের অনাস্থা। তথা হইতে প্রস্থান। পঞ্চজন ভদ্রবর্গীয় রুদ্রক শিষ্য কর্ত্তৃক বোধিসত্ত্বের অনুগমন। গয়াপ্রবেশ। গয়ায় মনস্তুষ্টি হইল না। নৈরঞ্জনাতটে উরুবিল্ব প্রবেশ। ছয় বৎসর দুষ্কর তপস্যা।

অষ্টদশ অধ্যায়।—দুষ্কর তপস্যা পরিহার। পঞ্চভদ্র বর্গীয়ের বারাণসী নগরে মৃগদাব ঋষি পতনে প্রস্থান। আভীর কুমারী সুজাতার পরিচর্য্যা। বোধিদ্রুম মুখে প্রস্থান।

ঊনবিংশ অধ্যায়।—কালিক নাগ কর্ত্তৃক বোধিসত্ত্বের স্তব। বোধিদ্রুম মূলে আসন গ্রহণ।

বিংশ অধ্যায়।—বোধিসত্ত্বের প্রভাবে আকর্ষিত হইয়া অন্যান্য বোধিসত্ত্বগণের বোধিমূলে আগমন।

এক বিংশ অধ্যায়—মার কর্ত্তৃক বিবিধ প্রলোভন দর্শন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়—বোধিসত্ত্বের প্রজ্ঞালাভ। বোধিসূত্রের উদ্ভাবন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—শুদ্ধাবাস কায়িকা দেবপুত্রগণ কর্ত্তৃক বোধিসত্ত্বের আরাধনা। সব্রহ্ম দেবপুত্র প্রমুখ ব্রহ্মকায়িক দেবগণ কর্ত্তৃক বোধিসত্ত্বের আরাধনা। শুক্লপাক্ষিক, পরনির্মিত বশবর্ত্তী, সুনির্মিত, সন্তুষিত, সুযাম দেবপুত্র প্রমুখ ইন্দ্র প্রমুখ ত্রয়স্ত্রিংশ, চতুর্মহারাজ কায়িকা, অন্তরীক্ষ, ভৌম, প্রভৃতি দেব পুত্র কর্ত্তৃক বোধিসত্ত্বের আরাধনা।

চতুর্বিংশ অধ্যায়—সাতদিন বোধিমূলে বাস, সমস্ত কুসুম দেবপুত্র কর্ত্তৃক বোধিসত্বের স্তব। আর তিন সপ্তাহ বোধিমূলে বাস। মার কর্ত্তৃক বোধিসত্বকে পরিনির্ব্বাণ গ্রহণার্থ অনুরোধ, বোধিসত্বের অস্বীকার। মার দুহিতৃগণ কর্ত্তৃক বোধিসত্বকে প্রলোভন প্রদর্শন। পঞ্চম সপ্তাহে মুচিলিন্দ নাগরাজ ভবনে বোধিসত্বের বিহার। ষষ্ঠ সপ্তাহে অজ পালের ন্যগ্রোধমূলে বিহার, নির্গ্রন্থাদির সহিত আলাপ, সপ্তম সপ্তাহে তারায়ণ মূলে বিহার। ত্রপুষ ভল্লিক নামক বণিক দ্বয়ের বুদ্ধ ও ধর্ম্মের শরণ গ্রহণ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—ব্রহ্মার অনুরোধে তথাগতের ধর্ম্ম। চক্রপ্রবর্ত্তনে প্রতিশ্রুতি। বোধিবৃক্ষ দেবতা চতুষ্টয়ের প্রশ্নোত্তরে বারাণসী নগর মৃগদাব ঋষি পতনে ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়—রুদ্রক ও অরাড় কালামের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া পঞ্চভদ্রবর্গীয়ের পূর্ব্ব সহচরদিগকে প্রথমে ধর্ম্মোপদেশ দান করিবার ইচ্ছা। গয়া বোধিমতস্থ আজীবকের সহিত পরিচয়। নাগরাজ সুদর্শনের নিমন্ত্রন গ্রহণ, গঙ্গার পরিপূর্ণতা হেতু পার করিবার জন্য নাবিকের সাহায্য প্রার্থনা। বিনা মূলে পার করিতে নাবিকের অস্বীকার, আকাশ মার্গে গঙ্গা উত্তরণ। বারাণসী প্রবেশ। গৌতম দুষ্কর তপস্যা পরিহার করিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া তাঁহাকে অসমাদর করিতে পঞ্চভদ্রবর্গীয়ের প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, বোধিসত্বের অভ্যর্থনা। দেবপুত্রগণের আগমন। রাত্রির প্রথম যামে তুষ্ণীভাব, মধ্যম যামে রঞ্জনীয় কথা, পশ্চিম যামে ভদ্রবর্গীয়দিগকে উপদেশ, বৌদ্ধনিদান কথা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।—মহাবৈপুল্য সূত্রান্ত ললিতবিস্তর শ্রবণ পঠন ধারণ ও প্রচারের কথালাপ। ললিতবিস্তরের শেষ শ্লোকে লিখিত আছে; "শ্রীসর্ব্ববোধিসত্বচর্য্যা প্রস্থানো ললিত বিস্তরো নাম মহায়ন্ন সূত্রং রত্ন রাজমিতি সমাপ্তং"।

ললিতবিস্তর যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ, গ্রন্থ মধ্য হইতেই তাহার কয়েকটী প্রমাণ পাওয়া যায়। মহায়ণ সম্প্রদায় শাক্যের মৃত্যুর শত বৎসর পরে গঠিত হইয়াছিল। ললিত বিস্তর মহায়ণ গ্রন্থ বলিয়া আপনিই আপনার পরিচয় দিতেছে। সুতরাং শাক্যের মৃত্যুর অনেক পরে যে ললিত বিস্তর রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। মহ বৈপুল্য গ্রন্থ সকল সাধারণতঃ আধুনিক বলিয়া স্বীকৃত হয়। ললিত বিস্তরও এক খানি মহাবৈপুল্য গ্রন্থ। বৈপুল্য গ্রন্থাবলীর রচনা কাল সম্বন্ধে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন,—"The Vapulya sutras are written in a mechanical style, mingling prose and verse in regular alternation. They allude to individuals who lived long after the days of their alleged author and claim a degree of elaboration and finish, which leave no doubt as to their having been compiled at a much later period." বিল সাহেবের মতে বৈপুল্য বৌদ্ধ ধর্ম্ম মহায়ণ ধর্ম্মের পরস্তন, "This is evidently a form of pure Pantheism and denotes the period when the distinctive belief of Buddhism merged into later Brahmanism, if it did not originate it." এতদ্ভিন্ন—"বোধিসত্ব" "ধারণী" প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের বর্ত্তমান অর্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। "ধারণী" সকল সম্বন্ধে আচার্য্য বর্ণুফ এইরূপে বলিয়াছেন "It is of a modern origin and formed no part of the religion promulgated by Sakya."

গ্রন্থ বিশেষের বহুভাষিতা দোষ ধরিয়া কেহ কেহ তাহাদিগকে আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ললিতবিস্তরে বহুভাষিতা বড় অধিক, সেই জন্য অনেকে ললিতবিস্তরকে অতি আধুনিক গ্রন্থ বলিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় প্রকৃতিই অতি অল্প সময়ে বহ্বায়তন ধারণ করে। বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যের নির্দ্দিষ্ট বিবর্ত্তন ভারতবর্ষে লক্ষিত হয় না। সে দিন বালক ছিলাম, আজ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, যৌবন কোথা দিয়া অন্তর্বাহিত হইয়াছে, বুঝিতে পারি নাই। তরু লতা পশু পক্ষী সকলেই যেন এক লম্ফে পূর্ণতা লাভ করে। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যশাস্ত্রের গতিও এইরূপ। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য, যত দিন শাক্যসিংহ রাজপুত্র, প্রতিবেশী, বা ধর্ম্মপ্রচারক রূপে মনুষ্যের আকৃতিতে ভারতবাসীগণের হৃদয়ে জাগরিত ছিলেন, তত দিন কেহ তাহাকে শতকোটী দেবপূজিত বোধিসত্ব রূপে বর্ণন করিতে সাহস করিত না। যতই তাঁহার মনুষ্যত্ব লোকের মন হইতে লোপ পাইয়াছে, অপর দিকে তাঁহার দেবত্ব ততই অঙ্কুরিত হইয়াছে। কিন্তু দেবত্বের একবার অঙ্কুর হইলে কত সময় তাহার পূর্ণতা লাভ হয়, বলা সহজ নহে। মহাজনের মৃত্যুর দুই তিন শত বৎসর পরে ভারতবর্ষের ন্যায় কুসংস্কার আচ্ছন্ন দেশে দেবত্ব লাভ দুষ্কর নহে। কত জনে জীবিতাবস্থায় দেব পদবী লাভ করিয়াছেন। খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কনিষ্কের সম সাময়িক অশ্বঘোষ যে বুদ্ধচরিত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই শাক্যকে দেবতারূপে বর্ণন করা হইয়াছিল, কিছু পরেই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বিকাশ।

"বিকাশ" সম্বন্ধে নানামুনির নানামত। পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে, চিন্তাশীল জগতে, চির দিনই একথার বিতণ্ডা চলিতেছে। চক্ষুর চারি দিকে এই বিচিত্র বিশাল বিশ্ব ছড়ান রহিয়াছে। চোক্ ফুটিবা মাত্র, নয়ন দুইটী খুলিবামাত্র, দশদিক্ হইতে, কোটি২, অসংখ্য, অগণ্য দৃশ্য, দৃষ্টির সম্মুখে হাসিয়া হাসিয়া নৃত্য করিতে থাকে। এমন নিরেট মূর্খ কে, সেই প্রকৃতির সরল-হাসি-মুখে কালি ঢালিয়া সেই বৈচিত্র্যময় পবিত্র ছবি খানি, আঁধারে ডুবাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে? কাহার এমন কঠোর প্রাণ, বিরক্ত হইয়া বলিবে, "যা তুই-প্রকৃতি, তোরও হাসি ভাল লাগেনা—ও হাসির দিকে আমার হৃদয় দিন রাত ছোটে না, তোর ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া আমার মস্তিষ্ক ক্ষয় করিতে আর অভিলাস হয় না? যখন গভীর নিশার নিস্তব্ধ কোলে, আঁধার আকাশে, শিশু তারাগুলি ফুটিয়া ফুটিয়া, একটুকু একটুকু সরল মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে ডাকে, "আয়! আয়!" কাহার প্রাণ, মন, হৃদয় এক হইয়া, একমুহূর্ত্তে তাহাদের কাছে ছুটিয়া গিয়া বলেনা, "এইদ্যাখ, সোণা মণি, কচি কচি তারাগুলি—ক্ষুদে ক্ষুদে জ্যোতির ফুলগুলি, তোদিগকে বুকে রাখিয়া প্রাণ জুড়াইতে আসিয়াছি, তোদের কচি কচি গলাধরিয়া, একসঙ্গে, একহইয়া, খেলা

করিতে আসিয়াছি, বল তোরা কে? কাননের, বাগানের শ্যামল কান্তিমাখা সুন্দর গায়ে ফুলগুলি, কলিকাগুলি ধীরে২ ফুটিতে দেখিয়া সকলেরই মনে কি ঐ সাধ হয় না? চাঁদের হাসি, উষার হাসি, গোধুলির হাসিখুসী লাল মুখ খানি দেখিয়া, কেনা ভাবে, এরা, হাসে কেন?—আসে কেন? যায় কেন? দুর্ব্বার আগে শিশির বিন্দু, উচ্ছ্বসিত সমুদ্র বক্ষ, রাজ পথের ধুলীকণা, প্রকাণ্ড শেখর রাজিমণ্ডিত বিশালবক্ষ হিমালয়, বিচিত্র প্রকৃতির আসন ঘূর্ণায়মান ধরা পৃষ্ঠ, নীল আকাশে চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহমালা; আবার পাখীর কুজন, ভ্রমর গুঞ্জন, রামধনু, পুষ্পকানন, মলয় অনিল নদীর বুকে কিরণমাখা লহরী পুঞ্জ, বিচিত্র দেহ জীবন স্রোত। উর্দ্ধে অনন্ত শূন্য, দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে, অনন্ত দূরত্ব। ভিতরে প্রাণ, তাহাতে অনন্ত ভালবাসা, অনন্ত আশা, অনন্ত তৃষ্ণা। ইহারই নাম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড? ঐ তারা হাসে ব্রহ্মাণ্ড কোলে, ফুল ফোটে ব্রহ্মাণ্ডবক্ষে। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডচিত্র, স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিয়া কে জীবিত থাকিতে পারে? চিন্তা আপনিই ঐ দিকে ছোটে, ভাবিতে হৃদয় আপনি উছলিয়া উঠে। মানুষ এই বিশ্বের চিন্তা হইতে অল্পক্ষণই বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে প্রথম চিন্তা, "বিকাশ"। মানুষের প্রাণ, সজনে, বিজনে, সর্ব্বদাই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছে, "সুন্দর প্রকৃতি, তুমি কোথা হইতে আসিলে? কে তোমাকে ফুটাইল? কি ভাবে ফুটিলে?" প্রাণের এই নীরব সম্বোধন সকলে শোনে না। যাঁহারা শোনেন, তাঁহাদিগকেই বলে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু।

জিজ্ঞাসা হইল, উত্তর দিতে বিজ্ঞান বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইল। বিজ্ঞান অনেক ভাবিয়া, চিন্তিয়া, মানুষকে বলিয়াছে, "তুমি, সদ্য পক্কমিষ্টান্নের মত প্রকৃতিটাকে, বড় রসাল ভাবিতেছ, বস্তুতঃ ওটা তত রসাল নয়। প্রকৃতি কতকগুলি অস্থি বা ধুলার সমষ্টি। উহাতে রস নাই। উহার প্রাণ নাই। উহা আন্ধারে ফুটিয়াছে, শূন্যে মিলাইবে। পঁয়ষট্টি প্রকার ভৌতিক পরমাণু নামক, অন্ধকার রাজ্যের কতকগুলি পদার্থে, অথবা ইথার নামক অন্ধতম প্রদেশের একমাত্রমূল বস্তুতে, এই বিশ্বচরাচরের দেহ গঠিত। প্রোটোপ্লাজম নামে অদৃষ্ট জগতের অদ্ভুত দ্রব্যে ঐ বিকাশের মূল ভিত্তি স্থাপিত। নেবুলা বা গগনব্যাপী জ্বলন্ত নীহার পুঞ্জ হইতে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড চক্র ফুটিয়াছে। প্রাকৃতিক রাজ্যের ঘন গভীর তমোরাশির গর্ভ হইতে, গুটিতিনেক অন্ধ নিয়ম প্রণালী (১) আসিয়া ইহাকে বর্ত্তমান আকারে সাজাইয়া রাখিয়াছে। পরমাণুর যোগ, বিয়োগই ইহার প্রাণ বা স্থিতি-রক্ষক। এ ব্রহ্মাণ্ডের আদিতে এবং অন্তে নিবিড় তিমির জাল বিস্তৃত। এজগতে প্রতিনিয়ত ঘটনাতরঙ্গের পরে ঘটনার তরঙ্গ উঠিতেছে, ছুটিতেছে। একটী ঢেউ পশ্চাত থাকিয়া, অপরটীকে ফুটাইতেছে। আদিতরঙ্গ কোথা হইতে আসিল, শেষ তরঙ্গ কোথায় মিলাইবে, এচিন্তা অবোধ্য। বিজ্ঞান মানুষকে এই শিক্ষা দিয়া নীরব, মানুষ এই শিক্ষা পাইয়া নীরব। ডারউইন, নেপ্লাস প্রভৃতি মূল অভিনেতাগণ, অভিনয় শেষ করিয়া, আজ বিশ্বরঙ্গক্ষেত্রে দণ্ডায়মান।

(1) Natural Selection, 2 Sexual Selection, 3 Survival of the Fittest.

জগৎ, উচ্চৈঃস্বরে, তাঁহাদিগের মস্তকে অগণ্য ধন্যবাদ বর্ষণ করিয়া, ধীরে ধীরে, তাঁহাদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করিতেছে। তবে কি বিকাশের চিন্তা, এখানেই শেষ হইল? এ বিশ্ব কি মৃত্যুতে ফুটিয়াছে, মৃত্যুতেই বিলীন হইবে;—মৃত্যুই কি ইহার আদি, মৃত্যুই কি ইহার পরিণাম?

বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার হাত কোথায়? পা কোথায়? বিজ্ঞান বলিবে, "আমি হাত পা শূন্য দেহমাত্র। দৃশ্যমান জগৎ আমার রাজ্য। আমার চক্ষুর সম্মুখে যে সকল বস্তু এবং ঘটনা আছে, আমি সর্ব্বদা তাহাদের মধ্যে একটী সাধারণ শৃঙ্খলা অনুসন্ধান করিয়া থাকি। যাই একটী ঘটনা আমার সম্মুখে আসিল, অমনি তাহার মূলে অবতরণ করিয়া দেখি, কোন্ শ্রেণীর নিয়ম সূত্রে ইহা বাঁধা। আমি জানি, অনিয়মে এজগতে কোন কাজই হয় না। অনিয়মে একটী সামান্য ধূলিকণাও স্থানচ্যুত হইতে পারে না। আবার জানি, ঘটনার মূলে যে নিয়মের শৃঙ্খলা রহিয়াছে তাহা অখণ্ড, অব্যর্থ। যদি আমার প্রথম দর্শনে ভুল না হয়, তবে এই নিয়মের সূত্র ধরিয়া, যে কাজে হাত দেই, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি। জগতে যত কিছু অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া, যত কিছু মানুষের মহৎ কার্য্য, এই ব্যাপার হইতে সমুদ্ভূত। এখন একটী কথা, এইরূপ জানি কেন? ইহার উত্তর, দেখি বলিয়া। যেখানে যেখানে ঘটনা দেখিয়াছি, সেখানেই নিয়ম দেখিয়াছি। যেখানে নিয়ম দেখিয়াছি, সেখানেই তাহার অব্যর্থতা দেখিয়াছি। দৃষ্টির ভ্রমক্রমে কোথায়ও ইহার ব্যতিক্রম হইলে, আবার বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে, এই অখণ্ডত্ব পুনরায় প্রমাণিত হয়। পরিদর্শন এবং পর্য্যবেক্ষণের * ফলেই, নিয়ম ও তাহার অখণ্ডত্বে দৃঢ় জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এই জ্ঞান, কেবল মানুষের স্বোপার্জ্জিত নয়। মনুষ্যের আদি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ পরম্পরা হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। এই দৃশ্যমান ঘটনা রাজ্যের নিয়ম প্রণালী বা অব্যর্থ শৃঙ্খলাই আমার আবাস ক্ষেত্র। এতৎ সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞানই আমার দেহ। এই জন্যই আমার নাম বিজ্ঞান। অনাগত, অদৃষ্ট জগতের কথা আমি বলিতে পারি না। আগুন জ্বলিতে দেখিয়া আমি বলি, দাহ্যবস্তুতে উপযুক্ত উত্তাপ উৎপন্ন হইয়াছে, এই উত্তাপোৎপাদনের মূলে কোন মানুষের কার্য্য বা তৎসদৃশ কোন ঘটনা নিহিত আছে। উদ্জানযুক্ত অঙ্গারে, উপযুক্ত উত্তাপের উৎপত্তি হইলে ভূ-বায়ুর অম্লজান সংযোগে তাহা জ্বলিতে থাকে। অতএব এই দাহন কার্য্যের অভ্যন্তরে দৃশ্যমান ও ভৌতিক নামে দুইটী কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পর্য্যবেক্ষণ বলে আমি ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিতে প্রস্তুত নই। উত্তপ্ত অঙ্গারের সহিত অম্লজানের এবম্বিধ নিগূঢ় সম্বন্ধের মূল কারণ কি, তাহা আমার দৃষ্টির অতীত। ইথার পর্য্যন্ত আমি জানি, ইথারের পশ্চাতে কি, আমি জানিনা। প্রোটোপ্লাজমের কথা বলি, প্রোটোপ্লাজম, প্রোটোপ্লাজম কেন, বলিতে পারি না। নিগূঢ়তত্ত্বের রাজ্য, আমার রাজ্য নয়। কিসের বলে আমি দাঁড়াইয়া আছি, আমি

* প্রাকৃতিক সংস্থানানুসারে যাহার এক দিক্ বা চতুর্দ্দিক দেখিতে পাই, তৎসম্বন্ধীয় দৃষ্টিকে পরিদর্শন বলা যায়। আর যে বস্তুটীকে ইচ্ছা মত নানা অবস্থায় সংস্থাপিত করিয়া পরীক্ষা করিতে পারি, তৎসম্বন্ধীয় দৃষ্টিকে পর্য্যবেক্ষণ বলা যাইতে পারে।

জানি না। এই জন্য বলি, আমার পা নাই।

পুরুষ পরম্পরাগত সংস্কারের ফলই বল, আর স্বোপার্জ্জিত জ্ঞানই বল, নিয়মের অখণ্ডত্বে নির্ভর অতিসত্য ঘটনা। আমি বর্ত্তমানদর্শী মানুষের ক্রীড়া পুত্তল। মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার শক্তির সীমা বর্ত্তমান। বর্ত্তমানের সম্মুখের দিক মনুষ্য এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। এখন যাহা ঘটিল, বা ঘটিতেছে, ইহাঠিক। পরমুহূর্ত্তে কি হইবে, মানবের জ্ঞান, বুদ্ধি বিচার শক্তি সে বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ মত দিতে অসমর্থ। আজ সূর্য্য উঠিয়াছে, কাল না উঠিতেও পারে। আজ এই গৃহ দণ্ডায়মান থাকিয়া আশ্রয় দিতেছে, কাল ইট, চুন,কাঠের এসম্বন্ধ ঘুচিয়াও যাইতে পারে। অথচ মানুষের কার্য্য বিশ্বাসপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহের লেসও নাই। মানুষ অর্ণবপোতে, বাষ্পীয় শকটে চড়িতেছে, বিশ্বাসের বলে। পরদিনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, বিশ্বাসের বলে। গৃহের তলে আশ্রয় নিয়া আছে, বিশ্বাসের বলে। আঁধার হইতে আলোকের উৎপত্তি হয় না, সন্দেহ হইতে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না। জ্ঞান,বুদ্ধি বিচারশক্তি বিসর্জ্জনদিয়া বলিতে পার, এবিশ্বাসের মূল, সংস্কার। সংস্কারের মূলে জ্ঞানের প্রয়োজন। মিথ্যাজ্ঞান হইতে, মিথ্যা সংস্কার হয়, সত্যজ্ঞান হইতে, সত্য সংস্কার উৎপন্ন হয়। অসত্যের ফল অসত্য, সত্যের ফল সত্য। বিশ্বব্যাপী নিয়মের অখণ্ডত্বে নির্ভর সত্য—জলন্ত সত্য-প্রত্যক্ষ সত্য। আমি সত্যজ্ঞান, আমি, ইহাকে সত্য না বলিলে আমার অস্তিত্ব থাকে না। আমার দেহ এই জগদ্ব্যাপী নিয়মের অব্যর্থতা। উহাই আমার চক্ষু, উহাই আমার প্রাণ। আমি যে কিছু অদ্ভুত কাজ করিয়াছি,উহারই সাহায্যে। জল আগুনের কুটম্বিতা, অলঙ্ঘ্য, অচ্ছেদ্য জানি বলিয়া, বাষ্পযন্ত্রের অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। এইরূপে অন্য সমস্ত আবিষ্ক্রিয়াতেও কৃতকার্য্য হইয়াছি। অতএব ব্রহ্মাণ্ডগত নিয়মের অব্যর্থতায় নির্ভর, যে সংস্কার হইতে উৎপন্ন, তাহা সত্য। সেই সত্য সংস্কারের মূলে,—আদিতে, সত্য জ্ঞান চাই। যা তাই আমার মনে একটা সংস্কার আছে, আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী প্রকৃতি, তাহার দাস হইয়া খাটিতেছে, ইহা উন্মত্তও ভাবিতে লজ্জিত হয়। আবার সত্য জ্ঞান, কোন সত্যকে অবলম্বন না করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। বাহ্যজ্ঞান, নিরপেক্ষ নয়, সাপেক্ষ। বিষয় নাই, জ্ঞান আছে, ইহা ভাবিতেও পারা যায় না। এই সত্যজ্ঞান—প্রাকৃতিক নিয়মে নির্ভরের মূলে যে সত্যসংস্কার কল্পনা করিতে ছিলাম, তাহার ভিত্তি ভূমিস্বরূপ সত্যজ্ঞান, কোন্ সত্যকে ধরিয়া, নিজের স্থানে দণ্ডায়মান, তাহাও আমার শক্তির অতীত রাজ্যের। এই হেতুই বলিয়াছি, "আমার হাত নাই। হাত নাই, পা নাই, আমি সুধু দেহ, আমি এই জানি।" বিজ্ঞান সহজে যাহা স্বীকার করে, যুক্তি তর্কে ঠেকিয়া যাহা স্বীকার করে, তাহা এই। বিজ্ঞান, এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নীরব।

বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া, অলঙ্কারের ভাষা ত্যাগ করিয়া, বিকাশের যথার্থ তত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। বিকাশ কথাটীর প্রকৃত অর্থ, যাহা অগোচরে ছিল, তাহা গোচরীভূত হইল—যাহা ইন্দ্রিয় রাজ্যের অতীত ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়ের নিকট হাসিল। অগোচরের বস্তু, গোচরীভূত হইতে সর্ব্বদাই একটী ক্রম অবলম্বন করে। অন্ধকার হইতে, ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে দ্রব্য সকল আলোকে আসে—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহা-

হাসি ফুটিতে, ফুটিতে অল্পে অল্পে ফুটিয়াছে, হাসি এখনও শেষ হয় নাই—অন্ধকারের গর্ভ এখনও খালি হয় নাই। এই কথার অভ্যন্তরে একটী গভীর সত্য আছে, ধীরে ধীরে যাহা আলোকে আসিল, একদিন তাহা আন্ধারে ছিল। আন্ধারে ছিল, আন্ধার শূন্যময় ছিল না। অন্ধকার আমাদের প্রত্যক্ষ রাজ্যের অতীত—জ্ঞান রাজ্যের অতীত স্থান। বিজ্ঞান, ক্রমবিকাশ বা বিবর্ত্তবাদ প্রচার করিতে গিয়া, জগতে এই মহাসত্য প্রচার করিয়াছে, "এ সৃষ্টির যত সূক্ষ্ম মূল অনুসন্ধান করি না কেন, তাহার পশ্চাতে শূন্য বলিতে পারি না। আবার শূন্যের স্থানে কি অবস্থিত তাহাও জানি না। আদিকারণ অজ্ঞাত।" এ অজ্ঞানের অর্থ, নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার নয়। তবে নিরবচ্ছিন্ন দীপ্তিও নয়। ক্রমবিকাশ, বিশ্বমূলে একমাত্র সর্ব্বব্যাপিনী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, সেই মহাশক্তির গুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া (৩) বলিতেছে, "আদিকরণ সম্বন্ধে যে অনভিজ্ঞতা, তাহা নিরবচ্ছিন্ন তমোময় নয়।" কিছুদিন হইল, একজন চিন্তাশীল বক্তা, কলিকাতা মহানগরীতে, শত শত লোকের সম্মুখে, বিশদ যুক্তি বলে প্রমাণ করিয়াছেন, "আদি কারণকে জানিনা এবং তিনি অনন্ত" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে "কিছু কিছু জানি" বলা হয়।" (৪) বস্তুতঃ "যে বলে তাঁহাকে জানি," সেও সত্যকথা বলে না। "যে বলে জানি না," সেও সত্য কথা বলে না। যাহা হউক, এই মহাবিকাশের মূল যে পর্য্যবেক্ষণাদি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অতীত, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও ভুল নাই। বিজ্ঞান, বিকাশের যে সকল মূল বীজ কল্পনা করে, তৎসমুদয় যে বস্তুতঃ বীজ নয়, জড়বিজ্ঞানের হস্ত যে মূল তত্ত্বরাজ্যে অতি খর্ব্ব, এতক্ষণ সংক্ষেপে যাহা যাহা বলিলাম, ইহাই স্থূলভাবে সে সকলের প্রতিপাদ্য। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে, এ সকল গুরুতর সত্যের সামান্য আভাস ভিন্ন, পূর্ণ জ্ঞান প্রদানের আশা, নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক।

এখন জিজ্ঞাস্য, তবে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ মহাবিকাশের মূল বীজ কোথায় এবং কি? জড় বিজ্ঞান, গুণ এবং গুণাধারের যোগকেই বিকাশের শেষ অবস্থা বা চরমফল মনে করে। গতি এবং জড়ত্বের সংগ্রাম, জড়বাদের মূল প্রতিপাদ্য। জড়ত্ব, জড়ের ক্রিয়া। জড়, গুণের আধার। গুণ, গতির ফল। জড়বাদীর এই মূল মন্ত্র।

গুণ, গতির ক্রিয়া মাত্র, ইহা সহজেই বুঝা যায়। আলোক বিকিরণ বা রূপ বৈচিত্র্যই জগতের মধ্যে প্রধান গুণ। বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিশেষ বিশেষ সঞ্চালনী শক্তি প্রভাবে, কিরণতরঙ্গ দর্শনেন্দ্রিয়ের সম্মুখস্থ হয় বলিয়া বিবিধ রূপের বিকাশ হয়। সৌরভও ঐ রূপ গতির ফল। কোমলত্ব এবং কাঠিন্য, উষ্ণত্ব এবং শৈত্য প্রভৃতি স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের প্রাণও যে বস্তু সমূহের আভ্যন্তরিক গতি বিশেষের প্রভাব, তাহা বলিয়া বুঝাইতে হয় না। শব্দে গতির চিরনিবাস। বায়ু মধ্যে গতি আছে বলিয়া অধিকাংশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি গুণ, স্পর্শজ্ঞান বা

(৩) স্পেন্সরের "First Principle" দেখ।

(৪) ১৮০৫ শকের ১৬ই ফাল্গুন ও ১লা মাঘের তত্ত্বকৌমুদীতে চতুপঞ্চাশত্তমমাঘোৎসবোপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা দেখুন।

রূপের আপেক্ষিক ফল। এই গতিপ্রাণ গুণই বিশ্বের বাহ্য বিকাশ।

গুণ বুঝিলাম; গুণের আধার কি? কোন বিষয়ের জ্ঞানের জন্য দুইটী উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। বিষয়টীকে প্রত্যক্ষ করিয়া পরীক্ষা পূর্ব্বক যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহার নাম সাক্ষাৎ জ্ঞান। পর্য্যবেক্ষণের দোষে এ জ্ঞানেও ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু সেরূপ ভুল কদাচিৎ ঘটে এবং ঘটিলেও বিশুদ্ধতর পরীক্ষা দ্বারা সহজে অপনীত হইতে পারে। প্রত্যক্ষীভূত প্রমাণিত সত্য হইতে তজ্জাতীয় সত্যের অনুমানলব্ধ জ্ঞান হইতে পারে। এবিধ জ্ঞানই, পরোক্ষ জ্ঞান। পরোক্ষ জ্ঞানে ভুলের সম্ভবনা অধিক। এতদ্ভিন্ন মানব অন্তরে বিষয় বিশেষে সহজে কোন কোন জ্ঞান-স্ফূর্ত্তি হইতে পারে। একদল পণ্ডিত এই জ্ঞানকে সংস্কারলব্ধ বলিয়া থাকেন। বিশ্বব্যাপী নিয়ম শৃঙ্খলার অব্যর্থতা বা অখণ্ডত্ব, এই প্রকার জ্ঞানের ফল। আমরা দেখাইয়াছি, সত্যসংস্কারের মূলে সত্যজ্ঞানের প্রয়োজন। সুতরাং মানুষে কোন অবস্থায় সহজ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই সহজজ্ঞান, উষার প্রাক্কালীন আলোকের ন্যায়, অতি অস্পষ্ট ভাবে মানবের অন্তস্তলে লুক্কায়িত থাকে। ধর্ম্মবিশ্বাসী ইহাকে মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বরের জ্যোতির ছায়া, অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্কুর বলিয়া থাকেন; কিন্তু জগদ্ব্যাপী প্রকৃতির কার্য্য যখন মানুষের অন্তর্নিহিত এই জ্ঞানের অনুবর্ত্তন করিতে থাকে, তখন মানব হৃদয়াকাশে, দৃঢ়বিশ্বাস রূপ মধ্যাহ্ন তপন, ধীরে ধীরে আপনার স্থান গ্রহন করিতে থাকে, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়া পড়ে। আজ ব্রহ্মাণ্ড একত্র হইয়া যদি বলে ' প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাস করিও না। প্রকৃতি, জল ও আগুনকে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে বন্ধন করিয়া, বাষ্পীয় যন্ত্র রূপ যে সুসন্তান জন্মাইয়াছেন, আজ প্রমাণ হইয়াছে, সে বিবাহ অসিদ্ধ।" ইত্যাদি২। এ কথায় বিশ্বাসীর এক গাছি ক্ষুদ্র কেশও টলিবে না। বিশ্বাসের পবিত্র শিশু কোপার্ণিকশ যদি আজ জগতে থাকিতেন, আজও তিনি, ধূলীর প্রাণাশা ধূলিতে নিক্ষেপ করিয়া, ধরাবক্ষে পদাঘাত পূর্ব্বক বলিতেন, "এখনও পৃথিবী ঘুরিতেছে।" সৌরজগতের প্রধান গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে অষ্টম স্থানীয় গ্রহ আবিষ্কারের পরে, সপ্তম গ্রহের (৫) অস্তিত্ব সম্বন্ধে যিনি বিশ্বাসের জলদ গম্ভীর স্বর তুলিয়া বিশ্বভুবন কম্পিত করিয়া ছিলেন, তাঁহার সে কণ্ঠ কি অনন্ত চেষ্টায় অনন্তকালেও, শূন্যময় অবিশ্বাসের আকাশে মিলাইতে পারে? কিন্তু এই জ্বলন্ত বিশ্বাস, বাহ্যজ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে মূলতঃ উৎপন্ন না হইলেও, তৎসাহায্যে ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, বিকাশ প্রাপ্ত।

এখন দেখা যাউক, জড় বা গুণাধার কোন্ প্রকার জ্ঞানলব্ধ সত্য। জড় নিজে প্রত্যক্ষের অতীত, তাহার গুণ মাত্র প্রত্যক্ষীভূত, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। জড়পদার্থ বিদ্যার মূল ও প্রথম সূত্র এই। গুণাধার পরোক্ষ জ্ঞানেরও বিষয় নয়। তজ্জাতীয় প্রত্যক্ষ সত্য এ জগতে নাই। আমাদের ঐন্দ্রিয় জ্ঞানের রাজ্যে গুণ ভিন্ন গুণাধারের পূর্ণাভাব। গুণ জড়ের বিরোধী সত্য। গুণ প্রত্যক্ষীভূত হয়, জড় প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাহা প্রত্যক্ষের

---

(৫) ইয়ুরেনাস গ্রহের আবিষ্কারের পরে নেপ্চুন আবিষ্কৃত হয়।

অতীত। গুণ গতির ফল, জড় গতির বিরোধী। জড়ত্বই গতির নিয়ামক বা বাধা। জড়ের অস্তিত্ব কেবল মনুষ্যের সংস্কারের উপরে স্থাপিত। কিন্তু এজগতে কোন প্রাকৃতিক ঘটনা এ সংস্কারের অনুবর্ত্তন করিতেছে, বলা যায় না। বরং জড়-বিরোধী গুণ এবং গতির কার্য্যই প্রকৃতির রাজ্যে প্রবল। এখন একমাত্র জড়ত্বই জড়ের অস্তিত্বের জন্য দায়ী। বোধ হয়, জগতে, জড়ত্ব দেখিয়াই মানুষের প্রাণে, জড়ের সংস্কার প্রস্তরাঙ্কনের ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে।

এখন বিচার্য্য, এই জড়ত্ব কি? গতির রাজ্যে বাধা আছে। বাধাময় গতি হইতে এই বিশ্বের বিকাশ। উচ্ছৃঙ্খল, নিরঙ্কুশ গতির ফল কি, আমরা তাহা মনে ধারণাও করিতে পারি না। নিরঙ্কুশ গতির নাম স্মরণ মাত্র আমরা কেবল ধ্বংস, কেবল প্রলয়, কেবল মৃত্যুর অন্ধকার স্বপ্ন দেখিতে থাকি। ভয়ে আমাদের প্রাণের ভিত্তিমূল কাঁপিয়া উঠে। যে দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি, গতির জগৎ বাধা শূন্য নয়। এই বাধা কি? আমরা বলি, গতির বাধা গতি। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে গতি-বিবর্জ্জিত বস্তু, ব্রহ্মাণ্ডের কোথায়ও নাই। আপাত দৃষ্টিতে যাহারা স্থির পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, বস্তুতঃ তাহাদেরও প্রতি অণু গতিশীল, অণুসমষ্টি গতিশীল। এই গতির বলে দৃশ্যমান স্থির বস্তু সকল, নিজ নিজ ভূমিতে, আঘাত করিতেছে। সকলেরই যেন ইচ্ছা, ভূমি ভেদ করিয়া অনন্ত শূন্যে ছুটিয়া পলায়ন করে। কিন্তু যে গতি তাহাকে বান্ধিয়া একটী বড় বস্তু করিয়াছে, সেই আণবগতি ভূমিকে ও বান্ধিয়া, তদপেক্ষা বৃহত্তর বস্তু করিয়াছে। বস্তু ভূমিতে আঘাত মাত্র, ভূমি সেই গতি বলে প্রসারিত হইয়া প্রতিঘাত করে। ভূমির প্রতিঘাত-গতিই বস্তুর গতির বাধা। বস্তুর সমষ্টিগত গতি, ভূমির মাধ্যাকর্ষণের ফলই হউক, বা পশ্চাদ্বর্ত্তী ইথার স্রোতের অনবরত প্রতিঘাতই (৬) হউক, কিছুতেই পূর্ব্বসিদ্ধান্তে দোষ স্পর্শ হইতেছে না। নূতন গতি প্রযোজিত হইয়াও যে আবার বস্তুর গতির নিবৃত্তি হয়, তাহা কেবল বস্তুর পূর্ব্বগতির এবং অন্যান্য বহির্গতির বাধা প্রযুক্ত। অতএব বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে গতিবিবর্জ্জিত বস্তুর অস্তিত্বাভাব, এখন এ মীমাংসায় উপস্থিত হইতে বাধা দেখিতেছি না। তবে একটী কথা, জড়ত্ব গতিহীনত্ব নয়, চেষ্টার অভাব। জড় বস্তু সকল, চেতন পদার্থের ন্যায়, ইচ্ছামত গতি পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। চেষ্টার বৈজ্ঞানিক অর্থ, বহিঃশক্তির সহিত ইচ্ছা বা মানসিক শক্তির সংগ্রাম। বহির্জগতে এই সংগ্রাম নাই। কেবল অন্তর্জগতেই এই চেষ্টার আভাস পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা-যাইতেছে, বহিঃসৃষ্টির অভ্যন্তরে একমাত্র শক্তি অন্তর্নিহিত থাকিয়া কার্য্য করিতেছে, এ রাজ্যে দ্বিতীয় শক্তির প্রভাব নাই। বস্তুমাত্রের মধ্যেই এক অদ্বিতীয় শক্তির কার্য্য ভিন্ন শক্ত্যন্তরের বিদ্যমানতা অসম্ভবপর বলিয়াই প্রতিবস্তুই নিশ্চেষ্ট। এই নিশ্চেষ্টতা গতির বিরতি নয়, শক্তির—একমাত্র শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবের ফল। গতিও শক্তির ফল। শক্তির বিকাশই গতি।

৬। কাহারও কাহারও মতে জড়বস্তুর আভ্যন্তরিক কোনরূপ ক্রিয়া বশতঃ ইথার স্রোত সর্ব্বদা আভ্যন্তরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। জড়ীয় আকর্ষণ তাহারই ফল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, গতিই, রূপ, রস, গন্ধাদিগুণের প্রাণ—গতিই বাহ্য বিকাশের মূল যন্ত্র। গতি শক্তির বিকাশ। অতএব শক্তিই মূলাধার। বিকাশ, শক্তি সাগরের বুদ্ বুদ্ মাত্র। শক্তির বক্ষে শক্তি ফুটিয়া, ঘন হইতে ঘনতম হইয়া, এই রূপাদি গুণময় বিচিত্র বিশ্ব বিকাশে পরিণত হইয়াছে। বিকাশ শক্তির আপেক্ষিক পরিণতি। গুণ ভিন্ন গুণাধার, শক্তি ভিন্ন শক্ত্যাধার, এ ব্রহ্মাণ্ড বিকাশের—রূপ রস গন্ধাদির মূলাধার নাই। জড়ের সংস্কার ভ্রান্তিমূলক। এ সংস্কারের নিম্নে সত্যজ্ঞানের অভাব।

আর এক দিক্ দিয়াও একথাটীর বিচার করা যাইতে পারে। বস্তুকে বিভাগ করিতে করিতে শেষে কোথায় উপস্থিত হওয়া যায়? জড় বিজ্ঞান, ভূত-পরমাণু বা ইথার (৭) পর্য্যন্ত গিয়াই নীরব। পরমাণু, বাস্তব পক্ষে বস্তুর আনুমানিক সূক্ষ্মতম সীমা মাত্র। নতুবা, যত কেন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম দ্রব্য হউক্ না, দ্রব্যের দ্রব্যত্ব স্বীকার করা পর্য্যন্ত তাহাকে বিভাগানর্হ ভাবা যাইতে পারে না। অবস্থিতি থাকিলেই বিস্তৃতি আছে। বিস্তৃতি বিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বিভাজনীয়। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই, কেবল বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনার সুবিধারজন্য, নির্দ্দিষ্টায়তন, বিশেষ বিধি আকৃতি ও গতি বিশিষ্ট ভূত পরমাণুর কল্পনার প্রয়োজন বোধ করেন। কেহ২, ইথার নামক সূক্ষ্ম পদার্থের সূক্ষ্মতম তরঙ্গ বা আবর্ত্তনকেই জড় পরমাণু বলিয়া থাকেন। যাহা হউক্, পরমাণু বস্তুর কাল্পনিক সূক্ষ্মতম সীমামাত্র। এই খানেই জড়পদার্থের শেষ পরিণতি নয়। ঐ কারণেই এক একটী ইথারাণুকেও বস্তুর শেষ সীমা বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ, অবস্তু ভিন্ন বস্তুতে, দ্রব্যের শেষ পরিণতি বিষয়ক চিন্তার বিরাম হয় না। বস্তু চিন্তার শেষ পরিণামে বস্তু চলিয়া যায়, কিন্তু শক্তির বিরাম হয় না। বস্তু অবস্তু হইয়া ক্রমে শক্তির রাজ্যে গিয়া পড়ে। ইথারাণু অপেক্ষাও যদি সূক্ষ্ম দ্রব্য কল্পনা করিতে পার, কর, কিন্তু দেখিবে তাহারও পশ্চাতে শক্তি। বস্তু যত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম হইয়া মিলাইতে থাকিবে, শক্তি যেন ততই ঘনীভূত হইয়া দেখা দিতে থাকে। বস্তুর পরিণাম যেমন বস্তু চিন্তায় শেষ হয় না, আকাশ চিন্তাতেও তাহার অবসান হইতে পারে না। কিছু না হইতে কিছু হইল, এ ধারণা উন্মত্ত ব্যক্তিতেও সম্ভবপর হয় না। তবে, বস্তু নয় অথচ আকাশ নয়, কিন্তু বস্তুর প্রাণ ও পরিচালক, বস্তুর অবস্থিতি ও বিকাশের কারণ, দ্রব্য মাত্রের সহিত অতি ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, এমন কি অবস্তু পদার্থ আমাদের চক্ষু এবং মনের নিকটে সর্ব্বদাই হাসিতেছে? এক মাত্র শক্তি, একথার অব্যর্থ উত্তর। আর দ্বিতীয় কিছুই এই স্থান পূর্ণ করিবার জন্য, আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদির সম্মুখে নাই। অতএব, সকলে গম্ভীরস্বরে বল, "এজগৎ—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শক্তিময়, এ সৃষ্টি শক্তিময়। "শক্তির বক্ষে শক্তি ফুটিয়া, ঘন হইতে ঘনতর, ঘনতম হইয়া, এইরূপাদি গুণময় বিচিত্র বিশ্ব বিকাশে পরিণত হইয়াছে।" এজগতে শক্তি ভিন্ন কিছুই নাই। ভিতরে সাক্ষাৎ জ্বলন্ত শক্তি, বাহিরে বিকাশ-

---

৭। পণ্ডিতেরা প্রচলিত পঞ্চষষ্টি প্রকার ভৌতিক পদার্থ হইতে আলোক বিশ্লেষণাদি দ্বারা অনুমান করেন, একমাত্র সূক্ষ্মতম মূল পদার্থ হইতে এই ভূতময় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। সেই একমাত্র সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থের নামই ইথার।

মান শক্তি। প্রভাতের বাগানে ঐফুল ফোটে, ও ফুল না, শক্তি ফোটে। নীল আকাশে চন্দ্র, তারা, সূর্য্য উঠে ও চন্দ্র, তারা, সূর্য্য নয়, শক্তি উঠে। নদীর বুকে জলের স্রোত, জলেরতরঙ্গ ছুটে, অজ্ঞানেরা বলে ও স্রোত, ও তরঙ্গ,জ্ঞানী বিশ্বাসী ভক্তিমান্‌পুরুষ বলেন, "না—না—ও যে শক্তি—ও তরঙ্গায়িত শক্তি, প্রবহমান শক্তি ধারা।" পর্ব্বতে, সাগরে, উদ্যানে, কাননে, জীবনস্রোতে, সচেতন রাজ্যে, সর্ব্বত্রই শক্তির রঙ্গক্ষেত্র—শক্তির মহাবিকাশ। এস্থলে আর একটী দিক্ দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, বিকাশের মূল একমাত্র শক্তি, এ কথাটী আরও পরিষ্কৃত হইবে। বস্তুর বিভাগ ক্রিয়ার অভ্যন্তরে কি দেখিতে পাই? দেখি, শক্তির বিশ্লেষণ। বস্তু, যতক্ষণ বস্তুত্বশালী, ততক্ষণই তাহাতে শক্তির সংযোগ গাঢ়তর। তখনও তাহা হইতে আরও শক্তির বিশ্লেষণ হইতে পারে, স্বীকার করিতে হইবে। তবেই বলিতে বাধ্য হইতেছি, সূক্ষ্মতম অবস্তুক বা নিরাকার শক্তির গাঢ়তাই বস্তু। গাঢ়তম শক্তিই বিকাশ। শক্তির মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে, শক্তির গাঢ়তা সহজ-বোধ্য হইবে।

এই শক্তি কি? শক্তি ইচ্ছা—ঘনীভূত ইচ্ছার প্রবাহ (৮)। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিরঙ্কুশ গতি সৃষ্টি বিরোধী। জগতের মূলে, প্রতিনিয়ত যে গতির কার্য্য দেখিতে পাই, তাহা উচ্ছৃঙ্খল নয়, কিন্তু নিয়মিত। এ কথার প্রকৃত অর্থ, এ বিশ্ব মধ্যে শক্তির শাসন আছে। গতি, শক্তিরই বিকাশ। শক্তি, ইচ্ছা বই আর কিছুই না। এ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ এবং দেহ, ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা নিয়মিত, শাসিত। ইচ্ছার শাসন আছে বলিয়াই বৈচিত্র্য ফুটিয়াছে—নিয়মিত—শাসিত ইচ্ছাই ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণে, সৃষ্টির দেহে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল, নিরঙ্কুশ ইচ্ছার কার্য্য মহা প্রলয়। তাহা কেবল সৃষ্টির গায়ে, অন্ধকার ঢালিয়া দেয়, জীবনসুধা সাগরে মৃত্যুর গরলময় তরঙ্গ তোলে। ইচ্ছার শাসন না থাকিলে, এ সুন্দর বিচিত্র শোভাময় বিশ্ব সৃষ্টি আঁধার হইতে আলোকে ফুটিত না। ঊর্দ্ধে অনন্ত গগনের দিকে দৃষ্টিপাত কর, চারিদিকে অনন্ত দূরতা চাহিয়া দেখ, মুহূর্ত্তের জন্য একবার এ বিশাল বিশ্ব ভুবনের চিন্তা কর, দেখ, তাহা, যে ইচ্ছাসাগরে ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ মাত্র, সে মহাসিন্ধু কতবড়। জগতে ভাষা নাই, আর কি বলিবে? বল, "জয়——! তাহারই জয় ——! সেই মহতী ইচ্ছারই জয়! তাহা, অনধিগম্য, অপার"

এখন জিজ্ঞাস্য এই, মহা মহতী ইচ্ছার শাসক কে? উদ্দেশ্য। ইচ্ছার শাসিক উদ্দেশ্য। অভিপ্রায় ব্যতীত ইচ্ছার উদ্রেক অসম্ভবনীয়। ইচ্ছা উদ্রিক্ত হইয়াও অভিপ্রায় দ্বারাই চালিত হয়। উদ্দেশ্যই ইচ্ছার প্রাণ। উদ্দেশ্য হইতে ইচ্ছা উদ্ভূত হয়, উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই অবস্থিতি করে, অভিপ্রায় সাধন হইলে আবার অদৃশ্য হয়। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই আপনার প্রাণ, মন, পরীক্ষা করিয়া এই কথা বলেন। জগদ্ব্যাপী ইচ্ছার শাসন মধ্যে কি দেখিতে পাই? উদ্দেশ্য—গূঢ় অভিপ্রায়। বিশ্বব্যাপ্ত নিয়ম শৃঙ্খলা বিশেষ উদ্দেশ্যের ফল—উদ্দেশ্যের বিকাশক। এই নিয়মেই শক্তির শাসন। গূঢ় অভিপ্রায়ের আদেশেই ইচ্ছা, বিশ্বকর্ম্মা হইয়া বিবিধ

---

(৮) বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্চম সংখ্যক নব্যভারতে "মহাশক্তি" শির্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

বিচিত্র শোভাধার বস্তু দ্বারা, এ ব্রহ্মাণ্ড দেহ সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রতি বস্তু, প্রতি ব্যক্তি, প্রতি জীবজন্তু, নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করিতে এ ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছে। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া, ধীরে ধীরে অনন্তের পথে, সকলেই হাটিতেছে (৯)। বিশেষ বিশেষ অভিপ্রায় সাধনের জন্য, বিশেষ২ সৃষ্টির প্রয়োজন। এই জন্যই দেখি, বিশেষ ব্যতীত সৃষ্টি নাই। বিশেষত্বের অভাবে সৃষ্টি হইতেপারে না। যে সকল বস্তু আপাত দৃষ্টিতে তুল্যরূপ বলিয়া প্রতীত হয়, বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যেও নিগূঢ় রূপে কোন না বিষয়ে বিশেষত্ব আছে—তাহারা প্রত্যেকেই বিশেষ অভিপ্রায় সাধনের জন্য জগতে আবির্ভূত। নতুবা তদ্রূপ সৃষ্টির বহুত্ব নিষ্প্রয়োজন, তাহার একটী থাকিলেই হয়। সৃষ্টিমূলে এইরূপ নিগূঢ় অভিপ্রায় থাকাতেই দুইএর অবস্থা বিভিন্ন হইলেও পক্ষপাত বা অমঙ্গল হইতেছে, বলা যায় না। একের জীবনের নিগূঢ় উদ্দেশ্যের সহিত অন্যের জীবনের গূঢ় লক্ষ্যের সম্বন্ধ নাই। এ জগতে প্রতি ব্যক্তি, প্রতিবস্তুই নিজ নিজ পথে চলিবার জন্য সৃষ্ট। সকলেরই স্ব স্ব পন্থা বিভিন্ন। অথচ এক ইচ্ছাই সকলকে এক সূত্রে একত্র বান্ধিয়া রখিয়াছে। এই জন্য, সাম্যে বৈষম্য মিশিয়া অপূর্ব্ব বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে। আবার ইচ্ছার পশ্চাতে অভিপ্রায় আছে বলিয়াই, বিশ্বের প্রতিবস্তু, প্রতিবস্তুর সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধে বান্ধা। চক্ষুর সহিত সূর্য্য, সূর্য্যের সহিত চক্ষু বাঁধা। বহির্জ্জগতের সহিত জরায়ুস্থ শিশু, জরায়ুস্থিত ভ্রূণের সহিত, বহির্জ্জগৎ বাঁধা। স্ত্রীর সহিত পুরুষ বাঁধা। মাতৃস্তনের সঙ্গে শিশু বাঁধা। গ্রহ নক্ষত্রের সহিত গ্রহ নক্ষত্র বাঁধা।

একদল পণ্ডিত, জগন্নিহিত এই মহদভিপ্রায়কে উড়াইয়া দিয়া, সৃষ্টিকে ঘটনা সম্মিলিত পদার্থ স্তুপমাত্র প্রমাণ করিতে চাহেন। তাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়মত্রয়ের সাহায্যে, চতুর্দ্দিকস্থ সৃষ্টি মধ্যে, নিয়ম শৃঙ্খলা দেখাইয়া, আপনাদিগকে পরিতৃপ্ত মনে করেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের স্বকীয় যুক্তির গর্ভেই তাঁহাদের ভ্রম দেখিতে পাই।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অভ্যন্তরে, সুগভীর উদ্দেশ্য নিহিত। ক্ষেত্রে যত বীজ বিক্ষিপ্ত হয়, তত গজায় না, যত অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তত বাঁচেনা। মানুষ এবং পশু পক্ষীরও কতকগুলি সন্তান নিয়মিত প্রসব কালের মধ্যেই নানা ঘটনার বিনষ্ট হয়, কতকগুলি জন্ম মাত্র মরিয়া যায়, অনেকগুলি কিছু দিন জীবিত থাকিয়া, আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইতে না হইতেই, রোগাদি নানাবিধ স্বাভাবিক দুর্ঘটনা বশতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন যাহারা অবশিষ্ট থাকে, জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, যে তন্মধ্য হইতে প্রতি যোগীকে পরাজয় করিতে কিম্বা তাহার সহিত সমকক্ষতায় স্থির থাকিতে পারে, সেই সুখে জীবন যাপনের অধিকারী হয়। ইহা সম্পূর্ণ রূপে প্রাকৃতিক নিয়মের ফল। এই স্বাভাবিক নিয়মের নাম, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (১০)।

৯। বর্ত্তমান বর্ষের তৃতীয় সংখ্যক নব্যভারতে, "অগ্নিময়জ্বলন্ত পুরুষ নামক প্রবন্ধে, বস্তুমাত্রেরই অনন্ত উন্নতির কথা বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধ দেখুন।

(১০) "Natural Selection এবং Survival of the Fittest"

এই উভয়কে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলা হইল। বস্তুতঃ এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

সকলেই স্বীকার করেন, এ জগতে যত জন্মায়, তত রক্ষা পাইলে ভয়ঙ্কর অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিত। এই অমঙ্গলের প্রতিবিধান জন্যই সংসারে মৃত্যুর সৃষ্টি। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর বিধান থাকাতেই, সর্ব্বদা নূতন নূতন দ্রব্যে জগৎ সজ্জিত হইতেছে। একটী পুরাতন দল সরিয়া গিয়া, আর এক নূতনতর দলকে আপনাদের স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। এই নিয়ম থাকাতেই সৃষ্টির এত গৌরব, এত মহত্ব, এত বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য। আবার এ জগতে যেমন পথের ধূলিকণার প্রয়োজন, তেমনই পর্ব্বতের প্রয়োজন। যেমন শতবর্ষ-জীবী বর্ষিয়ান ব্যক্তির প্রয়োজন, তেমনই গর্ভস্থ অস্ফুটাঙ্গ ভ্রূণেরও প্রয়োজন। গর্ভে যে মরিল, তাহার জীবন দ্বারাও মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইল, শতবর্ষ জীবিত থাকিয়া যে মরিল, তাহার জীবন দ্বারাও মহৎ কার্য্য সিদ্ধ হইল। প্রতি জীবনেরই মূল্য সমান, কেবল দেখিতে ভিন্ন, ভাবিতে ভিন্ন। কেহ এক মুহূর্ত্ত বাঁচিয়া থাকিয়া স্বকীয় জীবনের উদ্দেশ্য পালন করিতেছে, কেহ শত কিম্বা সার্দ্ধ শত বৎসর জীবিত থাকিয়াও জীবনের লক্ষ্য পথেই হাটিতেছে। প্রতি জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন, কার্য্য ভিন্ন, সময় অভিন্ন হইবে কেন? আবার বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হয়, সকলেই অনন্ত উন্নতির দিকে ধাবিত। যে মরিয়াছে, সেও অনন্তের পথের পথিক, যে বাঁচিয়া আছে, সেও অনন্তের পথের পথিক। আবার জীবন, মরণ থাকাতেই এজগতের সমষ্টিগত উন্নতির স্রোতও অনন্তের দিকে ছুটিতেছে। একটী মরিয়া আপনি মূলতঃ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াও, অপরের উন্নতি—সৃষ্টির সমগ্র উন্নতি সাধন করিতেছে। যে মরিল, সে জীবনের একস্তরের কার্য্য সমাপন করিয়া, অনন্ত উন্নতি সোপানের পরবর্ত্তী স্তরে পদক্ষেপ করিল। এখন যে মরিল, তাহার পক্ষেও যাহা, শতবর্ষ পরে যে মরিবে, তাহার পক্ষেও সেই একস্তর হইতে স্তরান্তরে পদনিক্ষেপ করাই কার্য্য, এ কথা বারম্বার বলিয়া প্রস্তাবের কলেবর বাড়াইতে চাই না। তবে যে মরিল, সে যে কেবল আপনার হারে অন্যের স্থান ও আহারের অংশ বৃদ্ধি করিল, তাহা নহে, তাহার মৃত শরীর সার রূপে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া সৃষ্টি রক্ষারও প্রচুর সাহায্য করিল। আবার জীবন রক্ষার জন্য জগতে মহাসংগ্রাম, না থাকিলে, জীবের কর্ম্মশীলতা এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মনের সুখ থাকিত না। সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন স্বয়ংই উদ্দেশ্যের—গভীর নিগূঢ় উদ্দেশ্যের ফল।

দাম্পত্য নির্ব্বাচন (১১) মধ্যেও নিগূঢ় অভিপ্রায়ের অনন্ত আভাস পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য স্পৃহা এবং সুন্দর বস্তু মনোনয়নের শক্তি মনের ধর্ম্ম না হইলে, কখনই দাম্পত্য নির্ব্বাচনের সৃষ্টি হইতে পারিত না। বাহিরের শোভা যদি ভিতরের মনকে টানিতে না জানিত, তবে কে সুন্দর বস্তুর জন্য ব্যাকুল হইত? আবার দাম্পত্য নির্ব্বাচন না থাকিলে, জগতে যে অনেক অসুন্দর, অকর্ম্মণ্য জীবের জন্ম সংসারকে ভারগ্রস্ত করিয়া রাখিত, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই কৌশল কি অতি অপূর্ব্ব নয়? এই মহা ব্যাপারের মধ্যে কি নিগূঢ়তম উদ্দেশ্য নিহিত নাই? আবার বিশ্বের অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা,

(১১) Sexual Selection কে দাম্পত্য নির্ব্বাচন বলা হইল। Survival of the Fittest একটী পৃথক প্রাকৃতিক নিয়ম নয়। এই জন্য পৃথকরূপে এতৎ সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না।

অদ্ভুত কার্য্যকলাপ, সুন্দর সম্বন্ধ বন্ধন; যখন ভাবি, তখন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া আপনিই বলিতে থাকে, এ সৃষ্টি সদভিপ্রায় হইতে উদ্ভূত না হইয়া পারে না।

এখন প্রমাণ হইল, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় শাসিত ইচ্ছাই (Will) এই বিচিত্র বিশাল বিশ্ব বিকাশের মূল যন্ত্র। উদ্দেশ্য আদি, ইচ্ছা অন্ত। উদ্দেশ্য চালক, ইচ্ছা চালিত। উদ্দেশ্য উৎপাদক, ইচ্ছা উৎপন্ন। ইচ্ছা, উদ্দেশ্য তরুর ফল, পুষ্প। ইচ্ছা উদ্দেশ্যর পরিণাম। উদ্দেশ্যের অভাবে ইচ্ছার সৃষ্টি হয় না। ইচ্ছার প্রাণ, উদ্দেশ্য। ইচ্ছা, ঘনীভূত উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়ের (Design) সঙ্গে ইচ্ছার এই সম্বন্ধ। এখন, যুক্তি সোপানের আর এক স্তরে অবরোহণ করিয়া বলিতে পারি, উদ্দেশ্যই বিশ্ববিকাশের মূল। নিগূঢ় অভিপ্রায় হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। নিগূঢ় অভিপ্রায় ইহার মূলে কার্য্য করিতেছে। প্রতিবস্তুতে নিগূঢ় লক্ষ্য সন্নিবেশিত রহিয়াছে বলিয়াই, প্রতি বস্তু বিভিন্ন, প্রত্যেক দ্রব্যের, প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের কার্য্য পৃথক্ পৃথক্। আপাত দৃষ্টিতে, সৃষ্টির মধ্যে যে ঘোর বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রতি পদার্থের এই বিশেষত্ব হেতুক। ইচ্ছা, উদ্দেশ্যানুসারিণী। উদ্দেশ্যের ভিন্নতার সঙ্গে ইচ্ছার গতিও বিভিন্ন। ইচ্ছার বিকাশই গতি। এইজন্য গতি এক হইয়াও, বিশ্বমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত। উদ্দেশ্যের বশোবর্ত্তিতায়, জগতের অভ্যন্তরে, গতিই, গতির বাধা বা শাসকরূপে কার্য্য করিতেছে। কি মানবজগৎ, কি পশুসমাজ, কি উদ্ভিদ্‌রাজ্য, কি অচেতন ব্রহ্মাণ্ড, সর্ব্বত্রই গতি গতির বাধা, শক্তি, শক্তির বাধা—ইচ্ছা, ইচ্ছার বাধা, উদ্দেশ্য সকলের উপরে—সকলের চালক। এক দিকে, সাগর তরঙ্গ ধরা গ্রাস করিতে অগ্রসর, সম্মুখে হিমাদ্রি সমান গিরিবর দণ্ডায়মান। এক দিকে দুর্দ্দান্ত নেপোলিয়নের দুর্দ্ধার পরাক্রম মানবসমাজ বিদলিত করিতে উদ্যত, সম্মুখে উত্তেজিত সমাজের উদ্দীপ্ত বলদর্পস্বরূপ ওয়েলিংটনের ভীষণ দাবদাহ তুল্য জ্বলন্ত বীরত্ব রাশি। শক্তি শক্তিকে পরাভূত করিল, নিগূঢ় উদ্দেশ্যের জয় পতাকা গগনে উড়িল। প্রতিহত তরঙ্গ হইতে মেঘমালা সাজিয়া, ধরাপৃষ্ঠে জলধারা ঢালিয়া পৃথিবীকে ধন ধান্যে পূর্ণ করিল, নেপোলিয়নের মহাপাতের পরে, শান্তিময় জগতে জন সাধারণের স্বাধীনতার সুধা নদী ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। পণ্ডিত—জ্ঞানী—বিশ্বাসী, বলিলেন, "নিগূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।"

উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় কি পদার্থ? উদ্দেশ্য, চিন্তার ফল। চিন্তার নদীতে উদ্দেশ্যের লহরী—উদ্দেশ্যের ঢেউ প্রতিনিয়ত, উঠিতেছে, পড়িতেছে। চিন্তা, চেতনা এবং ভাবুকতার ফল। চেতনা এবং ভাবুকতা দুই খানি ডাল, প্রেম কল্পতরু। প্রেমেই চিৎশক্তির চিরনিবাস। প্রেমের সহিত চেতনার চিরবিবাহ—চিরদাম্পত্য সম্বন্ধ। প্রেম আর চিৎশক্তি নিগূঢ় রাসায়নিক মিশ্রনে মিশ্রিত। প্রেম আর চেতনা একাত্মক। কবিতার কথা নয়। ভাব ত,প্রেম আর চেতনা পৃথক। প্রেম শূন্য চেতনা, অন্ধাকার, মৃত, অসার, অস্ফুট। চেতনাশূন্য প্রেম, একথা কিরূপে ভাবিতে হয়, জানি না। প্রেম আর চিৎশক্তির প্রাণ, এক। তাই প্রেমের নাম, চিদ্‌ঘন আনন্দ। চিদ্‌ঘন আনন্দ সরূপ, ব্রহ্ম। ভগবান্, চিদানন্দঘন।

আনন্দম, শিবং,"বিশ্ববীজম্। পূজনীয় আর্য্য-ঋষি শিবের ধ্যানে লিখিয়াছেন, "বিশ্বাদ্য-বিশ্ববীজম্।" "ইথার" "নেবুলা," "প্রোটো-প্লাজম", তোমরা অন্ধকারের জিনিষ অন্ধকারেই থাক, মৃত্যুর সহচর, মৃত্যুর কাছে থাক, তোমরা জড়, জড়বাদীর নিকটে থাক। "বিশ্বাদ্যবিশ্ববীজম" শিবং—আনন্দম্—চিদ্ঘনআনন্দম্—চিদানন্দঘনম্।"ইমানি ভূতানি সর্ব্বানি আনন্দাৎ জায়ন্তে, আনন্দেন সঞ্জীবন্তি, আনন্দেষু সন্তিষ্টন্তি।" আনন্দ হইতে এজগৎ—এ বিশ্বভুবন বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অবস্থিতি করিতেছে, আনন্দই ইহার জীবন—আনন্দই প্রাণ। প্রাণস্য প্রাণম্ আনন্দম্। আনন্দই সকলের পেয়, সকলের আহারীয়। আনন্দ নিশ্বাসে টানি, আনন্দ পান করি,আনন্দ ভোজন করি। দেখি আনন্দ, শুনি আনন্দ, স্পর্শ করি আনন্দ। আনন্দময়ের আনন্দ বাজার, এই মহাবিকাশ —সুন্দর বিচিত্র বিশ্ববিকাশ। প্রেমবীজে—আনন্দ বীজে, একদিন যাহা নিগূঢ়রূপে নিহিত ছিল, আজ তাহা ধীরে২, ক্রমে২, ফুটিয়া২, হাসিয়া২, অনন্তধারে আনন্দধারা ঢালিতেছে। বায়ু আনন্দধারা বহিতেছে; নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অনন্তস্বরে আনন্দের মহাগীতি গাইতেছে। এ বিকাশ, আনন্দেরই বিকাশ, প্রেমেরই বিকাশ।

কবির কবিতা মনে থাকে, মনে ফোটে, বাহিরে তাহার ছায়া পড়ে। চিত্রকারের চিত্র মনে হাসে, মনে খেলা করে, বাহিরে তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে। বিশ্ব কবি—আদি কবি—মহাকবির অভ্যন্তরে অনাদিকাল হইতে যে কবিতা, অনন্ত, জাগ্রত সত্য রূপে, সত্য অক্ষরে লেখা ছিল, এই বৈচিত্র্যময় অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কাব্য তাহারই জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া মাত্র। আমি সেই কবিতার এক পদ, তুমি সেই কবিতার একটী পদ, নদ, নদী, সিন্ধু, গিরি, বন, পত্র, পুষ্প, ফল, মেঘ, বায়ু, আলোক, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, প্রত্যেকেই এক একটী পদ। এক একটী সৌরজগৎ এক একটী কবিতা। এক একটী মানব সমাজ এক একটী কবিতা। সকল মিশিয়া, সেই মহাকবি—আদি কবির মহাকাব্য। এ মহাচিত্র, অনন্ত সত্যের বিচিত্র বর্ণে চির দিনই সেই চিদ্ঘন আনন্দ পটে, নিগূঢ়রূপে চিত্রিত ছিল, এখনও আছে, আমরা চিত্র হইয়াও সেই উজ্জ্বল ছবিরই নির্ম্মল ছায়া দেখিতেছি। আমাদের নিকট এ বিকাশ নূতন। সেই প্রেমসিন্ধুর, অপার প্রেমের নিকট, ইহা চিরপুরাতন হইয়াও চির নূতন। প্রেমের চক্ষু—আনন্দের নয়ন—ভাবের অক্ষি, চির নূতনতাময়। বট বীজে যেমন বট বৃক্ষ, পুষ্প বৃক্ষের গর্ভে যেমন পুষ্পনিগূঢ়রূপে নিহিত আছে, এ বিশ্ব সেই আনন্দঘনের আনন্দ গর্ভে নিহিত ছিল, নিহিত আছে, সেই প্রেম হইতেই ধীরে২, ক্রমে২, সুন্দররূপে ফুটিয়া বিকাশ নাম ধারণ করিয়াছে। "বিকাশ" ইহাই।

তবে বল ত "বিকাশ" এ জগতে কি বিকাশ করিল? জীবন আর মৃত্যু? ঘনীভূত জীবন—ঘনীভূত প্রাণ। মোহ আর চেতনা? ঘনচিৎশক্তি—চিশুদ্ধ চৈতন্য। আলোক আর আঁধার? উজ্জ্বল আলোক—নির্ম্মল দীপ্তি—বিশ্বব্যাপী—জগদ্ব্যাপী, অনাদ্যন্ত, চির প্রভারাশি। আর কি ফুটাইল? নরকে, স্বর্গ। মর্ত্ত্যে নন্দন। গরলে, সুধা। চিদানন্দ ঘনময় এসংসার, আর কিছু নাই—আর কিছু নাই, বিকাশ আজ জগতের সম্মুখে দাঁড়া-

ইয়া, জলদ গম্ভীর স্বরে, এই মহামন্ত্র—মহাগীত গাইবার জন্য আবির্ভূত। অদ্বৈতবাদ একদিন এই আর্য্যভূমে দাঁড়াইয়া গাইয়াছে, "চিৎ আর মোহ"; বিকাশ গাইল কেবল চিৎশক্তি, কেবল প্রাণ, কেবল ঘনীভূত আনন্দ। মায়া-বায়ুর আঘাতে এবিশ্ব তরঙ্গ উঠিয়াছে, ঝটিকাবসানে আবার সাগরে মিলাইবে, বিকাশ এনিদারুণ কথা বলে না। প্রেম সাগর চির তরঙ্গময়। অনাদি কালে যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, অনন্ত কাল ব্যাপিয়া ফুটিবে. কোন দিনই এ বিকাশ শেষ হইবে না, কখনই মিলাইবে না। অথচ প্রেমের তরঙ্গ প্রেমই, আনন্দের তরঙ্গ আনন্দই। এ বিকাশের নিম্নে, অস্থি নাই কেবল মাংস; মাংস নাই কেবল রুধির; রুধির নাই কেবল শক্তি। শক্তি ইচ্ছা; ইচ্ছা উদ্দেশ্য; উদ্দেশ্য প্রেম—ঘনীভূত আনন্দ। এ বিকাশের নিম্নে কেবল আনন্দ, কেবল জীবন, কেবল জ্যোতি। মৃত্যু কল্পনা, আঁধার কল্পনা। প্রেম বিরোচ্ছ্বাসময়, উচ্ছ্বাস তাঁহার দেহ, উচ্ছ্বাস প্রেমের প্রাণ, উচ্ছ্বাস প্রেমের প্রকৃতি, আনন্দের উচ্ছ্বাসই ভাব। আনন্দের উচ্ছ্বাসই ভাবনা। ভাবনার ফল, উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যের ফল, ইচ্ছা। ইচ্ছার ফল বিকাশ। এ বিকাশ চিরদিনের জন্য বিকাশমান, চিরকাল হইতে বিকাশমান। মানবাত্মা স্বপ্ন দেখিতেছে, তাই এ বিচিত্র বিশ্ব ফুটিয়াছে, সেই স্বপ্নের সঙ্গে এফুল ঝরিয়া পড়িবে, বিকাশ একথারও পক্ষপাতী নয়। অনন্ত কোটী মানবাত্মা, আবশ্যক হয়, ধূলায় মিলাইবে, চিদানন্দঘন যত দিন থাকিবেন, এ বিকাশ ততদিন থাকিবে। প্রেমঘন যত দিন থাকিবেন, প্রেম যতদিন থাকিবে, প্রেমসাগরে তরঙ্গ ততদিন নাচিবে। মহাকবি—আদিকবি যত দিন থাকিবে; এ মহাকাব্য ততকাল থাকিবে। এ চিত্রকরের আনন্দময় চিত্র মুছিয়া ফেলিবে, এমন শক্তি, এমন সাধ্য কাহার? মায়ের কোলে শিশু, আনন্দময়ী জননীর বিশ্বময় অব্যর্থ নিয়মাঙ্কে মানব সন্তান সকলে নির্ভয়ে থাক। ঐ শোন মা বলিতেছেন, "মাভৈ! মাভৈ, আশা কর। বীরের ন্যায় কর্ত্তব্য সাধন কর। আমি সর্ব্বত্র। এ বিশ্ব বিকাশ আমি।"

ভক্তের হৃদয় সমুদ্র মথিত করিয়া যখন বিশ্বমধ্যে নীরব গম্ভীরে শব্দ উঠে, "এ বিশ্ব বিকাশ আমি," তখন, তিনি বলেন, "মা! ঐ যে উষার কোলে ফুল গুলি ফুটিয়া আছে, কে বলে, ও ফুল? ও যে তুমি ফুটিয়া আছ। কে বলে, ঐ পূর্ব্বাকাশে তরুণ অরুণ আভা খেলিতেছে? ও যে, তুমি হাসিতেছ। কে বলে, ঐ ভাগিরথীর বুক ভাসাইয়া নির্ম্মল শীতল জলধারা ছুটিতেছে? ও যে, তোমার শান্তি সুধাধারা বহিতেছে। জননি! মা! হাস, হাস। যত শান্তি, যত সুখ, যত আনন্দ ভাণ্ডারে আছে, অমৃতের ধারায় বহাও। ঐ কলকণ্ঠ বিহঙ্গদল, নীলিমাময় স্থির আকাশ ভাসাইয়া, কি যেন গাইতেছে। ভুবনেশ্বরি! অনন্ত সুমধুরস্বরে, তুমি কি তোমার মানবশিশুদিগকে, আদর করিয়া, ঘুম ভাঙ্গিয়া ডাকিতেছ, "গা তোল—সন্তান গা তোল?" ভগবানের ভক্ত শিশুসন্তান ভাবেন্ আর প্রেমাশ্রু ধারায় গণ্ড দুইটী অনবরত ভাসান। সেই অশ্রুধারায় বালারুণ প্রভা পতিত হয়, বিশ্বজননী, বিশ্বারাধ্যা, বিশ্বভুবন বিমোহন করিয়া, ভক্তের পবিত্র মুখ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হন্। মধ্যাহ্ন মিহির জ্যোতি কি? ভগবজ্জ্যোতির ছায়া। নিশার আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসে, তারা হাসে, দিবসে

নির্ম্মল রবি হাসে, মানব! ভাই! তোমার মা হাসেন। ও চন্দ্র, তারা, রবি নয়। এই যে অনাদ্যনন্ত গগনের বুক ভরা, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জোড়া, বৈচিত্র্যময়, অপূর্ব্ব, দিব্য, শোভার হাসি, সৌন্দর্য্যের হাসি, বিচিত্র রূপের হাসি, ও মায়ের সুধা-মাখা হাসি রাশি, ঈশ্বরের ভক্ত বিশ্বাসী সন্তানের নিকট, এইরূপ রস গন্ধাদিময় বিচিত্র বিশাল বিশ্ববিকাশ, মায়েরই অপূর্ব্ব বিকাশ। ভক্ত বিশ্বের কোলে বসিয়া ভাবেন, মায়ের কোলে আছি। এই জন্য ভক্ত, অমর, নির্ভীক, চিরসুখী, সদানন্দচিত্ত। মা সদা যাহার কাছে, সে সুখী, না সে দুঃখী?

আকাঙ্ক্ষা

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যেন কারাগার,
বিচিত্র জগৎ একই প্রকার,
সাধারন বিধি যেন রে শৃঙ্খল,
মানস বিহঙ্গ কাঁদিছে কেবল!

২

ধায় জড় বায়ু দিক্ দিগন্তর,
ইথার তরঙ্গে শূন্যের ভিতর;
ভ্রমে অবিরাম জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা, চলিছে কেবল।

৩

নীরব অম্বরে বিহঙ্গ সঙ্গীত,
—সুস্বর লহরী—ভাসিয়া যায়;
অনন্ত সাগরে ধবল পর্ব্বত,
—বরফের শ্রেণী—চলিয়া যায়।

৪

অনিয়ত গতি ধূমকেতুচয়,
—তেজ বাষ্পময়, কেশ সুশোভিত,—
আসি যুগান্তরে তপন আলয়,
অন্তরিক্ষে পুনঃ হয় লুক্কায়িত।

৫

চলিছে সাগর ডাকিয়া ডাকিয়া,
ঘুরিছে অম্বর হাসিয়া হাসিয়া;
ছুটিছে সংসার কালেতে মিশিয়া,
কাঁদিছে পরাণ থাকিয়া থাকিয়া।

৬

প্রকৃতি স্বাধীন, ধায় নিরন্তর
আপনার বেগে—নাহি মনে ক্ষোভ;
নাহিরে তাহার অন্তরে অভাব,
চলে সুখে সুখে দেশ দেশান্তর।

৭

কিন্তু মানবের দুঃখ চিরদিন,
থাকিতে বাসনা, রহে শূন্যময়
তাহার অন্তর, যেন ছায়াময়
এ বিশ্ব সংসার—বিচিত্র রচন।

৮

কই মন্দাকিনী—পবিত্র সলিল!
কই পারিজাত—কুসুমের সার!
কই দেবতনু—পুণ্যেতে উজ্জ্বল!
কই কল্পতরু—আশার সঞ্চার!

৯

পারিনা ভ্রমিতে শশাঙ্ক উপর,
পারিনা ছুটিতে নক্ষত্র মণ্ডল;
দুগ্ধময় ভাতি প্রশস্ত সুন্দর,—
ছায়া পথ ডাকে, শরীর অচল।

১০

অনন্ত বিশ্বের সহ তুলনায়,
মানবের ক্ষুদ্র তনু কি ছার !
গরিমায় ভাষা লুকাইয়া যায় ;
ফোটেনা বচন মুখেতে আর।

১১

কিন্তু তারা দল ! বলনা স্বরূপ,
কেন এ পরাণ ব্যাকুল হয় ;
দেখিয়া গগনে তোমাদের রূপ,
ছুটিয়া যাইতে বাসনা হয় ?

১২

পার কি বলিতে, কেন যে অন্তর
হয় নিমগন চিন্তার সাগরে ?
দেখি সুবিস্তৃত বিশাল অম্বর,
অবোধ পরাণ ছট্ ফট্ করে।

১৩

এ বিপুল বিশ্ব যেন কারাগার,
এ জড়-বন্ধন যেনরে শৃঙ্খল ;
কত প্রেম মূর্ত্তি বিলীন হয়,
কত না সঙ্কল্প ভাঙ্গিয়া যায়।

১৪

বালকের মুখ মনেতে পড়েনা,
প্রণয়ের গীত ভুলিয়া যাই ;
পৃথিবীর সনে অন্তর নাচেনা,
নয়নের জল নয়নে নাই।

১৫

সংসার উদ্যানে কত শত ফুল,
যতনের ধন, আদরে রক্ষিত--
স্নেহের নির্ঝরে পালিত সকল,
কোথায় সে সব হয় লুক্কায়িত।

১৬

বাগানের ফুল বাগানে রয়,
জোনাকির পাতি জলেনা আর ;
মরমের কথা মরমে রয়,
সংসার সঙ্গীত বাজেনা আর !

১৭

কিসের লাগিয়া অতৃপ্ত পরাণ
ধায় শূন্য পথে, মানেনা বারণ,
মজে ধীরি ধীরি ভুলিয়া আপন
সুনীল অম্বরে—বিশ্ব আবরণ।

১৮

আছে কিরে সুপ্ত অনন্ত মাধুরী,—
অনন্ত সুষমা, আশার বরণ—
কুটিল প্রকৃতি ঘন আবরণ
দেয় না খুলিয়া সে রম্য কিরণ ?

১৯

না থাকিলে কেন উছলে পরাণ,
কেন বা অন্তর রহে অপূরণ
সংসারের সুখে ; কেন রাতি দিন
অতৃপ্ত নিশ্বাস ছায়রে গগন।

২০

হে প্রকৃতি ! তুমি রূপময়ী, তব
প্রশস্ত ললাট চাঁদের কিরণে
করে ঝলমল, যামিনী নীরব,
যেন মুগ্ধচিতে নেহারে স্বপনে।

২১

পরম উদার তোমার অন্তর,
নদী সরোবর, সাগর ভূধর,
প্রান্তর কানন, জীব জন্তু যত
প্রতিবিম্ব মাত্র ; তুমিই মহত্ত।

২২

কেমনে বলিব তুমি নিরদয়,
কৃতজ্ঞ অন্তরে যাবত্ জীবন
গাইব তোমায়, হবে বিশ্বময়
মানব সঙ্গীত--অসত্য বিহীন।

২৩

তুমি দয়াময়ী, দিতেছ নিয়ত
সুখ দ্রব্য কত, ভুলাইতে মন।
বসন্ত সৌরভে জীবজন্তু রত
মনের আনন্দে, ভুলিয়া আপন।

২৪

তবু যেন তুমি—খুলিব এ হিয়া—
কৃপণের ন্যায় রেখেছ ঢাকিয়া
নয়নের মণি। নশ্বর নয়ন
পায়না খুজিয়া সে অমূল্য ধন।

২৫

ঢাকে যথা মেঘ চাঁদের কিরণ,
রেখেছ ঢাকিয়া আশার বরণ—
অপরূপ জ্যোতি—বিশ্ব মাত্র যার
করে যে উন্মন মানব অন্তর।

২৬

দেখি দেখি এই হয় লুক্কায়িত,
পাই পাই আর সরিয়া যায়;
তারার অন্তরে ক্ষণ প্রকাশিত,
অমনি আকাশে বিলীন হয়।

২৭

ইহারি লাগিয়া অতৃপ্ত পরাণ
ধায় শূন্য পথে, মানেনা বারণ;
মজে ধীরি২ ভুলিয়া আপন,
সুনীল অম্বরে—বিশ্ব আবরণ।

২৮

যেন গোপনেতে বিশ্বের অন্তরে
আছে রে সুষমা, অনন্ত, মধুর;
যাহার আভাসে প্রেম অশ্রু ঝরে,
উঠে চমকিয়া মানব অন্তর।

২৯

নহে এ কল্পনা, নহেরে স্বপন,
সুনীল পুরবে নশ্বর শ্রবণ
অনাহত ভেরী,—গ্রহের সঙ্গীত
অনন্ত আকাশে—চিত্ত বিমোহিত।
হেরে লুকাইয়া অতৃপ্ত নয়ন,
অপরূপ জ্যোতি বিমল কিরণ।

৩০

আছে ভবিষ্যৎ, আছে প্রাণে বল,
আছে রূপে রস, আছে চক্ষে জল;
আছে একধন—ধন্য শক্তি তার—
জীবন সম্বল—মানব অন্তর।

৩১

এখনো ভস্মেতে জ্বলে যে অনল,
এখনো শৈশব জাগে পুনর্ব্বার;
এখনো বিকৃত নহেরে অন্তর,
এখনো তৃষাতে মিলিবে জল।

৩২

চলিছে পবন নাচিয়া নাচিয়া,
উঠিছে তপন হাসিয়া হাসিয়া,
নহেরে শৃঙ্খল এজড় বন্ধন,
নহেরে সুবিশ্ব কারার সমান।

৩৩

নয়ন পিপাসা কেনই তেজিব।
স্বভাবের গতি কেনই রোধিব;
পদ-ধূলিসাৎ কেনই হইব,
নাই কিরে আশা অনন্ত বিভব?

নবলীলা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

উচ্ছ্বাসে শান্তি।

সুলোচনা সেই আকাশের তলে, সেই অবস্থায় আবার বিনোদবাবুকে সুলোচনা আঁধারে—নিদ্রার বিচেতন। সেই নিদ্রিত নিকটে, অতি নিকটে দেখিলেন। স্বপ্ন

বলিয়া স্থলোচনার ধারণা নাই, সত্যই যেন বিনোদবাবু স্থলোচনার নিকটে। স্থলোচনার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। পূর্ব্বে যে আচ্ছাদনে শরীর মন ঢাকা ছিল, সে আচ্ছাদন উড়িয়া গিয়াছে;—সরলা সরল ভাবে নির্ভয়ে বলিলেন—"বিনোদবাবু, এই কি লীলা, এই কি খেলা?"

বিনোদবাবু গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—এই লীলাময় পৃথিবীতে এই লীলা,—এই খেলার আরম্ভ। আপনাকে, সংসারকে, অনন্তকে বুঝিতে হইলে এই খেলাই খেলিতে হইবে, এই লীলাই দেখিতে হইবে। ভীত হও কেন?

স্থলোচনা।—ভীত আমি? না তুমি? নিকটে আসিতে ভয় পাও তুমি!—আমি ভীত? এই আঁধারে আমি একাকী, কিন্তু তোমাতে নিমগ্ন। তোমার কথা পালনের জন্য সকল পরিত্যাগ করিয়াছি।

বিনোদবাবু,—সে কি আমার কথা? তুমি অবোধ বালিকা, কি বুঝিবে? হৃদয়ের পানে চাহিয়া শুন, কে কথা বলিতেছে, আমি, না আর কেহ? লোকের কথা পালনের জন্য লোক পাপ-মৃত্যুতে ডুবিতে যায় বটে, কিন্তু সত্যস্বর্গে যাইতে চায় না, যাইতে পারে না। যাঁহার কথায় লোক পারে, তাঁহার কথা কাণ পাতিয়া শ্রবণ কর। অমৃত কণ্ঠে, অমৃত তানে সেই মোহনস্বর হৃদয়ে গীত হইতেছে। তুমি বালিকা, কি বুঝিবে?

স্থলোচনা বলিলেন,—বিচ্ছেদের শাস্ত্র আর বুঝিতে চাহিনা, শুনিতে চাহিনা। মিলনের শাস্ত্র একবার শুনাও দেখি।

বিনোদবাবু আরক্তিম লোচনে স্থলোচনার পানে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিলেন, বলিলেন, আমি শুনাইব? একদিন তাহা অবশ্য শুনিতে পাইবে। বধির যত দিন আছ, ততদিন সে স্বর শুনিতে পাইবে না। বিচ্ছেদের শাস্ত্রেই মিলনের শাস্ত্র আছে। যিনি শুনাইবেন, তিনিই তাহা শুনাইবেন। যখন সময় আসিবে, তখনই শুনিবে। আজ এখনও মোহের বশীভূত রহিয়াছ?—উঠ, অবোধ, সংসারকীটের দংশন-পীড়নে মজিতেছ, উঠ, আমার সহিত আইস।'

এই কথা বলিয়া বিনোদবাবু চলিলেন, স্থলোচনার সর্ব্ব শরীরে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। নিস্তেজ, নিস্পন্দ শরীরে শত শত বহ্নি কণা যেন একই সময়ে দীপ্তি পাইয়া উঠিল। শরীর আগুন, মন আগুন, হৃদয় আগুন। অগ্নিময়ী স্থলোচনা বলিলেন, যাইবে? একাকী যাইতে দিব না, ধরিব, নিশ্চয় ধরিব। এই বলিয়া স্থলোচনা উঠিয়া পশ্চাতে ছুটিলেন। নিদ্রার মোহিনী আকর্ষণ তখনও রহিয়াছে, স্থলোচনা জঙ্গল ভেদ করিয়া বিনোদ বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

সেই শূন্য আকাশে, সেই গভীর রজনীতে মেঘ ভাসিল। ভাসিয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ছুটাছুটি করিয়া অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলীর সহিত মধুর খেলা খেলিতে লাগিল। মেঘ যেন বলে—স্থলোচনাকে আমিই ধরিব, আমিই শীতল করিব, আমিই দেখিব। নক্ষত্রদের যেন তাহা সহ্য হয় না, বলে, আমরাও দেখিব, আমরাও ডাকিব, আমরাও ভুলাইব। এই বলিয়া একবার বাহির হয়, আবার মেঘ আসিয়া চাপিয়া ধরে। একটী, একটী, একটী করিতে করিতে কত নক্ষত্রই ঢাকা পড়িল। নক্ষত্র-জগৎ যায় যায় হইল, ক্রীড়ায় হারিল; একে একে সকলের দর্প মেঘ চূর্ণ করিল। চূর্ণ করিয়া আপনি একাধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল।

নক্ষত্র-জগতের দুর্দ্দশা দেখিয়া বায়ুর প্রাণ চমকিয়া উঠিল; অসহ্য যাতনায় অধীর হইয়া সে আসরে নামিল। মল্লযুদ্ধ বাঁধিল। মেঘ ধরে বায়ুকে, বায়ু ধরে মেঘকে। ভীষণ সমর-রোলে দিক পূর্ণ হইয়া উঠিল। বিদ্যুৎ চমকিয়া বিভীষিকা দেখাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে ভয়ে মেঘ বা বায়ু কেহই ভীত হইল না। এমনই যুদ্ধ বাধিল যে, ভয়ে বৃক্ষদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল, তাহারা বিহ্বল হইয়া আপন আপন পত্র-কেশ, ফুল ফল ছিঁড়িয়া উড়াইয়া উপঢৌকন দিতে লাগিল। বায়ু উপহার পাইয়া আরো তেজে মাতিয়া মেঘ পানে ছুটিল। পৃথিবী আপন বক্ষ শূন্য করিয়া বালুকণা উপহার দিল, বায়ু তাহাতে মজিয়া আকাশে উঠিল। ভীষণ দৃশ্য! পশু পক্ষী ভয়ে কলরব করিল, আশ্রয় ছাড়িয়া আপন আপন দেহ রক্ষায় তৎপর হইল। সুলোচনা আর চলিতে পারিলেন না, শরীর থরথর কাঁপিতে লাগিল। এই সময়ে সুলোচনার চেতনা হইল,—দেখিলেন, বিনোদবাবুও নাই, সে মধুর স্বরও নাই। শরীর অবশ হইল, ভূতের খেলা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ওদিকে মেঘ ও বায়ুর যুদ্ধে মেঘ পরাজিত হইলেন, বায়ু তাহাকে জল করিয়া পৃথিবীতে নামাইল। আকাশ হইতে নামাইয়া নক্ষত্রদিগকে মুক্ত করিল, পরে বৃক্ষকে ও পৃথিবীকে উপহার দিল। বৃক্ষ, পৃথিবী উপহারে কৃতার্থ হইল। আর সুলোচনা?—সুলোচনার হৃদয়ের আগুণ—সেই প্রজ্জ্বলিত দুর্দ্দম্য বহ্নিকণা নিবিল, চেতনা হইল। শীতে অবসন্ন, বৃষ্টিতে সর্ব্ব শরীরের আচ্ছাদন আদ্র; কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। কত বিপদই সুলোচনার ভাগ্যে আছে, তাহা কে জানে! সেই অন্ধকারে, সেই বৃষ্টিতে সুলোচনাকে কি কষ্ট পাইতে হইল, তাহা পাঠক, তোমরা একবার ভাবিয়া দেখ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তিরোধানে।

সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে২, অবসন্ন শরীরে গোরাচাঁদের দল ফিরিয়া কালীর মন্দিরাভিমুখে গমন করিল। মশালের আলোগুলি বৃষ্টিতে নিবিয়া গিয়াছে—ঘোরতর আঁধার চতুর্দ্দিক ঘেরিয়াছে—সুলোচনাকে কোল পাতিয়া রক্ষা করিয়াছে, গোরাচাঁদের দল খোঁজ না পাইয়া পরাস্ত হইয়া ফিরিল। গোরাচাঁদের আশা তখনও মিটি২ জ্বলিতেছিল, সে তখনও মনে করিতেছিল, সুলোচনাকে পথে পাওয়া যাইবে। তাহা গেল না। অনেক কষ্টে গোরাচাঁদের দল মন্দিরে ফিরিল। তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর, সে মন্দিরে জনপ্রাণী শূন্য কেবলই আঁধার। সেখানে পুরোহিত নাই, কমলমণি নাই, কুলকামিনী নাই। কুলকামিনী কোথায় গিয়াছে, পাঠক তাহা জ্ঞাত আছ। পুরোহিত ও কমলমণির নেশা ভাল করিয়া ছুটিলে, কুলকামিনীর বিলম্ব দেখিয়া যখন তাহারা বুঝিল, কুলকামিনী আর ফিরিবে না, তখন তাঁহারা ভয়ানক বিপদ গণনা করিল। গোরাচাঁদকে উভয়েই ভালরূপ চিনিত। গোরাচাঁদের ক্রোধের সম্মুখে তিষ্টিতে পারা উভয়েই অসম্ভব মনে করিয়া, উভয়ে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া পরামর্শ করিল। দুই জনের স্বার্থ একজনের স্বার্থে মিলাইল। দুই জনে কত কি ষড়যন্ত্র করিল, কত কি গুপ্ত প্রতিজ্ঞা করিল। প্রতিজ্ঞা করিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া মন্দির পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইল। পুরোহিত এক একবার মনে করিল—যদি ধরা

পড়ি, তবে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, আমার রক্তে—নরশোণিতে এই কালীর মন্দির পবিত্র হইবে। ভাবিল, হয় হবে, সে ভালই। আবার ভাবিল—ধরা পড়িব কেন? মাকে এখনই কিছু মানিয়া রাখি। এই বলিয়া পুরোহিত সজলনেত্রে মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—মা, অভয়া, নির্ভয় কর, বর দেও। আবার আসিব, আবার ও রাঙ্গা চরণে রক্তচন্দনে মাখিয়া রক্ত জবা অর্পণ করিব, আবার তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া মাতিব, গাইব, নাচিব। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর—ফিরিয়া আসিয়া নরশোণিতে তোমার পা ধোয়াইব। এই বলিয়া পুরোহিত কমলমণির হাত ধরিয়া বলিলেন, যদি প্রাণের আশা থাকে, মায়ের নিকট বর চাহিয়া লও, তারপর চল। কমলমণি সেই পাপবিষাক্ত হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া উচ্চৈস্বরে তিন বার ডাকিল। সে ডাকে মন্দির কম্পিত হইল। তিন বার ডাকিয়া তারপর বলিল—ঠাকুর, মায়ের আশীর্ব্বাদ আনিয়া দেও। পুরোহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আপনি মায়ের পদস্থিত রক্তজবা তুলিয়া মস্তকে রাখিল, এবং একটী বিল্বপত্র আনিয়া কমলমণির হস্তে প্রদান করিল। কমলমণি একবার আশীর্ব্বাদ বক্ষে ধারণ করিল, পরে তুলিয়া মাথার কেশে বাঁধিয়া রাখিল। উভয়েই বিশ্বাসের সহিত প্রাণ ভরিয়া ডাকিল, উভয়ের হৃদয়েই বল আসিল। চিন্তা ভাবনা দূর হইল। পরে কি হইবে, সে ভাবনা আর রহিল না। উভয়ে মন্দির পরিত্যাগ করিল। মন্দির শূন্য হইল। যাইবার সময়ে যে দীপ রাখিয়া গিয়াছিল, প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে সে দীপ নিবিয়া গিয়াছে। গোরাচাঁদের দল যখন মন্দিরে ফিরিয়া আসিল, করালবদনীর পূজা করিতে তখন কেবল সেখানে আঁধার ছিল। চতুর্দ্দিকে বায়ু সোঁ সোঁ করিতেছে—বৃক্ষ কাঁপিতেছে, পত্র উড়িতেছে, বৃষ্টি নামিতেছে, বজ্র হানিতেছে,—আর আঁধার ঘনীভূত হইয়া বিরাজ করিতেছে। মন্দিরে আসিয়া গোরাচাঁদ সকল স্থান খুজিয়া দেখিল—জনপ্রাণী নাই। গোরাচাঁদ বড়ই উদ্বিগ্ন হইল, মাথায় যেন বজ্র খসিয়া পড়িল। সেই আঁধারে করালবদনীকে সম্মুখে রাখিয়া গোরাচাঁদ কত কি ভাবিল, মনে মনে কত কি প্রতিজ্ঞা করিল, তাহা কেহই জানিল না। আমরাও সে সকল কথা আপাততঃ পাঠকদিগকে বলিব না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অনন্তদেবীর অনন্ত দুঃখ।

বিনোদ গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, সুরেশচন্দ্র গৃহে রহিলেন, বিনোদ শান্তময়ীর প্রতি বিরক্ত হইলেন, সুরেশচন্দ্র আনন্দময়ীর প্রতি সন্তুষ্ট রহিলেন, ইহা শান্তিময়ীর সহ্য হইল না। শান্তময়ী শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট সকল কথা বলিয়া দিলেন—আনন্দময়ীর যে পত্র খান বিনোদ বাবুকে দেখাইয়াছিলেন, সেই পত্র খান অনন্তদেবীর হাতে দিলেন। অনন্তদেবী সে দিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন, সেই ব্যস্ততার মধ্যে শান্তময়ী আর একটু অগ্নিকণা ফেলিয়া দিলেন। অনন্তদেবী সেই পত্র খানি সুরেশের হস্তে দিলেন। সুরেশ চন্দ্র সে দিন আরো ব্যস্ত—মকর্দ্দমা রুজু করিতে যাইবেন, তাহার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার নিকট একটী ক্ষুদ্র মকর্দ্দমা দায়ের হইল। কিন্তু তিনি সে দিকে মন না দিয়া বড় মকর্দ্দমা দায়ের করিতে চলিলেন। মকর্দ্দমা দায়ের হইল বটে, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে আইনের সু অবিচারে

সুরেশচন্দ্র হারিলেন। তাঁহার গৃহ হইতে সু-লোচনা ও কুলকামিনীকে কে লইয়া গিয়াছে, তাহার প্রমাণ তিনি করিতে পারিলেন না, কিন্তু বিপক্ষেরা প্রমাণ করিল—দলাদলির দারুণ প্রতিশোধের জন্য তিনি তাহাদের পক্ষের লোককে কয়েদ রাখিয়াছেন ও প্রহার করিয়াছেন। সুরেশচন্দ্র মকর্দ্দমায় জরিমানা দিয়াই নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু বুঝিলেন—তাহার স্ত্রী ও শান্তময়ী এই মকদ্দমায় ভিতরে২ ইন্ধন দিয়াছে। সুরেশ চন্দ্র ক্রোধে অধীর হইলেন, যথা সময়ে বাড়ীতে আসিয়া ক্ষুদ্র মকর্দ্দমাটীর বিচার আরম্ভ করিলেন। শান্তময়ী যে উদ্দেশ্যে মকর্দ্দমাটী রুজু করিয়াছিলেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না; সুরেশ চন্দ্র স্ত্রীর দাস—তাহার কথায় ভুলিয়া গেলেন, মকর্দ্দমায় শান্তময়ী হারিলেন। শান্তময়ী মকর্দ্দমায় হারিলেন—লজ্জায় ও অপমানে মুখ মলিন হইল, এ দিকে আনন্দময়ী শান্তময়ীর শত্রু হইয়া উঠিলেন। বিনোদ বাবু বাড়ীতে নাই—সুরেশ চন্দ্র শান্তময়ীর প্রতি বিরক্ত, শান্তময়ীর আর মনের কথা বলিবার লোক নাই—আনন্দময়ীর হিংসার তলে বিষণ্ণভাবে দিন, পল, সময় কাটাইতে লাগিলেন। দশ দিন, পনর দিন, দেখিতে ২ অনেক দিন চলিয়া গেল, তবুও বিনোদ বাবু ফিরিলেন না, তবুও সুলোচনা ও কুলকামিনীর সন্ধান পাওয়া গেল না, অনন্ত দেবীর হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইতে লাগিল। মকর্দ্দমার পর গ্রামের লোকদিগের আস্ফলনে ও অহিত চেষ্টায় সুরেশচন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় হইলেন। ভ্রাতার অভাবে হৃদয়ের বলের হ্রাস হইয়াছে,—তিনি গ্রামের দলাদলির অনলের সম্মুখে তৃণের ন্যায় পড়িয়াছেন। গৃহে অনল শান্তময়ী ও আনন্দময়ীর হৃদয়ের অভ্যন্তরে—বাহিরে অনল চতুর্দ্দিকে, —ক্রমে ক্রমে অনন্তদেবী ও সুরেশচন্দ্র উভয়েরই হৃদয় মনের বাঁধনি ভাঙ্গিয়া পড়িল। গৃহে শান্তি স্থাপনের জন্য অনন্তদেবী অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল ফলিল না—কারণ সুরেশচন্দ্র স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার মিলনের আশার মূল উচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। যে স্ত্রী স্বামীর নিকট আদর পায়,—তাহাকে আর রাখে কে,? আনন্দময়ীকে তিরস্কার করিয়া অনন্তদেবী কোন ফলই পাইলেন না। অনন্তদেবী হার মানিলেন। গৃহের অশান্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অনন্তদেবীর প্রতি আনন্দময়ী অসন্তুষ্ট হইলেন—শাশুড়ীর বিরুদ্ধে স্বামীর নিকট বলিলেন। সুরেশচন্দ্র এ মকর্দ্দমাটী সহজে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কাজটী ভাল হইল না। পদে পদে অনন্তদেবী পুত্রবধূদিগের দ্বারা অপমানিত হইতে লাগিলেন। শান্তময়ী শাশুড়ীকে আর মানেন না—কারণ শাশুড়ী গৃহের অনল নিবাইতে পারেন নাই, শাশুড়ীর প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। আনন্দময়ী কেন বিরক্ত হইয়াছেন, সে কথা আর বলিব না। অনন্তদেবী জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এবার তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। বিনোদের অদর্শনে তাঁহার হৃদয়ের বাঁধনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—মনে ভাবিতেছেন—আমিই বিনোদকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়াছি—আমিই বিনোদকে পথের কাঙ্গাল করিয়াছি;—সেই জন্য বিনোদ আর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে না—এ বৃদ্ধ মায়ের মুখ আর দেখিবে না। আবার ভাবেন, না—বিনোদ আমার তেমন ছেলে নয়, পরোপকার বিনোদের জীবনের ব্রত—সেই ব্রত পালন

হইলেই ফিরিবে। আমি তাহাকে তাহার কর্ত্তব্যপথে যাইতে বলিয়াছি—এ ত মায়ের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছি—বিনোদ সে জন্য কেন রাগ করিবে? বিনোদ আমার তেমন মূর্খ ছেলে নয়। আবার ভাবেন—একমাস গেল, দুমাস গেল—কতদিন কত রাত্রি গেল, তবুও বিনোদ আসিল না—আমার মৃত্যুর দিন নিকটে—আর বুঝি দেখা হবে না! আবার ভাবেন—বিনোদ কোথায় গেল? যেমনটী ঘরের বাহির করিলাম, আর কি তেমনটী পাইব?—শুনেছি লোক বিদেশে গেলে আর পূর্ব্বের মত থাকে না—মায়া দয়া শূন্য হয়।—বিনোদ কোথায় গেল? কত করে লেখা পড়া শিখায়ে ষোলআনা ছেলেকে ঘরে তুলেছিলাম, সে ছেলে আবার গেল!! হায়, হায়, তবে আর আমার সহিত সাক্ষাৎ হবে না। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ অনন্তদেবীর শরীর দিন দিন কৃশ ও মলিন হইতে লাগিল। এ'দিকে গৃহে অনল জলিয়া উঠিয়াছে—সেই উত্তাপে অনন্তদেবী আরো শীর্ণ হইতে লাগিলেন। সুরেশচন্দ্র জননীর অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন—তাঁহারও কিছুই ভাল লাগিতেছে না। সমাজের আন্দোলন ও অত্যাচারে, গৃহের আন্দোলনে এবং ভ্রাতৃবিচ্ছেদে তিনিও জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগিলেন। গোপালপুরে এমন কেহ নাই—যাঁহার নিকটে মনের কথা বলিয়া উপদেশ পাইয়া একটু শান্তি পাইবেন। অনন্তদেবীর নিকট পূর্ব্বে পূর্ব্বে দুই একটী বৃদ্ধ মধ্যে মধ্যে আসিত, কিন্তু মকর্দ্দমার পর আর কেহ আসা যাওয়া করে না,—গ্রামের লোকদিগের অত্যাচারে আর কোন জনপ্রাণী সুরেশচন্দ্রের বাড়ীতে আসিতে পারে না। গৃহের অশান্তি মিটিল না—সুরেশ চন্দ্র অবশেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি শান্তময়ী ও আনন্দময়ীকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিলেন, ভগ্নীদিগকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিলেন, এবং ঘরের দরজায় চাবি দিয়া শেষে অনন্তদেবীকে লইয়া কলিকাতায় গেলেন। অনন্তদেবী মনে করিলেন, গঙ্গাতীরে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ শান্তিতে কাটাইবেন। কালীঘাটে ঘর ভাড়া করিলেন—কালী গঙ্গার গর্ভে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু জননীর হৃদয়ে কালীঘাট বাসেও শান্তি মিলিল না—পুত্রের বিচ্ছেদ সেখানেও অস্থির করিয়া তুলিল। গোপালপুরের কোন লোক ইহাদিগের জন্য কাঁদিয়াছিল কি না, জানি না,—কিন্তু কালীঘাটে আসিয়া অনন্তদেবীর হৃদয় গোপালপুরের আত্মীয় বান্ধবদিগের জন্য অস্থির হইল। বান্ধব না শত্রু? হউক শত্রু, দূরদেশে তাহারাই মিত্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কালীঘাট ভাল লাগিল না। গোপালপুরের মধুর গ্রাম্য-দৃশ্য অনন্তদেবী ভুলিতে পারিলেন না—সেই শিবপূজা ভুলিতে পারিলেন না। কালীঘাটেও শিবপূজা করেন, কিন্তু তেমন সুখ মিলে না। কন্যাদিগের অদর্শন, পুত্রবধূদিগের অদর্শন—গোপালপুরের ক্ষুদ্র রাজ্যের অদর্শন, সকলের উপরে বিনোদের অদর্শন অনন্তদেবীকে কালীঘাটে অস্থির করিয়া তুলিল। অনন্তদেবী কালীঘাটে আসিয়াও সুখ পাইলেন না। সুরেশ চন্দ্র বিষণ্ন হইলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মধুর সহানুভূতি।

সুরেশচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া বিনোদের অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথায়ও সন্ধান পাইলেন না। স্কুলের ছাত্রদিগের সহিত

বিনোদবাবুর বড়ই হৃদ্যতা ছিল, সুরেশ ছাত্রদিগের বাসায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়ই হউক, আর দুর্ভাগ্যের বিষয়ই হউক, বিনোদের পরিচিত ছাত্রদিগের বাসায় তাঁহার কিছু সংবাদ পাইলেন, কিন্তু সে সংবাদে সুরেশ চন্দ্র আরো অস্থির হইলেন। স্কুলের ছাত্রেরা বলিল,—বিনোদবাবুর সহিত সাক্ষাৎ নাই, তবে আমরা শুনেছি, তাহাকে ভুলাইয়া কুলিশ্রেণী ভুক্ত করিয়া কোথায় চালান দেওয়া হইয়াছে'। কোথায় চালান দিয়াছে, তাহার কোন সংবাদ পাইলেন না। প্রাণের ভাই বিনোদকে কুলি-শ্রেণীতে নিয়াছে, এ সংবাদ সুরেশচন্দ্রের প্রাণে সহিল না, বিষাদে, তাহার মুখ মলিন হইল, অস্থির হইয়া পড়িলেন। স্কুলের ছাত্রেরা বড় দয়ালু, সুরেশের দুঃখে অনেকেই ব্যথিত হইলেন, বলিলেন, 'আপনার কোন চিন্তা নাই, বিনোদবাবু আমাদের বড় প্রিয় জিনিস, তাহার অনুসন্ধানের জন্য আমরা যথা সাধ্য চেষ্টা করিব, একটা সংবাদ অবশ্য বাহির করিতে পারিব।' সেই দিন হইতে বিনোদবাবুর রীতিমত অনুসন্ধান আরম্ভ হইল, রেলওয়ে ষ্টেসন, কুলির ডিপো এ সকল আর বাকী রহিল না। রেলওয়ে ষ্টেসনে ষ্টেসনে ঘুরিলেন বটে, কিন্তু কোন সন্ধান মিলিল না। কোন একটী কুলী আফিসের একজন সহৃদয় বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বলিলেন, অনেক দিন হইল হোসেনউল্লা রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে একটী বাবুকে চাকুরী দিবার ছলনায় লইয়া আসিয়াছিল। বাবুটীর বেশ মলিন ছিল,—পাগলের মত,—জীর্ণ শীর্ণ। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, বাবুকে ফিরাই, চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল পাই নাই। তিনি বলিলেন,—বাঙ্গালায় থাকিতে আর আমার ইচ্ছা নাই—আমি কোন দূর দেশে যাইতে চাই। বাবুর নাম কি জানি না, তারপর তাহাকে কোথায় পাঠান হইয়াছে, তাহাও জানি না। তবে আপনারা আমাদের রেজেষ্টারি বহি যদি দেখিতে পারেন, তবে সবিশেষ সকলই জানিতে পারিবেন।'

একজন ছাত্র বলিল, রেজেষ্টারি বহি দেখিবার কি কোন উপায় আছে ?

বাবু বলিল—সে উপায় নাই, তবে চেষ্টা করিতে পারেন।

শুনিয়া সুরেশচন্দ্রের চক্ষু হইতে অশ্রু পড়িল।

স্কুলের ছাত্রেরা বলিল, কাঁদিলে কি হইবে, কুলি আফিসের লোকেরা না পারে এমন কাজ নাই, চলুন একবার চেষ্টা করিয়া দেখি; টাকায় সব হয়।

তখনকার স্কুলের ছাত্রেরা ঘুস দেওয়াকে দোষের মনে করিত না।

সুরেশচন্দ্র অগত্যা সম্মত হইলেন। ছাত্রেরা আফিসের অধ্যক্ষের নিকট গমন করিল। কুলীর অধ্যক্ষ, ছোট নবাব, ছাত্রদিগকে দেখিয়াও যেন দেখিল না, অন্যমনস্ক হইয়া অন্য কার্য্যে ব্যস্ত রহিল। ইহাদের হৃদয় পাষাণের ন্যায়, ক্রন্দনে—হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদেও ইহাদের প্রাণে আঘাত লাগে না। শত সহস্র লোকের চক্ষের জল দেখিয়া দেখিয়া ইহাদের নিকট ও সকল পুরাতন হইয়া গিয়াছে। সুরেশের চক্ষের জলে বক্ষ ভিজিয়া যাইতেছে—কিন্তু সেখানকার লোকেরা ঠাট্টা বিদ্রুপ করিতে ছাড়িতেছে না;—তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ ঠাট্টা করিতেছে, কেহ বলিতেছে,—তোমাদের কি হয়েছে গো, বাপের শ্রাদ্ধের ভিক্ষা চাহি-

তে এসেছ? নিরুপায় ছাত্রেরা কোন প্রকার উত্তর করিল না। প্রায় দুই ঘণ্টার পর একটী ছাত্র বিনীতভাবে অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —মহাশয়, প্রায় দুমাস পূর্ব্বে বিনোদ বাবু নামে একটী যুবক আপনাদের আফিস হইতে কুলি হইয়া গিয়াছে, সেই যুবকটীকে কোথায় পাঠান হইয়াছে, বলিতে পারেন কি?

অধ্যক্ষের কর্ণে একথা পৌছিল, কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না, আপনার মনে আপনার কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আর একটী ছাত্র বলিলেন,—মহাশয়, আমরা বিপন্ন হয়ে এসেছি. আমাদের প্রতি একটু সদয় হউন।

একথাও বায়ুতে মিশাইয়া গেল, উত্তর নাই।

কতক্ষণ পরে ছাত্রেরা বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল, কাণাকাণি চলিতে লাগিল,— খপরের কাগজে লেখার কথা উঠিল, চুপে চুপে নালিসের কথা উঠিল।

এ সংবাদ অধ্যক্ষের কর্ণে বাজিল, তেলে বেগুনে জলিয়া বলিলেন,—যা, বাবার কাছে নালিস্ কর্ যেয়ে।

এই কথার পর একজন ছাত্র হাতের আস্তিন গুটাইয়া সদর্পে বলিল—আমাদের সহিত বদ্‌মায়েসি, থাক্, দেখা যাবে কিছু হয় কি না?

অধ্যক্ষ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন— অনেক ছাত্র দেখেছি—অনেক লোক দেখেছি বাবা, আর কেন? এই কাজ করে করে আমাদের হাড় পেকেছে, তোদের ন্যায় লোককে যদি ভয় কর্‌তে হতো, তবে এতদিন এ ডিপো উঠে যেতো। যা পারিস তা করিস্।'

এই কথার পর হিন্দুস্থানী দ্বারবান আসিয়া চোক রাঙ্গাইয়া ছাত্রদিগকে অপমান করিতে লাগিল। ছাত্রেরা উপায়ন্তর না দেখিয়া অপমানিত হইয়া ডিপো হইতে ফিরিয়া আসিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—ডিপো সম্বন্ধে সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করা যাইবে।

কোন২ ছাত্র বলিল, মকর্দ্দমা করা উচিত। কোন কোন ছাত্র তাহাতে আপত্তি করিল, বলিল,—বিনোদ বাবু যখন ইচ্ছা পূর্ব্বক গিয়াছেন, তখন মকর্দ্দমায় কিছুই হইবে না।

সুরেশচন্দ্র, কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

ছাত্রেরা পথে পথে হাকাহাকি করিয়া বলাবলি করিল,—অধ্যক্ষেরা ভীত হইয়াছে। পাষাণ-হৃদয় ডিপো রক্ষকেরা যে কাহাকেও ভয় করে না, একথা স্কুলের ছাত্রেরা বুঝিল না।

সুরেশচন্দ্র ছাত্রদের অনুরোধে তাহাদের বাসাতেই গেলেন। ছাত্রেরা সুরেশ চন্দ্রকে বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিল, এবং সংবাদ পত্র ইত্যাদিতে বিষয়টী লইয়া আন্দোলন তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার উদ্যম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। দুই চারি দিন ভিন্ন ভিন্ন সম্পাদকদিগের বাড়ী হাটাহাটি করিতে২ তাহাদের উৎসাহ কতক কমিয়া আসিল, এবং বাকী টুকু সম্পাদকদিগের তাচ্ছল্য ব্যবহারে দূর হইল। সম্পাদকদিগের নিকট ছাত্রেরা মুখ পাইল না। তখনকার সম্পাদকেরা ছাত্রদিগকে অকর্ম্মণ্য জীব বলিয়া জানিত, তাহাদের কথা ততদূর বিশ্বাস করিল না। তবে কোন কোন কাগজে একটু একটু সংবাদ বাহির হইল। এই সংবাদে আশু কোন ফল ফলিল না দেখিয়া, ছাত্রদিগের উৎসাহ কমিয়া গেল। সুরেশচন্দ্র

ছাত্রদিগের নৈরাশ ভাব দেখিয়া বিষণ্ণ মনে তাহাদের বাসা পরিত্যাগ করিয়া কালীঘাটে গেলেন।

সুরেশ চন্দ্র কিয়দ্দিবস কালীঘাটে রহিলেন, কিন্তু যেমন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, ততই জননীদেবীর শোকোচ্ছ্বাস অসহ্য হইয়া উঠিল। ওদিকে অবিবাহিত ২টী ভগ্নী মাতুলালয়ে রহিয়াছে, তাহাদের বিবাহের সম্বন্ধ জুটিতেছে না, দলাদলির দরুণ কেহই বিবাহ দিতে সম্মত হয় না। মাতুলদিগের চেষ্টায় যখন কিছুই হইল না, তখন সুরেশ চন্দ্র জননীকে লইয়া পুনঃ বাড়ীতে আসিলেন। অনেক প্রকার চেষ্টার পর ২টী পাত্র জুটিল, কিন্তু টাকায় কুলাইল না; দশ বার হাজার টাকা খরচ করিতে পারিলে ভগ্নী দুটীকে এক প্রকারে পাত্রস্থ করা যাইত, কিন্তু অত টাকার যোগাড় হইল না। নগদ টাকাদি পূর্ব্বেই মকর্দ্দমা মামলায় নিঃশেষ হইয়াছিল। বিষয়ের কিছু বিক্রয় করিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দলাদলির দরুণ বিষয় কেহই ক্রয় করিল না। এদিকে অলক্ষিত চক্রান্তে প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, খাজনাদি বন্ধ। লোক নাই, জন নাই, দলাদলিতে সকলের চক্ষুর শূল হইয়া সুরেশচন্দ্র কি কষ্টে রহিলেন, তাহা তিনিই জানিলেন। সমদুঃখী নাই, আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই; ভ্রাতৃবিচ্ছেদে অস্থির, ভগ্নীদিগের জন্য চিন্তা-কাতর, পরিবারের মধ্যে অশান্তি, এই সকল কতদিন সুরেশচন্দ্র সহ্য করিলেন, তাহা পরে জানা যাইবে।

গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, দলাদলি, কষ্ট যন্ত্রণা, শোক দুঃখের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিনোদ বাবু কোথায় রহিয়াছেন, ঠিক নাই। কুলকামিনী কোথায়, কমলমণি ও পুরোহিত কোথায়, তাহা জানা গেল না। সুলোচনা সেই অরণ্যে, গোরাচাঁদের দল সেই কালীর মন্দিরে। নবলীলার প্রথম খণ্ড এই অবস্থায় শেষ হইল।

উৎসব সঙ্গীত।

"Sweet music! charming Nymph!
Do thou come—fill my heart:
Here is thy sacred throne!"

আজি এ উষায় মধুর ভাষায়
কি গান গাইছেরে!
আকাশে ভূতলে গাইছে সকলে
প্রাণ খুলে দিয়ে রে!
অরুণ রবির কিরণ বহিয়া
একটি কিবা মধুর তান,
বিজন আকাশ পশিয়া পশিয়া,
ধীরে-ধীরে-ধীরে নামিয়া নামিয়া,
ছুঁয়েছে আমার উদাস প্রাণ!

বিমল প্রভাতে উজল সঙ্গীতে
সমস্ত জগৎ উঠেছে মাতিয়া!
বহু দিন পরে হৃদয় সাগরে
প্রাণের আবেগ বহিছে ছুটিয়া!
হোথায় সুদূরে মাথার উপরে,
দুইটী তারকা মেয়ে
মধুর হাসিছে, মধুর গাইছে,
মুখপানে মোর চেয়ে!
"চলিলাম মোরা," গাইল তাহারা,
মোদের ভগিনীগণ,

মোদের ফেলিয়া গিয়াছে চলিয়া
গান করি সমাপন।
সাজিয়াছে রবি, প্রভাতের কবি
গাইছে প্রভাতী গান,
যাইগো চলিয়া আবার আসিয়া
শুনাব নূতন গান!"
ঐ গেল!—ঐ গেল—গেল!
তারা দুটি চলে গেল!
নব ভানু নব সাজে সাজিয়া আইল!
ধীরে-ধীরে-ধীরে আঁধার লুকাল!
যাই আমি ডুবে যাই—
আলোকেতে মিশে যাই!
নয়নেতে অশ্রুধারা
হৃদয় পাগলপারা
আলোকের গলাটি ধরিয়া
গাই গান বিজনে বসিয়া!

নব ভানু হাসি হাসি মুখে
গাইতেছে চেয়ে মোর দিকে,
"ধরাবাসি! একাকী বসিয়া কেন?
শুনিবে আমার গান?
শুনিবে আমার গান?
সারা দিন ঘুরে ঘুরে
সীমা হ'তে সীমান্তরে
জগৎ করিয়া প্রদক্ষিণ
অবিরাম গাব আমি গান!"

কি কোমল! কি ললিত! কি মধুর!
ভাবাহীন ভাষে গাইছে রবি!
মিলা'য়ে মিলা'য়ে সেই সুরে সুর
গাইছে যত জগতের কবি!
সুললিত গীত ধ্বনি উথলিয়া উঠিছে!
গানে গানে আজি দিক্ দিগন্ত প্লাবিছে!

দূরে—দূরে—দূরে
জলে—স্থলে—শূন্যে
যেখানে সেখানে সর্ব্বত্রে,
প্রাণময় সঙ্গীতের সুতান লহরী
ঢালিয়া দিতেছে কিবা মধুর মাধুরী!
জগতের যত কবি, আজি সবে মাতোয়ারা—
না জানি করেছ পান কি মহা আনন্দ তারা!

গাইছে পাপিয়া
গাইছে কোয়েলা,
প্রভাত বিহগ সবে কলকণ্ঠ ছাড়ি দিয়া,
গাইতেছে আকাশের শূন্যবক্ষ বিদারিয়া!
হাসন্ত মুখে ফুটন্ত ফুল গুলি
গাইছে হরষে কানন উজলি!
ললিত লতিকা দুলিয়া দুলিয়া
মৃদুল সমীর চুমিয়া চুমিয়া
মধুর ভাষায় কেমন মধুর গাইছে গো!
শুনিয়া মোর নয়নের জল শুকায়ে গেছে গো!
প্রাণের মোর জ্বলন্ত জ্বালা নিবিয়া গেছে গো!
প্রাণের আবেগ পারিনা রোধিতে,
দূর শূন্য পানে চায় গো ছুটিতে—
অসীম আকাশ বহিয়া বহিয়া
প্রাণের সাগরে যাইতে মিশিয়া!
আজি কিবা আনন্দের দিন!
আজি কিবা উৎসবের দিন!
প্রাণভোরে ভাল বাসি যাঁরে
নববর্ষ চুমিতে তাঁহারে
আসিয়াছে সঙ্গে নিয়ে নব নব আশা,
মিটাইতে নব নব প্রাণের পিপাসা!

প্রিয়তম কবিগণ
প্রাণভোরে গাও গান!
তোমাদের ভাই আমি,
তোমাদের ভালবাসি!
আজি তোমাদের সনে,
গাইব মধুর তানে,

ভালবাসাময় জীবন্ত সঙ্গীত,
জগতের মন করিয়া মোহিছে!

এস ভাই, এস বন,
গাই তবে এক গান,
এক সাথে মিলাইয়া আশা
জগতের বিলাই ভালবাসা!
কুসুম, বিহগ, রবি
জগতের যত কবি
এস মোরা এক প্রাণে
ললিত মধুর তানে
ঢেলে দিই ভালবাসা জগত-হৃদয়ে
প্রেমের অমৃত নদী যাউক বহিয়ে!

বনের বালিকা
সোণার লতিকা
এস বন! থেকনা নীরব—তুলি তান
ভাষাইয়া দাও জগতের প্রাণ!

ললিত।

প্রেমময়! আজি তব প্রেম পানে চেয়ে
জগতের যত কবি গাইছে আকুল হ'য়ে!
লভিয়া নূতন প্রাণ মেতেছে সবার প্রাণ,
গাইছে মঙ্গল গান প্রেম মুখ নিরখিয়ে!
মোরা ক্ষুদ্র শিশুগণ জগতে বিলাব প্রেম,
কহগো আশ্বাস বাণী কৃপাকণা বিতরিয়ে!
আজি এ সুখের দিনে দাওগো চরণ খানি,
প্রক্ষালন করি মোরা প্রেম অশ্রু বরষিয়ে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

আগ্রহ।

ফুটিয়া আসিছে ফুল, ধীরে বিকশিছে দল,
নবীনা মাধবীলতা স্নেহে সদা ঢল ঢল।
ঐ লতাটীরে আমি যতনে তুলিয়া লব,
এ বুকের আশে পাশে জড়ায়ে রাখিয়ে দিব।
ছিঁড়িব না ফুলগুলি রবে চির হাসিমাখা,
রাতি দিন চোখে চোখে দুজনার হবে দেখা।
ধুক্ ফুক্ করে যত নিশ্বাসে কাঁপিবে হিয়া।
উঠিবে পড়িবে সুখে নবীনা লতিকা কায়া।
এ বুক ভাঙ্গিয়া যবে ধূলায় পড়িয়া যাবে;
তখন লতিকা মোর? জানি নাত কি যে হবে?
বুঝিবা বাঁধিবে দৃঢ়, ভাঙিবে না বুক খানি,
আয় রে, কাঁপিছে প্রাণ, বুকে আয় দেবরাণি
যা হবার তাই হবে, ভাবিব না শেষ কথা
আয় রে নবীনা লতা, জুড়াই মনের ব্যথা।

একেলা।

(১)

একেলা পড়িয়া আছি কেহ কাছে নাই—
কেমনে গো জীবন কাটাই?
দেখিতেছি উষা চলে গেল,
দেখিতেছি সন্ধ্যা মরে গেল।
গণিতেছি আকাশের তারা,
খুঁজিতেছি প্রাণের বাসনা,
মুছিতেছি বিষাদের ধারা,
ছিঁড়িতেছি সাধের কামনা।
একাকী বসিয়া হেথা কেহ কাছে নাই—
কেমনে গো জীবন কাটাই?

(২)

ফুল ফুটে ছিল,
পাখী গেয়ে ছিল,
কাঁপায়ে নবীন লতা বসন্ত-মরুৎ বয়ে ছিল,

একাকী বসিয়া আমি দেখিনু সকলি,
সবি এল, সবি গেল চলি।

(৩)

একাকী যে পারিনে থাকিতে—
বিষাদ রে তুই কাছে আয়,
এ যে ক্ষত পারিনে ঢাকিতে—
আঁধার রে তুই তবে আয়।
দেবে কি বিস্মৃতি মোরে,অথবা যা চাই?
কাছে আয়, একাকী যে কেহ মোর নাই,
কেমনে এ জীবন কাটাই? শ্রীবিঃ

বৃদ্ধের শেষ প্রণয়-গীতি।

ভালবাসা, প্রেয়সীরে, একি স্বপ্ন একি খেলা?
ফুরাবে থাকিবে নাকো, যখনি ফুরাবে বেলা!
ওই গো পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িছে রবি,
বেলা গেল, সবি গেল, একি হ'ল,তাই ভাবি!
আজিও মেটেনি সাধ, আজিও পোরেনি আশ,
আজিও তৃষিত কণ্ঠে বহিছে শুকানো শ্বাস।
ছেলে বেলা হ'তে আমি হ'য়ে আছি তুমিময়,
এ বুকে, এ বৃদ্ধ বুকে, তোমারি শোণিত বয়।
আমি, তুমি, দুই জন—ঘুমে ছিল এ চেতনা,
সহসা জাগিল কেন বিচ্ছেদের এ ভাবনা!
হয়নি ত "প্রেম" প্রিয়ে,এ জীর্ণ দেহের মত,
আজিও বসন্তময় আশার কলিকা শত!
আজিও অনন্ত গীতি লেখা তোর চোখে মুখে
গায়িছি কি ভ্রান্তগান – ডুবেছি কি স্বপ্ন সুখে?

(বুড়াকবি)

বহুদিনের পর দেখা।

বহুদিন হ'ল, ভাল নাহি পড়ে মনে,
খেলেছি শৈশবে এক বালিকার সনে!
বাগানে লইয়া তারে পরায়েছি ফুল,
খোঁপায় গুঁজিয়া দিছি মঞ্জরী মুকুল!
বকুলে গাঁথিয়া দিছি চারু চন্দ্রহার,
গলায় দিয়াছি মালা নব মল্লিকার!
সপত্র গোলাপ ফুল অর্দ্ধ বিকশিত
শ্রবণ যুগলে তার বড় শোভা দিত!
একদিন দেখিতে সে শোভা মনোহর,
চাহিয়ে রয়েছি তার মুখের উপর,
অকস্মাৎ জিজ্ঞাসিল বালিকা সরলা,
স্থির অবিচল যেন চঞ্চলা চপলা,
"কি দেখিছ একদৃষ্টে চাহিয়া অমন?"
কহিলাম, দেখি তব চারু চন্দ্রানন!
লাজের আবেশে মৃদু মধুর হাসিল,
ছুটিয়া আসিয়া বুকে মুখ লুকাইল!
কিন্তু সে সুখের দিন বেশী দিন নয়,
অপরের সনে তার হ'ল পরিণয়!
আর সে বাগানে নাহি এ'ল এক দিন,
কত ফুল কত মালা হইল মলিন!
কি বলিব শুধু সেই শুষ্ক ফুল দলে,
ভাসায়েছি একা বসি নয়নের জলে!
দিন গেল, মাস গেল—ফিরিল না আর,
সেই দেখা শেষ দেখা হইল তাহার!
বহুদিন হ'ল—ভাল মনে নাহি জাগে,
কে তুমি সরলে! যেন চিনি চিনি লাগে?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

অনন্ত মিলনের রাজ্যে।

এক দিন বসিয়া ভাবিতেছিলাম, —পৃথিবীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবরাজ্যের কত উন্নতি হইল,—যাহা ছিল না, তাহা আসিল, যাহা জ্ঞানের অগোচর ছিল, তাহা প্রকাশিত হইল; কিম্বা যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, তাহা পূর্ণ হইল; যাহা দোষ-সংযুক্ত ছিল, তাহা দোষমুক্ত হইল; সংক্ষেপে সহজে বলিতে হইলে বলা যায়—কত উন্নতি হইল; কিন্তু পৃথিবীর অনেক লোকের কেন এইমত রহিল যে, ধর্ম্ম জগতে কিছু নূতন সত্য পাওয়া যাইতেছে না? ভাবিতেছিলাম, মানুষ এক দিন প্রকৃতির সহচর ছিল,—উলঙ্গ, অনাবৃত, অস্নাত, আমমাংস ভক্ষণ-রত ছিল, আজ বেশ ভূষায় সুসজ্জিত, সভ্যতায় ভূষিত, জ্ঞানে অলঙ্কৃত, সুপক্ক আহারে রত। আদিম সময় হইতে মানব-ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, মানুষ কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; অথবা সন্দেহ হয়, সেই মনুষ্যজাতিই এই কি না। এতই উন্নতি, এতই পরিবর্ত্তন। শরীরের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মনেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আরো হইতেছে, কালের ঢেউ যেন ক্রমেই উলটি পালটি কেবল পরিবর্ত্তনের স্রোতেই প্রবাহিত করিতেছে। প্রাতে যে মানুষ দেখি, অপরাহ্নে আর সে মানুষকে দেখিতে পাই না; রাত্রে যে মানুষ শয়ন করে, প্রাতে আর পৃথিবীর বাজারে সে মানুষকে খোঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাল যাহা ছিলাম, আজ তাহা নই; আজ যাহা আছি, কাল হয় ত আর তাহা থাকিব না। পরিবর্ত্তনময় জগতে কেবলই পরিবর্ত্তন, উন্নতি-পিপাসু মানবরাজ্যে কেবলই উন্নতি। এত উন্নতি, কিন্তু সত্য থাকিতেও সত্য জগতের উন্নতি কেন হইতেছে না, অথবা কেন সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত রহিল? সত্যই কি সত্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতেছে না? বাহিরের চক্ষে দেখিলে বোধ হয় বটে,—ধর্ম্মের মূলে সেই আদি সময়ে যে কয়েকটী মূল সত্য নিহিত ছিল, সেই কয়েকটী সত্য ভিন্ন নূতন সত্য পাওয়া যাইতেছে না; কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে একথার ভ্রম স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এ ধর্ম্ম জগতের অভ্রান্ত সত্যের কথা বলিতেছি। মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন, আশা ভিন্ন ভিন্ন, সুখ ভিন্ন ভিন্ন, বাহ্যিক চেহারা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সত্য ভিন্ন ভিন্ন কখনই হইতে পারে না। সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের ঘনীভূত মিলন, এক মন্ত্রে অভ্রান্ত সত্যে। স্বর্গ হইতে শব্দ হইল—মিথ্যা কথা বলিও না, ব্যভিচারী হইওনা, পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্র পার্থক্য, বৈষম্য ভুলিয়া একই সময়ে মস্তক পাতিয়া সেই সত্য গ্রহণ করিল। যুগ যুগান্তর গেল, কত বৈসম্য, কত বিভিন্নতা সোণার পৃথিবীতে গ্রাস করিল, কিন্তু ঐ সত্যে আর বিভিন্নতা দেখা গেল না। খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ সকলে এক হইয়া বলিল—মিথ্যা কথা মহাপাপ। ইহাকেই বলে অভ্রান্ত সত্য। আমি তুমি নই, তুমিও আমি নও, এ পৃথিবীর বাজারের কথা, পৃথিবীতেই পড়িয়া পচুক। পৃথিবীর চিন্তাতে তুমি আমি বিভিন্ন,

তোমার মতে আমার মতে পার্থক্য, কিন্তু স্বর্গীয় জিনিষে এক। তুমি যখন জ্ঞানের অনুসরণ কর, হয়ত আমি তখন প্রেমের খেলা খেলিতে থাকি, তোমার সহিত তখন আমি এক হইব কি রূপে? পৃথিবীতে এত বিভিন্নতা, এত বৈষম্য এই জন্য যে, প্রত্যেকের সাধনা ও চিন্তার পথ বিভিন্ন গতিতে বিভক্ত। সংক্ষেপে বিভিন্ন প্রকারের অবস্থা, জল, বায়ু, শিক্ষা জন্ম ইত্যাদিতে তোমাকে তুমিত্বে লইয়া যাইতেছে, আমাকে আমিত্বে উপনীত করিতেছে; নচেৎ তুমি আমি এক। এক কখন? যখন এক পথে হাটি।—এক তখন, যখন এক চিন্তাতে মজি। আর এক তখন, যখন এক সত্যে—এক অভ্রান্ত সত্যে প্রাণকে ভাসাই। যে অভ্রান্ত সত্যে সব মানবহৃদয় এক—আমেরিকা, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, আসিয়া এক, সেই সত্য কেন সীমাবদ্ধ স্থানে রহিল, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত আধ্যাত্মিক অভ্রান্ত সত্য সকল কেন মানবজাতিকে একত্বে মিশাইতে পৃথিবীর বাজারে অবতীর্ণ হইয়া বিকাইল না? এত বিবাদ, এত বিসম্বাদ, এত জঞ্জাল কেন সোণার সংসারকে মলিন করিল?—ভ্রাতায় ভ্রাতায় বক্ষ বিদারণ করিয়া কেন মরিল, কেন ডুবিল? সত্য কেন দুষ্প্রাপ্য রহিল, মানুষ কেন সত্য ধরিতে অক্ষম হইল? একথার উত্তর অতি সহজ। যে বালকের বর্ণজ্ঞান হয় নাই, সেই বালককে কোন শিক্ষকই প্রথম পাঠ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় পাঠ শিক্ষার্থ দেয় না। দিলেই বা কি হইবে, সে বালক তাহা বুঝিতে, তাহা ধরিতে, তাহা দেখিতে পায় না। ক্রম অনুসারে জ্ঞান। একটু জ্ঞান জন্মিলে, তবে মানব আর একটু জ্ঞানের অধিকারী হয়। যে ক খ শিখে নাই, শাস্ত্যদর্শন তাহার নিকট আঁধার, থাকিয়াও নাই। যত সূক্ষ্ম বিচার করিবে, ততই বুঝিবে, ক্রম ভিন্ন উন্নতি নাই। যে বালক দুগ্ধ পান করিয়া হজম করিতে পারে না, সে বালককে কোন পিতা মাতাই অন্ন আহার করিতে দেয় না। যে রোগী সাগু হজমে অক্ষম, সে রুটী মাংস আহারে অনধিকারী; কোন বিজ্ঞ বৈদ্যই তাহাকে রুটী মাংস আহারের ব্যবস্থা দিবে না। দ্রব্য আছে তাতে কি? দুগ্ধ আছে, মাংস আছে, অন্ন আছে, পৃথিবীর বাজারে সকলই আছে। যে যাহা হজম করিতে পারে, সে তাহা পায়; কেবল যে তাহাই পায়, এমন নহে, আরো গুরুপাক দ্রব্য আহারে অধিকারী হয়। বালক প্রথমে মায়ের দুধ্ হজম করিল, পরে গরুর দুধ্ পাইল। যখন গরুর দুধ্ হজমে সক্ষম হইল, তখন পিতা মাতা সন্তানের অন্ন-প্রাসন করিলেন। বালক যখন মায়ের দুধ্ খাইত, তখন পৃথিবীর বাজারে রাশি রাশি খাদ্য থাকিয়াও বালকের নিকট ছিল না। রোগীকে দেখ। রোগী রোগ শয্যা হইতে উঠিয়া প্রথমে সাগু হজম করিল, পরে অন্যান্য দ্রব্য পাইল। যে রোগী সাগু হজমে অক্ষম, কোন বৈদ্যই তাহাকে অন্য গুরুপাক দ্রব্য ব্যবস্থা করে না। জ্ঞানের বাজারে ক্রম দেখিলে, স্বাস্থ্য-রক্ষার বাজারে ক্রম দেখিলে, প্রেমের বা দয়ার বাজারে যাও, সেখানেও ক্রম দেখিবে। শিশু মাটীতে পড়িয়া প্রথমে মাকেই দেখে, মাকেই ভালবাসে। পৃথিবীর আর সকল তাহার নিকট থাকিয়াও থাকে না, মাতাই তার সকল। মাকেই ভালবাসে। মাকে যে ভাল বাসিতে পারিল, সে পরে মায়ের পেটের ভাই ভগ্নীকে ভাল বাসিতে পারিল,—পরে ঘনিষ্ট আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভালবাসিল,—পরে স্বদেশের

লোকদিগকে,—পরে জগৎকে, ক্রমে ক্রমে অনন্তের দিকে প্রাণ ছুটিল। আগে সীমাবদ্ধ, পরে অনন্ত। দয়াও বিন্দু বিন্দু করিয়া লোকে শিক্ষা করে। প্রাণে ডুবিয়া যাও, এ কথা বুঝিতে পারিবে। একবিন্দু দয়াও যে প্রত্যক্ষ বুঝে নাই, অনন্ত দয়া তাহার নিকট স্বপ্ন; কাহাকেও যে নিজে ভালবাসে নাই, বিশ্বপ্রেম তাহার নিকট কল্পনা। শ্রদ্ধাভক্তি, দয়া প্রেম, একটুকও যাহার মধ্যে নাই, সে অনন্ত শ্রদ্ধাভক্তি, দয়া প্রেম কি, কিছুই বুঝিতে পারিবে না। তাহার নিকট ও সকল স্বপ্ন। যে মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে না, ভালবাসে না, দেশকে ভালবাসে না, সে মানুষের অনন্ত ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা বা ভালবাসিতে পারা অসম্ভব। এইজন্যই জগতে নাস্তিক নামে একশ্রেণী লোকের কথা শুনা গিয়া থাকে। নাস্তিক জগতে তাহারা, যাহারা ক্রমকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আকাশে উঠিয়াছে—মাটীতে পড়িয়া যাহারা কেবলই অবিশ্বাস, অপ্রেম, অজ্ঞানের বাজারে ভ্রমণ করিয়াছে। নাস্তিক তাহারা, যাহারা আপনাকে মানে নাই,—বিশ্বাস করে নাই,—ভালবাসে নাই; মাকে মানে নাই, দেশকে ভালবাসে নাই, কিছুই করে নাই,—কেবল আকাশে,—কেবল কল্পনার রাজ্যে,—কেবল শূন্যে বিচরণ করিয়াছে। সীমাবদ্ধ স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া তবে অনন্তে যাওয়া যায়, সঙ্কীর্ণ জরায়ু গর্ভে বাস করিয়া তবে এত বড় পৃথিবীর মুখ সন্দর্শন করা যায়। জরায়ু গর্ভকে উপেক্ষা করিয়া কেহ কি পৃথিবীতে আসিতে পারে? সীমাবদ্ধকে যে অবহেলা করিল, সে কি কখনও অনন্তে যাইতে পারিবে? আপনাকে সংস্কার কর, পল্লীকে সংস্কার কর, গ্রামকে সংস্কার কর, পরে দেশকে সংস্কার কর, তবে ভারতসংস্কার সম্ভব; আপনাকে ভুলিয়া, পল্লিকে ভুলিয়া, গ্রামকে ভুলিয়া ভারত-সংস্কার কেবলই কল্পনা, কেবলই চীৎকার। উহা কিছুই নহে, উহা মহাভ্রান্তি। বড় সে হইবে, যে ক্ষুদ্র শরীর পাইয়া তাহার আদর ও যত্ন করে। মায়ের কোলকে উপেক্ষা করিয়া যে বালক একেবারে সংসারে যায়, তাহার গায়েই কুবাতাস লাগে। ঘরে বসিয়া বল সঞ্চয় করিলে পরে সংসার-যুদ্ধে জয় লাভের সম্ভাবনা। উচ্চ সে হইবে, যে নিম্নকে আদর করিয়া, তাহাকে অবলম্বন করিয়া উচ্চের দিকে ধাবিত। কূল পাইলে তবে অকূল কি, ধারণা হয়; সীমাবদ্ধ কিছু জানিলে তবে অনন্ত কি, কতক ধারণা হয়। যে কূল কি জানে না, অকূল তাহার নিকটে কল্পনা। এইজন্যই এ সত্য অভ্রান্ত,—একটু যে জানে না, অনেক সে জানে নাই—অনেক সে জানিবে না। আজ একটু যে জানে, কল্যই সে অনেক জানিতে পারিবে,—আজ যে মায়ের দুধ্ হজম করিতে পারে, সেই একদিন পৃথিবীর অন্ন আহার করিতে পারিবে। এ সকল সম্বন্ধে যেমন, সত্য সম্বন্ধেও তেমনি। একটী সত্য বুঝিলে তবে অন্য সত্য বুঝা যায়, একটী সত্য পাইলে তবে অন্য সত্য ধরা যায়। পৃথিবীতে যে সত্য আসিতেছে না, অথবা মানব যে নূতন সত্য পাইতেছেনা, তাহার এক মাত্র কারণ এই, যে সত্য পৃথিবীতে আছে, তাহাও পালিত, রক্ষিত, ভক্ষিত হইতেছে না। পৃথিবীর দুগ্ধ, অন্ন, রুটী যেমন মানবের শরীরের আহার, সত্য তেমনই আত্মার আহার। অজীর্ণ হইলে যেমন মানব দুধ্ বল, ভাত বল সকল দ্রব্যাহারেই অনধিকারী হয়; আত্মার অজীর্ণ হইলে সত্যাহারেও তেমনি অরুচি জন্মে, মানব অনধিকারী হয়। অরুচি

জন্মিলে মৎস্য বা কার, দুগ্ধ বা কে খায়? অরুচি হইলে সত্যেরই কে আদর করে, সত্যই বা কে খায়? এক অরুচি শরীর নাশক, আর এক অরুচি আত্মা নাশক। আহার করিও না, শরীর শুকাইয়া যাইবে। সত্য পালন করিও না, নিশ্চয় জানিবে আত্মা শুকাইবে। কিছুদিন আহার করিও না, দেখিবে পাকশক্তি হ্রাস হইবে, হইবেই হইবে, বিজ্ঞানের অকাট্য সত্য; কিছুদিন সত্যপালন করিও না, সত্যগ্রহণ, ধারণ ও পালন শক্তি হ্রাস হইবেই হইবে। কি কুক্ষণে জানি না, পৃথিবীতে ভয়ানক মত-ম্যালেরিয়া আসিয়া মানবের অরুচি জন্মাইয়া দিয়াছে, এক্ষণ আর সত্য বুঝেই বা কে, ধরেই বা কে, রাখেই বা কে? এমনই অরুচি জন্মিয়াছে, কিছুই আর ভাল লাগে না—যে দ্রব্য আছে, তাহাও আর কেহ হাতে ধরিয়া মুখে দেয় না। আহার জগতের উন্নতি হইয়াছে, কেবল অনুসন্ধানে। যখন দুধে পেট ভরে না, তখন বালক মাটীতে নামিয়া অন্য বস্তু ধরে, ধরিয়া পরে মুখে দেয়। মুখে দিতে দিতে ভাল দ্রব্য পায়। সকল উপকারী ভাল বস্তু দুই প্রকারে মানবের ভাগ্যে ঘটিয়াছে,—অনুসন্ধান ও ক্ষুধা। ক্ষুধা ছিল, তাই মানুষ বাঁচিয়াছে,; অনুসন্ধান ছিল, তাই মানুষ ক্রমেই স্বাস্থ্য-হানিকর দ্রব্য পরিহার করিয়া সুস্থ হইতেছে। ক্ষুধা না থাকিলে অনুসন্ধান বা কে করে, অনুসন্ধান না করিলে আহার বা কে পায়? সত্য আসিবে কি?—পৃথিবীতে যে সত্য আছে, তাহায় আহার করে,এমন লোকও আর দেখা যায় না—এমনই ম্যালেরিয়ায় অরুচি জন্মিয়াছে। সত্য-ক্ষুধা নাই—অনুসন্ধান তাই একেবারেই নাই; যে সত্য আছে, তাহাও মিট মিটি করিতেছে, মিটি মিটি করিতে করিতে এক একবার অন্তর্হিত হইতেছে, আবার কখনও বা কোন মহাত্মার প্রজ্বলিত ক্ষুধার ইন্ধনে জ্বলিয়া উঠিতেছে। সত্য কোথায় নাই? সত্যময় এই জগৎ,—আকাশে সত্য, পাতালে সত্য, হৃদয়ে সত্য, বাহিরে সত্য অনন্ত সত্য, অনন্ত ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দেখে বা কে, খোঁজে না কে, ধরে বা কে, আহার করে বা কে? যে জন একটী সত্য আহার করিয়া হজম করিয়াছে, সেই মনুষ্যই অন্য একটী সত্য বুঝিতে পারে,—অন্য সত্য আহারে অধিকারী হয়। আহার কথা নহে। আহারে শোণিত, শক্তি, স্বাস্থ্য, বল, তৃপ্তি সকলই। কথার কথা লইয়া মানব ক্রীড়া করিতেছ, তুমি দূর হও। সত্য আহারে তুমি যদি রত থাকিতে, তবে তোমার তেজ দেখিতাম, সৌন্দর্য্য দেখিতাম, —অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি দেখিতাম। আহার করিয়াছে, অথচ বল পাও নাই, শান্তি পাও নাই, আহারে আরো স্পৃহা জন্মে নাই, একথা বিশ্বাস করি না। আহার করিলে করিতে পার, কিন্তু হজম তোমার হয় নাই, অপাক জন্মিয়াছে। হজম হয় ভিতরে,—চক্ষুর অদৃশ্য সেই নিভৃত কক্ষে, যেখানে চন্দ্র সূর্য্যের পরাক্রম নাই—সংসার নাই—কিছুই নাই। হজম হইলে তেজ তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। যে সত্য হজম করে, সে নূতন সত্য আহার পায়। যে সত্য হজম করে, তাহার সত্য ক্ষুধা বাড়ে—বাড়েই বাড়ে। সে—ক্ষুধায় অস্থির হইয়া আকাশ পাতালকে তোলপাড় করিয়া তবে নূতনতর সত্য বাহির করিয়া আনিয়া খায়,—খাইয়া বাঁচে। জ্ঞানীরা পৃথিবীতে কি করিতেছেন, তোমরা কি জাননা?—আফ্রিকার ভীষণ সাহারার প্রচণ্ড রৌদ্রকে তুচ্ছ করিয়া, আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরকেও অবহেলা

করিয়া, কত জ্ঞানী জ্ঞানের ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, কত বিপদকে মস্তকে লইতেছেন। তুমি আমি কি কিছু অধিকার করিতে পারি?—পারি কি আমরা, যাহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা নাই—জ্ঞানে যাঁহাদের স্পৃহা বা রুচি নাই। সত্য কে পায়?—যে সত্য হজম করিয়াছে। কত শতাব্দী গেল, চাহিয়া দেখ—ঐ শাক্যসিংহ নিরঞ্জনা নদী তীরে সত্য-ক্ষুধায় বিহ্বল হইয়া কি করিয়া গিয়াছেন? সত্য নাই এ কথা বল? মুখ তুলিয়া দৃষ্টিকে বহু শতাব্দীর পশ্চাতে লইয়া যাও,—যিশু, চৈতন্য, নানক, শাক্য কি করিতেছেন, দেখ। সত্য-পিপাসু সত্যকে হজম করিয়া যাই বলিলেন —"অনন্তসত্য-সিন্ধু, ক্ষুধায় কি আমরা মরিব? সত্য দেও, সত্য দেও, সত্য দেও" বলিতে না বলিতে চতুর্দ্দিক হইতে শত ধারে, সহস্র ধারে বর্ষিত হইয়া সত্য নামিল, সত্য বন্যা হইল, সত্য-প্লাবনে দেশ ভাসিয়া গেল। আকাশ হইতে সত্য নামিল, বৃক্ষ বক্ষ বিদারণ করিয়া লুক্কায়িত সত্য প্রদান করিল, পর্ব্বত ভয়ে অস্থির হইয়া বুক চিরিয়া গুপ্ত সত্য বাহির করিল। পাখী গাইল, আকাশ কাঁপিল, মেদিনী ধন্য হইল। হায়, সে দিন আজ কোথায়? সে আহার কোথায়?—সে ক্ষুধা কোথায়? সে অনুসন্ধানই বা কোথায়? আজ সময় বুঝিয়া সত্য আবার লুকাইয়া যাইতেছে,—পর্ব্বতের গুহায়, বৃক্ষের পল্লবে, আকাশের মেঘে, পৃথিবীর মানবাত্মার আহারকে সকলে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। আজ মানুষ অন্ধ,—আর সত্য দেখে না, পায় না, ধরে না। আর আসে না, যাহা ছিল তাহাও যায়। যায়, যায়, আর থাকে না, একে একে সব নিবিল। একে একে সব মানব-চক্ষুকে ফাঁকি দিয়া অদৃশ্য হইল। কে সত্যকে রাখিবে, কে ধরিবে, কে বুঝিবে? হায়, ঐ আকাশে লুকায়, ঐ পলায়। অধর্ম্ম, অত্যাচার, অসত্য-পীড়নে সত্য যায়। অসত্য-ক্ষুধায় বিহ্বল মানব আর সত্যকে দেখিয়া ধরিতে পারিল না। আজ মানব মুখে হাহাকার করিতেছে, কিন্তু প্রাণে তৃষ্ণা নাই, ক্ষুধা নাই এই জন্যই সত্য আসিতেছে না, বরং যাহা ছিল তাহাও যাইতেছে। আসিতেছে না, ইহার অর্থ এই—কেহ তাহা দেখিতেছে না। পূর্ব্বে সত্য আহার হইয়া মানবাত্মাকে পরিপোষিত করিত, এখন মতে অধিষ্ঠিত হইয়া মুখে মুখে রহিয়াছে। এমনই অরুচি সত্য আর জলাধঃকরণ হয় না, মুখেই থাকে। মত লইয়া এক্ষণ লোক মজিতেছে, ডুবিতেছে, কে বা আহার করে, আর কে বা হজম করে! মত মুখের নিয়ে আর গায় না, কিসে আর জীবন রক্ষা হইবে, কিসে আর আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে? এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে বোধ হইতেছে, যেন আর নূতন সত্য আসিতেছে না। একদিকে সন্দেহবাদ, অপরদিকে মতবাদ, এই দুইবাদ জোট করিয়া সত্যকে পরাস্ত করিয়াছে। মানবের ক্ষুধা গিয়াছে, অমনি স্বর্গের আহার লক্ষ্য ভুলিয়া আবার মায়ের স্তনে লুক্কায়িত হইয়াছে। কথায় শরীর রক্ষা হয় না, আহার করা চাই। মতে আত্মরক্ষা হয় না, সত্যপালন চাই। সত্যকে প্রাণের জিনিষ কে করিতে পারিয়াছে? পৃথিবীতে স্বাধীনতার বংশিরব উঠিয়াছে—অনৈক্যতা বিভিন্নতা—বৈষম্য, সকলেই পর পর, এই ধ্বনিতে কর্ণকুহর বধির হইতেছে, কিন্তু একতার মধুরধ্বনি কোথায়? তোমার প্রাণ যে সত্যের জন্য কাতর, আমার প্রাণ যদি ঠিক সেই সত্যের জন্য কাতর হইত, তবে ভাই,

তোমার প্রাণ আমার প্রাণে মিলিত। বৈষম্যের বংশিধ্বনি কেবলই কর্ণ পাতিয়া শুনিতেছ, চিরকালই শুনিবে?—সাম্যের গীতি কি শুনিবে না? বিভিন্নতার মোহময় ফাঁদেই পড়িয়া ছটফট করিবে, একতার মধুময় জালে কি বাধা পড়িবে না? মতে বিভিন্নতা—বৈষম্য অধর্ম্ম; সত্যে—একতা, সাম্য, পুণ্য, ধর্ম্ম। সত্য যখন মতকে গ্রাস করিয়া অন্নপান হইয়া উদরে যায়, তখনই মানবের জীবন বিকাশ পায়। সত্য যখন প্রাণে মিলিয়া মিশিয়া যায়—সত্যজ্ঞান, সত্যধ্যান, সত্যপান যখন হয়, তখনই মানব-জীবন বিকশিত হয়। মতের কথা অনেক শুনেছি, এখন জীবনের কথা শুনিতে চাই। মতের ঝগড়া অনেক করেছি, এখন সত্যকে আহার করিতে চাই। জীবন মত-ম্যালেরিয়ায় বিনষ্ট হয়, সত্য-আহারেই স্ফূর্ত্তি পায়। বাহিরে সত্য আছে কি নাই, তাতে আমার কি, যতক্ষণ তাহাতে আমার রুচি না হইবে,—যতক্ষণ আমি তাহাকে আহার ও পান না করিব, ততক্ষণ আমার জীবন রক্ষা পাইবে না। মত-মালেরিয়া এমনই ভয়ানক অরুচি জন্মাইয়া দিয়াছে যে, আর সত্যে রুচি নাই। তবে কি জীবন যাইবে?—তবে কি আত্মা বিনষ্ট হইবে? একটী সত্য আহারে প্রবৃত্তি নাই, অন্য সত্য কেমনে পাইব? হায়, আজ কোথায় যিশুখ্রীষ্ট, কোথায় চৈতন্য, কোথায় নানক, আর কোথায় বুদ্ধদেব? হতভাগ্য মানবসমাজকে মত-ম্যালেরিয়া গ্রাস করিয়া ক্ষুধা-মান্দ্য জন্মাইয়া শরীরের তেজ, কান্তি সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে, আজ তোমরা কোথায়? তোমরা আর একবার অবতীর্ণ হও,—সত্যসিন্ধুকে লইয়া অবতীর্ণ হইয়া সত্য পান করিয়া আমাদিগকে দেখাও; তোমাদিগের জীবন্ত ভাবে অনুপ্রাণিত কর, আমরা ধন্য হইয়া যাই, পৃথিবী শান্তি-সুখ পাইয়া কৃতার্থ হউক। শুষ্ক মরুতে পড়িয়া আর পৃথিবী থাকিতে পারে না। পৃথিবী চায় সত্য, পায় মত; পৃথিবী চায় শান্তি, পায় অশান্তি; পৃথিবী তৃষিত সাম্যের জন্য, পায় কেবলই বৈষম্য; মানব লালায়িত একতার জন্য, ঘটে কেবলই বিচ্ছেদ। বৈষম্যের ঘোরতর আগুণ জলিয়া উঠিয়াছে—মত-ম্যালেরিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া তাহাতে ইন্ধন দিতেছে,—স্বেচ্ছাচার স্বাধীনতার ভাণ করিয়া তাহাতে আহুতি দিতেছে, কোথায় জীবন্ত সত্য, তুমি একবার অবতীর্ণ হও। প্রাণে প্রাণে মিলাও, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাও, মানুষ এক সত্যে মিলিয়া আর এক সত্যের রাজ্যে যাইয়া ঘনীভূত মিলন পাউক। মিলিতে মিলিতে, কোটী কোটী কণ্ঠ এক হইয়া, কোটী কোটী হৃদয় মিলিয়া সত্যেরই জয় ঘোষণা করুক, আর তাহাতে মজুক, তাহাতে ডুবুক, তাহা লইয়া থাকুক। আমরা সকলে সত্য-শাস্ত্র শিখিতে শিখিতে আরো শিখি, সত্য পাইতে পাইতে আরো পাই। সীমাবদ্ধ শাস্ত্র অসীম হউক, ক্ষুদ্র মানব প্রাণ ক্ষুদ্রত্বে আরম্ভ করিয়া অনন্তের দিকে ধাবিত হউক। কোটী ভাঙ্গিয়া সহস্র হউক, সহস্র শত, শত মিলিয়া এক হউক। সকল স্বর এক হইয়া একই সত্য প্রচার করুক, সকল হৃদয় এক হইয়া একই সত্য পান করুক। সেই ঘনীভূত মিলনের রাজ্যে—যেখানে সাম্য আছে, বৈষম্য নাই; একতা আছে, অনৈক্যতা নাই; স্বজন আছে, পরজন নাই; স্নিগ্ধতা ও কোমলতা আছে, কঠোরতা নাই;—সুখ শান্তি আছে, বিচ্ছেদ দুঃখ নাই; জ্ঞান আছে অহঙ্কার নাই; স্বাধীনতা আছে স্বেচ্ছাচারিতা

নাই; সেই ঘনীভূত সত্যপ্রেম রাজ্যে যাইবার জন্য সকলে একবার মাত্র দেখি, বঙ্গদেশ স্বর্গে পরিণত হয় কি না, ঘনীভূত মিলন ঘটে কি না ঘনীভূত শান্তি পাওয়া যায় কি না?

ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব

(সমালোচনা।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভারত কি ইংরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত?

"To spill a few bright drops of blood,
And straight rise up a Lord."

কোন কোন ইতিহাস লেখক মনে করিয়া থাকেন যে, ক্লাইব পলাসির যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজয় করিয়াই বঙ্গদেশে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পলাসির যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সমুদয় ঘটনাগুলি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পলাসি ক্ষেত্রে ক্লাইব শুদ্ধ কেবল মিরজাফর প্রভৃতি সিরাজউদ্দৌলার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারিগণের পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পলাসিক্ষেত্রের সংগ্রামে এক পক্ষ সিরাজউদ্দৌলা, অপর পক্ষ তাঁহার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারিগণ; ইংরাজ কেবল সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষের অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব পলাসির জয়দ্বারা ইংরাজগণ বঙ্গদেশের উপর যে কোন প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হন নাই, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

দিল্লীশ্বর আরঙ্গজিবের মৃত্যুর পর মোগল সম্রাটদিগের সাম্রাজ্য ক্রমেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। তাহাদিগের আধিপত্য দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইল। মোগল সম্রাটদিগের ক্ষমতা এই প্রকারে বিলয় প্রাপ্ত হইলে, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সুবাদারগণ কেবল নাম মাত্র দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতেন। বস্তুতঃ তাহারা প্রায় প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে আপন আপন প্রদেশে এতাদৃশ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন যে, কালক্রমে তাঁহাদিগেরই বংশপরম্পরা সেই সেই প্রদেশের রাজ পদ অধিকার করিতে লাগিল। দক্ষিণ প্রদেশে নিজাম দিল্লীশ্বরের অধীনতা হইতে আপনাকে নির্ম্মুক্ত করিয়া স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিলেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার আলিবর্দ্দিখাঁর মৃত্যুর পর, তাঁহার দৌহিত্র সেই নর-পিশাচ সিরাজউদ্দৌলা দিল্লীশ্বরের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অবলীলাক্রমে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু ঈদৃশ ইন্দ্রিয়াসক্ত হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য নির্ব্বোধ যুবকের রাজত্ব কখনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের অনতিবিলম্বেই তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার জন্য নানাবিধ উপায় দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা কলিকাতাস্থ ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইব সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, ক্লাইব সসৈন্যে মুরসিদাবাদে আসিয়া সিরাজউদ্দৌলাকে আক্রমণ করিলে, সিরাজের প্রধান অমাত্য মীরজাফর স্বীয় সৈন্য সহ ক্লাইবের সহিত সম্মিলিত হইয়া, সিরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবেন। ইংরাজেরা

এ পর্য্যন্ত কেবল সামান্য বণিকের ন্যায় কলিকাতায় বাণিজ্য করিতেন। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমতঃ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ক্লাইব অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। বিশেষতঃ এই সহায়তার প্রতিদান স্বরূপ মীরজাফর প্রভৃতি ইংরাজদিগকে বহুল অর্থ প্রদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন; ক্লাইব সেই অর্থলোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এই গুরুতর কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, সৈন্যসহ মুরসিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে জুন তারিখে উভয় সৈন্য মধ্যে যুদ্ধারম্ভ হইল। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের পরাজয়েরই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের কুপরামর্শে সিরাজ সেনাপতিকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে অনুমতি করিলেন। সেনাপতি অনিচ্ছা সত্বেও ক্ষান্ত হইলে, সহসা সেনাগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এই বিক্ষিপ্ত সেনাগণের উপর ক্লাইব সহজেই জয়লাভ করিলেন। কেবল দৈবঘটনা বলেই ইংরাজগণ ও মীরজাফর সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

যে দিন সেই নরপিশাচ সিরাজউদ্দৌলা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরের বেশে স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে মুরশিদাবাদের রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতে ভারতলুণ্ঠন আরম্ভ হইল। মীরজাফর, ক্লাইব ও অন্য কয়েক জন ইংরাজ, আমীর বেগ, নবকৃষ্ণ এবং রামচাঁদ একত্র হইয়া মুরশিদাবাদের ধনাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক ধন বিভাগ করিতে লাগিলেন। সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিতে ইংরেজ বণিকগণ মীরজাফরের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া, কলিকাতাস্থ কৌন্সিলের মেম্বরগণ মোট বারলক্ষ আশি হাজার টাকা প্রাপ্ত হইলেন। তন্মধ্যে ড্রেক ও ক্লাইব সাহেব প্রত্যেকেই ২৮০০০০ করিয়া এবং ওয়াট, বিচার ও কিন পেট্রিক নামক অপর তিনজন প্রত্যেকে ১৪০০০০ করিয়া প্রাপ্ত হইলেন। ক্লাইব এতদ্ভিন্ন গোপনে ১৬০০০০০ টাকা আত্মসাৎ করিলেন। সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করিলে, ইংরেজ বণিকদিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, সেই ক্ষতি পূরণার্থে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রায় এক কোটি টাকা দিতে হইল। বাঙ্গালীর ভাগ্যে চিরকালই পাত্রাবশিষ্ট; সুতরাং বাঙ্গালী বণিকদিগকেও পিতৃশ্রাদ্ধের ভিক্ষার ন্যায় বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইল। ইংরাজ সৈন্যগণ প্রায় প্রত্যেকেই নবদ্বীপের পণ্ডিতের ন্যায় ছলে বলে যোল আনা বিদায় প্রাপ্ত হইলেন। আর সিপাহিরা ও দেশীয় অন্যান্য সকলেই রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের গড় বিদায়ের ন্যায় কিছু কিছু লাভ করিতে লাগিল। এই ধনবিভাগের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতার ব্যাপার যথেষ্ট ঘটিয়াছে। বিশ্বাসঘাতকতায় ও নিষ্ঠুরতায় সুসভ্য ইংরাজ-জাতি কোন দিনই ভারতবাসী হইতে কোন ক্রমে ন্যূন নহেন। ক্লাইবের কূট প্রতারণা জালে জড়িত হইয়া হতভাগ্য উমিচাঁদ একেবারে নৈরাশ সাগরে মগ্ন হইলেন, এবং তদবধি উন্মত্ত ভাবে জীবনের অভিনয় শেষ করিলেন।

কলিকাতাস্থ ইংরাজ বণিকেরা এই প্রকারে সিরাজের ধনাগার পরিশূন্য করিয়া

বহুল অর্থসহ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে ভারতাগমনের তৃষ্ণা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু সুশিক্ষিত ভদ্রবংশীয় ইংরাজগণ এই সঙ্কট-পরিপূর্ণ সুদীর্ঘ জলপথ পর্য্যটনের কষ্ট সহসা স্বীকার করিতেন না। সুতরাং ইংরেজ সমাজের নীচশ্রেণীস্থ অসংখ্য নীচাশয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান-বর্জ্জিত, দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, অর্থলোলুপ, শ্বেত-চর্ম্মাবৃত কালিমা-কলঙ্কিত-হৃদয় শ্মশান সদৃশ ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, পিশাচবৃন্দের ন্যায় নিরীহ-প্রকৃতি, নিস্তেজ আর্য্য সন্তানদিগের রক্ত শোষণ করিতে লাগিল। ইহাদিগের অর্থপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য ভারতের কত ধনী দরিদ্র হইয়া পড়িলেন, আবার ইহাদের সদৃশ প্রকৃতি বিশিষ্ট নিম্নশ্রেণীস্থ কত-লোক সহসা সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। যেরূপে ইহাদের দ্বারা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হইল; যেরূপে ইহাদি-গের নিষ্ঠুর ব্যবহারে আর্য্যসন্তানদিগের কোমল হৃদয় ক্রমে পাষাণবৎ কঠিন হইয়া উঠিল; যেরূপে ইহাদিগের অসৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ ক্রমে ভারত অপরিজ্ঞাতপূর্ব্ব নানা-বিধ ধূর্ত্ততা, শঠতা ও বীভৎস পাপাচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল; যে প্রকারে ইহা-দিগের অর্থগৃধ্নুতা দ্বারা ভারত তৎকালে দিন দিন অর্থশূন্য হইতে লাগিল, তাহা বিশেষরূপে যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে আমরা টরেন্স্ সাহেব কৃত এম্পায়ার ইন এসিয়া * নামক পুস্তক বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভারত, একদিকে, এই প্রকার অসংখ্য অসংখ্য অর্থলোলুপ ইংরাজ দ্বারা পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, আর একদিকে অরাজকতা নিবন্ধন দেশীয়দিগের অন্তঃকরণ হইতে দয়া ধর্ম্ম সত্যপরায়ণতা ও ন্যায়পরতা দিন দিন অন্তর্হিত হইতে লাগিল, দেশ দুর্গতির স্রোতে ভাসিয়া চলিল। মীরজাফর বঙ্গের সিংহা-সনে উপবিষ্ট হইল পর রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল। তিনি সেই অর্থলোলুপ ইংরাজ বণিকগণের অযথোচিত অর্থলিপ্সা পরিতৃপ্ত করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়ি-লেন। সুতরাং ইহাদিগের চক্রান্তে আবার তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত হইতে হইল।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইব ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি প্রবঞ্চনাদি কার্য্যে সুচতুর হইলেও নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহারে আসক্ত ছিলেন না। তাঁহার অন্তর বীরপ্রকৃতি-সুলভ দুই একটি সদ্গুণেও সুশোভিত ছিল। কিন্তু তাঁহার ভারত পরিত্যাগের পর বান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতাস্থ কুঠীর (Factory) অধ্য-ক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। অর্থলোলুপ বান্সিটার্ট ও কলিকাতাস্থ কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরগণ অর্থলোভে অনতিবিলম্বেই মির-জাফরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া বিশলক্ষ টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার জামাতা মীরকাসিমকে বঙ্গের সুবাদারির পদ প্রদান করিলেন। মীর-জাফর যে রাজ্যশাসনে নিতান্ত অনুপযুক্ত ছিলেন, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি অনুপযুক্ত ছিলেন বলিয়াই ইংরাজ মহাত্মাগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করেন নাই; কেবল অর্থলোভেই গুরুতর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ঈদৃশ গর্হিত আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। স্বজাতি পক্ষপাতিত্ব হেতু ইংরাজ-ইতিহাস লেখকগণ বলিবেন যে, দেশের মঙ্গ

* Torrens' Empire in Asia.

স্বার্থ এবং বঙ্গের সুশাসনের জন্য মীরজাফরকে পদচ্যুত করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে একবার পদচ্যুত করিয়া পুনরায় কেন সুবাদারি পদে নিযুক্ত করা হইল? এ সংসারে মনুষ্য আপন স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রতিনিয়তই এমন অনেকানেক কার্য্য করিতেছে, যদ্দ্বারা চরমে সাধারণের মঙ্গল হইয়া থাকে। প্রায় সকল ঘটনা দ্বারাই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের এই অখণ্ডনীয় নৈতিক নিয়ম প্রমাণিত হইতেছে। জন বিশেষের কিম্বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থপরতা দ্বারা সময় সময় যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অবশ্যম্ভাবী চরমফল পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে,তদ্দ্বারা জগতের কোন না কোন মঙ্গল সাধিত হইতেছে। যদি মীরজাফরের পদচ্যুতি দ্বারা তৎকালে বঙ্গদেশের কোন মঙ্গল হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইংরাজগণ ধন্যবাদার্হ নহেন। ইংরেজ বণিকগণ যে শুদ্ধ কেবল অর্থ লোভেই ঈদৃশ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক করে না। তাহারা যখন অর্থ পাইয়া পুনরায় তাহাকে সুবাদারি পদে প্রতিষ্ঠিত করিল, তখন কে না বুঝিতে পারে যে, তাহাদিগের অর্থ লালসাই এই সকল পরিবর্ত্তনের মূল কারণ।

নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বক্ষণেই সতেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। মীরকাসিমের অল্পকালস্থায়ী রাজত্ব দুই দিনের জন্য বঙ্গের সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছিল। বঙ্গে মুসলমানদিগের যে একটু প্রভাব ও গৌরব অবশিষ্ট ছিল, তাহা কাসিমের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গ হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। মীরকাসিম উৎকোচ প্রদান পূর্ব্বক রাজ্যলাভ করিলেও তাহার হৃদয় একেবারে পৈশাচিক ভাবে পরিপূর্ণ ছিল না। সেই ঘোর অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন, বিষময় ভুজঙ্গ সমূহের আবাস, গিরিগহ্বর সদৃশ, কাম, ক্রোধ, স্বার্থপরতা ও কুটিলতা পরিপূর্ণ মীরকাশিমের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রজাবৎসলতার উজ্জ্বল রশ্মি কিয়ৎ পরিমাণে নিপতিত হইয়াছিল। তিনি সিংহাসনারূঢ় হইয়া প্রজাদিগের মঙ্গল সাধনে যত্নবান হইলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যোগী হইবামাত্র সেই অর্থলোলুপ ও স্বার্থপরায়ণ ইংরাজ বণিকগণ তাহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। যে ঘটনা উপলক্ষে মীরকাশিম পদচ্যুত হইলেন, তাহা পাঠ করিলে ইংরাজগণ কতদূর স্বার্থপরায়ণ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রচলিত নিয়মানুসারে পণ্য দ্রব্য এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে নীত হইলে, তজ্জন্য রাজসরকারে শুল্ক কিম্বা ট্যাক্স দিতে হইত। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক তিন হাজার টাকা প্রদান করিয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন, সুতরাং কোম্পানির পণ্য দ্রব্যের উপর এই শুল্ক দিতে হইত না। কলিকাতার গবর্ণরের দস্তখতি দস্তক মাশুলঘাটায় দেখাইলেই নবাবের কর্ম্মচারিগণ কোম্পানীর পণ্যদ্রব্য বিনা মাশুলে যাইতে দিত। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যচ্যুতির পর ইংরাজেরা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন, এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণও নিজ নিজ বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের এই সমস্ত নিজ নিজ বাণিজ্য সম্বন্ধীয় পণ্য দ্রব্যের উপর দেশীয় অন্যান্য প্রজাদের ন্যায় মাশুল দিতে

হইত। কিন্তু ইংরাজদিগের ন্যায় স্বার্থপর বণিক বিশ্বসংসারে অতি অল্পই দেখা যায়। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, মুরশিদাবাদের নবাব তাহাদিগেরই প্রসাদাকাঙ্ক্ষী, যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, ভারতে অত্যাচার করিয়াও অনায়াসে নিষ্কৃতি পাইতে পারিবে, তখন তাহাদের অত্যাচারের স্রোত আর কে অবরোধ করিবে? অর্থলোভে ভারতে যে সকল ইংরাজগণ আগমন করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত। সুতরাং সংসারে তাহাদিগকে কুকার্য্য ও অসদাচরণ হইতে বিরত রাখিবার জন্য রাজদণ্ড ভিন্ন আর কি আছে? এই সকল স্বার্থপর অর্থলোভী ইংরাজ বণিকগণ দেশ-প্রচলিত বিধান উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিজ নিজ বাণিজ্য দ্রব্যের উপরও ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করিলেন। নবাবের কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগের নিকট ট্যাক্স চাহিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করা হইত। মিরকাসিম ইংরাজ-বণিকদিগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিদিগের এই সকল অত্যাচার নিবারণের জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরাজগণ তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে প্রজাবৎসল মিরকাসিম দেখিলেন যে,ইংরাজগণ কোন ক্রমেই মাশুল দিতে স্বীকার করিতেছে না। সুতরাং এই অবস্থায় কেবল স্বদেশীয় প্রজাগণের নিকট হইতে মাশুল গ্রহণ করিলে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হয়. সুতরাং তিনি মাশুল গ্রহণের প্রথা একেবারে রহিত করিলেন, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ-বণিকগণ ইহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন।

তাঁহারা নবাবকে বলিলেন, দেশীয় বণিকদিগের নিকট হইতে তোমাকে শুল্ক গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে; কিন্তু ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের পণ্যদ্রব্যের উপর তুমি কোন মাশুল ধার্য্য করিতে পারিবে না। এমন প্রস্তাবে মীরকাসিম কোন ক্রমেই সম্মত হইলেন না। কি প্রকারেই বা হইবেন? মীরকাসিম নিতান্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বর্জ্জিত। মীরকাসিম ইংরাজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্বে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। মীরকাসিম ভারতবাসী ইংরাজ কুল-শার্দ্দূলগণের তৎকালাবলম্বিত সংশোধিত অভিনব খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ! অ-খ্রীষ্টীয়ান মীরকাসিম এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন, সুতরাং ইংরাজগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধারম্ভ হইল। এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি রাজ্যচ্যুত হইলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই বৃদ্ধ মীরজাফর ইংরাজদিগকে বলিয়াছিলেন, আমি শুল্ক লইয়া তোমাদিগের বাক্যের উপর বাক্যব্যয় করিব না, আমাকে নবাবী দাও, তোমরা যে পথে চালাইবে, সেই পথেই চলিব। সুতরাং অর্থ-প্রিয় সহৃদয় ইংরাজগণ পুনরায় জাফরকেই বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিলেন।

বস্তুতঃ রোমের মুমূর্ষাবস্থায় প্রিটোরিয়ান গার্ডেরা যেমন অর্থ লোভে সময় সময় এক এক জন সম্রাটকে পদচ্যুত করিয়া এক একটী নর পিশাচকে সিংহাসন প্রদান করিত, সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত অর্থলোভী ইংরাজগণও ঠিক তাহাই করিতে লাগিলেন। যে কুকার্য্যই হউক না কেন, অর্থলোভে এই শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষগণ তাহার অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতেন না। এই সময়ে ইংরাজদিগের নাম ভারতবাসিগণের মনে যুগপৎ ভীতি, ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব আনয়ন করিত। কিন্তু,

সুসভ্য দেশই হউক, অসভ্য দেশই হউক, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও ধূর্ত, সর্ব্বত্রই আছে। নন্দকুমার প্রভৃতি ভারতবর্ষের কতকগুলি ঘোর প্রবঞ্চক অর্থলিপ্সু বণিকগণের সহিত এই সকল সম প্রকৃতি ইংরাজদিগের মিলন হইত। দেশের প্রকৃত ভদ্র লোক যাঁহারা, তাঁহারা ইংরাজগণের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া গ্রাম্যজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় এই উভয় সমাজের নীচাশয় ও প্রবঞ্চক সকল পরস্পর সম্মিলিত হইয়া, ভারতের কার্য্যক্ষেত্রে অভিনেতা হইলেন, সুতরাং ইংরাজগণ জানিতে পারিলেন যে, ভারতবর্ষ কেবল মিথ্যাবাদী শঠ ও প্রবঞ্চকদিগের আবাসভূমি, আর ভারতবাসী ভদ্রলোকেরা বুঝিলেন যে, ফিরিঙ্গীর ন্যায় জঘন্য প্রকৃতি বিশ্বসংসারে আর কুত্রাপি নাই। ঈদৃশ অবস্থা নিবন্ধন ইংরাজদিগের প্রথম সমাগম হইতেই, এক দিকে যেমন ভারতবাসী ভদ্রলোক ইংরাজ সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, অপরদিকে প্রকৃত সহৃদয় ইংরাজগণের মধ্যেও কেহ কেহ চিরকাল ভারতবাসিদিগকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। ইংরাজগবর্ণমেণ্টের সূত্রপাত হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যে সকল ইংরাজ ভারতে আসিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই ইংলণ্ডীয় সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। আবার ভারত সমাজের মধ্যে যে সকল লোক তোষামোদ ও কপটাচরণে বিশেষ পটু, তাহারাই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সূত্রপাত হইতে, ইংরাজদিগের নিকট গমনাগমন করিয়া আপন আপন পদপ্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে—ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের এই প্রকার অসদাচার প্রযুক্ত যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, ক্লাইবকে পুনরায় ভারতে প্রেরণ করিলে এই সকল অনর্থ নিবারিত হইবে। এই মনে করিয়া ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ক্লাইবকে কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ক্লাইবের পুনরাগমনের পূর্ব্বেই মীরজাফরের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সময়ে দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইংরাজগণ দিল্লীশ্বরের কোন অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া মীরজাফরের উপপত্নীর গর্ভজাত নজমউদ্দৌলা নামক একটী অল্প বয়স্ক বালককে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই উপলক্ষে মীরজাফরের উপপত্নী মণিবেগম কলিকাতাস্থ ইংরাজগণকে অনেক উৎকোচ প্রদান করিয়াছিলেন।

ক্লাইব ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তরুণবয়স্ক নবাব রাজ্যশাসনে নিতান্ত অসমর্থ। তৎকালে দেশের মধ্যে এমন একটী লোক ছিল না যে, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য অগ্রসর হইয়া এই সকল অরাজকতা নিবারণের চেষ্টা করেন। প্রায় পাঁচশত বৎসর মুসলমানদিগের অত্যাচারে আর্য্যসন্তানদিগের অন্তরাত্মা অবসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রত্যেকেই আপন আপন সঞ্চিত সম্পত্তি অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু অত্যাচার সমূলে উৎপাটন পূর্ব্বক দেশব্যাপিনী অরাজকতা নিবারণ করিবার ইচ্ছা একটী লোকের হৃদয়েও উদয় হয় নাই। বস্তুতঃ এই সময়ে যদি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে ওয়াসিংটন,

ম্যাট সিনীর ন্যায় একটীও স্বদেশ-হিতৈষী বীর্য্যবান ব্যক্তি থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভারতক্রোড়ে সিংহাসন স্থাপন পূর্ব্বক মাতৃভূমিকে দীর্ঘকালের দুর্গতি ও দুরবস্থা হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু ভারত তখন শ্মশান। সেই শ্মশানবাসী অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ভারতসন্তানগণ বুঝিল না যে, দেশ-প্রচলিত অত্যাচার নিবারণ না করিলে দেশস্থ কোন ব্যক্তিই সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত কালযাপন করিতে পারে না; বুঝিল না যে, সমাজের কোন একটি লোক নিপীড়িত হইলে তদ্দ্বারা সমুদয় লোকের ক্ষতি হয়। শরীরের কোন একটী অঙ্গ আঘাত প্রাপ্ত হইলে, তদ্দ্বারা যেরূপ সমস্ত শরীর ক্লিষ্ট ও জর্জ্জরিত হয়, সেই প্রকার সমাজস্থ কোন এক ব্যক্তি কিম্বা কোন এক সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হইলে, তন্নিবন্ধন সমস্ত সমাজের অমঙ্গল হইয়া থাকে। সিরাজের সিংহাসনচ্যুতি নিবন্ধন যে বিপ্লব ঘটিল, তদ্দ্বারা ভারতবাসিগণের কোন উপকার হইল না। নীচাশয়, স্বার্থপরায়ণ বঙ্গ কুলাঙ্গারগণ সামাজিক সহানুভূতি বিবর্জ্জিত হইয়া, কেবল আত্মরক্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিল। তৎকালে একটী ন্যায়পরায়ণ লোক যদি বঙ্গের সুবাদার-পদ গ্রহণ-পূর্ব্বক অত্যাচার নিরাকরণ পূর্ব্বক প্রজাদিগের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আজ কি ভারত সভ্যসমাজে এমন ঘৃণিত বলিয়া পরিচিত হইত? কিন্তু ভারতের তৎসাময়িক সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই বোধ হইবে যে, সেই সময়ে ভারতমাতা একটী ওয়াসিংটন বা ম্যাট্‌সিনি প্রসব করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থা ছিলেন। এই সময়ে ভারতের প্রাচীন বিজ্ঞানমূলক বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত বিলুপ্ত হইয়া চৈতন্য-প্রচারিত অনেকানেক ভ্রমাত্মক মত ভারবাসিদিগের হৃদয়ে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ছিল। সুতরাং যাহাদিগের হৃদয়ে কিছু কিছু ধর্ম্মভাব ছিল, এবং যাঁহারা ধর্ম্মবলে ন্যায় ও সত্যের পথেই বিচরণ করিতেন, তাঁহারা চৈতন্যের মত অবলম্বন পূর্ব্বক মনে করিতেন যে, সংসারাসক্তিই মনুষ্যগণকে নরকের দিকে পরিচালন করে; অতএব সংসারের বিবাদ কলহ হইতে দূরে অবস্থিতি করাই মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু এই সংসারই যে মনুষ্যের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র এবং ইহসংসারে ন্যায় ও সত্যের রাজত্ব সংস্থাপন করিতে চেষ্টা না করিলে যে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়, এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান তৎকালের আর্য্যসন্তানগণের হৃদয়ে উদিত হয় নাই। এই বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রচার করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডুকুলতিলক অর্জ্জুনের বিশ্ববিজয়ী রথ কুরুক্ষেত্রাভিমুখে পরিচালন করিয়াছিলেন।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়ম কে লঙ্ঘন করিতে পারে? ভারতে ইংরাজ রাজত্ব সংস্থাপিত না হইলে, ভারতের সেই ঘোর অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবার আর সম্ভাবনা ছিল না। মানবাত্মার উন্নতি সাধনই সেই ঐশ্বরিক নিয়মের মুখ্য অভিপ্রায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যেমন দৈববলে ক্লাইব পলাসির যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন, সেইরূপ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে পুনরাগমন করিয়া, অতি সহজেই কোম্পানির নামে দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলেন। কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি দ্বারাই বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ইংরাজ রাজত্ব সংস্থাপিত হইল। এই বন্দোবস্ত দ্বারা মুরশি-

দাবাদের নবাবের সকল ক্ষমতা রহিত হইল এবং তিনি কেবল ৫৩০০০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন বলিয়া ধার্য্য হইল। এখন সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, ইংরাজগণ কখনও বাহুবলে ভারতে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করেন নাই। ভারত বাহুবলে পরাজিত, সুতরাং বাহুবলেই ভারত শাসন করিতে হইবে, ষ্টিফেন প্রভৃতির এই মত যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক, তাহার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। দিল্লীশ্বরের নিয়োগ পত্র দ্বারাই ভারতে প্রথমতঃ ইংরাজ অধিকার সংস্থাপিত হয়। অতএব দিল্লীশ্বরের সনন্দ দ্বারা ইংরাজগণ শাসন সম্বন্ধে যে যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা ক্রমে আলোচিত হইতেছে।

দেওয়ানি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অত্যাচারের আরম্ভ।

"On one side, your lordships have the prisoner declaring that the people have no laws, no rights, no usages, no distinctions of ranks, no sense of honour, no property; in short, that they are nothing but a herd of slaves to be governed by the arbitrary will of a master. On the other side, we assert that the direct contrary of this is true. And to prove our assertion we have referred you to the institutes of Ghinges Khan and of Tamerlane: we have referred you to the Mahomedan laws, which is binding upon all, from the crowned head to the meanest subject; a law interwoven with a system of the wisest, the most learned, and most enlightened jurisprudence, that perhaps ever existed in the world."

Burke's Impeachment of Warren-Hastings.

ইংরাজ বণিকগণ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়া, এই দেশত্রয়ের প্রকৃত অধিকারী হইলেন। দেওয়ানি প্রাপ্তি নিবন্ধন এই সকল দেশের রক্ষা ভার তাহাদিগের হস্তেই পতিত হইল। তাহারা মোগল সম্রাটের প্রতিনিধির পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ১৭৭২ সনের পূর্ব্বে তাঁহারা দেশের আভ্যন্তরিক শাসন সম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না। বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা ভিন্ন এই সময়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন রাজা, শাসনকর্ত্তা কিম্বা সুবাদারদিগের অধিকারে ছিল। কিন্তু প্রায় সর্ব্বস্থানই অরাজকতাময় ছিল। ফলতঃ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যেমন ঘোরতর অরাজকতা ভারতকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, এমন অরাজকতা ভারতে আর কদাপি ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহস্থল। ভারতসমাজ এই সময়ে অবনতির চরমাবস্থা এবং দুর্গতির শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতের সুখসূর্য্য বহুকাল অস্তমিত হইয়াছে; ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্ভাগ্য জীবনের এই দ্বিপ্রহরা-যামিনী। ভারত এখন আর সেই ঋষি জননী বীররত্ন প্রসবিনী পুণ্যভূমি নহে। ভারতের রাজ্যে রাজ্যে আর প্রজারঞ্জক রাম নাই; উদারচেতা আকবর নাই; ভারতে আর রামের অযোধ্যার মত স্থান নাই; ভারতে আর শান্তি নাই, সুখ নাই। ভারত একটী বিশাল শ্মশান ক্ষেত্র। ভারত পুণ্যশ্লোক মৃত আর্য্যগণের ও অন্ন প্রাণ, অত্যাচার প্রপীড়িত, জীবন্মৃত আর্য্যসন্তানগণের চিতাভূমি। কিন্তু মৃতদিগের চিতাগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে।

"আর্য্যের শ্মশানে এবে ভস্মমাত্র সার,

এবে রে ভারতভূমে আচ্ছন্ন করিয়া ধূমে ;
জীবিতের চিতানল জ্বলে অনিবার।
গগনে গগনে শুধু ধ্বনি হাহাকার!"

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের শাসন-প্রণালীই ঘোর শিথিলতা প্রাপ্ত হইল। পরস্পরের স্বার্থপরতা ও অর্থ-গৃধ্নুতা হইতে জন বিশেষের অধিকার রক্ষার্থ কুত্রাপি কোন প্রকার সুদৃঢ় রাজকীয় শাসন নাই। একদিকে অর্থলোভী ইংরাজবণিকগণ নানাবিধ অবৈধ উপায় দ্বারা অর্থ সঞ্চয় পূর্ব্বক সত্বর সত্বর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর এক দিকে ভারত-কুলাঙ্গার দেশীয় রাজগণ দিল্লীশ্বরের দুরবস্থা দর্শন করিয়া, রাজ্যবৃদ্ধির প্রলোভনে বিমোহিত হইয়া, আপন রাজ্যরক্ষার্থে কোন চেষ্টা না করিয়া পররাজ্য হরণের উপায় দেখিতেছে। তাহারা বুঝে না যে, প্রজার মঙ্গল সাধনে যত্নবান না হইলে পূর্ব্বলব্ধ রাজ্য হইতেও বঞ্চিত হইতে হইবে। তাহারা বুঝে না যে, রাজ্যলাভ অপেক্ষা রাজ্যরক্ষণই গুরুতর কর্ত্তব্য।

এই সময়ে একটী ক্ষুদ্র প্রদেশে এই অরাজকতার অন্ধকার প্রবেশ করে নাই। এই সময়ে শান্তি, সদাচার, ন্যায়পরতা ও সত্যাচরণ ভারতের কোন প্রদেশে স্থান না পাইয়া ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট হোলকার রাজ্যে আপন আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল। এই সময়ে, স্বার্থপরতা, দ্বেষ হিংসা, অজ্ঞানতা, বিশ্বাসঘাতকতা ভারতের সর্ব্বত্রই বিরাজিত। কিন্তু পরমসাধ্বী ভারতকন্যা অহল্যার রাজ্যে কোন অবিচার নাই—অশান্তি নাই। যে সকল ইংরাজ মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষ শুদ্ধ কেবল জ্ঞান ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত মিথ্যাবাদাদি প্রবঞ্চকদিগের আবাসভূমি, যাঁহারা বলিতেছেন যে, ভারতবাসিদিগকে শুদ্ধ পাশব বল দ্বারাই শাসন করিতে হইবে, যাঁহারা ভারতবাসিগণের মধ্যে সদ্‌গুণের লেশমাত্রও দর্শন করেন না, তাহাদিগকে বলিতেছি, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের অহল্যার রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। চতুরতা ও কার্য্যদক্ষতায় অহল্যা সুসভ্যজাতীয়া রাজ্ঞী, অতি সভ্যা ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের অনুরূপাই ছিলেন ; কিন্তু এলিজাবেথের ন্যায় তাহার শত শত উপপতি ছিল না ; চরিত্রাংশে এলিজাবেথ অবলার চরণ-ছায়া স্পর্শ করিবারও উপযুক্তা নহেন। ফলতঃ চরিত্র তুলনায় এতদুভয়ের মধ্যে স্বর্গ নরক প্রভেদ। অহল্যা যৌবনাবস্থায় পতিহীনা হইয়াও পরম সাধ্বী বলিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এলিজাবেথ বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্তও দোষাশ্রিতা ছিলেন। অহল্যা, দেশস্থ অপরাপর প্রতিবেশী রাজগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহাতে বুদ্ধিদত্তা বিষয়ে রুসিয়ার মহারাণী ক্যাথারিণের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে, কিন্তু ক্যাথারিণের ন্যায় পতির রুধিরে তাঁহার শয্যাস্তরণ আপ্লুত হয় নাই। অহল্যা ডেনমার্কের অধিশ্বরী মারগারেটের সমাবস্থায় পতিত হইয়া রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু মারগারেটের ন্যায় তাঁহাকে কথন প্রজাপীড়ন করিতে দেখা যায় নাই।

বস্তুতঃ সেই সময় ভারতকুলপাংসন দেশীয় অন্যান্য রাজবর্গ যদি সেই সীতা-সদৃশী পরম গুণবতী অহল্যার দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক, আপনাপন রাজ্যে প্রজাদিগের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাজ্য মধ্যে শান্তি সংস্থাপনে যত্নবান হইত, যদি পরস্পরের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে অভিলাষী হইয়া কখন ফরাসি, কখন বা ইংরাজ বণিকদিগের সাহায্যার্থী না হইত,

তাহা হইলে ভারতের সেই সময়ের দুর্গতি ও দুরবস্থা কখনও উপস্থিত হইত না। অহল্যার রাজ্য ভিন্ন ভারতের সমুদয় প্রদেশই অরাজকতাময়। এই সময়ে ইংরাজদিগের দেওয়ানি প্রাপ্তি নিবন্ধন, তৎকালে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা অধিকতর অত্যাচারে নিপীড়িত হইতে লাগিল। ইংরাজবণিকগণ কর্ত্তব্যের অনুরোধে, স্বার্থপরতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক, যদি দেওয়ানি প্রাপ্তি মাত্র বাণিজ্য ব্যবসা একেবারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, কখনই তাদৃশ ভীষণ অত্যাচার ঘটিতে পারিত না, ভারতে ইংরাজ নামও এমন কলঙ্কিত হইত না। পরন্তু তাঁহারা দেশীয়দিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু ইংরাজগণ রাজ্যশাসন করিবার অভিপ্রায়ে তৎকালে দেওয়ানি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের দৃষ্টি তখন বাণিজ্যের দিকে। যাহাতে নির্ব্বিবাদে ভারতের বাণিজ্য একচাটিয়া করিতে পারেন, শুদ্ধ এই উদ্দেশ্যেই দেওয়ানীর সনন্দ-প্রার্থী হইয়াছিলেন। সনন্দ প্রাপ্তির পর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে সেপ্টেম্বর ক্লাইব ডিরেক্টরদিগের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রই ইহার প্রমাণ। ঐ পত্রের এক স্থানে ক্লাইব লিখিয়াছেন যে, দেওয়ানি লাভ দ্বারা আপনাদিগের অধিকার ও প্রভাব নিরাপদ ও চিরস্থায়ী হইল; কারণ, কোন ভবিষ্যৎ নবাবের এমন ক্ষমতা বা অর্থবল হইবে না যে, সে বল বা অর্থ প্রয়োগ দ্বারা আপনাদিগকে পরাভব করিতে চেষ্টা করিবে। * ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সংস্থাপিত তদানীন্তন মেয়র কোর্টের জনৈক জজ মেঃ উইলিয়াম বোলট্স স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বপ্রকার পণ্যদ্রব্যের এক চেটিয়া বাণিজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিবার প্রত্যাশায় এবং দেশীয় বালকদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্যই ইংরাজগণ দেওয়ানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। *

দিল্লীশ্বর সাহ আলমের নিকট হইতে, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজগণ দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়া রাজ্যশাসনের ভার প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু ১৭৭২ অব্দের পূর্ব্বে তাঁহারা বাণিজ্য বিষয়ে একচাটিয়া অধিকার সংস্থাপন ভিন্ন শাসন সম্পর্কীয় কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন না। করিবেনই বা কেন? অর্থ সঞ্চয়ই তাঁহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রত্যেক কর্ম্মচারীই ভারতের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া সত্বর সত্বর স্বদেশ প্রত্যাগমনের উপায় দেখিতেন। দেওয়ানি প্রাপ্তি নিবন্ধন বঙ্গে সুশাসন সংস্থাপন করা

*"By this *acquisition* of the Dewannee, your possessions and influence are rendered permanent and secure, since *no future Nobab will either have power* or riches sufficient to attempt your overthrow by means either of force or corruption."

* "Among the many private motives pointed at for this manœuvre, we can not conclude on this head, without taking notice, that a principal one was, to enable the gentlemen who planned and adapted this mode of government, to *establish such monopolies of the trade of the country, and even of the common necessaries of life, for their own private emolument, and to the subversion of the natural rights of all mankind*, as to this day remain unparalleled in the history of any government, and of which we shall treat more particularly hereafter." William Bolts.

যে তাঁহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা বোধ হয় তাঁহারা ভ্রমেও চিন্তা করিতেন না। ভারতবাসীর স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার্থ যে কোন কালে কোন বিধি ছিল, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও মনে করিতেন না। তাঁহারা ভাবিতেন যে, ভারত অসংখ্য ক্রীতদাসের আবাস ভূমি; সুতরাং ক্রীত দাসদিগের প্রতি যদৃচ্ছা অত্যাচার করিলেও কোন নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না। বস্তুতঃ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে ইংরাজগণ কর্ত্তৃক যে সকল ঘোরতর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়। অবশেষে, ১৭৭২ অব্দের পূর্ব্বেই ইংরাজগণ বুঝিতে পারিলেন যে; তাদৃশ অত্যাচার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে দেশ একেবারে উৎসন্ন হইবে এবং এই নবাবিষ্কৃত অর্থলাভের উপায় বিনিষ্ট হইবে। অতএব তদবধি অত্যাচারের স্রোত অল্পে অল্পে রুদ্ধ হইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইংরাজ বণিকদিগের দেওয়ানি প্রাপ্তির পর প্রায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্য্যের ভার দেশীয় লোকের হস্তে ছিল। মুরশিদাবাদে মহম্মদ রেজা খাঁ এবং পাটনায় রাজা সিতাব রায় রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইলেন। যাহাতে অধিক রাজস্ব আদায় হয়, কেবল তৎপ্রতি তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতেন। কিন্তু দেশের কৃষি বাণিজ্যাদির উন্নতি সাধিত না হইলে এবং প্রজাগণের ধনসম্পত্তি সংরক্ষিত না হইলে যে দেশ ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন হইবে, এ বিষয়ে তাহারা কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তা করিতেন না। বিশেষতঃ অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে পারিলে ইংরাজদিগের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবেন, এই আশায় রাজস্ব আদায় উপলক্ষে তাঁহারা প্রজাগণের উপর প্রায়ই ঘোর অত্যাচার করিতেন।

ইংরাজদিগের কলিকাতাস্থ সিলেক্ট কমিটি ফ্রান্সিস্ সাইকস্ নামক জনৈক ইংরাজকে মুরশিদাবাদের রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় বিভাগের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণের ভার প্রদান করিলেন। সাইকস্ সাহেব একদিকে ইংরাজদিগের কাসিমবাজারস্থ কুঠীর অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন, আবার মহম্মদ রেজা খাঁ প্রভৃতির রাজস্ব আদায় সম্বন্ধীয় কার্য্য-কলাপও পরিদর্শন করিতেন। সুতরাং বাণিজ্য করিবার উপলক্ষে ইংরাজগণ যে সকল অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তাহার শাসন করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। দেওয়ানি প্রাপ্তি নিবন্ধন ইংরাজগণ তখন দেশের প্রকৃত রাজা। মহম্মদ রেজা খাঁ, সিতাব রায় প্রভৃতি ইংরাজদিগের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। দেশে এমন একটী লোকও ছিল না যে, ইংরাজদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে প্রতিবাদ করে। বরং সহস্র সহস্র অর্থলিপ্সু, নরপিশাচ সদৃশ ভারতকুলাঙ্গার ইংরেজবণিকদিগের কুঠীর গোমস্তার পদে নিযুক্ত হইয়া অর্থ লাভাশায় ইংরাজদিগের এই সকল অত্যাচারের সহায়তা করিতে লাগিল।

ক্লাইব দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন করিবার পূর্ব্বে, ১৭৬৪ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখে (ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালে) ডিরেক্টরদিগের নিকট যে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একচেটিয়া বাণিজ্য সংস্থাপনের উদ্যোগ দ্বারা যে সকল অত্যাচার হইতেছিল; তাহারও বিশেষ উল্লেখ ছিল। এই পত্রের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, কলি-

কাউন্সিলের গবর্ণর, কাউন্সিলের মেম্বরগণ ও কম্পানির অন্যান্য কার্য্যকারকগণ, লবণ, গুবাক ও তামাকের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নবাবের চিরপ্রতিষ্ঠিত অধিকারে অন্যায়রূপে হস্তক্ষেপ করিয়া ছিলেন বলিয়াই মিরকাসিমের সহিত এই প্রকার বিবাদ হইয়াছিল। অতএব লবণ গুবাক ও তামাকের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় চির-প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় অধিকার নির্ব্বিবাদে নবাবকে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক কোম্পানির কার্য্যকারকগণকে এই সমস্ত দ্রব্যের বাণিজ্য হইতে ক্ষান্ত রাখিলে নিশ্চয়ই শান্তি সংস্থাপিত হইবে।* ডিরেক্টরগণও ক্লাইবের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া লবণ, গুবাক্ ও তামাকের বাণিজ্য হইতে তাহাদিগের কার্য্যকারকগিদকে ক্ষান্ত রাখিতে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ক্লাইবকে গবর্ণরের পদে বরণ করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ইংরেজদিগের বিলাতে অবস্থিতি কালে তাহাদিগের অন্তরে ক্ষণপ্রভা বিদ্যুতের ন্যায় কখন কখন ন্যায়ান্যায় জ্ঞান সমুদিত হইয়া থাকে; কিন্তু এই হতভাগ্য ভারতবর্ষে পদার্পণ মাত্রই তাহাদিগের আচার ও ব্যবহারে ঘোর পরিবর্ত্তন সমুপস্থিত হয়। জনব্রাইট্ সত্যসত্যই বলিয়াছেন যে, ইংরাজগণ ভারতে গমন কালে সমুদ্রের মধ্যে বাইবেল নিক্ষেপ করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

ক্লাইব যদিও ডিরেক্টরদিগের নিকট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের লবণ, গুবাক ও তামাকের বাণিজ্য রহিত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষে পৌছিয়া তদ্বিপরীত আচরণ করিলেন। ভারতে সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্য সম্বন্ধে ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণের একচেটিয়া সংস্থাপিত হইল। দেশীয় সকল শ্রেণীস্থ বণিকদিগের উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ হইল। ইংরাজগণ যে পণ্যদ্রব্যের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন, সেই মূল্যেই দেশীয় বণিকদিগকে তাহা বিক্রয় করিতে হইত। আবার সেই সকল জিনিস ইংরাজদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিবার সময় দেশীয় লোকদিগকে তাহার চতুর্গুণ মূল্য প্রদান করিতে হইত। তন্তুবায়গণ ইংরাজদিগের নির্দ্ধারিত মূল্যে বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে অসমর্থ হইয়া বস্ত্র-প্রস্তুত ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু ইংরাজগণ তখন কেবল বণিক নহে। তাহারা আবার দেশের রাজা। সুতরাং তন্তুবায়গণ বস্ত্র বস্তুত করিতে অস্বীকার করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করা হইত। এই জন্য অনেকানেক তন্তুবায় আপন আপন বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া ইংরাজদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিত, আমি হস্ত-শূন্য হইয়াছি, আমার বস্ত্র প্রস্তুত করিবার সাধ্য নাই।*

* "It was the encroachments made upon the Nabab's prescriptive rights, by the Governor and Council, and the rest of the servants in Bengal trading in the articles of salt, beetle-nut and tobacco, which had greatly contributed to hasten and bring in the troubles with the Nobab Kasim Ally Khan. That therefore, as the trading in salt, beetle-nut and tobacco had been one cause of the disputes which then had subsisted, those articles would be restored to the Nabab and the company's servant absolutely forbidden to trade in them." (Clive's letter dated 27th April 1764.)

* "And the winders of raw silk called Nagaads have been treated also with such injustice, that instances have been known of their cutting off

যে সকল প্রবঞ্চনা মূলক উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক ডিরেক্টরদিগের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ বাণিজ্য সম্বন্ধে একচেটিয়া সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইলেন, এবং বাণিজ্য সম্বন্ধে তদ্রূপ একচেটিয়া সংস্থাপন নিবন্ধন দেশীয় লোকদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইল, তৎসম্বন্ধে সমালোচনা করিতে হইলে মুসলমানদিগের সময়ে বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাই অগ্রে উল্লেখ করা উচিত। অতএব এই সকল বিষয় পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে—"(বাণিজ্য না লুট)"—সমালোচিত হইবে। এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে এই মাত্র বলিতেছি যে, ইংরাজগণ দেওয়ানি প্রাপ্তির পর সাতবৎসর যাবৎ দেশীয় লোকদিগের উপর বাণিজ্য উপলক্ষে এতাদৃশ অত্যাচার করিতে লাগিলেন যে, কোন সহৃদয় মনুষ্য পশুদিগের প্রতিও সেই প্রকার অত্যাচার করিতে পারিত কি না, সন্দেহ। কিন্তু ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে আবার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, অনেক স্থলে দেশীয় কুলাঙ্গারগণই এই সকল অত্যাচারের মূল কারণ। তৎকালে দেশীয় অনেক নরপিশাচ সমধিক অর্থলাভ করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজদিগকে কুপরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক ঈদৃশ অসদনুষ্ঠানে রত করিত।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১। বাল্মীকির জয়। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্,এ, প্রণীত। মূল্য ৷৷০ আট আনা। হরপ্রসাদ বাবুর বাল্মীকির জয় ১২৮৮ সালে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি, নব্যভারতের পাঠকদিগের মধ্যে প্রায়ই এই গ্রন্থের সহিত পরিচিত। ভাল ভাল গ্রন্থের আদর বাড়িতেছে, কাজেই বাল্মীকির জয়ও সর্ব্বত্র আদৃত, বাঙ্গালী পাঠকের সম্মানার্থ আমরা এ কথা মনে করিয়া লইতে বাধ্য।

সকলেই যীশুখ্রীষ্ট, রুসো এবং নেপোলিয়ানের নাম অবগত আছেন। মহাত্মা যীশু দরিদ্রের সন্তান, সহায় সম্বলের মধ্যে, এসংসারের লোক যাহাদিগকে মূর্খ বলে, এমন দ্বাদশটী শিষ্য। কিন্তু তাঁহার সাম্যনীতি এবং প্রেম আজি বিশ্ব-ভুবন ছাইয়াছে; খ্রীষ্ট আজি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পূজিত। রুসো অপরিসীম বুদ্ধিবলে যে সাম্যনীতি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে প্রসিদ্ধ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব,—কত নরহত্যা, কত রক্তপাত। বুদ্ধিমানেরা ভয় পাইল; বার্ক প্রমুখ ইংরাজজাতি বলিল, এ সাম্যনীতি চাই না; কিন্তু খ্রীষ্টের সাম্যনীতি ইংলণ্ডের স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ সকলেরই বুকের রক্তে মিশ্রিত। নেপোলিয়ানের আকাঙ্ক্ষা, এ পৃথিবী ভুজবলে জয় করিব, একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিব। কিন্তু যে দিন তিনি সেণ্টহেলেনা দ্বীপে বন্দী, সেই দিন তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন, "আমি এসংসারকে জয় করিতে পারিলাম না। বাহুবলে কেহ জয় লাভ করিতে পারে না। লোকে আমাকে শত্রুজ্ঞানে ঘৃণা করিবে; কিন্তু হায়, যীশুখ্রীষ্টকে সমগ্র

---

their thumbs, to prevent their being forced to wind silk"—William Bolts, Judge of the Mayor Court, of Calcutta.

পৃথিবীর লোকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতেছে এবং করিবে! আমি যাহা জয় করিতে গিয়াছিলাম, তাহা মৃত্তিকা; আর খ্রীষ্ট যাহা জয় করিয়াছেন, তাহা মানব হৃদয়। বাহুবলে বা বুদ্ধিবলে সংসারে জয়পতাকা উড়ান যায় না। মানুষ ভাই ভাই বলিয়া পরস্পরের সহিত মিশে না। নীতির বন্ধন ও প্রেমের বন্ধন ভিন্ন এজগতে সকল বন্ধনই টুটিবে, সকল বন্ধনই দুই দিনের জন্য।"

হরপ্রসাদবাবু এই গ্রন্থে বাহুবল এবং বুদ্ধিবলের অকিঞ্চিৎকারিতা এবং নৈতিক বলের সর্ব্বোপরি প্রভুতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সরল, পরিষ্কৃত এবং সুমিষ্ট ভাষায়, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ট এবং বাল্মীকি এই তিন ঋষি চরিত্র লইয়া, অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে এই দেবভাব পরিস্ফুট হইয়াছে।

ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা, ইহা ঋষিত্রয়েরই বাসনা। বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, আমি বাহুবলে এ মহাকার্য্য সাধন করিব; বশিষ্ট ভাবিলেন, আমি বুদ্ধিবলে সাধন করিব। বিশ্বামিত্র দেখিলেন, বশিষ্টের বুদ্ধিবল তাঁহার উপর প্রভুতা লাভ করিল; তিনি সাধনার বলে এ অভাব পূরাইবেন সংকল্প করিলেন! মার্লো এবং গেটের ডাক্তার ফষ্ট যাহা করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র তাহা সকলই করিলেন। দেবক্ষমতা তুল্য তাঁহার ক্ষমতা হইল, নুতন ভুবন গড়িলেন, নব উৎসাহে মাতিলেন। কিন্তু উৎসাহ—কেবলই উৎসাহ—কয় দিন থাকে? ক্ষমতার শিশুসন্তানগুলি লইয়া কত দিন দিন কাটে? বিশ্বামিত্র দেখিলেন, তাঁহার হৃদয় শূন্য শূন্য। এতদিন যাহা করিয়াছিলেন, তাহা গৌরবলাভ প্রণোদিত নব উদ্যম এবং একাগ্রতার বলে। উদ্যম ও একাগ্রতার কাজ না হয়, তাহা নহে, কিন্তু যদি মূলে ধর্ম্ম ভাব নীতিভাব, না থাকে, তবে তাহা হইতে স্থির ফল প্রসূত হয় না। বিশ্বামিত্রের চিত্রে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আজি কালিকার ভারতউদ্ধার ব্রতে দীক্ষিত ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় এ গ্রন্থ হইতে অনেক শিক্ষা পাইতে পারেন। যাঁহারা দেশোদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হইয়া, অবকাশ অভাব বশতঃ ধর্ম্মচিন্তার সময় পান না, তাঁহারা তাঁহাদের ভবিষ্যৎ এবং তাঁহাদের কার্য্যের ভবিষ্যৎ একবার চিন্তা করিবেন। যদি ফষ্টের কথা পাড়িলাম, তবে এখানে আরও একটী কথা বলিব। ফষ্ট ধর্ম্ম চাহেন নাই, ক্ষমতা চাহিয়াছিলেন, তাহার ফলে ইউরোপীয় কবিগণের হাতে তিনি অনন্ত নির্ভরসাপূর্ণ, অনন্ত অন্ধকারপূর্ণ নরক লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের গ্রন্থে তাঁহার পুনরুদ্ধার হয় নাই। কিন্তু হরপ্রসাদ বাবুর বিশ্বামিত্র গদা ছুড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, ঘুরিতে ঘুরিতে ঘুরিতে শূন্য পথে, কে জানে কত কাল ধরিয়া রক্তবমন করিতে করিতে পড়িলেন; কিন্তু পড়িয়া মরিলেন না; শেষ ব্রহ্মার কোলে স্থান পাইলেন। ব্রাহ্মণ হইলেন। খ্রীষ্টীয়ান নরকবাদী, হিন্দু কৃপাবাদী, তাই এই বিভিন্নতা। হিন্দুজাতির ন্যায় অপার করুণাময় বলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে আর কে ভাবিতে পারে? তবুও খ্রীষ্টানেরা বলে, সংস্কৃত হিন্দুদিগের ঈশ্বরের ভাব বাইবল হইতে গৃহীত।

বিশ্বামিত্র পরাজিত; বশিষ্ট পরাজিত; কেহই এ সংসারে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করিতে পারিলেন না। যিনি ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন করিলেন, তিনি বাল্মীকি। যিনি অন্যকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন, তিনি অন্যকে উদ্ধার করিতে পারেন না।

যাঁহার বাসনা আমি নিজে উদ্ধার লাভ করিব, নিজে পবিত্র হইব, তাঁহার দ্বারাই জাতির উদ্ধার এবং জাতির পবিত্রতা লাভ হয়! নিজে বদ্‌মায়েস্‌ থাকিব, কিন্তু কেবল গলাবাজীতে পরে ভাল হইবে, এবং ভারতোদ্ধার হইবে, হরপ্রসাদ বাবু যে এ উনবিংশ শতাব্দীতে এ শিক্ষা কেন দেন নাই, বুঝিতে পারিলাম না, বোধ হয় হরপ্রসাদ বাবুর বুদ্ধি কিছু মোটা। তাঁহার বাল্মীকি কাঁদিয়া কাঁদাইয়াছেন, মাতিয়া মাতাইয়াছেন, পবিত্র হইয়া সকলকে পবিত্র করিয়াছেন। যেদিন ঋভুগণের গান শুনিয়া সকলে উন্মত্ত, বশিষ্টের মনে আত্মপ্রসাদ, তিনি ভাবিতেছেন, তিনি সব ভাই ভাই করিয়া দিবেন; বিশ্বামিত্রের মনে আত্মগরিমা, তিনিও ভাবিতেছেন, সব ভাই ভাই করিয়া দিবেন; তখন বাল্মীকি অশ্রুজলে ভাসিতেছেন। তিনি পরের কথা তখন ভাবিবেন কি, তাঁহার হৃদয়ে বিষম আত্মগ্লানি! বাল্মীকি ভাবিতেছেন, "কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকেই বিধবা করিয়াছি; এ মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই? এই যে ঋভু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল। আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না! হায়, কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম। কোথায় সব ভাই ভাই হব *, না আমায় দেখে সবাই পালায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল? আবার কেন বাজিল, ভাই ভাই ভাই। বাল্মীকির নয়নজলে বুক ভাসিয়া গেল। ভাবিলেন, কি পাপই করিয়াছিলাম! এ স্মৃতি কি নিবিবে না? আরও নয়নে দরবিগলিত বাষ্পপাত হইতে লাগিল!" শেষে এই বাল্মীকির ভাই ভাই গানে জগৎ মাতিয়া উঠিল। দস্যু দস্যুবৃত্তি ছাড়িল। বশিষ্ট বিশ্বামিত্রকে কোল দিল। স্পৃশ্য অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ম্লেচ্ছ যবন, রাক্ষস বানর, সকলে ভাই ভাই হইল। সকলে সকলকে কোল দিল। স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া আজি বাল্মীকিকে কোল দিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন "বাল্মীকি তোমারই জয়"; সকলে গাইল বাল্মীকির জয়; দিকদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইল "বাল্মীকির জয়"। আজ এ দানব ও দুর্নীতির আঁধার মগ্ন ভারতে ধ্বনিত হউক—"বাল্মীকির জয়"; "নীতির জয়" "ধর্ম্মের জয়"। হরপ্রসাদ! তোমার লেখনী অমরত্ব লাভ করুক।

২। মানবপ্রকৃতি। (শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক)। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম,এ, প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে সরল ভাষায়, অতি সহজ-বোধ্য করিয়া, মানব-প্রকৃতি যে ক্রমবিকাশশীল, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। আজি কালি সভ্য-জগতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই তত্ত্ব লইয়া খুব ধুম চলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ এই প্রথম। সুপ্রসিদ্ধ ডারউইন, ওয়ালেস, লাবক্‌, হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি আপন আপন গ্রন্থে এই মতের পরিস্ফুটন কার্য্য সমাধান করিয়াছেন। সংক্ষেপে সে সকল তত্ত্বের সার কথা যত বলা যাইতে পারে, ক্ষীরোদ বাবু তাহা দক্ষতার সহিত বলিয়াছেন। কেমন করিয়া অসভ্য মনুষ্য সভ্য হইল, উলঙ্গ কাপড় পরিল, সমাজ গড়িল, বিবাহ পদ্ধতি করিল, ধর্ম্মালোচনা করিল, এ সকল কথা জানিবার জন্য কাহার না কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইবে? ক্ষীরোদবাবু এরূপ গ্রন্থ

* "ভাই ভাই হব;" কিন্তু করিব, এ কথা বাল্মীকির প্রাণে উদিত হইল না।

প্রচার করিয়া দেশের একটী অভাব পূরাইয়াছেন। ক্ষীরোদ বাবু এই গ্রন্থ প্রণয়নে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন; এখানি বাঙ্গালা ভাষার একটী অপূর্ব্ব রত্ন। এ রত্নের আদর কি বঙ্গে হইবে না? আমাদের বিশ্বাস, নিশ্চয় হইবে। গল্প পড়িবার দিন যাইতেছে। পুস্তক খানির ছাপা বেশ; অক্ষর বড় বড়, কাগজ ভাল, ৩৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কিন্তু একটী কথা। ক্ষীরোদবাবু গ্রন্থখানির মূল্য কিছু অধিক করিয়াছেন। ক্ষীরোদ বাবু কি ভাবিবেন,জানি না,তিনি চারি টাকা স্থলে ২ টাকা মূল্য করিলেন। আমরা তবুও বলিতেছি, গ্রন্থের দাম বড় বেশী। যুবক যুবতীর প্রণয়ের কথা থাকিলেও এত দামে সহজে এ বঙ্গদেশে পুস্তক বিক্রীত হইত কিনা সন্দেহ। এদেশে এ প্রকার গ্রন্থ পড়াইতে হইলে, মূল্য আরও একটু কম করা চাই।

৩। শোভনা। অথবা ভবিষ্য ইতিহাসের একটী অধ্যায়। প্রথমভাগ। শ্রীহরিদাস ভারতী প্রণীত, মূল্য ১৲। আমরা এই নামের একখানি পুস্তক সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাপ্ত হইয়াছি—মনোযোগের সহিত সমস্ত পড়িয়াছি। পুস্তক খানি ইতিহাস, না নাটক, না উপন্যাস, ইহার কি আমরা বুঝিলাম না। পুস্তক খানির দৃশ্যগুলি কতক নাটকের মত, কিন্তু যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা নাটকের বিষয় হইবে কিরূপে? ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা এই বুঝি, যাহা আজও ঘটে নাই, এ হিসাবে এরূপ গল্পকে কেবলই কল্পনা বলিয়া ধরা যায়। গ্রন্থকারের কাল্পনিক ভবিষ্যতের চিত্র যদি সত্য হয়—তবে বঙ্গসমাজ একদিন ফিরিঙ্গি সমাজ হইবে—আচার ব্যবহার সামাজিক রীতি নীতি, বেশভূষা সকলই সাহেবী ধরণের হইবে; কারণ শোভনার চিত্র বঙ্গসমাজের চিত্র নহে, ফিরিঙ্গি সমাজের চিত্র। এ প্রকার চিত্র গ্রন্থকার যত্ন করিয়া কেন আঁকিলেন, বুঝিলাম না। গ্রন্থকার সদুদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহার বিজ্ঞাপনে বুঝিলাম; কিন্তু লীলাবতী ও শশিভূষণের চিত্র আঁকিয়া তিনি স্ত্রীস্বাধীনতার কূলে যে কি গাঢ়তর কালিকা লেপন করিয়াছেন, তাহা কি তিনি বুঝিতে পারেন নাই? স্ত্রীস্বাধীনতার ফল যদি এরূপ শোচনীয় হয়, তবে তাহাকে কে আদর করিবে? ভবিষ্য বঙ্গ-ইতিহাসের এ প্রকার চিত্র আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। বঙ্গীয়সমাজ গঠনের সময়ে এ প্রকার চিত্র সর্ব্বনাশের মূল। পুস্তক খানি পড়িলে বোধ হয়, যেন কতকগুলি ধর্ম্ম উপদেশ দিবার জন্যই পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে; এই জন্য গ্রন্থকার এমন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহার সহিত এই পুস্তকের মূল চিত্রের সহিত সম্পর্ক নাই। দৃষ্টান্ত তুলিব না, যিনি পুস্তক খানি পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন। ইন্দুভূষণ, প্রেমমালার চিত্র, মাতালের গল্প, এ সকলই এই উদ্দেশ্যে লিখিত। শ্যামা শশিভূষণের স্ত্রী নহে, অথচ তাহাদের ব্যবহার এত ঘৃণিত যে, কোন ভদ্র পরিবারে এরূপ ঘটে, বোধ হয় না। ইন্দুভূষণ এই মাতাল ছিলেন, বদমাইসের শিরোমণি ছিলেন, হঠাৎ রং বদলাইলেন,—একেবারে সংস্কারক হইলেন! কি সূত্রে তাহা গ্রন্থকারই জানেন। পুস্তকে বিশেষ কোন ঘটনার বা কারণের উল্লেখ নাই। গ্রন্থারম্ভে জন্ম তিথি—সাহেবি চাল্ চল্ তি শিক্ষার চরম আদর্শ—সেখানে গান হইতেছে,—প্রেমালাপ হইতেছে,—চুম্বন হইতেছে, আরো

কত কি? পরে কোর্টসিপ হইতেছে, সেও সাহেবী প্রণালীতে। যাহারা এই প্রকার সাহেবী চাল্ চল্‌তির পক্ষপাতী, তাঁহারা এ পুস্তকের আদর করিতে চান, করুন; আমরা ইহার ভয়ানক বিরোধী। যখন ভারতের এ প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিব, তখন বক্ষ ভাসাইয়া কাঁদিতে বসিব।

অনেকের মতে, শোভনার চিত্রটী ভাল হইয়াছে। ভাল,—ইহার পরিচয় সেই স্থানে পাইলাম যেখানে 'সমতা' নাই বলিয়া শোভনা বিনোদ বাবুকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। এইটীই উজ্জ্বল ঘটনা। কিন্তু পরে সে জন্য আবার শোভনাকে কষ্ট পাইতে হইল! "এইরূপ ভাবে অপমানিত ও মর্ম্ম পীড়িত করিয়া শোভনার মনে যে কষ্ট হইল, তাহা তুমি আমি কি করিয়া বুঝিব? কখনও যদি কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনার হাতে আপনার হৃদয়কে উৎপাটিত করিয়া থাক, শোভনার এই কষ্ট কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবে।" কর্ত্তব্য পালন করিতে যে সক্ষম হয়, তাহার আবার কষ্ট হয়? নূতন শুনিলাম। যাহার হয়, সে নরকের কীট, কর্ত্তব্য তাহার নিকট নরক যন্ত্রণা। শোভনার চিত্র এই স্থানেই মলিন হইল। কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানব হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিয়া যাঁহারা কখনও একটুও কষ্ট পান নাই, তাঁহারা শোভনার কষ্ট কি প্রকারে বুঝিবেন?

আর একটী কথা—শোভনা বাঙ্গালীর মেয়ে, চিরকাল গৃহেই থাকিতেন, বীরত্বের বিকাশ পূর্ব্বে যদি কিছু হইয়া থাকে, তবে তাহা কেবল কল্পনায়। এই শোভনা হঠাৎ সেই "প্রতিজ্ঞার সময়ে" কেমন করিয়া বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিল, আমরা বুঝিলাম না। এ চিত্র-বিকাশ ভালরূপ হয় নাই।

তারপর লীলাবতীর চিত্র। লীলাবতীর চিত্রকে গ্রন্থকার জেদ রক্ষা করিবার জন্যই যেন হত্যা করিয়াছেন। এমন 'ফুটন্ত ফুলকে' এমন করিয়াও পেষণ করিতে হয়? এমন সুন্দর হৃদয়ে এমন হিংসা, এমন ভালবাসা-সুধায় এমন অবিশ্বাস-গরল, রমণী জীবনে ঘটিতে পারে, আমাদের সে ধারণা ছিল না। লীলাবতীর চিত্রটীর শেষ ভাগ একেবারে অস্বাভাবিক হইয়াছে।

রমানাথের চিত্রকেও গ্রন্থকার মলিন করিয়াছেন। শশিভূষণের মত একটা পাষণ্ডকে রমানাথ বহুদিনের আলাপ ব্যবহারেও চিনিতে পারিলেন না,—স্ত্রীস্বাধীনতার সীমা অতিক্রম করিয়া লীলার সহিত এখানে ওখানে পাঠাইলেন, নির্জ্জনে আলাপ পরিচয় করিতে দিলেন, কত কি করিলেন। সব কাহিনী বলিতে গেলে পুস্তক বাড়িয়া যায়। সেই শশিভূষণ লীলাকে ফাঁদে ফেলিয়া ধরিল—গোপনে বিবাহ করিল। উদারতার দিকে দেখিলে—ইহাতে রমানথের ক্রোধোন্মত্ত না হইলেই ভাল হইত। যদি হইলেন, তবে আবার আপোস কি—ভয় কি?—নীতি-পরায়ণ লোকে এমন অবৈধ কার্য্যে সহানুভূতি দেখাইতে পারে না। সেই পৈশাচিক বিবাহের সংবাদ রমানাথ পরে সংবাদ পত্রে ঘোষণা করিয়া না দিলে কি ক্ষতি ছিল? ঐ টাকা না দিলে কি হইত?—লোকে নিন্দা করিত? তাতে রমানাথের কি হইত? এই কপটতার এইরূপ ঢাকাঢাকিতে বঙ্গ সমাজের, ভয়ানক অনিষ্ট হইতেছে। রমানাথের চিত্র এইখানেই গেল।

কোন চিত্রের বিকাশই এ পুস্তকে ভাল হয় নাই; শোভনা, রমানাথ, লীলাবতীর চিত্রই প্রধান, তাহাও এই প্রকারে মাটী হইয়াছে।

পুস্তকের শেষাংশ কিছু ঐন্দ্রজালিক ভাবে পূর্ণ, গ্রন্থকার কিছু বৈচিত্র্যময় করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। বিরাট পুরুষ, ঐ বৈশাখের চতুর্দ্দশী, ঐ প্রতিজ্ঞা, ঐ নিশীথ সঙ্গীত, ঐ নদী তীর, এ সকলে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু নূতনত্ব নাই। ম্যাট্‌সিনীর 'নব্য-ইটালি' সংগঠনের পর আনন্দমঠে বঙ্কিম বাবু বৈচিত্র্য দেখাইতে পারেন নাই; বঙ্কিমের পরে আবার সে চেষ্টা কেন? বঙ্কিম শক্তিশালী লোক, তবুও কতক ভাব ঢালিতে পারিয়াছেন। কিন্তু শোভনায় কিছুই হয় নাই, কেবল বক্তৃতাই সার হইয়াছে। সেই চতুর্দ্দশীর দিন প্রতিজ্ঞার পরে সকলের সহিত পরিচয় হইল—সেখানে দেখা গেল, রমানাথ, যোগীন্দ্রনাথ, ইন্দুভূষণ, বিনোদবিহারী, আর সেই শোভনা; কি সূত্রে সকলে মিলিলেন, আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে পাইলাম না। তারপর সেইখানে হঠাৎ দেবেন্দ্রনাথ, শোভনার পিতা উপস্থিত; কি সূত্রে ভগবান জানেন! গ্রন্থকার বেশ মিলন দেখাইলেন। তারপর, জয় ভারতের জয় গাইলেন। বেশ শুনিলাম, বেশ দেখিলাম। শোভনার পরিণাম কি হইবে, পাঠক অনুমান করিয়া বলিতে পারেন বলুন, আমরা সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না।

দোষের কথা অনেক বলিলাম, গুণের কথা একটু বলি। মলাটের ছবিটী ভাবপূর্ণ—আত্মনির্ভর ও আত্মবিসর্জ্জন ভারতকে স্বাধীনতার দিকে তুলিয়া দিতেছে, এ বেশ চিত্র পুস্তকে এ চিত্রের বিকাশ দেখাইতে পারিলে বড়ই ভাল হইত, তাহা হয় নাই; তবুও ইহা ভাবপূর্ণ। পুস্তকের ভাবা মন্দ নহে,তবে স্ফুটন্ত ঘুমন্ত, পড়ন্ত প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার-বাহুল্যে কিছু শ্রুতি-কঠোর হইয়াছে। যাহা হউক ভাষাড়ম্বর বড় নাই। গ্রন্থকার নূতন লেখক, তাঁহার হাতে যাহা হইয়াছে, ইহাতেই তাঁহাকে ধন্যবাদ দি। আজ কাল যে প্রকার অসংখ্য অসংখ্য গল্পের পুস্তক ছারপোকার ন্যায় সাহিত্য সংসারকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে, শোভনা তাহাপেক্ষা অনেক ভাল। কিন্তু এ ভালতে গ্রন্থকারের ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই।

৪। অষ্টাদশ বিদ্যা। অর্থাৎ বেদ বেদাঙ্গাদির মূল অর্থ। শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা গোবিন্দ বাবুর লীলাবতী পড়িয়া সুখী হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার এ অষ্টাদশ বিদ্যা যে কেন প্রকাশিত হইয়াছে, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। ৬০ পৃষ্ঠায় বেদবেদাঙ্গাদি অষ্টাদশ বিদ্যার স্থূল মর্ম্ম কে বুঝিতে পারিবে, জানি না। যাঁহারা মূল শাস্ত্রাদি পড়িয়াছেন, তাঁহারা কেবল বলিতে পারেন যে, হাঁ অমুক দর্শনের তাৎপর্য্য এই, কিম্বা এই নয়। তদ্ব্যতীত ইহা হইতে কাহারও কিছু বুঝিবার সাধ্য নাই। এ গ্রন্থ খানিতে লেখা আছে, এখানি প্রথম খণ্ড। যদি প্রথমখণ্ড কেবল মাত্র index হয়, তবে আপত্তি নাই, হয়ত দ্বিতীয় খণ্ডে সকল শাস্ত্রের স্থূল মর্ম্ম প্রকাশিত হইবে। তাহা হইলেও প্রথমখণ্ডকে হয় দ্বিতীয়খণ্ড হওয়া উচিত, অথবা পরিশিষ্ট হওয়া উচিত। যেমন ইংরাজিতে History of Philosophy আছে, ঐরূপ বাঙ্গালায় একখানি পুস্তকে সংস্কৃত দর্শনাদির পরিষ্কার ভাবাদি প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজনীয়। শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয়ভাগে ইহা কতকাংশে সাধিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও বিস্তারিত রূপে কিছুই হয় নাই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যদি তাহাই পারেন,

করুন, নচেৎ এরূপ অষ্টাদশ বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অতি অল্প।

৫। কি কর্ত্তব্য। শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলনকে দেশে স্থায়ী করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা বিধেয়, এ পুস্তকে তাহারই আলোচনা হইয়াছে। পুস্তক খানি পড়িয়া সুখী হইলাম। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "শুধু অর্থ সংস্থানের চেষ্টা না করিয়া যাহাতে সমিতি-সূত্রে আমাদিগের মধ্যে একতা সংস্থাপিত হয়, তদ্বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।" গ্রন্থকারের এ মতটী অত্যন্ত সারগর্ভ। গ্রন্থকার স্বীয় মন্তব্য প্রকাশান্তে একতা সংস্থাপন উদ্দেশ্যে একটী সমিতি কি প্রণালীতে চলিতে পারে, তাহার কতকগুলি নিয়ম নির্ব্বাচন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হউক, আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

৬। রত্ন-রহস্য। নানা শাস্ত্র হইতে শ্রীরামদাস সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য ১৲। রামদাস বাবু বঙ্গের একটী রত্ন। ধনীর সন্তান বিলাস সুখের পথ পরিত্যাগ করিয়া দেশের এই প্রকার পঙ্কোদ্ধার করিতেছেন, ইহা দেখিলে কাহার মনে না সুখের উদয় হয়? অর্থের সদ্ব্যবহার কি প্রকারে করিতে হয়, রামদাস বাবু তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে কি কি রত্ন ছিল, কি প্রকারে কোথায় পাওয়া যাইত, কি ব্যবহারে আসিত, কি করিয়া বিশুদ্ধ রত্ন সকল পরীক্ষা করা হইত, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে তাহার সার লিপিবদ্ধ করিয়া, 'রত্নরহস্য' নামক গ্রন্থ খানিকে তিনি এ বৎসর সাহিত্য-জগৎকে উপহার দিয়াছেন। সাহিত্য জগৎ তাঁহার উপহারে উপকৃত, তাঁহার নিকটে অবশ্য কৃতজ্ঞ হইবেন। এ প্রকার পুস্তকের আদর না হইলে আর কিসের আদর হইবে? রামদাস বাবু দীর্ঘজীবী থাকিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

৭। আদর্শ কৃষি।—ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতি হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত; শ্রীশশিভূষণ গুহ প্রণীত, মূল্য ।৵০। পুস্তক খানি বেশ পরিপাটী, দেখিতে ভাল, পড়িতে ভাল। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে এই পুস্তকের আদর হইবে, আমাদের বিশ্বাস নাই। কারণ ইহা পড়িবে কে? পড়িলেই বা ইহা দ্বারা উপকৃত হইবে কে? এ দেশের নিরক্ষর কৃষকশ্রেণী কখনও পুস্তক দেখিয়া মৃত্তিকাকর্ষণ করে না, বীজ বপন করে না, শস্য কাটে না। বিশেষতঃ এ পুস্তকে নূতন উপদেশ অতি অল্পই আছে, যেমন মান্ধাতার আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহারই বর্ণনা আছে, সুতরাং এ পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবে কে, বুঝিলাম না। তবে সারস্বত সমাজ অবশ্য প্রশংসার পাত্র, কারণ ঘরের টাকা খরচ করিয়া দেশের উপকার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। গ্রন্থকারকেও প্রশংসা করি, তিনি অন্যান্য অনেক গ্রন্থকারের ন্যায় অসার প্রবন্ধাদি লিখিয়া সময় নষ্ট করেন নাই। শশিবাবুর পরিশ্রম সার্থক হইলে আমরা সুখী হইব। এস্থলে একটী কথা বলিব, ভারতসুহৃদ হইতে 'ভারতের কৃষি ও বাণিজ্য' প্রবন্ধটী না তুলিলেই ভাল হইত; কারণ, তিনি উক্ত পত্রিকায় যে প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলেন, তাহা এত পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়াছিল যে, তাহাকে একটী নূতন প্রবন্ধ বলা যায়, শশিবাবুর প্রবন্ধ না বলিলেও চলে। এই সামান্য বিষয়ে উদাসীন থাকাই উচিত ছিল।

৮। দুর্গোৎসব—উদ্ভট কাব্য।—ভাল লাগিল না। গ্রন্থকার বিরক্ত হইবেন না। এ পুস্তক প্রকাশে দেশের কোন উপকার হয় নাই, এবং হইবে না।

৯। An Essay on Happiness, by Kisori Lal Ray, মূল্য ১৲। কি করিলে মানুষ সুখী হইতে পারে, গ্রন্থকার বিস্তার সহিত তাহা, সাধারণের উপকারের জন্য, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিশোরীলাল বাবু চিন্তাশীল ধার্ম্মিক লোক, তাঁহার পুস্তক পড়িতে আমরা খুব ভালবাসি। এই প্রবন্ধটী পড়িয়াও আমরা সুখী হইলাম। দুঃখ এই রহিল, এ পুস্তক স্বদেশের অনেকেই বুঝিবে না। কিশোরী বাবুর ন্যায় লোকের বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা উচিত। তাহাতে দেশের উপকার হইবে —দেশের উপকার হইলে তাঁহারও লাভ হইবে।

১০। বেদিয়া বালিকা। শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত, ও শ্রীআশুতোষ ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত। গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলী। মূল্য ৵০। বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ সুরুচিপূর্ণ একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এই সময়ে 'বেদিয়া বালিকার' ন্যায় সরল, সুপাঠ্য, উপদেশপূর্ণ পুস্তক যে গৃহে গৃহে অধীত হইবে, আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আলীসের চিত্রটী এত সুন্দর, যিনি পুস্তকখানি পড়িবেন, তিনিই সুখী হইবেন, তিনিই উপকৃত হইবেন। প্রকাশক ঠিকই বলিয়াছেন—'ইহা পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবে না।"

১১। কৃষক বালা—অভিনব গীতিকাব্য, মূল্য ৷৹, ইংলণ্ডগমনপ্রয়াসি-ভিক্ষার্থি-বিরচিত। এখানিও গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলীর মধ্যে একখানি। হউক একখানি, তাতে কিছু আসে যায় না। এ প্রকার পুস্তকে মহিলাদের বড় উপকার হয় না। প্রণয় শিক্ষাই সংসারের চরম শিক্ষা নহে, পতির চিতায় আরোহণ করিলেই নারীজন্ম সার্থক হয় না। সহমরণের অর্থও তাহা নহে। শাস্ত্রবলে, ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য ;—ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলে সংসারাশক্তি মরিয়া যায়; তাহাই সহমরণ। ইহা সত্বেও ঐ নৃশংস শোকাবহ ঘটনার মায়াময়ী স্বপ্ন আবার ভারতে জাগাইয়া লাভ কি, উপকার কি, সুখ কি? একজন মানুষের জন্য আর একজন মানুষ মরিবে, এ কুপ্রথা দেশ হইতে ধৌত হইয়াছে, বাঁচিয়াছি। আবার সে চিত্রের প্রলোভন কেন?—প্রণয় ভাল, প্রেম ভাল, তাহা জানি, তাহা মানি; কিন্তু নৃশংস ব্যাপারের আদর কে করিবে? মহিলাদের যাহাতে ধর্ম্ম-জ্ঞান বদ্ধমূল হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করাই উচিত। প্রণয়, বিচ্ছেদ প্রভৃতি লইয়াই তাঁহারা মগ্ন; তাঁহাদিগকে আর সে শিক্ষা প্রদানে লাভ কি? আর একটী কথা, কৃষকবালার চিত্রটী কিছু অস্বাভাবিক হইয়াছে। গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলীর তালিকায় এই অসাময়িক পুস্তকখানিকে না রাখিলেই ভাল হয়। তবে লেখকের কবিতা লিখিবার যে বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কৃষকবালার লেখা ভাল, পড়িলে সুখ পাওয়া যায়, ইহাতে যথেষ্ট বৈচিত্র্যময় ঘটনার সমাবেশ আছে,—তাহাতে লালিত্য আছে,—তাহাতে মধুরতা আছে। গৃহপাঠ্য পুস্তকাবলীতে এই পুস্তক খানি না থাকে, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

১২। শ্রীপুর-হিতসাধিনী সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ। আমরা এই সভার কার্য্যবিবরণখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। বিনা আড়ম্বরে সভা শ্রীপুরে অনেক গুলি হিতানুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন। সভা হইতে অনেকগুলি দরিদ্র ছাত্রের স্কুলের বেতন দেওয়া হয়, গ্রাম্য পুস্তকালয়টীর তত্ত্বাবধান করা হয়। এতদ্ভিন্ন সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, এবং স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়টীর তত্ত্বাবধান করিতেছেন। অত্যন্ত সুখের বিষয়, ১২৮৯ সালের শ্রাবণ হইতে ১২৯০ সালের ভাদ্র পর্য্যন্ত সভা হইতে ৪৪০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৬৭ জন আরোগ্য হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সভা স্থানীয় মিউনিসিপালিটীর সংশোধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। এ সভাটীর কার্য্য প্রণালীর মধ্যে কিছুই আড়ম্বর দৃষ্ট হয় না। বাবু ফনীন্দ্রমোহন বসু প্রভৃতি কয়েকজন উৎসাহী সভ্য থাকায় সভার বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। আমরা ঈশ্বরের নিকট এই সভার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি।

১৩। বাঁশরী—নবন্যাস, মূল্য ।৹, গ্রন্থকারের নাম নাই। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে একটী ক্ষুদ্র গল্প আছে, গল্পটীর প্রথমাংশ তত ভাল নহে, "প্রিয়তম, প্রাণাধিক" প্রভৃতি কতক গুলি অনাবশ্যক বাহ্য প্রণয়-প্রকাশক কথার ছড়াছড়ি দেখিয়া মনে একটু দুঃখের উদ্রেক হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, বিচ্ছেদ-সঙ্গীত প্রচারই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। সে ভ্রম দূর হইয়াছে। পুস্তক খানি শোক উদ্দীপক। এ প্রকার পুস্তক প্রচারে দেশের উপকার আছে—স্থায়ী ফল ফলে। লেখকের শত শত ত্রুটী সত্ত্বেও আমরা এ পুস্তকের প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। লেখক যিনিই হউন, তাঁহার গল্প রচনার বেশ শক্তি আছে। তবে সুখদয়াল বৈদ্যনাথের বাড়ীতে গেল কেন, বুঝিলাম না; এইরূপ না করিলে গল্পের মিল হয় না বলিয়া জোর করিয়া যেন ঐরূপ করা হইয়াছে। ঘটনার সামঞ্জস্য, কার্য্য কারণ উত্তমরূপ প্রস্ফুটিত করিতে না পারিলে আর গ্রন্থকারের প্রশংসা কি?

১৪। অজেন্দুমতী—নাট্যগীতি—মূল্য ।৶৹ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকারের নাম নাই। ভাল লাগিল না বলিয়া পুস্তক পড়িয়া শেষ করিতে পারিলাম না। গুরুদাস বাবু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তিনি পয়সার লোভে আজ কাল মৃত-সাহিত্য ভাণ্ডার লইয়া ব্যবসা চালাইতেছেন, এজন্য আমরা বড়ই দুঃখিত আছি। গুরুদাস বাবুর দোকান কালে কি বটতলা হইয়া উঠিবে? গুরুদাস বাবুকে অনুরোধ করি, সাবধান হউন, তাঁহার নামে কলঙ্ক আমাদের অসহ্য।

১৫। পাক্ষিক সমালোচক। তৃতীয় সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। ফাল্গুন মাসে এই অভিনব পত্রিকা খানি প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের একটী শুভ লক্ষণ এই, অনেকেই ইংরাজি-প্রমুখ ইয়ঙ বেঙ্গলের দল পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য জগতের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। দেশে থাকিব, দেশে বড় হইব, দেশেই শিখিব, দেশেরই উন্নতি করিব,—অন্তিমকালে দেশেরই মৃত্তিকাতেই অস্থি মিশাইব;—দিন দিন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বাসনা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গ-যুবকের নব তেজের, নব উৎসাহের পরিচয় চাও? ১২৯০ সালের সাহিত্য সমাজের দিকে চাহিয়া

দেখ। জাতীয় ভাষার উন্নতির জন্য এত লোক খাটিতেছে. একি সুখের চিত্র! ইহার মধ্যে একটী দুঃখের রেখাও আছে—উৎসাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যেমন উঠিল, অমনি পড়িল,,—অমনি মরিল। উঠা, পড়া দেখিতে দেখিতে আমাদের চোক ঝালাপালা হইয়া উঠিয়াছে,—এক চোকের হাসি নিবিতে না নিবিতে আর চোকে অশ্রু দেখা দিতেছে। এমনি হইয়া উঠিয়াছে—এমন আর অভ্যুদয়েও আনন্দ পেলে না, তিরোধানেও দুঃখের উদ্রেক হয় না। অবশ্য স্বীকার করিব, ইহা বড় শুভলক্ষণ নহে। কি করিব, ভাব ত বুঝিতে পারি না;—উঠিতে দেখিলেই মনে হয়—অবোধ শিশুর হাসি বুঝি অনেকক্ষণ থাকিবে না—বুঝি রৌদ্র উঠিতে না উঠিতেই চলিয়া পড়িবে। হায় গত বৎসর কত উঠিল, কত পড়িল!! পাক্ষিক সমালোচক আমাদের আদরের জিনিষ, কিন্তু কত দিন থাকিবেন, জানি না; তাই প্রাণ খুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেও ইচ্ছা হয় না। একে একে তিন সংখ্যা পাইলাম—কিন্তু ঠিক যে সময়ে পাওয়া উচিত, সে সময়ে পাইলাম না। এ লক্ষণ বড় ভাল বোধ হয় না। পাক্ষিকের স্বর ভাল, আকৃতি ভাল, মত ভাল,—আড়ম্বরশূন্য, ঝাঁকজমক শূন্য। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর সমালোচকের জন্ম হয়—কেবল অন্যের নিন্দা প্রচারের জন্য; দেখিয়া সুখী হইলাম, এ সমালোচক সে শ্রেণীর নহে। অন্যের দোষ প্রচার অপেক্ষা নিজের মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়াতেই শক্তির পরিচয়! সমালোচক দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইলে আমরা সুখী হইব।

১৬। A Discourse on the Nature and Progress of Theism: by C. C. Sen. কে বড়?—মা বড় কি পুত্র বড়?—ঈশ্বর বড় কি মানুষ বড়? স্রষ্টা বড় কি সৃষ্ট পদার্থ বড়?—এই কথা লইয়া পৃথিবীতে কত তর্ক বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। কেহ বলিতেছেন—সংসারই বড়—মানুষই শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানই পূজ্য,—বিকাশই লক্ষ্য;—বলিতেছেন, ঈশ্বর নাই, থাকিলেও তাঁহাকে বুঝা যায় না, ধরা যায় না। মিল, কম্‌টীর মাথা ঘুরিয়া গেল, পেন্সার কূল ধরিতে পারিলেন না। ইথরের মত, প্রোটোপ্লাজমের মত, কত মতই উঠিয়া ঈশ্বরকে মানব রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য চেষ্টা করিল। চেষ্টার ফল কি হইল? সকলই ধূলির ন্যায় উড়িয়া গেল! কেন বলিতেছি? মানবের অন্তরের নিগূঢ়তম স্থানে যে ধর্ম্মের পিপাসা—স্রষ্টার প্রতি অবিচলিত ভক্তি—স্রষ্টার অনুভূতি (Consciousness) ছিল, তাহা তিরোহিত হইল না; কখনও যে হইবে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে, মহান্ ঈশ্বরের এক চুলও টলিবে না—ঈশ্বরের রাজ্যের একচুলও ধ্বংশ হইবে না। তর্ক বল, যুক্তি বল, জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, মত বল, সকল পরাস্ত হইয়া যাইবে—ঐ অনন্ত শক্তির নিকটে! তাই হইতেছে। সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্ত হইতেছে,—মানবের আত্মায় আত্মায় মিলনের ধর্ম্ম, যাহা পৃথিবীর আদি সময়ে ছিল, তাহাই আবার নবভাবে, নবতেজে, নব সৌন্দর্য্যে দীপ্তিমান হইয়া জাগিতেছে। সমস্ত অধর্ম্ম, অসত্য একদিকে,—প্রকৃত ধর্ম্ম—প্রকৃত সত্য এক দিকে;—সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী, ধর্ম্মের জয় ধ্রুব নিশ্চিত। সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে না, অধর্ম্ম থাকিবেনা,—মনুষ্যের প্রধান্য থাকিবে না;—যাহা সত্য তাহাই থাকিবে। এই পুস্তকে এই সকল কথাই বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই।